প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত এম.এ., পি-এইচ্. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের

ধারাবাহিক ও সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনায় প্রধান পথিকৃৎ

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বি.এ., ডি.লিট্.

মহোদয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

—গ্রন্থকার

সূচী-পত্র

মধ্য যুগ

পৃষ্ঠা

(লৌকিক-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও জন-সাহিত্য)

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

* এই গান রচকগণের অনেকেই, বিশেষতঃ ৮নং হইতে ২৩নং পর্যন্ত সকলেই, শাক্তগান রচনা করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার। (১১) রামকৃষ্ণ রায়। (১২) ভারতচন্দ্র রায়। (১৩) শিবচন্দ্র রায়। (১৪) মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। (১৫) রামনিধি গুপ্ত। (১৬) দাশরথি রায়। (১৭) কুমার শম্ভুচন্দ্র রায়। (১৮) দেওয়ান রঘুনাথ রায়। (১৯) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। (২০) দেওয়ান রামদুলাল নন্দী। (২১) মহারাজা নন্দকুমার। (২২) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। (২৩) রামপ্রসাদ সেন। (২৪) আজু গোঁসাই, (২৫) রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), (২৬) দাশরথি রায়, (২৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

(ii) কবিগান।

(১) শাক্ত কবিওয়ালাগণ :—

(ক) রামবসু, (খ) এন্টনি ফিরিঙ্গি, (গ) ঠাকুর সিংহ।

(২) বৈষ্ণব কবিওয়ালাগণ :—

(ক) রঘুনাথ দাস (রঘু মুচি), (খ) রাসু ও নৃসিংহ, (গ) গোঁজলা গুঁই, (ঘ) কেষ্টা মুচি, (ঙ) নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, (চ) হরু ঠাকুর, (ছ) ভোলা ময়রা, (জ) রাম বসু, (ঝ) রামরূপ ঠাকুর, (ঞ) যজ্ঞেশ্বরী।

(iii) যাত্রাগান।

(ক) পরমানন্দ অধিকারী, (খ) শ্রীদাম সুবল অধিকারী, (গ) লোচন অধিকারী, (ঘ) গোবিন্দ অধিকারী, (ঙ) পীতাম্বর অধিকারী, (চ) কালাচাঁদ (পাল) অধিকারী, (ছ) কৃষ্ণকমল গোস্বামী, (জ) প্রেমচাঁদ অধিকারী, (ঝ) আনন্দ অধিকারী, (ঞ) জয়চাঁদ অধিকারী, (ট) গুরুপ্রসাদ বল্লভ, (ঠ) লাউসেন বড়াল, (ড) গোপাল উড়ে, (ঢ) কৈলাস বারুই, (ণ) শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।

(iv) কীর্তন গান।

(১) গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, (২) মঙ্গল ঠাকুর, (৩) চন্দ্রশেখর ঠাকুর, (৪) শ্যামানন্দ ঠাকুর, (৫) মদনচাঁদ ঠাকুর, (৬) পুলিনচাঁদ ঠাকুর, (৭) হরিলাল ঠাকুর, (৮) বংশীদাস ঠাকুর, (৯) নিমাই চক্রবর্ত্তী, (১০) হারাধন দাস, (১১) দীনদয়াল দাস, (১২) রামানন্দ মিশ্র, (১৩) রসিকলাল মিশ্র, (১৪) বনমালি ঠাকুর, (১৫) কৃষ্ণকান্ত দাস প্রভৃতি।

ভূমিকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী এখনও আশানুরূপ সচেতন নহে। ইহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। এই কথা সুনিশ্চিত যে বাঙ্গালীর প্রাচীন ভাবধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা নিতান্ত আবশ্যক। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেরই উত্তরাধিকারী। সব দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগে ইহার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। খৃঃ ৮ম হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। তাহার পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্যান্ত আধুনিক যুগ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ কতকগুলি সমস্যার, সুতরাং অসুবিধার, সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে? সাহিত্যের বাহন ভাষা, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাই বা কত পুরাতন? বাঙ্গালা দেশের আয়তন কত বড় এবং ইহার অধিবাসী সকলেই কি "বাঙ্গালী" অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে? বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? এইরূপ নানা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই প্রকার প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ গ্রহণযোগ্য মীমাংসা-গুলিই লিপিবদ্ধ করা গেল, কারণ স্থানাভাব এবং যুক্তি-তর্কের সীমাহীন অবকাশ।

খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষার আরম্ভ হইয়াছে এবং খৃঃ ৯ম শতাব্দী হইতে সাহিত্যের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খৃঃ ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার যুগ এবং এই ৮ম শতাব্দীতেই সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উন্মেষ হয়। ইহার পর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রথম-দিকে কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে। এমনকি এই সময় "বাঙ্গালা" বা "বঙ্গ" কথাটির স্থলে অনেক কাল যাবৎ "প্রাকৃত" এবং "ভাষা" কথাটির প্রচলন ছিল। "বঙ্গ" বা "বাঙ্গালা" কথাটি "প্রাকৃত" অথবা "ভাষা" কথাটির স্থানে ঠিক কবে হইতে ব্যবহৃত হইতেছে বলা কঠিন। তবে, "প্রাকৃত" অথবা "ভাষা" কথার স্থানে "গৌড়ীয়" ও "বঙ্গ"

শব্দ দুইটির প্রয়োগ খৃঃ ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিপুরার রাজপঞ্জীতে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ করিতে "সুভাষা" কথাটির ব্যবহার বেশ মনোরম। রাগ-রাগিণীতে ব্যবহৃত "বাঙ্গাল" রাগ কথাটিও এই উপলক্ষে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশের আয়তন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রূপ ধরা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পলিবাহিত শস্যশ্যামল সমতলভূমিই প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বাঙ্গালা দেশ। উহা এখনকার শাসনসম্পর্কিত একটি প্রদেশমাত্র। জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিবেচনা করিলে দেশটির আয়তন আরও বড়। এই হিসাবে দেশটির আয়তন বর্দ্ধিত করিতে হয়। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং আসামের অংশবিশেষ ইহার অন্তর্গত করা সঙ্গত। সমগ্র আসাম প্রদেশ তো বটেই, সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগকে বাঙ্গালা দেশে আগত প্রাচীন জাতিগুলির সংস্পর্শ, সংঘর্ষ ও উপনিবেশের ক্ষেত্র হিসাবে বৃহত্তর বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিলে কোনরূপ আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

নানা বিভিন্ন জাতি পূর্ব্ব-ভারতে ছড়াইয়া পড়িবার ফলে শুধু বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশেই ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে নাই; তাহারা সমগ্র বিহার আসাম, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং উত্তর-ব্রহ্ম, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ তথা পূর্ব্বহিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্ন সময়ে বসতিস্থাপন করিয়াছিল। ইহার একটি প্রধান অংশই প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ। তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার সমতল ভূমি ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতলভূমি এবং পার্ব্বত্য অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই ভূভাগ অবশ্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত সমতল ভূমি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ইহার প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। সম্ভবতঃ "বাঙ্গালা" দেশ বুঝাইতে ইহা সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বুঝিতে অধিক সুবিধা হয়।

প্রাচীনকালে যে জাতিগুলি পূর্ব্ব-ভারতে বা "প্রাচ্য" দেশে আগমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছে তাহারা প্রধানতঃ "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠী-ভুক্ত। ইহাদের ছাড়া (প্রায় অবলুপ্ত নেগ্রিটো ভিন্ন) পামিরীয়, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য্যগণের নাম করা যাইতে পারে। আমাদের ধারণা এই সব জাতি প্রাথমিক নানা সংঘর্ষের পর ক্রমশঃ সকলে প্রতিবেশীর মত সৌহার্দ্দপূর্ণ মনোভাব লইয়া বাস করিতে অভ্যাস করে। ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে কিছু পরিমাণে বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কারণপরম্পরা বাঙ্গালী জাতি

প্রধানতঃ "অষ্ট্রো-আম্নাইন" (পামিরীয়) নামক মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে এই জাতির রক্তের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিমাণে মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য্যরক্তও সংমিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদের বাহ্যিক সংস্কৃতি এবং আচার বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য্যসম্ভূত হইলেও অন্তরে ইহারা অষ্ট্রো-আম্নাইন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই দিক দিয়া ইহাদের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মালয় ও অন্যান্য জাতিগুলির ভাষা ও সংস্কৃতিগত নৈকট্য খুব অধিক। অপরপক্ষে ইহারা সূর্য্যপূজা ও মা দুর্গার পূজার মধ্য দিয়া পশ্চিম এসিয়ার মিটানি ও ইরাণী প্রভৃতি জাতির সহিত প্রাচীন আর্য্যজাতির সংস্রবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে এই জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ। অতি প্রাচীন যুগে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই প্রাচ্যের প্রধান ভূখণ্ড বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? বৈদিক ও পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে এই অঞ্চলের সম্যক পরিচয় কি ছিল? তাহার পর, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগে এই ভূভাগের অধিবাসীগণের সম্বন্ধে কি পরিমাণ সংবাদ আমরা রাখিয়া থাকি? বৌদ্ধযুগে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই সময়ের বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার আছে। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয় নাই।

এই সময়ে রাজশক্তিপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্য ও সংহতির যে স্তরে নিয়া পৌঁছাইয়াছিল তাহার ফলেই বাঙ্গালায় একটি নিজস্ব ভাষাগত ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। তাহার পর খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে আসিল গুপ্তযুগ। গুপ্ত সম্রাটগণ হিন্দু ছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধগণের আদরণীয় পালি-ভাষার স্থলে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর খৃঃ ৭ম শতাব্দীতেও বাঙ্গালার সম্রাট শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু আদর্শই পূর্ব্ব-ভারতের প্রাধান্য লাভ করিল। যদিও গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ ৫ম শতাব্দী) চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং কান্যকুব্জের বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও পূর্ব্ব-ভারতের হিন্দু সম্রাট শশাঙ্কের সময়ে (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) অপর চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতে আগমন করিয়া এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেক

কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তথাপি এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই দুই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের স্থলে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কারণ পূর্ব্বভারতের রাজশক্তি এই ধর্ম্মকে তখন সাহায্য করিতেছিল।

পুনরায় খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানহেতু সমগ্র ভারতে বৈদান্তিক মত ও শৈবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল। মুসলমান আক্রমণও ইহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ভারতে অবসানের পূর্ব্বে শেষ একবার ইহার অভ্যুত্থান হইয়াছিল। তাহা খৃঃ ৮ম-১০ম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গে পালরাজগণের রাজত্বকালে। এই সময়ে পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু শূররাজবংশ হিন্দুধর্ম্ম ও ইহার আদর্শ স্থাপনে প্রচুর চেষ্টা করে এবং ইহাদের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী সেনরাজবংশের সময় (খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী) পালরাজগণের বৌদ্ধ আদর্শের স্থলে সেনরাজগণের হিন্দু আদর্শ বাঙ্গালা দেশে প্রাধান্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যায় যে বাঙ্গালা দেশে কোন সময়ে বৌদ্ধমত এবং কোন সময়ে হিন্দুমত প্রবল হয় এবং বিভিন্ন সময়ের রাজশক্তি হয় বৌদ্ধধর্ম্মের নতুবা হিন্দুধর্ম্মের প্রচুর সহায়তা করে। ইহার পর মুসলমান অধিকারে এবং নানা কারণপরম্পরা এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে ব্রাহ্মণগণের নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম্ম খৃঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। পুনরায় এই খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে রাজশক্তির সাহায্য ভিন্নই হিন্দুধর্ম্ম সাম্যবাদ ও প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিতে নূতন প্রেরণা লাভ করে অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম এই সময়ে রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে এদেশ হইতে বহু সংঘারাম এবং নালান্দা ও বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

একটি কথা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য, তাহা তান্ত্রিকতা। এই মত শৈবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সম্ভবতঃ বেদ-পূর্ব্বযুগ হইতে এই দেশে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পামিরীয় জাতি কর্ত্তৃক উত্তরকালে বাঙ্গালা দেশে আনিত হয়। বৌদ্ধসমাজে যেমন দলাদলির ফলে "হীনযানী" ও "মহাযানী" নামক দুইটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তদ্রূপ হিন্দুসমাজেও "বৈদিক" ও "পৌরাণিক" দুই আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্রমে দেখা যায় এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করে।

খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার শূর ও সেনরাজবংশের সময় পর্য্যন্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের স্থলে ক্রমশঃ পৌরাণিক ব্রত, নিয়ম ও পূজা প্রচারিত হইতে লাগিল। আবার খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট শশাঙ্ক সম্ভবতঃ তান্ত্রিক শাক্তমত প্রচারে অধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। একদিকে এই তান্ত্রিক মত খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজে নূতনভাবে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়েরই রূপ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছিল অপরদিকে শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক মত এই খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়া মায়াবাদের সাহায্যে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। আরও পরবর্ত্তীকালে রামানুজের বৈষ্ণব মত বাঙ্গালা দেশে অভিনব জীবনের সঞ্চার করে। মিথিলার ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং শৈব সম্প্রদায়ের যোগশাস্ত্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহার ফলও সুদূরপ্রসারী হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সমস্ত মতের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ খৃঃ অষ্টম শতাব্দী হইতেই প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষার শৈশব অবস্থা। ভাষা ভাবকে আশ্রয় করিয়া চলে। সুতরাং এই সব বিভিন্ন প্রকার মত একটি ভাবধারাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া নানা শাখা-প্রশাখা সহ খৃঃ নবম ও দশম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বীজবপন করে। খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই এই নবজাত সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়া খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় সবই ছন্দে রচিত। এই ছন্দ দুই প্রকারের ছিল—"পয়ার" ও "লাচাড়ী" (পরবর্ত্তীকালের আংশিক ত্রিপদী)। ইহা সমস্তই রাগ-রাগিণী সংযোগে গীত হইত। সংস্কৃত ভাষায় কবিত্বপূর্ণ রচনাগুলি মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য বা চম্পূ (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত)। প্রায় সব বাঙ্গালা রচনাই খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। খণ্ডকাব্যসমূহের ভিতরে ইতস্ততঃ কিছু কিছু মহাকাব্যের ছায়াও পড়িয়াছে। ইহার উদাহরণ মঙ্গলকাব্যসমূহ। আর গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক ও গদ্য রচনার একান্ত অভাব দেখা যায়। প্রায় সব রচনাই কোন ধর্ম্মভাবের প্রেরণার ফল। তবে আধুনিক নাটক ও উপন্যাসের উপাদান এই সাহিত্যে খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে কারণ উহা শাশ্বতধর্ম্মী। এই সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে খৃঃ ১৫শ

শতাব্দী পর্য্যন্ত মূল কবির স্বহস্তলিখিত পুথির একান্ত অভাব। এইরূপ পুথি মোটেই পাওয়া যায় না, অথবা দুর্লভ। যে সব পুথি পাওয়া যায় তাহা কবির নিজ পুথি নহে। ইহা অনুলিপিকার কর্ত্তৃক লিখিত পুথি। প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগে, এইসব ধর্ম্মানুগ সাহিত্যের গায়কগণের নানা দল ছিল। অনেক গায়কই অধিকাংশ সময়ে আবার পুথির লেখক। এইসব পুথি নকলকারীগণ নিজরচিত অনেক ছত্রও লেখাগুলির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আবার অনেক পুরাতন ও লুপ্তপ্রায় পুথির সংস্কার করিয়া ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলি জোড়া লাগাইয়া নানা সময়ের নানা কবির রচনা সংযোগে পুথিসমূহ সম্পাদিত হইত। এই জাতীয় পুথি বহু কবির ভণিতাযুক্ত হইবার ইহাই কারণ। ইহা ভিন্ন নানা প্রতিদ্বন্দ্বী গায়কদলের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কবির পুথি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গীত হইবার ফলে ও খ্যাতি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে নকলের সময় কিছু পরিবর্ত্তিত কলেবর পরিগ্রহ করিত। কোন একজন মূল কবির পুথিখানি এইরূপে নানা কবির হস্তচিহ্নিত হইয়া বিভিন্নরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে এইরূপ কাব্যসম্বন্ধে সমালোচনা বিশেষ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, শূন্যপুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের কাল, কৃত্তিবাসের কাল ও পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম, কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে উল্লিখিত রাজা মানসিংহ, ধর্ম্ম-মঙ্গলের গৌড়েশ্বর ও ময়ূরভট্টের কথা, মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক সুলতান ও চণ্ডীদাস-সমস্যা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালে এইরূপ পুথির সম্পাদনা বিশেষ কঠিন কার্য্য। বহুপ্রকার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠের বাহুল্য ইহাতে যে বিভ্রম সৃষ্টি করে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

বিষয়-বস্তুর পরিধি অল্প অথচ কোন একটি বিষয়ে কবি অনেক। নকলকারী ও পরিবর্ত্তনকারী কবির সংখ্যা ততোধিক। সুতরাং অনেক প্রাচীন কাব্যের সঠিক সময় নির্দ্দেশ ও আলোচনা একরূপ অসাধ্যসাধন সন্দেহ নাই। তদুপরি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন মূল কবির সময় ও পরিচয়জ্ঞাপক পত্রখানিরও অনেক কীটদষ্ট এবং অযত্নরক্ষিত পুথিতে অভাব। এমনকি সব পত্রের মধ্যে শুধু এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্রখানির অভাব ঘটিবার কারণ নিয়াও অনেক যুক্তিতর্কের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সময় সময় কীটদষ্ট পুথিতে কতিপয় নিতান্ত আবশ্যকীয় অক্ষর ও সময়জ্ঞাপক অঙ্কের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অভাব সমালোচনার পথ আরও জটিল করিয়া তোলে। ইহার উপর কোন পুথির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তনের মধ্যে অভিসন্ধির আরোপ করিবার সুযোগের পথও যে না রহিয়াছে এমন নহে। প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধারই এক কঠিন ব্যাপার,

তাহার উপর উল্লিখিত অসুবিধাগুলি বিশেষ করিয়া খণ্ডিত পুথির উপলক্ষে সত্য নির্দ্দেশের পথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে।

এত অসুবিধার মধ্যে আবার পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণের পুরাতন রীতি অনুসরণ করিয়া এদেশের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিগুলির ভিতরে যত্রতত্র বৌদ্ধগন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহারা বিষয়বস্তু ও রচনাগুলির সরল ব্যাখ্যা না করিয়া একটা জটিল ও কুহেলিকাচ্ছন্ন পথ আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাতে সত্য আবিষ্কারের পথ সরল ও সুগম না হইয়া যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সময় খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। আবার এই সাহিত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা আদিযুগ ও মধ্যযুগ। খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১২শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মুসলমানগণের বাঙ্গালায় আগমন পর্য্যন্ত, আদিযুগ এবং অবশিষ্ট প্রায় ছয়শত শতাব্দী অর্থাৎ ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগ। প্রাচীন যুগের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ খৃঃ ১৯শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়া এখন চলিতেছে।

আদিযুগের ছড়া ও গানগুলি কোন বিশেষ দেবতা উপলক্ষে রচিত নহে, থাকিলেও খুব অল্প। সাধারণতঃ ইহা সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, কৃষি ও জ্যোতিষতত্ব এবং দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মতবাদপূর্ণ কতগুলি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মাত্র। কিন্তু মধ্যযুগের ছড়াগুলি কোন বিশেষ দেবতা উপলক্ষে রচিত এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ কাহিনী। ইহাও গীত হইত। এই ছড়াগুলির কাব্যের মর্য্যাদালাভ করিতে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইয়াছিল। একমাত্র বৈষ্ণব অংশছাড়া যাঁহারা মধ্যযুগের কাব্যগুলিকে সাহিত্যিক মর্য্যাদা দিতে অনিচ্ছুক আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। মানবজীবনের তথা সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি যদি সাহিত্য হয়, সার্থক চরিত্র সৃষ্টি যদি সাহিত্যের অঙ্গ হয়, বর্ণনার সৌন্দর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য যদি সাহিত্যে স্থান পায়, বিশেষতঃ গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আন্তরিকতা ও কবিত্বপূর্ণ রচনা যদি সাহিত্যরূপে গণ্য হয়, তবে মধ্যযুগের কাব্যগুলিও সাহিত্যপদবাচ্য।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সময় ও শ্রেণীবিভাগ আর একটি সমস্যা বটে। ইহাকে শ্রেণী (type) ও কালহিসাবে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সময়ের দিকে দেখা যায় প্রায় প্রতি একশত বৎসর পরে একশত বৎসর যাবৎ এই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এইরূপভাবে

গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে স্থূলতঃ ১৪শ, ১৬শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্য যত সমৃদ্ধ ১৩শ, ১৫শ ও ১৭শ শতাব্দীতে তত নহে। শ্রেণীর দিক দিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনটি উপ-বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহা লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্য। ইহা ভিন্ন ইহার শেষের দিকের কবিগান, গীতিকা (পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকা) প্রভৃতি নিয়া "জনসাহিত্য" নামে একটি উপ-বিভাগও কল্পনা করা যাইতে পারে।

লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় খৃঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্য, খৃঃ ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যৌবন এবং ইহার পরে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যের লক্ষণযুক্ত। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব এই তিন শাখাই প্রচুর সমৃদ্ধ এবং পরস্পর ভাব-বিনিময়ে গৌরবযুক্ত।

খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে পাঠান সুলতান হুসেন সাহ বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের দেব-চরিত্র বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের অপর শাখাগুলিকেও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে। এতৎ সত্ত্বেও এই দুই পুরুষসিংহ ও নরদেবতার নামে কোন বিশেষ সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিহ্নিত করা সমীচীন কি না তাহা বিবেচ্য। সময় বিশেষের রাজনৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক অবস্থার সহিত রাজশক্তির উৎসাহ অথবা দেবোপম মানব-চরিত্রের আদর্শের যোগাযোগ এবং একত্রিভূত ফল বাঙ্গালা সাহিত্যের অংশবিশেষে মূর্ত্ত হইয়াছে। কোন বিশেষকালের সাহিত্যবিশেষের উন্নতি ও বৈশিষ্ট্যের ইহা আংশিক কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্মজগতে রাজশক্তি অথবা দেবোপম চরিত্রের যত প্রভাবই থাকুক না কেন সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে উহা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ এবং অন্য কারণপরম্পরা-সাপেক্ষ।

সাহিত্যকে উপরিলিখিতভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে চিহ্নিত না করিয়া শ্রেণীহিসাবে বিভাগ করাই অধিক সঙ্গত। একই বিষয়বস্তু নিয়া বহু কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া সেই জাতীয় কাব্যসমূহ একযোগে আলোচনা করাই সুবিধাজনক।

এই ধর্ম্মানুগ সাহিত্য শেষ সময়ে রূপান্তরিত অবস্থায় জনসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে। ধর্ম্ম বা রাজানুগ্রহপুষ্ট কাব্যসাহিত্য প্রথমে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া ক্রমে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রীতি

আকর্ষণ করে এবং ইহার ফলে এই সাহিত্য ধীরে ধীরে বিভিন্ন আকারে কবি, যাত্রা ও কীর্ত্তন প্রভৃতি গানে পরিণত হয়।

যুগে যুগে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং সমাজের ভিতরে সাধারণ জনগণ কবিগান, যাত্রাগান, কীর্ত্তনগান প্রভৃতিতে প্রচুর আনন্দলাভ করিবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মধ্যযুগের সাহিত্যের এই শেষ পর্য্যায়ে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের যুগে বঙ্গবাসীর চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহাতে ধর্ম্মের আবরণ অনেক পরিমাণে ভেদ করিয়া ভারতচন্দ্রের আদিরসপূর্ণ কবিতার প্রতি (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে) সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে ময়মনসিংহ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত গীতিকার মধ্যে দেবতার প্রতি নিবেদিত প্রেমের অভাব অথচ সাধারণ নর-নারীর মধ্যে সদ্য-জাগ্রত মানবীয় প্রেমের উচ্চ ও নব আদর্শ খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে দেবতার প্রভাবমুক্ত সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে। তদানিন্তন বৃটিশ শাসকবৃন্দ এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকগণের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই নূতন আদর্শ প্রচারে সাহায্য করে এবং তাহার আংশিক ফলেও এই সাহিত্যের রূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্য যে সময় কতক পরিমাণে অবজ্ঞাত ছিল সেই বিগত শতাব্দীর দুর্দ্দিনে রমেশচন্দ্র দত্ত ও রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ মহোদয়গণ আংশিক-ভাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম রচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করেন। অবশেষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রথম রচনা করেন। সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অপরিচিত অংশ জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। পরবর্ত্তী কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে অনেক সময়োপযোগী মূল্যবান তথ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রন্থখানির কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বহু প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের রচনা দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই দিক দিয়া এবং সুষ্ঠু সাহিত্য সমালোচনায় গ্রন্থখানি তুলনা-রহিত। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে, আধুনিককালে আরও কতিপয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক বিশেষজ্ঞ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের

বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থের গৌরব ম্লান হওয়া দূরে থাকুক ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অব্যাহতই আছে। তথ্যসংগ্রহের জন্য এই গ্রন্থের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য্য। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার অমূল্যগ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এখন সেই অবস্থা নাই। প্রাচীন পুথি সংগ্রহ মানসে তিনি প্রচুর মনোবল দেখাইয়া ও দৈহিক কষ্ট সহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজার (বীরচন্দ্র মাণিক্য) ন্যায় অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তদুপরি পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে উৎসুক ছিলেন। এই বিষয়ে ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌ব্যতীত স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, হারাধন ভক্তনিধি, অক্রুরচন্দ্র সেন, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, জগদ্বন্ধু ভদ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, হরগোপাল দাস কুণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ ও সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ বহু খ্যাতনামা সুধীবৃন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য এবং উৎসাহ তিনি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অক্রুরচন্দ্র সেন, জগদ্বন্ধু ভদ্র, অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও হারাধন ভক্তনিধি তাঁহাকে অনেক সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি, দীনেশচন্দ্র সেন স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের গৌরবময় স্বপ্নে বিভোর থাকিতেন এবং ইহার উদ্ধার মানসে প্রকৃত সাধকের ন্যায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেইরূপ একনিষ্ঠ সাধকও এখন কোথায় পাওয়া যাইবে? সাহিত্যিক উপাদান-সংগ্রহে, রচনা-নৈপুণ্যে, সাহিত্য-সমালোচনাতে ও চরিত্র-বিশ্লেষণে দীনেশচন্দ্র সেন এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বীই রহিয়া গিয়াছেন।

তবে, একটি কথা মনে রাখা উচিত। যিনি যত ভাল গ্রন্থই রচনা করুন না কেন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ভুলভ্রান্তি অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিবেই। এইজন্য অনাবশ্যক চীৎকার করা শোভন নহে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার যৌবনে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের (বিশেষতঃ টেইনের ইতিহাসের) অনুকরণে তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রচনা করিয়া গিয়াছেন। মালমসলা ও বহুবিধ অমূল্য তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ থাকিলেও গ্রন্থখানির কয়েকটি বিশেষত্ব

লক্ষণীয়। তাঁহার সময়ের সমালোচকগণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ প্রভাবের আধিক্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভব করিতেন। দীনেশচন্দ্র সেন এই মতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সুতরাং বৌদ্ধ-দৃষ্টিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে গিয়া তিনি স্থানে স্থানে মাত্রা ছাড়াইয়া তো গিয়াছেনই এমনকি বাঙ্গলার এই যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে মোটামুটি একটি বৌদ্ধযুগ এবং একটি হিন্দুযুগের পরিকল্পনাও করিয়া গিয়াছেন। আদি-যুগ এবং মধ্যযুগের অর্দ্ধাংশ তাঁহার মতে বৌদ্ধভাবে পরিপূর্ণ। এই সম্বন্ধে যে মতান্তরের অবসর আছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার অত্যধিক ভাবপ্রবণতা এবং কবিত্বপূর্ণ মনোভাব স্থানে স্থানে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে তাঁহার সমালোচনা স্থানবিশেষে কিছু অতিরঞ্জন দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কবি এবং তৎরচিত গ্রন্থের কাল নির্দ্দেশে তিনি স্থানে স্থানে অসাবধানতার পরিচয়ও দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সংগৃহীত সীমাবদ্ধ তথ্যও ইহার আংশিক কারণ। তৎরচিত সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের পরিচয়ও রহিয়াছে। যাহা হউক এইজন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত দায়ী করিয়া লাভ নাই। তথাপি দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রধান পথপ্রদর্শকের গৌরব চিরদিনই লাভ করিবেন।

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি যে কোন ইতিহাস রচনা করিতে গেলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ এক কঠিন ব্যাপার। এই তথ্যগুলিদ্বারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনা করাও সহজ নহে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি বিশেষ রূপ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়-বস্তুর অন্তরালে থাকে। প্রত্যেক বিশিষ্ট লেখকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণের প্রত্যেকের রচনার মধ্যে মতামত ও আদর্শগত কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। সর্ব্বপ্রথম দেখা কর্ত্তব্য কোন এক বিশেষ কালের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল কথাটি কি। ইহা ধরিতে না পারিলে সাহিত্যের ইতিহাস প্রাণহীন হইবে। ইহা শুধু কতকগুলি সন-তারিখ ও ঘটনা বর্ণনায় পর্য্যবেসিত হইবে। নানারূপ তথ্য ও বিবরণ দ্বারা এক শ্রেণীর বা সময়ের সাহিত্য পরিবেষ্টিত থাকিলেও ইহার প্রাণ-শক্তির উৎসই মূল কথা। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল কথা বা মূল-সুরটি কি? আমাদের মনে হয় ইহা একটি শান্ত ও সমাহিত ধর্ম্ম-ভাব। প্রাচীনকালে এতদ্দেশীয় জ্ঞানী

ব্যক্তিগণ দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের বাহিরে একটি বৃহত্তর জগৎ ও উৎকৃষ্টতর জীবন কল্পনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহাদের মতে এই জগৎই সব বিষয়ের শেষ নহে। তাঁহাদের এই আদর্শের প্রভাব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সুস্পষ্ট। একরূপ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই দেশবাসীগণ সংসারের দুঃখকষ্ট ভগবানে সমর্পণ করিয়া সুখ অপেক্ষা শান্তিলাভই অধিক কাম্য মনে করিত। দেশে তত অন্নকষ্ট না থাকাতে তাহারা দার্শনিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অবসর পাইত। ইহার ফলে নানা দেব-দেবীর পূজায় মনোনিবেশ করিয়াও তৎকালের বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ যথেষ্ট সামাজিক ঐক্যবোধ এবং আনন্দলাভ করিত। এই দেব-পূজার সমারোহ ও স্তব-স্তুতির ভিতর দিয়া মধযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য আত্ম-প্রকাশ করে। ইহাদের জীবনধারায় জ্ঞান ও ভক্তি যত প্রভাব বিস্তার করে কর্ম্ম তত করে না। শাক্ততান্ত্রিক মত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মত জ্ঞানের পথের সন্ধান প্রথম দেয়। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব মত ভক্তির দিকে অধিক নির্ভর করে। কর্ম্মবিমুখতা এদেশবাসীর পক্ষে কতকটা জলবায়ুর গুণেও ঘটিয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে জীবন-যুদ্ধের ও কর্ম্ম-চঞ্চলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে জীবন-যাত্রায় স্বল্পে সন্তুষ্টির ও আধ্যাত্মিকতার তত পরিচয় পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশের জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক বিশেষ অবস্থা ইহার অন্যতম কারণ বলা চলে। সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে এদেশবাসীগণ সুন্দরকেই অধিক প্রার্থনা করিয়া থাকিবে। ইহার ফলে তাহারা নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়। আর পাশ্চাত্য জাতিগুলি জীবনের কঠোর সংগ্রাম মানিয়া লইয়া ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাহার ফলও শুভ হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতিগুলির পক্ষে পরলোক অপেক্ষা ইহলোকেরই মূল্য বেশী। এই দেশের বিশ্বাস ইহার ঠিক বিপরীত।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন রীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি রীতি হইতেছে দার্শনিক রীতি ও ঐতিহাসিক রীতি। এই দুইটি পথের মধ্যে ঐতিহাসিক রীতি বা পথ অবলম্বন সত্যনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত সমালোচনার পক্ষে অধিক নিরাপদ মনে হয়। কেহ কেহ আগে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তদনুযায়ী উপাদানসমূহ কাজে লাগাইয়া থাকেন। ইহা মোটেই নিরাপদ নহে। ঐতিহাসিক রীতিতে ইহা বর্জ্জনীয়। দীনেশচন্দ্র সেনের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ইতিহাস ভিন্ন অধুনা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক আরও

কয়েকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ার পরে পুনরায় আর একটি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন কেন হইল ইহা একটি প্রশ্ন বটে। উপরের মন্তব্যগুলি হইতে ইহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনে বর্ত্তমান ইতিহাসখানি রচনায় অগ্রসর হইয়াছি। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে কোন দেশের রাজনৈতিক অথবা সাহিত্যের ইতিহাস সেই দেশের ভূগোল ও জাতিতত্ত্বের সহিত বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত তদ্দেশবাসীগণের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সমাজ ও ধর্ম্মমতের সম্বন্ধ অল্প নহে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও সমাজ-জীবন অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দেয়। এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা সঙ্গত নহে। মোটামুটি মৎরচিত গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া গেল। গ্রন্থখানিতে আমার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য।

(১) প্রাচীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি। এইজন্য এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ অধ্যায় গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছি। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও বিষয়বস্তু এই উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি।

(২) বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর অনাবশ্যক জোর দেই নাই। বরং প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শৈব-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব দেখাইতেও চেষ্টা পাইয়াছি।

(৩) প্রাচীন সাহিত্যকে শ্রেণী (type) হিসাবে ভাগ করিয়া এক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর সাহিত্য একত্র গ্রথিত করিয়া আদ্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই সাহিত্যকে শতাব্দী হিসাবে একস্থানে বিভাগ করিয়া দেখাইলেও এই রীতি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থখানি লিখি নাই। মহাপ্রভুদ্বারা সাহিত্যকে তৎপূর্ব্ব, তৎসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী আখ্যা দিয়া তাঁহার ও নবদ্বীপের নামে চিহ্নিত করিবার প্রয়াস পাই নাই। গৌড়ের নামে অথবা হুসেন সাহ কিম্বা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে সাহিত্যিক যুগের নামকরণও সমর্থন করি নাই। এইরূপ করিবার কারণ গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি।

(৪) গ্রন্থখানি সরলভাবে রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস কিম্বা অহেতুক ভাবপ্রবণতা বর্জ্জন করিয়াছি। বিশেষ করিয়া, যথাসম্ভব

প্রত্যেক কবির জীবনী ও তৎসঙ্গে তাঁহার রচনার নমুনা দিয়া গিয়াছি। ইহাতে কবির রচনা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

(৫) ভাষা-তত্ত্ব, অক্ষর-তত্ত্ব, ছন্দ, অলঙ্কার ও সামাজিক ইতিহাস, নানা বংশলতা প্রভৃতি অল্পপরিমাণে উল্লেখ করিয়াছি। সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিষয়গুলির প্রয়োজন আছে কিন্তু এতৎসম্পর্কে অত্যধিক আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি, কারণ ইহা ভাষার ইতিহাস কিম্বা শুধু সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ নহে। ইহা কোন বিশেষ সময়ের সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির বিবরণসম্বলিত কবিগণ ও তাঁহাদের কাব্যসমূহ সম্বন্ধে একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস।

(৬) এই গ্রন্থরচনার উপাদান ও ইহার উদাহরণ সংগ্রহে প্রধানতঃ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থগুলির উপর অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং তজ্জন্য ঋণ স্বীকার করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অনেক মূল্যবান পুথি রহিয়াছে। এই পুথিগুলির সাহায্যও নিয়াছি। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) সাহিত্যিক ও বিষয়গত নানা জটিল প্রশ্নের নূতনভাবে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রত্যেকটি বিশেষ বিষয়ে প্রাচীন হইতে আধুনিককালের সর্ব্বশেষ সমালোচক পর্য্যন্ত সকলের মতামত যথাসম্ভব দিতে এবং কঠিন বিষয়সমূহের মীমাংসা করিতে যত্ন পাইয়াছি।

(৮) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবৈষ্ণব অংশ বিশদরূপে লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছি এবং বৈষ্ণব অংশে অনাবশ্যক ভক্তির উচ্ছ্বাস না করিয়া সাহিত্য সমালোচনার চেষ্টা করিয়াছি। নানা নূতন বিষয়ের, যথা—ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, তান্ত্রিকতা, শৈবধর্ম্ম প্রভৃতির সহিতও সাহিত্যের সংযোগ ও তৎসঙ্গে ইহাদের প্রভাব দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

(৯) গ্রন্থখানির মধ্যে অতি আধুনিক সংবাদ দিতেও চেষ্টা করিয়াছি এবং বিভিন্ন মত নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করিয়া আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্ববর্ত্তী সুধীগণের মত সর্ব্বদা অন্ধভাবে গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং স্থানবিশেষে আমার নূতন মত প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

ফলকথা গ্রন্থখানি ভুলভ্রান্তিশূন্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তবুও গ্রন্থ মধ্যে উহা কিছু থাকা সম্ভব এবং এইজন্য আমিই দায়ী।

(১০) এই গ্রন্থখানি রচনা উপলক্ষে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের প্রাচীন যুগের সাহিত্য দরিদ্র নহে বরং যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেকালের রচনার একঘেয়েমি দোষ আছে বলিয়া একটি অভিযোগ আছে। ইহা আংশিক সত্য হইলেও আমি নানারূপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে তৎকালে বহু বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ রচিত হইত। তৎকালীন কবিগণ ও গান রচনাকারীগণের বহুমুখী প্রতিভার চিহ্নস্বরূপ সহস্র সহস্র হস্তলিখিত পুথি রহিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ইহাদের একটি বৃহৎ ভাগ এখনও সুদূর পল্লী অঞ্চলে নগরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষুর অন্তরালে সংগোপনে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন নিদর্শন এই পুথিগুলির উদ্ধারকল্পে প্রচুর অর্থব্যয়, যথেষ্ট পরিশ্রম এবং বিরাট আয়োজন অত্যাবশ্যক। যাঁহারা মাতৃভূমিকে ভালবাসেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই পুথিগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এতৎসম্বন্ধে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য একক সমাধান করাও সম্ভব নহে এবং ভাবিয়া দেখিলে করিবেনই বা কাহারা ? সুতীব্র রবি-রশ্মিতে অন্ধপ্রায় চক্ষুর দ্বারা দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় সুদূর প্রাচীন যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন বটে। এতদুপযোগী রুচি ও অর্থই বা কোথায় ?

যুগে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে। আদিযুগে এই সাহিত্য একদিকে প্রধানতঃ গান ও ছড়ার আকারে শৈব ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের "চর্য্যাপদ" ও "দোহা"সমূহ এবং নাথপন্থী শৈব সন্ন্যাসীগণের "গোরক্ষবিজয়" ও "গোপীচন্দ্রের গানে"র মধ্য দিয়া বৈরাগ্য প্রচার করিয়াছে। অপরদিকে নানারূপ ছড়ার আকারে প্রচারিত "ডাক" ও "খনার বচনে"র মধ্য দিয়া গৃহস্থালীর উপযোগী মূল্যবান উপদেশসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোন বিশেষ দেব-দেবীর পূজা বা স্তুতি উপলক্ষে আদি যুগের এই ছড়া ও গানগুলি রচিত হয় নাই। খৃঃ ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত এই জাতীয় রচনাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিল।

খৃঃ ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে এই বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের পরস্পর বিরোধী আদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। যোগী শিব গৃহী হইলেন এবং শুধু শিবই নহেন এই সঙ্গে নানা দেব-দেবীর পূজা এবং দেবচরিত্র ও মানবচরিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের ছবি অঙ্কিত হইল। একদিকে এই জাতীয়

সাহিত্য যেমন বাস্তবধর্ম্মী হইয়া পড়িল অপরদিকে জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীগণের উপদেশাবলীর ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বৈদান্তিক ভক্তিবাদের বিকাশ হইতে লাগিল। বিদেশীর ও বিধর্ম্মীর আক্রমণে পর্য্যুদস্ত অসহায় বাঙ্গালী ক্রমশঃ দেব-পূজায় মনোনিবেশ করিয়া ভক্তি-আকুল চিত্তে যে স্তবস্তুতি করিতে লাগিল তাহাতেই মধ্যযুগের সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইল। মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়নগুলি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তান্ত্রিক জ্ঞানবাদ মাতৃকা-পূজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালার অধিবাসী মাতৃকাপূজক। তিব্বত ব্রহ্মী ও অষ্ট্রিক জাতিগুলিই ইহার প্রধান সহায়ক হইবার কথা। কালীপূজা, চণ্ডী-পূজা ও মনসা-পূজার প্রভৃতি শাক্ত পূজার মধ্য দিয়া জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয় মতের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইল। এই যুগের প্রথমদিকে ধর্ম্ম-চেষ্টাই মুখ্য এবং সাহিত্য গৌণ। যাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি মুখ্য এবং বিষয়বস্তুর অভাবে ধর্ম্মানুগ বিষয়বস্তুর প্রচলন সমর্থন করেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রারম্ভিক ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাদের অভিমত সমর্থন করে না। এই কথা নিশ্চিত যে সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায় থাকিলে কাহারও কখনও বিষয়বস্তুর অভাব হয় না।

এই যুগের প্রায় মধ্যভাগে (খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে) নবদ্বীপে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহার আবির্ভাবের ফলে নববলে বলিয়ান বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ এক নূতন দার্শনিক মত প্রচারে মনোযোগী হয়। বাঙ্গালার নবপ্রচারিত বৈষ্ণব মতানুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নারীর নূতন স্থান লাভ ঘটে। বৈরাগ্যের নীতির মধ্য দিয়া "পরকিয়া" মতের নারী-ঘটিত ব্যাপারও প্রচারিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ জাতীর চরিত্র পৌরষহীন হইয়া পড়ে। যে তান্ত্রিকতা শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ প্রচারের যুগেও জাতীয় চরিত্র বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল তাহারও ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিক শৈবধর্ম্ম, তান্ত্রিক শাক্তধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে থাকে। পুরুষের এবং নারীর বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়চিত্ততা সম্পর্কে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে অন্য ধর্ম্মগুলি ইহার যত অবনতি ঘটাইয়াছিল বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্ভবতঃ তদপেক্ষা বেশী অবনতি ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শে সমাজ সংস্কারও ইহার জন্য কিয়দংশ দায়ী। তবে বাঙ্গালীর যুদ্ধবিমুখতার এবং রাজা লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের জন্য বাঙ্গালার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে অন্যতম প্রধান কারণ ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের সময় পুরুষের "নারীভাব" বিষয়টি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আনিয়া

ফেলিয়াছিল। তবে সূক্ষ্মভাব ও রসবোধের দিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই অবস্থায় বৈষ্ণব-বিরোধী রক্ষণশীল স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে পূর্ণোদ্যমে পৌরাণিক আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই সময়ের বহু পূর্ব্বে শূর ও সেনরাজবংশের আধিপত্যকালে কোলাঞ্চ (কান্যকুব্জ?) হইতে পঞ্চকায়স্থসহ পঞ্চব্রাহ্মণ যেদিন বাঙ্গালাতে প্রথম পদার্পণ করেন সেই দিনটি বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়। এই ব্রাহ্মণগণ তিন বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

(ক) তাঁহারা এই সমাজে পৌরাণিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সমস্ত স্থানীয় ধর্ম্মগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ উহাদের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। অবশ্য ঐক্যপ্রদর্শন, আপোষ ও কৌশল দ্বারা তাঁহারা এই কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রথমে রাজশক্তিরও সাহায্য পাইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের নূতন শাস্ত্র ও আদর্শ গড়িতে হইয়াছিল।

(খ) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালার দেশীভাষাগুলির ভিতর এক নূতন প্রেরণা জোগাইল এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইল।

(গ) সেনরাজগণ প্রবর্ত্তিত কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ ও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণবংশীয়গণের প্রতি অগাধ ভক্তিপ্রচারে নবগঠিত শাস্ত্র মুখর হইয়া উঠিল এবং ইহার ফলে জাতীয় ঐক্য সংসাধিত হইলেও জাতির প্রাণ-শক্তির অযথা অপচয় ঘটিল। এই ব্রাহ্মণগণের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দুর্নীতি "অষ্ট্রিক-পামিরীয়া-মঙ্গোলীয়" জাতিত্রয়ের সংযোগে প্রধানতঃ উৎপন্ন বাঙ্গালী জাতির তেজবীর্য্য, সমুদ্রযাত্রা, বৈদেশিক সম্বন্ধ ও অনেক সদ্‌গুণ আর্য্য আগমনে এবং প্রভাবে এইরূপে ক্রমে লোপ পাইতে বসিল।

ব্রাহ্মণগণের উক্ত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা সাহিত্যের নানাদিকে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা তাঁহারা "ভাষাতে" রচনার প্রথমে পক্ষপাতী ছিলেন না, পরে অবস্থাগতিকে হইলেন। যাহা হউক, সংস্কৃতের অনবদ্য সাহিত্যসম্পদ বাঙ্গালা ভাষা ও ভাবের শ্রীবৃদ্ধি করিল এবং পৌরাণিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা নূতন গ্রন্থ লিখিত হইতে লাগিল। শুধু, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত নহে—এই প্রচেষ্টার ফলে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং গদ্য রচনাও ক্রমশঃ সাহিত্যের আসরে স্থান গ্রহণ করে। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্য এই পৌরাণিক আদর্শের কাছেই অধিক ঋণী। যে জনসাহিত্য, লোকসাহিত্য বা গণসাহিত্য এবং ইহার

অন্তর্গত নানাবিধ পাঁচালী, যাত্রা ও কবিগান প্রভৃতি জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত তাহারও ইহাতে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিল। মাতৃনামে ভাব-বিভোর শাক্ত সম্প্রদায়ের গানসমূহ এই "সংস্কার যুগে" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনবদ্য পদগানগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-শিবায়নাদি অবৈষ্ণব সাহিত্য মহাকাব্যধর্ম্মী এবং বৈষ্ণব পদসাহিত্য গীতিধর্ম্মী ইহা বলিলে বোধ হয় আপত্তির কোন কারণ নাই। অন্ততঃ মঙ্গলকাব্যে ঘটনার আড়ম্বর, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চরিত্র সৃষ্টি সবই মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুগামী রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক অথবা মহাপ্রভু বিষয়ক পদগানগুলি সবই যে গীতিধর্ম্মী তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুবাদ সাহিত্যের বৈষ্ণব অংশ ভাগবতে শুধু মহাকাব্যের স্পর্শ রহিয়াছে।

অবৈষ্ণব সাহিত্যের চরিত্রগুলি আদিতে বৌদ্ধও নহে, পৌরাণিক হিন্দুও নহে। ইহারা নানা জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বাঙ্গালী জাতির মূল বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম এই চরিত্রগুলির মূলগত ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। ইহাদের প্রকাশভঙ্গী বদলাইয়াছে মাত্র। মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের বেহুলা-চরিত্র উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত করা উপলক্ষে বেহুলা বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সতী নারীর পক্ষে মৃত স্বামীকে পুনরায় বাঁচাইবার ঘটনায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ জয়লাভ করিয়াছে। নানা পরীক্ষায় উত্তির্ণা হইয়া বেহুলা যে পাতিব্রত্যের জয় ঘোষণা করিল তাহার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সার্থকতা লাভ করিল। ব্রাহ্মণগণ সতী নারীর কর্ত্তব্য চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন এবং পাতিব্রত্যের কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নারীগণকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইহার অপরদিকও আছে। মরা বাঁচান ও বেহুলার পরীক্ষা দান তান্ত্রিকতাগন্ধী ও তিব্বত-ব্রহ্মী সমাজের রীতি-নীতির পরিচায়ক। ইহা ছাড়া স্বামী-হারা বেহুলার প্রথম যৌবনে মৃত স্বামীসহ একা নির্ভয়ে জলপথে সুদীর্ঘকালের জন্য অনিশ্চিতের আশায় যাত্রা, নানারূপ অদ্ভুত কার্য্যসাধন এবং নৃত্যগীত দ্বারা দেবসমাজকে সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা, নানারূপ প্রলোভন জয় ও চরিত্রের দৃঢ়তা মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজের দিকে ইঙ্গিত করে। আর্য্য সমাজে এরূপ আদর্শ দুর্লভ। "সাবিত্রী-সত্যবান" কাহিনীর সাবিত্রী-চরিত্র বেহুলা-চরিত্রের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ফলে পট-পরিবর্ত্তন হইল। খৃঃ ১৬শ শতাব্দী (মধ্যযুগ) হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির

মধ্যে পুরুষের পৌরষের একান্ত অভাব দেখা যায়। ইহারা তখন জ্যোতিষ-দৈবজ্ঞ ও শাস্ত্র-বচন বিশ্বাসী। এই সময় হইতে নারীও মৃদুতায় মধুর এবং একান্তই পুরুষের উপর নির্ভরশীলা। মনসা-মঙ্গলের বেহুলা ও ধর্ম্ম-মঙ্গলের লখা-কানেড়ার যুগ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থগুলি রহিয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে এই নারী চরিত্রগুলিও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে কবিগণ আদি চরিত্রগুলি কতক পরিমাণে রূপান্তরিত করিয়া পুরুষাকারের উদাহরণের স্থলে ইহাদিগকে অদৃষ্টবাদীরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জাতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে ধর্ম্ম অপেক্ষা জাতির প্রভাব বেশী, অন্তত: ধর্ম্মের প্রভাব পরবর্ত্তী। বর্ণিত চরিত্রগুলির কতকাংশ বৌদ্ধগন্ধী বলিয়া সক্রিয় এবং পৌরাণিক হিন্দু আদর্শে কতক চরিত্র নিষ্ক্রিয় (যথা, রামায়ণের সীতা) ইহা আংশিক সত্য হইতে পারে, সবটা সত্য নহে। নারী হিসাবে নারীর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও জাতিগত প্রকৃতি ধর্ম্মের প্রভাব অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তথাপি পৌরাণিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী চরিত্রের ক্রমে যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে।

ভৌগোলিক ও জাতিগত পরিবেশের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য দেশের কোন্ অংশে কাহাদের মধ্যে প্রথম জন্মলাভ করে তাহা এই গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সহিত বাঙ্গালার উত্তর প্রান্তের হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং পামিরীয় জাতির সম্বন্ধ সম্ভবত: খুব অধিক। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে "বঙ্গ" ও "রাঢ়" প্রদেশের কথা স্বত:ই মনে হয়। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কতক অংশ মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ। চণ্ডী ও মনসার নামে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রথম অথবা প্রধান কবিগণের প্রায় সকলেরই জন্মভূমি "বঙ্গ" অথবা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশ। যে জাতির মধ্যে ইহাদের উদ্ভব তাহারা বাঙ্গালার অষ্ট্রিক-মঙ্গোলীয় মিশ্রজাতি। এই সাহিত্য ক্রমে পশ্চিম-বঙ্গে বিশেষত: রাঢ়দেশে ছড়াইয়া পড়ে ও ক্রমে উন্নতি লাভ করে। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি কাণা হরিদত্ত এবং নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান কবিগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। চণ্ডী-মঙ্গলের প্রথম কবিদ্বয় মাণিক দত্ত ও জনার্দ্দনের নিবাস সঠিক জানা যায় না, তবে উহা হয়

"বঙ্গ" নতুবা উত্তর-বঙ্গ (বরেন্দ্র)। রামায়ণের কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাস ছাড়া অনন্ত, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। মহাভারতের কবিগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী প্রমুখ কবিগণ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে "ধর্ম্ম-মঙ্গল" শ্রেণীর কাব্যের পশ্চিম-বঙ্গে ও গৌড়ে উৎপত্তি এবং অংশতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রচারিত এবং ইহার কবিগণও এই অঞ্চলদ্বয়ের অধিবাসী। ভাগবতের অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-সাহিত্য। অবৈষ্ণব-সাহিত্য পূর্ব্ব-বঙ্গের সাহায্যে এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। পদাবলীর চণ্ডীদাস ও ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু উভয়ই পশ্চিম-বঙ্গবাসী। যদিও বৈষ্ণব-সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গকেই অধিক আশ্রয় করিয়াছিল তবুও একথা বলা চলে যে মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পূর্ব্ব-বঙ্গের ভক্তই নবদ্বীপে এই ধর্ম্মের প্রচার করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির সাহায্য করেন। অপরপক্ষে দ্রাবিড়ীদের প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে খুব বেশী।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আদিযুগে বৌদ্ধ পালরাজগণের সহানুভূতি লাভ করে। মধ্যযুগে এই সাহিত্য হিন্দু সেনরাজগণের সাহায্য পাইয়া গড়িয়া উঠে। গৌড়রাজগণের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের রাজ্যান্তর্গত রাঢ়দেশে এই সাহিত্যের প্রচুর চর্চ্চা হইতে থাকে। বাঙ্গালাদেশে আর্য্যসভ্যতা সর্ব্বপ্রথম গঙ্গা নদীর দুই তীর আশ্রয় করিয়া পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হয়। আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পরবর্ত্তীকালে রাজনৈতিক কারণে উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে রাঢ়দেশে অনেক পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। তখন উত্তর-রাঢ়দেশ আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়। গৌড়ে অবস্থিত রাজশক্তি রাঢ়ের সন্নিকটে বিরাজ করিতেছিল। গঙ্গার প্রধান খাত অনুসরণ করিয়া এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বঙ্গভেদ না করিয়া গৌড়ের রাজশক্তি প্রথমে হুগলী বা ভাগীরথী নদীর দুই তীর দিয়া এবং নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া আর্য্যসভ্যতা প্রচারের চেষ্টা করে। তমোলুকের সামুদ্রিক বন্দর এবং সাগর-সঙ্গম তীর্থস্থান ভাগীরথীর মাহাত্ম্য প্রচারে ও আর্য্যসভ্যতা বিস্তারে সেনরাজগণকে উৎসাহিত করে। ইহার ফলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এই অঞ্চলে এত সমৃদ্ধ হইয়া উঠে যে এক এক সময় মনে হয় বুঝি এই সাহিত্যের জন্মই এইখানে। সম্ভবতঃ তাহা ঠিক নহে।. যাহা হউক, 'বঙ্গদেশ' ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রাচীনবাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান পীঠস্থান এবং রাঢ়দেশ পূর্ব্ব-বঙ্গের উদ্ভাবিত এই সাহিত্যের সমর্থক ও সমৃদ্ধিসাধক বলা যাইতে পারে। এই যুগের

বাঙ্গালা সাহিত্য পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতা অঞ্চল হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কালের কুটিল গতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের আরও কত পরিবর্ত্তন হইবে কে বলিতে পারে!

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আমার বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ইহাতে নানারূপ ত্রুটি ও মতানৈক্য থাকাও নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেরূপ চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছি তাহারই রূপটি অকপটে পাঠকবর্গ ও জিজ্ঞাসুর গোচর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার সিদ্ধান্তে কোনরূপ ভুল থাকিলে অবশ্য আমিই দায়ী। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থখানি মুদ্রণকালে আমার প্রুফ সংশোধনের অপটুতার ফলে ও অনবধানতাবশতঃ কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও আমারদিকের দায়িত্ব দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি। যাহাহউক বোধগম্য সাধারণ বর্ণাশুদ্ধি ভিন্ন বিশেষ বিশেষ ভুলগুলি গ্রন্থপাঠের সুবিধার জন্য একটি ভ্রমসংশোধনের তালিকায় নিবদ্ধ করিলাম। আশা করি এই সমস্ত ভুলত্রুটি সত্বেও বিষয়বস্তুর গুরুত্ববোধে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এই গ্রন্থমধ্যে যে সাতখানি চিত্র সংযুক্ত হইল, তাহা সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত। এই চিত্রগুলি আমার গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়াতে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মৎপ্রণীত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ইতিহাসখানি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ ও মুদ্রিত করাতে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলারসহ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে অনারেবল জষ্টিস শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্.এ, এল্-এল্.বি., ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্.এ. এল্-এল্. বি., ডি.লিট., এল্-এল্.ডি., ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল, এম্.পি., শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্.এ., (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার) এবং ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ., এল্-এল্.বি, পি-এইচ.ডি. (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) মহোদয়গণের নিকটও আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতেছি। এই পরম শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্যেই এই গ্রন্থমুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে। এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ. (কঃ বিঃ এ্যাসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার) মহাশয়কেও আমার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

পরিশেষে গ্রন্থখানি সুচারুরূপে মুদ্রণের জন্য শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্ম্মীবৃন্দকে এবং বিশেষ ভাবে এই প্রেসের পক্ষে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বি.এ. ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়কে এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীবারীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ.কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, } **শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত**

চিত্র-বিবরণী

শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি

বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভালরূপে জানিতে হইবে, কারণ সাহিত্যের ভিতরে জাতীয় জীবনের অনেক কথা লিপিবদ্ধ থাকে। এই হিসাবে প্রত্যেক সাহিত্য প্রত্যেক জাতির অমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে। সাহিত্য শুধু রসবোধের দিক দিয়া অর্থাৎ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া পাঠ করিলে সম্পূর্ণ লাভবান হওয়া যায় না। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, ধর্ম্মগত ও জাতিগত এমন অনেক মূল্যবান তথ্য সাহিত্যের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে যাহা অন্যত্র পাওয়া কঠিন এবং জাতীয় উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। এইদিক দিয়া আধুনিক সাহিত্য অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের মূল্য অধিক।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য নানারূপ বিষয়সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সাহিত্যের দিকে এখন বাঙ্গালী জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে কি না সন্দেহ। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যেরই রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন সাহিত্য ভালরূপে জানিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয় ভিত্তি করিয়া ইহা আমাদের পাঠ করা উচিত নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল।

বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন সময়ের আয়তন ও ভৌগোলিক সংস্থানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিপুষ্টির সহিত এই বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। শুধু বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশ নহে, এই উপলক্ষে বৃহত্তর বাঙ্গালার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। বৃহত্তর বাঙ্গালার ভিতরে আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর ও

উড়িষ্যা প্রদেশকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ধরা যাইতে পারে। সঙ্কীর্ণ অর্থে, শুধু বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্থান সহ বাঙ্গালার আশেপাশের কতিপয় জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

উল্লিখিত "বৃহত্তর বঙ্গদেশ"কে এক কথায় "প্রাচ্যদেশ" বলা যাইতে পারে। এই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে নানাজাতি আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অষ্ট্রিক জাতি, পামিরীয়ান (আল্পাইন) জাতি, মঙ্গোলীয় জাতি, দ্রাবিড় জাতি ও আর্য্য জাতি। মূলতঃ বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে অষ্ট্রিক জাতি, উত্তর হইতে পামিরীয়ান ও মোঙ্গল জাতিদ্বয়, পশ্চিম হইতে আর্য্য জাতি ও দক্ষিণ হইতে দ্রাবিড় জাতি এই দেশে প্রবেশ করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে এখন বাঙ্গালী জাতি বলিতে যে জাতিকে বুঝি তাহার মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ অল্প হয় নাই।

এই জাতিগুলি একদেশে বাসের ফলে ক্রমে বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হইতে কত রাজনৈতিক ও সামাজিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ইহার সঠিক ও সুসম্বদ্ধ ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে উল্লিখিত জাতিগুলির উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে এই জাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং প্রসারও অল্প সাহায্য করে নাই। বহুশাখাসমন্বিত এই জাতিসমূহ অনেক ধর্ম্মমত ও নানা দেবদেবী পূজার প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছে। কালক্রমে বৃহত্তর ধর্ম্মের দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া এই সব লৌকিক দেব-দেবীগণকে স্ব স্ব অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। এইরূপে নানাজাতির ধর্ম্মমূলক সংস্কৃতির ফলে আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে শিবঠাকুর, সূর্য্য বিষ্ণু, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি প্রথমে কোন্ কোন্ জাতির দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন? প্রাচীন ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, ছড়া ও গানের মধ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণের সম্বন্ধে কত কথাই না লুক্কায়িত রহিয়াছে। শিবায়ন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবসাহিত্য প্রভৃতির মধ্যেও বাঙ্গালীর সামাজিক গঠন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ বিশেষ কারণ-পরম্পরায় এই দেশের জনগণের মধ্যে সংস্কৃতি ও সামাজিক সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সাহিত্যে তাহার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিলে অনেক নূতন সংবাদ জানা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা ও দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

এতদিন বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া আসিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে তাঁহারা সম্যক্ দৃষ্টিপাত করিলে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই অঞ্চলের আসাম প্রদেশে প্রাচীন কত রাজত্বের ভগ্নাবশেষ, কত মঠ, মন্দির ও গুহাদিসমন্বিত নগরের ভগ্নস্তূপ, বিস্মৃত অথবা অর্দ্ধবিস্মৃত নানা জাতির কীর্ত্তি বহন করিয়া বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্ব্বতের কুক্ষিগত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্যের অনেক জটিল সমস্যা ও প্রশ্নের সুমীমাংসা এই উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালী জাতিকে ভালরূপে চিনিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষাকে ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতিকে গড়িয়া তুলিতে বাঙ্গালা ভাষা অল্প সাহায্য করে নাই। বাঙ্গালায় আগন্তুক নানা প্রাচীন জাতির নানা ভাষা, জাতিগুলির একদেশে বসবাস এবং ভাবের আদানপ্রদান হেতু কতকাংশে মিশিয়া গিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু সংস্কৃত (প্রাচীন ও নবীন), পালী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার আলোচনা করিলেই চলিবে না। এই উপলক্ষে অষ্ট্রিক জাতির (যথা মুণ্ডারি ও তজ্জাতীয়) ভাষা, মঙ্গোলীয় জাতির (বিশেষতঃ তিব্বত-ব্রহ্মী) ভাষা ও দ্রাবিড় জাতির (তন্মধ্যে তেলেগু, তামিল, মালয়ালম ও কানাড়ি) ভাষাও আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এই ভাষাগুলি ছাড়া আরও কতিপয় ভাষা মূল্যের দিকে অল্প হইলেও আলোচনার পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে উল্লিখিত সকল ভাষার সহিতই অল্প-বিস্তর পরিচয় রাখা সঙ্গত।

এই দেশের চারুকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্যের ভিতরেও অনুসন্ধান করিলে অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। ভাবসমৃদ্ধ ও নানা তথ্যপূর্ণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য এবং এই সাহিত্যের ভিত্তি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিতে হইবে তাহার সামান্য উল্লেখ এই স্থানে করা গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য[১]

ভারতবর্ষ মহাদেশের লক্ষণযুক্ত একটি বিরাট দেশ। এই দেশে প্রায় চল্লিশকোটি লোকের বাস। এই বিশাল দেশের এবং বিশেষ করিয়া ইহার উত্তর-পূর্ব্বভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক জটিল প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। ইহাদের মধ্যে জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগোলিক কতিপয় প্রশ্নই অবশ্য প্রধান।

ভারতের অধিবাসিগণ এক জাতীয় নহে নানাজাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে ককেশীয় জাতির তিন শাখা যথা—"বৈদিক আর্য্যগণ" উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে, "দ্রাবিড়"গণ সর্ব্ব-দক্ষিণ ভারতে এবং "প্রাচ্য"গণ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় নামক অপর জাতিত্রয়ের বিভিন্ন শাখা স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছে। এই জাতিসমূহের মধ্যে নেগ্রিটো জাতির অতি অল্প নিদর্শন এই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ককেশীয় জাতির শাখাগুলির মধ্যে "বৈদিক আর্য্যগণ" "উত্তরদেশীয়" (Nordic), "দ্রাবিড়গণ" "সামুদ্রিক" (Proto-Mediterranean) এবং "প্রাচ্যগণ" "পাহাড়ী" (Alpine) শাখার অন্তর্গত হওয়া বিচিত্র নহে।

ভৌগোলিক বিশেষত্বের দিক দিয়া ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—হিমালয় প্রদেশ (উত্তরাখণ্ড), উত্তরভারতের সমতলভূমি (আর্য্যাবর্ত্ত), দাক্ষিণাত্য (উত্তর-দক্ষিণাপথ) ও সর্ব্বদক্ষিণ-ভারত (দক্ষিণ-দক্ষিণাপথ) বা দ্রাবিড় দেশ। সংস্কৃতির দিক দিয়া উত্তর ভারতের সমতলভূমি আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা পঞ্চসিন্ধুদেশ বা উত্তরাপথ (পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত) মধ্যদেশ বা মধ্য আর্য্যাবর্ত্ত এবং প্রাচ্য (পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত)। মতান্তরে পঞ্চসিন্ধুদেশকে মধ্য আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত করা চলিতে পারে। এই হিসাবে এই অংশটিকেও পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত বলা যায়।

---

(১) সংক্ষিপ্ত এই লেখাটি পূর্ব্বে "শ্রীহট্ট সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা"তে, কার্ত্তিক ও মাঘ সংখ্যায় (১৩৫০ বাং) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রচনাটি আমার "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" নামক গ্রন্থেও অংশতঃ গৃহীত হইয়াছে।

বাঙ্গালীগণের স্বদেশ বাঙ্গালাদেশ "প্রাচ্য" (গ্রীক Prasii) ভূখণ্ডের অন্তর্গত। বাঙ্গালীজাতি প্রাচ্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য জাতি। ভারতের আর্য্যজাতিসমূহের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত আদর্শ বেদ হইলেও প্রাচ্যের বাঙ্গালী আর্য্য প্রভৃতি জাতির আদর্শ অনেক পরিমাণে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষিবৃন্দ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালার কতিপয় সুসন্তান আমাদের দৃষ্টি এইদিকে নিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট আছেন।

প্রাচ্য বা পূর্ব্বভারত বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, ভক্তিশাস্ত্র, নব্য-ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি প্রচার করিয়া ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দিকে ভারতের চিন্তাধারার এক নূতন রূপ দান করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারেও পূর্ব্ব-ভারতের দান অল্প নহে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রাচীন মগধরাজ্য ও ইহার রাজধানী পাটলিপুত্র যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। মহাভারতের যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত দিল্লী মহানগরী (প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ) যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল, একসময়ে রাজগৃহের রাজশক্তির উত্তরাধিকারী পাটলিপুত্র মহানগরী তদ্রূপ সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিথিলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দানও অল্প নহে। প্রাচীন নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহারদ্বয়ও বৌদ্ধযুগে এই দুইটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগে এই প্রাচ্যেরই অন্তর্গত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্মরাজ্যের গৌরবময় উল্লেখ রহিয়াছে। বিহারের অন্তর্গত মগধ, বৈশালী, চম্পা ও মিথিলারাজ্য ভিন্ন, উত্তরবঙ্গে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যদ্বয়, মধ্য-বঙ্গে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে বঙ্গরাজ্য, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও ত্রিপুরারাজ্য, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কামরূপরাজ্য, আসামের সুরমা উপত্যকায় কাছাড়রাজ্য এবং প্রাচ্যের পূর্ব্বসীমান্তে মণিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্ব-ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল।[১] প্রাচ্যের নিকটবর্ত্তী নেপাল ও আরাকান রাজ্যদ্বয়ের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

(১) পাল, শূর, সেন, নাথ, খড়্গ, চন্দ্র, দেব, বর্ম্মণ, মাণিক্য ও নারায়ণ প্রভৃতি রাজবংশ মূল বাঙ্গালাদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া এই দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে।

এই প্রাচ্যভূমির সীমানির্দ্দেশ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে শোণ নদ, মহাকাল পর্ব্বত ও বেনগঙ্গা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে পাতকোই, মণিপুর ও লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী অথবা একেবারে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদী। এই বিস্তৃত ভূভাগ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও নানাজাতির বাসভূমি।

প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বাঙ্গালা প্রদেশ আয়তনে ও লোকসংখ্যায় প্রাচ্যের অপরাপর অংশ হইতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ হিসাবে প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজ-শাসিত বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার প্রদেশের অনেকখানি অঞ্চলের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। এই বিষয়ে আসাম প্রদেশের অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালা প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহিত খুবই বেশী বলা যাইতে পারে; এমতাবস্থায় বাঙ্গালা ও আসামকে একত্র করিয়া ইহার সহিত ছোটনাগপুর বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ সংযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষাভাষী অধিবাসীদিগের যে প্রদেশটি কল্পনা করা যায় তাহাই প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ। এই প্রদেশটির সহিত ইংরেজ-শাসিত পূর্ব্বতন প্রদেশের ও বর্ত্তমানে সামরিক শাসিত বিভাগের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই অঞ্চল খনিজ ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ এবং একটি বৃহৎ অংশ নদীমাতৃক। এই বর্দ্ধিতায়তন প্রদেশের প্রধান ভাষা বাঙ্গালা হইলেও আর্য্যেতর অনেক ভাষাও এই অঞ্চলে কথিত হয়। এই ভাষাসমূহের অধিকাংশই আদিম জাতিগুলির ভাষা। ছোটনাগপুর ও আসাম প্রদেশের আদিমজাতিদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার অধিবাসীদিগের কথা বৃহত্তর বাঙ্গালা সংগঠন উপলক্ষে বিবেচনা করিতে হয়। সুরমা উপত্যকার অধিকাংশ অধিবাসী, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসিগণ তো বরাবরই বাঙ্গালী আছেন। একমাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের ভাষা বাঙ্গালা বা তাহার প্রকারভেদ হইলেও এবং বাঙ্গালীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও একশ্রেণীর অধিবাসী স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের বিরোধী। এই বৃহত্তর বঙ্গ বা "মহাবঙ্গের" অধিবাসিগণ বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া এক মহাজাতি-গঠনে সহায়তা করিলেই এই দেশের মঙ্গল।

আমরা এইস্থানে বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে কতিপয় সমস্যার উল্লেখ করিতেছি।

(১) বাঙ্গালীজাতি গোড়াতে কি ককেশীয় জাতির তিনশাখার কোন একটি শাখা হইতেও আসিয়াছে ? তাহা ঠিক হইলে ইহারা অর্থাৎ "প্রাচ্য" নামধেয় বাঙ্গালীগণ কি অনেকাংশে Alpine শাখাভুক্ত পামিরীয় না দ্রাবিড় এবং ইহারাই কি "ব্রাত্য" ? খুব সম্ভব ইহারা Alpine শাখারই অন্তর্গত পামিরীয় (Pamirians)। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত সভ্যতার আংশিক অধিকারী কি ইহারাই না অপর কোন জাতি ? প্রাচীন তুরানীয় জাতির শাখা বলিয়া পরিচিত দ্রাবিড়গণ কি Proto-Mediterranean ককেশীয় জাতি ? তিব্বত-ব্রহ্মী নামক মঙ্গোলীয়গণের যে যে শাখা বাঙ্গালা ও আসামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহাদের "আর্ট" ও সংস্কৃতির এখন কি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরই বা কাহারা ? অষ্ট্রিক (Austric) জাতির মুণ্ডারি ও অন্যান্য শাখার বংশধরগণের বাঙ্গালায় সংস্কৃতিগত কি দান অবশিষ্ট রহিয়াছে ? বর্ত্তমানে বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জাতিকে অষ্ট্রিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ? এই সব বিভিন্ন জাতি কিরূপে, কোথা হইতে এবং কোন্ কোন্ সময়ে পূর্ব্ব ভারতে প্রথম আগমন করিয়াছিল ? সর্ব্বশেষে বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য্যগণের উত্তরাধিকারিগণ বাঙ্গালাদেশকে যে সংস্কৃতিগত দান দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহার পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে কি ? অদ্যাপি ইহারা বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের প্রধান ও বিশিষ্ট অংশ হইলেও এই দেশে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে কি ? এই প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশে সময়ের দিক দিয়া নেগ্রিটোগণ ছাড়া প্রথমে Austric জাতি, তৎপরে বিভিন্ন সময়ে Alpine জাতি, Tibeto-Burman জাতি ও দ্রাবিড় জাতির (Proto-Mediterranean) বিভিন্ন শাখা এবং সর্ব্বশেষে বৈদিক আর্য্যজাতি (Nordic) আগমন করিয়াছিল কি ? এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে রক্তের সংমিশ্রণ অনুমিত হয় তাহারই বা স্বরূপ কি ? বাঙ্গালীজাতির প্রধান ভাগ কি অষ্ট্রো-আলপাইন না মঙ্গলো-দ্রাবিড় ? বৈদিক আর্য্যসভ্যতা বাঙ্গালীর অধিবাসিগণকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া ইহাদিগকে যেরূপে সমাজ ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে নূতন রূপ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল তাহার কতটা ধারাবাহিক ইতিহাস এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে ?

(২) বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতি বলিতে সম্ভবতঃ বাঙ্গালার উল্লিখিত প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে Austro-Alpine রক্তের সংমিশ্রণ সম্পন্ন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত আদানপ্রদানের ফলে উদ্ভূত, বঙ্গভাষাভাষী অথচ বিভিন্নধর্ম্মী

অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালার এই সংমিশ্রিত অষ্ট্রো-আল্লাইন জাতি অথবা আংশিক অবিমিশ্র প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির জীবনযাত্রার ধারা এবং তাহাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে এইদিকে আমাদের বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এবং এই উপলক্ষে গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণপ্রণালী, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা প্রভৃতি কলাবিদ্যা, যন্ত্রশিল্প, কুটিরশিল্প, নৌশিল্প, বস্ত্রশিল্প ও সীবনশিল্প প্রভৃতি শিল্প, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, বিভিন্ন জাতিবিভাগ ও উপজীবিকা, চিকিৎসা, অস্ত্রবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা, সংস্কৃতি, স্ত্রী-পুরুষের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা ও অধিকার, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মপ্রচার, দার্শনিক মতবাদ, সমুদ্রযাত্রা, শৌর্য্যবীর্য্য, রাজনৈতিক চেতনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালী-জাতির একটী সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

(৩) বাঙ্গালীজাতি অতি প্রাচীনকালে বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে বহির্ভারতের অনেক সুদূর দেশে গমনাগমন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছিল। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দো-চীন, মালয় ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাহার অস্পষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির উপনিবেশস্থাপনের বহু লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এইসব দেশে, বিশেষতঃ ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম (চম্পা) ও মালয় প্রভৃতি দেশে এবং সুমাত্রা, যাভা, বলি ও লম্বক প্রভৃতি দ্বীপে অনুসন্ধান করিলে অদ্যাপি পাওয়া যাইতে পারে। French Indo-China এবং Dutch East-Indiesএর গভর্ণমেণ্টদ্বয়ের অধুনালুপ্তপ্রায় মিউজিয়মগুলিতে ইহার অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই মিউজিয়মগুলিতে এবং উল্লিখিত দেশসমূহের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিয়া সঠিক তথ্য বাহির করা একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় জাতি ও পূর্ব্ব-ভারতের প্রাচ্য জাতি (প্রাচীন বাঙ্গালী-জাতি) এই উভয় জাতির দানই এই অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই উপলক্ষে দ্রাবিড় জাতি ও প্রাচ্য জাতির দানের তুলনামূলক সমালোচনা করাও চলিতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের যে সব নিদর্শন এইসব দেশে রহিয়াছে তাহারও একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়। এইসব অঞ্চলে পালি ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তাহাও দেখা উচিত। বাঙ্গালাদেশে ও তাহার প্রতিবেশী

পূর্ব্বদিকের এইসব দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবের তুলনামূলক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৪) বাঙ্গালীজাতির বিস্মৃতপ্রায় শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনেক নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যাইতে পারে। এইদিক দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য্য মনে হয়। অবশ্য ইহার একটা সাহিত্যিক মূল্যও আছে। আমরা এখন তাহা লইয়া বিচার করিতেছি না। উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলক্ষে এই সাহিত্যের কতিপয় বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিতেছি।

(ক) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দীতে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মাগধী অপভ্রংশ হইতে আগত ও ত্রিপুরার "রাজমালা" বর্ণিত "সুভাষা", আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা অবশ্য ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তুলট কাগজে রক্ষিত ও হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথি-পত্রের যে পরিচয় এখন পাওয়া যায় তাহা ইহার কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যেসব মূল্যবান্ তথ্য এইসব পুথিতে লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহার মধ্যে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মের চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া নানা লৌকিক ধর্ম্মের ছাপও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। এই লৌকিক ধর্ম্মগুলি কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। লৌকিক ধর্ম্মগুলির কোনটি অষ্ট্রিক জাতি, কোনটি পামিরীয়ান জাতি, কোনটি তিব্বত-ব্রহ্মী জাতি আবার কোনটি বা আর্য্যজাতি হইতে আসিয়াছে। অবশ্য ঠিক কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ জাতি হইতে ইহারা প্রথমে আসিয়াছে সে সম্বন্ধে অনুমান করা ছাড়া আর পথ নাই। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রিকজাতীয় অধিবাসিগণের কোন কোন শাখা সুদূর অতীতকালে সভ্য ও উন্নত থাকাও অসম্ভব নহে। প্রাচীন "নাগ" জাতি কি ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না ইহারা দ্রাবিড়? খুব সম্ভব ইহারা অষ্ট্রিক শাখারই অন্তর্গত। তাহারা তো সভ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। ভারতের নানা অংশে সর্প-পূজার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী ও ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা রাজশক্তির সাহায্যে কতটা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে বৌদ্ধ

ও হিন্দুধর্ম্ম যে অন্তত: সাময়িকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে রাজশক্তির সাহায্যলাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয়ের অভাব নাই।

(খ) বৈদিক আর্য্যগণ এইদেশে বসতিস্থাপনের অনেক পরে উত্তর-বঙ্গে (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগে) পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। পালরাজবংশের অভ্যুদয়ের কিছু পরে প্রথমে শূরবংশ ও তৎপরে সেনরাজবংশ বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মও সেনরাজবংশের প্রচেষ্টায় যথোচিত প্রসারলাভ করিয়াছিল। মুসলমান অধিকারের সময়ও সুদীর্ঘকাল বৈদিক ও পৌরাণিক মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজে ইহার আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এইস্থানে বলা আবশ্যক—তখন তান্ত্রিক আদর্শও ক্রমশঃ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়া উভয় ধর্ম্মমতকেই নূতন রূপ দান করিয়াছিল। বৈদিক ও তাহার উত্তরাধিকারী পৌরাণিক মতের সহিত তান্ত্রিক মতের অপূর্ব্ব সমন্বয় এই বাঙ্গালাদেশেই সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এতদ্দেশীয় তান্ত্রিক মতের প্রবেশলাভও বৌদ্ধধর্ম্মজগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। কামরূপ, গৌড় ও নবদ্বীপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পৌরাণিক ধর্ম্মমত ও আদর্শের প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তান্ত্রিক ধর্ম্মের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপ এখন আর জানিবার উপায় নাই। তবে ইহার আদর্শ ও পূজাপদ্ধতি যে বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে, হিন্দু (পৌরাণিক) শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রচুর রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। লৌকিক ধর্ম্মগুলির মধ্যে—হিন্দুমতের শৈব ও শাক্তধর্ম্ম তান্ত্রিক ও পৌরাণিক প্রভাবে পড়িয়া বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, এবং এই দুইটি লৌকিক ধর্ম্মের প্রাথমিক পুষ্টির স্থান নির্ব্বাচন করিতে গেলে গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-রাঢ় দেশকেই সেই সম্মান দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সঙ্গত। সংগুপ্ত বুদ্ধ (?) অথবা বৌদ্ধগন্ধী লৌকিক ধর্ম্মঠাকুরের পূজা একমাত্র রাঢ়দেশে ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। ইহারও কারণানুসন্ধান প্রয়োজন। আর একটি কথার উল্লেখ এইস্থানে করিতেছি। লৌকিক স্ত্রীদেবতাগুলি মূলত: আর্য্যেতর বা অনার্য্য অষ্ট্রিক ও তিব্বত-ব্রহ্মী জাতিগুলি হইতে আসিয়াছে কি না তাহা বিশেষ করিয়া দেখা দরকার। ইহা ছাড়া বাঙ্গালায় ককেশীয়জাতিগুলির মধ্যে প্রাচ্য পামিরীয় জাতি হইতে শিবদেবতা, সমুদ্রপ্রিয় দ্রাবিড়জাতি হইতে বিষ্ণুদেবতা এবং বৈদিক আর্য্য-

জাতি হইতে সূর্য্যদেবতা প্রথম আসিয়াছেন কি না তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ।

বাঙ্গালা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে মানবজাতির ভারতবর্ষীয় শাখাগুলির অন্তর্গত সমস্ত জাতিই বসবাস করিয়া বাঙ্গালার ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিতরে যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় আনিয়া দিয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিলে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বৈষ্ণবসাহিত্য এবং কুলজীগ্রন্থনিচয়ে তাহার অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই সাহিত্যগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যসমূহে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস অনেক পরিমাণে নিবদ্ধ আছে। গৌড়রাজ্যকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিক কাব্যের মধ্যে আদি মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য ও ধর্ম্মঠাকুরের পূজা গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত রাঢ়ের বাহিরে পাওয়া কঠিন। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী এবং মনসামঙ্গলের দেবী মনসা হয়তো বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে যথাক্রমে প্রথমে এদেশে আসিয়া থাকিবেন। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল সাহিত্য পাঠ করিলে উত্তর-বঙ্গ, হিমালয় প্রদেশ ও কামরূপ অঞ্চলের সহিতই যেন এই দুই দেবীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। গৌড়রাজ্যকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে এই দুই মঙ্গলকাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিলেও পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব-বঙ্গে ও দক্ষিণ-বঙ্গে শাক্ত সাহিত্যের অংশ হিসাবে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ শাক্তসাহিত্যের দিকে এবং পশ্চিম-বঙ্গ বৈষ্ণবসাহিত্যের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায় কি? রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্য প্রথমে পশ্চিম-বঙ্গ ও কালক্রমে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে সমভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার রাজ্যগুলির এবং বিশেষ করিয়া গৌড়রাজ্যের উল্লেখ অপরিহার্য্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারের সহিত এই রাজ্যগুলির বিশেষ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং এই রাজ্যগুলির নাম ও ইহাদের ভৌগোলিক সংস্থান জানা একান্ত আবশ্যক। এই রাজ্যসমূহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যুদয় ও উৎসাহের ফলে বাঙ্গালার সংস্কৃতির ও বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর পাল ও সেনরাজবংশ এবং পরবর্ত্তী মুসলমান নরপতিগণ রাজনীতি ও বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রচুর যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় মহানগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কীর্ত্তিকলাপ লুক্কায়িত আছে। মোটামুটি এই জেলা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের কিয়দংশ লইয়া প্রাচীন গৌড়রাজ্য প্রথমে গঠিত হইয়াছিল। কালক্রমে "গৌড়দেশ" কথাটির নানা অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। কোন সময়ে বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের দক্ষিণাংশকে গৌড়রাজ্য বলিত। আবার কোন সময়ে পশ্চিম-বঙ্গ অর্থে "গৌড়" শব্দ ব্যবহৃত হইত।

ইহার কারণ বোধ হয় যে রাঢ়দেশ ইহার অন্তর্গত ছিল এবং "বঙ্গদেশ" (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ) ইহার শাসনের বাহিরে ছিল, অন্ততঃ স্বতন্ত্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে (১৬শ শতক) আছে, "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ।" এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশকেই "গৌড় দেশ" বলিত। "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রমুখ বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান "বাঙ্গালী" অর্থে বৈষ্ণবসাহিত্যে "গৌড়িয়া" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। খৃঃ৮ম শতাব্দীতে (খৃঃ ৭৩৯ অব্দে) পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল "গৌড়ে" (টলেমির "গঙ্গারিজিয়া") প্রথম স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মূল রাজধানী ছিল বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত ওদন্তিপুরে। যে কোন বাঙ্গালার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উত্তর-বঙ্গের প্রায় পশ্চিমসীমায় বিহার প্রদেশের সন্নিকটে ও ওদন্তিপুরের অনতিদূরে গোপাল তাঁহার গৌড় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে স্থানে গৌড় অবস্থিত উহা উত্তর-বঙ্গের "বরিন্দ" নামক উচ্চভূমির অন্তর্গত। গঙ্গার উত্তর তীরস্থ এইস্থান সুরক্ষিত বিবেচনায় এবং বাঙ্গালার অধিক অভ্যন্তরে প্রবেশের বাধা হেতু হয়তো এইস্থানে গৌড় মহানগরী প্রথমে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। আমাদের ইহা অনুমান মাত্র। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে "পঞ্চগৌড়" বলিয়া একটি কথার প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশগুলি সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল। বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান অনেক নৃপতি "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন। এইরূপ "পঞ্চদ্রাবিড়" বলিয়াও একটি কথা আছে।

এই গৌড়রাজ্য হইতে একটি প্রাচীনতর রাজ্য গৌড়ের পূর্ব্বদিকে সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যটির নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বৈদিকযুগের "আরণ্যক" সাহিত্যে ও পরবর্ত্তী কালে মহাভারতে এবং পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতীয় যুগে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মহানগরী কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত "মহাস্থানগড়" নামক স্থানকে অনেকে এই নগরীর শেষচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় করতোয়া নদী এবং উত্তরে তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদ। তিস্তা নদ বারংবার গতিপরিবর্ত্তনের জন্য কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উত্তরে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা কুচবিহার রাজ্য। এই দুই রাজ্যের পূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল।

(ঘ) তিস্তার ন্যায় ব্রহ্মপুত্র নদের অন্তত: একবার গতিপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। আসাম হইতে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিয়া এই নদের পুরাতন খাত ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার নূতন জলপ্রবাহ "যমুনা" নদী নামে ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের সীমানির্দ্দেশ করিতেছে। কোন সময়ে এই পুরাতন খাতের দক্ষিণ তীর পূর্ব্ব-বঙ্গের উত্তর সীমা বলিয়া এবং ইহার উত্তর তীর হিমালয় পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত প্রসারিত কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপে করতোয়া নদ কোন সময়ে উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্বসীমা এবং কামরূপ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিত। তিস্তানদের জলধারা এক সময়ে করতোয়া (প্রাচীন নাম "সদানীরা") নদে পতিত হইত। প্রাচীন পূর্ব্ব-বঙ্গের দক্ষিণ সীমা পদ্মানদী। পদ্মানদীর দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও তৎসহ সমতট, নিম্ন-বঙ্গ বা দক্ষিণ-বঙ্গ অবস্থিত ছিল।

গঙ্গার প্রাচীন এক ধারা পূর্ব্বদিকের পথে করতোয়া নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ধারা আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান ঢাকা মহানগরীর নিম্নস্থ নদী প্রাচীন "বুড়িগঙ্গা" নামে ও নিকটস্থ ধলেশ্বরী নদী নামে ক্রমশ: পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধারা "ভাগীরথী" বা "হুগলী" নদী নামে পূর্ব্বে বাগড়ি ও পশ্চিমে রাঢ়দেশের সীমানির্দ্দেশ করিয়া কলিকাতা মহানগরীর নিম্ন দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। সেনরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যকে চারিটি ভাগ করিয়া প্রদেশগুলির নাম "রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগ্ড়ি ও বঙ্গ" এই নাম দিয়াছিলেন। প্রথমে নিম্ন বা দক্ষিণ-বঙ্গ ও পরে পূর্ব্ব-বঙ্গ লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত হইয়াছিল। ইহাই সুপ্রাচীন "বঙ্গ"দেশ এবং বর্ত্তমান সমস্ত প্রদেশের বাঙ্গালা বা বঙ্গ নামটি এই "বঙ্গ"দেশ হইতে আসিয়াছে।

গঙ্গার উত্তর তীরে বরেন্দ্র ভূমি (বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গ বা রাজসাহী বিভাগ)।

এই অঞ্চলে সেনরাজগণের (১০ম—১২শ শতাব্দী) অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে রাজ্যসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় সুবিখ্যাত। এই রাজ্যদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যদ্বয় হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত কামরূপ (কাঁউর) এবং কোচবিহার। ইহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। বরেন্দ্র ও এইসঙ্গে সমগ্র উত্তর-বঙ্গের উত্তরদিকে প্রাকৃতিক সীমা হিমালয় পর্ব্বত, ইহার পশ্চিম দিকের প্রাকৃতিক সীমা মহানন্দা নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও মহানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলাকেও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে কুশী নদীই বৃহত্তর বরেন্দ্রের পশ্চিমসীমা।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তরাংশে অবস্থিত "কানসোণা" গ্রামকে কেহ কেহ প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রাচীন "সুহ্ম" ও "কর্ণসুবর্ণ" প্রদেশদ্বয় লইয়া এরূপ মতভেদ আছে যে ইহাতে অবাক হইতে হয়। কেহ কেহ "সুহ্ম"কে রাঢ়দেশ বলিয়া এবং কেহ কেহ চট্টগ্রাম বিভাগে ধার্য্য করেন। "কর্ণসুবর্ণ" কেহ কেহ মুর্শিদাবাদ জেলায়, কেহ কেহ বর্দ্ধমান জেলায় এবং কেহ কেহ ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক আমরা উভয় দেশকে আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গে বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্ত্তমানে অবস্থিত নবদ্বীপ মহানগরী কোন সময়ে সেনরাজগণের রাজধানীর গৌরব লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের স্থাননির্দ্দেশ লইয়াও গোলযোগ আছে। কেহ কেহ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে, কেহ কেহ পশ্চিম তীরে এবং কেহ কেহ ভাগীরথীর ঠিক মধ্যভাগে এই মহানগরীর প্রাচীন স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য বিষয়টি বহু বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে।

বাগ্‌ড়ি অঞ্চল সুন্দরবনের অরণ্য সমাবৃত থাকিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের সতত পরিবর্ত্তনশীল নদ-নদীসমূহের গতিপথে অবস্থানহেতু বসবাসের পক্ষে বিশেষ অনুকূলস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ এইজন্য এই অঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত ইছামতী ও মাতলা নদী দুইটির পূর্ব্ব-তীর বঙ্গ বা পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক এবং পশ্চিম তীর রাঢ়দেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক ক্রমে উপনিবিষ্ট হইয়া অনেকটা সামাজিকভাবে এই উভয় অংশের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এই উভয় নদীর দুই তীরই শাসনতান্ত্রিক হিসাবে পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত ছিল। নিম্ন-বঙ্গের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া প্রাচীন "বঙ্গ"-বা "সমতট" দেশ প্রথমে গঠিত হইয়া থাকিবে। মতভেদে চট্টগ্রামের উপকূলভাগ হইলেও

আমাদের মতে এই সমতট ভূভাগের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় পদ্মানদী এবং তাহার উত্তর-পূর্ব্ব তীর হইতে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পুরাতন খাত পর্য্যন্ত মূল পূর্ব্ব-বঙ্গ। এই পূর্ব্ব-বঙ্গ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আরও উত্তর দিকে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে মেঘনা নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্ট (অধুনা আংশিক আসাম প্রদেশের মধ্যে) ও কুমিল্লা জেলা এবং ত্রিপুরারাজ্য এমন কি ক্রমশঃ প্রাচীন উপবঙ্গের অন্তর্গত নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহকেও কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে।

বাঙ্গালা প্রদেশের লোকজনের বসবাস, রীতি-প্রকৃতি ও নানারাজ্য সংস্থাপনের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় আর্য্যাবর্ত্তোদ্ভব বিভিন্ন জনস্রোত গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া কেবলই যেন পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতেছে। ইহার ফলে পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে কতকগুলি স্থান যথা—পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোটালিপাড়া, ফুল্লশ্রী ও বিক্রমপুর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। আবার যদি পূর্ব্বদিকের কথা বিবেচনা করি, তবে দেখিতে পাইব কতিপয় জনস্রোত পূর্ব্বদিক হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম-দিকে ছুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় জাতির অনেক বংশধর আছে। উত্তর-বঙ্গের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের বিভিন্ন মঙ্গোলীয় জাতি এই অঞ্চলের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তর-বঙ্গে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরের মঙ্গোলীয়গণ হিমালয় প্রদেশে, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষতঃ সানদেশে), মণিপুর রাজ্যে ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতিস্থাপন করিয়াছে। এই শেষোক্ত স্থানের অধিবাসিগণ "আহোম" নামে পরিচিত। দক্ষিণ হইতে আরাকানের মগগণ নিম্ন ও পূর্ব্ববঙ্গে এবং আসামে প্রথমে লুটপাট করিয়া পরে এই অঞ্চলে অনেকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের পথ বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরে উপকূল দিয়া দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং ক্রমে "বাঙ্গালী"নামে পরিচিত হইয়াছে। এই পথে বাঙ্গালীগণও দক্ষিণদিকে গিয়াছে।

"প্রাচ্যের" অন্তর্গত বৃহত্তর বাঙ্গলা ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে এই স্থানে সামান্য যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল তাহা প্রদেশটির বৈশিষ্ট্য এবং ইহার অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে মূলগত ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখাইবার [illegible] না হইলেও বিষয়টির গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। এদেশবাসিগণ ইহা উপলব্ধি করিলেই আশার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

তান্ত্রিকতা এবং প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে সমগ্র মানবজাতির প্রধান শাখাগুলি আগমন করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। ভারতের "প্রাচ্য" অংশে ইহাদের নিদর্শন অদ্যাপি বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরই কতিপয়ের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়া থাকেন। ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো নামক মানব জাতির চারিশাখারই অস্তিত্ব পূর্ব্ব-ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নেগ্রিটো জাতীয় মানবের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে প্রায় লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালাদেশ প্রাচ্য-ভারতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ, সুতরাং বাঙ্গালী জাতির রক্তে নানা মানব জাতির সংমিশ্রণ ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

ভারতের প্রথম অধিবাসী নেগ্রিটো জাতীয় বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ইহাদের পর অষ্ট্রিকদিগের নাম করা যাইতে পারে। ইহারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দিক হইতে "প্রাচ্য" বা পূর্ব্ব-ভারতের পথে এদেশে প্রথম আগমন করিয়াছিল। তাহার পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ককেশীয়েরা প্রবেশ করিল। ইহাদের যে শাখা ভারতে প্রথম (?) আগমন করিয়াছিল তাহারা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। ভাষাবিদ্‌গণের নিকট ইহারা তুরাণীয় বলিয়া উল্লিখিত হয়। অপরপক্ষে সামুদ্রিক (Proto-Mediterranean), পাহাড়ী (Alpine) ও উত্তরদেশীয় (Nordic)—ককেশীয়গণের এই তিন শাখার মধ্যে দ্রাবিড়গণ "সামুদ্রিক" শাখার অন্তর্গত, ইহাও কথিত হয়। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে বা পরে "পাহাড়ী" শাখার অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত পামিরীয়গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে এই দেশে প্রবেশ করে। ইহাদের পর এই দ্বারপথে "উত্তরদেশীয়" বলিয়া অনুমিত বৈদিক আর্য্যগণ ভারতে আগমন করে। বোধ হয় ইহাদেরই প্রায় সমকালে অথবা কিছু আগে মঙ্গোলীয় জাতির কোন কোন শাখা (বিশেষতঃ তিব্বত-ব্রহ্মী শাখা) উত্তর-পূর্ব্বদিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া বসতি স্থাপন করে। খৃঃ পূঃ ৪০০০ [illegible] হাজার বৎসরের মধ্যে উল্লিখিত জাতিগুলি ভারতবর্ষে, তথা বাঙ্গালাদেশে, দলে দলে

আগমন করিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে।

উল্লিখিত মতানুসারে অষ্ট্রিকগণ দ্রাবিড়গণের নিকট পরাজিত হয়। আবার দ্রাবিড়গণ উত্তর-ভারতে প্রথমে পামিরীয় ও পরে বৈদিক আর্য্যগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পামিরীয়গণ ক্রমে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিলে এই দেশের অষ্ট্রিকজাতীয় অধিবাসীগণের সহিত তাহাদের তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ইহার ফলে অষ্ট্রিকগণ পামিরীয়গণের নিকট পরাজিত হয়। পামিরীয়গণ শুধু যে অষ্ট্রিকগণকেই পরাজিত করিয়াছিল তাহা নহে। তাহারা পূর্ব্বভারতে মঙ্গোলীয়গণকেও পরাভূত করিয়াছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালার উত্তরাঞ্চল ও কামরূপ অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও আল্পাইন বা পাহাড়ী জাতীয় পামিরীয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। এই সমস্ত যুদ্ধ ও সন্ধি, বিরোধ ও মিলনের ভিতর দিয়া সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির মধ্যে ক্রমে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে এবং একটি মিশ্র ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। বাঙ্গালায় সকলের শেষে আগত বৈদিক আর্য্যগণের দানও এই উপলক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারাই নানাজাতি সমুদ্ভূত বাঙ্গালী জাতি ও নানাজাতি অধ্যুষিত বাঙ্গালাদেশের মধ্য পৌরাণিক আদর্শ প্রচার করিয়া জাতীয় ঐক্য স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

বাঙ্গালী রক্তের প্রধানভাগ খুব সম্ভব অষ্ট্রিক (সম্ভবতঃ প্রাচীন নাগজাতি) ও আল্পাইন (পামিরীয়) জাতিদ্বয়ের দ্বারা গঠিত। অনেক নৃতত্ত্ববিদ এইরূপই অনুমান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ প্রধানতঃ মঙ্গোলো-দ্রাবিড় (Mongolo-Dravidian) এইরূপ আর একটি মত প্রচলিত আছে। তবে আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতিকে মূলতঃ অষ্ট্রো-আল্পাইন (Austro-Alpine) বলিবারই অধিক পক্ষপাতী, কারণ ভাষা, প্রাচীন কিম্বদন্তি, ঐতিহ্য এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়া এই শেষোক্ত মতটিই অধিক সমর্থন লাভ করে। অবশ্য বাঙ্গালীর রক্তে কিয়ৎপরিমাণে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয় রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

অষ্ট্রিক ও আল্পাইন জাতিদ্বয়ের ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বাঙ্গালী জাতির অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রকৃত রূপ, প্রকৃতি ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে বিস্মৃত যুগের এক অধ্যায় স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যাইত। কার্য্যটি কঠিন হইলেও বোধ হয় অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির দিকে অষ্ট্রিক ও আল্পাইন জাতিদ্বয়ের মধ্যে কোন্ জাতির দানের স্বরূপ কি প্রকার এবং তাহার মূল্যই বা কতখানি তাহারও তুলনামূলক বিচার আবশ্যক। অথচ এই সম্বন্ধে আলোচনার উপযুক্ত উপাদানেরও একান্ত অভাব।

আধুনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধর্ম্মের দিক দিয়া তান্ত্রিক প্রণালী নামক একটি প্রণালীর বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে আল্পাইন গোষ্ঠীভুক্ত পামিরীয়ানগণের (Pamirians) বহুবিধ দানের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠদান এই তান্ত্রিকতা কি না তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই তান্ত্রিকতা ও প্রসঙ্গতঃ পামিরীয়ান জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়া কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এই আলোচনার ভিতরে আমার যে কল্পনা ও অনুমান মিশ্রিত আছে তাহার জন্য অবশ্য আমিই দায়ী।

বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত তান্ত্রিকতার কোন মূলগত সম্বন্ধ দেখা যায় না। ইহা ছাড়া পশুবলি এবং নরবলিও তান্ত্রিকতার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। তান্ত্রিকতা মূলে নিম্নস্তরের নানারূপ মন্ত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের পক্ষপাতী হইলেও ক্রমে ইহা জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। উচ্চ অঙ্গের তান্ত্রিক মত মন্ত্রতন্ত্রপূর্ণ এক প্রকার রহস্যবাদ (mysticism) ও ভাবজগতের আবহাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরুর সাহায্যে দীক্ষিত হইয়া কতকগুলি রহস্য বা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার চর্চ্চা এই মতের অপরিহার্য্য অঙ্গ। জড়জগত ও মানবদেহের বিশেষ ব্যাখ্যার উপর এই মত যে গুরুত্ব অর্পণ করে তাহা বিস্ময়কর। ইহার ভগবৎতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বেদ ও পুরাণের মত হইতে কতকটা বিভিন্ন। তন্ত্রের প্রচারিত, মন্ত্রের প্রভাব এবং সাধন-ভজনের বিশেষ প্রণালীও লক্ষনীয়। বহু প্রচলিত "তন্ত্র-মন্ত্র" কথাটিতেও তন্ত্র ও মন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। তান্ত্রিকতা প্রথমে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ক্রমে ইহার আদর্শ উন্নত হইলে এই মত চিকিৎসা শাস্ত্র রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এদেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তান্ত্রিকতার নিম্নস্তরে তুক্‌তাক্, ডাকিনীবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। মানুষকে মেষে পরিণত করা (অবশ্য যদি সম্ভব হয়) অথবা পঞ্চমকারের অপকৃষ্ট অনুশীলন প্রভৃতি তান্ত্রিকতার ভ্রষ্টাচার বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া রক্তপাতের সাহায্যে পূজা প্রচলনের ভিতর আত্মদানের মহান উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা পরবর্ত্তীকালে যোজিত হইলেও প্রথমে ইহা তান্ত্রিক মতের অন্তর্গত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার

যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত শুধু রক্তপাত কেন, কালক্রমে ইহার সহিত যৌনব্যাপারের এক বিশেষ আদর্শ যুক্ত হইয়া তৎসংক্রান্ত বীভৎস ক্রিয়াকলাপ ইহাকে সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছিল। বলাবাহুল্য তান্ত্রিকতার ভিতরে কালক্রমে উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইলেও ইহার বহুল প্রচারের সময় নানা অবান্তর বিষয় ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়া ইহার অবনতির কারণ হইয়াছিল।

অনুমান হয় অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তান্ত্রিক মত বিভিন্ন আকারে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে মিশর হইতে ভারতবর্ষ পর্যান্ত নানা দেশের নানাজাতি প্রকারভেদে তান্ত্রিকতারই অনুশীলন করিত। ইহার বহিরঙ্গের ভিতরে ক্রমে রক্তপাত ও যৌনব্যাপার প্রবেশলাভ করাতে তান্ত্রিক আচরণ বীভৎস ও ভীতিজনক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি এক শ্রেণীর ভ্রষ্টচরিত্র মানবকে বেশী আকর্ষণ করিত কি না কে বলিবে?

এখন, ভারতবর্ষে তান্ত্রিকমতের প্রসার বিচার করিতে গেলে প্রথমেই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়। এই মতের প্রধান দেবতা এই দেশে কে এবং তিনি মূলে কোন জাতির দেবতা? আমরা এই দেশে যে আকারে তান্ত্রিক মত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রধান দেবতা যে শিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই শিব দেবতাকে কোন জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে আনিয়াছে তাহা অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই। ককেশীয় জাতির আল্পাইন শাখাভুক্ত প্রাচীন পামিরীয়গণকে এই গৌরব দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ দেওয়া কঠিন।

কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত পামিরের পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীগণ সুপ্রাচীনকালে লিঙ্গপূজক বা শিশ্নপূজক ছিল কি না তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। বৈদিক সাহিত্যে শিশ্নপূজকগণ সম্বন্ধে প্রচুর নিন্দাবাদ রহিয়াছে। শিশ্ন দেবতা হিসাবে শিবকে গ্রহণ করিলে তিনি এই পামিরীয়গণেরই প্রাচীন দেবতা হওয়া বিচিত্র নহে। অবশ্য যদি তাহারা লিঙ্গপূজক বলিয়া গণ্য হয় তবেই তাহা সম্ভব। পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব সীমান্তে, পার্ব্বত্য অঞ্চলে, "শিবি" বা "শৈব" নামে একটি জাতির (tribe) উল্লেখ কোন কোন বিশেষজ্ঞ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিতস্তা নদীর তীরেও এককালে শিবিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল (অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন)। ইহা ছাড়া পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত "শিবালিক" পর্ব্বতশ্রেণী এবং

বেলুচিস্থানের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত শিবি উপত্যকা "শিব" নামের সহিত জড়িত আছে। পামির প্রদেশের সহিত এই সব অঞ্চলের সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। পামিরের পূর্ব্বে এবং অতি সন্নিকটে অবস্থিত কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত শিবদেবতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কাহারও অজানা নাই। এমতাবস্থায় শিশ্নদেবতা শিবের সহিত পামির ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যাঞ্চলের পামিরীয় নামক জাতির সম্বন্ধ স্থাপন খুব স্বাভাবিক মনে হয়। বৈদিক আর্য্যগণের সহিত পামিরীয়জাতির সংঘর্ষের এক অধ্যায় দক্ষ-যজ্ঞের কাহিনীতে সূচিত হইতেছে কি না কে বলিবে? এই শিশ্নদেবতা শিব কালক্রমে বৈদিক শিব বা রুদ্র দেবতার সহিত অভিন্ন কল্পিত হইয়াছেন এবং পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালায় প্রাচীনকাল হইতে এই শিবদেবতার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য প্রবিষ্ট হওয়াতে এই দেবতা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা "শিবায়নে"র কৃষি-দেবতা শিব এবং মঙ্গলকাব্যের শিবকে এই উপলক্ষে আমাদের মনে পড়ে।

পুং ও স্ত্রীচিহ্নের দিক দিয়া শিশ্নপূজকগণের দুইটি উপবিভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। উভয় চিহ্নের প্রতীককেই ইহারা পূজা করিলেও ইহাদের একটি মুখ্য ও অপরটি গৌণ হিসাবে গণ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। উভয় চিহ্নই সৃষ্টিকার্য্যে প্রয়োজন, সুতরাং শিশ্নপূজক মাত্রেই যুগ্ম-চিহ্নের উপাসক হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। শিবলিঙ্গপূজার "গৌরীপট্ট" ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল।

যদি পামিরীয়গণ শিশ্নপূজক হইয়া থাকে তবে ইহাদের দেবতা শিব এবং তিনি পুংশিশ্নদেবতা। এই দেবতার সহিত সংযুক্ত স্ত্রীদেবতা বা শক্তি—দুর্গা, উমা বা গৌরী নামে পরিচিতা এবং গৌণদেবতা। স্ত্রীচিহ্নের দিকে শক্তি বা মাতৃকাদেবীকে মুখ্য করিয়া যে সব শিশ্নপূজক পূজা করিত মঙ্গোলীয় (তিব্বত-ব্রহ্মী) জাতিগুলির মধ্যে তাহাদের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ইহার কারণ পূর্ব্ব-ভারতে স্ত্রীদেবতার উপাসক তিব্বত-ব্রহ্মী জাতির মধ্যে এখনও পাওয়া যায় এবং ঋষি বশিষ্টের মহাচীন হইতে "তারা" মন্ত্র আনয়নের কাহিনী এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। অবশ্য মাতৃকাপূজা মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যেই শুধু নিবদ্ধ নাই। উদাহরণ স্বরূপ মুণ্ডারি ও অন্যান্য গোষ্ঠির অষ্ট্রিক জাতিসমূহের নামও করা যাইতে পারে। তান্ত্রিকতার ন্যায় শিশ্নপূজাও কোন সময়ে পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সমাজ হিসাবে বোধ হয় অনেক মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) জাতিই শক্তিপূজা

উপলক্ষে স্ত্রীশিশ্নপূজক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মঙ্গোলীয় জাতির তিব্বত-ব্রহ্মী শাখাও ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, নানা কারণে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তান্ত্রিক হইলেই শিশ্নপূজক হয় না, আবার শিশ্নপূজক হইলেই তান্ত্রিক হয় না। তবে কতকগুলি শিশ্ন-পূজক জাতি নিশ্চয়ই তান্ত্রিক ছিল এবং সেই জন্যই আমরা শিশ্ন-পূজক তথা শিবলিঙ্গোপাসকগণের মধ্যে তন্ত্রের মতবাদ প্রচারের ইতিহাস পাইতেছি। শিবদেবতা এদেশের তন্ত্রের প্রধান দেবতা, অথচ তিনি আবার শিশ্নদেবতা এবং সম্ভবতঃ পামিরীয় জাতিও শিবোপাসক। শিবদেবতার সহিত পাহাড়-পর্ব্বতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে এই দেবতার আল্লাইন বা পাহাড়ী গোষ্ঠীভুক্ত পামির নামক পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের দেবতা হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পামিরীয়ান দেবতা শিবের সহিত যে শক্তিদেবী সংযুক্ত আছেন তাঁহার মধ্যে প্রচুর মঙ্গোলীয় প্রভাব পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত ও কৈলাস পর্ব্বতের সহিত যে সমস্ত কিম্বদন্তি এই দুই দেবতাকে লইয়া রচিত হইয়াছে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা এই মতেরই সমর্থন করে। এই দেশে লিঙ্গপূজকগণের মধ্যে হস্তপদসমন্বিত সম্পূর্ণ দেবমূর্ত্তির পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে কত সময় লাগিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে উহা বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী হওয়াই সম্ভব, কারণ এই সময়েই তান্ত্রিক, বৌদ্ধ ও বৈদিক নানা দেবতা পুরাণের সাহায্যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে এই দেশে মূর্ত্তিপূজার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

পুংশিশ্নপূজকগণের মধ্যে সকলেরই যে প্রধান দেবতা "শিব" ছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই এবং পামিরীয়ানগণই যে একমাত্র শিশ্নপূজকজাতি তাহাও নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শিশ্ন-পূজা তান্ত্রিকমতের ন্যায় পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন মিশরে শিব-দুর্গার স্থলে অসিরিস (Osiris) ও আইসিস (Isis) নামক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সেমিটিক, গ্রীক ও ল্যাটিন জাতিগুলি বিভিন্ন নামে হয়ত একই দেব-দেবীর পূজা করিত। অন্ততঃ শিব-দুর্গার সহিত এই সব দেব-দেবীর যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে শিব-দুর্গা, উমা-মহেশ্বর বা হর-গৌরীর পূজোপলক্ষে তান্ত্রিকতা ও পুং-স্ত্রী উভয় শিশ্নের পূজার মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

প্রথমে এই দেশে পামিরীয়ানগণ-প্রচলিত পুংশিশ্নদেবতা শিবঠাকুর যথেষ্ট সমাদর লাভ করিলেও পরবর্ত্তীকালে (বোধ হয় মঙ্গোলিয় প্রভাব বশতঃ) পূর্ব্ব-ভারতে বা প্রাচ্যে তথা বঙ্গদেশে শিব অপেক্ষা শক্তিই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মূর্ত্তিপূজার ভিতর দিয়া ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। শিশ্নপূজকগণ পুং-স্ত্রী উভয়দেবতার পূজা করিলেও দেখা যায়, পুংদেবতার প্রতি পামিরীয়ানগণের যতটা আকর্ষণ ছিল স্ত্রীদেবতার প্রতি আবার মঙ্গোলীয়গণের ততটা আকর্ষণ ছিল। পামিরীয়ানগণ এই হিসাবে শিবঠাকুরের পরমভক্ত হইলেও দেখা যায় পূর্ব্ব-ভারতে বা প্রাচ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাবের দরুণ ক্রমে স্ত্রীদেবতা, শক্তি বা মাতৃকাদেবীকে তাহারা অধিক সমাদর করিতে আরম্ভ করিল। পামিরীয়গণ একদিকে যেমন মন্ত্র, গুরুবাদ ও রহস্যবাদ (mysticism) সম্বলিত তান্ত্রিকতার পক্ষপাতী ছিল অন্যদিকে তাহারা শিশ্নপূজকও ছিল। ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গোলিয় সংশ্রবের ফলে পামিরিয়গণের ভিতরে যেমন শক্তিপূজা প্রসারলাভ করিয়াছিল তেমনই ইহার আনুসঙ্গিক পূজায় বলিদান প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান কতদূর সত্য তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে জীবহত্যাদ্বারা দেবতার পূজা নিষ্পন্ন করিবার প্রথা নানাধর্ম্মের লোকের মধ্যে শক্তিপূজকগণের ভিতরেই বিশেষভাবে প্রচলিত দেখা যায়। শিবপূজায় রক্তপাত করিয়া পূজার ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। এরূপ প্রথা কোথায়ও থাকিলে (যথা হাণ্টার সাহেব-বর্ণিত বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে) তাহা শক্তিপূজার প্রভাবের ফল বলা যায় কি না তাহা দেখা আবশ্যক। ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও মনসাপূজা প্রভৃতিতে জীবহত্যা করিয়া পূজা দিবার রীতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অবশ্য পূজায় 'বলিদান' শক্তি-পূজকগণেরই একমাত্র অধিকার নহে। পৃথিবীতে অনেক জাতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিপূজক না হইয়াও ধর্ম্মকার্য্যে জীবহত্যা করিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বেদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নাম করা যাইতে পারে। ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো সব জাতির মধ্যেই পশুবলিদান প্রথার তো কথাই নাই নরবলিদানের প্রথারও প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায়।

পূজায় বলিদান প্রথা ও রক্তপাতের ব্যাপারে ধর্ম্মগত কারণের অন্তরালে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ইহার সাহায্য করিয়াছে। ইহার দার্শনিক

মতবাদ বিষয়টিকে সুষ্ঠু ও সংস্কৃত আকারে দেখাইবার প্রচেষ্টামাত্র। যাহা হউক উল্লিখিত নানাকারণে তিব্বত-ব্রহ্মী (মঙ্গোলীয়) এবং মুণ্ডারীজাতীয় (অষ্ট্রিক) সমাজে বলিদান প্রথার বহুল প্রচলন থাকিবারই কথা। এই হেতুতেই আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের প্রাচীন শক্তিপূজক তিব্বত-ব্রহ্মীদিগের ভিতরে (যথা আহোম, চীন প্রভৃতি জাতির) শক্তিপূজায় রক্তপাত করিয়া পূজা দিবার এত আগ্রহ। আসামের আহোমরাজগণ কালক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পামিরীয়গণ ককেশীয়দিগের "পাহাড়ী" গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয় (তিব্বত-ব্রহ্মী) অথবা অষ্ট্রিকগণ (প্রাচীন নাগজাতি ?) অপেক্ষা উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল। ইহা ছাড়া পামিরীয়গণ বোধ হয় প্রথমে তান্ত্রিক, পরে শৈব এবং মঙ্গোলীয়গণ প্রথমে শাক্ত, পরে তান্ত্রিক। আর একটি কথা এই যে শিবদেবতাকে পামিরীয়গণ জন্ম ও মৃত্যুসম্বন্ধে জন্মের দেবতা হিসাবেই অধিক দেখিয়া থাকিবে, আর মঙ্গোলীয়জাতি শক্তিদেবীকে মৃত্যুর প্রতিক হিসাবে অধিক গ্রহণ করিয়া থাকিবে। বোধ হয় ইহার ফলেই শক্তিপূজায় বলিদানের এত বাহুল্য দেখা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুমান হয় পামিরীয়ান শৈব তান্ত্রিকগণ তিব্বতব্রহ্মীগণের শক্তিপূজা গ্রহণ করে এবং তিব্বত-ব্রহ্মী জাতীয় মঙ্গোলীয়গণ পামিরীয়গণের তান্ত্রিকতা গ্রহণ করে। এই দুই জাতির পূর্ব্ব-ভারতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত মতের বিনিময় হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের "মঙ্গল" কথাটির মাধবাচার্য্য নামক এক কবি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে "মঙ্গল দৈত্য" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে যেন শক্তিপূজায় মঙ্গোলীয় সংশ্রবের ছায়াপাত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পামিরীয়ান দেবতা শিবঠাকুরের শক্তি উমা বা দুর্গার উপর প্রচুর মঙ্গোলীয় প্রভাব পতিত হওয়া সম্ভব। হিমালয় অঞ্চলের কিম্বদন্তিগুলি যেন সেই অনুমানেরই সমর্থন করে। দুর্গার ন্যায় অপর শক্তিদেবী মনসাকে (সর্পদেবী) আবার পামিরীয়, মঙ্গোলীয় এবং অষ্ট্রিক সভ্যতার আদান প্রদানের মধ্য দিয়া আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালীর জাতক গ্রন্থাদিতে যে "নাগ"জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা বোধ হয় সর্প-উপাসক এবং অষ্ট্রিক জাতীয় ছিল। নাগজাতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দেবী বাঙ্গালা দেশে শিবকন্যা (পৌরাণিক মতে কশ্যপকন্যা) মনসারূপ পরিগ্রহ করেন। ক্রমে দ্রাবিড় ও বৈদিক আর্য্য সভ্যতার ভিতরও এই

দেবীর প্রভাব অল্প পতিত হয় নাই। শিবপূজকগণের সহিত সর্পপূজকগণের সম্বন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। সর্পিনী এককালে বহুডিম্ব প্রসব করে এবং সর্পবিষ বহু মানবের মৃত্যুর কারণ। সম্ভবতঃ এই উভয় কারণ বশতঃ সর্প শিবলিঙ্গপূজকগণের নিকট জন্ম ও মৃত্যু এই উভয়েরই যোগ্য প্রতীক হিসাবে গণ্য হইয়া শিবের গলায় শোভা পাইতেছে। শিব সর্পবিষও পান করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন। হয়ত পামিরীয়ানগণের বাঙ্গালায় প্রবেশের পূর্ব্বে পামিরীয়ান ও অষ্ট্রিকগণের সংস্কৃতির আংশিক মিলন ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে। নানা কারণ পরম্পরা সর্পসহ সর্পদেবী মনসাও শিবদেবতার নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। অষ্ট্রিক সর্পদেবতার স্ত্রীরূপ (মনসাদেবী) পরিকল্পনা মঙ্গোলীয় প্রভাবের ফলে হওয়ার দিকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইঙ্গিত উপেক্ষনীয় নহে। ইহা বাঙ্গালাদেশে পামিরীয়, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির যুক্ত প্রতীক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহারা প্রাচীন নাগ জাতিকে দ্রাবিড় বলেন এবং মনসাদেবীকে মূলে দ্রাবিড় জাতির দেবী বলেন আমরা তাঁহাদের মত সমর্থন করি না, কারণ ইতিহাস ও সাহিত্য তাহা সমর্থন করে না।

এইভাবে নানা জাতি, নানা রুচি, নানা প্রথা ও নানা ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে বা সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি এবং তাহাদের উন্নত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপলক্ষে পামিরীয় জাতির দানের কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইল। কতদিনে এই সংগঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা বলা কঠিন হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে। সময়ের দিক দিয়া ধর্ম্মগুলির মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বোধ হয় বৈদিক ধর্ম্মেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। তান্ত্রিকতা শুধু যে হিন্দু ধর্ম্মকে প্রভাবিত করিয়াছিল এরূপ নহে। ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৃহত্তর হিন্দু ধর্ম্মেরই এক শাখা এবং কালক্রমে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম ও মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মই তান্ত্রিক ধর্ম্মমত ও ইহার দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

বৈদিক আর্য্যগণের ভারতে প্রবেশের সময় নিয়া মতভেদ থাকিলেও ইহা অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পামিরীয়গণের ভারতে আগমন তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তান্ত্রিকতা তাহাদের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হইলে ইহার প্রচলনের কাল বৈদিক-পূর্ব্ব সময়ে দেখিতে হইবে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হইয়াছিল এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের প্রচলনকাল গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৪০০-৫০০ খৃঃ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন পুরাণ এই সময়ের অনেক পূর্ব্বেই লিখিত

হইয়াছিল। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের সংস্কার সাধিত হয় এবং মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম্মে তান্ত্রিক মত প্রবেশ করিয়া তিব্বত দেশে ইহা গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষ ও ইহার অন্তর্গত বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নিম্নে তিনটি তালিকার সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করা গেল। অবশ্য ইহাতে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল। আশা করি ধর্ম্মগুলির মোটামুটি পরিচয় ও সম্বন্ধ ইহা হইতে কতকটা বোঝা যাইবে।

(১)

তন্ত্রপ্রধান
(ক) বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে।
(খ) এই ধর্ম্মগুলিরও নানা শাখা-প্রশাখা আছে।

(২) তান্ত্রিকধর্ম্ম

- সাধারণ
- অংশতঃ সংমিশ্রিত (অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত)
  - মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম
  - বৈষ্ণবধর্ম্ম
  - নাথধর্ম্ম
  - শিশ্নপূজা
    - শৈবধর্ম্ম
    - শাক্তধর্ম্ম
  - অন্যান্য ধর্ম্ম

(৩) অলৌকিক শক্তি-বিশ্বাসী ধর্ম্ম (সুপ্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মসমূহ)

- বৌদ্ধধর্ম্ম (অংশতঃ মিশ্রিত)
- তান্ত্রিকধর্ম্ম (অংশতঃ মিশ্রিত)
- শিশ্নপূজা (অংশতঃ তান্ত্রিক)
- বৈদিকধর্ম্ম
  - পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম (নানাধর্ম্ম সংমিশ্রিত অথবা প্রভাবান্বিত)
- মাতৃকাপূজা
- অন্যান্য ধর্ম্ম (যথা প্রকৃতিপূজা, জীবজন্তুপূজা, পিতৃপুরুষেরপূজা, ভূতপ্রেতপূজা ইত্যাদি)
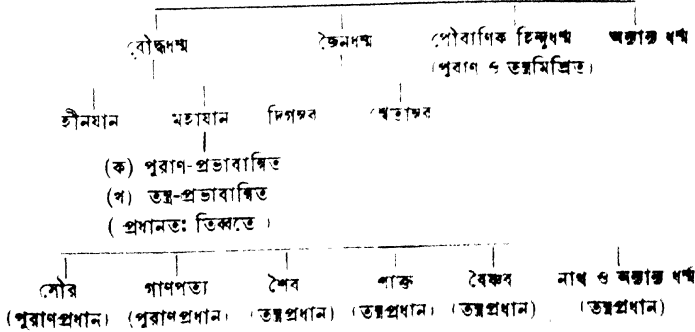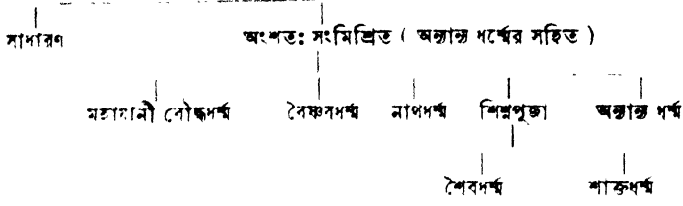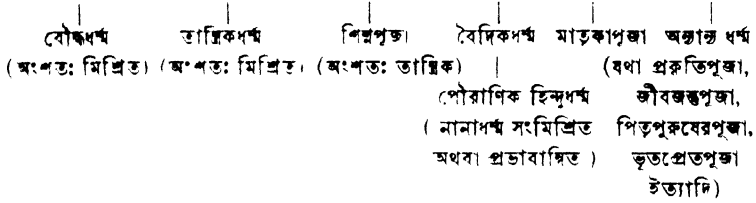
আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনুমান ও সিদ্ধান্তের ভিতরে নানারূপ ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি, ইহা বিষয়টির গুরুত্ব ও পথনির্দ্দেশে সাহায্য করিলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমার মতের মোটামুটি সমর্থনে নিম্নে কতিপয় পুস্তক ও প্রবন্ধের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। অবশ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামতসম্বলিত বহু লেখা রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে সামান্য কয়েকটির নাম দিলাম আশা করি উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-তালিকা।

(তান্ত্রিকতা, শৈবধর্ম্ম, শক্তিপূজা, সর্পপূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে)

১। Serpent & Siva worship & Mythology, in Central America, Africa & Asia—by Hyde Clarke

২। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনায় জীবনের আদর্শ—(১৯শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী)—গোপীনাথ কবিরাজ

৩। Notes in J. A. S. A., 1897 & 1908—by Pargiter

৪। Peoples of India—Risley

৫। Indo-Aryan Races—R. Chanda

৬। Alpine Strain in the Bengali people—(Nature, Feb. 22, 1917)—R. Chanda

৭। An article in J. R. A. S., 1912, pp. 467—468

৮। The Races of Man—(P. 27, 1924)- A. C. Haddon

৯। Siva- Rgveda (7th Mandala, 187)

১০। Political History of India, 4th ed. (Re. the tribe Siboi of the Punjab) H. C. Roy Choudhury.
Also Do (Re. the river Gauri & the tribe "Guraeans" referred to by the Greeks)—H. C. Roy Choudhury.

১১। Development of Hindu Iconography, Chap. IV, PP. 124-141—(Re. Siva & Uma Cults in Ancient India, with ref. also to both in Indo-Greek & foreign coins) —J. N. Banerjee

১২। Carmichael Lectures. 1921 (1st. Chapter)— D. R. Bhandarkar.

১৩। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সমাজবিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ—(২৯শে ডিসেম্বর, সন ১৯৩৮)— শরৎচন্দ্র রায় (সভাপতি)

১৪। Tree & Serpent worship—Fergusson (Encyclo. of Religion & Ethics)

১৫। Encyclo. Britannica (for Serpent worship)

১৬। "তন্ত্র" শব্দ—বিশ্বকোষ

১৭। ১৯শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ—(সভাপতি) শরৎকুমার রায়

১৮। Pre-Aryan & Pre-Dravidian in India—Sylvain Levi, Jean Pryzluski & Jules Bloch—Translated into English(P. C. Bagchi.)

১৯। Pre-Historic, Ancient & Hindu India—R. D. Banerjee

২০। Oxford History of India—V. Smith (Ancient Period)

২১। The Terror of the Leopard (Re. Lycanthropy)—Juba Kennerley

২২। Juju & Justice in Nigeria—Frank Hives

২৩। Cult of the Leopard (The Wide World Magazine, February, 1943)—Page Cord

২৪। Egypt—Breasted

২৫। History of the Near East – Hall

২৬। উল্লেখযোগ্য তন্ত্রসমূহ (বৌদ্ধ ও হিন্দু)

২৭। উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ পালি জাতকসমূহ

২৮। উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত পুরাণসমূহ

২৯। Vestige of a Vanished Empire (for Siva cult)—Gartsang (an article in "The Wonders of the Past" series)

৩০। Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter

৩১। History of the Assam Rifles—Col. L. W. Shakespear (for information about various Assam tribes & Serpent worship)

৩২। Some recent researches into the origin of the Siva-worship and festival—Saratchaudra Mitra (The Hindusthan Review, Allahabad, May-June, 1918, P. P. 386 390.

আদি যুগ

(হিন্দু-বৌদ্ধযুগ)

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা ও অক্ষর এবং ডাকার্ণব

(ক) বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর

বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর—বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সাধারণ শিশুর ন্যায় জন্ম পরিগ্রহ করে নাই। ইহা ক্রম-বিবর্ত্তনের ফল। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভিক অবস্থা এইরূপ। পর্ব্বত-গাত্রনিঃসৃত গঙ্গা নদীর উৎসমূলের জটিলতার সহিত ইহা কতকটা তুলনীয়। যাহা হউক বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন বাঙ্গালাভাষা কত পুরাতন? ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে মাগধী প্রাকৃত ও তাহার অপভ্রংশ ভাষা ক্রমে বঙ্গ-ভাষায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য ব্যাপারটি একদিনে নিষ্পন্ন হয় নাই। ইহা সাধিত হইতে একাধিক শতাব্দী অতীত হইয়া থাকিবে। অনেকে অনুমান করেন খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি (শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত) বঙ্গভাষার এবং নেপালে আবিষ্কৃত আনুমানিক ৮ম।৯ম শতাব্দীর চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পর্যান্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালাভাষার ন্যায় বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। উত্তর ভারতের প্রাচীনতম লিপি "খরোষ্ঠি" ও "ব্রাহ্মীলিপি" নামে পরিচিত। সময়ের দিক দিয়া ইহার পর "অশোকলিপি" ও তাহার পর "গুপ্তলিপি"র উদ্ভব হয়। আর্য্যসম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলিতে দুই প্রকার লিপি ব্যবহার করিয়াছেন। কপূরদি গিরিতে তিনি যে অনুশাসন খোদিত করিয়াছেন তাহার গতি খরোষ্টিলিপির রীতিক্রমে দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে কিন্তু অপর অনুশাসনগুলিতে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লিখিবার সাধারণ রীতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। অশোকলিপি পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গুপ্তসম্রাটগণের সময়ে "গুপ্তলিপি"তে পরিণত হয়। আবার কালক্রমে "গুপ্তলিপি" হইতে নানাপ্রকার অক্ষরের প্রচার হয়। ইহাদের মধ্যে "সারদা", "শ্রীহর্ষ" ও "কুটিল" অক্ষর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "সারদা" অক্ষর হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের "কাশ্মীরী", "গুরুমুখী" ও "সিন্ধী" প্রভৃতি অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। "শ্রীহর্ষ" সংযুক্ত-প্রদেশ অঞ্চলের দেবনাগরী ও অন্য বিভিন্ন প্রকার নাগরী অক্ষরের পূর্ব্বপুরুষ।

তিব্বত দেশের প্রচলিত অক্ষরও ইহারই অনুরূপ। "কুটিল"ও ইহার সদৃশ অক্ষরসমূহ হইতে প্রাচ্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। নেপাল, বারানসী অঞ্চল, মগধ, কলিঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে এই জাতীয় অক্ষরগুলি প্রচলিত রহিয়াছে।

উল্লিখিত অক্ষরগুলির কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল। যথা,—

MODERN BENGALI	ASOKAN (3rd century B.C.)	KUṢĀN (1st, 2nd and 3rd centuries A.D.)	GUPTA (4th and 5th centuries A.D.)	PROTO BENGALI (11th and 12th centuries A.D.)
ক	𑀓	𑀓	𑀓	ক
ন	𑀦	𑀦	𑀦	ন
স	𑀲	𑀲	𑀲	স
ত	𑀢	𑀢	𑀢	ত
শ	𑀰	𑀰	𑀰	শ
র	𑀭	𑀭	𑀭	র

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ এই পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট বলা যায় না। প্রধান নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, নেপাল রাজ্যে। এই উপলক্ষে চারিখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে যথা—"ডাকার্ণব", "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়", "বোধিচর্য্যাবতার" ও সরোজবজ্রের "দোহাকোষ"। এই গ্রন্থগুলির আবিষ্কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। শেষোক্ত গ্রন্থ তিনখানিতে বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ পদ বা গান রহিয়াছে। এই চর্য্যাপদগুলির বিষয়বস্তু বিশেষ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। শাস্ত্রী মহাশয় এই চর্য্যাপদ-গুলিকে বৌদ্ধদিগের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ইহাদের কতক-গুলিকে একত্র করিয়া "বৌদ্ধগান ও দোহা" নাম দিয়া সম্পাদিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে যে অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহাদের নাম (১) ডাকার্ণব (ডাকের বচন), (২) চর্য্যাপদ (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার ও সরোজবজ্রের "দোহাকোষ"), (৩) খনার বচন, (৪) শূন্যপুরাণ, (৫) গোপীচন্দ্রের গান ও গোরক্ষবিজয় এবং (৬) ব্রতকথা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগ ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যান্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই উল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানিতে রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য মোটামুটি (১) ভাষাতে সংস্কৃতের প্রভাবশূন্যতা, (২) ভাবের দিকে পরবর্ত্তীযুগের ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক আদর্শের অভাব, (৩) কৃষি, জ্যোতিষ ও গৃহস্থালীর জ্ঞানের প্রতি অত্যধিক অনুরক্তি এবং (৪) দার্শনিক ও তান্ত্রিক (হিন্দু ও বৌদ্ধ) আদর্শবাদ।

(খ) ডাকার্ণব

এই গ্রন্থখানি ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিকট প্রাপ্ত হন। তাহার ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে পুথিখানি দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন বাঙ্গালায় পরিচিত ডাকতন্ত্র ও নেপালে প্রাপ্ত ডাকার্ণবের বিষয়বস্তু প্রায় একইরূপ। আবার এই "ডাকতন্ত্রের"ই রূপান্তর এদেশের সর্ব্বজনপরিচিত "ডাকের বচন"। সুতরাং উল্লিখিত মতানুসারে "ডাকের বচনে"র মূল "ডাকার্ণব" এবং ইহা একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ। ডাকের বচনে কিছু কিছু দুর্ব্বোধ্য ভাষার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—
"বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড। আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥" ইত্যাদি (বটতলার ছাপা পুথি)।

এইরূপ ভাষা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন দশম শতাব্দীর বাঙ্গালাভাষা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন

ডাকের বচনে এরূপ ছত্রসমূহও রহিয়াছে

(১) "ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকার জন্য তুলিয়া না থোব॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার।
আপনে মইলে কিসের আর॥"—ডাকের বচন।

(২) "যে দেয় ভাতশালা পানিশালী।
সে না যায় যমের পুরী॥"—ডাকের বচন।

(৩) "ঘরে স্বামী বাইরে বইসে।
চারি পাশে চাহে মুচ্‌কি হাসে॥
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস।
তাহার কেন জীবনের আশ॥"—ডাকের বচন।

(৪) "ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘার।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজ্ঝার॥"—ডাকের বচন।

(৫) "নিয়র পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥"—ডাকের বচন।

ডাকের বচনের ছড়াগুলি নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ছড়াগুলির ভিতরে ঘরের নারী বা গৃহিণী সম্বন্ধে যে কৌতূহলোদ্দীপক সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীনকালের এতদ্দেশীয় পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেকখানি আলোক সম্পাত করে। ডাকের বচনগুলিতে কিছু জ্যোতিষ এবং বিশেষভাবে গৃহস্থালীজ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। ছড়াগুলির ভিতরে পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধে এক বিশেষ আদর্শের এবং কোন বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় রহিয়াছে। যে বিষয়সমূহ ডাকের বচনে রহিয়াছে তাহা হইল—নীতি-প্রকরণ, রন্ধন-প্রকরণ, জ্যোতিষ-প্রকরণ, ক্ষেত্র-প্রকরণ, গৃহিণী-লক্ষণ, কৃষি-লক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ ও পরিত্যাগ-কথন, ধর্ম্ম-প্রকরণ, বসতি-প্রকরণ, কুগৃহিণী লক্ষণ ও স্ত্রীদোষ-লক্ষণ, ইত্যাদি।

কতকগুলি বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হইলেও ডাকের বচনগুলি হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যথা—

(ক) বাঙ্গালা ডাকের বচনের আদর্শ "ডাকার্ণব" একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ।

(খ) "ডাকার্ণব" (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে) খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন। আবার ডাক ও খনার বচনকে খৃষ্টীয় ৮ম—১১শ শতাব্দীর রচনা বলিয়াও ডাঃ সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(গ) "বলে ডাক এই সংসার। আপনে মইলে কিসের আর।"—ইত্যাদি উক্তি ইহকালসর্ব্বস্ব হিন্দু দার্শনিক চার্ব্বাকের মতের ন্যায় একপ্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ। ইহা মহাযানী বৌদ্ধগণের অবনতির যুগের দ্যোতকও বটে, এমনকি ইহা তাহাদেরই উক্তি।

(ঘ) বৌদ্ধগণ জনহিতকর কার্য্যাবলীর সমর্থন করিত। এই হিসাবে

"যে দেয় ভাতশালা পানিশালী। সে না যায় যমপুরী ॥"—ইত্যাদি তাহাদের এইরূপ মতবাদই সমর্থন করিতেছে।

(ঙ) "ডাকের বচন"সমূহ কাল্পনিক লোক মারফত কোন সম্প্রদায় বিশেষের মতবাদ না সত্যই কোন ব্যক্তিবিশেষের উক্তি? শেষোক্ত মতের উদ্ভব আসামে। সেখানকার অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে "ডাক" নামে সত্যই কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের মতে "ডাক" জাতিতে কুম্ভকার (বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত মত গোয়ালা) ছিল এবং কামরূপ জেলার বাউসী পরগণার অন্তর্গত লোহ গ্রাম (প্রবাদ কথিত লোহিডাঙ্গরা) তাহার বাসস্থান ছিল। "লোহিডাঙ্গরা ডাকের গাও" প্রবচন এবং এইরূপ আরও কতিপয় প্রবচন এইরূপ মতের সমর্থনে প্রদর্শিত হয়। অপরপক্ষে "ডাক" অর্থ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "প্রচলিত বাক্য"ও হইতে পারে। আবার ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে "ডাক" শব্দ ও "ডাকিনী" শব্দ মন্ত্রতন্ত্রাভিজ্ঞ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী অর্থে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে বৌদ্ধ "ডাকার্ণব" গ্রন্থের ভিতরে বাঙ্গালা ডাকের বচনাদি পর্য্যন্ত সংস্কৃত টিকাটিপ্পনীসহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তবে, আধুনিক ডাকের বচনের ভাষা অপেক্ষা উহা বেশ পুরাতন ও জটিল।

এমতাবস্থায় বাঙ্গালা ডাকের বচনের আদর্শ ডাকতন্ত্র ও ডাকার্ণব হওয়াই সম্ভব। ভাষাতাত্ত্বিকগণের সমর্থন লাভ করাতে চর্য্যাপদগুলির ন্যায় ডাকার্ণবের ভাষাকে খৃঃ দশম শতাব্দীর বাঙ্গালাও হয়ত বলা যাইতে পারে। তবে পণ্ডিতগণ যে ইহার ভাষাকে দশম শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহার একটু অর্থ আছে। এই শতাব্দীতে বৌদ্ধ পাল-রাজগণ বাঙ্গালা দেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহা (ডাকার্ণব) বৌদ্ধগ্রন্থ হইলে পালরাজগণের সময় এই দেশে ইহা প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এই হিসাবে পুথিখানি খৃঃ দশম শতাব্দীতে রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার অপরদিক দিয়া বিচার করিয়া পুথিখানিকে খৃঃ দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মূলে স্বীকার করিয়া লইলে ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সোজা কথায় পুথিখানি খৃঃ দশম শতাব্দীর হইলে ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৌদ্ধগ্রন্থ হইলে ইহা খৃঃ দশম শতাব্দীতে (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের সময়ে) লিখিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আসামে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মিহির নামক কোন জ্যোতির্ব্বিদের আশীর্ব্বাদের ফলে ডাক জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিয়াই মাতাকে ডাক দিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে

মাতাকে উপদেশ দেন। এই মাতাকে ডাক দেওয়া উপলক্ষেই নাকি "ডাক" নাম হইয়াছে। যাহা হউক কথা হইতেছে জ্যোতির্ব্বিদ মিহিরকে লইয়া। কোন আসাম দেশীয় বিশেষজ্ঞ (দেবেন্দ্রনাথ বেজবড়ুয়া) বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ-মিহিরের সহিত এই প্রবাদোক্ত মিহিরকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া ডাককে বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের এক শাখার উপাধি "মিহির" ছিল বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উক্ত মতবাদ সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে যে কোন মিহিরই বরাহ-মিহির নহে। সম্ভবতঃ ডাঃ সেনের অভিমতই ঠিক।

"ডাকার্ণব" বৌদ্ধগ্রন্থ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, ইহার অপর কারণ পুথিখানি নেপালের বৌদ্ধদিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ইহারা কোন্ শ্রেণীর বৌদ্ধ তাহাও অনুমিত হইয়াছে। এই হিসাবে "ডাকার্ণব" তান্ত্রিক মতের মহাযানী বৌদ্ধদিগের অন্যতম শাখা বজ্রযানী সম্প্রদায়ের পুথি বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপ মতামতের ভিত্তিতে রহিয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে বৌদ্ধ প্রভাব। ডাকার্ণব সত্যই কি বৌদ্ধগ্রন্থ? আমরা যদি বলি ইহা বৌদ্ধগন্ধী এক শ্রেণীর তান্ত্রিক শৈব সন্ন্যাসীদের পুথি তাহা হইলে কি দোষ হয়? এই সম্বন্ধে আমাদের মতামত অপর তিনখানি তথাকথিত বৌদ্ধগ্রন্থ (চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়, বোধিচর্য্যাবতার ও সরোজবজ্রের দোহাকোষ) আলোচনা উপলক্ষেও দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের সহিত, বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালার কৃষি ও জ্যোতিষের জ্ঞানের সহিত, শিবঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"ডাক" নামটি লইয়া আর একটি প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। "ডাকের বচনের" ডাক ও "খনার বচনের" খনাকে এদেশবাসী সকলে রক্ত মাংসের জীব ছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। "ডাক দিয়া বলে রাবণ" প্রভৃতি উক্তিতে ডাক কথাটি অন্য অর্থবাচক হইলেও রাবণের সত্যকার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এদেশবাসী জনসাধারণ অত্যন্ত বিশ্বাসী সন্দেহ নাই। খনা বা রাবণ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মতামতই পোষণ করি না কেন ডাকের অস্তিত্বের স্বপক্ষেও দুই একটি কথা বলিবার আছে। ডাক সত্যই একটি ব্যক্তি বিশেষ হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ এই নামের একটি ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আসাম প্রদেশে এত কিম্বদন্তি ও নিদর্শন রহিয়াছে তখন উহা একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে কি?

এই উপলক্ষে অপর একটি বিষয়ও প্রণিধান যোগ্য। ডাক নামক ব্যক্তিটি জাতিতে কুম্ভকার ও মতান্তরে গোয়ালা এবং আসামের কামরূপ জেলার অন্তর্গত লোহিডাঙ্গরা গ্রামের অধিবাসী বলিয়া কথিত হইলেও সেই জেলায় বা তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ডাকার্ণবের পুথি পাওয়া যায় নাই। কামরূপ জেলা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত নেপালরাজ্যে এবং হিমালয় পর্ব্বতের নিভৃত ক্রোড়ে ডাকার্ণব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাও আবার কোন গৃহীর নিকট হইতে নহে, কোন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে। ইহার অর্থ কি? গৃহীর প্রতি উপদেশপূর্ণ পুথিতে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কি প্রয়োজন? এই সব কারণ পরম্পরা সন্দেহ হয় যে ডাক সত্যই কোন জ্ঞানী (বৌদ্ধ বা হিন্দু) ব্যক্তি বিশেষের নাম। গোয়ালাজাতীয় এই ব্যক্তিটি বোধহয় প্রথমজীবনে গৃহী এবং "ডাকের বচনের" রচনাকারী হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী জীবনে এই ব্যক্তিটি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকিলে এবং এই উপলক্ষে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলে তাহারা যে সব স্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইত নেপাল তাহাদের অন্যতম স্থান হয়ত ছিল। কিন্তু ডাক অল্পবয়সে জলে ডুবিয়া মারা যান এরূপ প্রবাদ আছে। ইহা সত্য হইলে তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তবুও ডাকের সহিত অন্ততঃ কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পণ্ডিতপ্রবর ভিনসেন্ট স্মিথের মতানুসারে ইহাও বলা যায় যে মুসলমান আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য বিপর্যাস্ত হইলে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ বহু পুথি বিহার ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ হইতে সন্ন্যাসিগণ নেপালে লইয়া পলাইয়া যান। "ডাকার্ণব" এইরূপ একখানি পুথিও হইতে পারে। ইহার ফলেই নেপালরাজ্যে "ডাকার্ণব" পুথিটি পাওয়া যায়। ডাকের দলস্থ সন্ন্যাসীগণ মহাযানী বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্প্রদায় না শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল তাহা এখন বলা কঠিন, বরং পুথিখানি বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিকটই পাওয়া গিয়াছে। অথচ পুথির বিষয়বস্তু, শৈব ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়দ্বয়ের পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের লক্ষণ তান্ত্রিকতা, বৌদ্ধধর্ম্মের নামগত ও আদর্শগত বহু বিষয়ের স্পষ্ট অভাব প্রভৃতি পুথিখানিকে শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের চিহ্নযুক্তও করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধগণের নিকট পুথিখানি প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার (essential) না হইয়া অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার (accidental) হওয়াও বিচিত্র নহে।

ডাকার্ণবের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে মনে হয় ইহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধমতও নহে এবং সম্পূর্ণ হিন্দুমতও নহে। হিন্দু চার্ব্বাক মতের সহিত ইহার বেশ মিল রহিয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। পরোপকারার্থে বৃক্ষরোপণ এবং পুষ্করিণী খনন শুধু বৌদ্ধদেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে, ইহা হিন্দুমতেরও দ্যোতক। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ মৌর্য্য সম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলির ভিতরে জীবহিংসা নিষেধাত্মক, পরোপকারবাঞ্জক ও গুরুসেবার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক উপদেশ খোদিত করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই মতসমূহের পরিপোষক নীতিগুলি আবহমানকাল হইতে এই দেশে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ডাকার্ণবকে সম্পূর্ণ বৌদ্ধগ্রন্থ না বলিয়া বৌদ্ধভাবমিশ্রিত হিন্দুগ্রন্থ বলাই বোধ হয় অধিকসঙ্গত।

প্রসন্ন-বুদ্ধ

পঞ্চম অধ্যায়

চর্য্যাপদ *

(ক) **চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়** (পুঁথি সম্পূর্ণ)
(খ) **বোধিচর্য্যাবতার** (খণ্ডিত)
দোহাকোষ (সরোজবজ্রকৃত)

চর্য্যাপদের পুঁথি দুইখানির প্রথমটি সম্পূর্ণ ও দ্বিতীয়টি খণ্ডিত আকারে নেপালে পাওয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের পুঁথি দুইখানি ছাড়া সরোজবজ্রের দোহাকোষও নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুঁথিগুলির আবিষ্কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি কতকগুলি চর্য্যাপদ ও কতিপয় দোহা একত্র করিয়া বৌদ্ধগান ও দোহা নামে সম্পাদিত করিয়াছেন। এই পুঁথিগুলি ছন্দে নিবদ্ধ কতকগুলি পদের সমষ্টি। অনেক পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবপদগুলির সহিত চর্য্যাপদগুলি তুলনীয়। বৈষ্ণবপদের ন্যায় চর্য্যাপদও সম্ভবতঃ গীত হইত। চর্য্যাপদগুলির ভিতরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মেরই চিহ্ন রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এমন এক যুগ ছিল যখন মহাযানী বৌদ্ধ, শৈব হিন্দু ও শাক্ত হিন্দুর মধ্যে দার্শনিক মত ও তান্ত্রিক আচারের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। শুধু মত বিচার করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধকে পৃথক করা দুরূহ। শৈব ও শাক্ত ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মেও পরবর্ত্তীকালে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। তান্ত্রিক আচার সম্বন্ধে এদেশে শৈবগণই প্রথম পথপ্রদর্শক ছিল বলা যাইতে পারে। ইহা বলিবার কারণ এই যে শৈব ধর্ম্মাশ্রিত প্রাচীন পামিরীয় জাতিই প্রথমে এই দেশে তান্ত্রিক মতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। শিব দেবতার সহিত তন্ত্রের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই ইহার অন্যতম প্রমাণ। পামিরীয়গণ যে অতি প্রাচীনকালে এমনকি হয়ত বেদ-পূর্ব্ব যুগে এই দেশে শৈব ধর্ম্ম ও তৎসহ তান্ত্রিকতা আনয়ন করিয়াছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। তাহার পর মঙ্গোলীয় মাতৃকাপূজকগণ বা শাক্তগণ উল্লেখযোগ্য। শাক্ত তান্ত্রিকগণের পর মহাযানী বৌদ্ধগণ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম কি ৮ম শতাব্দীতে তান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময়ে তিব্বত দেশেও মহাযানী শাখার

* চর্য্যাপদসমূহের বিভিন্ন সম্পাদনা দ্রষ্টব্য দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধ গান ও দোহা (H. P. Sastri) ও Origin and Development of Bengali Language (Introduction) by S. K. Chatterjee দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধগণের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। ইহাদের পরে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের মধ্যেও তান্ত্রিক প্রভাব দেখা যায়।

মহাযানী বৌদ্ধদের যেমন বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামক চারিটি শাখা তদ্রূপ তান্ত্রিকমতও বিভিন্ন প্রকার থাকাতে নানাশাখার তান্ত্রিক রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "বামাচারী" তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদিগের সহিত ও মহাযানী বৌদ্ধদের কোন কোন সম্প্রদায়ের সহিত চর্য্যাপদগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। "বামাচারী" সন্ন্যাসী বলিলেই অনেকে বৌদ্ধতান্ত্রিক সন্ন্যাসী বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা ভুল। "বামাচারী"গণ স্ত্রীলোক নিয়া সাধনা করিবার পক্ষপাতী এবং ইহারা তান্ত্রিক। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসী বলিলে প্রধানতঃ শাক্ত "বামাচারী" সন্ন্যাসী বুঝাইয়া থাকে যেমন "বীরাচারী" সন্ন্যাসী বলিলে শৈব সন্ন্যাসী বুঝাইয়া থাকে। বৌদ্ধতান্ত্রিক ও শৈবতান্ত্রিকগণের মধ্যেও কিছু কিছু "বামাচারী" শ্রেণীর সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব থাকিলেও "শাক্ত বামাচারীগণের" ন্যায় তাহারা ততটা উল্লেখযোগ্য নহে। শৈব ও শাক্তগণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হেতু কোন বামাচারী সন্ন্যাসী শৈব না শাক্ত তাহা হঠাৎ নির্ণয় করা কঠিন।

স্বামী প্রণবানন্দ তাঁহার একটি ইংরেজী পুস্তকে (Exploration in Tibet) কৈলাশ পর্ব্বত সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় এই পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই মান্য। উভয়েরই বিশ্বাস এই পর্ব্বতের চূড়ায় (সুতরাং অধিক সম্মানের স্থানে) "হর-গৌরী" বিরাজ করেন। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধগণের মতে পর্ব্বতের নিম্নদেশে (সুতরা "হর-গৌরীর" নীচে) বোধিসত্ত্বগণ অবস্থান করেন। এইরূপ বিশ্বাসের মূলে শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় অথবা উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সদ্ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। শিবদেবতাতে পৌরাণিক বর্ণক্ষেপ করিয়া আর্য্যগণ অনেক পরবর্ত্তীকালে এই আর্য্যেতর দেবতাটিকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। আবার অনেককাল গত হইলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে শিবদেবতার একান্ত উপাসক দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী শঙ্করাচার্য্য যে মায়াবাদ সারাভারতে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই দেবতাটির গাত্রে বহু ধর্ম্ম ও বহু জাতির চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধের সমাধির সহিত শিবের সমাধির সাদৃশ্য প্রদর্শন খুবই সহজ। তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণের এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের "বজ্রযান ও সহজযান" নামক শাখাদ্বয়ের মতবাদের সহিত যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত-বিশ্বাসী কোন কোন শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মতবাদের যথেষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া শুধু মতবাদ উল্লেখ করিয়া উহা হিন্দু কি বৌদ্ধ

তাহা প্রমাণ করা সহজ নহে। পরস্পর নৈকট্য ও সৌহার্দ্দানিবন্ধন অনেক বৌদ্ধ শৈবমত এবং অনেক শৈব বৌদ্ধমত আংশিকভাবে তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবে। এই উপলক্ষে শৈব "বিন্দুবাদ" ও বৌদ্ধ "শূন্যবাদ" এতদুভয়ের সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূল উপাস্য দেবতার স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলে শুধু দার্শনিক মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য দেখান কঠিন। ইহা ছাড়া আর একটি কথা বলা যায়। মৃত্যুর ও মহাকালের প্রতীক হিসাবে শিবের ভিতরে বৌদ্ধ শূন্যবাদ প্রবেশ করা সহজ-সাধ্য বলিয়াই মনে হয়।

শূন্যতার বিশেষ ব্যাখ্যার উপর ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বৌদ্ধ শূন্যবাদের যে নানারূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহার কোন কোনটির সহিত "বিন্দু"তে পরিণত পরম শিবের ব্যাখ্যার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, এমনও হইতে পারে চর্য্যাপদ বৌদ্ধদিগেরই রচিত পুথি, কিন্তু বুদ্ধ বা তথাগতের নামগন্ধ ইহাতে দেখা যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা একেবারে বৈদান্তিক মায়াবাদ ও যোগশাস্ত্রের কথা এবং কিয়ৎপরিমাণে শূন্যতার আভাস। এমতাবস্থায় আমরা যদি চর্য্যাপদের অনেক পদই বৌদ্ধ ভাবাপন্ন শৈব সন্ন্যাসীদের পদ বলি তবে কি ভুল হয়? শৈব নাথপন্থী যোগী-গুরুগণের কোন কোন নাম এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন "কাহ্ন" বা "কানুপা"।

চর্য্যাপদগুলিতে ব্যাখ্যাত মায়াবাদের কিছু নিদর্শন নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) "আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী—কাহ্নপাদ

চিত্তে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন মোহ কিরূপ বিপদ ঘটায় এই ছত্রটি দ্বারা তাহাই বুঝান যাইতেছে।

(২) "মন তরুবর গঅন কুঠার।
ছেবহ সো তরুমূল, ন ডাল॥"—কাহ্নপাদ

পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত মন যত বাসনার মূল। ইহাকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া সমূলে বিনষ্ট করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যোগশাস্ত্র শৈব যোগীদের প্রধান অবলম্বন। এই যোগশাস্ত্রের অনেক কথা হিন্দুও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছে। চর্য্যাপদসমূহে এই যোগশাস্ত্রের অনেক তত্ত্বই লিপিবদ্ধ আছে।

চর্য্যাপদের ভাষা সাঙ্কেতিক ও প্রহেলিকাপূর্ণ। এইজন্য ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার "সন্ধ্যাভাষা" নাম দিয়াছেন। এই "সন্ধ্যাভাষা বা

আলো-আঁধারি ভাষাকে কেহ কেহ "সন্ধা"-ভাষা নাম দিয়াছেন। ইহা তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিবার জন্য একপ্রকার স্বতন্ত্র ভাষা।

চর্য্যাপদের রচনাকারী সন্ন্যাসিগণের অনেকেই শৈব যোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেক পদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় "সহজানন্দ" নামক একপ্রকার আনন্দলাভ। এই "সহজানন্দ" সম্বন্ধে কাহ্ন বলিয়াছেন—

'গুণ কইসে সহজ বোল বুঝাঅ।
কাঅবাক্ চিঅ জসুন সমাঅ ॥
আলে গুরু উএসইসিস।
বাক্‌পথাতীত কহিব কিস ॥
মোহেব বিগো আকহণ না জাই"—কাহ্নপাদ

অর্থাৎ, অবাঙমনসোগোচর সহজবাণী কিপ্রকারে বুঝান সম্ভব? তাহা বুঝাইয়া বলা সম্ভব নহে।

সহজানন্দলাভ উপলক্ষে এক শ্রেণীর যোগিগণ চর্য্যাপদের বিশেষার্থ-বোধক কতিপয় বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "মহাসুখ" "শূন্যবাদ", "নির্ব্বাণ", "করুণা", "বোধিচিত্ত" প্রভৃতি প্রধান। এই বিষয়গুলি তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণকেই বেশী লক্ষ্য করিতেছে। আবার সাধনভজনের যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে প্রকার হেয়ালীর ভাষায় যোগ-শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালার শৈব নাথপন্থী যোগিগণের রীতিনীতির সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ আছে। বাঙ্গালা "গোরক্ষবিজয়" গ্রন্থের নাম এই উপলক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ঢেণ্ঢনের রচিত—

"টালত মোর ঘর নাহি পরবাসী।
ঘরেতে ভাত নাহি নিতি উবাসী ॥
বেঙ্গ সংসার বডহিল যায়।
দুহিব দুধু কি বেণ্টে সামায় ॥"—

প্রভৃতি পদের সহিত গোরক্ষবিজয়ের গোরক্ষনাথ ও মীননাথের প্রশ্নোত্তর-সমূহ তুলনা করা যাইতে পারে। চর্য্যাপদের সিদ্ধাচার্য্যগণ "নৈরাত্মা দেবীকে" (জ্ঞানময় সত্বাকে) অস্পৃশ্যা "ডোম্বী" বা ডোমনারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে বেশ তান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ রহিয়াছে। বামাচারী শাক্ত তান্ত্রিকগণের "গুপ্তসাধন তন্ত্র" নামক গ্রন্থে নারী নিয়া সাধনার পদ্ধতির উল্লেখ আছে।

যে সব শ্রেণীর নারী তাহাদের মতে সাধনায় প্রশস্ত তাহাদের নিম্নরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। যথা,--

"নটী কপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যা প্রকীর্ত্তিতা।
বিশেষ বৈদগ্ধযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ শীলসৌভাগ্যশালিন্যঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধঃ ভবেন্নরঃ॥"

গুপ্তসাধন তন্ত্র।

"গুপ্তসাধন তন্ত্রে" উল্লিখিত "কপালিকী" ডোমনারী পদবাচ্য। এই শ্রেণীতে শবরী, চণ্ডালিনী, শুঁড়িনী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর নারীকেও ধরা যাইতে পারে। ইহাদের ছাড়া উচ্চ শ্রেণীর নারীর, যথা "ব্রাহ্মণী"র, উল্লেখ তো রহিয়াছেই।

প্রাচীনকালে পৃথিবীব্যাপী লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। লিঙ্গপূজকগণের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষে এবং সকলের মধ্যেই যৌন-ব্যাপারের পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়া ধর্ম্মসাধনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে লিঙ্গ পূজার ন্যায় তান্ত্রিক পূজা-বিধিও সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-ভারতে, তান্ত্রিক মতানুবর্ত্তী শিবলিঙ্গ পূজকগণের সহিত শক্তি পূজকগণের সম্মেলনের ফলে যৌন-ঘটিত বিষয় তন্ত্রের অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার ফলেই নারীসম্ভোগের ভিতর দিয়া পরমানন্দ বা আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের (সহজানন্দ) প্রচেষ্টা ও তাহার বিধি প্রচলনের চেষ্টা হয়। এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। সাধন-ভজনে নিম্নশ্রেণীর নারীর আধিক্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষে, তথা বাঙ্গালা দেশে, নানা ধর্ম্মমতের উত্থানপতনের সহিত এই দেশের অধিবাসী নানা জাতির প্রচেষ্টা ও সংমিশ্রণ জড়িত আছে। এই দিক দিয়া তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নারী বুঝাইতে অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় জাতির সংশ্রব সূচিত করে কি না তাহা কে বলিবে। নারীসম্ভোগের সাহায্যে সহজানন্দলাভের চেষ্টা মহাযানী বৌদ্ধদের বিভিন্ন শাখাতেও ক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এমনকি বৈষ্ণবগণের এক সম্প্রদায়ও (সহজিয়া সম্প্রদায়) এই মতবাদ গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ কামনা বা বাসনার পরিতৃপ্তির দ্বারা ক্রমে ইহার উপর জয়লাভ করাই এই প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। যৌনবোধ ও

কামবাসনা। হিন্দুমতে ষড়রিপুর প্রধান রিপু। হিন্দুমতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়রিপু এবং বৌদ্ধমতেও অনুরূপ কতিপয় রিপু স্বীকৃত হইয়াছে। কামরিপু সকল রিপু অপেক্ষা বলবান বোধে তাহার নিরোধের জন্যও নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের "সহজমত" ইহাদের অন্যতম উপায় মাত্র। উভয়ের মতেই যেহেতু সংস্কার, মুক্তি (মোক্ষ বা শূন্যত্ব) সাধনার প্রধান অন্তরায় সেই হেতু কামপরিচর্য্যাতেও লোকাচার, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি রাখিতে নাই। বামাচারী তান্ত্রিকগণের (হিন্দু ও বৌদ্ধ) বীভৎস ক্রিয়াকলাপ এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। শাক্ত কাপালিক ও শৈব অঘোরপন্থী সন্ন্যাসীদের জঘন্য কার্য্যকলাপও সংস্কার-মুক্তির চেষ্টাই সূচিত করে।

তান্ত্রিকতার সহিত দার্শনিকতার সংযোগ সাধিত হইলে একদিকে বেদান্তের মায়াবাদ (যথা শঙ্করাচার্য্যের মত) ও অপরদিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যোগশাস্ত্র তান্ত্রিকতার প্রণালী নির্দ্দেশ করে এবং বেদান্তের মত পরবর্ত্তী সময়ে ইহার সহিত যুক্ত হইয়া যে রূপদান করে তাহার অন্যতম ফল "পরকীয়া" মত। এই মত জীবাত্মা-পরমাত্মা ঘটিত উচ্চ দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণের নিকট সহজিয়াগণ কর্ত্তৃক ইহার সাধন-ভজন ও আচরণের দিক বামাচারী তান্ত্রিকগণের আচরণের ন্যায়ই বিশেষ নিন্দনীয়। শৈব-হিন্দু ও মহাযানী-বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ই দার্শনিক মতের দিকে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও প্রণালীর দিকে তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মত উভয়েরই নানাশাখা গ্রহণ করিয়াছিল এবং ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতের মধ্যেও অনেকটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। মহাযানী বৌদ্ধগণের সকলেই তান্ত্রিক নহে এবং সকলেই "সহজিয়া" ও "পরকীয়া" মতাবলম্বী নহে। এইরূপ শৈবসম্প্রদায়ের সকলেই "সহজিয়া" ও "পরকিয়া" সমর্থক নহে। ইহার উদাহরণস্বরূপ শৈব নাথ-পন্থী সন্ন্যাসিগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। "সহজিয়া" ভাবাপন্ন কানুভট্ট-সংগৃহীত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের অনেক পদ সহজিয়া মতের দ্যোতক হইলেও সব পদই এই মতের পরিপোষক মনে করিলে ভুল হইবে। ইহাতে তুল্যরূপ নাথপন্থী মায়াবাদীদের মতও প্রচুর রহিয়াছে। অন্ততঃ আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। চর্য্যাপদগুলিতে নানারূপ বিরোধী মত জট পাকাইয়া বিষয়বস্তুকে আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছে। অনেকগুলি চর্য্যাপদ আবার মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত ও শিবের প্রতি

প্রভাবিত তিব্বত দেশে রক্ষিত হওয়ার ফলে তিব্বতি ভাষায় ইহার কিছু কিছু রূপান্তর হেতু চর্যাপদগুলির প্রকৃত অর্থসমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। চর্যাপদগুলির রচনারীতিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও রহস্যময় (mystic) ভাষার পদ্ধতি (technique) ব্যবহৃত হওয়ার কারণ যে তান্ত্রিকতা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কোন শ্রেণীর তান্ত্রিকতা—হিন্দু না বৌদ্ধ? আমরা ইতঃপূর্ব্বে অনেক চর্যাপদের রচনাকারী যে শৈব-হিন্দু সন্ন্যাসী ইহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপ মত প্রকাশ করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তিব্বত ও অন্য স্থানের অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিকও চর্যাপদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে চর্যাপদের পুথিগুলি তান্ত্রিকমত, বৌদ্ধমত, বেদান্তমত ও যোগশাস্ত্রের মতের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহার ফলে চর্যাপদগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ লেখকগণের রচনার সম্মিলিত সংগ্রহ মাত্র এবং সহজিয়া মতানুবর্ত্তী কান্নভট্ট (১০ম শতাব্দী) নামক কোন ব্যক্তি "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে"র অন্তর্গত পদগুলির প্রসিদ্ধ সংগ্রহকর্ত্তা বলা যায়।

"মহাসুখ", "করুণা" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যে সব পদ রচিত হইয়াছে অথবা যেসব পদকর্ত্তা বা সিদ্ধাচার্য্য নিশ্চিত বৌদ্ধ বলিয়া সমালোচকগণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়াছেন সেই সব পদকর্ত্তা বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে। অপর পদগুলি এবং তাহাদের পদকর্ত্তাগণ অবশ্য হিন্দু। আবার উভয় শ্রেণীর পদেই উভয় মতের ছাপ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সিদ্ধাচার্য্য বলিতে নাথ-পন্থী সাহিত্যে শৈব সন্ন্যাসীকেই বুঝাইয়া থাকে এবং এই সাহিত্যে উল্লিখিত সিদ্ধাচার্য্যগণের কয়েকজন আবার চর্যাপদেরও পদকর্ত্তা বলিয়া নাম সাদৃশ্যে অনুমিত হইয়া থাকেন, যেমন কাহ্নপাদ। এই কাহ্ন আবার সরোজবজ্রের দোহাকোষের কতিপয় দোহারও রচনাকারী।

চর্যাপদগুলি কোন সময়কার রচনা? সরোজবজ্রের দোহাগুলিই বা কখন রচিত হইয়াছিল? ইহা স্থির হইয়াছে যে দোহা ও চর্যাপদ দুইপ্রকারের রচনা এবং এই উভয়ের মধ্যে দোহাগুলি চর্যাপদ অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যবর্ত্তী ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলা হয় এবং এই দোহাগুলি অপভ্রংশ ভাষার নিদর্শন বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। যে দোহাগুলি নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার রচনাকারী প্রধানতঃ সরোজবজ্র নামক এক ব্যক্তি এবং আংশিকভাবে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্ন। এই কাহ্ন আবার কতকগুলি চর্যাপদ বা সঙ্গীতের পদও রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাপদগুলির ভিতরে মায়াবাদীদিগের সংসার-বৈরাগ্য ও বামাচারীদিগের নারীসাধনার সহজিয়া

মত, এই উভয় মতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চর্য্যাপদগুলির সংগ্রহকারক কানুভট্ট একজন সহজিয়া মতানুবর্ত্তী ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদগুলির অনুবাদ, অনুলিপি ও সদৃশ বহুপদ তিব্বতি ভাষায় পাওয়া গিয়াছে। "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থখানি সম্পূর্ণাবস্থায় পাওয়া যায় নাই এবং খণ্ডিত পুথি হইলেও ইহা "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চিয়ে"র অনুরূপ পুথি ইহা বলা যাইতে পারে।

কানুভট্ট খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া স্থির হইলেও চর্য্যাপদগুলি অবশ্য সকলই এই সময়ের রচনা বলিয়া ধরা যায় না, কারণ সিদ্ধাচার্য্যগণ সকলেই এক সময়ের ব্যক্তি নহেন। নামসাদৃশ্যে কানুপা কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তিনি যোগীগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার শিষ্য ছিলেন। গোরক্ষনাথের সময় নিয়া অনেক আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত "শঙ্কর-দিগ্বিজয়" গ্রন্থে এই গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। আবার বাঙ্গালা গোপীচন্দ্রের গানেও তাহার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। ইহার ফলে খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন সময় গোরক্ষনাথের কাল বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ের সমর্থনে বহু কিংবদন্তি রহিয়াছে।

যাহা হউক চর্য্যাপদগুলি আনুমানিক খৃষ্টীয় ৮ম।৯ম শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দোহাগুলিতে (যথা সরোজবজ্রের দোহাকোষের দোহাসমূহ) অপভ্রংশ ভাষার নমুনা রহিয়াছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বের রচনা হইলে এইগুলি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দীতে রচিত হওয়ারই সম্ভাবনা। সোজা কথায় গুপ্তযুগের অবসানের পর (খৃঃ ৪র্থ।৫ম শতাব্দী) প্রথমে দোহা ও পরে চর্য্যাপদগুলি রচনার আরম্ভ এবং মোটামুটি বাঙ্গালার পালরাজগণের রাজত্বের অবসানের সহিত ইহার শেষ বলা যাইতে পারে।

ভাষাবিদ্‌গণের মতানুসারে দোহাগুলি অপভ্রংশ ভাষার নমুনা এবং চর্য্যাপদগুলির সহিত প্রাচীন মৈথিলী ও পূর্ব্ব-বিহারের ভাষা, প্রাচীন ওড়িয়া ভাষা এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। এই ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রাকৃতের পরবর্ত্তী অবস্থা অপভ্রংশ ভাষা। চর্য্যাপদগুলি অপভ্রংশেরও পরবর্ত্তী অবস্থা সূচিত করিতেছে। এই হিসাবে এগুলি খৃঃ ৮ম।৯ম শতাব্দীর রচনা বলিয়াই গণ্য করা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালাকে এক সময়ে "প্রাকৃত"ও বলিত। দোহা ও চর্য্যাপদগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার আদিরূপ বলিয়া গণ্য হওয়াতে অন্ততঃ চর্য্যাপদগুলির ভাষা বাঙ্গালার পালরাজাদিগের সময়ে বর্ত্তমান ছিল বলা যাইতে পারে।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

খনার বচন

"খনার বচন" কত পুরাতন তাহা বলা সহজ নহে। তবে ইহা অন্ততঃ চর্য্যাপদের যুগের অর্থাৎ ৮ম।১০ম শতাব্দীর হওয়া বিচিত্র নহে। ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন এইরূপই অনুমান করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় ইহা আরও পুরাতন। ইহার কারণ বলিতেছি। খনার বচনের বিষয়-বস্তুর প্রধান ভাগ কৃষিবিষয়ক। ইহাতে ছড়ার আকারে এমন সব কৃষিবিষয়ক উপদেশ রচিত হইয়াছে যাহা বাঙ্গালার কৃষির অত্যন্ত উন্নতির সময় নির্দ্দেশ করে। কৃষি সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় কৃষককুলের সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। খনার বচনে প্রাপ্ত মন্তব্যগুলি ইহার ফলে দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যক্ষ সত্যের আসন গ্রহণ করিয়াছে। খনা নামক একজন বিদুষী নারী ছিলেন এবং "বচন"গুলি তাঁহারই রচনা বলিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশ্বাস। এই মহিলার জীবনের সহিত রাক্ষস-সংশ্রব ছিল ও উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" সভার বরাহ-মিহিরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। ইহা একদিকে বাঙ্গালীর কৃষিজ্ঞানের মূলে "রাক্ষস" নামক কোন অনার্য্য জাতির দানের ইঙ্গিত এবং অপরদিকে "বচন"গুলি রচনার সময়ের সহিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের আভাস দিতেছে। খনা ও তাঁহার "বচন"গুলি সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তি প্রচলিত রহিয়াছে তাহা তেমন বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে। কিন্তু উহা যে সময়ের নির্দ্দেশ করে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে কি? মূলে কিছু সত্য ঘটনা না থাকিলে কিংবদন্তিগুলি কিসের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইবে? অন্ততঃপক্ষে উহা কোন গৌরবময় হিন্দু-যুগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কথাসাহিত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও "বিক্রমাদিত্য" নাম অথবা উপাধিযুক্ত একাধিক হিন্দু রাজা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই রাজা গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হইতে পারেন বলিয়া অন্যতম ঐতিহাসিক মত আছে। কোন কোন মতে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবই গল্পের বিক্রমাদিত্য। ইনি যে স্বনামধন্য ব্যক্তিই হউন খৃষ্টীয়

৪র্থ/৫ম শতাব্দীর দিকেই খনার গল্পের রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" সভার কথা এই দেশের জনসাধারণের নিকট অতি সুপরিচিত। মহাকবি কালিদাস "নবরত্নের" শ্রেষ্ঠতম রত্ন ছিলেন বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ-মিহির এই নবরত্নের অন্যতম রত্ন। মতান্তরে বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে *বরাহ পিতা ও মিহির পুত্র এবং উভয়েই বিক্রমাদিত্যের রাজসভার জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন।* খনা মিহিরের স্ত্রী ছিলেন এদেশের এইরূপই কিংবদন্তি। যাহারা বরাহ-মিহিরকে এক ব্যক্তি অনুমান করেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ "মিহির" কথাটি যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের একটি শাখার উপাধি অদ্যাপি রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "মিহির" কথা বা উপাধি দেখিলেই উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে আপত্তি করেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার কিম্বদন্তি অনুসারে বরাহ ও মিহির দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইঁহারা দুই বা এক ব্যক্তি হউন তাহা নিয়া আমাদের কথা নহে। খনার গল্পটি যে "গুপ্তযুগ"কে (৪র্থ—৫ম খৃঃ) নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "খনার বচন" এই সময়ে প্রথম রচিত হইয়া থাকিলে উহা চর্য্যাপদের এবং হিন্দু-বৌদ্ধ দোহাগুলিরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য বচনগুলির বর্ত্তমান ভাষা প্রাচীন ভাষার অনেক পরিবর্ত্তনের ফল সন্দেহ নাই।

রাজতরঙ্গিণীর "বঙ্গ-রাক্ষসৈঃ" কথাটি বঙ্গদেশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় এবং "খনার বচন" বাঙ্গালা ভাষাতেই পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক খনা বাঙ্গালী ঘরের নারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। খনার রাক্ষসদেশে জন্ম কথাটি বাঙ্গালা দেশকেই বুঝাইয়া থাকিবে। এই সব কারণে জনসমাজে খনা বাঙ্গালী নারী বলিয়া গৃহীত হওয়ায় আমরাও সন্দেহের সুযোগ নিয়া এই মতই গ্রহণ করিলাম। এই উপলক্ষে বরাহ-মিহির সম্বন্ধে ইহাও সন্দেহ হয় যে নামসাদৃশ্যে হয়ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম রত্নের সহিত নাম দুইটি লৌকিক কল্পনায় যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে গুপ্তযুগের ইঙ্গিত "খনার বচন" রচনা উপলক্ষে পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন বাঙ্গালার কৃষকদিগের সম্বন্ধে প্রাচীনতম ছড়া মনে করেন এবং উভয়েরই রচনাকাল ৮০০-১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া অনুমান করেন। আমাদের মনে হয় অন্ততঃ খনার বচন আরও পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ গুপ্তযুগের রচনা এবং যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নবকলেবর প্রাপ্ত

হইয়াছে। তবে ডাকের বচনের সময়ে যে খনার বচনও প্রচলিত ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দেশে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা। উত্তর ভারতে এই সম্পর্কে মৌর্য্য ও গুপ্তরাজগণের কাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং মৌর্য্যযুগে যদি বচনগুলির উদ্ভব হয় উত্তম, নতুবা অন্ততঃ ইহার পরবর্ত্তী গুপ্তযুগে (৪র্থ।৫ম শতাব্দী) খনার বচনগুলি রচিত হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। খনা লঙ্কার রাক্ষস কন্যা এবং বিক্রমাদিত্য রাজার সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতির্ব্বিদ বরাহের সমুদ্রে পরিত্যক্ত পুত্র মিহিরের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া ও রাক্ষস দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। খনার জীবনের সহিত লঙ্কা ও সমুদ্র-তীরবাসী রাক্ষসসংস্রব আর্য্যেতর যে জাতির নির্দ্দেশ দেয় তাহারা নাগজাতির ন্যায় Austric গোষ্ঠীভুক্ত হইলে হইতে পারে। বাঙ্গালাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার বহু দেশের সঙ্গেও খৃষ্ট জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে Austric জাতির উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে (যথা "বঙ্গ-রাক্ষসৈঃ" কথা)। প্রাচীন Chaldaean-গণের ন্যায় এই রাক্ষস নামীয় Austric-গণ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। তবে খনার জীবনের ঘটনা বিশ্বাস করিতে হইলে রাক্ষসগণের সমাজে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই হিসাবে বচনগুলি মূলে অষ্ট্রিক জাতির হওয়াও অসম্ভব নহে।

খনা কোন কাল্পনিক মহিলা, না সত্যই তাঁহার অস্তিত্ব ছিল? "ডাকের বচনের" ডাক ও "খনার বচনের" খনার প্রকৃত অস্তিত্ব থাকুক আর না থাকুক এই দুইজন বাঙ্গালী চিত্তের কল্পলোকে চিরদিন বিরাজ করিবে। খনার প্রথম জীবন নানা কিংবদন্তির ফলে ঘনকুহেলিকাচ্ছন্ন। এক মতে খনার রাক্ষসদেশে জন্ম ইহা বলা হইয়াছে। আবার অপর মতে খনার পিতার নাম ছিল "অটনাচার্য্য"। "আমি অটনাচার্য্যের বেটি। গণতে গাঁথতে কারে বা আঁটি॥" এই প্রবচন হইতে ইহাও মনে হয় যে খনার পিতাও খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসত সবডিভিসনে দেউলি নামে যে গ্রাম আছে সেখানে মিহির ও খনার আবাসস্থল ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বর্ত্তমান দেউলি গ্রাম চন্দ্রকেতু নামক কোন রাজার চন্দ্রপুর নামক গড়ের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার অনেক ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে খনা ও মিহির "চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রয়ে চন্দ্রপুর

নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই।" (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড)

"খনার বচন" সাধারণতঃ কৃষিতত্ত্ববিষয়ে উপদেশপূর্ণ কতকগুলি ছড়া। প্রথমে হয়ত ইহা মুখে মুখে আবৃত্তি হইয়া ক্রমে লিখিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন যুগে লিখিত ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। খনার বচনের ছড়াগুলিকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা,—

(ক) কৃষিকার্য্যে প্রথা ও কুসংস্কার, (খ) আবহাওয়া জ্ঞান, (গ) কৃষিকার্য্যে ফলিত জ্যোতিষ জ্ঞান, এবং (ঘ) শস্যের যত্ন সম্বন্ধে উপদেশ (সারতত্ত্ব ও রোগ আরোগ্যতত্ত্ব)। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) আষাঢ়ের পঞ্চদিনে রোপয়ে যে ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান ॥—খনা

(২) ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট।
সেই তিল দা'য়ে কাট ॥ ইত্যাদি।—খনা

(এই সব ছড়া খুব প্রাচীন প্রথাসমূহ নির্দ্দেশ করিতেছে।)

আবার, (৩) পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ চিরকাল ॥
তার বলদের হয় বাত।
ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে হানি ॥—খনা

এবং (৪) ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।
সবংশে মলো রাবণ-শালা ॥—খনা

এই ছড়াগুলি প্রাচীন কুসংস্কারেরই দ্যোতক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ কৃষি সম্বন্ধে কোন কুফল আশঙ্কা করিয়াই এইরূপ নিষেধাত্মক বাণী প্রচারিত হইয়াছিল।

নিম্নের কতিপয় উদাহরণ আবহাওয়া এবং জ্যোতিষিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

(১) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥—খনা

(২) কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
বলগে চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় হ'বে কাল॥--খনা

(৩) চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥--খনা

(৪) আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা॥
যদি বর্ষে মুষলধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা।
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সয় মেদিনী॥
হেসে চাকি বসে পাটে।
শস্য সেবার না হয় মোটে॥- খনা

(৫) করকট ছরকট সিংহ সুকা কন্যা কানে কান।
বিনা বায়ে বর্ষে তুলা কোথা রাখবি ধান॥—খনা

(৬) শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষ খোড় কেবল মাত্র॥

শস্য সম্বন্ধে যত্ন লইতে খনার যে সব উপদেশ চলিত আছে তাহার কিছু নমুনা এইস্থানে দেওয়া গেল।

(১) মানুষ মরে যাতে।
গাছলা সারে তাতে॥-- খনা

(২) শুন বাপু চাষার বেটা॥
বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥
দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া ভুঁই বাড়বে ঝাড়ে॥—খনা

(৩) লাউ গাছে মাছের জল।—খনা

(৪) ধেনো মাটীতে বাড়ে ঝাল।—খনা

দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালি ছন্দে খনার অনেক বচন রচিত হইয়াছে। যথা,—

(১) আমে ধান। তেতুলে বান॥—খনা

(২) অঘ্রাণে পৌটি।
পৌষে ছেউটি॥
মাঘে নাড়া।
ফাল্গুনে কাড়া॥

(৩) বামুন বাদল বান।
দক্ষিণা পেলেই যান॥—খনা

এইরূপ অসংখ্য প্রবচনে "খনার বচন" পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রবচনের ক্রমে ভাষাগত পরিবর্ত্তন হইলেও কিয়দংশ এখনও বেশ দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে। এই প্রবচনসমূহে দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ অংশের সহিত চর্য্যাপদ ও নাথপন্থী ছড়াগুলিতে ব্যবহৃত, দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষার তুলনা করা যাইতে পারে। হেঁয়ালিগুলির সরলার্থ বাহির করা কঠিন বটে। খনার বচনের অঙ্গে প্রাচীনতার যে চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত কতিপয় উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

(৪) শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি (রামাই পণ্ডিত)

"ধর্ম্ম" নামে কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে এই পুথিখানি রচিত হয়। এই পুথির রচনাকারী রামাই পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি। রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য একটি মত এই যে ইনি গৌড়ের পালরাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। ইহা সত্য হইলে রামাই পণ্ডিত ১০ম।১১শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া গৌড়ের পালরাজবংশে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তবে এই সময় দণ্ডভুক্তিতে বা বৰ্দ্ধমানে এক ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। তিনি সাময়িক-ভাবে গৌড় দখল করিয়াছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। রামাই পণ্ডিত ও তাঁহার রচিত শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিয়া অনেক তর্কের অবতারণা হইয়াছে। যাহা হউক রামাই পণ্ডিতের জীবন-কথা এইরূপ:—তিনি বাইতি জাতীয় ছিলেন। রাঢ়দেশের অন্তর্গত দ্বারকা নামক স্থানে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল এবং তিনি খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ও দারুকেশ্বর নদীতীরস্থ চম্পাইঘাট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৎসর আমাদের জানা নাই তবে তিনি খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। রাঢ়দেশের "হাকন্দ"[১] (বাঁকুড়া জেলা) নামক স্থানে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়", প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে—"ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ। ৮০ বৎসর বয়সে শুধু ধর্ম্ম-পূজা প্রচলনের অভিপ্রায়ে রামাই পণ্ডিত কেশবতী নাম্নী রমণীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্রের নাম ধর্ম্মদাস। রামাই পণ্ডিত বঙ্গীয় ধর্ম্ম-পূজার প্রধান পুরোহিত; প্রায় সকলগুলি ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যেই গ্রন্থকারগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শূন্যপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের "পদ্ধতি" এখনও মুদ্রিত হয় নাই।......রামাই পণ্ডিত যে ধর্ম্ম-পূজার প্রচলন করেন, তাহা

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশচন্দ্র সেন) গ্রন্থে আছে—"রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে মোক্ষলাভ করেন। উহা চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে অবস্থিত।" শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তনিধির মতে হুগলী জেলার অন্তর্গত বদনগঞ্জের নিকটেও "হাকন্দ" নামে একটি গ্রাম আছে।

মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত রূপ। ঐতিহাসিকগণের মতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম্মই কালে ধর্ম্মঠাকুররূপে পরিণত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের রচনার কতকগুলি অংশ অতি প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত, তাহার অনেকাংশ দুর্ব্বোধ্য। অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল অংশগুলি সম্ভবতঃ পুথিনকলকারগণ কর্ত্তৃক সহজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে।"

রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" বা "ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি"[১] নামক পুথি গোড়াতে যে তিনখানি পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি পুথির সহিত নগেন্দ্রনাথ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সংশ্লিষ্ট আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়গণ এই পুথিখানি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণ সম্পূর্ণ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতির অন্তর্গত ধর্ম্ম-পূজার মন্ত্রাদি সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন, "বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বিজয়পুর (বিজিপুর) গ্রাম নিবাসী শ্রীহরিদাস ধর্ম্ম-পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত তেরিজপাতের প্রাচীন পুথি হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মরাজের পূজার মন্ত্রাদি ও ব্যবস্থা লিখিত আছে। পুথির মোট পত্রসংখ্যা ৬০।" —বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড।

(ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি)

নিদ্রাভঙ্গ যাত্রা সিদ্ধি।
"যোগনিদ্রায় কর ভঙ্গ,
সব কর দেখ রঙ্গ,
পরিহার তব চরণে।
উল্লুক সহিত যাচ্চ,
নিদ্রাভঙ্গ
পরণাম করিব কেমনে॥
কিন্তু রামাই পণ্ডিত,
তব করভার।
নিদ্রাভঙ্গ যাত্রা সিদ্ধি, ধর্ম্মরাজার জয় জয়কার॥" ইত্যাদি।

---

(১) এই সম্বন্ধে কতক আলোচনা "ধর্ম্মমঙ্গল" আলোচনার অংশে করা গেল। ডাঃ সুকুমার সেন কতিপয় শূন্যপুরাণের পুথি পাইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মতে এই পুথি শূন্যপুরাণ, ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি বারমতি, অনিলপুরাণ প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে" "শূন্যপুরাণ" ও "ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি"কে দুইখানি গ্রন্থ হিসাবে এবং "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উভয়কে এক গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

রামাই পণ্ডিত ও তৎরচিত শূন্যপুরাণ নিয়া নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত সত্যই কি ১০ম।১১শ শতাব্দীর ব্যক্তি? সমস্ত ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতেই এইরূপ উক্তি আছে যে সম্রাট ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতী (লাউসেনের মাতা) রামাই পণ্ডিতের নিকট ধর্ম্ম-পূজার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি উত্তরবঙ্গের পালরাজবংশীয় দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। এই সম্রাট ধর্ম্মপাল কে তাহা নিয়া মতানৈক্য আছে। এই কথা মানিয়া লইলেও অবশ্য রামাই পণ্ডিতের কাল নিয়া তর্ক চলিতে পারে। আবার ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলিতে "গৌড়েশ্বর" কথাটি আছে—ধর্ম্মপালের পুত্রের অন্য কোন নাম নাই। তাহার পর প্রশ্ন রামাই পণ্ডিতের "পণ্ডিত" কথাটি লইয়া। রামাই পণ্ডিত "বাইতি" বা "ডোম" জাতীয় "পণ্ডিত" বা পুরোহিত না সত্যই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ দুইমত হইয়াছেন। কেহ কেহ "ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে বিস্তর" বাক্যটি দ্বারা এবং রামাই কর্ত্তৃক তৎপুত্র ধর্ম্মদাসকে ডোম হইবার অভিশাপের গল্পটির সাহায্যে রামাইকে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষী। আবার অনেকে রামাইকে ডোমজাতীয় ব্রাহ্মণ বা "ডোম-পণ্ডিত" ভিন্ন অধিক কিছু মনে করেন না।

শূন্যপুরাণ পুথির অকৃত্রিমতা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। শূন্যপুরাণের অন্যতম আবিষ্কারক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুথির মধ্যে বহুব্যক্তির হস্তচিহ্নের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তৎসম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুথিখানির হস্তলিপি ও ভাষাদৃষ্টে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ যে অপর কবির রচনা তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের অত্যাচারঘটিত বিবরণ, যথা—"নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অংশটি রামাই পণ্ডিত রচিত নহে, উহা সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের জনৈক কবি কর্ত্তৃক (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) রচিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। এই পুথির ভাষা স্থানে স্থানে খুব আধুনিক আবার স্থানে স্থানে খুব দুর্ব্বোধ্য, জটিল ও প্রাচীন। পুথিখানিতে অভিসন্ধিমূলক হস্তচিহ্ন রহিয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। "শূন্যপুরাণ" নামে অপর দুইখানি পুথিতে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশটি নাই।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত শূন্যপুরাণের পুথিখানিতে ভাষার পরিবর্ত্তন পুথি নকলের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার তাহা বলা কঠিন। কঠিন শব্দই সহজ হইয়াছে না সহজ শব্দ কঠিন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আমরা অক্ষম।

রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র ছিল, যথা—মাধব, সনাতন, শ্রীধর এবং ত্রিলোচন। ময়না নামক স্থানের যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক ধর্ম্মঠাকুরের ইহারা বংশানুক্রমিক পুরোহিত। ইহারা ৩৬ জাতির তাম্রদীক্ষা দিয়া থাকেন বলিয়া গৌরব করেন। এই পৌরহিত্য সত্ত্বেও এবং রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় প্রায়ই নামের সহিত "দ্বিজ" কথাটি যুক্ত থাকিলেও রামাই পণ্ডিতের দ্বিজত্ব এখন অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শূন্যপুরাণে ৫৬টি কাণ্ড। ইহার মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে রচিত এবং অপরগুলি ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ও রাজা হরিচন্দ্রের এবং অপরাপর ধর্ম্মের সেবকগণের ত্যাগের কাহিনীতে পূর্ণ।

সুধীবর্গের মতে আনুমানিক খৃঃ ১২শ শতাব্দীর কবি ময়ূরভট্ট ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে "হাকণ্ড-পুরাণ" নামক একখানি কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি খৃঃ ১১শ শতাব্দীর লোক। এই ময়ূরভট্টকে নিয়া এখন মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক নগেন্দ্রনাথ বসু এই হাকণ্ড-পুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ একই গ্রন্থ মনে করিয়াছিলেন। ময়ূরভট্টের রচিত হাকণ্ড-পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই দুই পুথি স্বতন্ত্র কেননা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শূন্যপুরাণের ধর্ম্মপূজার কথার সহিত রাজা হরিচন্দ্রের কাহিনী জড়িত এবং ময়ূরভট্টের হাকণ্ড-পুরাণ পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলগুলির আদর্শবিধায় লাউসেনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং কাহিনীর মিল নাই।

শূন্যপুরাণে নানা কাহিনী জড়িত আছে এবং পরবর্ত্তী যোজনায় "নিরঞ্জনের রুষ্মা"র কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী অপর ২।১খানি ধর্ম্মপূজার পদ্ধতির মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ সেন উল্লেখ করিয়াছেন।

শূন্যপুরাণ বৌদ্ধদের পুথি এবং ধর্ম্মঠাকুর সংগুপ্ত বুদ্ধ ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ডাঃ সেন প্রমুখ অনেক পণ্ডিতই তাহা মানিয়া লইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাতে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। পুথিখানিতে বৌদ্ধ ছাপ থাকিতে পারে, ধর্ম্মঠাকুরের প্রসঙ্গে বুদ্ধের কথা

মনে হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মঠাকুরও বুদ্ধ নহেন এবং শূন্যপুরাণও বৌদ্ধ পুথি নহে। ধর্ম্মঠাকুর নানা স্থানে নানা নামে পরিচিত কোন লৌকিক দেবতা। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের সহিত "শঙ্খপাবনের" শঙ্খ ও ধর্ম্মঠাকুরের "ধর্ম্ম" কথাটি যুক্ত করা সমীচীন নহে। অহিংসামূলক দুই একটি কথা কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বে কিছু বৌদ্ধ মতের সাদৃশ্য ধর্ম্মঠাকুরকে বুদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নহে। "নিরঞ্জনের রুষ্মা"র মধ্যেও বৌদ্ধগন্ধের আবিষ্কার সমর্থনযোগ্য নহে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে পুনরায় এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাইবে। শূন্যপুরাণের "শূন্য" কথাটি বৌদ্ধ "শূন্য"বাদ এবং শৈবতান্ত্রিক "বিন্দু"বাদ উভয়ই বুঝাইতে পারে। "শূন্য"কে "বিন্দু" মনে করিলে ক্ষতি কি ? এই সব শব্দের ব্যাখ্যা নানারূপই হইতে পারে সুতরাং "শূন্য" শব্দ দেখিলেই বৌদ্ধ গন্ধ আবিষ্কারের কোন অর্থ হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালায় শূন্যবাদী হীনযানী বৌদ্ধগণের পরিচয় নাই। যাহা আছে তাহা দেবতার পরিবর্ত্তে বোধিসত্ত্ববিশ্বাসী তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণ সম্বন্ধে, বলা যাইতে পারে। শূন্যপুরাণের কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

ছিষ্টি-পত্তন।

(ক) "নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্নচিন।
রবি শশী নহি ছিল নহি রাত্তি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরুমন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবার দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভূর আর আছে কেহ॥
রিষি যে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পর্ব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
পূণ্য থল নহি ছিল নহি ছিল গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর নহি সুরনর।
বম্ভা বিষ্ণু ন ছিল ন ছিল মহেশ্বর॥
বারবরত নহি ছিল রিষি যে তপসী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বারানসী॥

পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥
দশ দিকপাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল যমেব তাড়ন ॥

* * * *

শ্রীধর্ম্ম চরণারবিন্দে করিয়া পণতি।
শ্রীযুত রামাই কঅ শুনরে ভারতী ॥"—শূন্যপুরাণ।

শূন্যপুরাণের বহুস্থানে পুথি নকলকারীগণ হস্তক্ষেপ করাতে মূল পুথি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত অংশের বানান প্রাকৃত মতানুযায়ী হইলেও ভাষা যে তত প্রাচীন নহে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাও বেদ এবং হিন্দু পুরাণের অনুকরণ মাত্র। প্রথমে কিছু ছিল না পরে ক্রমে সব সৃষ্টি হইল এইরূপ মত পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মমতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত গদ্য অংশের ভাষা যে খুব পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চনা-পাবন।

(খ) "দুআরিরে ভাই ধর গিআ তুম্মারে দণ্ডর নন্দন।
পচ্ছিম দুআরে দানপতি যাঅ।
সোণার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে।
বসুআ আপুনি আইল সেইত বরণর চনা ॥
শেতাই পণ্ডিত চারিশঅ গতি।
চন্দ্রকোটাল নাহি ভাঙ্গ এ চনার বিবেচনা ॥" ইত্যাদি।

—শূন্যপুরাণ।

উল্লিখিত দুর্ব্বোধ্য অংশে শেতাই পণ্ডিত ও চন্দ্রকোটাল বোধ হয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী সশিষ্য দ্বারপণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রমশিলার সঙ্ঘারামের নাম করা যাইতে পারে। চন্দ্রকোটাল কে ছিলেন তাহা নিয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে (নগেন্দ্রনাথ বসু—ময়ূরভঞ্জ সার্ভে রিপোর্ট) তিনি চন্দ্রসেনা ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রগোবি আবার কাহারও মতে (Dr. Burgess) তিনি দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর।

(গ) "হে ভগবান বারভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি সেবক হব.সুখি ধামাৎ কল্লি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি।"—শূন্যপুরাণ (পৃঃ ৭০)

শূন্যপুরাণে কিছু কিছু প্রাচীন গদ্যের নমুনা রহিয়াছে। উপরোক্ত অংশ প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্যের উদাহরণ কি না তাহা বিবেচ্য। অবশ্য এই গদ্যে পরবর্ত্তী যোজনা (বা ইহার পরিবর্ত্তন) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের অবকাশ আছে।

শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশটি অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলোদ্দিপক। অংশটি অবশ্য পরবর্ত্তী যোজনা ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। যথা,—

(ঘ) জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘরবেদি
কর লয় চুন।
দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাহি পায়
সাঁপ দিয়া পুরায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর দিলঅ কয় চুন—
দখিন্যা মাগিতে যায় যার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিস পাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দশবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস॥
বেদ করে উচ্চারণ বেরাাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপী মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।

চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল মুলপানি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইলা যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলে বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নুর।
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়া ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

—শূন্যপুরাণ।

উপরি লিখিত অংশে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার ও জাজপুরে ব্রাহ্মণগণের উপর মুসলমানগণের আক্রমণে ধর্ম্মপূজকগণের আনন্দ প্রকাশ পরবর্ত্তী যোজনা হইলেও ইহা হয়ত কোন সত্য ঘটনার সন্ধান দিতেছে। এই হিসাবে ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্যও থাকিতে পারে। হিন্দু দেব-দেবীগণের সহিত মুসলমান পীর-পয়গম্বর প্রভৃতির পাশাপাশি যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ভণিতায় রামাই পণ্ডিতের বেনামীতে কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী) অলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সন্ধানও

দিয়াছেন। নতুবা হিন্দু দেব-দেবী ও মুসলমান পীর-পয়গম্বরের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইত না।

(ঙ) রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতির" ভাষা তত পুরাতন বোধ হয় না। এই গ্রন্থ মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কেন না ইহাতে "শূন্যবাদ" প্রচারিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধ মত "মহাযানী" বলিয়াও যুক্তি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি "শূন্যবাদ" মহাযানী মত নহে—ইহা হীনযানী মত। সুতরাং মহাযানী মতের পোষক গ্রন্থে ইহার প্রচার সম্ভবপর নহে। মোট কথা, এই পুথি হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে অনেক পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে। শৈব মত অনেক পরিমাণে শূন্যবাদের পরিপোষক। ইহাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতির স্তব।

* * * *

"আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোঁসাঞি,
করপদ নাস্তি কায়া।
নাহিক আকার, রূপগুণ আর
কে জানে তোমারি মায়া॥
জন্ম জরা মৃত্যু, কেহ নাহি সত্য,
যোগীগণ পরমাধ্যায়।"—ইত্যাদি।
শূন্যমূর্ত্তি দেবশূন্য অমুক[১] ধর্ম্মায় নমঃ।—ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতি।

শূন্যপুরাণে বর্ণিত ধর্ম্ম, আদ্যা, শঙ্খ ও শিব কোনটিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইঙ্গিত করে না। ধর্ম্ম ও শঙ্খ কথা দুইটি হিন্দু মতের গ্রন্থাদিতে প্রচুর রহিয়াছে। "বুদ্ধ", "ধর্ম্ম" ও "সংঘ"—বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই ত্রিরত্নের বা পবিত্র বাক্যত্রয়ের মধ্যে "ধর্ম্ম" ও "সংঘে"র দ্যোতক রূপে শূন্যপুরাণের ধর্ম্মঠাকুরকে ও শঙ্খ-পাবনের শঙ্খকে গ্রহণ করার কোনই হেতু দেখা যায় না। এইরূপ শক্তিদেবী আদ্যা হিন্দুতান্ত্রিক মতে বিশেষ পূজনীয়া এবং চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা। অনেক হিন্দুতন্ত্র গ্রন্থে আদ্যা দেবীর উল্লেখ আছে।

শূন্যপুরাণে শিবঠাকুরের কথাও আছে। ইহা আকস্মিক নহে। নির্গুণ ও সগুণ শিবের অনেক পরিচয়ই এই ধর্ম্মঠাকুর উপলক্ষে পাওয়া যাইবে।

১। বিভিন্ন ধর্ম্মরাজের কাহারও নাম এইখানে বসিতে হয়।

অবশ্য শিবঠাকুরের কথা শূন্যপুরাণে পরবর্ত্তী যোজনা অথবা কাহিনীতে প্রসঙ্গ-ক্রমেও উল্লিখিত হইতে পারে। কিন্তু শৈব ও বৌদ্ধচিহ্নযুক্ত ধর্ম্মঠাকুর প্রথমে শিবঠাকুরের প্রতীক কি না তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব চিহ্নও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই স্থানে শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "শিবের গানের" কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। এই শিব কৃষি-দেবতা। মহাযানী বৌদ্ধগণ শিবঠাকুরকে বুদ্ধ অপেক্ষা নিম্নস্থান দিলেও মান্য করিতেন। ইহা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত। তিনি এবং অনেক সুধীজন ধর্ম্মঠাকুরকে বুদ্ধের সহিত অভিন্ন কল্পনাও করিয়াছেন। আমাদের মতে, মহাযানী বৌদ্ধগণ শিবঠাকুরকে সব সময় বুদ্ধের নিম্নে স্থান দিয়া থাকেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বামী প্রণবানন্দের মতে কৈলাশ পর্ব্বতে শিব-দুর্গার নিম্নে বোধিসত্বগণ বিরাজ করেন। তিব্বতি বৌদ্ধগণের এই বিশ্বাসের কথা তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধ এক এই অভিমতও আমরা সমর্থন করি না।

শিবের গান।

"আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥

*   *   *   *

ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোসাঞি কেওদাবাঘের ছড়॥"—ইত্যাদি।

—শিবের গান, রামাই পণ্ডিত।

শূন্যপুরাণে "শিবের গান" কেন অন্তর্ভুক্ত হইল তাহা আলোচনার বিষয়। শিবের গান অথবা শিবের কথার অবতারণা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। তবে শূন্যপুরাণের শিবের গানের ভাষাদৃষ্টে ইহাকে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের রচনা বলিয়াই বোধ হয়। এই অংশ "নিরঞ্জনের রুষ্মার" ন্যায় হয়ত পরবর্ত্তীকালের যোজনা। কৃষি-দেবতা হিসাবে শিবঠাকুরের কথার অবতারণা "শিবায়ন" নামক পুঁথিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক সেই আদর্শে শিবঠাকুরকে শূন্যপুরাণে অবতারণা

পরবর্ত্তীকালের শিবায়নের প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া ধর্ম্মঠাকুর ও শিব অভিন্ন হইলে অথবা ধর্ম্মঠাকুরের উপর শিবঠাকুরের প্রভাব পড়িলে শূন্যপুরাণে তাহার উল্লেখ থাকা সম্ভব। ধর্ম্মঠাকুর ও শিবঠাকুরের গান যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল তাহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। সুতরাং শূন্যপুরাণে চাষ-বাসের মধ্য দিয়া উভয় দেবতার একত্ব বা নৈকট্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

"শূন্যপুরাণ" ও ইহার কবি রামাই পণ্ডিতকে নিয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি রামাই পণ্ডিতের সময় সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কাব্যের উল্লেখ মানিয়া লইয়া "শূন্যপুরাণ" ও "ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতি"কে "আদিযুগের"ই অন্তর্গত করা গেল।

অষ্টম অধ্যায়

গোপীচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয়

"গোপীচন্দ্রের গান" ও "গোরক্ষ-বিজয়" (বা "মীন-চেতন") নামক দুইখানি প্রাচীন পুথি "নাথসাহিত্য" বা "নাথগীতিকা" নামে পরিচিত। "গোপীচন্দ্রের গান" যে বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত তাহা গোপীচন্দ্র, গোবিচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র নামক বাঙ্গালার কোন তরুণ রাজার সাময়িক সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে। এই গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম রাজা মাণিকচন্দ্র এবং মাতার নাম রাণী ময়নামতী। কোন কোন মতে রাজা মাণিকচন্দ্রের রঙ্গপুরের অন্তর্গত "পাটিকা" (বর্ত্তমান নাম পাটিকাপাড়া, থানা জলঢাকা) নামক স্থানে রাজধানী ছিল। আবার মতান্তরে কেহ কেহ বলেন "পাটিকা" ত্রিপুরার অন্তর্গত "পাটিকারা" নামক একটি পরগণা। ইহারই পার্শ্বে "মেহারকুল" নামক পরগণা। রাজা মাণিকচন্দ্র ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন মাণিকচন্দ্র মেহারকুল পরগণার রাজা ছিলেন। ময়নামতীর নামে ত্রিপুরা অঞ্চলে একটি পাহাড় এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজা মাণিকচন্দ্রের কিছু ভূসম্পত্তি উত্তরবঙ্গের পাল-রাজত্বাধীনে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে অনেক অজ্ঞাতনামা কবি প্রাচীনকালে ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। এই ছড়াগুলি শুধু যে "গোপীচন্দ্রের গান" নামে পরিচিত তাহা নহে। "ময়নামতীর গান", "মাণিকচন্দ্র রাজার গান", "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" প্রভৃতি নামেও ইহা পরিচিত। ছড়াগুলি একই কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন কবির রচনা। নাথপন্থী যোগী জাতির প্রিয় রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী গাহিয়া এক শ্রেণীর লোক সেকালে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত। এইরূপ নাথপন্থী যোগী জাতির মধ্যে প্রচলিত সাধু গোরক্ষনাথের চিত্তসংযমের অপূর্ব্ব কাহিনী "গোরক্ষ-বিজয়" ও "মীন-চেতন" উভয় নামেই রচিত হইয়া গীত হইত এবং লোকরঞ্জন করিত।

এই রাজা মাণিকচন্দ্রের ও গোবিন্দচন্দ্রের সময় নির্দ্ধারণ নিয়া নানারূপ আলোচনার সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-ভারতের তিরুমলয়ে প্রাপ্ত শিলালিপি (১০২৪ খৃঃ) এই রাজাদ্বয়ের সময় নির্দ্ধারণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

উত্তর বাঙ্গালার রাজা প্রথম মহিপালের সমসাময়িক, দক্ষিণ-ভারতের চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোলের কাল ১০৬৩—১১১২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। তিরুমলয়ে প্রাপ্ত রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি বরেন্দ্রভূমির রাজা মহিপালকে এবং গোবিন্দচন্দ্র নামে বঙ্গের কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা মাণিকচন্দ্র একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" শীর্ষক একটি প্রাচীন ছড়া মন্তব্যসহ এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে (Vol. 1, Part III, 1878) প্রথম জনসাধারণে প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে তৎপূর্ব্বে বুকানান সাহেব কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। গ্রীয়ারসন সাহেবের উৎসাহের ফলে এই দেশের সুধীবর্গ নাথপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে যে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেন তাহাতে বাঙ্গালা প্রদেশ ও ইহার বাহিরে গানগুলির বিভিন্ন আকারে অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার একটি মোটামুটি তালিকা প্রদত্ত হইল:

(১) মাণিকচন্দ্র রাজার গান (১১শ-১২শ শতাব্দী)

(গ্রীয়ারসন সঙ্কলিত)

(২) গোবিন্দচন্দ্রের গীত (পুথি ময়ূরভঞ্জের যোগী জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত ; দুইশত বৎসরের প্রাচীন পুথি—১১শ-১২শ শতাব্দী)

(৩) ময়নামতীর গান (রঙ্গপুর নীলফামারি হইতে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)

(৪) রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গান—

১১শ শতাব্দীর একটি প্রাচীন ছড়া হইতে সম্ভবতঃ ১৭শ শতাব্দীর কবি দুর্ল্লভ মল্লিক কর্ত্তৃক রচিত। সুতরাং ইহা পরবর্ত্তী কালের একটি সংস্করণ মাত্র। এই গানটি শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

(৫) ময়নামতীর গান—

শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক চুঁচুড়ার কোন বৈষ্ণবীর নিকট পুথিটি প্রাপ্ত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা দুর্ল্লভ মল্লিকের প্রাচীন গানের নূতন সংস্করণ।

(৬) গোপীচাঁদের পাঁচালী—

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের ভবানী দাস রচিত ও মুন্সী

আব্দুল করিম কর্তৃক ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে সংগৃহীত। কবির চারিখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

(৭) "যোগীর পুথি" বা "ময়নামতীর পুথি" (গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস)—

রঙ্গপুর সিন্দুরকুসুম গ্রামনিবাসী সুকুর মহম্মদ রচিত ও উত্তর-বঙ্গের রঙ্গপুর জেলায় সংগৃহীত।

(৬) ও (৭) নং পুথি দুইখানি "গোপীচন্দ্রের গান" নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(৮) গোরক্ষ-বিজয় বা মীন-চেতন (সম্ভবতঃ ভিন্ন নামে একই পুথি)—

ইহা কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামাদাস সেন ও সেখ ফয়জুল্লার ভণিতাযুক্ত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে লেখক একমাত্র সেখ ফয়জুল্লা। এই ব্যক্তি পুথি-খানির সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। ইহার সময় সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দী। গোরক্ষ-বিজয় পুথিখানির আধুনিক সম্পাদক মুন্সী আব্দুল করিম ও প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

এক সময়ে গোপীচন্দ্রের গানের জনপ্রিয়তা সমধিক ছিল। এই গানের ভারতব্যাপী খ্যাতির প্রমাণ এই যে কবি লক্ষণদাস হিন্দী ভাষায় এই গান রচনা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশেও গোপীচন্দ্রের গানের প্রচলন আছে। এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বিবরণে জানা যায়—"শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিবিধ কবির রচিত "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।" (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড)।

এখন নাথপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম সমস্যা—নাথপন্থী সাহিত্য কোন যুগের সাহিত্য? ইহা আদিযুগের না মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্তর্গত? দ্বিতীয় সমস্যা—ইহার শ্রেণীবিচার লইয়া। এই সাহিত্য চর্য্যাপদের সমগোত্রীয়—না ধর্ম্মমঙ্গল, ভাটগান, শিবায়ন অথবা পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার লক্ষণাক্রান্ত? তৃতীয় সমস্যা—গোবিন্দচন্দ্র, পাল রাজাদের কেহ না অপর কোন বংশীয়? এই রাজা পালবংশীয় হইলে অন্ততঃ গোপীচন্দ্রের গান পালবংশীয় কোন রাজার স্তুতিবাচক গান নহে তো? চতুর্থ সমস্যা -বাঙ্গালাদেশের এই গানের এত ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তার কারণ কি? ইহা কি তবে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজা হিসাবে বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক? এই চারিটি সমস্যা সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

নাথ-গীতিকা চর্য্যাপদ, ডাকের বচন, খনার বচন ও শূন্যপুরাণের সহিত সময়ের দিক দিয়া নাথ-গীতিকাগুলিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় কি না অর্থাৎ আদিযুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত কি না এরূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। নাথ-গীতিকার সহিত তুলনীয় অপর রচনাগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ইহাদের বিষয়-বস্তু পুরাতনতো বটেই, তবে ইহা ছাড়া রচনাকারীদের সময় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সঠিক কিছু জানা যায় না। অবশ্য যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হইলেও কবি ও তাঁহার রচনা মূলতঃ প্রাচীন বলিয়া মনে হইলে তদনুরূপ গ্রহণ করিতে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। কোন প্রচলিত ছড়ার কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলে ইহার তিনটি দিক লক্ষ্য করা যাইতে পারে : উহার ভাব এবং বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনাকারী। ভাষা ও রচনাকারীর সময় লক্ষ্য করিয়া কোন প্রাচীন পুথির সময় নির্দ্দেশ করিবার আমরা অধিক পক্ষপাতী।

বিষয়বস্তু ও তাহার ভাব যদি পুরাতন হয় আর কবি যদি আধুনিক হয় তবে সেইরূপ রচনাকে আধুনিকই বলিব। রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও বিষয়বস্তু পুরাতন কিন্তু এখন যদি কোন কবি এই পুথিগুলি লেখেন তবে এই রচনাগুলিকে অবশ্য আধুনিকই বলিব, পুরাতন বলিব না।

আবার ভাষা ও কোন সময়ের ইঙ্গিত অথবা রচনার কোন বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর (technique) সাহায্যেও কোন পুথি পুরাতন না নবীন তাহা সাব্যস্ত হইতে পারে। কোন রচনার বিষয়বস্তু পুরাতন বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও অনেক সময় তাহার মূল রচনাকারী কে তাহা সঠিক জানা যায় না। হয়ত এই সম্বন্ধে আমাদের শুধু কিংবদন্তী সম্বল। তেমন রচনা ছড়ার আকারে যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে নব কলেবর প্রাপ্ত হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় তেমন রচনাকে (যেমন "খনার বচন" ও "ডাকের বচন") আমরা পুরাতন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিব।

"নাথ-গীতিকা" প্রথমে কোন্ কবির রচনা তাহা আমরা জানি না। ইহা প্রাচীন ছড়া হিসাবে কোন প্রাচীন কবির নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। যোগী বা জুগী জাতীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক ইহা সুদীর্ঘকাল যাবৎ শুধু মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। এক সময় যোগীগণ এই গান দ্বারে দ্বারে গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। গ্রীয়ারসন সাহেব লোকমুখে এইরূপ গান শুনিয়া উহা সংক্ষেপে কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই গান প্রাচীনই মনে হয়। কিন্তু যে আকারে অধিকাংশ ছড়াগুলি আমরা এখন পাইতেছি তাহার ভাষা প্রাচীনতা

ও আধুনিকতা মিশ্রিত। বহিরঙ্গে যত আধুনিকতাই থাকুক না কেন, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ গীতিকাগুলিকে প্রাচীন বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। এই গীতিকাগুলির কোন কোনটির সহিত নানা কবির নাম জড়িত আছে। এই সব কবি খুব পুরাতন নহেন, সুতরাং আদিযুগে তাঁহাদিগকে ধরা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে "রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গানের" কবি দুর্লভ মল্লিকের সময় খৃ: ১৭শ শতাব্দী বলিয়া ধার্য্য হওয়াতে তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এইরূপ "গোপীচাঁদের পাঁচালী" নামক ছড়ার কবি ভবানী দাসের কালও খৃ: ১৮শ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আবার "গোরক্ষ-বিজয়" নামক ছড়ার রচয়িতা চারি কবির মধ্যে একজন মুসলমান (সেখ ফয়জুল্লা) এবং তিনিই প্রধান কবি। এইরূপ "যোগীর পুথি" ও "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের" রচয়িতা সুকুর মহম্মদও একজন মুসলমান কবি। ইহা বিস্ময়ের বিষয়ও বটে। অবশ্য ইহা মধ্যযুগের শেষের দিকে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং সৌহার্দ্দ্যের লক্ষণ। মুসলমান কবি সেখ ফয়জুল্লা ব্যতীত "গোরক্ষ-বিজয়" গীতিকার অপর তিনজন কবিই হিন্দু এবং তাঁহাদের নাম কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস ও শ্যামাদাস সেন। ডা: দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত—সেখ ফয়জুল্লা খৃ: ১৫শ শতাব্দীর ব্যক্তি।

যদি উল্লিখিত কবিগণ গোবিন্দচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয় পুথিদ্বয় রচনা করিয়া থাকেন তবে পুরাতন বিষয়বস্তু ও ভাব থাকা সত্ত্বেও এই পুথিগুলিকে আদিযুগের বলিবার উপায় নাই। এই হিসাবে পুথিগুলিকে মধ্যযুগের অন্তর্গত করিতে হয়। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ উল্লিখিত কবিগণ আদি রচনাকারী নহেন, শুধু সংগ্রাহক মাত্র। এই প্রাচীন কাহিনীসমূহ ছড়ার আকারে বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল। ইহাদের মূল কবি-গণের নাম পর্য্যন্ত এখন লোপ পাইয়া গিয়াছে। অনেক কাল পরে অন্য কবিগণ এই ছড়াগুলির পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন এবং সময়োচিত সংস্কার সাধন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম হইতেই ইহা শুধু মুখে মুখে রচিত ও গীত হইত কি না তাহা সঠিক বলা কঠিন। অনেক পরবর্ত্তীকালে হিন্দু ও মুসলমাননির্ব্বিশেষে এই ছড়াগুলির কবি ও গায়কগণ এইগুলি কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। ইহার ফলেই বিভিন্ন গ্রাম্য কবির নাম সংযোগে ছড়াগুলির অন্ততঃ কিয়দংশ লিখিত আকারে আমরা পাইতেছি। যাহা হউক, এই সব বিচার করিয়া এই

ছড়া বা গীতিকাগুলিকে আমরা আদি যুগের অর্থাৎ ১০ম-১১শ শতাব্দীর রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের যুগের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, কারণ আবিষ্কৃত নাথসাহিত্যের কবিগণ রচনাকারী বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুরাতন গানগুলির সংগ্রাহক ও সংস্কারক মাত্র, মূল কবি নহেন।

যে শৈব-সন্ন্যাসীদের উপলক্ষে বা সংস্রবে চর্য্যাপদ, দোহা, শূন্যপুরাণ ও ডাকের বচন রচিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যেই নাথ-গীতিকারও প্রচলন ছিল। যোগী সম্প্রদায় এই শৈব-সন্ন্যাসীদিগকে মানিয়া চলিতেন। সম্প্রদায়গত ব্যাপারে নাথপন্থী সাহিত্যের সহিত চর্য্যাপদ ও শূন্যপুরাণ প্রভৃতির ঐক্য আছে। কতকগুলি শৈব-সন্ন্যাসী বা সিদ্ধাচার্য্যের নাম নাথ-সাহিত্যে ও চর্য্যাপদে সমভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য্য গোরক্ষনাথ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ, রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। "গোরক্ষ-সংহিতা" ইহার অন্যতম উদাহরণ।

গোরক্ষনাথের কাল নিয়া নানারূপ বিতর্ক আছে। খৃঃ ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন শতাব্দী নির্দ্ধারণ করেন। "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থে গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। উহা খৃঃ ৮ম শতাব্দীর রচনা। অথচ গোপীচন্দ্রের সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে গোরক্ষনাথের সময় খৃঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী ধার্য্য না করিয়া উপায় নাই।[১] ইহার সুমীমাংসা কবে হইবে তাহা আমাদের জানা নাই।

নাথপন্থী সাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্ব ও তান্ত্রিকতার সহিত চর্য্যাপদসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব ও তান্ত্রিকতার অপূর্ব্ব মিল রহিয়াছে। অথচ নাথ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু চর্য্যাপদের বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নাথপন্থী সাহিত্য কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাহিনীমূলক কতিপয় গীতিকথা। অপরপক্ষে চর্য্যাপদগুলি দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গানের বা ছড়ার সমষ্টিমাত্র। নাথ-সাহিত্যের মূল কবিগণের নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু চর্য্যাপদ রচনাকারী সন্ন্যাসীশ্রেণীর কবিগণের নাম প্রত্যেক চর্য্যাপদের ভণিতায় রহিয়াছে। কাহিনীমূলক গানহিসাবে এতদ্দেশে প্রচলিত ভাটব্রাহ্মণগণ রচিত গান সমূহ এবং পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত গীতিকাসমূহের প্রচুর সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাথপন্থী সাহিত্য ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় বিষয়বস্তু হিসাবে প্রেমের

(১) তিব্বতের লামা তারানাথের (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) মতে চন্দ্রবংশীয় গোপীচন্দ্র নামে এক রাজার চাটিগ্রামে রাজধানী ছিল।

প্রাধান্য গীতিকাশ্রেণীর সাহিত্যের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে। আবার ধর্ম্মমঙ্গল ও শিবায়নজাতীয় কাব্যের সহিত নাথ-সাহিত্যের যে মিল রহিয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। শিবঠাকুর উপলক্ষে অথবা শিবঠাকুরের প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য রচিত এই সাহিত্যগুলির গল্পাংশে পার্থক্য থাকিলেও ধর্ম্মগত ও দেবতাগত আদর্শের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঐক্য বিরাজ করিতেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিবদেবতাকে কেন্দ্র করিয়াই যেন গল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। "মহিপালের গান" নামে পরিচিত উত্তর-বঙ্গের একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত পালবংশীয় রাজা প্রথম মহিপালের নামের সহিত জড়িত ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। এই গান আর এখন প্রচলিত নাই এবং থাকিলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। "মহিপালের গান" ও "গোপীচন্দ্রের গান" প্রসিদ্ধ রাজাগণের কীর্ত্তিপ্রকাশক হিসাবে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে হয়।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র কোন বংশীয় ছিলেন ইহা নিয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি পাল রাজাদের সম্পর্কিত ছিলেন। আবার অপর মতানুসারে তিনি চন্দ্ররাজগণের কেহ ছিলেন। "বঙ্গে" (দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে) "চন্দ্র"বংশীয় রাজাদিগের অস্তিত্ব ও প্রতাপের অনেক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত মতই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু "চন্দ্র" উপাধিধারী রাজাগণের জাতি কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। এক প্রকার মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। গোপীচন্দ্রের গানের "বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রিকুল হেলায় হারামু" উক্তিটিতে অবশ্য গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষত্রিয়ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বোধ হয় সেকালে যে কোন জাতির রাজা মাত্রেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেন। ইহার ঐতিহাসিক সমর্থনও রহিয়াছে। আবার "বেনিয়াকুল" কথাটিতে ইহারা বণিক (সম্ভবতঃ গন্ধবণিক) কুলসম্ভূত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয়। আর একটি উক্তি উক্ত গীতে এইরূপ আছে, যথা—"এক ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বলি"। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের এই উক্তি তাঁহার "তাম্বুলি" (এক শ্রেণীর বৈশ্য) জাতীয় কোন ভ্রাতার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে গোবিন্দচন্দ্রও তো এই জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র রাণী অদুনা ও রাণী পদুনার পিতা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে আর এক সমস্যা দেখা দেয়। এই হরিশ্চন্দ্র "রাজবংশী জাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অথচ সাভারের নিকবর্ত্তী কোণ্ডাগ্রামবাসী ইঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ নিজেদিগকে "মাহিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা

পাইয়াছেন যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রও জাতিতে রাজবংশী ছিলেন। যাহা হউক প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও এই জাতিগত প্রশ্নটি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। অবস্থাদৃষ্টে আমাদের কিন্তু মনে হয় চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র জাতিতে বণিক (গন্ধবণিক) সুতরাং বৈশ্য ছিলেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। একটি কথা এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের বিবাহের প্রথা বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় তত কঠোর ছিল না। তৎকালে সম্ভবতঃ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিল। ইহা কতকটা বৌদ্ধপ্রভাবেরও ফল কি না জানি না। তবে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। এই সব কারণে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সঠিক জাতি নির্ণয়ে জটিলতার উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র যদি উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ পাল রাজাদের বংশীয় না হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্ররাজাদের কোন আত্মীয় হইয়া থাকেন তবে নাথ-সাহিত্যের গানগুলি পাল-রাজাদের স্তুতিবাচক গান নহে। তাঁহাদের উপলক্ষে আর একপ্রকার গানের সংবাদ জানা যায়। এই গানের নাম "মহীপালের গীত"। বৃন্দাবন দাসের (জন্ম ১৫০৭ খৃষ্টাব্দ) চৈতন্য-ভাগবতে পালরাজা মহীপালের স্তুতিবাঞ্জক গানের উল্লেখ আছে। কথাটি হইতেছে—

"যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত।
যাহা শুনিতে যত লোক আনন্দিত॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, বৃন্দাবন দাস।

এই "মহীপালের গীতের" কথা মদনপালের তাম্রশাসন পাঠেও অবগত হওয়া যায়। এই গান এখন পর্য্যন্ত উদ্ধার করা হয় নাই। অথচ আমরা ইহার সম্বন্ধে শুনিয়া আসিতেছি যে রঙ্গপুর ও দীনাজপুর জেলাদ্বয়ের অভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে নাকি এই গান এখনও গীত হইয়া থাকে, তবে এই উক্তির পক্ষে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ বা এই গানের নিদর্শন আমাদের গোচরীভূত হয় নাই। "ধান ভানতে শিবের গীত" বলিয়াও একটি প্রাচীন উক্তি আছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "মহীপালের গীত" কথাটিই পরিবর্ত্তিত হইয়া "শিবের গীত" কথাটি প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করা যায় না।

নাথ-গীতিকার মধ্যে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে এত ছড়াই বা রচিত হইল কেন এবং এই বিষয়টি নিয়া সুদূর মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সাড়া পড়িয়া গেল কেন? গোপীচন্দ্র খুব বড় রাজা ছিলেন এবং সেইজন্যই গানগুলি ভারত-

ব্যাপী খ্যাতি পাইয়াছে এরূপ একটি মত থাকিলেও আমরা ইহার সমর্থন-যোগ্য কোন ভাল প্রমাণ পাইতেছি না। গোবিন্দচন্দ্র যে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন তাহা বাঙ্গালা ছড়াগুলিতে তেমন পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার গ্রাম্য ছড়ার বর্ণনায় তিনি ২২শ দণ্ড গমনোপযোগী রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইহা সত্য হইলে তাঁহার রাজত্ব বৃহৎ ছিল বলা যায় না। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত পুথিতে আছে এই রাজার "কটক" বা সৈন্যদল তিন ক্রোশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। এই বর্ণনা অবশ্য রাজার কিছু ক্ষমতার পরিচায়ক। আর যদি দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্র চোলের সহিত সত্যই গোবিন্দচন্দ্রের যুদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষমতাশালী রাজা বলাই সঙ্গত। রাজেন্দ্র চোল রাঢ়ের রাজা রণশূর, বঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও বরেন্দ্রের রাজা মহীপাল এই তিনজনকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তিরুমলয়ের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে। এখন শিলালিপির উক্তি বিশ্বাস করিলেও সমস্যা এই যে শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র কোন গোবিন্দচন্দ্র? তিনি ও নাথ-সাহিত্যের গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র এক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহা অনুমানমাত্র। এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলা ঠিক নহে।

নাথসাহিত্যের গোবিন্দচন্দ্রের বংশ-তালিকা আর একটি গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছে। এই বংশতালিকা বাঙ্গালা গীতিকাগুলিতে একপ্রকার, উড়িষ্যায় অন্যপ্রকার, আবার মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নাথসাহিত্যের প্রধান যোগীসন্ন্যাসী সিদ্ধাচার্য্য গোরক্ষনাথের সময় নিয়াও নানা দেশের বিভিন্ন মতবাদ নানা তর্কের কারণ ঘটাইয়াছে।

যাহা হউক, গোবিন্দচন্দ্র বড় রাজা ছিলেন বা তাঁহার সন্ন্যাসের কাহিনী বড়ই করুণ বলিয়া ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এই বিশ্বাস আমাদের নাই। আমাদের মনে হয় নাথপন্থী যোগীসম্প্রদায়ে ভারতের নানা প্রদেশের লোক ছিল এবং এই শৈব যোগীসম্প্রদায়ে নানা জাতির লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন কৈবর্ত্ত জাতীয় মৎস্যেন্দ্রনাথ ও হাড়ি বা ডোম জাতীয় হাড়িপা। সম্ভবতঃ বিভিন্ন প্রদেশে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার লোক হইতে পারেন, কিন্তু "জলন্ধরি" উপাধিযুক্ত গোরক্ষনাথ ও বালপাদ বা হাড়িপা পাঞ্জাব জলন্ধর অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।[১] যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর সহরে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে এবং

(১) বৌদ্ধ-গান ও দোহা (H. P. Sastri, Introduction) এবং Origin & Development of Bengali Language, (S. K. Chatterjee, Introduction) দ্রষ্টব্য

নেপালে গোরক্ষনাথের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। এমতাবস্থায় এই সম্প্রদায়ে কোন খ্যাতিমান রাজা যোগদান করিলে সেই রাজার কীর্ত্তিগাথা প্রদেশে প্রদেশে গাহিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগ এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছাড়িবেন কেন? কোন নরপতি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিলে যে সেই সম্প্রদায় লাভবান হয় তাহার প্রমাণ খৃষ্টানজগতে সম্রাট কনস্টানটাইন ও বৌদ্ধজগতে সম্রাট অশোক। সুতরাং গোবিন্দচন্দ্রের যোগীসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান ও সাময়িক সন্ন্যাস গ্রহণ বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যের চিরতরে সংসার ত্যাগের সমশ্রেণীতে না পড়িলেও উক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহা গৌরবের সহিত দেশে দেশে বিঘোষিত করিয়া থাকিবেন।

যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার মাতা এত খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ না হিন্দু? গোবিন্দচন্দ্রের গীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যারপর নাই।" এই অহিংসার বাণী হিন্দু সমাজে অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহা বৌদ্ধগন্ধী। হাড়িপার অনুগ্রহে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উক্তি—"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি। আপনি জলস্থল আপনি আকাশ। আপনি চন্দ্র-সূর্য্য জগত প্রকাশ।"—প্রভৃতি বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও দেবতার প্রভাবের অভাব সূচিত করে। অবার "জিয় জিয় রাড়ীর বেটা ধর্ম্মে দিউক বর"—উক্তিতে হয়তো শিবঠাকুরের প্রতীক হিসাবেই ধর্ম্মঠাকুরের উল্লেখ রহিয়াছে। আবার এই গীতগুলিতে শিবঠাকুরের প্রভাব এবং বেদান্ত ও যোগ-শাস্ত্রের মহিমার প্রচুর প্রচার রহিয়াছে। যাহা হউক বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের নানা দেবতার ছাপ বিভিন্ন সময়ে এই সম্প্রদায়ের মতবাদের উপর পতিত হইয়া ইহাকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের সেতু বা যোগসূত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। বুকানন সাহেব এবং গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে দলভ্রষ্ট কতিপয় শৈবসন্ন্যাসী হইতেই এই যোগীসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের মূল সুর তান্ত্রিকতা। তান্ত্রিকতা বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজের মধ্যেই প্রবেশলাভ করিয়া উভয়কে এমন একটি রূপদান করিল যে তাহার পর উভয়ের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ইহাদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িল। সুতরাং তান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ দেখিলেই তাহাকে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা সঙ্গত নহে, কারণ তাহা শৈব বা শাক্ত হিন্দুও হইতে পারে। সম্ভবতঃ যে সব অদ্ভুত ও বিসদৃশ ক্রিয়াকাণ্ড নাথসাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অধিকাংশই

হিন্দুতান্ত্রিকতা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতা নহে। বরং ইহাদিগকে শুধু তান্ত্রিক রীতিনীতির উদাহরণ বলাই অধিক সঙ্গত। এইগুলিকে "বৌদ্ধ" বা "হিন্দু" বলিয়া চিহ্নিত না করাই উচিত। এই গানগুলির ভিতরে রাণী ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সহিত আলাপের মধ্যে দেহতত্ত্বের উপদেশের সহিত যে সমস্ত আপত্তিজনক অংশ রহিয়াছে তাহা নিছক তান্ত্রিকগুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে সদুপদেশ দানের সহিত তুলনীয়। এই স্থানে হিন্দু বা বৌদ্ধ মত অভিব্যক্ত হয় নাই। রাণী ময়নামতীকে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক নানারূপ পরীক্ষা এবং হাড়িসিদ্ধা ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতির অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ, তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তিরই পরিচায়ক। তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তির ফলে এইরূপ অসাধ্যসাধনের সম্ভাবনা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজেই স্বীকৃত হইয়াছে।

হেঁয়ালির ভাষায় তান্ত্রিক মতের প্রচার, "অজপা কাহারে বলে জপে কোন জন" (গোরক্ষ-বিজয়) এবং "দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে" (গোরক্ষ-বিজয়) প্রভৃতি কথায় সুস্পষ্ট রহিয়াছে। আবার হেঁয়ালির ভাষায় ময়নামতী কর্ত্তৃক স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে সাবধান করিতে গিয়া দেহতত্ত্বমূলক উপদেশ উল্লেখযোগ্য।

"মানকচু পহরী তুমি থুইয়াছ হেজা !
খিজিরের হাতে তুমি সমর্পিলা গেজা ॥"

—(ময়নামতীর পুথি, ভবানী দাস)

ইহার সহিত গোরক্ষ-বিজয়ের* নিম্নের ছত্র দুইটির বেশ সাদৃশ্য আছে।

"কুকুরের মুখে গুরু রাখিয়াছ গেজা।
মানকচু পহরী যেন রাখিয়াছ সেজা ॥" —(গোরক্ষ-বিজয়)

এই হেঁয়ালির ভাষা উভয় পুথিতে প্রচুর পাওয়া যাইবে।

'মহাতেজে কুড়ালেতে সমর্পিলা শুরু।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গরু ॥" —(গোরক্ষ-বিজয়)

উল্লিখিত উপদেশসমূহে যোগীসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কে স্ত্রীজাতির প্রতি একটা কঠোর মনোভাব বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু।

এই পুথিগুলি পূর্ব্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল পরে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রথমে শুধু ধর্ম্মঠাকুররূপ বুদ্ধদেবকে মান্য করিয়া

---

* "গোরক্ষ-বিজয়" সাধু মীননাথের "কদলী" নামী স্ত্রীলোকের দেশে গমন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়াতে যে পতন হয় তদুপলক্ষে রচিত। সাধু গোরক্ষনাথ অবশেষে স্বীয় গুরু মীননাথকে উদ্ধার করেন।

পরে রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা এমনকি চৈতন্য-বন্দনা পর্য্যন্ত প্রচারে সাহায্য করিয়াছে এবং ইহাতেই পুথিগুলির জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এইরূপ একটি মত আছে। এই মত সম্পূর্ণভাবে সত্য না হইলেও আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে। ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধের ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে পুথিগুলিতে নানা দেবদেবীর উল্লেখ পরবর্ত্তী সময়ের লেখকগণের হস্তক্ষেপের ফল ইহা নিশ্চিত। এইজন্য গ্রীয়ারসনের আবিষ্কৃত এবং লোকমুখে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রচারিত মাণিকচন্দ্র রাজার গান ভিন্ন, এই জাতীয় অন্য সব গান পরবর্ত্তী বিভিন্ন সময়ে লিখিত বলিয়া তাহাতে নানা যুগের ধর্ম্ম ও সমাজের পরিবর্ত্তনের চিহ্ন এত বেশী রহিয়াছে যে অতি সাবধানতার সহিত এইগুলিকে গ্রহণ করিতে হয়। এই দিক দিয়া অন্ততঃ কতকগুলি পুথিকে মধ্যযুগের অন্তর্গত করা চলে কি না দেখা উচিত। অবশ্য তাহাতে এই জাতীয় সাহিত্যের ভাব, প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতির দিকে পুথিগুলিকে আদিযুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত হইলেও লেখক বা কবি যদি সংগ্রাহক না হইয়া থাকেন তবে সেই সব কবির পুথি মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে।

নাথসাহিত্যের কবিত্ব গ্রাম্যজনোপযোগী হইলেও সরল উক্তি ও বর্ণনায় ইহা কবিত্বপূর্ণ। ধর্ম্মজনিত হেঁয়ালির ভাষা ছাড়া এই পুথিগুলিতে যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা মর্ম্মস্পর্শী সন্দেহ নাই। ভাষা সংস্কৃতপ্রভাবশূন্য ও অমার্জ্জিত হইলেও ভাব ও কবিত্বরসে পরিপূর্ণ। এই সাহিত্যের পুথিগুলিতে গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সন্ন্যাসের (বা দাম্পত্য প্রেম ও বৈরাগ্যের) আদর্শের একটি সংঘাত সৃষ্টি করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ধ্যান ও যোগ দ্বারা চিত্ত ও দেহকে পরিশুদ্ধ করিয়া এমন শক্তি অর্জ্জনের আভাস দেওয়া হইয়াছে যে তাহার কাছে দেবশক্তি পরাজিত হয়। এই পুথিগুলিতে এই হিসাবে গুরুর সাহায্যে ধ্যানধারণার উপদেশ আছে। ইহার ফলে এক শ্রেণীর সমালোচক "দেভাজু" (দেবপূজক) ও "গুভাজু" (গুরুপূজক) নামক দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন শেষোক্ত শ্রেণী অর্থাৎ নাথপন্থীগণ বৌদ্ধ, কারণ তাহারা দেবতার নির্ভরশীল নহে। এই যুক্তি বহু ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। বৈদান্তিক মায়াবাদ ও জীবাত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে এই নাথসম্প্রদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই "নাথ" সম্পর্কে হাণ্টার সাহেব Annals of Rural Bengal গ্রন্থে "নাথ" জগতের কর্ত্তা

(Lord) অর্থে শিবঠাকুরকে মনে করিয়াছেন এবং বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা হইতে ইহার স্বপক্ষে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।[১]

নিম্নে রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প শ্রবণে রাণী অদুনার বিলাপের ভিতর যে প্রেমের চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব।

(ক) "না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পরে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দশ গিরির মাও বইন রবে স্বামী লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও।
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানি।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥

* * * *

গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘমাসি সিতে ঘেৰিয়া রমু গাও॥

* * * *

খায় না কেন বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত্ত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামীর পদতল॥
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাজা চরণ বেড়িয়া রমু পালাইয়া যাবু কোথা॥—ইত্যাদি।

—(মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গ্রীয়ারসন সংগৃহীত)

কবি দুর্ল্লভ মল্লিক "গোবিন্দচন্দ্রের গান" সংস্কার করিয়া প্রকাশ করেন

---

(১) ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশে (বিশেষ করিয়া শান্‌ রাজ্যে) প্রচলিত "Nut" (নাট্‌) দেবতার বা উপদেবতার পূজার সহিত বাঙ্গালার নাথধর্মের কোন সম্বন্ধ আছে কি না কে জানে। "Nut" ও "নাথ"এর সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। Lyde রচিত Asia গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ইহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই গানের মধ্যেও প্রেমের যে সুন্দর বর্ণনা কবি দিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

(খ) "অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥
তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্নপানি ॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥
* * * *
নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন।
তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী ॥
* * * *
না ছাড় না ছাড় মোরে বঙ্গের গোসাঞি।
তোমা বিনে উদুনা থাকিবে কোন ঠাঞি ॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥" ইত্যাদি।

—(গোবিন্দচন্দ্রের গান)

এই অনাড়ম্বর ছড়াগুলির ভিতর অন্তরের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য ও অনাবিল রসমাধুর্য্য অস্বীকার করিবার নহে।

———

নবম অধ্যায়

ব্রতকথা*

প্রাচীন বাঙ্গালার ব্রতকথাসমূহ বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগের এক বিশেষ অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত এই ধর্ম্মমূলক কাহিনীগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালার হিন্দু নারীসমাজের ধর্ম্মজীবনের একটি দিক উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলে প্রাচীনকালের বঙ্গনারীর ধর্ম্ম ও সামাজিক বুদ্ধি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় অনেক দেবদেবীর পূজা প্রচারের মূলে এই ব্রতকথাগুলি রহিয়াছে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক শাখার যে এই ব্রতকথাসমূহ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ডাঃ ইভান্স ক্রিটদ্বীপে প্রায় তিন হাজার বৎসরের পুরাতন যে সমস্ত মৃন্ময় মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন বাঙ্গালায় প্রচলিত ব্রতকথার অন্তর্গত মৃৎমূর্ত্তি-গুলির কোন কোনটির সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলি যত পুরাতনই হউক না কেন ইহাদের সম্পর্কিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে প্রাচীন ভাষার পরিচয় স্থানে স্থানে এখনও রহিয়াছে তাহার এবং আনুসঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ অন্যান্য প্রমাণের ফলে অন্ততঃ খৃঃ ৮ম। ৯ম শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রতকথাগুলির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব ব্রত ও তৎসংক্রান্ত কথাগুলি বহু প্রাচীন হইলেও ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হয় নাই বলিয়া এরূপ অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রতকথাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজের আদিযুগের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ব্রতকথাগুলি ধর্ম্মের দিকে যাহাই হউক, সাহিত্যের দিকে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। কথাসাহিত্যের অবলম্বন অবশ্য গল্প। এই গল্প সত্যও হইতে পারে, আবার কাল্পনিক অথবা উভয় মিশ্রিতও হইতে পারে। এইরূপ ইহা গদ্যে, পদ্যে

---

* Folk Literature of Bengal (D. C. Sen), History of Bengali Language and Literature ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (D. C. Sen) এবং মৎরচিত "বাঙ্গালার কথাসাহিত্য" (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত) ও "প্রাচীন বাঙ্গালার ব্রতকথা" (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন, ১৩৫৫) দ্রষ্টব্য। "বঙ্গলক্ষ্মীর" প্রবন্ধটিই এইস্থানে গৃহীত হইয়াছে।

অথবা মিশ্রিতভাবেও রচিত হইতে পারে। এমনকি কোন কোন কাহিনী গীত পর্য্যন্ত হইত। কথাসাহিত্যের বিভাগে বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রতকথা কোন্ শাখা বা প্রশাখার অন্তর্গত? "গোপীচন্দ্রের গান" এবং "মহীপালের গান"ও কথাসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। আবার "শিবায়ন" এবং "মঙ্গলকাব্য"গুলিকেও এক হিসাবে কথাসাহিত্য ভিন্ন আর কি বলিব? এইরূপ ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা এবং ভাট-ব্রাহ্মণগণের রচিত গানগুলিও কতকাংশে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কথা বা কাহিনী এই সকল শ্রেণীর সাহিত্যের মূল উপাদান হইলেও, এমনকি এই সব কাহিনী গীত হইলেও ইহাদের প্রধানভাগ কাব্যধর্ম্মী এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব, আদর্শ ও প্রকাশভঙ্গীর তারতম্য এইগুলিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

"মহীপালের গান" ও "গোপীচন্দ্রের গান"জাতীয় গানগুলি কোন রাজার সম্বন্ধে রচিত। আবার কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথাগুলি কোন দেবদেবীর স্তুতি উপলক্ষে রচিত সুতরাং উভয় শ্রেণীর গীতে উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যসমূহও কোন দেবতাবিশেষের পূজা প্রচারের জন্য রচিত কিন্তু ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে ব্রতকথা নারীসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ এবং একান্তই তাহাদের ব্যাপার। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে পূজিত হয় এবং ব্রাহ্মণগণ এই সমস্ত পূজায় পৌরহিত্য করেন। অথচ মূলে কোন ব্রতবিশেষের উপাখ্যান হইতেই ক্রমে মঙ্গলকাব্যের দেবতাবিশেষের পূজা ও স্তুতিবাচক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মঙ্গলচণ্ডীদেবী ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নাম করা যাইতে পারে। ব্রতকথাগুলির ভিতরে মঙ্গলকাব্যসাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল বলা যায়। কথা বা কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথাগুলি রচিত হইলেও ইহাদেরই একভাগ দেবতার খ্যাতিবৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে কাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া অন্ততঃ কতকগুলি মঙ্গলকাব্যের জন্মদান করিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকাগুলি কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ মানবসমাজের কথা এবং নর-নারীর অপূর্ব্ব প্রেমের অমর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই গীতিকাগুলি প্রেমের বেদীতে আত্মবলিদানের অসামান্য কাহিনীর মধ্য দিয়া একটি পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করিলেও পারিবারিক জীবনের আদর্শ স্থাপনে গল্পগুলির লক্ষ্য নাই। কিন্তু ব্রতকথাগুলির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের কাহিনী ভিন্ন আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনের

একটি উচ্চ ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ এই ব্রতকথাসমূহের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অবস্থাপন্ন ও অভিজাত শ্রেণীর লোকের গুণ বর্ণনায় দক্ষ ভাটগণের গানের সহিত "মহীপালের গান" বা "গোপীচন্দ্রের গানের" বিষয়গত প্রচুর সাদৃশ্য অথবা ঐক্য থাকিলেও ব্রতকথার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত ভাট-ব্রাহ্মণগণের গানের কোন মিল দেখা যায় না। এইরূপ চর্য্যাপদ ও শিবের "গাজন" গান এবং "শিবায়ন" গানের সহিতও ব্রতকথাগুলির ব্যবহারগত ও আদর্শগত কোন মিল নাই। শুধু কাহিনী ও গীত এই দুই বিষয় অবলম্বনে এই জাতীয় নানা শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে বলিয়া এই দিক দিয়া সকল প্রকার সাহিত্যেরই মিল রহিয়াছে, নতুবা আদর্শগত, ব্যবহারগত ও কাব্যগত নানা বিষয়ে এই সাহিত্যগুলি পরস্পর হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

কথাসাহিত্য গদ্যে লিখিত হইয়া অধুনা গল্প ও উপন্যাসের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে একদিকে গল্প ও উপন্যাস এবং অপরদিকে প্রাচীন কথাসাহিত্য তথা ব্রতকথার মধ্যে কত প্রভেদ! অথচ ইহারা সমস্তই কাহিনীমূলক সাহিত্য। তবে, গল্প ও ব্রতকথায় বরং কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। আধুনিক কথাসাহিত্য গল্প ও উপন্যাস কিম্বা মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতি বাদ দিলে প্রাচীন কথাসাহিত্য প্রধানতঃ চারি প্রকার। যথা—ব্রতকথা, রূপকথা, গীতি-কথা ও ব্যঙ্গ-কথা। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হিসাবে ব্রতকথাগুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার হিন্দু নারীগণ অনেক প্রকার ব্রত পালন করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে খুব প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই উভয় প্রকার ব্রতেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্রত যত প্রাচীন তাহার প্রকাশভঙ্গী, ভাষা এবং ভাবও তত প্রাচীন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যসম্রাট অশোক পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুশাসনে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রাচীন "মঙ্গলব্রতের" অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রতকথা উপলক্ষে নির্ম্মিত মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও ইতঃপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

এই সব ব্রতকথা কোন একটি বিশেষ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। দেবতার মূর্ত্তি মাটি ও চা'লের গুড়ার সাহায্যে নির্ম্মাণ করিয়া কুলবধূগণ নিজেদের পারিবারিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এই সব ব্রত পালন করিত।

ব্রতসমূহের কতিপয় দেবতাকে খুব প্রাচীন মনে হয়। এই ব্রতকথাগুলির ভাষাও কতকটা দুর্ব্বোধ্য ও প্রাচীনতা মিশ্রিত।

এই সব প্রাচীন দেবতাদের নাম থুয়া, লাউল, ভাদুলি ও সেঁজুতি। ইহা ছাড়া সূর্য্যঠাকুর ও শিবঠাকুরের নামও এই উপলক্ষে কিছু পরিমাণে উল্লেখ-যোগ্য। নিম্নে এই দেবতাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(ক) থুয়া—

"থুয়া" নামটি অসংস্কৃত এবং অনার্য্যগন্ধী। "থুয়া" নামে পাঁচটি দেবতার পূজা এদেশের নারীসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সন্তান-সন্ততি কামনায় ও সাংসারিক অভাব-অনটনের হস্ত হইতে মুক্তি বাসনায় নারীগণ অগ্রহায়ণ মাসে থুয়া দেবতার পূজা করিত। এই থুয়া পূজার ভাষা অতি প্রাচীন। ইহার উদাহরণ এইরূপ—

"থু থু থুয়স্তি।
আঘণ মাসের জয়াস্তি॥" ইত্যাদি।

(খ) লাউল—

আর একটি দেবতার নাম এই উপলক্ষে করা যাইতে পারে। এই দেবতার নাম "লাউল" (লাঙ্গল ?)।

এই "থুয়া" ও "লাউল" নাম দুইটি এই দেশের নারীগণ কোথা হইতে পাইল তাহা বলা কঠিন। উভয়ের মূর্ত্তিই মৃত্তিকা ও চা'লের গুড়ার সাহায্যে নির্ম্মিত হইত। মূর্ত্তিগুলির আকৃতি অনেকটা পিরামিডের অনুরূপ এবং পূজা-বিধিও সংস্কৃত পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত নহে। এই দুই দেবতার পূজায় প্রাচীন বঙ্গের কৃষিসম্পদের প্রতি এই দেশের অধিবাসিগণের নির্ভরশীলতা ও আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

(গ) ভাদুলি—

নৌ-যাত্রার ও নৌ-বাণিজ্যের চিত্রহিসাবে আমরা আর একটি দেবতার পরিচয় পাই। এই দেবতার নাম "ভাদুলি" (ভাদ্র ?)। নৌ-যাত্রার আপদ-বিপদের কথা স্মরণ করিয়া ভাদুলি দেবতার অনুগ্রহ কামনা করা হইত। নারীগণ তাহাদের স্বামীপুত্রের জলপথে নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইয়া এই দেবতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত। স্ত্রীদেবতা ভাদুলির পূজোপলক্ষে নারীগণ "সাতসমুদ্র" ও "তেরনদীর" চিত্র অঙ্কিত করিত। এই ব্রত প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর জলপথে নানা দেশে গমনের ইঙ্গিত করে। এই দেবতার পূজা

ভাদ্রমাসে করা হইত। বোধ হয় বর্ষাকালে জলপথে যাতায়াত সুবিধাজনক-বোধে এইকালে নৌ-যাত্রার প্রথা ও তৎসংক্রান্ত পূজা প্রচলিত ছিল।

(ঘ) আর একটি ব্রত প্রচলিত ছিল, তাহার নাম "সেঁজুতি"। কুমারী কন্যাগণ বিবাহের পূর্ব্বে সেঁজুতি-ব্রত পালন করিত। সেঁজুতি সম্ভবতঃ কোন দেবী। ঐ দেবীর পূজায় অবিবাহিতা কন্যাগণ প্রার্থনার ভিতর দিয়া মনের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জানাইত তাহাতে মনে হয় তাহারা ভবিষ্যতে সপত্নীরূপ বিপদ নিবারণের জন্য এবং স্বামীপ্রেম কামনায় এই ব্রত পালন করিত।

প্রাচীন ব্রতকথাগুলির ভাষা তখন খুব দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রচলিত মনে হইলেও কোন এক সময়ে বোধ হয় এরূপ ছিল না। এইগুলির জটিল ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইলেও প্রাচীন ভাষার কিছু চিহ্ন এখনও ইহাদের গাত্রসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রাচীন ব্রতসমূহের অনুষ্ঠানের ভিতরে অনেক অপৌরাণিক উপাদানের অস্তিত্ব, দুর্ব্বোধ্য ভাষার প্রয়োগ, অপৌরাণিক দেবতার উল্লেখ, জলপথে বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ, কৃষিসম্পদের প্রতি অনুরক্তি, নারীগণের বাল্য ও যৌবনের আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রভৃতির যে অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তুলনা নাই। এই ব্রতসমূহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলিপনা ও চিত্রাঙ্কণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও খুব উচ্চ শ্রেণীর বলা যাইতে পারে।

এই ব্রতকথাগুলির কোন কোনটির ভিতরে দেখা যায় প্রথমে সমাজে ইহা প্রচলিত হইতে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ গৃহকর্ত্তার আপত্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বণিক সমাজের সহিত কতকগুলি ব্রতের বিশেষ সম্বন্ধও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার কারণ সঠিক বলা যায় না। ইহা আর্য্যেতর সমাজ হইতে আর্য্য সমাজে প্রচলনের ইঙ্গিত করে কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবীর পূজা প্রচলনের মধ্যে ইহার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এই দুই দেবী আর্য্যসমাজের বাহির হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবেন। প্রথমে ব্রতকথার আকারে এই দুই কাহিনী রচিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে ইহারা "মঙ্গলকাব্য" নামে এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ের আর্য্যসংস্কৃতির স্পর্শ কতকগুলি ব্রতকথার মধ্যে এক নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে। বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন ব্রতগুলিকে একেবারে তুলিয়া না দিয়া বরং রূপান্তরিত অবস্থায় ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রচারের কার্য্যে

এইগুলিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও বাঙ্গালা সাহিত্য এতদুভয়েরই পরম উপকার সাধিত হইয়াছে।

মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবী ভিন্ন লাউল ও ভাদুলি দেবতাদ্বয় সম্পর্কে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই পৌরাণিক রূপান্তরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে লাউল দেবতাকে শিবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং ভাদুলি দেবীকে দেবরাজ ইন্দ্রের শাশুড়ি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। শিব ও সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যেও কতকগুলি ব্রত ও প্রাচীন ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। উহাও কালক্রমে পুরাণগুলির প্রভাবে নবরূপ লাভ করিয়াছে।

ব্রতকথার ন্যায় গীতিকথা এবং রূপকথাসমূহের অনেক গল্পেও প্রাচীনত্বের আভাষ রহিয়াছে। গীতিকথার অন্তর্গত "মালঞ্চমালা"র গল্পটি ইহার অন্যতম উদাহরণ। রূপকথাগুলির মধ্যে জাতিবিশেষে আদিযুগে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর জীবনসংগ্রামের ও নারীপ্রেম লাভের জন্য দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনের ও অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় কৃষ্টিও সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান ইহাতে নিবদ্ধ আছে। রূপকথার কাহিনীগুলি শুধু শিশুমনেরই খোরাক যোগায় না, পরিণত বয়স্কদেরও চিন্তনীয় অনেক মূল্যবান বিষয়-বস্তু ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে। বাঙ্গালার আদিযুগ অংশের সাহিত্যে ব্রতকথার ন্যায় রূপকথা এবং গীতিকথাগুলিরও সম্যক পরিচয় লাভের প্রয়োজন আছে। হাস্যরসের উদ্রেককারী ব্যঙ্গকথার গল্পগুলির প্রয়োজনীয়তা ইহাদের তুলনায় অল্প। প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথার বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথার অবতারণা করা গেল। ব্রতকথা বা সমধর্ম্মী সাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া না হইলেও এক শ্রেণীর রচনার কথা এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ইহা "ছেলে ভুলানো ছড়া"। এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক ছড়ার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী সমাজের প্রাচীন চিত্র উদ্ঘাটনে ব্রতকথা, রূপকথা ও গীতিকথার ন্যায় এই জাতীয় ছড়াগুলি অল্প সাহায্য করে নাই। ব্রতকথার অন্তর্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয়জ্ঞাপক অনেক ছত্রের ভাবমূলক সাদৃশ্য এই ছড়াগুলিতেও রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "লোকসাহিত্য" নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা রহিয়াছে। ইহাতে অনেক প্রাচীন ও প্রচলিত ছড়াও উল্লিখিত হইয়াছে। কবিগুরুর অনবদ্য ভাষায়—"ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত

হইয়া আসিয়াছে ;—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে” ইত্যাদি। এই স্থানে এই জাতীয় অসংখ্য ছড়ার মধ্যে মাত্র তিনটি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল।

(ক) ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ী এসো।
সেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে ব'সো ॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো ॥

—ছেলেভুলানো ছড়া।

(খ) ঘুঘু মোতি সই।
পুত কই।
হাটে গেছে ॥
হাট কই।
পুড়ে গেছে ॥
ছাই কই।
গোয়ালে আছে ॥
সোনা কুড়ে পড়বি।
না—ছাই কুড়ে পড়বি ॥

—ছেলেভুলানো ছড়া।

(গ) ওপারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম,
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে ॥
এ মাসটা থাক, দিদি, কেঁদেককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে ॥
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাপ দিয়ে পড়ি ॥

—ছেলেভুলানো ছড়া।

---

(১) লোকসাহিত্য, ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধ্যযুগ

(লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য
ও জনসাহিত্য)

হর গৌরী
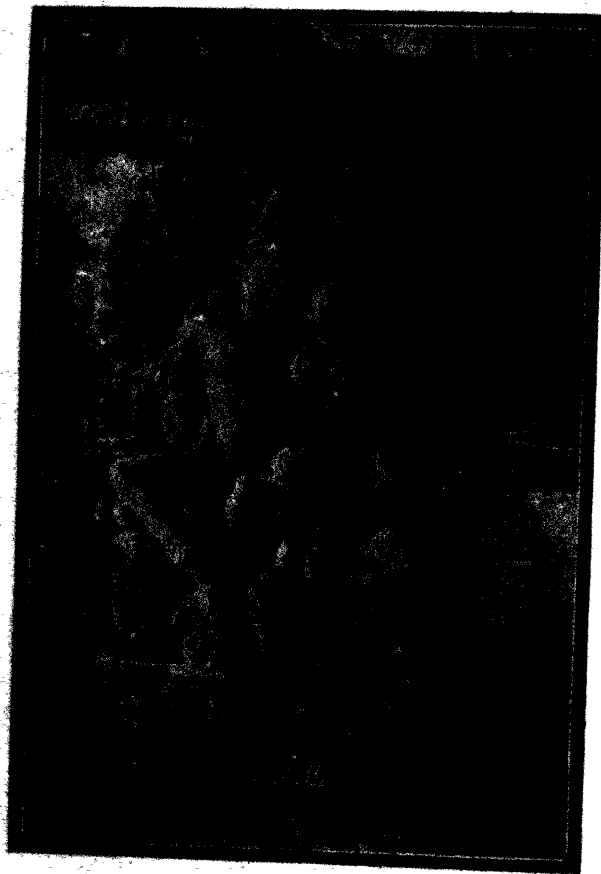
পেহুয়ার, খৃঃ একাদশ শতাব্দী।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

দশম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগ খৃঃ ১৩শ হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। এই ছয়শত বৎসরের সাহিত্য প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত, যথা, "লৌকিক", "অনুবাদ" ও "বৈষ্ণব" সাহিত্য। এতদ্ভিন্ন "জন-সাহিত্য" নামে চতুর্থ অপর একটি শাখারও কল্পনা করা যাইতে পারে। সময়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই শাখাসমূহের অন্যতম শাখা "লৌকিক-" সাহিত্য সর্ব্বাগ্রে আলোচনার যোগ্য। (১) "মঙ্গলকাব্য" ও (২) "শিবায়ন" নামক ছন্দে নিবদ্ধ কাহিনী দুইটি এই শাখার অন্তর্গত।[১] "শিবায়ন" নামক ছড়া মঙ্গলকাব্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া অনেক পরে স্বতন্ত্র সাহিত্যে পরিণত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার আলোচনা মঙ্গলকাব্যের পরে করাই সঙ্গত।

মধ্যযুগের সাহিত্যের উল্লিখিত নামগুলি ব্যবহারের একটু অর্থ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ব্বে জনসাধারণ কোন স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষে স্তব-স্তুতি করিতে যাইয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই "লৌকিক"-সাহিত্য। এই সাহিত্য প্রথমে কৃষিসম্পদপূর্ণ নিতান্ত পল্লী অঞ্চলে সমুদ্ভূত হইলেও কালক্রমে ইহা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও নগরের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র বাঙ্গালার সমতলভূমির বিভিন্ন গ্রাম হইতে এই সাহিত্যের উদ্ভব। "অনুবাদ"-সাহিত্য সংস্কৃত পুরাণসমূহের প্রভাবের ফলে উৎপন্ন হইয়াছিল। একদিকে রাজানুগ্রহ এবং অপরদিকে ব্রাহ্মণগণের নব আদর্শ প্রচারের ফলে এই সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। বিজাতীয় মুসলমান শাসকগণ ও হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সাহিত্যপ্রচারে সহায়তা করাতে ইহা কতকটা নাগরিক সাহিত্যেও পরিণত হইয়াছিল। "বৈষ্ণব"-সাহিত্যের বীজ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে অঙ্কুরিত হইলেও খৃঃ ১৬ শতাব্দীতে ইহা ফল-ফুল পরিশোভিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেবোপম জীবন-কাহিনী ও অত্যুজ্জ্বল আদর্শই এই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ। শ্রীবৃন্দাবনের গো-চারণ ভূমির ও তৎস্থানের অধিবাসী

---

(১) মঙ্গলকাব্য জনপদে বাণিজ্যপ্রিয় বণিক জাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে অষ্ট্রিকজাতির এবং কৃষিবিস্তারপূর্ণ শিবায়ন সমতলভূমিতে আগত পার্ব্বতীয়গণের ইঙ্গিত করে কিনা দেখা আবশ্যক।

গোপ-গোপীগণের জীবন-যাত্রার পটভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার অধিবাসিগণ রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বের অপূর্ব্ব আস্বাদ অনুভব করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবন-কাহিনী প্রেম ও ভক্তির এই নব আদর্শের পথ দেখাইয়াছে। ইহা ছাড়া নানা ছড়া এবং কাহিনীপূর্ণ "জন"-সাহিত্যের ভিত্তি বাঙ্গালার প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। প্রেম ও বৈরাগ্যের উভয় আলেখ্যই ইহাতে পাওয়া যায় এবং নানা জাতির সংমিশ্রণপুষ্ট বাঙ্গালী সমাজের একান্ত ঘরের কথাই ইহাতে রহিয়াছে। বৈরাগ্যের উচ্চ দার্শনিক আদর্শ এবং পারিবারিক জীবনের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ উভয়ই ইহাতে মিশ্রিত আছে। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর অনুপম আত্মবলিদান, বণিক সম্প্রদায়ের সুদূর সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রা, আবার রাজভোগ এবং সুন্দরী যুবতী স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি নানা কথা, কাহিনী ও গীতিকার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়া আসিয়াছে। এই সাহিত্য রাজানুগ্রহপুষ্ট না হইলেও জনসাধারণের চিত্তের সিংহাসনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

"মঙ্গলকাব্য" নামের তাৎপর্য্য কি? যে গান গাহিলে গায়ক এবং শুনিলে গৃহস্বামী ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের মঙ্গল বিধান হয় তাহাই মঙ্গলগান ও পরবর্ত্তী মঙ্গলকাব্য। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে মাধবাচার্য্য নামক চণ্ডী-মঙ্গলের একজন প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার কাব্যে "মঙ্গল" শব্দটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "মঙ্গলদৈত্য বধ করি নাম ধরিলা মঙ্গল-চণ্ডী"। বলা বাহুল্য এই স্থানে "মঙ্গল" নামক একটি দৈত্যের উল্লেখ করিয়া কবি মঙ্গলগানের দেবতা সম্বন্ধে জাতিগত প্রশ্নের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধে আলোচনার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যসমূহ পঠিত না হইয়া গীত হইত। আটদিন হইতে একমাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলগান গীত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় "চণ্ডী-মঙ্গল" আটদিন ব্যাপিয়া এবং মনসা-মঙ্গল সম্পূর্ণ একমাস ধরিয়া গান গাহিবার নিয়ম ছিল। মঙ্গলগান প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে ব্রত-কথা এবং ছড়ার পর্য্যায়ে নিবদ্ধ ছিল। কালক্রমে এই গানগুলি বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়া কাব্যের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির প্রতিভা-গুণে এই ক্ষুদ্রকলেবর ছড়াগুলির কোন কোনটির আয়তন যেমন বৃহৎ হইয়াছে তেমন ইহা প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কাব্যের শ্রী ধারণ করিয়াছে।

মঙ্গলগান কোন দেবতার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের জন্য রচিত হইত এবং ইনি প্রায়শঃ স্ত্রী দেবতা। এই হিসাবে মঙ্গলকাব্যের প্রধান ও মূল অংশ শাক্ত-সাহিত্য সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালার এক এক অংশে এক একটি বিশেষ দেবতা বিশেষ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত স্থানীয় দেবতার উপলক্ষে রচিত এবং ক্রমশঃ কাব্যাকার প্রাপ্ত ছড়াগুলিকে ধর্ম্মানুগ সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করাই সঙ্গত। কোন একটি বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া কোন ভক্ত কবি এবং এবং গায়ক নিজের অজ্ঞাতসারে উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন।

মঙ্গলগানের দেবতা অনেক এবং ইহারা প্রধানতঃ স্ত্রীদেবতা, যেমন মনসা, চণ্ডী, গঙ্গা, শীতলা ইত্যাদি। এই দেবীগণের মধ্যে মনসাদেবী এবং চণ্ডীদেবীর নামেই শ্রেষ্ঠ মঙ্গলগানগুলি রচিত হইয়াছে। পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে ধর্ম্মঠাকুরের নামে রচিত গানসমূহ উল্লেখযোগ্য।

যাহারা "মঙ্গল" নামটি সংযুক্ত দেখিলেই মঙ্গল-কাব্যের গন্ধ পান আমরা তাহাদের মত সমর্থন করি না। এই শ্রেণীর সমালোচকের মতে "চৈতন্য-মঙ্গল" নামক গ্রন্থদ্বয় এবং অদ্বৈত-মঙ্গল গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও মঙ্গলকাব্য। ইহা ছাড়া মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক ও "লৌকিক" নামক দুইটি উপবিভাগ কল্পনাও সমর্থনযোগ্য নহে। প্রকৃত মঙ্গল-কাব্যগুলি সবই লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রচিত। মূলে আর্য্যজাতির সমাজে প্রচলিত পৌরাণিক দেবতাসমূহ এই মঙ্গলগানের অন্তর্গত না থাকিবারই কথা। বরং মঙ্গলগান ও কাব্যে অপৌরাণিক দেবতাগণের ক্রমশঃ পৌরাণিক রূপ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের প্রমাণ ছাড়াও অনেক অপৌরাণিক দেবতাকে যে কালক্রমে সংস্কৃত পুরাণগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। শিবঠাকুরই তাহার অন্যতম উদাহরণ।

এক সময়ে "মঙ্গল" নামটির বহুল প্রচলন ছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের সময়েও যে "মঙ্গল-ব্রতে"র অস্তিত্ব ছিল তাহা তাঁহার কোন অনুশাসন হইতেই অবগত হওয়া যায়। পুণ্যজনক, পবিত্র-অথবা মঙ্গলজনক রচনা হিসাবে "মঙ্গল" কথাটির বহুল প্রচারের ফলেই চৈতন্য-"মঙ্গল" ও অদ্বৈত-"মঙ্গল" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ অর্থে চৈতন্য-মঙ্গল ও অদ্বৈত-মঙ্গল "মঙ্গলকাব্য" নহে।

এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের ইতিহাস যেমন বিচিত্র ইহার রচনা-রীতিও (technique) তেমনই স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তির মূলে কোন বিশেষ

দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত কোন ব্রতকথা অথবা কোন ছড়ার উল্লেখ অপরিহার্য্য। এই দিক দিয়া কোন বিশেষ মানব এমনকি কোন নরদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত কাব্যও "মঙ্গলকাব্য" পদবাচ্য নহে। কোন গৃহে অথবা কোন মন্দিরে দেব-পূজা উপলক্ষে গান না হইলে তাহাকে মঙ্গলগান বা মঙ্গলকাব্য বলা চলে না। ইহা ছাড়া কাঁচুলি-নির্ম্মাণ, সৃষ্টি-তত্ত্ব, শিব-দুর্গার কাহিনী, সদাগরের বাণিজ্য ও সমুদ্রে ডিঙ্গা-ডুবি, চৌতিশা প্রভৃতির উল্লেখের মধ্যে প্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃত কাহিনীর বাহুল্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়া থাকে। কোন দেবতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবপূর্ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবশেষে সেই দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন, নারীর অসমান্য দেব-ভক্তি ও পতিপ্রেম, বহু ক্লেশ স্বীকার ও অদ্ভুত নানা পরীক্ষা দানের ভিতর অসাধ্যসাধন ও সতীত্বের অপূর্ব্ব মহিমা প্রচার মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্বজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা ও শিবলোকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ভিন্ন মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। মনে হয় পৌরাণিক আদর্শপুষ্ট ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাদের বিশেষ আদর্শপ্রচারে একদিকে মঙ্গলকাব্যসমূহের এবং অপরদিকে বণিক সমাজের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাহিত্যের প্রধান চরিত্রগুলি সাধারণতঃ যে বণিক সমাজ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

এই হিসাবে মনসা-মঙ্গল ও চণ্ডী-মঙ্গলকে মঙ্গলকাব্যের type বা আদর্শ বলা চলে। কোন কাহিনীমূলক এই জাতীয় সাহিত্য বর্ণনা-মাধুর্য্য, পুণ্যবানের পুরস্কার, পাপীর দণ্ড, পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র, নানা দেশের বর্ণনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বণিক সমাজের সমুদ্র-যাত্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। বস্তুতন্ত্রতা ও আদর্শবাদিতা, হাস্যরস ও করুণরস, ভাষা ও ভাবে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত প্রভাব, চরিত্র-চিত্রণ, সামাজিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মজনিত আদর্শ এবং আন্তরিক ভক্তিমূলক মনোভাব এই জাতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্য ও নাটকের কলা-কৌশলের লক্ষণ ও ছায়া এবং গভীর সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে। এই সব কারণে ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ সন্দেহ নাই।

একাদশ অধ্যায়

(ক) মনসা-মঙ্গল*

"মনসা-মঙ্গল", পদ্মাপুরাণ অথবা বিষহরি-পুরাণের উপাস্য দেবী হইতেছেন মনসা দেবী। ইনি পদ্মা দেবী ও বিষহরি দেবী নামেও পরিচিতা। ইনি যে অতি প্রাচীন দেবী তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্প বা নাগ-পূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে স্ত্রী অথবা পুরুষ-দেবতা হিসাবে সর্প-দেবতার পূজার সন্ধান প্রাচীন জগতের বহু অংশেই খুঁজিলে মিলিতে পারে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতি, আফ্রিকার নিগ্রো জাতি, ওশেনিয়ার নানা অষ্ট্রিক জাতি, এসিয়া ও ইউরোপের মঙ্গোলীয় জাতি এবং সেমেটিক, আর্য্য,[1] প্রভৃতি ককেশীয় নানা জাতির মধ্যেই সর্প-পূজার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্পকে খাদ্যহিসাবে ব্যবহারের উদাহরণেরও অভাব নাই আবার ইহার অতর্কিত আক্রমণে ভীত মানব ইহাকে মারিতেও দ্বিধা করে না। অথচ এই ভীতির মনোভাব লইয়া মানুষ স্থানে স্থানে ইহার পূজার ব্যবস্থাও করিয়াছে। নিরাপদে গৃহবাস হেতু বাস্তুসাপের পূজা এবং সন্তানবৃদ্ধি কামনায় ইহার পূজা-প্রচার বিশেষত্বব্যঞ্জকও বটে। যৌন-ব্যাপারেও গুহ্য সাঙ্কেতিক অর্থে সর্পকে সম্মান করার রীতি ছিল।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনার গহন বনে প্রবেশ না করিয়া বাঙ্গালাদেশে মনসা দেবী ও তাঁহার পূজার বিষয় আলোচনায় মনোনিবেশ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এই দেবী ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গালাদেশে কত প্রাচীন এবং এতদ্দেশে কোন্ জাতির মধ্যে মনসা-পূজা প্রথম প্রচলিত হয়? আমাদের অনুমান বাঙ্গালাদেশে প্রায় সর্ব্বপ্রথম আগত প্রাগৈতিহাসিক যুগের "নাগ" নামধেয় প্রাচীন অষ্ট্রিক জাতি খৃষ্টজন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে সর্পপূজা প্রথম প্রচলিত করে। অতঃপর মাতৃকা-পূজক (শাক্ত) মঙ্গোলীয় জাতির তিব্বত-ব্রহ্মীশাখা ইহা গ্রহণ করে। ইহারাই সর্প-দেবতাকে দেবীরূপে কল্পনা করে। অতঃপর ইহাদের নিকট হইতে মনসা-পূজা গ্রহণ করিয়া শিব-পূজক পামিরীয় জাতি বাঙ্গালাদেশে প্রবেশের পরে এই দেবীর পূজা সমগ্র পূর্ব্বভারতে প্রচলিত করে। অবশ্য এই সমস্ত জাতি পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবার পর সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিলনের

---

* মঙ্গলকাব্য—(লৌকিকসাহিত্য)। স্ত্রী-দেবতাপ্রধান শাক্ত—মঙ্গল-কাব্যসমূহ।

(১) বেদে সর্পবাচক "অহি" শব্দের উল্লেখ আছে।

চিহ্নস্বরূপ এইরূপ করিয়া থাকিবে। মনসা দেবীর পূজার উদ্ভব প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশেই ঘটিয়াছিল মনে হয়। "বাচ্ছাইর" উপাখ্যান এবং আরও কতিপয় কারণে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন[১] মনে করেন মনসা-পূজার উৎপত্তি প্রাচীন অঙ্গ এবং মগধ দেশে অর্থাৎ বিহার অঞ্চলে হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব না হইলেও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপ অঞ্চলে ইহার প্রথম উদ্ভব হইয়া পরে মগধ অঞ্চলে ইহা ছড়াইয়া থাকিবে কারণ অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় এবং পামিরীয় সংঘর্ষ এই অঞ্চলেই বিশেষভাবে ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্ব-ভারতে আর্য্য-উপনিবেশ ও আর্য্য-সংস্কৃতির প্রসারের ফলে মনসা দেবী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া আর্য্য-দেবতাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। আবার অনেকে মনে করেন সর্পপূজক দ্রাবিড়গণ হইতে মনসা দেবীকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নাগজাতিকেও অনেকে দ্রাবিড়জাতি বলিয়া মনে করেন। অথচ শব্দশাস্ত্র ও পালিজাতক গ্রন্থাদির কাহিনী প্রভৃতি নাগজাতিকে অষ্ট্রিকই প্রতিপন্ন করে এবং মনে করা যাইতে পারে যে নাগজাতির সংশ্রবে আসিয়াই দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়গণ সর্প-পূজা অবলম্বন করিয়াছিল। সর্প-দেবীর পূজা দ্রাবিড়দেশে প্রচারের কারণ দ্রাবিড়গণের সহিত বাঙ্গালা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশের সংশ্রবের ফল হওয়াও অসম্ভব নহে। দক্ষিণ-ভারতের "মুনচম্মা" নামটি "মনসার" সহিত সাদৃশ্যব্যঞ্জক হইলেও ইহা দ্বারা দ্রাবিড় প্রভাব প্রতিপন্ন করা নিরাপদ নহে। এই দুইটি নামের কোনটি কাহার নকল সে সম্বন্ধে দুই মত হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই এবং আর্য্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও পামিরীয় ইহাদের মধ্যে কোন্ জাতির ভাষায় মূল নামটির উৎপত্তি হইয়া উল্লিখিত নাম দুইটির প্রচারের কারণ হইয়াছে তাহা কে বলিবে? যাহা হউক "মনসা" নামটির এবং এই দেবীর উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে নানা অনুমানই চলিতে পারে। সংস্কৃত শাস্ত্রের "জগৎগৌরী", "জরৎকারু(রী)" ও "মনসা" ভিন্ন "পদ্মা" ও "বিষহরি" নাম দুইটিও বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত। আবার শিবের গলায় নাগের পৈতা অথবা শিরোভূষণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হয়ত শিবপূজক পামিরীয় এবং নাগপূজক অষ্ট্রিক জাতির পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের পরিচায়ক। পরবর্ত্তী সময়ে নারীরূপে সর্পদেবতার পরিকল্পনা মাতৃকা-পূজক মঙ্গোলীয়গণের প্রভাবের ফলও হইতে পারে। যাহা হউক নিরঙ্কুশ

(১) বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় প্রথম খণ্ড (পৃঃ ১৭১-১৭৪) মনসা-পূজা সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কল্পনা নানা দিকেই ধাবিত হইতে পারে সুতরাং এইখানেই নিরস্ত হওয়া গেল।

মহাভারতের ন্যায় সংস্কৃতগ্রন্থে বাসুকীনাগের উপাখ্যান, সমুদ্র-মন্থনে নাগরাজ বাসুকীর সাহায্য, অষ্ট নাগের কথা ইত্যাদি একদা ভারতবর্ষে সর্প-পূজা বিস্তৃতির পরিচয় দেয়।

সংস্কৃত পদ্ম-পুরাণের বর্ণিত উপাখ্যান অনুযায়ী পদ্মা বা মনসা-দেবীর পালকপিতা হইতেছেন শিবঠাকুর, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য অনুযায়ী শিববীর্য্য হইতে এক বিশেষ অবস্থায় মনসা-দেবীর জন্ম হইয়াছে। এই জাতীয় অদ্ভুত বর্ণনা মনসা-দেবীর আদি অবস্থা অজ্ঞাত থাকিবারই ইঙ্গিত দেয়।

মহাভারতে কশ্যপপত্নী ও সর্পমাতা কদ্রুর উপাখ্যানে সর্পদিগের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই হিসাবে মনসা-দেবী কশ্যপ-দুহিতা। কোন সংস্কৃত গ্রন্থে মনসা নামটি আছে আবার কোনটিতে তাহা না থাকিয়া জরৎকারু বা জগৎগৌরী নাম দুইটি রহিয়াছে। পদ্মা নামটিরও একইরূপ অবস্থা। এই নামগুলির আলোচনার ভিতর দিয়া পদ্মা-পূজার অনেক লুপ্ত খবর পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন মহাভারতের কদ্রু-বিনতা উপাখ্যানই আগে না বাঙ্গালায় প্রচলিত উপাখ্যান আগে তাহাও আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সর্পপূজা বা ইহার দেবী খুব পুরাতন হইতে পারেন কিন্তু এই দেবীর নামে বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সময় খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে। মনসা-দেবীর উপাখ্যান ও ব্রত ইহার অনেক পূর্ব্বেও প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত আকারে মনসা-দেবীর নামে কোন বাঙ্গালা ছড়া বা পাঁচালী এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

মনসা দেবীর পূজা উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী প্রথমে কোথা হইতে আসিল? মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা স্থানে চাঁদসদাগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁদসদাগর অথবা বেহুলা-লক্ষীন্দরের গল্পের মূলে কোন অন্তর্নিহিত সত্যতা রহিয়াছে কি? সংস্কৃত পুরাণ বা অন্য কোন সাহিত্যে এই গল্পের এযাবৎ কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। একমাত্র আসামে প্রচলিত যে গল্প তাহা বাঙ্গালাদেশের গল্পেরই স্থানীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নহে। এমতাবস্থায় গল্পটি একান্তই কোন বাঙ্গালী বণিক পরিবারকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকিবে। তরুণ বয়সে অতর্কিতে সর্পদংশনে মৃত্যু সম্বন্ধীয় কাহিনীর অভাব বাঙ্গালা

দেশে কোন কালেই নাই। এই বিপদ উচ্চ-নীচেও প্রভেদ করে না এবং নব-বিবাহিত দম্পতির সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এমতাবস্থায় বেহুলার গল্পটি বাঙ্গালাদেশেরই চিরন্তন মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর মূর্ত্ত প্রতীক মাত্র।

এই গল্পটি বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রীতে এমন আঘাত দিয়াছে যে ইহা সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র জনগণ বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের স্মৃতিবাঞ্জক স্থানগুলির যেরূপ দাবী করিয়া থাকে এবং গন্ধবণিক সমাজ বেহুলা ও চাঁদসদাগর প্রভৃতির প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসী যে তাহাতে এই গল্পের প্রধান চরিত্রগুলির অস্তিত্বের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ চাঁদসদাগর একেবারেই কাল্পনিক চরিত্র হইলে তাঁহার এত প্রচার ও প্রতিপত্তি বাঙ্গালা-সাহিত্যের নানা স্থানে হয়ত হইত না। সর্প-দংশনের চির-পরিচিত কাহিনী কোন বিশেষ পরিবার ও স্থান নিয়া যেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে গল্পটিকে একেবারে কাল্পনিক বলিতেও ইচ্ছা হয় না। তবে, গল্পটির মধ্যে মৃতকে জীবিত করার অসম্ভব কাহিনীর প্রচার উপলক্ষে একদিকে পৌরাণিক এবং অপরদিকে অপৌরাণিক আদর্শের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থানের যুগে তাহারা এই গল্পের সাহায্যে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে যে নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধভাবের তেমন কোন স্থান নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কোন নারীর দৃঢ়চিত্ততা ও একনিষ্ঠ পতিভক্তি কোন ধর্ম্মেরই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি নহে সুতরাং ইহার ভিতর কর্ম্মবাদ, ভক্তিবাদ প্রভৃতি টানিয়া আনিয়া লাভ নাই। মধ্যযুগের গল্পগুলির মধ্যে আদিতে বৌদ্ধ-প্রভাব এবং ক্রমে ইহার বিলোপ সম্বন্ধে যাহারা আস্থাবান আমরা তাহাদের মতকে সমর্থন করি না। তবে, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক আদর্শের স্থান ইহাতে প্রচুর। এতদ্ভিন্ন শাক্ত দেবীর উপযোগী সমস্ত লক্ষণই এই দেবীর পূজায় রহিয়াছে। মনসার ছড়া ও পাঁচালিতে মন্ত্র-তন্ত্রাদির প্রভাব, শারীরিক অসম্ভব কষ্টস্বীকার ও পশুবলি প্রভৃতি তান্ত্রিকতাও শাক্তমতের যেমন সাক্ষ্য দেয়, পৌরাণিক নানা দেব-দেবীর উল্লেখ সেইরূপ ইহাতে পরবর্ত্তীকালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব সূচিত করে।

বোধ হয় চণ্ডীপূজক ও মনসাপূজকগণের মধ্যে কোন সময়ে খুব বিবাদ বর্ত্তমান ছিল মঙ্গল-কাব্যগুলিতে ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ

এই অশাস্ত্রীয় দেবীর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এই দেবীর সাহায্যে তাঁহাদের বিশিষ্ট পৌরাণিক মত প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহারা আশানুরূপ সফল হইয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। চণ্ডী বা মঙ্গল-চণ্ডী দেবীর উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যতটা পড়িয়াছিল, ইহাতে ততটা পড়ে নাই। মনসা দেবী সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে চণ্ডী দেবীর ন্যায় এতটা সমাদৃতা হন নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ জাতিগত। বাঙ্গালার মূল সর্পপূজক অষ্ট্রিক জাতির সংখ্যাধিক্য ও অবনতি ইহাদিগকে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রচারক আর্য্য ব্রাহ্মণগণের নিকট হীন করিয়া ফেলিয়াছিল। হয়ত ইহার ফলেই মনসা দেবীর পূজা সর্ব্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিলেও উচ্চশ্রেণীর বঙ্গীয় হিন্দুগণের মধ্যে প্রচারিত পৌরাণিক প্রভাব এই দেবীকে কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। অবস্থাপন্ন বৈশ্য-বণিক শ্রেণীর নায়ক-নায়িকা দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণের ছড়া-পাঁচালী রচনাদ্বারাও এই দেবীকে চণ্ডী দেবীর তুল্য সম্মান দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। চণ্ডী দেবী প্রবল পামিরীয় ও মঙ্গোলীয় জাতিদ্বয়ের অত্যন্ত প্রিয় দেবী হওয়ার পর আর্য্যগণের মধ্যে সমাদৃতা হন এবং ব্রাহ্মণগণ এই দেবীকে পৌরাণিক দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে শিবের পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া গ্রহণ করেন। বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব আগে চণ্ডী দেবীতে পড়ে, পরে মনসা দেবীর উপর পতিত হয়। মঙ্গলকাব্য পুথিসমূহে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

(খ) মনসা-পূজার কাহিনী। (চাঁদসদাগরের উপাখ্যান)

মনসা-দেবীর শিব-বীর্য্যে জন্ম। এই বীর্য্য একটি পদ্মের মৃণাল আশ্রয় করিয়া পাতালে নাগ-রাজ বাসুকীর গৃহে অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অতঃপর বাসুকী মনসা দেবীকে শিবঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন। মনসা দেবীর জন্মের পূর্ব্বে শিবের ঘর্ম্ম হইতে নেতা নামে অপর একটি দেবীর জন্ম হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব ঘটনা দুইটি চণ্ডী দেবীর অজ্ঞাতসারে এক পুষ্পবাড়ীতে শিবঠাকুরের কামোদ্রেকের ফলে সংঘটিত হয়। ঘটনাচক্রে নেতা দেবী মনসা দেবীর জ্যেষ্ঠা হইয়াও তাঁহার সঙ্গিনী এবং সর্ব্বদা উপদেশ-দাত্রীরূপে নিযুক্ত হন। চণ্ডী দেবীকে লুকাইয়া শিব-ঠাকুর পুষ্পবাড়ী হইতে কন্যাকে গৃহে আনিতে যে প্রচেষ্টা করেন তাহার ফলেই মনসা-পূজার বীজ প্রথমে মর্ত্ত্যলোকে রোপিত হয়। একটি ফুলের সাজির ভিতর তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া শিবঠাকুর গৃহে যাইবার পথে রাখালগণকে দেখিয়া কন্যার জন্য কিছু ক্ষীর চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ প্রথমে রক্ষিত হইল না।

ইহার ফলে একটি রাখাল সেইস্থানে ঢলিয়া পড়িল। তাহার পর অবশ্য রাখালেরাও ক্ষীর দিল এবং শিবের উপদেশে মনসা-পূজা করিয়া মৃত রাখালকে পুনরুজ্জীবিত করিল। ইহার পরে হালুয়া কৈবর্ত বাছাইর উপাখ্যান। ধনী কৈবর্ত বাছাই মনসাকে চিনিতে না পারিয়া অপ্রীতিকর রসিকতা করিল এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। ইহার ফলে সেও মনসা দেবীর রোষনেত্রে পড়িয়া ঢলিয়া পড়িল। অতঃপর বাছাইর মাতা আসিয়া মনসা দেবীর স্তুতি করিয়া পুত্রকে দেবীর কৃপায় পুনরায় জীবিত করিল এবং খুব ধুমধাম করিয়া মনসা-পূজা করিল।

কিন্তু চম্পকনগরের চাঁদ (চন্দ্রধর) সদাগর পূজা না করিলে মনসা-পূজা প্রচারিত হইবে না ইহাই ছিল শিবঠাকুরের নির্দ্দেশ। মনসা দেবী এইদিকে মনোনিবেশ করিলেন। কতকগুলি ঘটনাচক্রে পড়িয়া এই দেবীর মনে কোন সুখ ছিল না। ইহার এক কারণ, শিব ইহাকে নিয়া কৈলাশে তাঁহার গৃহে ফিরিলে চণ্ডী দেবী শিবের অনুপস্থিতিতে ফুলের সাজিতে (করণ্ডীতে) লুক্কায়িতা মনসা দেবীর অবস্থিতি টের পান। ইহার ফলে উভয়ে যে বিবাদ হইল তাহাতে চণ্ডীর আঘাতে মনসা দেবীর একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। ইনিও চণ্ডীকে দংশন করাতে চণ্ডী দেবী মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। শিবের অপর পত্নী গঙ্গাদেবী এই বিবাদে যোগ দেন নাই। যাহা হউক অবশেষে দেবগণের সাহায্যে শিব কন্যাকে শান্ত করিতে এবং চণ্ডী দেবীর জ্ঞান ফিরাইতে অথবা বাঁচাইতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর শিব জরৎকারু নামক এক কোপনস্বভাব ঋষির সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। এই ঋষি পত্নীত্যাগের ওজর খুঁজিতেছিলেন কারণ গৃহধর্ম্ম তাঁহার মনঃপুত ছিল না। কোন ছলে শীঘ্রই তিনি মনসা দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে শিব খুব দুঃখিত হইলেন এবং নেতাসহ মনসা দেবীকে জয়ন্তীনগরে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বতন্ত্র বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এইস্থানে সমস্ত সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসা দেবী বাস করিতে লাগিলেন।

একদা শিব-পূজক এক বিদ্যাধর অজ্ঞাতে মনসা দেবীর রোষের কারণ হইলেন এবং দেবীর কোপে চম্পকনগরে এক ধনী বণিক গৃহে চন্দ্রধররূপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও চন্দ্রধর কালক্রমে শিবের একনিষ্ঠ সেবকরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। চন্দ্রধরের স্ত্রীর নাম সনকা। এখন মনসা দেবী স্বীয় পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করিয়া দেব-সমাজে কৌলিন্যলাভ মানসে চন্দ্রধরের হস্তে পূজা পাইতে ইচ্ছুক হইলেন, কারণ ইহাই ছিল

দেবলোকের নির্দ্দেশ। কিন্তু পরম শৈব চাঁদ কিছুতেই মনসা দেবীর পূজা করিবেন না। তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতাদ্বয় হইতেছেন হর-গৌরী। তখন লোকচক্ষুর কতকটা অন্তরালে কেহ কেহ ঘটে মনসা-পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ঝালু-মালু নামক জালিক কৈবর্ত্ত ভ্রাতৃদ্বয় উল্লেখযোগ্য।[১] লোকমুখে মনসা দেবীর খ্যাতি শুনিয়া সনকা গোপনে ঝালু-মালুর বাড়ীতে গিয়া মনসা-পূজা করিতে যান। সেই সময় চাঁদ এই নূতন দেবীর ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং পত্নী কর্ত্তৃক মনসা-পূজার কথা কোনক্রমে অবগত হইয়া ক্রোধে ঝালু-মালুর বাড়ী গিয়া তাঁহার হস্তস্থিত হিন্তাল কাষ্ঠের লাঠি বা হেঁতালের বাড়ি দ্বারা মনসা-দেবীর ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শিবঠাকুরের নির্দ্দেশে চাঁদ মনসার অবধ্য। সুতরাং প্রহারের ফলে ভগ্ন কাঁকালী দেবী মনসা অন্তর্দ্ধান করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর চাঁদসদাগরকে শিক্ষা দিবার জন্য মনসা দেবী চাঁদের ছয় পুত্রকে মারিয়া ফেলিলেন। চাঁদের তখন আর কোন পুত্র ছিল না। চন্দ্রধরের বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝাকেও মনসা দেবী বিনাশ করিলেন এবং সদাগরের বড় সাধের একটি বাগানও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজতুল্য চাঁদ মনসা দেবীর বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অধিকারে সমস্ত স্থানে মনসা-পূজা বারণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ সময়ে স্বীয় পূজাপ্রচারে বাধা পাইয়া মনসা দেবীও ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিলেন। অবশেষে শিবঠাকুরের মধ্যস্থতায় স্থির হইল স্বর্গের বিদ্যাধর অনিরুদ্ধ ও তাহার পত্নী উষা মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দ্রধরকে বশে আনিবেন। এই দুইজন পূর্ব্বজন্মে মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসীই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের বাণ রাজার কন্যা উষার মর্ত্ত্যলোকে পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ উভয়ের বিবাহ হয়। এই দুইজনকে পুনরায় মর্ত্ত্যে পাঠাইতে ছলের অভাব হইল না। উষা স্বর্গলোকে নৃত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মনসার ছলনায় নৃত্যের ত্রুটিহেতু উভয়েরই মর্ত্ত্যে যাইতে হইল তবে তাঁহারা একটি সুবিধা এই পাইলেন যে উভয়ে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।

এদিকে চাঁদ শোকে দুঃখে কাতর হইয়া বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রপথে দূরদেশে যাইতে মনস্থ করিলেন। এই সময় সনকা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। চাঁদ বাণিজ্যে গেলে অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীন্দররূপে সনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

---

(১) কোন কোন ব্রতকথায় ঝালু-মালুর উল্লেখ ও সর্প-পূজার উল্লেখ আছে। দেবীর পূর্ব্বীয় বিগ্রহে মনসা-দেবীর সহিত ঝালু-মালু, নেতা ও দুলহা দেবী বিরাজ করিতেছেন।

আবার উজানিনগরের ধনী বণিক সাহের পত্নী সুমিত্রার গর্ভে উষার বেহুলারূপে জন্ম হইল। সিংহল ও দক্ষিণ পাটনে চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়া বাণিজ্য করিতে যাইয়া চাঁদের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। অসাধু ব্যবহারে পাটনের রাজাকে প্রতারিত করিয়া বহু ধন ও মূল্যবান বস্তুসহ ফিরিবার পথে মনসা-দেবীর চক্রান্তে কালীদহে চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিয়া গেল। প্রধান ডিঙ্গা মধুকর হইতে জলে পড়িয়া চাঁদ 'শিব শিব' বলিয়া কত ডাকিলেন, কিন্তু শিবঠাকুর তাহার ভক্তকে উদ্ধার করিলেন না। তবে শিব একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি চাঁদকে প্রাণে মারিতে মনসাকে নিষেধ করিয়াছিলেন কারণ চাঁদের মৃত্যু হইলে মনসা-পূজা প্রচলিত হইবে না। তাই চাঁদ অবশেষে ডিঙ্গা ও ধনজন হারাইয়াও নিজে রক্ষা পাইলেন। চাঁদের পদ্মার প্রতি এত ঘৃণা হইয়াছিল যে এই দেবীর দত্ত কোন সাহায্যই লইলেন না। ইহাতে প্রাণ যায় তাহাও ভাল। এমনকি পদ্মফুল দেখিয়া পর্য্যন্ত পদ্মানামের সংশ্রবহেতু তাহাতে কুলকুচা করিয়া জল ফেলিলেন। এই চাঁদ সদাগর অনমনীয় তেজস্বীতার প্রতীক। কিন্তু তাঁহার পত্নী সনকা ও আত্মীয়স্বজনের নিকট দাম্ভিক ও গোঁয়ার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

মনসা দেবীর ক্রোধে ও কৌশলে পথে নানাস্থানে লোকজন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও ভিমরুল কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া বহু দুঃখ কষ্ট এবং অনেক দুর্ঘটনা অতিক্রমের পর অবশেষে চাঁদ নিজরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে লক্ষীন্দরের তরুণ বয়স, দিব্যকান্তি ও মধুর ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। চাঁদ পুত্রকে সাহে রাজার কন্যা বেহুলার সহিত বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে সনকার ঘোর আপত্তি ছিল কারণ লক্ষীন্দরকেও সর্পদংশনের ভয় ছিল। এমনকি জ্যোতিষিক মতে বাসর ঘরেই সর্পদংশনের কথা। তবুও চাঁদ জোর করিয়া অদ্ভুত গুণসম্পন্না বেহুলার সহিত লক্ষীন্দরের বিবাহ দিলেন এবং নানা ঘটনাপরম্পরা সাহে রাজা প্রথমে অমত করিলেও পরে এই বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন।

চাঁদ একটি লোহার ঘর বিশেষ যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে পুত্র ও পুত্রবধূর কালরাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করিলেন। গৃহটি যেমনই দৃঢ় ও ছিদ্রহীন তেমনই ইহা বিশেষজ্ঞ নানা লোকজনের পাহারা রাখিয়াছিলেন ও সর্পবিষের প্রতিষেধক নানারূপ নিখুঁত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু মনসা দেবীর কূট কৌশলে একটি ছিদ্র অজ্ঞের অলক্ষ্যে রহিয়াই গেল এবং সেই ছিদ্রপথে কালনাগিনী মনসা দেবীর

নির্দ্দেশে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিল। কমনীয়কান্তি লক্ষ্মীন্দরের ভবিতব্য ফলিল।

অতঃপর বেহুলার মৃত স্বামীকে নিয়া ভেলায় ভাসিবার পালা। মনসা-মঙ্গলের মূলরস করুণরস। লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু উপলক্ষে বেহুলা, সনকা ও চন্দ্রধরের করুণ ক্রন্দন বিভিন্ন কবির তুলিকায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! পথে নানা বাঁকে বেহুলা কত বিপদে পড়িলেন, কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা এই মহীয়সী ও পতিব্রতা নারীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু বিপদের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিতা হইয়া বেহুলার চরিত্র যেন আরও উজ্জ্বলতর হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। অবশেষে দেবলোকে গিয়া নেতা দেবীর সাহায্যে বেহুলা দেবাদিদেব মহাদেবের করুণা ভিক্ষা করিলেন। শিবঠাকুরের আদেশে অশ্রুভারাক্রান্ত এই নারী সমবেত দেবসভায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং নৃত্যে বিমুগ্ধ করিয়া দেবতাদের এবং বিশেষ করিয়া হর-গৌরীর কৃপালাভে সমর্থা হইলেন। মনসাকে অত্যন্ত অনিচ্ছার মধ্যেও লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাইয়া দিতে হইল। শুধু ইহাই নহে। এই উদার হৃদয় চন্দ্রধরের পুত্রবধূটি তাঁহার ছয় ভাসুর, ধন্বন্তরি ওঝা এবং অপরাপর মৃতব্যক্তিদেরও প্রাণ ফিরাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। এই প্রার্থনা ত রক্ষিত হইলই, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরও দ্রব্যজাতসহ পুনরায় জলে ভাসিয়া উঠিল। এই সমস্ত জিনিষপত্র ও লোকজনসহ স্বামীকে নিয়া বেহুলা সতীত্বের বিজয় মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার সুনিশ্চিত ফল ফলিল। এত আপদ-বিপদের পর বেহুলার চরিত্রবল জয়লাভ করিল। চন্দ্রধর তাঁহার পুত্রবধূর অনুরোধে অবশেষে বামহস্তে পদ্মাপূজা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে চাঁদ ও পদ্মা দেবীর বিবাদ অবসানের ফলে মর্ত্ত্যলোকে মনসা-পূজা প্রবর্ত্তনের বাধা দূর হইল। কিন্তু বেহুলার দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহে ফিরিয়াও চরিত্র বিষয়ে তাঁহাকে সর্প, জল, অগ্নি প্রভৃতির কঠিন পরীক্ষা দিতে হইল। যদিও যাত্রা করিবার সময় সনকার কাছে পরীক্ষার জন্য বহু কঠিন ও অসম্ভব বস্তুনিচয় রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণাও হইয়াছিলেন তবুও তাঁহার নিস্তার নাই। বাড়ী ফিরিয়া চাঁদ কর্ত্তৃক মনসা-পূজার পর চাঁদ ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের সম্মুখে এই সব পরীক্ষায় পুনরায় জয়লাভ করিবার পর বেহুলার আর এই কঠিন পৃথিবীতে থাকিতে সাধ রহিল না। তখন মনসা দেবী লক্ষ্মীন্দরসহ ভক্তিমতী বেহুলাকে স্বর্গলোকে নিয়া চলিলেন। স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বে যোগী ও যোগিনীর ছদ্মবেশে শেষবারের জন্য স্বামীসহ বেহুলা একবার পিতৃগৃহে গিয়া সকলের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় পরিচয়জ্ঞাপক এক পত্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময় মাতা-কন্যার সাক্ষাৎ অত্যন্ত করুণ ও স্নেহপ্রস্রবণসিক্ত। বেহুলা চলিয়া যাইবার পর তাহার প্রকৃত পরিচয় পত্রপাঠে অবগত হওয়াতে সাহে বণিক ও সুমিত্রার শোকাকুল অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক মর্ত্ত্যের লোক ক্রন্দন করুক এবং বেহুলা ও লক্ষীন্দর পুনরায় উষা ও অনিরুদ্ধরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া মনসা দেবীর কৃপায় স্বর্গলোকে সুখে থাকুন। এই স্থানে আমাদের গল্পের শেষ হইল।

এই গল্পের মধ্যে পৌরাণিক আদর্শ পরবর্ত্তীকালের আমদানি। এই কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া গল্পের গোড়ায় পুরাণকারের রীতি অনুযায়ী একটি পৌরাণিক গল্প কবিগণ জুড়িয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের গল্প ও উপমা-তুলনায় সর্ব্বশ্রেণীর মঙ্গলকাব্য ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈষ্ণব আদর্শের নিদর্শনই ক্রমে পরিমাণে অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে হিন্দুসমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণের লৌকিক সাহিত্যকে পৌরাণিক সাহিত্যের সান্নিধ্যে আনিয়া ফলশ্রুতি ও উচ্চশ্রেণীর গ্রহণযোগ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে বলা যাইতে পারে। অতঃপর মনসা-মঙ্গলের কবিগণের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ

(১) হরি দত্ত

হরিদত্ত নামক জনৈক প্রাচীন কবি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কবির রচিত নির্ভরযোগ্য কোন পুথি এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবু যতটুকু রচনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই কবির সময়নির্দ্দেশ কঠিন বটে। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি বিজয় গুপ্তের পুথিতে ইহার যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ হরিদত্তকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন। বিজয়গুপ্তের পুথিতে আছে—

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গীত নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"

—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

বিজয় গুপ্ত খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি। তাঁহার পুথিতে পাওয়া যাইতেছে কাণা হরি দত্ত মনসা-মঙ্গলের আদি কবি। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করা যাইতে পারে এই কবি কাণা ছিলেন সেইজন্য কবিকে "কাণা হরি দত্ত" নাম দেওয়া হইয়াছে। এই কবিকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াও বিজয় গুপ্ত তাহাকে মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবির গৌরবান্বিত আসন দিয়াছেন। হইতে পারে তিনিই এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যের প্রথম কবি এবং তিনি আনুমানিক খৃঃ ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। বিজয় গুপ্তের সময় হরি দত্তের কাব্য লুপ্ত হওয়ার কথায় বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এই প্রসিদ্ধ কাব্যখানির এইরূপ অবস্থা হইতে অন্ততঃ ২৫০।৩০০ শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। এক্ষেত্রে সবই অনুমানের

উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। আর একটি প্রশ্ন হইতেছে "কাণা হরি দত্ত" ও "হরি দত্ত"কে লইয়া। হরি দত্ত নামক জনৈক কবির যে কয়েক ছত্র পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ইনিই বিজয় গুপ্ত বর্ণিত "কাণা হরিদত্ত" কিনা কে বলিতে পারে। কাণা হরি দত্ত পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলিয়াও অনুমিত হইয়াছেন। তবে কোথায় তাঁহার বাড়ী ছিল কেহ জানে না। মোট কথা এই কবির সম্পর্কিত প্রায় সব কথাই অনুমান মাত্র সুতরাং খুব নির্ভরযোগ্য নহে। কেবলমাত্র কবি বিজয় গুপ্তের উক্তি কবি সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোকপাত করিয়াছে। হরি দত্তের পুথির যে পরিমাণ অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও আবার অন্য কবির হস্তক্ষেপ থাকাই সম্ভব। পুরুষোত্তম নামক জনৈক কবি হরি দত্তের পুথি পরিবর্ত্তন করিয়া যে স্থানে স্থানে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১]

নারায়ণ দেবের একটি পুথিতে হরি দত্তের ভণিতাযুক্ত দুইটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। উহা মৎসম্পাদিত নারায়ণদেবের পদ্মা-পুরাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই "হরি দত্ত" ও "কাণা হরি দত্ত" অভিন্ন কি না সঠিক বলা না গেলেও একই কবি বলিয়া আপাততঃ অনুমান করিলে ক্ষতি নাই। নারায়ণ দেবের পুথিতে প্রাপ্ত উল্লিখিত ছত্রগুলি এইরূপ,—

(ক) চাঁদসদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন

(পুত্রের বিবাহান্তে)

লাচাড়ি ॥ সুহিরাগ ॥

"সাহে বাণিয়া কান্দে কোলে লইয়া ঝি।
ঘর সজ্জ করিয়া জাও চাহিমু গিয়া কী ॥
ডাক দিয়া আন দ্রুত খেলার সখিগণ।
আইসে না আইসে বেউলা মায়া হউক দরসন ॥
সাহে রাজা কান্দে বেউলারে কোলে তুলি।
হিজুলজালি বাসরে মোর কে করিব ধামালি ॥
সাহে রাজা কান্দে বেউলার মুখ চাইয়া।
নাগের বাহুয়ার ঠাই তোমারে দিমু বিহা ॥
এই জে দারুন দুঃখ রহিল মোর চিত্তে।
মনসার চরণ গিত গাইল হরি দত্তে ॥"

—মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৬৬ (প্রথম সং)।

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত), ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(খ) পদ্মার নাগআভরণ পরিধান।
(যমরাজার সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে)

লাচাড়ি

"সাজিল সাজিল দেবী সিবের নন্দনি
বাহুত বান্দিয়া বিরবালা।
ভূজঙ্গ হাতে কাকালি জমচুত গুড়াগুড়ি
জমের কটকে দিতে হানা॥
পরিধান করিল দেবী উত্তম পাটের সাড়ি
হেঙ্গুল বাড়ি নাগে খাট কৈল।
অনন্ত বাসুকি আইল মাথার মকুট হইল
ত্রিপাপত্র তাড়ু নাগে হইল॥
দুই হস্তের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনি আইল
কেশের জাদ ই কালনাগিনী।
সুতলিয়া নাগ আইল গলার সুতলি হইল
বেতনাগে কাকালি কাছণি॥

* * * *

হেমন্ত বসন্ত নাগে পিষ্ঠের থোপ লাগে
অগ্নি জলে মুখে কোনা কোনা।
অমৃত নয়ান এড়ি বিস নয়ানে চায়
ভয় পাইল জত সুরজনা॥
আদেশিল বিসহরি ধামনা দুয়ারী
পর্ব্বতে সাড়া দিতে জায়।
মনসার চরণ সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি হরিদত্তে গায়॥"

—মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ
(প্রথম সং, পৃঃ ১৬৫-১৬৬)।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে (১৭৪-১৭৫ পৃঃ) কাণা হরিদত্তের রচিত বলিয়া অনুমিত কবির নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

পদ্মার সর্প-সজ্জা

"দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী ॥
সিতলিয়া নাগে কৈল সীতার সিন্দুর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিণী।
বেতনাগ দিয়া কৈল কাকালি কাঁচুলী ॥
কনক-নাগে কৈলা কর্ণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি ॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণা ॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায় ॥"

—কাণা হরি দত্তের মনসা-মঙ্গল।

কাণা হরি দত্ত সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে কবিকে বিজয় গুপ্তের কথা সমর্থন করিয়া কবিত্বগুণহীন "মূর্খ" বলিতে ইচ্ছা হয় না। এই কবির অন্ততঃ যথেষ্ট বর্ণনাশক্তি এবং কিছুটা প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তি ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(২) নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেব মনসা-মঙ্গলের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। খুব সম্ভব ইনি কাণা হরি দত্তের পরেই পদ্মাপুরাণ নাম দিয়া তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। উভয় কবির সময়ের ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসর অনুমান করিলে খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর মধ্য কি শেষভাগে কবি নারায়ণ দেবের অভ্যুদয়ের সময়[১] ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য কাণা হরি দত্তকে কেহ কেহ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি মনে করিলেও ইনি খৃঃ ১২শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ কি

(১) কোন কোন পুঁথিতে এই দুই ছত্র পাওয়া যায়:—

"পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোকে বান্ধা আছে।
নারায়ণ দেব তাহে পাঁচালি করিছে।" ইহাতে কবির প্রাচীনত্বই সূচিত হয়।

১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত মনসা-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে কাণা হরিদত্ত প্রথম কবি বলিয়া স্বীকৃত হইলে নারায়ণ দেব সময়ের দিক দিয়া দ্বিতীয় কবি। এই কাণা হরিদত্ত যে মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি তাহাও বিজয় গুপ্তের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। মনসা-মঙ্গলের তৃতীয় কবি হইতেছেন এই বিজয় গুপ্ত এবং ইনি খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই সব প্রসিদ্ধ কবিগণের স্বহস্তলিখিত পুথি একখানাও প্রাপ্ত হওয়ার উপায় নাই। কাণা হরিদত্তের রচিত কতিপয় ছত্র ভিন্ন কবির লিখিত সম্পূর্ণ পুথি তো পাওয়াই যায় না, তাঁহার পরবর্ত্তী নারায়ণ দেবের পুথিতেও বহু কবির হস্তচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত কবির স্বলিখিত সম্পূর্ণ পুথি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

নারায়ণ দেবের পূর্ব্বপুরুষের আদি বাস মগধ ছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। কোন সময়ে ইহারা মগধ হইতে রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে এই বংশের কেহ কেহ পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কবির অধস্তন ১৭শ পুরুষ বলিয়া গণ্য এই বংশের যাহারা এই অঞ্চলে বাস করিতেছেন তাহারা এখন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মধ্যে অবস্থিত বোরগ্রামের অধিবাসী। ইহাদের প্রমাণানুসারে নারায়ণ দেব বোরগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রামটি জোয়ানসাহী পরগণায় অবস্থিত। নারায়ণ দেব জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাহার গোত্র মধুকুল্য এবং গাঁই গুণাকর। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত তথ্য হইতে জানিতে পারা যায় কবির মাতার নাম রুক্মিণী বা রত্নাবতী এবং পিতার নাম নরসিংহ। মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে নিম্নরূপ ভণিতা আছে :—

"নরসিঙ্গতনয় নারায়ণ দেবে কয়
ডিঙ্গা বাইয়া যায় তরাতরি।"

—(মৎসম্পাদিত পদ্মাপুরাণ, ১ম সং, পৃঃ ২২৫)

বল্লভ নামে কবির একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল বলিয়া ডাঃ সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এমনকি তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়ে"র প্রথম খণ্ড পাঠে জানিতে পারি যে এই বল্লভ নামক "ভ্রাতাটি" "নারায়ণ দেব অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বৎসরের ছোট। নারায়ণ দেব কিছুতেই বিদ্যাচর্চ্চা করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্পে এক সরোবরের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এই সময়ে

মনসা দেবীর কৃপায় তাঁহার সরস্বতীর অনুগ্রহলাভ হইল। নারায়ণ দেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন ও বল্লভ লিখিতে লাগিলেন, এইভাবে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মনসার ভাসান রচিত হয়। বিশেষ বিবরণ তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৯৩ পৃষ্ঠায় ও ভূমিকায় "খ" পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অপরাপর বিবরণ ১৭৩০ শকাব্দে পরগণা ভাতিয়া গোপালপুর, চোওডালা গ্রাম নিবাসী শ্রীগৌরীকান্ত দাস লিখিত নকল হইতে শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন।"

ডাঃ সেন বল্লভ সম্বন্ধে উল্লিখিত যে সমস্ত কথা অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই অংশটুকুর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়" মৎসম্পাদিত পদ্মাপুরাণে (পৃঃ ২১৯ এবং অন্যত্র) নারায়ণ দেবের এই ভণিতা তাহার পদ্মাপুরাণে প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পুথিখানিতে অপর একটি ভণিতা ইহা অপেক্ষাও অধিক রহিয়াছে, যথা :—"সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালি। পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥" —(মৎসম্পাদিত পদ্মাপুরাণ, ১ম সং, পৃঃ ১৩৭ এবং অন্যত্র)। আমাদের বিশ্বাস নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল "সুকবিবল্লভ" এবং "সংক্ষেপে সুকবি" যেমন চণ্ডী-মঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের উপাধি ছিল "কবিকঙ্কণ"। প্রথম ভণিতাটির অর্থ যে নারায়ণ দেব "সুকবি বল্লভ" বলিয়া খ্যাত তিনিই এই পদ বলিতেছেন। এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। বাঙ্গালার ন্যায় আসামেও নারায়ণ দেবের "সুকবি" উপাধিটির এত প্রসিদ্ধি যে তথায় এই কবির অসমিয়া সংস্করণের যে পদ্মাপুরাণ আছে তাহার নাম "সুকবির" পদ্মাপুরাণ এবং তথাকার জনসাধারণ সুকবির পদ্মাপুরাণ বলিতে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণকেই বুঝিয়া থাকে।

নারায়ণ দেব মনসা-মঙ্গলের কবি হিসাবে এরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে উত্তর-বঙ্গ বা বরেন্দ্র এবং রাঢ়দেশে এই কবির গান ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া ময়মনসিংহের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি বংশীদাস নারায়ণ দেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া পরবর্ত্তী কালে তাহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। আমার নিকট রক্ষিত নারায়ণ দেবের পুথিটিতে বংশীদাসের রচিত ও ভণিতাযুক্ত পদও পরবর্ত্তীকালে নারায়ণ দেবের গানের সহিত যোজিত হইয়া শোভা পাইতেছে। রাঢ়ের সুবিখ্যাত কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও অনেক পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার পুথিতে লিখিয়া গিয়াছেন, "নারায়ণ দেবে আমি করি যে বিনয়" ইত্যাদি।

নারায়ণ দেব অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। এই কবির প্রধান কৃতিত্ব করুণরসের স্ফুরণে। বিবাহের পর কালরাত্রিতে সর্পদংশনের ফলে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুকালীন রোদন এবং মৃত্যু হইলে বেহুলার অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে করুণ বিলাপের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা নারায়ণ দেব অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। সনকা ও চাঁদসদাগরের শোকাচ্ছন্ন মনের অভিব্যক্তিও কম হৃদয়বিদারক নহে। অথচ এই তিনজনের বিলাপের মধ্য দিয়া কবি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। করুণরসাত্মক মনসা-মঙ্গল কাব্যের এই অংশ শ্রেষ্ঠ কবির তুলিকাস্পর্শে সমুজ্জল হইয়াছে।

সর্পদংশনকাতর লক্ষ্মীন্দর বলিতেছে,—

"উঠল সুন্দরী বেউলা কথ নিদ্রা জাও।
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও ॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি খিতিতলে।
অকালেতে রাড়ি হইলা খণ্ডব্রত ফলে ॥
কত খণ্ডব্রত তুমি কৈলা গুরুতর।
সেহি দোষে ছাড়ি তোরে জায় লক্ষ্মীন্দর ॥
মাও সনকা আমার মিত্যু শুনি।
সরির কষ্ট করি মায়েতে জিব পরাণি ॥
আমার মরণে মায়ের লাগীব বড় তাপ।
মন দুঃখে মায়ে সাগরে দিব ঝাপ ॥
আমার মরণে মাও হইব কালি ছালি।
আমার মরণে মাও সাগরে দিব ডালি ॥" ইত্যাদি।

(মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৮৯-৯০)

আর নিদ্রোত্থিতা বেহুলা ?—

"হিমালয় টনক দেখে প্রভুর শর্ব্ব গাও।
বুকে ঘাও মারে বেউলা মুখে না আইসে রাও ॥
হার করো ছারখার কঙ্কন করো চুর।
মুছিয়া ফেলায় আজি সিথের সিন্দুর ॥
বেগর দোসে কৈল মোরে পঞ্চ অবস্থা।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু তুমি গেলা কথা ॥

আমা হনে সুন্দরী আছে কোন সাউধের নারী।
তে কারণে গেলা প্রভু আমাকে পরিহরি॥
আমি হেন অভাগীনি নাহি খিতিতলে।
অকালেতে রাড়ি হইনু খণ্ডব্রত ফলে॥
কত খণ্ডব্রত আমি কৈলাম গুরুতরে।
সেহি দোসে প্রভু তুমি ছাড়ি গেলা মোরে॥
কিবা ইষ্ট কিবা মিত্র কিবা বাপ ভাই।
তুমি প্রভু অভাবে দাড়াইতে লক্ষ্য নাই॥
জে বিধি লিখিয়াছে অভাগীর কলেবর।
মহাসাঁপ দিব আজি বিধাতা উপর॥
সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্মরাশি।
বিধাতারে কি বুলিব মুঞি কর্ম্ম হ্রাস॥
অভাগিনীর সরির অগ্নিতে করোঁ খয়।
এহি কর্ম্ম করিবারে মোর মনে লয়॥
ক্ষ্যাতি রাখিব আমি সংসার জুড়িয়া।
মুঞি অগ্নিত পুনি মরিব পুড়িয়া॥
চিতা সাজ্জাইব আমি গুঞ্জুরিয়ার তিরে।
তোমা লইয়া প্রবেসিব চিতার উপরে॥" ইত্যাদি।

(মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, ১ম সং, পৃঃ ৯৩-৯৪)

মাতা সনকার ক্রন্দনও বড় মর্ম্মস্পর্শী—

"পুত্র পুত্র বুলি সোনাঞি তুলিয়া লইল কোলে।
কান্দিয়া আকুল সোনাই লোটায় ভূমিতলে॥
বুকে মারে ঘাও সোনাই মুখে না আইসে রাও।
দুঃখিনি সোনাইরে হাসিয়া বোলান দেও॥
কোন রাজ্যে জাইব আমি তোমা না দেখিয়া।
পুত্রের কারণে মোর পুড়িয়া উঠে হিয়া॥
ছয় পুত্র মরণে লাগিল জত তাপ।
তুমি পুত্র লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ॥" ইত্যাদি।

(মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৯৯)

এই শোকাবহ ঘটনা একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সুকুমারমতি লখীন্দর মৃত্যুকালে স্ত্রীকে জাগরিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টার পর "মা, মা" বলিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু বেহুলা চরিত্র এত কোমল নহে। এই চরিত্র কোমলে কঠোরে গঠিত। ধৈর্য্য ও চিত্তের দৃঢ়তায় অতুলনীয়া পতিব্রতা বেহুলা শুধু ক্রন্দনেই এই শোকাবহ দুর্ঘটনার পরিসমাপ্তি হইতে দেন নাই। তিনি অল্পকাল পরেই স্বীয় শোক সংযত করিয়া স্বামীকে পুনরায় জীবিত করিবার মানসে তাহাকে নিয়া ছয় মাসের জন্য ভেলায় ভাসিতে প্রস্তুত হইলেন। এই স্বামীভক্তিপরায়ণা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারীর তপস্যা যে অবশেষে সাফল্যলাভ করিল তাহা বলাই বাহুল্য। মাতা সনকার রোদন গভীর হইলেও সাধারণ মাতা এই অবস্থায় শোকের যে পরিচয় দিয়া থাকেন মাতা সনকা তদতিরিক্ত কিছু করেন নাই। তিনি ঘোর অদৃষ্ট-বাদিনী, বেহুলার ন্যায় আত্মনির্ভরতা তাঁহার মধ্যে নাই। কিন্তু চাঁদের চরিত্র অন্যরূপ। কবি নারায়ণ দেব ইহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। চাঁদসদাগর স্বীয় পত্নী সনকার ন্যায় অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল নহেন। তিনি ঘোর পুরুষকার বিশ্বাসী ও শিবভক্তিপরায়ণ। তাঁহার মনোবল ও ধৈর্য্য অসীম। মনসার ন্যায় প্রতিহিংসাপ্রবণা দেবীর সহিত বিবাদে তিনি যে জেদ দেখাইয়াছেন তাহা একমাত্র চাঁদসদাগরেই সম্ভবে। অন্য সকলে, এমনকি স্ত্রী সনকা পর্য্যন্ত, এই জন্য চাঁদকে অনাবশ্যক কলহপরায়ণ মনে করিয়াছেন। এই দুর্ব্বার মনোবলের প্রকাশকে নির্ম্মমতা ও অনাবশ্যক জেদ বা গোঁয়ারের কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মত দিয়াছেন। এই সমীতরু বা বটবৃক্ষ তুল্য চাঁদ পুত্রের মৃত্যু প্রথমে শ্রবণ করিয়াই আকস্মিক পুত্রশোকে কালক্ষেপ না করিয়া মনসাদেবীর উপর ক্রোধে কালানল তুল্য প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নারায়ণদেব যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"এতি বুলি কান্দে সোনাই পুত্র লইয়া কোলে।
অন্তসপুরে বার্ত্তা পাইল চান্দো সদাগরে॥
হেমতাল বাড়ি লইয়া কান্দের উপর।
লড় পাড়িয়া আইসে চান্দো সদাগর॥
চান্দো বোলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে।
বিচারিয়া চাহি নাগ কোনখানে আছে॥
বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিল চান্দো বিসাদ ভাবিয়া॥" ইত্যাদি।

(মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, ১ম সং, পৃ ১০০-১০১)

অতঃপর ওঝা ডাকিয়া মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ব্যর্থকাম হইয়া চাঁদ সদাগর বেহুলার বারম্বার অনুরোধে মৃতপুত্র সহ পুত্রবধূকে ভেলায় ভাসাইয়া দিলেন। তাহার পর সদাগর মনের তীব্র শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া গুঙরি নদীর তীরে বসিয়া,—

"আহারে নদীর তিরে বসিয়া সদাগর ঝুরু ঝুরু কর়য়ে বিলাপ।
মরুয়ার সহিতে জিয়ন্তা ভাসি জায় কাহারে দিয়া য়েত তাপ॥"
—(মৎসম্পাদিতনারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ, ১ম সং, পৃ ১০৯)

করুণরসের স্ফুরণে নারায়ণ দেবের কিরূপ দক্ষতা ছিল উল্লিখিত ছত্রকয়টি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া চরিত্র-চিত্রণেও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার বর্ণনাগুণে বেহুলা, চাঁদসদাগর ও মনসা দেবী যেন জীবন্ত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

নারায়ণ দেব তাঁহার কাব্যে হাস্যরস অপেক্ষা করুণরস ফুটাইতেই অধিক সক্ষম হইয়াছেন এবং মনসা-মঙ্গলও করুণরসপ্রধান কাব্য। কবির মধ্যে মধ্যে জাতিবিষয়ক শ্লেষ উক্তিগুলি বড়ই বাস্তবধর্মী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। যথা,—

"ব্রহ্ম দিজে শুনিয়া চন্দ্রোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্দ্ধেক দিল ততক্ষণ॥
জথা তথা ব্রাহ্মণ না হয় তবে দানী।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দিল কড়াটেকের কানী॥"—(পৃঃ ২৪৩)

অন্যস্থানে,

"দেবগুরু ব্রাহ্মণ আর মাতাপিতা।
বানিয়ার ঠাই নাহি এতেক মান্যতা॥
কাক হস্তে সেআন যে বানিয়া ছাওয়াল।
বানিয়া হস্তে ধূর্ত্ত জেই তারে দেই পান॥"—(পৃঃ ৩২৯)

নারায়ণ দেবের কাব্যে স্থূল রসিকতা এবং অশ্লীলতার পরিচয় থাকিলেও ইহা সীমাবদ্ধ। ইহা যুগধর্ম্মের পরিচায়ক এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক। সেকালের নৈতিক মানদণ্ড দিয়াই সেকালের বিচার করা সঙ্গত। চরিত্রগুলির বিচারে ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মনসা দেবীর চরিত্র নারায়ণ দেব যথেষ্ট ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথেষ্ট প্রতিহিংসা ও ক্রোধের পরিচয় দিলেও দেবীর চরিত্রে কোথায় যেন কিছু অভিমানমিশ্রিত

মৃদুতা রহিয়াছে। পুত্রশোকাতুর ও মনসাবিরোধী চাঁদসদাগরের দুর্জ্জয় ঘৃণা ও প্রতিহিংসার বিরোধিতা করিতে যাইয়া—

"পদ্মা বোলে সুন নেতা আমার উত্তর।
অখনে আমাক মন্দ বোলে সদাগর॥" —(পৃঃ ২৪৬)

বারবার এই উক্তিটির ভিতরে এই মৃদুতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

নারায়ণ দেবের বর্ণনাশক্তি স্বাভাবিক ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি সূক্ষ্ম ছিল। মধ্যযুগের বাঙ্গালী পরিবার ও বাঙ্গালী সমাজের যে চমৎকার প্রতিকৃতি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী কালের বহু প্রখ্যাতনামা কবিগণের আদর্শরূপে গণ্য হইয়াছিল। বংশীদাস (পূর্ব্ববঙ্গ) ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (রাঢ়) নারায়ণ দেবের প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই কবির পুথি ক্রমশঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইবার উপক্রম হইলে কবির ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে জোড়াতাড়া দিয়া নারায়ণ দেবের যে পুথি জনসাধারণে প্রচার করিয়াছেন, তাহাই এতকাল পরে পুনরায় আমরা দেখিতে পাইতেছি। জনসাধারণের প্রিয় কবির পুথি অংশতঃ লোপ পাইতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগিবার কথা। বংশীদাসের (১৬শ শতাব্দী) সময় হইতেই বোধ হয় পুথিটির সংস্কার ও পুনরুদ্ধার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। "বিজয় গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত দেখিয়া নারায়ণ দেবকে অগ্রবর্ত্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণ দেবের পুঁথিখানা গত ২০০ বৎসর যাবৎ কোনও রূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই, এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু জয়গোপালগণ সেরূপ সুবিধা পান নাই।" আমরা ডাঃ সেনের এই মত সমর্থন করিতে অপারগ এবং ইহার কারণ ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

---

(১) কুচবিহার মহারাজার গ্রন্থাগারে একখানি নারায়ণ দেব রচিত পদ্মাপুরাণ রহিয়াছে। এই পুথিখানি আনুমানিক তিন শত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে "সৃষ্টিতত্ত্ব" বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থাগারে দ্বিজ বৈদ্যনাথ নামধেয় কোন কবির রচিত মনসা-মঙ্গল আছে। এই পুথি দুইশত বৎসরের পুরাতন। ইহাতেও নারায়ণ দেবের ভণিতাসহ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে। ইহা পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে সমস্ত মঙ্গলকাব্য সাহিত্যেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর পর হইতে রচিত হইত। বেহুলা-লখীন্দরের ঘটনাও এই সময় হইতে একই রূপে বর্ণনা করিবার প্রথা প্রচলিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পুথিতে ঘটনা অন্যভাবে সাজান আছে। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব নাই। এমনকি খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্তও সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেন নাই। "পুষ্পগাড়ী" সংক্রান্ত বিবরণ মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের প্রারম্ভে দেওয়া হইত বলিয়া অনুমান করি। নারায়ণ দেবের মৎসম্পাদিত পুথি ও বিজয় গুপ্তের পুথি—উভয় পুথিতেই পুষ্পবাড়ীর ঘটনা দিয়া প্রারম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতেই মনসা-মঙ্গল পুথি আরম্ভের রীতির আদি ব্যবস্থা অনুমিত হয়।

সুকবি নারায়ণ দেব "পদ্মাপুরাণ" ভিন্ন আর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "কালিকাপুরাণ"। মনসা-মঙ্গলের এক কবির নাম জানা যায় সুকবি দাস। ইনি নারায়ণ দেব হইতে পৃথক কবি বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। অথচ নারায়ণ দেবের সহিত কেহ কেহ "দাস" শব্দ যোজনা করেন এবং নারায়ণ দেবের "পদ্মাপুরাণ" আসাম অঞ্চলে "সুকবির পদ্মাপুরাণ" বলিয়া পরিচিত আছে। যাহা হউক সুকবি দাস ও নারায়ণ দেব পৃথক কবিও হইতে পারেন। সুকবি দাসের পুঁথি আমরা দেখি নাই, সুতরাং কবির কাল ও কবি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আমাদের অজ্ঞাত।

(৩) বিজয় গুপ্ত

মনসা-মঙ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা লোকরঞ্জক ও প্রসিদ্ধ কবি হইতেছেন বরিশালের কবি বিজয় গুপ্ত। বিজয় গুপ্তের পুঁথি রচনার কাল নির্দ্দেশ উপলক্ষে বিভিন্ন পুঁথিতে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পাওয়া যায়।

(১) "ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক॥"

(২) "ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।"

(৩) "ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক॥"

এই তিনটি উক্তির প্রথমটির দত্ত সময় ১৪০৬ শক (১৪৮৪ খৃঃ), দ্বিতীয়টির সময় ১৪১৬ শক (১৪৯৪ খৃঃ) এবং তৃতীয়টির সময় ১৪০০ শক (১৪৭৮ খৃঃ)। ইহার কোনটি ঠিক সময়?

এতদ্ভিন্ন কবির রচনার মূলে মনসা দেবীর প্রত্যাদেশ "বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে" স্বীকৃত হইয়াছে। তখনকার অনেক কবির রচনার মূলে প্রত্যাদেশ বর্ত্তমান। ইহার হেতু সম্বন্ধে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। বিজয় গুপ্তের প্রত্যাদেশের নমুনা এইরূপ। —

"শ্রাবণ মাসের রবিবার মনসা-পঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন।
হেনকালে বিজয় গুপ্ত দেখিল স্বপন॥"

এই উক্তিদ্বারা বুঝা যাইতেছে কোন বৎসর শ্রাবণ মাসের রবিবার দিনে কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি ছিল এবং সেই রাত্রে মনসা দেবী কবি বিজয় গুপ্তকে

"মনসা-মঙ্গল" রচনা করিবার জন্য স্বপ্নে আদেশ করেন। এই স্বপ্নদর্শনের পর কবি কি করিলেন ?

স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিন্দ।
হরি হরি নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ ॥
প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশদিশা।
স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা ॥"

সুতরাং এই কথা সত্য হইলে কবি সোমবার দিন সকালে স্নানান্তে মনসা দেবীর পূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ পুথি পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন বৎসর রচনা আরম্ভ হইল ? শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত তৎসংগৃহীত ও সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আপত্তির কোন কারণ দেখি না। তিনি "ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত" ভণিতাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই ভণিতা দ্বারা বুঝা যায় যে ১৪১৬ শকে বিজয় গুপ্ত মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। এই উভয় শকের* (অর্থাৎ ১৪০৬ শকের ও ১৪১৬ শকের) মধ্যে কোনটি ঠিক তাহা স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা এই সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, বিজয় গুপ্ত রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; সুতরা ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, যে বৎসর বিজয় গুপ্ত গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসর মনসা-পঞ্চমী অর্থাৎ কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি রবিবারে ছিল। দিনচন্দ্রিকা মতে জ্যোতির্গণনা দ্বারা দেখা যায়, ১৪০৬ শকে ১২ই শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পরে মনসা-পঞ্চমীর আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৪১৬ শকাব্দে মনসা-পঞ্চমী ২২শে শ্রাবণ রবিবার কয়েকদণ্ড পরে আরম্ভ হয় এবং তৎপর দিবস ২৩শে শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি করে। রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে পঞ্চমীর আরম্ভ হয় না। কিন্তু তৎপর দিবস সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি থাকে। এইজন্য মনসা-পূজা পরদিবস কর্ত্তব্য হয়; কিন্তু মনসা-পঞ্চমী রবিবারেই প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং ১৪০৬ শকের পরিবর্ত্তে ১৪১৬ শকই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।"

দেখা যায় কবি বিজয় গুপ্ত সুলতান হুসেন সাহের সমসাময়িক ছিলেন। কবির ভণিতাতে হুসেন সাহের উল্লেখ আছে। সুলতান হুসেন সাহ ১৪৯৩ খৃঃ হইতে ১৫১৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

* বন্ধনীর কথাটি মৎপ্রদত্ত।

সুতরাং কবির রচিত মনসা-মঙ্গল হুসেন সাহের সিংহাসনে আরোহণের বৎসর লেখা আরম্ভ হইলেও নিশ্চয়ই একাধিক বৎসর ইহা শেষ হইতে লাগিয়াছিল। এই জন্যই কবির পুথিতে হুসেন সাহের প্রশংসাসূচক ভণিতা রচিত হইবার অবসর ঘটিয়াছিল। আর একটি কথা, বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন উল্লেখ নাই। অথচ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী প্রায় সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থে তাঁহার নাম ভক্তিভরে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খৃঃ ও তিরোধানকাল ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। এমতাবস্থায় মনে করা যাইতে পারে বিজয় গুপ্তের গ্রন্থ সমাপনের সময় মহাপ্রভু বালক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ তখনও লোকসমাজে প্রকাশিত হয় নাই এবং বিজয় গুপ্ত ও উহা অনুমান করিতে পারেন নাই। কাজেই মহাপ্রভুর নাম কবির পুথিতে প্রকাশ-লাভ করে নাই।

কবি বিজয় গুপ্ত ১৫শ শতাব্দীর সম্ভবতঃ মধ্যভাগে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত তৎসম্পাদিত বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন "১৪০৬ শকের কিছু পূর্ব্বে ভক্ত-সাধক বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জের অধীন গৌরনদী ষ্টেশনের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সনাতন গুপ্ত, মাতার নাম রুক্মিণী এবং স্ত্রীর নাম জানকী"। দাসগুপ্ত মহাশয়ের বিজয় গুপ্তের জন্ম সময়ের উল্লেখ কোন কারণে ভুল রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। বিজয় গুপ্তের গ্রন্থারম্ভের তারিখগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ১৪০০ শক তো আলোচনার বাহিরেই রহিল। অপর দুই শকের মধ্যে ১৪০৬ শকে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কবি জন্মলাভ করিয়া থাকিলে এই শকেই পুথি লেখা আরম্ভ করিতে পারেন না। আর ১৪১৬ শকে তিনি পুথি লেখা আরম্ভ করিলে (যাহা আমাদের অনুমান) কবিকে ১০ বৎসর বয়সে পদ্মাপুরাণ লেখা আরম্ভ করিতে হয়। কবি দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেও ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। যাহা হউক এই ভুলটি ভবিষ্যতে সংশোধিত হইলেই মঙ্গল। কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার গ্রামের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥

কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের সূর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে চতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥"

—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ৪।

এই খ্যাতিসম্পন্ন ফুল্লশ্রী গ্রামের অপর দুইটি নাম মানসী ও গৈলা। গৈলা বর্তমান নাম। গ্রামটি বহু পণ্ডিত ব্যক্তির বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার "পণ্ডিত নগর" বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

কবিবর বিজয় গুপ্তের বংশতালিকা* যতদূর জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত হইল।
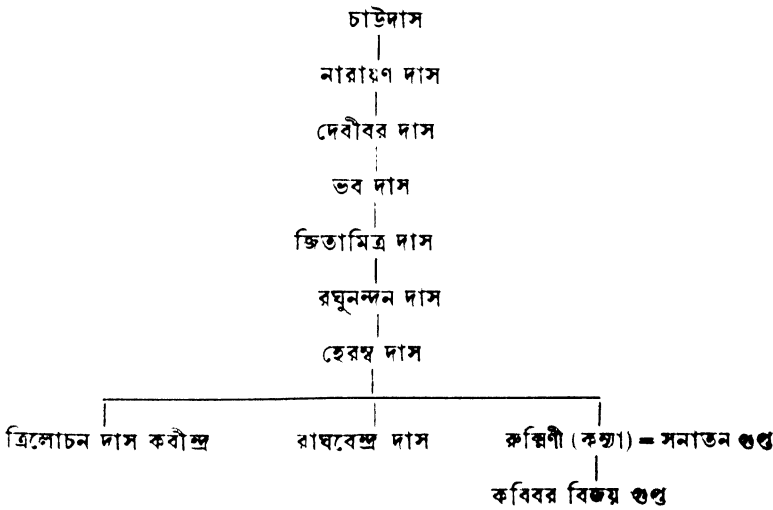
নারায়ণ দেব যেরূপ মূলতঃ করুণরসের কবি বিজয় গুপ্ত সেইরূপ মূলতঃ হাস্যরসের কবি। বেহুলার কাহিনী করুণরসাত্মক হইলেও উভয় কবিই বাস্তবচিত্র অঙ্কণ উপলক্ষে হাস্যরসকে বিস্মৃত হন নাই। তবে বিজয় গুপ্তের পুথিতে ইহার মাত্রা কিছু বেশী। ভক্তের হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তিমিশ্রিত যে সারল্য উভয়ের পুথিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উভয় কবির বর্ণিত হাস্যরসের চিত্রগুলি একেবারে অশোভন হয় নাই। বরং শ্রোতার মন আন্তরিক দুঃখের অনুভূতি হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইয়াছে।

* বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল (প্যারীমোহন দাসগুপ্তের সং)

হাস্তরসের মধ্যে বিজয় গুপ্ত ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রচুর নিপুণতা দেখাইয়াছেন তবে উহা স্থানে স্থানে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যথা –

পদ্মার বিবাহ প্রস্তাব

"জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান,
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে।
এনেছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা সমর্পিব তার তরে॥
হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে
আর চাবে তৈল সিন্দুরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পান গুয়া দিবে কোন জনে।
বিজয় গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
ঘরে গিয়ে কর সন্বিধানে॥"

—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

বিজয় গুপ্ত খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণেও তিনি কম নিপুণতা দেখান নাই। তবে কতকটা কবির গাম্ভীর্যের অভাববশতঃ এবং কতকটা পৌরাণিক প্রভাববশতঃ বেহুলা ও চাঁদসদাগরের চরিত্রে বলিষ্ঠতার সহিত ভক্তিভাবের কিছু অধিক পরিমাণে সংমিশ্রণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিজয় গুপ্তের লেখায় পৌরাণিক প্রভাব যেমন বেশী অশ্লীলতার তেমনই যথেষ্ট ছড়াছড়ি। কবির কৌতুকপ্রিয়তা ঠিক ভাঁড়ামো না হইতে পারে কিন্তু অশ্লীল অংশগুলির ইহার মধ্যে সংমিশ্রণ সকল সময়ে হয়ত সমর্থন করা যায় না। তবে প্রাচীনকালের রুচিহিসাবে কবিকে দোষ দিয়াও খুব লাভ নাই।

নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে নারায়ণ দেবের সময়াপেক্ষা বিজয় গুপ্তের সময় অধিক উন্নতিশীল ছিল বলিয়া মনে হয় না। নারায়ণ দেবের পুথিতে ও বিজয় গুপ্তের পুথিতে ইহার একটি উদাহরণে অপূর্ব্ব মিল দেখা যায়। মনসাদেবীর কোপে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিলে নানারূপ কষ্টভোগের পর চন্দ্রধরের কিছু অর্থাগম হইলে তিনি বলিতেছেন :

(ক) "চান্দো বোলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইব।"

—নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

(খ) "এক পণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর এক পণ কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব॥
আর এক পণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব।
আর এক পণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব॥"

– বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

বিজয় গুপ্তের পুথির মধ্যে নানা কবির রচনা পাওয়া যায়, সুতরাং কবির মূল পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ দ্বিজ চন্দ্রপতির রচনা ও ভণিতা বিজয় গুপ্তের পুথিতে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জানকীনাথ নামে এক কবির উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুথি ও বিজয় গুপ্তের পুথি—উভয় পুথিতেই পাওয়া যায়। তবে নারায়ণ দেবের পুথির কবি "বিপ্র জানকীনাথ" এবং বিজয় গুপ্তের পুথির শুধু "জানকীনাথ"; ইহার নামের পূর্ব্বে "বিপ্র" কথাটি নাই। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্তের মতে বিজয় গুপ্তই "জানকীনাথ" বা জানকী নাম্নী কোন মহিলার স্বামী। বিজয় গুপ্তের স্ত্রীর নাম নাকি জানকী ছিল। যাহা হউক এই নামটির সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পৌরাণিক প্রভাব বৈষ্ণব প্রভাবের অভাব এবং মুসলমানদের উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথম দুইটির কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মুসলমানদের কথার মধ্যে কিছু কিছু আরবি ও ফারসি শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ চাঁদসদাগরের নৌবহরের কর্ম্মচারীগণের ও নৌকার বা নৌশ্রেণীর অংশবিশেষের নাম যথা—"বহর", "মিরবহর", "মালুমকাঠ" প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "হাসন-হুসনের পালা" বলিয়া যে পালাটি সুবিস্তৃতভাবে বিজয় গুপ্ত রচনা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। হাসন-হুসনের নামোল্লেখ

বিজয় গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নারায়ণ দেবের পুথিতেও রহিয়াছে। ইহা এই পুথিতে পরবর্ত্তী যোজনা হইতে পারে ও অন্যান্য নানা পুথিতে যে ভাবে উল্লিখিত আছে তাহার আদর্শ বিজয় গুপ্ত যোগাইয়া থাকিবেন। বিজয় গুপ্তের হাসন-হুসন সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ কবির সমসাময়িক সুলতান হুসেন সাহার সাময়িক হিন্দুবিদ্বেষ উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল কি না কে জানে? মুসলমান জোলাদিগের পাড়ায় মনসা-দেবীর কোপদৃষ্টির বিবরণও বোধ হয় একই কারণে রচিত হইয়া থাকিবে। *অবশ্য এই সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না।* *মনসা-মঙ্গলের* প্রথম কবি কাণা হরি দত্ত সম্বন্ধে কবি বিজয় গুপ্তের তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তি যেন কবির মনসা-মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া প্রথম আসন না হইলেও কবি মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতম আসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় রচিত হইয়াছিল।

বিজয় গুপ্তের খ্যাতির অন্যতম কারণস্বরূপ বলা যায় যে মনসা দেবীর পূজা গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে সুদীর্ঘকাল যাবৎ খুব ঘটার সহিত হইয়া থাকে। "এই দেবী বিজয় গুপ্তের আরাধ্যা ও তৎকর্তৃক সংস্থাপিতা বলিয়া অদ্যাপি বিখ্যাত।......পর্ব্বোপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয় এবং তখন সরোবরের অপর তিন পাড়ে মেলা হইয়া থাকে।"* যাহা হউক, বিজয় গুপ্ত মনসা-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে যশোভাগ্যে যে সর্ব্বপ্রধান তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) দ্বিজ বংশীদাস†

মনসা-মঙ্গল বা মনসার ভাসানের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি দ্বিজ বংশীদাস। ইনি খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কবির নিবাস পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতওয়াড়ী গ্রাম বলিয়া জানা গিয়াছে। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেন। কবির গ্রন্থে এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুইটি ছত্র পাওয়া যায়।

"জলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥"

---

* প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সংগৃহীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের ভূমিকা।

† নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও বংশীদাসের মনসা-মঙ্গলে প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রা এবং নাগ-দেবীর পূজা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান কথা আছে। সুদূর প্রাচ্যের সহিত এই বিষয়সমূহের প্রচুর সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। Some notes on the early trade between Bengal & Burma (Calcutta Review, April, 1949) by P. C. Das Gupta এবং The origin of the Thai Art (Modern Review, July, 1949) by P. C. Das Gupta প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

এই ভণিতায় ১৪৯৭ শক অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ গ্রন্থ রচনার কাল হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। দ্বিজ বংশীদাস রচিত অপর কতিপয় গ্রন্থের নাম রামগীতা, চণ্ডী ও কৃষ্ণগুণার্ণব। বংশীদাস নিজেতো সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেনই, কবির কন্যা চন্দ্রাবতীও একটি বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা করিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষিতা মহিলা তাঁহার পিতার গ্রন্থসমূহ রচনায় কিছু পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। চন্দ্রাবতীর ব্যর্থ প্রেম ও দুঃখপূর্ণ জীবন-কাহিনী পালাগানের আকারে কোন সময়ে ময়মনসিংহ জেলার নানাস্থানে গীত হইত। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত ময়মনসিংহ-গীতিকাগ্রন্থে "চন্দ্রাবতী" পালাটি স্থানলাভ করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে "দস্যু কেনারামের পালা" নামে অপর একটি পালায় আছে যে দস্যু কেনারাম বংশীদাস রচিত "মনসার ভাসান" গান শ্রবণে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে গায়ককে ইতঃপূর্ব্বে বধোদ্যত হইলেও এই দস্যু অবশেষে হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া গলদশ্রুলোচনে তাহারই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া মনসা-দেবীর পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কবি বংশীদাস বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের প্রায় ৯১।৯২ বৎসর পরে মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। বংশীদাস তাঁহার স্বদেশীয় নারায়ণ দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। অথচ নারায়ণ দেবের অনেক পরে বিজয় গুপ্তের কবিত্বপূর্ণ রচনা তাঁহার আদর্শ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বোধ হইতেছে বংশীদাস ও তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী রাঢ়ের কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের সময় পর্য্যন্তও নারায়ণ দেবের প্রভাব ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। তবুও বলা যায় পূর্ব্ববঙ্গের নারায়ণ দেব দক্ষিণবঙ্গের বিজয় গুপ্তের প্রভাবের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে এই দুই অঞ্চলের গায়ক সম্প্রদায়গুলির প্রতিযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের গায়কগণ তাঁহাদের রচিত অনেক ছত্র আবশ্যক বা অভিপ্রায়মত সংযোগ করিয়াছেন। কবি বংশীদাসও ইহাতে বাদ যান নাই। মৎসংগৃহীত নারায়ণ দেবের পুথিতে বংশীদাসের রচিত নিম্নে বর্ণিত ছত্রগুলি আছে।

চন্দ্রধরের বদল-বাণিজ্য।

"বদল করয় অধিকারি।

বুঝিয়া মূল্যের ভেদ বাছা করে পরিৎসেদ

ভিন্ন দেসি পচ্ছিমা জহরি।

আগে আনি গুয়াপান রাজসভা বিদ্যমান
মূল্য বোলে কাড়ারি দুলাই।
একটি ২ পানে মরকত দশগুণে
গুয়ায়ে মাণিক্য যেন পাই ॥
রসের বদলে চূণ জুখি দিবা দশ গুণ
খয়ার বদলে গোরচনা।
করঙ্গা জাঙ্গির হালি দেও মতি বদলি
পীপল বদলে দিবা সোণা ॥
একটি ২ নিবা সোণার গুঙ্গরা দিবা
কিছু কিছু সোণার নাকুড়া।—
ভরৈ ঝিঙ্গা দুদকুসি নাফা বাইঙ্গন বারমাসি
সসা বাঙ্গি আর জত খিরা।
ওল আলু কচুরমুখি ইসব তৌলের বিকি
ইহার বদলে দিবা হিরা ॥

*　　*　　*　　*

এহি মতে বদল করি বোলে চান্দো অধিকারি
আজি আমি না বুঝিলাম ভায়।
আজুকার বদল থাউক ইধন ভাণ্ডারে জাউক
চন্দ্রধরে বাসা ঘরে জায় ॥
রাজা উঠে আস্তে বেস্তে ধরিয়া চান্দোর হাতে
মিত্র বুলি হাসিয়া বোলায়।
দিজ বংসিদাসে বোলে রাজা অন্তস্পুরে চলে
চন্দ্রধর বাসাঘরে জায় ॥"

—নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

কবি বংশীদাস যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন সমাজে একদিকে পৌরাণিক প্রভাব এবং অপরদিকে বৈষ্ণব প্রভাব, এই দুই প্রভাবের উদ্ভব হইয়াছিল। যেমন সংস্কৃত পুরাণাদি ও শাস্ত্রকারদিগের রচিত আদর্শ সমাজও সাহিত্যের অঙ্গে পরিস্ফুট হইতেছিল তেমন চৈতন্যদেবের জীবনের আদর্শ ও ভক্তিবাদ নূতন ব্যাখ্যা নিয়া সমাজের সর্ব্বস্তর প্রভাবিত করিতেছিল। সুতরাং দ্বিজ বংশীদাসের কবিত্বের বহিরাবরণে সংস্কৃত পুরাণ ও ইহার অন্তরালে মনসা দেবীর পূজা প্রচার উপলক্ষে শাক্তের হৃদয়ে ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত

হওয়া স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ কবির "হরি-হর" বর্ণনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।—

হরি-হর

"প্রণমহুঁ হরিহর অদ্ভুত কলেবর
শ্যাম শ্বেত একই মূরতি।
অভেদ ভাবিয়া লোকে দেখিছে অতি কৌতুকে
মরকতে রজতের জ্যোতি॥
দক্ষিণ শরীরে হরি বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি
আধ আধ একই সংযোগে।
ধন্য লোকে দেখে হেন গঙ্গা যমুনা যেন
মিশিয়াছে সঙ্গম প্রয়াগে॥
দক্ষিণাঙ্গ অনুপম সুন্দর জলদশ্যাম
বাম তনু নিরমল শশী।
দেখি মুনি-মন ভোলে দুই পর্ব্ব এককালে
অমাবস্যা আর পৌর্ণমাসী॥
বাম শিরে উভাজটা লম্বিত পিঙ্গল কটা
দক্ষিণাঙ্গে কিরীট উজ্জ্বল।
বাম কর্ণে বিভূষণ অদ্‌ভূত ফণি-ফণ
দক্ষিণেত মকর-কুণ্ডল॥
অর্দ্ধ ভালেত নয়ন প্রকাশিত হুতাশন
কস্তূরী শোভিছে আন পাশে।
কেশর অগুরু সঙ্গে লেপিত দক্ষিণ অঙ্গে
বাম অঙ্গে বিভূতি প্রকাশে॥
ত্রিশূল ডম্বুর করে শোভিয়াছে বাম করে
শঙ্খ চক্র দক্ষিণে বিরাজে।
কটির দক্ষিণ পাশে পরিধান পীতবাসে
বাম পাশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সাজে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মঞ্জীর দক্ষিণ পায়
ফণী বাম চরণ-পঙ্কজে॥"

—বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল।

দ্বিজ বংশীদাসের মধ্যে মধ্যে শ্লেষাত্মক বর্ণনা বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে এইরূপ বর্ণনায় তিনি তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডী-মঙ্গলের কবিদ্বয় মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনসা-মঙ্গলের কবিদ্বয় বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। কবির সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ইহা পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কলির ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ওঝা ধন্বন্তরির মারফৎ কবি আমাদিগকে যাহা শুনাইতেছেন তাহার নমুনা এইরূপ :—

কলির ব্রাহ্মণ

"কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল।
ভালমন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল॥
পতিতের দান লইতে না কর বিচার।
হাড়ি ডোম চণ্ডাল যজাও কদাচার॥
কাকড়ার মাটি দিয়া কর দীর্ঘ ফোঁটা।
কাকালির মধ্যে রাখ ভাঙ্গা লাউ গোটা॥
মাথায় বেড়িয়া বান্ধ রাত্রিবাস ধড়ি।
মুষ্টিভিক্ষা মাগিয়া বেড়াও বাড়ী বাড়ী॥" ইত্যাদি।

—বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল।

দ্বিজ বংশীদাসের ভণিতাসমূহের মধ্যে তাঁহার নারায়ণের প্রতি ভক্তিসূচক উক্তি উল্লেখযোগ্য। শাক্তদেবী মনসার নামে মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে যাইয়া এইরূপ বৈষ্ণব মনোভাব তখনকার দিনে অনেক কবিই প্রদর্শন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নাম করা যাইতে পারে। বংশীদাসের ভণিতাগুলির মধ্যে "দ্বিজ বংশী মনসা কিঙ্কর" যেমন আছে আবার তেমনই "সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর" এমন উক্তিও পাওয়া যায়। আবার পদ্মাদেবী ও নারায়ণ দেবের সামঞ্জস্য করিয়া কবি এরূপ ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন ;—

"দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥"

—বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল।

দ্বিজ বংশীদাস মনসা-মঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অনুসরণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কবি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস

মনসা-মঙ্গলের কবি ষষ্ঠীবর বিক্রমপুরের অন্তর্গত দীনারদি বা ঝিনারদি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম গঙ্গাদাস। পিতাপুত্র উভয়েই প্রথিতযশা কবি ছিলেন। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি সেন এবং সম্ভবতঃ ইঁহারা সুবর্ণবণিক জাতীয় ছিলেন, কারণ একখানি প্রাচীন পুথির ভণিতায় "বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক্য তনয়" কথাটা আছে এবং ঝিনারদি গ্রামেও বহু সুবর্ণবণিকের বাস (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। কবি ষষ্ঠীবর ও কবি গঙ্গাদাসের সময় বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। অন্ততঃ প্রাচীন পুথি দৃষ্টে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপই অনুমান করিয়াছেন। ইঁহারা পিতাপুত্রে মনসা-মঙ্গল ছাড়াও বহু গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ভাগবতের কবি মালাধর বসুর ন্যায় কবি ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল "গুণরাজ খাঁ"। সম্ভবতঃ ইহা রাজদত্ত উপাধি। ইঁহাদের মনসা-মঙ্গলের নমুনা এইরূপ :—

লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ-যাত্রা

* * *

"প্রথমে চলিল কাজি মীরবহর তাজি।
আঠার হাজার পাইক তাহার বামবাজি॥
সতর হাজার পাইক বামবাজ লড়ে।
ধানুকীর ফৈদ সব লড়ে ঘোড়ে ঘোড়ে॥
মুখে দোয়া করে কাজি হাতেত কোরাণ।
সাহেমানি দোলা আনি দিল বিদ্যমান॥
দোলাএ চড়ি কাজি খসাইল মজা।
সেই দিন যুমাবার পেগম্বরি রোজা॥
ভনে গুণরাজ খানে কাজির বড়াই।
হিন্দুয়ান খণ্ডাইয়া খাওয়াইব গাই॥" ইত্যাদি।

—ষষ্ঠীবরের মনসা-মঙ্গল।

যাহা হউক অবশেষে কাজি "হুষণ" চান্দসদাগরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কবির ফারসী ভাষায় যে ভাল দখল ছিল তাহা এই সব অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায়। কবির "গুণরাজ খান" উপাধির উল্লেখও এই অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মনসা-মঙ্গলগুলিতে শুধু দক্ষিণ-পাটনের

নামই প্রাপ্ত হই। কিন্তু ষষ্ঠীবর আরও কতিপয় পাটন বা সহরের সংবাদ তাঁহার কাব্যে আমাদিগকে দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ "মাণিক্য-পাটন", "কনক-পাটন" "বেহার-পাটন" প্রভৃতি পাটনের নাম করা যাইতে পারে। তেলেঙ্গা বা মাদ্রাজি সৈন্যের উল্লেখও কবি মধ্যযুগের বহু কবির ন্যায় করিতে বিস্মৃত হন নাই, যেমন "তেলেঙ্গার ঠাট লড়ে বত্রিশ হাজার"। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রায় সকলেই বর্ণনাপ্রিয়। এই বিষয়ে কবি ষষ্ঠীবর যে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন তাহা তাঁহার মনসা-মঙ্গল পাঠে বুঝিতে পারা যায়।

কবি গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবরের কাল সম্ভবতঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ এবং কবি গঙ্গাদাসের কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। গঙ্গাদাস সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন মনে হয়। তাঁহার রচিত মনসা-মঙ্গলে পদ্মার বেশ পরিধান অংশে সংস্কৃত শব্দ ও অলঙ্কারের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত করা গেল।

পদ্মার বেশ পরিধান

* * * *

"কনক চম্পক পাঁতি অপূর্ব্ব অঙ্গের ভাতি
হেমজিনি মুক্তাহার সাজে।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে কে হেন পতঙ্গ অঙ্গে
হেমাঙ্গুরী অঙ্গুলি বিরাজে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কামের কামান লুকি
মদনে তজিল ধনুখান।
গজেন্দ্র গমনে জিনি চলিতে কিঙ্কিনী ধ্বনি
মুনিগণে ছাড়িল ধেয়ান॥
বিচিত্র গৌরিন শাড়ী জয় দেবী বিষহরি
সাজাইয়া নিল সখীগণ।
*রাজকৃষ্ণ দ্বিজে কয় নারীগণে জয় জয়
গঙ্গাদাস সেনে সুরচন॥"

(৬) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল বা মনসার ভাসান এই শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ নামটি নিয়া

* "রাজকৃষ্ণ দ্বিজ" সম্ভবতঃ কবি গঙ্গাদাস সেনের রচিত মনসা-মঙ্গলের একজন গায়ক।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে কবি একটি আবার কাহারও মতে কবি দুইটি। কেহ বলেন প্রকৃত কবি ক্ষেমানন্দ এবং "কেতকাদাস" তাঁহার উপাধিমাত্র। "পদ্ম" বা কেতকী পুষ্প নাম হইতে মনসা-দেবীর পদ্মা নামটিকে উপলক্ষ করিয়া এই দেবীর নামের স্থানে কেতকা নামটি এই কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং "কেতকাদাস" অর্থ পদ্মাদেবীর দাস বা ভক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহা কবি ক্ষেমানন্দের উপাধি। অপর মতের সমর্থকেরা বলেন পুথিটীর মধ্যে সর্ব্বত্র নানাস্থানে উভয় নামই ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রথমাংশের ভণিতায় "কেতকাদাস" নামটির বহুল প্রয়োগ এবং শেষার্দ্ধে বা ততোধিক অংশে "ক্ষেমানন্দ" নামটির অত্যধিক ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয় পুথিটির কিয়দংশ কেতকাদাস নামক এক কবি রচনা করিয়াছিলেন ও অবশিষ্ট অংশ অপর কবি ক্ষেমানন্দের রচনা বলা যাইতে পারে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই উভয় মতই তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন সময়ে সমর্থন করিয়াছেন, তবে তাঁহার সর্ব্বশেষ মত এক কবিরই বলিয়া মনে হয়। আমরাও মনে করি কবি দুইজন নহেন একজন এবং "কেতকাদাস" কবি ক্ষেমানন্দের উপাধিমাত্র।

কবি ক্ষেমানন্দ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার নাতিবৃহৎ ও প্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। কবির আত্মবিবরণী হইতে জানা যায় কবির জন্মস্থান ছিল কাঁথড়া গ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান এবং সম্ভবতঃ তিনি কায়স্থ ছিলেন। কবি ৺স্বর্ণ রায় নামক কোন জমিদারের তালুকে বাস করিতেন বা তাঁহার অধীনে ভূমি রাখিতেন। এই জমিদার কবিকে মনসা-মঙ্গল রচনায় উৎসাহ দিয়া থাকিবেন। কবি ক্ষেমানন্দ তাঁহার আত্ম-চরিতে বর খান বা বারা খান নামক সেলিমাবাদ পরগণার (জেলা বর্দ্ধমান) জনৈক শাসনকর্ত্তার যুদ্ধে মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন ("রণে পড়ে বর খাঁ")। প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্য প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র শিবরামকে এই ব্যক্তি কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ভূমিদান পত্রটির তারিখ বর্ত্তমান হিসাবে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ। ইহা হইতে বলা যায়, প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামের সমসাময়িক ছিলেন এবং নিশ্চয়ই তাঁহার মনসা-মঙ্গল ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল।

ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলের ছত্র সংখ্যা পাঁচ হাজার এবং ইহা বৃহৎ গ্রন্থ না হইলেও সুখপাঠ্য। এই স্থানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ক্ষেমানন্দের পুথি বটতলার প্রেসে ছাপা হওয়াতে ইহার যথেষ্ট প্রচার হইতে পারিয়াছে

এবং কবিত্বগুণে পুথিখানি বাঙ্গলার জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিপদ হইয়াছে পুথিখানির বিভিন্ন প্রকার পাঠান্তর লইয়া। বঙ্গবাসী প্রেসে (কলিকাতা) মুদ্রিত ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্ষেমানন্দের যে পুথি মুদ্রিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের এত অভাব, মনে হয় উভয় পুথিই একেবারে বিভিন্ন কবির রচনা। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির সাধারণ অসুবিধাতো আছেই। এক স্থানে প্রাপ্ত পুথির সহিত অন্যস্থানে প্রাপ্ত পুথির অনেক স্থানেই মিল নাই। সুতরাং কোন প্রাচীন পুথির মুদ্রণকার্য্যে "অতিরিক্ত পাঠ" ও "পাঠান্তর" থাকিতে বাধ্য।

কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন যে এই পুথিতে "চাঁদসদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। ক্ষেমানন্দ বেহুলার চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে প্রচুর করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন। যেমন, বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়া জলে ভাসিবার পর কিছুদিন গত হইলে, যখন শব পুতিগন্ধময় ও গলিত হইতে লাগিল, তখন—

"দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায়ে বড় শোক।
ধরিয়া মরার গায় হানে এক জোক॥
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥" ইত্যাদি।

—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল।

অন্যত্র, বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহের পর বেহুলা পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে যাত্রা করিবার সময়,—

"কোলাকুলি আলিঙ্গন বেহাই বেহাই।
চাপিল পাটের দোলা বেহুলা লখাই॥
বেহুলা লাগিয়া কান্দে অমলা বাঙ্গানী।
ছয় ভাএর কোলে তুমি দুলাল বহিনী॥
নিকটে তোমার ভরে না মিলিল বর।
কেমনে পাঠাব ঝিএ দেশ দেশান্তর॥
সঙ্গের খেলুয়া সব বেড়িছে কান্দিয়া।
কোথাকারে যাহ আমা সভারে এড়িয়া॥

কোন দেশে যাহগো আসিবে কত দিনে।
কেমনে রহিব মোরা তোমার বিহনে॥" ইত্যাদি।

— কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল।*

মনসা-মঙ্গলের আরও কতিপয় কবি

কতিপয় মনসা-মঙ্গলের কবি সম্বন্ধে যৎসামান্য বিবরণ প্রধানতঃ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) অবলম্বনে নিম্নে দেওয়া গেল।

(৭) জগজ্জীবন ঘোষাল

জানা যায় কবি জগজ্জীবন ঘোষাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত "কোচআ-মোরা" গ্রামে কবির বাড়ী ছিল। ইনি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। কবি বর্ণনায় খুব দক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নমুনা যথা,—

(ক) "সিন্দুরেত ইন্দুবিন্দু কজ্জলের রেখা।
কালীয়া মেঘের আড়ে চন্দ্র দেছে দেখা॥"

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গল।

একটি ধুয়াও বেশ চিত্তাকর্ষক,—

(খ) "বাও নহে বাতাস নহে তরু কেনে হেলে।
নবীন কদম্বের ডাল বায়ে ভাঙ্গে পড়ে॥"

—ধুয়া, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গল।

(৮) রামবিনোদ

কবি রামবিনোদ সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ অনুমান করেন। রামবিনোদ কবি হিসাবে উচ্চ শ্রেণীরই মনে হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় কবির পারিবারিক কোন

* মন্তব্য। "কেতকাদাস" ও "ক্ষেমানন্দ" এই দুইটি নাম একত্র ও স্বতন্ত্রভাবে যে কতপ্রকারের বিবিধ পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং কত বিভিন্ন প্রকারেরই পাঠান্তর যে পুথিগুলিতে রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে শুধু বিস্ময়েরই উদ্রেক করে, অথচ মূল প্রশ্নের সমাধানে তত সাহায্য করে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গের কবির ইহার খ্যাতির পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। ক্ষেমানন্দ নারায়ণ দেবের যে প্রশংসা করিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনুমান হয় কবির নিবাস পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বঙ্গের কোথায়ও ছিল। প্রসঙ্গতঃ তিনি "পাটের রাজা মোর বসন্ত কেদার" ছত্রে ছদ্মবেশিনী 'মনসা-দেবী'দ্বারা যে উক্তি করাইয়াছেন তাহাতে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর অন্যতম ভূঞা রাজাদ্বয় কেদার রায় অথবা বসন্ত রায়ের (প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতের) উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। কবির সময় ১৮শ শতাব্দীর হইলে বলিতে হয় প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বের এই স্বনামধন্য রাজাদ্বয়ের কথা কবির ও তাঁহার দেশবাসীর স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। এই কথা সত্য হইলে প্রতাপাদিত্যের স্থলে বসন্ত রায়ের উল্লেখ অনেক পরিমাণে বিস্ময়ের কারণও বটে। কবির কৌলিক উপাধিও অজ্ঞাত, সুতরাং বেশী কিছু অনুমান করাও নিরাপদ নহে। রামবিনোদের কবিত্ব ও ভণিতার নমুনা এইরূপ,—

মালিনীর বেশে মনসা-দেবী

* * *

"কস্তুরী কাঞ্চনদল কাজলা দাড়িম্ব ফল
কলিকা মান্দার যূথে যূথে।
চম্পা বকুল মালী সাজাইয়া সারী সারী
বিশরি বিষম গণু ঝাকে ॥
পসার সাজাইয়া ফুলে পদ্মাবতী লৈয়া চলে
সৌরভে ভ্রমরা পড়ে উড়ি।
শ্রীরামবিনোদ ভণে মনসার চরণে
যাএ দেবী শঙ্কর নগরী ॥"

—কবি রামবিনোদের মনসা-মঙ্গল।*

(৯) দ্বিজ রসিক

মনসা-মঙ্গলের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি দ্বিজ রসিকের নিবাস পশ্চিম-বঙ্গে ছিল। এই কবি মাত্র একশত কি তদূর্দ্ধ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উৎকৃষ্ট মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কবির দুর্ভাগ্য যে তাঁহার গ্রন্থখানি আধুনিক যুগের ছাপাখানার সাহায্যলাভ করিতে পারে নাই। ইহার ফলে কবি ও তাঁহার কাব্যখানি জনসাধারণের নিকট

---

* ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কবি রামবিনোদের মনসা-মঙ্গলের খণ্ডিত পুথির প্রাপ্ত হস্তলিপি প্রায় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন।

সবিশেষ পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন দ্বিজ রসিক ও তাঁহার মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে নিম্ন-লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন।

"দ্বিজ রসিকের মনসা-মঙ্গল অতি বিরাট্ গ্রন্থ। আমরা ১২৫৮ সালের হস্ত-লিখিত পুথি হইতে তদীয় রচনা উদ্ধৃত করিলাম। গ্রন্থ-রচনার সময় পাই নাই। ভাষা দেখিয়া মনে হয় দ্বিজ রসিক অন্যূন ১০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখক। ভণিতায় তাঁহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায়। সেনভূম ও মল্লভূমের মধ্যবর্ত্তী আখড়ামাল নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল।······ইঁহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম কালিদাস, পিতামহের নাম মহেশ মিশ্র, পিতার নাম প্রসাদ বা শিবপ্রসাদ। কবির অপর দুই ভ্রাতা ছিল, তাঁহাদের নাম রাজারাম ও অযোধ্যা; এক ভগিনী, নাম সাবিত্রী।··· দ্বিজ রসিকের দুইটি উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহার একটি 'কবিবল্লভ' ও অপরটি 'কবিকঙ্কণ'।·····"

দ্বিজ রসিকের ভণিতা এইরূপ :—

(ক) "শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মনসার পায়।
মনসা-মঙ্গল গীত রসিকেতে গায়॥"

(খ) "মাথায় সোণার পাট নেতা এস্থে সেই ঘাট
কাচিবারে দেবতার বসন।
দুই পুত্র সঙ্গে ধায় শ্রীকবিবল্লভ গায়
বেহুলা না করে নিরীক্ষণ॥"

রাঢ়ের কবি ধর্ম্ম-মঙ্গলের কাহিনী ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মনসা-মঙ্গলের ভিতর ধর্ম্ম-মঙ্গলের উল্লেখ করিয়া ছাড়িয়াছেন। এই উপলক্ষে নেতা-দেবীর সন্নিকটে যাওয়ার পূর্ব্বে হনুমানের সহিত বেহুলার আলাপ ও কাতর অনুনয়বিনয় মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে বেশ খানিকটা নূতনত্ব আনিয়া দিয়াছে।

কবি রসিকের পুথিতে কবি কাণা হরি দত্তের আদর্শে মনসা দেবীর সর্পসজ্জার একটি বর্ণনা রহিয়াছে। এই স্থানে তাহা উল্লিখিত হইল।

মনসা দেবীর সর্প-সজ্জা

* * *

"শঙ্খিনী চিত্রানী নাগে শঙ্খ পেন্ধে হাতে।
কাণ্ডড়িয়া নাগে দেবীর খোপা বান্ধে মাথে।

কর্কটিয়া নাগে যে কর্ণের করে শলি।
ফণী-মণি জিনিয়া যে কাঞ্চলিয়া বলি॥
সিন্দুরিয়া নাগে দেবীর শিরের সিন্দুর।
খঞ্জনিয়া যোড়াএ দেবীর চরণে নুপূর॥
কল্লোলিয়া যোড়াএ দেবীর কঙ্কণ পদ্মাবতী।
গগনিয়া নাগের যে গলার গ্রীবা-পাতি॥
তাড়ুয়া নাগে যে বিচিত্র চারি তাড়।
সিতলিয়া নাগে দেবীর সাত-লরীহার॥
নাগ-আভরণ পরি হরিষ অতুল।
অনন্ত যোড়াএ কৈল মাথে পঞ্চফুল॥" ইত্যাদি।

দ্বিজ রসিকের পুথির এই অংশ বৈদ্য শ্রীজগন্নাথ রচিত, কেননা কয়েক ছত্র পরেই ভণিতা রহিয়াছে—

"বৈদ্য শ্রীজগন্নাথ* রচিত পদবন্ধ।
সুরচিত কহি গাহি লাচারী প্রবন্ধ॥"

বোধ হয় প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনার মধ্যে গায়কগণের নিজ রচনা মিশ্রিত করিবার প্রচলিত রীতিই ইহার কারণ। নারায়ণ দেবের পুথিতেই (মৎসম্পাদিত) "শ্রীজগন্নাথ" ও "বৈদ্য জগন্নাথ" উভয় নামের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। দ্বিজ রসিকের পুথি অনুসারে "শ্রী" ও "বৈদ্য" একই ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

(১০) জগমোহন মিত্র

কবি জগমোহন মিত্রের মনসা-মঙ্গল রচনার তারিখ ১৭৬৬ সাল। এই কবির গ্রন্থে স্বীয় বংশ-পরিচয় সুবিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। তাহা হইতে জানা যায় কবির নিবাস বালাণ্ডার অন্তর্গত গোহপুর এবং পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র। কবির রচনায় সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিনয় প্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়া কবিকে বৈষ্ণব বলিয়া সন্দেহ হয়। কবি লিখিয়াছেন,—

"নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন।
অন্ধের যেমন নাম কমললোচন॥"

—জগমোহনের মনসা-মঙ্গল।

---

* মৎসম্পাদিত নারায়ণদেবের পুথিতে নারায়ণ দেব ছাড়া যে সব মনসা-মঙ্গলের কবির নাম ভণিতায় পাওয়া যায় তাঁহাদের নাম চন্দ্রপতি, বৈদ্য জগন্নাথ, বিপ্র জগন্নাথ, শ্রীজগন্নাথ, বংশীদাস, দ্বিজ জয়রাম, বল্লভ, মাধব, হরি দত্ত (সম্ভবতঃ মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি কাণা হরি দত্ত), দ্বিজ বলরাম (বলাই), শিবানন্দ ও বিপ্র জানকীনাথ।

(১১) জীবন মৈত্রেয়

কবি জীবন মৈত্রেয় বগুড়া জেলার অন্তর্গত ও করতোয়া নদীতীরস্থ লাহিড়ীপাড়া গ্রামে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কবি-রচিত দুইখানি গ্রন্থের প্রসিদ্ধি আছে। উহার একখানি মনসা-মঙ্গল ও অপরখানি শিবায়ন। কবি জীবন মৈত্রেয় রচিত মনসা-মঙ্গলের নাম "বিষহরী-পদ্মাপুরাণ"। কবির এই কাব্যখানি উৎকৃষ্ট হইলেও ১৮শ শতাব্দীতে রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের দোষ ও গুণ ইহাতে দুইই আছে। কবি জীবন মৈত্রেয় ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক, সুতরাং তৎকালীন রুচি ও রচনারীতি অনুসারে কবির পক্ষে অত্যধিক সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রয়োগ একান্ত স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া ময়মনসিংহের কবি নারায়ণ দেবের "মনসা-মঙ্গল" বা "পদ্মা-পুরাণের" খ্যাতি উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গে এমন কি রাঢ়ে এবং আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় কবি গল্পাংশ বর্ণনায় তাঁহাকেও অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা সম্ভব মনে হয় কারণ বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদ বা যমুনা নদী তৎকালে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের সীমা নির্দ্দেশ করে নাই। তখনও এই নূতন খাতের উৎপত্তি হয় নাই। ময়মনসিংহের অনেকাংশ এক সময় রংপুর কালেক্টরিরও অধীন ছিল। এই সব কারণে উত্তর-বঙ্গের সহিত বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে ময়মনসিংহ জেলার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কবি জীবন মৈত্রেয়র রচনার নমুনা এইরূপ :—

বেহুলার রূপ-বর্ণনা—"কিবা সে রূপের শোভা পূর্ণ শশধর।
থাকুক মনুষ্য কায় দেবতা চঞ্চল॥
বদনের শোভা কিবা পূর্ণিমার চান্দ।
বধিতে যুবক যেন পাতিয়াছে ফান্দ॥
নয়ান বন্দুক তাহে রঞ্জক কজ্জল।
পলক পলিতা তাহে তোতা দুই কর।" ইত্যাদি।
—বিষহরি পদ্মা-পুরাণ, জীবন মৈত্রেয়।

(১২) বিপ্রদাস পিপলাই(১)

মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নাদুড়্যা-বটগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম ছিল মুকুন্দ পণ্ডিত। কবির আরও কতিপয় (৩ কি ৪) ভ্রাতা ছিল।

(১) "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" (ডাঃ সুকুমার সেন) দ্রষ্টব্য।

কবির মনসা-মঙ্গল রচনার কাল ডাঃ সুকুমার সেনের মতে ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ এবং রচনার কারণ মনসা দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশ। বিপ্রদাসের "মনসা-মঙ্গল" রচনার কাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছত্র দুইটি পাওয়া যায়। যথা—

"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান ॥"

—মনসা-মঙ্গল, বিপ্রদাস পিপলাই।

একই নামের আরও দুইজন মনসা-মঙ্গলের কবি ছিলেন।[১] ইঁহাদের একজনের নাম বিপ্ররাম দাস এবং অপর কবির নাম বিপ্রদাস। অন্তুতঃ বিপ্রদাস নামে শেষোক্ত কবি বিপ্রদাস পিপলাই কি না তাহা জানা নাই। বিপ্রদাস পিপলাই রচিত পুঁথির কাল সন্দেহ বা আপত্তির অতিত হইলে এই সম্বন্ধে আমাদেরও আপত্তির কিছু নাই। এই পুঁথিখানি আমরা না দেখাতে বিশেষ মতামত দিতে অক্ষম।

(১৩) অন্যান্য কবিগণ

পূর্ব্ববর্ণিত কবিগণ ভিন্ন নিম্নে আরও কতিপয় মনসা-মঙ্গলের কবির নামোল্লেখ করা গেল।—

১। রঘুনাথ
২। যদুনাথ পণ্ডিত
৩। বলরাম দাস
৪। বংশীবর
৫। বল্লভ ঘোষ
৬। বিপ্র-হৃদয়
৭। গোবিন্দ দাস
৮। গোপীচন্দ্র
৯। বিপ্র জানকীনাথ
১০। দ্বিজ বলরাম (বলাই)
১১। অনুপচন্দ্র
১২। রাধাকৃষ্ণ
১৩। হরিদাস
১৪। কমলনয়ন
১৫। সীতাপতি
১৬। রামনিধি
১৭। চন্দ্রপতি
১৮। গোলকচন্দ্র
১৯। কবি কর্ণপুর
২০। জানকীনাথ দাস
২১। বর্দ্ধমান দাস
২২। আদিত্য দাস
২৩। কমললোচন
২৪। কৃষ্ণানন্দ
২৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস
২৬। গুণানন্দ সেন

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ৬ষ্ঠ সং) পৃঃ ৩০৮ এবং History of Bengali Language and Literature (Dr. D. C. Sen), p. 293-294 দ্রষ্টব্য।

২৭। জগৎবল্লভ
২৮। বিপ্র জগন্নাথ
২৯। বৈদ্য জগন্নাথ (সেন)
৩০। শ্রীজগন্নাথ (বিপ্র, বৈদ্য অথবা স্বতন্ত্র ব্যক্তি)
৩১। দ্বিজ জয়রাম
৩২। বল্লভ (যদি নারায়ণ দেবের ভ্রাতা হইয়া থাকেন)
৩৩। মাধব
৩৪। শিবানন্দ
৩৫। জানকীনাথ দাস
৩৬। জয়দেব দাস
৩৭। দ্বিজ জয়রাম
৩৮। নন্দলাল
৩৯। বাণেশ্বর
৪০। মধুসূদন দেব
৪১। বিপ্ররতি দেব
৪২। রতিদেব সেন
৪৩। রামকান্ত
৪৪। রাজা রাজ সিংহ (সুসঙ্গ)
৪৫। রামচন্দ্র
৪৬। রামজীবন বিদ্যাভূষণ
৪৭। বিপ্ররাম দাস
৪৮। রামদাস সেন
৪৯। দ্বিজ বনমালী
৫০। বনমালী দাস
৫১। বিশ্বেশ্বর
৫২। বিষ্ণু পাল
৫৩। সুকবি দাস (নারায়ণ দেব ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলে)
৫৪। সুখদাস
৫৫। সুদাম দাস
৫৬। দ্বিজ হরিরাম
৫৭। চন্দ্রাবতী

এই কবিগণের তালিকা সম্পূর্ণ নহে। আরও অনেক কবি অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(ক) চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য[1]

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের চণ্ডীদেবী কত প্রাচীন এবং এই দেবীর উপলক্ষে রচিত কাব্যই বা কত পুরাতন? মঙ্গলকাব্য সাহিত্য আলোচনা কালে ইহার উপর যে দেবপ্রভাব রহিয়াছে তাহারও আলোচনা করা প্রয়োজন। চণ্ডী-মঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল সাহিত্য এক জাতীয় সাহিত্যেরই বিভিন্ন শাখা মাত্র এবং সাদৃশ্যহেতু নানাদিক দিয়া বিশেষ তুলনীয়।

চণ্ডী দেবী ও মনসা দেবী উভয়েই যে খুব প্রাচীন দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতৃকা-পূজা, সর্প-পূজা, ও শিশ্ন-পূজা বৈদিক আর্য্যসভ্যতা হইতেও প্রাচীনতর। প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানাস্থানে, যথা উত্তর আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তির্ণ ভূখণ্ডে এবং আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত এই তিন দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[2] যাহা হউক এই বিষয়ের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিলে ক্ষতি নাই।

সর্প-দেবতার নানামূর্ত্তির মধ্যে যেমন মনসা দেবীর উদ্ভবের স্বরূপ জানা দরকার তেমনই মাতৃকা-পূজার অন্তর্গত নানা দেবীর মধ্যে (এবং তন্মধ্যে মনসা দেবীও আছেন) চণ্ডী দেবীর উৎপত্তির হেতু নির্ণয় করাও প্রয়োজন। মনসা দেবীর কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন চণ্ডী দেবী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। চণ্ডী দেবী সম্বন্ধে অনুমান হয় যে তিনি অন্যতমা মাতৃকা দেবীরূপে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে, বিশেষতঃ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে, অনেক প্রাচীন কাল হইতে পরিচিতা ছিলেন। ভারতবর্ষে যে সময়ে আর্য্যসভ্যতা প্রবেশলাভ করে নাই সেই সময়েও এই দেশে চণ্ডী দেবীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা খৃঃ পূঃ ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। সমগ্র পৃথিবীতে মাতৃকা বা শক্তি-দেবী বিভিন্ন নামে পরিচিতা এবং বিভিন্ন জাতিদ্বারা পূজিতা। শিশ্ন বা লিঙ্গপূজকগণও শক্তিপূজা প্রচারে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকিবে। সর্পপূজকগণও সম্প্রদায় এবং জাতি বিশেষে সর্প-দেবতাকে মাতৃকা বা শক্তি-দেবীতে পরিণত করিয়াছে বলিয়া আমরা মনসা দেবীকে পাইয়াছি।

---

(১) স্ত্রী-দেবতা প্রধান শাক্ত-মঙ্গলকাব্য (লৌকিক সাহিত্য)।

(২) History of Egypt (Breasted) History of the Near East (Hall), Annals of Rural Bengal (Hunter) ১ম Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa and Asia (Hyde Clarke) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং Crete দ্বীপে Dr. Evansএর আবিষ্কার দ্রষ্টব্য।

মনসা দেবী

কোটালীপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত। আনুমানিক খৃঃ দশম শতাব্দী।

ক. বি. আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত

শক্তিপূজার প্রতীক হিসাবে এই দেশে যত দেবী রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডী দেবীর প্রসিদ্ধি সমধিক। এই দেবীর সহিত আল্লাইন জাতির অন্তর্গত পামিরীয় গোষ্ঠীর সম্বন্ধের স্বপক্ষে যে কল্পনা বা অনুমান করিয়াছি তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থের স্থানান্তরে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক। শক্তি-দেবী অবশ্য অনেক আছেন, যেমন দুর্গা, কালী, তারা, চণ্ডী, শাকম্ভরী প্রভৃতি।* এই দেবীগণের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল তাহা বোধ হয় কালক্রমে লোপ পাইয়া একই দেবীর বিভিন্ন নাম ও রূপ বলিয়া শক্তি-পূজকগণ মানিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে Isis, Ishtar, Anna-Parenna প্রভৃতি দেবীর কথা এই স্থানে আলোচনা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের শক্তিপূজা কালক্রমে "হিন্দু" ও "বৌদ্ধ" নামক দুই বৃহত্তর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। লিঙ্গপূজা এবং তান্ত্রিকতাও এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই "হিন্দু" ও "বৌদ্ধ" উভয় নামই আগে যে ভাবে ব্যবহৃত হইত তাহাতে উভয়ের ব্যবধান বোঝা সময় সময় কঠিনই মনে হয়। এই উভয় ধর্ম্মমতের সৌধ গঠন করিতে বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য্যজাতির প্রচেষ্টা এবং বৌদ্ধমত গ্রহণে বিশেষ করিয়া মঙ্গোলীয় জাতির উৎসাহ স্বীকার না করিয়া লাভ নাই।

নানাপ্রকার শাক্ত-দেবীর মধ্যে চণ্ডী একজন দেবী। আবার চণ্ডী দেবীও নানারূপ আছেন—যেমন পৌরাণিক চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ঘোড়াইচণ্ডী, মাকড়-চণ্ডী, ঠাকুরাণী, দেলাইচণ্ডী, লখাইচণ্ডী, বাসুলী ইত্যাদি। এই দেবীগণ মূলে এক চণ্ডীরই প্রকারভেদ বলিয়া এখন স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে নানা দেবী এক বৃহত্তর চণ্ডীর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

---

* (1) "The late discovery made in Orete by Dr. Evans of the image of a goddess standing on a rock with lions on either side, which is referred to a period as remote as 3000 B. C. has offered another startling point in regard to the history of the Chandi-cult. The mother in the Hindu mythology rides a lion, and in Markandeya Chandi there is a wellknown passage where she stands on a rock with a lion beside her for warring against the demons."

—History of Bengali Lang. & Lit. by D. C. Sen, p. 298.

(2) "The worship of the Snake-goddess and of Chandi once prevailed in all parts of the ancient world and recent discoveries made in Crete by Dr. Evans attest that it existed there as early as 3000 B. C."

—History of Bengali Lang. & Lit. by Dr. D. C. Sen, p. 251

(3) Lost World by Anne Terry White.

আমাদের কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়োজন এই চণ্ডী-দেবীগণের মধ্যে "মঙ্গলচণ্ডী" নামক দেবীকে লইয়া, কারণ তাঁহার নামেই প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশেই "মঙ্গলচণ্ডী" আছেন অন্যত্র নাই। কিন্তু মনসাদেবীর অবস্থা সেরূপ নহে। তিনি "মুঞ্চামা" দেবী নামে একটু স্বতন্ত্র উচ্চারণের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-ভারতের স্থান বিশেষে অদ্যাপি পূজিতা হইতেছেন।

আমাদের ধারণা ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গালাদেশে পামিরায় জাতির উপাস্যদেবী "গৌরী", "দুর্গা" বা "উমা" "চণ্ডী" নামে পরিচিতা হইবার সময় ইহাতে মঙ্গোলীয় সংশ্রব ঘটিয়াছে। পামিরীয় ও মঙ্গোলীয় জাতিদ্বয়ের প্রথমে বিবাদ-বিসম্বাদ ও পরে মিলনের ফলে আমরা চণ্ডীদেবীকে এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে "মঙ্গলচণ্ডী" দেবীকে পাইয়াছি কি না ইহা গবেষণার বিষয় বটে।

বাঙ্গালাদেশে পামিরীয় সভ্যতার অন্যতম দান এই "মঙ্গলচণ্ডী" দেবীকে ধরিয়া লইলে অষ্ট্রিক সভ্যতার অন্যতম দান "মনসা"দেবী হইতে পারেন। তবে উভয় দেবীই মঙ্গোলীয় সংশ্রবে ও প্রভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন বলা চলিতে পারে কি? সম্ভবতঃ পৌরাণিক আর্য্যসভ্যতা এই দেবীদ্বয়ের সর্ব্বশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকিবে। বাঙ্গালার সংস্কৃতির ভিতরে কিঞ্চিৎ দ্রাবিড় সংশ্রব থাকার দরুণ ইহার প্রভাবও বাঙ্গালার দেব-দেবীর ভিতরে কিছুটা থাকা অসম্ভব নহে।

সমগ্র পৃথিবী হিসাবে সর্প-পূজা ও মাতৃকা-পূজা উভয়েই সমপ্রাচীন। শুধু ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করিলে এই দেশে মাতৃকা-পূজা (যেমন চণ্ডী-পূজা) অপেক্ষা সর্প-দেবতার পূজা অধিক প্রাচীন। কেননা সর্প-পূজক অষ্ট্রিকজাতি চণ্ডী বা দুর্গাদেবীর পূজক পামিরীয়গণ (আল্পাইন) অপেক্ষা এই দেশের অধিক প্রাচীন অধিবাসী। আবার বাঙ্গালাদেশে "মঙ্গলচণ্ডী" নামক চণ্ডীদেবীর পূজা সর্প-দেবী মনসার পূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর। বাঙ্গালা-দেশে "মঙ্গল-চণ্ডী" দেবীর পরে যে মনসা-দেবীর পূজার উদ্ভব অথবা বিস্তৃতি ঘটে তাহা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের আদি কবি বলিয়া আজ পর্য্যন্ত যিনি আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইয়াছেন তিনি খৃঃ ১২ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কাণা হরি দত্ত। অবশ্য কাণা হরি দত্তের সময় অনুমান মাত্র। অপরপক্ষে চণ্ডী-মঙ্গলের আদি

কবি বলিয়া অনুমিত কবি মাণিক দত্ত খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। এই সময়ের অপর চণ্ডী-মঙ্গলের কবির নাম দ্বিজ জনার্দ্দন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের উদ্ভবের বেশ কিছুকাল পরে চণ্ডী-মঙ্গল সাহিত্যের আরম্ভ হয়। অথচ ব্রতকথা হিসাবে চণ্ডীর উপাখ্যান আরও প্রাচীন এবং কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। মাণিক দত্ত এবং দ্বিজ জনার্দ্দনের কাব্যদ্বয়ও প্রায় ব্রতকথার মতই সংক্ষিপ্ত।

সংস্কৃত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানের উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ইহা পরবর্ত্তী যোজনা এবং বাঙ্গালা ব্রতকথার গল্প আরও অধিক পুরাতন। এই ব্রতকথার ভিতর দিয়াই চণ্ডী-মঙ্গলের গল্প প্রথম প্রচারিত হইয়াছে।

হর-গৌরীর বাঙ্গালাদেশে প্রসার-প্রতিপত্তির পর মনসা দেবীর শিব-বীর্য্যে জন্ম এবং চণ্ডীর সহিত বিবাদের কথা মনসা-মঙ্গল সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুতরাং এতদ্দেশীয় মঙ্গলচণ্ডী দেবী মনসা দেবী হইতে প্রাচীনা বলা যাইতে পারে।

মানব-সভ্যতার স্তর বিচারে মানব আগে পশুঘাতক (Hunter) বা কিরাত, পরে পশুচারণকারী, তাহার পর কৃষক এবং সর্ব্বশেষে বণিক। আমাদের বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডী দেবীকে সর্ব্বপ্রথম পশুগণ ও কিরাতগণের দেবীরূপে দেখিতে পাই। তিনি প্রথমে পাহাড়ী (Alpine) জাতির দেবী ছিলেন বলিয়া ইহাতে সন্দেহ হয়। পাহাড়ী পামিরীয় জাতির সভ্যতার আদিযুগের স্তর ইহাতে সূচিত হইতেছে কি? বাঙ্গালাদেশে উল্লিখিত জাতি কৃষি-কার্য্যে পরবর্ত্তী সময়ে মনোনিবেশ করে। আমাদের শিবায়ন সাহিত্য এই বিষয়টিরই ইঙ্গিত দিতেছে কি না কে বলিবে? পামিরীয় দেবতা শিব-ঠাকুরের বাঙ্গালা দেশে কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ এই দিক দিয়া বিশেষ অর্থপূর্ণ।

অষ্ট্রিক জাতির সর্প-পূজার প্রতীককে পামিরীয়গণ মঙ্গোল-প্রভাবে পড়িয়া সম্ভবতঃ স্ত্রীদেবতা মনসা দেবীতে রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমুদ্র-ভ্রমণপ্রিয় অষ্ট্রিক জাতির অস্তিত্বের আভাষ মনসা-মঙ্গল কাব্যের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণের অত্যধিক ছড়াছড়ির ভিতর লক্ষ্য করা যাইতে পারে। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে উহা পরবর্ত্তী সময়ে সংক্রমিত হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া কৈবর্ত্ত ও তিয়র প্রভৃতি যে সব জাতি জলে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জলের সাহায্যে জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদিগের প্রাধান্য এই মনসা দেবীপূজার আদি যুগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদিকে বাছাইর উপাখ্যানে মনসা-

মঙ্গলের গল্পে হালিক কৈবর্ত্ত আমদানি করিয়া চণ্ডী-মঙ্গলে ও শিবায়নে বর্ণিত কৃষি-সভ্যতার সহিত সংযোগ রাখা হইয়াছে. আবার অপর দিকে ধনপতির উপাখ্যান পরবর্ত্তীকালে রচিয়া চণ্ডী-মঙ্গলের গল্পে মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগরের এক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে এবং জলপথের গুণাগুণসহ এই পথের যাত্রীর নানাদেশের সভ্যতার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডী-মঙ্গল সাহিত্যের চণ্ডী দেবী যেরূপ গোড়াতে কিরাত জাতির, মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের মনসা দেবী সেইরূপ তিয়র, কৈবর্ত্ত বা জেলে জাতির দেবী ছিলেন ইতিপূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ ধর্ম্ম-মঙ্গল সাহিত্যের ধর্ম্ম-ঠাকুরও আদিতে ডোম জাতির দেবতা ছিলেন। এই ধর্ম্ম-ঠাকুর শিব-ঠাকুরেরই নিম্নশ্রেণীসুলভ রূপান্তর কি না কে জানে। এই ধর্ম্ম-দেবতার পূজা কালক্রমে রাঢ়ের রাজন্যবর্গের তো বটেই এমনকি গৌড়ের বৌদ্ধ পাল রাজগণেরও সমর্থন লাভ করে। সুতরাং ধর্ম্ম-দেবতার পূজা নিকৃষ্ট শ্রেণী ডোম জাতি হইতে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আবার চণ্ডী দেবী ও মনসা দেবীর পূজা বৌদ্ধ পাল রাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বী শৈব সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃতি-লাভ করে। তদুপরি সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের সুদৃষ্টি চণ্ডী-পূজার উপর পতিত হওয়ায় ইহা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং বিশেষ করিয়া পৌরাণিক আদর্শের প্রেরণা লাভ করে। মনসা দেবীর পূজকগণের ভাগ্য এই দিক দিয়া তত সুপ্রসন্ন ছিল না। ব্রাহ্মণগণ মনসা দেবীকে চণ্ডী দেবীর ন্যায় তত পৌরাণিক ভাবাপন্ন করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই সেই সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলে না।

চণ্ডী দেবী ও মনসা দেবীর সেবকগণ তাহাদের দেবীদ্বয়ের পূজা প্রচারে রাজশক্তি অপেক্ষা বণিক সমাজের উপরই অধিক নির্ভরশীল ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজশক্তির ক্রমিক দুর্ব্বলতা এবং বণিক সমাজের, বিশেষতঃ গন্ধবণিক সমাজের, সমৃদ্ধি ও সমুদ্রযাত্রার গৌরবময় স্মৃতি ইহার কারণ হইতে পারে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রকৃত আরম্ভ মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের কিছু পরে হয়। এই সাহিত্য-স্রষ্টাগণ কিন্তু কিরাত, কৈবর্ত্ত, ডোম প্রভৃতি জাতির উপর ধর্ম্মের উপাদান সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য নির্ভর করেন নাই। বৈষ্ণবগণ গোপ বা গোয়ালা সমাজের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের বিশেষ আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। এই উপলক্ষে যে দৃশ্য তাঁহারা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন তাহা কিরাত, কৃষক বা বণিকের নহে এবং বাঙ্গালারও নহে। তাহা ব্রজমণ্ডলের এবং গোচারণ ভূমিতে ভ্রমণশীল গোপ বালকগণের। সেইজন্য

বৃন্দাবনের ঝোপঝাড়পূর্ণ গোচারণ ভূমির দৃশ্যপট রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাবর্ণনার মধ্য দিয়া আমাদের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। এক একটি বিশেষ জাতিকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন ধর্ম্ম-মত ও তদানুষঙ্গী সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও যথেষ্ট অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(খ) মঙ্গল-চণ্ডীর উপাখ্যান

মঙ্গল-চণ্ডীর উপাখ্যানের ভিতরে দুইটি গল্প রহিয়াছে। ইহাদের প্রথমটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান বা আক্ষটি উপাখ্যান ও দ্বিতীয়টি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। দ্বিতীয় গল্পটি ধনপতি সদাগরের পুত্রের নামানুসারে শ্রীমন্তের (শ্রীপতির) উপাখ্যান নামেও পরিচিত

(১) কালকেতুর উপাখ্যান

চণ্ডী দেবীর পূজা পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে সমুচিত প্রচারিত ছিল না। তখন পৃথিবীশুদ্ধ শিব-পূজারই প্রসার প্রতিপত্তি ছিল। ইহাতে চণ্ডী দেবী বিশেষ দুঃখিতা ছিলেন, কারণ মর্ত্ত্যলোকে কোন দেবতার উপযুক্ত মর্য্যাদা না থাকিলে দেবলোকেও বিশেষ সম্মান পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া চণ্ডী দেবীও ভক্তদত্ত উপচার প্রাপ্ত না হইলে শিব-ঠাকুরের গৃহের দারিদ্র্য ও অশান্তি বিদূরিত হয় না, সুতরাং চণ্ডী দেবীর কোন বিশেষ ভক্তের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সখী পদ্মার উপদেশমত শিব-ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং কৌশলে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে শিব-ঠাকুরকে দিয়া অভিশাপগ্রস্ত করিয়া সস্ত্রীক মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে নীলাম্বর কালকেতু ব্যাধরূপে ধর্ম্মকেতু নামক ব্যাধের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পত্নী ছায়াদেবীর ফুল্লরারূপে সঞ্জয়কেতু নামক ব্যাধের গৃহে জন্ম হইল। ইহা বলা বাহুল্য যে মর্ত্ত্যলোকেও উভয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কালকেতু বাল্যকাল হইতেই ব্যাধপুত্রের উপযুক্ত রূপ ও গুণে বিভূষিত হইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। সে যে ভবিষ্যতে অদ্ভুতকর্ম্মা হইবে তাহা বাল্যকাল হইতেই প্রতিভাত হইল। যৌবনে তাহাকে ব্যাধকুলোচিত গুণাবলীতে ভূষিত হইতে দেখা গেল। কালকেতু একদিকে পশুবধে অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল, অপরদিকে স্বীয়

পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরক্তিতে ও চরিত্রগুণে সকলকে বিস্মিত করিল। তাহার পিতামাতার প্রতি ভক্তিও যথেষ্ট ছিল। এদিকে ফুল্লরার রূপ, স্বামীপ্রেম ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা এবং গৃহস্থালিতে পটুতা ব্যাধপরিবারকে বিশেষ সুখী করিয়া তুলিল। কালকেতু নিত্য বনে গিয়া পশুবধ করে এবং ফুল্লরা হাটে গিয়া সেই মাংস বিক্রয় করে। ইহাদ্বারা সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ও রন্ধন করিয়া গৃহস্থালি চালায়। এইরূপে দিন যায়। পরিণত বয়সে ধর্ম্মকেতু পত্নীসহ কাশীবাস করিতে গেল। কালকেতু সেখানে পিতামাতার ভরণ-পোষণোপযোগী খরচ পাঠাইতে লাগিল।

এক শুভদিনে ব্যাধ-পরিবারের গৃহে নূতন পবিবর্ত্তন আসিল। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে কৃপা করিতে অগ্রসর হইলেন। দেবীর উদ্দেশ্য এই ব্যাধের সাহায্যে পৃথিবীতে স্বীয় পূজার প্রচলন করা। এই জন্যই ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বরকে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেই শুভদিনের আগমনের পূর্ব্বে একদিন কালকেতুর মৃগয়ার বিরুদ্ধে বনের পশুগণের এক ষড়যন্ত্র হইয়া গেল। কালকেতুর নিত্য পশুবধে বনে পশুকুল সন্ত্রস্ত। তাহারাও তো দেবীর সেবক। সুতরাং তাহারা আকুল ক্রন্দনে দেবীর নিকট কালকেতুর বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ জানাইল। দেবী তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার ফলে কালকেতু পরদিন বনে যাইয়া একটি পশুও দেখিতে পাইল না। অবশেষে একটি সুবর্ণ-গোধিকা দেখিতে পাইয়া ধনুকের ছলে তাহাকেই বাধিয়া নিয়া তিক্ত মনে বাড়ী ফিরিল। এই সুবর্ণ-গোধিকা আর কেহ নহেন, দেবী স্বয়ং। গোধিকা অযাত্রিক হইলেও ভবিষ্যৎ-ভক্ত কালকেতুকে দয়া করিতে চণ্ডী দেবী এই রূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্যাধ পরিবারের শুভদিনের সূচনা করিলেন।

ক্ষুধার্ত্ত কালকেতু বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী ফুল্লরাকে প্রতিবেশিনীর গৃহ হইতে কিছু চাউল ধার করিতে পাঠাইয়া নিজেই বাসিমাংস বিক্রয় করিতে গোলাহাটে গেল। এদিকে ব্যাধ-দম্পতির অনুপস্থিতিতে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল। দেবী চণ্ডী গোধিকা রূপ পরিত্যাগ করিয়া এক অসামান্যা সুন্দরীর ও ষোড়শীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তিনি রূপে ও বেশ-ভূষায় ব্যাধ-গৃহ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও মৃদু-মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। ফুল্লরা গৃহে ফিরিয়া তো অবাক। এই অপরিচিতা নারীকে ব্যাধ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনেক অনুরোধ করিয়া ফুল্লরা অকৃতকার্য্য হইল। ছদ্মবেশিনী চণ্ডী দেবী কালকেতু ব্যাধকে অনুগ্রহ করিবেন ইহা ফুল্লরাকে জানাইতে যে

দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করিলেন, তাহা অবশ্য কোন স্বামীপ্রেমমুগ্ধা নারী সহ্য করিতে পারে না। অবশেষে ফুল্লরা কাঁদিয়া ফেলিল এবং কালকেতুকে হাটে গিয়া ডাকিয়া আনিল। প্রথমে ফুল্লরার অভিযোগ শুনিয়া এবং অবিলম্বে এই অলোকসামান্যা রূপবতী ষোড়শীকে দেখিয়া কালকেতুও অবাক হইয়া গেল। কালকেতুর অনুরোধও দেবী অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ কালকেতু অবশেষে দেবীর উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইল শরটি তাহার নিজের হাতেই আটকাইয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার পর দেবীর দয়া হইল। তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন ও কালকেতুকে প্রচুর ধন, একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী এবং সাত ঘড়া ধন দান করিলেন। ইহা ছাড়া দেবী স্বীয় দশভুজা মূর্তি ব্যাধ-দম্পতিকে দেখাইলেন এবং কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত গুজরাট নামক স্থানের একটি বন কাটাইয়া তথাকার রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালকেতু রাজ্যলাভ করিল বটে কিন্তু নূতন রাজ্যে প্রজা নাই। পুনরায় চণ্ডী দেবী কালকেতুকে সাহায্য করিলেন।

কালকেতু কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজা ছিল। দেবী চণ্ডীর ইচ্ছাক্রমে কলিঙ্গ দেশে এই সময় ভয়ানক বন্যা ও বৃষ্টি হইয়া দেশের অধিবাসিদিগকে অতিশয় বিপন্ন করে। কলিঙ্গরাজের প্রজাপীড়ক বলিয়াও দুর্নাম ছিল। তখন কলিঙ্গ দেশ হইতে দলে দলে প্রজাবৃন্দ গুজরাটের নবগঠিত রাজ্যে বাস করিতে গেল। কালকেতু সাদরে ইহাদিগকে গ্রহণ করিল কারণ বন কাটাইয়া যে নূতন রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে, ইহারাই তাহার প্রথম অধিবাসী হইবে। ইহাদের অধিকাংশই ভাল লোক হইলেও ইহাদের সঙ্গে অন্ততঃ একজন দুষ্টলোক গুজরাটে আসিল। এই ব্যক্তি ধূর্তশিরোমণি ভাড়ু দত্ত।

শঠ ভাড়ু দত্ত কালকেতুর রাজ্যে রাজ-অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাগণের অভিযোগে ক্রুদ্ধ কালকেতু অবশেষে ভাড়ু দত্তকে অপমান করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। ইহার ফলে ধূর্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাড়ু কলিঙ্গরাজের নিকট কালকেতুকে বিদ্রোহী প্রজা বলিয়া প্রমাণ করিল। তখন কলিঙ্গ রাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বাধিল। কালকেতু পরাজিত হইয়া বন্দী হইল। অতঃপর চৌত্রিশ অক্ষরে চণ্ডী দেবীকে স্তব করিয়া দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তিলাভ করিল। দেবী কলিঙ্গ-রাজকে স্বপ্নে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া যে নির্দেশ দিলেন তাহার ফলে কালকেতু শুধুই যে মুক্তিলাভ করিল তাহা নহে, স্বীয় রাজ্যও ফিরাইয়া পাইল। ইহার পর

ধূর্ত্ত ভাড়ুদত্তকে কালকেতু শাস্তি দিল, তবে প্রাণে মারিল না। কিছুকাল পরে পুত্র পুষ্পকেতুকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কালকেতু পত্নী ফুল্লরাসহ স্বর্গে গমন করিল। দেবী চণ্ডী স্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও শচী দেবীর নিকট ফিরাইয়া দিলেন। এদিকে মর্ত্ত্যলোকে চণ্ডী দেবীর পূজা প্রচারিত হইল। কালকেতুর কাহিনী শেষ হইল।

এই উপাখ্যানটি শিবরাত্রি ব্রতকথার অন্য একটি ভক্ত ব্যাধের উপাখ্যানের সমগোত্রিয় এবং শৈবগন্ধী বলা যাইতে পারে। যাহা হউক পরবর্ত্তী গল্পটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান এবং সম্ভবতঃ ইহা মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগরের গল্পের অনুকরণে অনেক পরে রচিত।

(২) ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

ধনপতি সদাগর উজানি* নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মনসা-মঙ্গলের চাঁদসদাগরের ন্যায় গন্ধবণিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উজানি নগরে মনসা-মঙ্গল কাব্যের বেহুলার পিতৃ গৃহ ছিল বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। এইদিক দিয়া উভয় শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের কবিগণ উভয় কাব্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাইয়া থাকিবেন। ধনপতির দুই স্ত্রী ছিল, লহনা ও খুল্লনা। এই খুল্লনা পূর্ব্বজন্মের অপ্সরী রত্নমালা। ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিবার সময় তালভঙ্গ হওয়াতে চণ্ডী দেবীর অভিশাপে মর্ত্ত্যলোকে ইছানীনগরে লক্ষপতি নামে এক বণিক গৃহে খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত অভিশাপ দেবানুগ্রহেরই নামান্তর। এই খুল্লনা ও ভবিষ্যতে তৎপুত্র শ্রীমন্ত চণ্ডী দেবীর পূজা মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করিয়া ধন্য হইবেন। এই উদ্দেশ্যেই ইহাদের মর্ত্ত্যলোকে আগমন। পারাবত ক্রীড়া উপলক্ষে সাধু ধনপতি লহনার খুল্লতাত কন্যা খুল্লনার পরিচয় লাভ করেন। চতুর সাধু প্রথমা স্ত্রী লহনাকে মিথ্যাবাক্যে প্রবোধ দিয়া খুল্লনাকে বিবাহ করেন। একবার উজানি-রাজের কার্য্যে ধনপতি গৌড়-রাজের নিকট গমন করেন। সপত্নীদ্বয় এতদিন মনের মিলেই বাস করিতেছিল কিন্তু সদাগরের গৌড়ে অনুপস্থিতিতে বাড়ীর দাসী দুর্ব্বলা লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিল। লহনার মন তখন সপত্নীদ্বেষে ভরিয়া উঠিল। ইহার ফলে লহনা খুল্লনাকে নিকৃষ্ট খাদ্য খাইতে দিল এবং উত্তম বেশভূষা কাড়িয়া নিয়া ঢেঁকিশালায় তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিল। শুধু ইহাই নহে, খুল্লনাকে

* নানাস্থানের মধ্যে রাঢ়দেশের অন্তর্গত বলিয়া বহু কবি লিখিলেও এই উজানি নগর গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও চাপাইর তীরে উজানি-মঙ্গলকোট নামে দুইটি গ্রাম (বর্দ্ধমান জেলায়) রাঢ়দেশে বর্ত্তমান আছে।

ছিন্নবস্ত্রে, নিরাভরণ ও তৈলহীনদেহে কদন্ন ভক্ষণ করিয়া নিত্য একপাল ছাগল চড়াইতে নিযুক্ত করা হইল। খুল্লনা প্রথমে এই সব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিল। চতুরা লহনা প্রতিবেশিনীর সাহায্যে লিখিত সদাগরের আদেশ-জ্ঞাপক জালপত্র খুল্লনাকে দেখাইয়াছিল। খুল্লনা লেখাপড়া জানিত এবং সদাগরের হস্তাক্ষর চিনিত। সুতরাং ইহা সে প্রত্যয় না করিয়া জালপত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিল। তখন উভয় সতীনে কথাকাটাকাটি হইতে মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গেল বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লহনার জেদই বজায় রহিল, খুল্লনাকে নিত্য বনে-জঙ্গলে ছাগল চড়াইতে যাইতে হইল। একদিন সর্ব্বশী নামক একটি ছাগল হারাইয়া যাওয়াতে খুল্লনার মহাবিপদ উপস্থিত হইল। সেই সময় বনে কতিপয় অপ্সরা চণ্ডী-পূজা করিতেছিল, ইহা খুল্লনা দেখিতে পাইল এবং তাহাদের পরামর্শে চণ্ডী-পূজা করিয়া হারাণ ছাগল ফিরাইয়া পাইল। অবশ্য চণ্ডী দেবীর মায়াতেই এই সব ঘটিয়াছিল।

ধনপতি সদাগর দেশে ফিরিলেন। তিনি যথাসময়ে তাঁহার বিগত-যৌবনা স্ত্রী লহনা কর্ত্তৃক সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী খুল্লনার দুর্দ্দশার কথা অবগত হইলেন। সদাগরের মৃদু তিরস্কার ও উপদেশে পুনরায় গৃহ-শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন পরে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সমাগত হইল। ইহাতে দেশের যত জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও স্বজাতি নিমন্ত্রিত হইল কিন্তু এই সময় জ্ঞাতিবর্গ ঘোঁট করিয়া বসিল। তাহারা বলিল যাহার যুবতী স্ত্রী স্বামীর গৃহে অনুপস্থিতির কালে বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে তাঁহার হস্তের অন্ন জ্ঞাতিবর্গ স্পর্শ করিতে পারে না। ইহার উপায়ও আবিষ্কৃত হইল হয় খুল্লনা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতিবর্গনির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা প্রদান করুক নতুবা ধনপতি প্রচুর অর্থ দণ্ডস্বরূপ দান করুক। অবশেষে খুল্লনার ইচ্ছাক্রমে পরীক্ষা গ্রহণই স্থিরীকৃত হইল। এই পরীক্ষা সহজ নহে। সর্প-পরীক্ষা, অগ্নি-পরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, জতু-গৃহ পরীক্ষা এবং আরও কত রকম পরীক্ষা। চণ্ডী দেবীর কৃপায় খুল্লনা সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণা হইল এবং সামাজিক গোল মিটিল।

ইহার পর সদাগর ধনপতি রাজাদেশে সিংহলে বাণিজ্য করিতে প্রেরিত হইল, কারণ রাজভাণ্ডারে কতিপয় আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছিল। এই সময় খুল্লনা অন্তঃসত্ত্বা। সদাগর খুল্লনাকে তাহার গর্ভের অবস্থার স্বীকারোক্তিজ্ঞাপক একটি পত্র ("জয়পত্র") লিখিয়া দিয়া অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি যাত্রার সময় একটি অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। তিনি খুল্লনার উপাস্যদেবী চণ্ডীর ঘট ও ইহার পুরোহিতকে

অপমানিত করিলেন, কারণ তিনি পরম শৈব, শাক্ত দেবী চণ্ডীর ক্ষমতার কথা তাঁহার জানা ছিল না। ইহার কুফল যাহা ঘটিবার ঘটিল। পথে সদাগর অনেক বিপদে পড়িলেন। ঝড়-জলে সমুদ্রের মধ্যে তাঁহার সাতডিঙ্গা মধুকরের মধ্যে ছয়খানা ডিঙ্গাই ডুবিয়া গেল। একমাত্র মধুকর ডিঙ্গাসম্বল ধনপতি অতি কষ্টে সিংহলের নিকটে পৌছিলেন। যখন কালিদহ নামক সাগরের অংশে আসিয়াছেন তখন এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এক দেবী অকূল সমুদ্রে এক বৃহৎ পদ্মের উপর সমাসীনা থাকিয়া একটি গজকে একবার শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন আবার তাহার শুণ্ড সমেত মুখমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন এবং পুনরায় উগরাইতেছেন। দেবী এইরূপ বারবার করিতেছেন সদাগর ইহা দেখিতে পাইলেন। এই মূর্ত্তি চণ্ডী দেবীর এবং "কমলে-কামিনী" নামে খ্যাত।

ধনপতি সিংহলে পৌছিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা সিংহলরাজের নিকট নিবেদন করিলেন। সিংহলরাজ শালিবাহন সদাগরের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবশেষে ধনপতি রাজদরবারে উপহাসের পাত্র হওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তিনি রাজার সহিত বাজি রাখিলেন। স্থির হইল হয় তিনি সিংহলরাজকে "কমলে-কামিনী" দেখাইবেন নয়তো কারাগারে যাইবেন। তখন ধনপতি সদাগর রাজাকে নিয়া যেখানে "কমলে-কামিনী" দেখিয়াছিলেন পুনরায় সেখানে গেলেন। কিন্তু ধনপতির দুর্ভাগাবশতঃ এই দেবী-মূর্ত্তি আর দেখা গেল না। সুতরাং তিনি বাজিতে হারিয়া গেলেন। দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ রাজা ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে ধনপতির গৃহে খুল্লনা যথাসময়ে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। এই সুন্দর শিশুটি আর কেহ নহে, শাপভ্রষ্ট মালাধর গন্ধর্ব্ব। চণ্ডী দেবীর পূজা প্রচারের প্রয়োজনে ইহার জন্ম। নামকরণের বয়স হইলে তাহার নাম রাখা হইল শ্রীমন্ত বা শ্রীপতি। শ্রীমন্ত মাতা ও বিমাতা উভয়েরই প্রচুর স্নেহে মানুষ হইতে লাগিল। তাহাদের আদরের নাম হইল "ছিরা"। শিশু ক্রমে বালক বয়স প্রাপ্ত হইল। তাহার যেমন রূপ তেমনই বুদ্ধির প্রাখর্য্য। শ্রীমন্ত এই বয়সে নিত্য জনার্দ্দন ওঝার পাঠশালায় পড়িতে যায়। একদিন শ্রীমন্ত গুরুকে এমন এক প্রশ্ন করিল যে তাহার উত্তর গুরু খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রশ্নটি হইল যে ভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকিলেও সূর্পণখা, অজামিল প্রভৃতির এত সহজে মুক্তি হইল কেন, আর

প্রহ্লাদের স্থায় ভক্ত এত কষ্ট পাইল কেন? প্রশ্নটি উপলক্ষ করিয়া প্রথমে কিছু তর্ক হইল এবং সদুত্তরদানে অক্ষম গুরু শ্রীমন্তকে "জারজ" বলিয়া গালি দিলেন। অপমানিত শ্রীমন্ত অভিমানে বাড়ীতে ফিরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল এবং আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। মাতা, বিমাতা ও দুর্ব্বলা দাসীর অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বালক দ্বার খুলিল এবং মাতাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার পিতা ধনপতি এই নগরের রাজাদেশে বাণিজ্য করিতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিঘ্নসঙ্কুল সমুদ্রপথে সিংহল গিয়াছেন এবং তাঁহার ফিরিবার সময়ের কোন নিশ্চয়তা নাই ইহা শ্রীমন্ত জানিতে পারিল। তখন এই আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চিত্ত বালক পিতার সন্ধানে এই বিপজ্জনক সমুদ্রে যাইতে অভিলাষ জানাইল। মাতা ও বিমাতার কোন অনুরোধ ও ভীতিপ্রদর্শনেই বালকের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। এক শুভদিনে পিতার খোঁজে শ্রীমন্ত সাতডিঙ্গা মধুকর নিয়া সমুদ্রে ভাসিল। পিতার স্থায় শ্রীমন্তও পথে "কমলে-কামিনী" দর্শন করিল। পিতা ধনপতির স্থায় পুত্র শ্রীমন্তও সিংহল-রাজকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইতে অপারগ হইল। এইবার অতিক্রুদ্ধ সিংহল-রাজ শ্রীমন্তের প্রাণ-দণ্ডাদেশ দিয়া মশানে পাঠাইয়া দিলেন। বিপন্ন শ্রীমন্ত তখন চৌত্রিশ অক্ষরে চণ্ডী দেবীর স্তব করিতে লাগিল ও ভক্তি-গদগদ চিত্তে পিতামাতাকে জীবনের শেষমুহূর্ত্তে অশ্রুপাত করিতে করিতে স্মরণ করিল। দেবী চণ্ডী ভক্ত শ্রীমন্তের স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন। তখন দেবীর ডাকিনী-যোগিনী রাজসৈন্যগণকে প্রহারে জর্জ্জরিত ও বধ করিয়া শ্রীমন্তকে উদ্ধার করিল। ইহার পর পিতা-পুত্রের পরিচয় ও মিলন হইল এবং ধনপতি চণ্ডী দেবীর পূজা করিলেন। দেবীর কোপে অতিমাত্র ভীত রাজা দেবীর আদেশে পিতা-পুত্রকে মুক্তিদান করিলেন। দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত এইবার রাজাকে "কমলে-কামিনী" দর্শন করাইল। এই দেবীমূর্ত্তি দর্শনে সকলেই কৃতার্থ হইলেন। অতঃপর সিংহল-রাজ নিজকন্যা সুশীলাকে শ্রীমন্তের সহিত বিবাহ দিলেন এবং পিতা ও পত্নীসহ শ্রীমন্ত নিরাপদে স্বদেশে ফিরিল। উজানি-রাজ ধনপতি এবং শ্রীমন্তের সমুদ্র যাত্রার সমস্ত আপদ-বিপদের ও তৎসঙ্গে "কমলে-কামিনী" দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া এই বিস্ময়কর দেবীমূর্ত্তি দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। এইবারও দেবীর কৃপালাভ হইল। দেবী উজানি-রাজকেও দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। উজানি-রাজ বিক্রমকেশরী ইহাতে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ

দিলেন। চণ্ডী দেবীর আশীর্ব্বাদে ধন্য এই বণিক পরিবার কিছুদিন আনন্দে কাটাইলে সময় মত দেবলোকের অধিবাসিগণ পুনরায় দেবলোকে প্রয়াণ করিল। চণ্ডী দেবীর পূজাও মর্ত্ত্যে প্রচার লাভ করিল। এইস্থানে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি হইল।*

---

* অতঃপর চণ্ডী-মঙ্গলের মুখ্য মুখ্য কবিগণ ও তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে একে একে উল্লেখ করা যাইতেছে। মনসা-মঙ্গলের ন্যায় চণ্ডী-মঙ্গলের কবিও অনেক। কবি, গায়ক, কবি-গায়ক ও লেখকের নাম অনেক সময় মিশ্রিত হইয়া আছে। ইহাদের সংখ্যাও একশতের উপরে হইবে বলিয়াই অনুমান হয়। কোন সময়ে মঙ্গল-কাব্যের "চণ্ডী-মঙ্গল" শাখা যে সবিশেষ সমৃদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেণীর বিশেষ প্রিয় সঙ্গীতময় ও ধর্ম্মমূলক সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণ

(১) **মাণিক দত্ত**—মাণিক দত্তের পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই কবির সময় গৌড়ের সুবিখ্যাত দ্বারবাসিনী দেবীর পূজা খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইত। কবির লেখার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ কবি খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য অথবা শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন এবং গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কবি মাণিক দত্ত তাঁহার পুথিতে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অনেক পরিমাণে রামাই পণ্ডিতের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। এই বর্ণনার মধ্যে অনাদ্য বা ধর্ম্ম-ঠাকুর ও তাঁহার বাহন উল্লুকের কথা আছে। বেদ ও পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত হিন্দু-বৌদ্ধনির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম-পূজকগণ, নাথ-পন্থীগণ, মনসা-পূজকগণ, চণ্ডী-পূজকগণ ও অন্যান্য লৌকিক ধর্ম্মের সেবকগণ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডী-মঙ্গলের কবি মাণিক দত্ত এবং দ্বিজ জনার্দ্দন, মনসা-মঙ্গলের কবি কাণা হরিদত্ত অথবা নারায়ণ দেবের প্রায় সমসাময়িকও হইতে পারেন। শূন্য-পুরাণের কবি খৃঃ ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর লোক হইলে রামাই পণ্ডিতের সময়ের সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা পরবর্ত্তী কবি মাণিক দত্তের চণ্ডীকাব্যকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। মাণিক দত্ত বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব নিম্নরূপ :

"অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে।
হস্তপদ নাই ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি গোলোক ধেয়াইল
গোলোক ধেয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধেয়াইল।
শূন্য ধেয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি যুহিত ধেয়াইল :
যুহিত ধেয়াতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপামা।
পৃথিবী সৃজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা॥" ইত্যাদি।

—মাণিক দত্তের চণ্ডী-কাব্য।

মাণিক দত্তের ভণিতা এইরূপ :—

"দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়।
নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায়॥"

—মাণিক দত্তের চণ্ডী-কাব্য।

(১) **দ্বিজ জনার্দ্দন**—দ্বিজ জনার্দ্দন সম্ভবতঃ ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন (History of Bengali Language & Literature, P. 1005)। দ্বিজ জনার্দ্দন রচিত চণ্ডীকাব্য মাণিক দত্ত রচিত চণ্ডীকাব্যের ন্যায় আকারে ক্ষুদ্র। দ্বিজ জনার্দ্দনের পুথিকে "কাব্য" না বলিয়া "ব্রতকথা" বলিলেও চলিতে পারে। ইহাতে বিষয়বস্তু অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই কবি লিখিত "ব্রত-কথা" অথবা কাব্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ভক্ত কবিগণের অক্লান্ত শ্রমের ফলে বৃহদাকার ধারণ করিয়া সুন্দর কাব্যে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিজ জনার্দ্দন ও মাণিক দত্তের মূল পুথি দুইটি তো পাওয়াই যায় না, এমনকি ইহাদের রচনা যে সব পুথিলেখক নকল করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য। দ্বিজ জনার্দ্দনের পুথিতে কালকেতুর গুজরাটে রাজ্যস্থাপন ও কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধের কথা নাই। দ্বিজ জনার্দ্দনের রচনা এইরূপ :

(ক) "নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া।
পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে।
সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্যাগিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে।
পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ।
মঙ্গল-চণ্ডীর পদে লইল শরণ॥"—ইত্যাদি।

—দ্বিজ জনার্দ্দন রচিত কালকেতুর উপাখ্যান।

(খ) "মঙ্গল-চণ্ডীর বরে খুল্লনা যুবতী।
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি॥
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান।
শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান॥" ইত্যাদি।

—দ্বিজ জনার্দ্দন রচিত ধনপতির উপাখ্যান

চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের আদিযুগের কতিপয় কবি :—

চণ্ডী-মঙ্গলের কতিপয় কবির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(৩) **মদন দত্ত**—মাণিক দত্ত ও দ্বিজ জনার্দ্দনের পর মদন দত্ত নামক জনৈক কবিকে চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের তৃতীয় কবি বলা যাইতে পারে। এই কবি সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি খৃঃ ১৪শ কি ১৫শ শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে পারেন। এই কবির পর উল্লেখযোগ্য কবি মুক্তারাম সেন।

(৪) **মুক্তারাম সেন**—মুক্তারাম সেনের নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম (দেয়াঙ্গ) নামক গ্রাম। ইহার অপর নাম "আনোয়ারা।" ইহার চণ্ডী-মঙ্গল প্রণীত হওয়ার কাল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ (১৬৬৯ শক)। মুক্তারাম সেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার পুঁথির নাম "সারদা মঙ্গল"। এই কবির লেখাতে সংস্কৃতপ্রভাব অল্প এবং বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী। যথা,

কালিদহে

"কালিদহে স্বচ্ছে মাতা কমলের বন
তদুপরি মাহেশ্বরী কুমারীবরণ।
অবহেলে গজ গিলে হেরিয়া অবলা
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা।
কোনখানে ব্যাঘ্র সনে মেষে করে কেলি
ফণা সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একুকেলি।
ব্যাঘ্র চাপিঞা মৃগে যাই পুছএ কুশল
তথাপিয় কারে কেহ নাহি করে বল।
গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥"

— মুক্তারাম সেনের চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য।

খাদ্য ও খাদকসম্পর্কিত পশুদের উল্লিখিত মনের মিলসূচক বর্ণনা অনেক পরবর্ত্তী কালে ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৫) **দেবীদাস সেন**—(ক) ইনি চণ্ডী-মঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি। এই কবির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৬) **শিবনারায়ণ দেব**—(খ) চণ্ডী-মঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি। এই কবি ও ইহার কাব্য সম্বন্ধেও সবিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৭) **কীর্ত্তিচন্দ্র দাস**—(গ) ইনিও চণ্ডী-মঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি এবং বিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত।

(৮) **বলরাম কবিকঙ্কণ**—(ঘ) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে বলরাম কবিকঙ্কণ বলিয়া অপর একটি চণ্ডী-মঙ্গলের কবির অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। উপাধিটি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও মতান্তরে দেখা যায় মুকুন্দরামের ন্যায় এই কবিরও "কবিকঙ্কণ" উপাধি ছিল। মুকুন্দরামের একটি পুথির বন্দনাপত্রে উল্লিখিত আছে—"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ"। এই কবি বলরাম মুকুন্দরামের শিক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া অনুমিত হন এবং ইহার রচিত চণ্ডী-মঙ্গল মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এইরূপ অনুমান করাও বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে "গীতের গুরু" কথাটিতে বলরাম কবিকঙ্কণকে চণ্ডী-মঙ্গলের আদি কবি বুঝাইতেছে। তাঁহার পূর্ব্বের চণ্ডীর কাহিনী সম্ভবতঃ শুধু ছড়ার আকারে নিবদ্ধ ছিল। উহা ষোল পালায় আট দিন গান করিবার উপযুক্ত তখনও হয় নাই।

(৯) **দ্বিজ হরিরাম**—(ঙ) দ্বিজ হরিরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ হইলে এই কবি মাধবাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "কবিকঙ্কণের কবিত্ব যে সকল উপাদানে পুষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল উপাদান অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিতভাবে মাধবাচার্য্য ও হরিরামের কাব্যে দৃষ্ট হয়।" এই কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁহার রচনার নমুনাদৃষ্টে মনে হয় কবির রচনা মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের রচনার সহিত একসঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত। দ্বিজ হরিরামের রচনার স্থানে স্থানে মুকুন্দরাম অথবা মাধবাচার্য্যের রচনার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ব্যাধ-ভবনে চণ্ডীর আগমন ও পরিচয়ের কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিজ হরিরামের নিম্নলিখিত ছত্রগুলির সহিত অপর কবিদ্বয়ের বর্ণনামূলক ছত্রগুলি তুলনা করা যাইতে পারে। যথা,

"যুক্তি করি মহাবীর লয় ধনুঃশর।
বাণ যুড়ি বলে রামা পালায় সত্বর ॥

(ক) (খ) ও (গ) চিহ্নিত কবিত্রয় সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের History of Bengali Language and Literature গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়।

(ঘ) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২, শ্রাবণ, নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী-মঙ্গলের একখানি পুথি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ছিল। এই পুথি নকলের তারিখ ১০৮০ বাঙ্গালা সন।

নহিলে বিন্ধিমু আজি ঠেকিল বিপাকে।
এত বলি মহাবীর টানিল ধনুকে॥
আকর্ণ পুরিল বাণ না ছুটিয়া যায়।
চিত্রের পুতলী হৈল মহাবীর কায়॥
মুখে না নিঃসরে বাণী রহিল চাহিয়া।
নিঃশব্দ ফুল্লরা হৈল পতিরে দেখিয়া।
মহাবীরে দেখি চণ্ডী মুচকি হাসিয়া
কহিতে লাগিলা মাতা কপট ছাড়িয়া॥" ইত্যাদি।

—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

দ্বিজ হরিরাম একখানি মনসা-মঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন।

(১০) মাধবাচার্য্য—মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যের নাম "সারদা-চরিত"। কবি মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস পশ্চিম-বঙ্গের ত্রিবেণী ছিল। তাঁহার রচিত মঙ্গলকাব্য পাঠে জানা যায় যে তিনি "ইন্দুবিন্দুবাণধাতা" শকে অর্থাৎ ১৫০১ শকে অথবা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে তিনি ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ বর্ত্তমান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে আসিযা স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই গ্রামের প্রাচীন নাম "ন্যানপুর" (নবীনপুর) ও বর্ত্তমান নাম গোঁসাইপুর এবং গ্রামটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। মাধবাচার্য্যের পিতার নাম পরাশর, পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী ছিল। কবি আত্মপরিচয় এইরূপ দিয়াছেন:—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি।
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥

তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতিতালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দুবিন্দুবাণধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত॥
সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে।"

— মাধবাচার্য্যের সারদা-চরিত বা চণ্ডীকাব্য।

মাধবাচার্য্যের উক্তি অনুসারে তাঁহার চণ্ডীকাব্য প্রণয়নের কাল ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ ধার্য্য হইলে এই কবির পুথি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের অন্ততঃ দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মুকুন্দরামের দামুন্যাগ্রাম ত্যাগের সময় ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ হইলে তাহার অন্ততঃ এগার কি বার বৎসর পরে চণ্ডী মঙ্গলের পুথি রচনা সম্পূর্ণ হইবার কথা। এই হিসাবে ১৫৮৮ কি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরামের পুথি রচনার কাল অনুমিত হয়।

সুতরাং মাধবাচার্য্য মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তের কবি মাধবাচার্য্য পশ্চিম প্রান্তের কবি মুকুন্দরামের সহিত তুলনীয়। এত দূরবর্ত্তী দুইজন কবির প্রাচীনকালে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা সহজ ছিল না এবং একজনের লেখার সহিত যে অপরজন পরিচিত ছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অথচ এই দুই কবির রচনার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য এমনকি অনেক ছত্র একইরূপ রহিয়াছে। দুইজনই শক্তিশালী কবি। এই দুই কবিই আর কোন কবির (যেমন বলরামের) আদর্শ কিছু পরিমাণে হয়তো গ্রহণ করিয়াছিলেন বলা যায়। কিন্তু মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের চণ্ডী দুইখানি তুলনা করিলে মনে হয় যেন অন্যান্য কবির মধ্যে মাধবাচার্য্য অঙ্কিত চিত্রগুলির নিকট মুকুন্দরাম অনেক পরিমাণে ঋণী। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অঙ্কিত চিত্রগুলি মুকুন্দরাম শোধন করিয়া তাঁহার অতুলনীয় কাব্য রচনা করেন বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কনে পটুতা দেখাইলেও মুকুন্দরামের অঙ্কিত ফুল্লরা, লহনা ও খুল্লনা প্রভৃতির

ন্যায় উহা তত বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তবে পুরুষ-চরিত্রগুলি মাধু কবি মুকুন্দরাম বর্ণিত চরিত্রগুলি অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। মাধু কবির "কালকেতু" মুকুন্দরামের "কালকেতু" অপেক্ষা অধিক পৌরুষ দেখাইয়াছে। মুকুন্দরাম যতটা বিস্তৃতভাবে চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন মাধু কবি হয়ত তাহা করেন নাই। আবার ভাড়ুদত্তের ন্যায় খল চরিত্র চিত্রণে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব বোধ হয় মাধবাচার্য্য অপেক্ষা অল্প। কিন্তু অল্প কথায় শঠ মুরারী শীলের যে জীবন্ত চিত্র আমরা মুকুন্দরামের পুথিতে প্রাপ্ত হই মাধু কবির পুথিতে তাহার একেবারেই উল্লেখ দেখিতে পাই না। মাধবাচার্য্য খল মুরারী শীলকে তাঁহার রচিত কাব্য হইতে একেবারে বাদ দিয়া তৎস্থানে অপর একটি ভাল চরিত্রের স্থান করিয়াছেন। আবার উভয় কবিই স্বাভাবিকত্বের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ঘটনা বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ, স্বাভাবিকত্ব প্রভৃতির দিক দিয়া দোষগুণ বিচার করিলে উভয় কবির মধ্যে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠতর হইলেও উভয়ের ব্যবধান খুব অল্প। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতে "মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য"। ইহ ছাড়া তাঁহার মতে "মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য।" ডাঃ সেনের কবিদ্বয় সম্বন্ধে এই সমস্ত অভিমত মূল্যবান সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হয়, মুকুন্দরামের প্রতি গুণগ্রাহিতা দেখাইতে যাইয়া তিনি মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে যেন ততটা সুবিচার করেন নাই। মাধবাচার্য্য "দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি" এবং মুকুন্দরাম অপেক্ষা "ক্ষমতায় অল্প" ডাঃ সেনের এই মন্তব্য দুইটিতে মাধু কবির ভক্তগণ সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না। কালকেতু ব্যাধের বাল্যের মূর্ত্তিটিতে উভয় কবিরই স্বাভাবিকত্বের দৃষ্টি তুল্যরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেরই বর্ণনার মধ্যে মুকুন্দরামের বর্ণনা অধিকতর সুন্দর বলিয়া ডাঃ সেন যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সকল স্থান সম্বন্ধে কতদূর সমর্থনযোগ্য বলা যায় না। স্বাভাবিকত্বের দিক দিয়া নিম্নে উভয় কবির রচিত কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

কালকেতু ব্যাধের বাল্য-লীলা।

"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর,
গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে।
যতেক আখেটি সুত, তারা সব পরাভূত,
খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥

বাটুল বাঁশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে,
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥"

—মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য।

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নবরতিপতি,
সবার লোচন সুখ হেতু॥

*   *   *   *

দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা,
কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ি,
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে,
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশারু তাড়িয়ে ধরে,
দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে।
বিহঙ্গম বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

কবি মাধবাচার্য্যের যুদ্ধবর্ণনার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "কবি মাধু যুদ্ধ বর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র "অন্নদা-মঙ্গলে" সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন।" কালকেতু ও কলিঙ্গ-রাজের যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে—

"যুঝে প্রচণ্ড ভাইয়া, কোপে প্রজ্জলিত হৈয়া,
মার কাট সঘনে ফুকারে।"

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যের এই সব ছত্রের সহিত "অন্নদা-মঙ্গলে"র—

"যুঝে প্রতাপ আদিত্য।
ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার,
সংসারে সব অনিত্য" ॥—

প্রভৃতি ছত্র তুলনা করা যাইতে পারে।

---

(১১) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিলিমাবাদ পরগণার অধীন ও রত্নানু নামক নদীর তীরবর্ত্তী দামুন্যা নামক গ্রামে কবির বাসভূমি ছিল।[১] এই গ্রামে কবি সাতপুরুষ যাবৎ বাস করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর কথা। বাঙ্গালা দেশে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে মামুদ সরিফ নামক স্থানীয় রাজপুরুষের (ডিহিদার) অত্যাচারে কবিকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর কবি নানারূপ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া নদী-পথে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ও বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীনস্থ আবড়া বা আবড়া-ব্রাহ্মণভূমি নামক গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা বাঁকুড়া রায়ের শরণাপন্ন হন।[২] এই রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া এবং তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কবি তাঁহার অমর গ্রন্থ চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরামের বংশ পরিচয় এইরূপ। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র ও পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র। কবির আরও দুই ভ্রাতা ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র (সম্ভবতঃ "গঙ্গাবন্দনা"র কবি[৩] নিধিরাম) ও কনিষ্ঠভ্রাতার নাম রামানন্দ। কবির মাতার নাম ছিল দৈবকী ও কবির পুত্রের নাম ছিল শিবরাম[৪]। ইহা ছাড়া কবির পুত্রবধূর নাম ছিল চিত্রলেখা, কন্যার নাম ছিল যশোদা ও জামাতার নাম ছিল মহেশ। ইহা আমরা কবির আত্মবিবরণী পাঠে জানিতে পারিয়াছি।

---

(১) মুকুন্দরামের বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থান ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ছোটবৈনান নামক গ্রাম। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ইহারা এখন তিন স্থানে বসবাস করিতেছেন; উহা (ক) বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দামুন্যা গ্রাম, (খ) মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রাম এবং (গ) হুগলীর অন্তর্গত রাধাবল্লভপুর গ্রাম। —সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২, শ্রাবণ।

(২) রঘুনাথ রায়ের বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থান আবড়া গ্রামের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী সেনাপতে নামক গ্রামে। ইহাদের পূর্ব্বের জমিদারি ও প্রতাপ আর নাই।

(৩) মতান্তরে অযোধ্যারাম ("দাতাকর্ণ" প্রণেতা)।

(৪) বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে কবির শিবরাম ভিন্ন অপর একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম পঞ্চানন।

কবির আত্মবিবরণী হইতে কবি মুকুন্দরাম সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন আকারে রহিয়াছে। এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য দুই পুথির ছাপা সংস্করণ বঙ্গবাসী প্রেস ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে অক্ষয় সরকারের সম্পাদিত গ্রন্থ, কায়েথি গ্রামে প্রাপ্ত পুথি ও বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পুথি হইতে পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রিত মূল পুথি সম্বন্ধে সম্পাদকগণ দাবি করেন যে উহা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের স্বহস্তলিখিত, অথবা কতিপয় কর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত অংশে কবির হস্তচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার পুত্র শিবরামকে বরর্থা গাজী নামক রাজপুরুষ যে ভূমিদানপত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা এই পুথিখানার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানা কবিস্থাপিত সিংহবাহিনী নামক দুর্গামূর্ত্তির পাদপীঠে সিন্দুরলিপ্ত অবস্থায় তাঁহার স্বগ্রাম দামুন্যায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এত প্রমাণ সত্বেও পুথিখানা মুকুন্দরামের স্বহস্তলিখিত নাও হইতে পারে। এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কবির বংশধরগণ পরবর্ত্তীকালে অপর কোন লেখক লিখিত কবির পুথিকে প্রামাণিক করিবার চেষ্টায় উল্লিখিত দলিলটি রাখিয়াছিলেন কিনা কে জানে। হাতের লেখারও নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই। ইহা অনুমান মাত্র।

মুকুন্দরামের একটি পুথির আত্মবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে কবির সময় রাজা মানসিংহ (সম্ভবতঃ বিদ্রোহ দমনে আগত অস্থায়ী) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ,[১] বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহীদার মামুদ সরীপ॥"—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য।

ইহার পাঠান্তর শেষের দুই ছত্র এইরূপ—

"অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।"

---

(১) রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার (পাকা ?) প্রথম নিযুক্ত হন ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে (আকবরের সময়)। তিনি ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৫ খৃঃ অব্দ (আকবরের মৃত্যু, ১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫ খৃঃ) এর পরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাঙ্গালা ত্যাগ করেন এবং জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পর (২৪শে অক্টোবর, ১৬০৫ খৃঃ অব্দ) তিনি পুনরায় দিল্লী হইতে বাঙ্গালায় প্রেরিত হন এবং কয়েক মাস কার্য্য করিয়া ১৬০৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার সুবেদারী শেষবার ত্যাগ করেন। (ইকবাল নামা ও Stewart's History of Bengali)।

রাজা মানসিংহ[১] পাঠানদিগকে শেষবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ও বারভূঁইঞার বিদ্রোহ দমন করেন। তখন আকবর বাদসাহের কাল। এই হিন্দু রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় অবস্থানকালে কবিকে স্থানীয় ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে স্বগ্রাম দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি তাঁহার রচিত আত্ম-বিবরণীতে ডিহিদার মামুদের নিন্দা করিলেও মানসিংহের প্রশংসাই করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে "বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ" বা পরম বৈষ্ণব আখ্যা দিতেন না। যে কিছু অত্যাচার তাহা অদৃষ্টবাদী কবি রাজার পাপের ফলে না বলিয়া "প্রজার পাপের ফলে" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে কবির এই বিরুদ্ধধর্ম্মী উক্তিসমূহ হইতে অনুমান হয় যে তৎকালে পাঠানরাজত্বের অবসানে মোগল-রাজত্ব নূতন স্থাপিত হওয়াতে কেন্দ্রে শাসনকর্ত্তাটি ভাল থাকিলেও সমস্ত দেশে শান্তি আনয়ন করিতে বিলম্ব হইতেছিল। ফলে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়ন এবং নানাস্থানে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণের অন্যায় অত্যাচার প্রাদেশিক ও সামরিক শাসনকর্ত্তা দমন করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তৎকালীন শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ যে শাসক হিসাবে লোক ভাল ছিলেন তাহা কবি মিথ্যা বলেন নাই। ইতিহাসও তাহার সাক্ষ্য দেয়। তখনকার দিনে যাতায়াতের রাস্তা ভাল ছিল না এবং সেকালের যানবাহনে দেশের একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে, দূরবর্ত্তী হইলে, দীর্ঘদিন সময় লাগিত। বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গ ও উড়িষ্যায় তখনও পাঠানগণ মধ্যে মধ্যে গোলযোগ বাধাইতেছিল এবং স্থানগুলি ঘন ঘন হাত বদলাইতেছিল। এই অরাজকতা ও দুর্গমতার দিনে ভাল রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত যে সব মন্দ ও অত্যাচারপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী মিশ্রিত ছিলেন মামুদ সরিফ তাহাদের একজন। তবে কবি মামুদ সরিফকে নিন্দা করিতে গিয়া "প্রজার পাপের ফলে" উক্তি করিয়া একদিকে যেমন দেশবাসীর অদৃষ্টকে বা বিরোধিতাকে এই জন্য দায়ী করিয়াছেন অপরদিকে তেমন রাজভক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। "অধর্ম্মী রাজার কালে" বলিয়া যে পাঠান্তর আছে তাহা মুকুন্দরামরচিত হইলে মানসিংহ ভিন্ন অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তার কাল অর্থ করা সঙ্গত নহে, কারণ ছত্রগুলি সব মিলাইয়া পাঠ করিলে সেরূপ মনে হয় না। কোন কোন পুথিতে "সে রাজা মানসিংহের কালে" পর্য্যন্ত পাঠ আছে। রাজা মানসিংহের নামের পরেই "অধর্ম্মী রাজার" কথাটি ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রসঙ্গে "বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ" মানসিংহ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তির ইঙ্গিত আছে এবং তিনি মানসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সুবেদার

বলিয়া মনে হয় না। এইস্থানে "অধর্ম্মী" অর্থ "ধর্ম্ম-হীন" নহে "অন্য ধর্ম্মী" বা পুথির ক্ষেত্রে মুসলমান রাজা। এই "রাজা" "রাজা মানসিংহ" তো নহেনই কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তাও নহেন। ইহার অর্থ যাহার রাজত্ব সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "মোগল বাদসাহ আকবর"। জানি না এইরূপ অর্থ ঠিক হইল কিনা। নতুবা এক ছত্রে রাজা মানসিংহের নাম এবং পরের ছত্রেই ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী "হুসেনকুলি খাঁ" অথবা "মজঃফর খাঁ" নামক শাসনকর্ত্তাদ্বয়ের কাহাকেও ইঙ্গিত করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমরা তো জানি মানসিংহের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য আজিজ খান ও তৎপূর্ব্বে রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গালার পাঠানদিগকে দমন করিতে ও বাঙ্গালা শাসন করিতে মোগল বাদসাহ আকবর কর্ত্তৃক প্রেরিত হন।

কবিকঙ্কণের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র সম্বন্ধে আত্মবিবরণীতে দুই প্রকার সংবাদ অবগত হওয়া যায়। কোন আত্মবিবরণীতে আছে জগন্নাথ মিশ্র "মীন-মাংস" ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তিনি "মন্ত্রজপি দশাক্ষর" গোপাল আরাধনা করিতেন। আর এক সংবাদ "মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পূজিল শঙ্কর"। ইহা ভিন্ন বংশ-পরিচয় এইরূপ বর্ণিত আছে।

"কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার,
শব্দকোষ কাব্যের নিদান।
কয়ড়ি কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা,
তস্য সুত উমাপতি নাম ॥
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা,
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর,
বাসুদেব, মহেশ, সাগর ॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম,
কবিচন্দ্র তার বংশধর ॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা,
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান।

শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান ॥"

—মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যে আত্মবিবরণী।

কবিকঙ্কণের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রের পরিবার সুদীর্ঘকাল যাবৎ শিবভক্ত ছিলেন। কবির আত্মবিবরণীতে যেমন জগন্নাথ মিশ্রের শিব-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তেমন আত্মবিবরণীর মধ্যে প্রথমেই স্বগ্রাম বর্ণনায় "চক্রাদিত্য" শিবের ভক্তিভরে উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয়। কবির পিতামহ সম্ভবত: শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়ে দেশব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি শেষ বয়সে "মীন-মাংস" পরিত্যাগ করিয়া "দশাক্ষর মন্ত্রজপ" ও গোপাল দেবতার সেবা করিতেন।

মুকুন্দরাম লিখিত এই সমস্ত বিবরণ হইতে একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইহা মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে। কবির পিতামহ তো কখনও শৈব এবং কখন বৈষ্ণব। আবার কবি শাক্তদেবী চণ্ডী সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিলেও তাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তির যথেষ্ট ছড়াছড়ি রহিয়াছে। এমনকি স্বগ্রামে, স্বীয় গৃহে, মুকুন্দরাম প্রতিষ্ঠিত "সিংহবাহিনী" নামক চণ্ডী বা দুর্গামূর্ত্তির হস্তে পাশাঙ্কুশ প্রভৃতি দশপ্রহরণের স্থানে বিষ্ণুর হস্তধৃত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। এমতাবস্থায় কবির নিজের ধর্ম্মমত কি ছিল? কেহ বলেন তিনি শাক্ত ছিলেন, কেহ বলেন তিনি বৈষ্ণব এবং কেহ তাঁহাকে পঞ্চোপাসক বলিয়াছেন। "পঞ্চোপাসক" কথাটি প্রয়োগ করা চলে কি না জানি না। হিন্দুমতে শিব, সূর্য্য, দুর্গা, গণেশ ও বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভক্ত প্রায় সকলেই সর্ব্ব দেবতার প্রতিই শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিভিন্ন দেবতার নামে স্তবস্তুতিসমূহ এবং মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে উল্লিখিত সর্ব্বদেব বন্দনা ইহার অন্যতম উদাহরণস্থল। এই হিসাবে সকলেই পঞ্চোপাসক। কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার প্রকৃত চিহ্ন দীক্ষা। এই হিসাবে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব ইত্যাদি। মুকুন্দরামের দীক্ষা সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানা না থাকিলেও মুকুন্দরামের কাব্যের ভিতরে তিনি তাঁহার পরিবার ও নিজের ধর্ম্মমতের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র পর্য্যন্ত কতিপয় পুরুষ এই পরিবার শৈব ছিল। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের আদর্শ ও তাঁহার ধর্ম্মমতের দেশব্যাপী প্রভাবের ফলে জগন্নাথ মিশ্র "মীন-মাংস" ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হন। সুতরাং কবির পিতা এবং

কবি স্বয়ং প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন। পরে সাংসারিক দুঃখকষ্টে পতিত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পথে কবি চণ্ডী-পূজা দ্বারা নিজের শিশুর "ওদনের তরে" ক্রন্দন নিবারণ করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গের জীবনরক্ষায় সমর্থ হন। বিশেষ দেবতার পূজা বিশেষ সময়ে করিবার রীতি আছে। সঙ্কটে দুর্গাপূজাই প্রশস্ত। ইহা ছাড়া, তিনি চণ্ডীমঙ্গল লিখিতে স্বপ্নাদিষ্টও হইয়াছিলেন। পরে আড়রা-ব্রাহ্মণভূমির রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবতঃ এই রাজবংশও শাক্ত ছিল। কবি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া চণ্ডীর সেবক হইলেও পারিবারিক বৈষ্ণবভাব ও রুচি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তখনকার বিশেষ যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাজ ও স্বদেশের সকলের সমালোচনার পাত্র হইতে হয়ত কবি অনিচ্ছুক ছিলেন। এইসব কারণপরম্পরা কবি শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, অন্ততঃ শাক্ত-গ্রন্থ লিখিলেও, বৈষ্ণব মনোবৃত্তি ও রুচি পরিত্যাগ করেন নাই। ইহার ফলে কবিপ্রতিষ্ঠিত শাক্ত দেবী বৈষ্ণব প্রহরণ হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারসমূহের সমর্থনে বহু কিম্বদন্তি, বৈষ্ণব ব্যাখ্যা, স্বপ্নাদেশ ও অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য ঘটিয়াছে এবং তাহা তৎকালীন অবস্থাদৃষ্টে স্বাভাবিক। শাক্ত ও বৈষ্ণবমতের সমন্বয় সাধন না করিলে কবির সমাজে বাস করাও কঠিন হইত। সর্ব্বশেষে বলা যাইতে পারে, চৈতন্যোদ্ভূত সাহিত্যে ও অন্যান্য শাক্ত গ্রন্থগুলিতে যথেষ্ট বৈষ্ণব প্রভাব পতিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী লেখক ও গায়কগণ এই দিকে অল্প সাহায্য করেন নাই। সুতরাং মূল পুথি কালক্রমে নূতন ভাবধারায় সিক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুথি রচনার কাল সম্বন্ধে এই দুই ছত্র পাওয়া যায় :—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
সেইকালে দিলা গীত হরের বণিতা॥"[১]

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

---

(১) কেহ কেহ রস "অর্থে" নয় না ধরিয়া ছয় ধরেন। তাহা হইলে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হয় এবং তাহা বাকুড়া রায়ের সময়ের আগে হইয়া পড়ে।

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত একটি পুথিতে আছে "চাপা ইন্দু বাণ সিন্ধু শকনিয়োজিত।" সিন্ধুকে ইন্দু ধরিয়া কেহ কেহ কবির পুথি রচনার কাল ১৫১৫ শক অর্থাৎ ১৫৯৩ খৃঃ অনুমান করেন।

আবার আর একটি পুথিতে আছে "অম্বর সাগর মুনিবরে"।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের মতে রাজা রঘুনাথ রায়ের সময় ১৫৭৩-১৬০৩ খৃঃ (রাজ্য শাসনকাল ?)।

এই ছত্র দুইটীতে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। আড়রা যাইবার পথে এই ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে "দেবী দেখা দিলেন স্বপনে" এবং তিনি কবিকে চণ্ডীকাব্য লিখিতে স্বপ্নাদেশ করেন। এই বৎসর টোডরমল্ল বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলে স্বল্পদিনের জন্য আজিজ সুবেদার নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ তাঁহার পরই মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া একবার আসেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ গ্রন্থরচনার শেষে লিখিবার রীতি ছিল। সে হিসাবে গ্রন্থরচনার শেষে এই বিবরণ কবির লিখিবার কথা। এই অংশে রাজা মানসিংহের উল্লেখ সময় নির্ণয়ের দিক দিয়া বিশেষ অর্থপূর্ণ। রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় সুবেদারির আমলে* গ্রন্থ শেষ হইলে অবশ্য ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের সহিত কতিপয় বৎসর যোগ করিতে হয়। কারণ এই উপলক্ষে মানসিংহ অন্ততঃ দুইবার বাঙ্গালায় আসেন। ইহার মধ্যে সম্ভবতঃ ১৫৮৯-১৫৯০ খৃষ্টাব্দ মধ্য বাঙ্গালার সুবেদার থাকিবার কালে তিনি পাঠান নেতা কতলুখানকে দমন করেন। পাঠান বিদ্রোহ দমন করিতে তিনি ১৫৯৯ খৃঃ অঃ আর একবার সচেষ্ট হন। আবার কবির স্বপ্নাদেশের বৎসর, অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালায় "বারভুঞা" রাজগণের বিদ্রোহ সূচনা ও মানসিংহের আগমন হয়। সুতরাং এই প্রদেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের যে পরিচয় কবি দিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত নহে। কবির এই পুথি শেষ করিতে সুদীর্ঘ ১১।১২ বৎসর লাগিয়া থাকিবে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন। ইহা সত্য হইলে তো মানসিংহের আমলেই উহা শেষ হয়। আমাদের তো ইহাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। ১১।১২ বৎসরের ন্যায় সুদীর্ঘ সময় লাগিবে কেন বুঝা না গেলেও অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয় ১৫৮৯-৯০ খৃঃ অঃ মধ্যে তিনি এই পুথি শেষ করেন। তখন তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। সুতরাং তখন তিনি প্রৌঢ়, হয়ত তাঁহার তখন বয়স ৫০ বৎসরের উপর। তিনি ১৫৩২ কি ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ধরিয়া লইলে খুব ভুল হয় না। মুকুন্দরামের সম্ভবতঃ দুই স্ত্রী ছিল, কারণ ধনপতির গল্পে লহনা ও খুল্লনার বিবাদের বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন:—

"একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥"

এই ছত্র দুইটি দ্বারা তিনি নিজ গৃহের ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন। কবি সঙ্গীত-

* রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার বাহিরে নানা রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রায়শঃ প্রতিনিধি দ্বারা বাঙ্গালা শাসন চালাইতেন। উহাতে অনেক সময় কুশাসনও চলিত।

শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার শিক্ষক মাণিক দত্ত নামক এক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার পুথি হইতে জানিতে পারি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মধ্যে কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় রহিয়াছে। এমন একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের তিনি নামকরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক ভণিতা-সমূহের ভিতরে "অম্বিকামঙ্গল ভণে" কি "অভয়ামঙ্গল ভণে" কথা দুইটি এত অধিকবার রহিয়াছে তাহাতে মনে করিলে ক্ষতি নাই যে কবির এই দুইটি নামের একটিকে পুথিটির নাম রূপে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ছিল।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য তাঁহার সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডী-কাব্যের কতকটা উন্নত ও বিস্তৃততর সংস্করণ বলা যাইতে পারে। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী অবশ্য মুকুন্দরামের চণ্ডীর কিছু পূর্ব্বের লেখা। আমরা উভয় কবির তুলনামূলক সমালোচনা মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য আলোচনা উপলক্ষে করিয়াছি। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর ন্যায় মুকুন্দরামের চণ্ডীর প্রভাব দেড়শতাধিক বৎসরের পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গল" কাব্যে দৃষ্ট হয়।

মুকুন্দরামের রচনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতিপয় বিষয় প্রধান; যথা—(১) বাস্তবতা, (২) চরিত্র-চিত্রণ, (৩) হাস্যরস, (৪) সংস্কৃত ভাষা ও অলঙ্কারের প্রভাব, (৫) কবির সময়ের একটি নিখুঁত চিত্র প্রদান, (৬) দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৭) আন্তরিকতা এবং (৮) মহাকাব্যের আদর্শে কাব্য লিখিবার প্রচেষ্টা।

বাস্তবধর্ম্মী কবি মুকুন্দরাম তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের সর্ব্বস্তর সম্বন্ধেই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম, ভাল ও মন্দ কোনদিকই কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। কবি তাঁহার কাব্যে পশু-পক্ষী ও তরু লতা পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। মানব-চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবতা। কালকেতু ব্যাধের বর্ণনা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কালকেতুর বাল্যচিত্রে ঠিক ব্যাধ বালকের চিত্রই দিয়াছেন, শাপভ্রষ্ট দেবতা বা উচ্চতর সমাজের বালককে অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার "নাক, মুখ, চক্ষু, কান, কুন্দে যেন নিরমাণ, দুই বাহু লোহার শাবল" এবং বিহঙ্গ বাটুলে বিঁধে লতায় সাজুরি পদে, স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে" প্রভৃতি উক্তি বড়ই মনোরম। কবির চিত্রিত ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা তো বটেই এমন কি দুর্ব্বলাদাসীর চরিত্র পর্য্যন্ত কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও নিপুণ তুলিকার সাহায্যে কিরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে!

কবি তাঁহার কাব্যে মধ্যে মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়াছেন। যথা,—

"উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চোধুরী নহি না রাখি তালুক॥" কাঃ কেঃ উপাখ্যান।

এই সমস্ত উক্তি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পশুগণের ক্রন্দনের ভিতরে বনদুর্গা বা মঙ্গলচণ্ডীর সহিত তাহাদের সম্পর্ক বর্ণনার ভিতর দিয়া হয়ত অলক্ষ্যে কবি তৎকালীন রাজনৈতিক গোলযোগ ও মাৎস্যন্যায়ের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। মামুদ সরিফের অত্যাচার বর্ণনা কেমন জীবন্ত হইয়াছে তাহা কবির আত্মবিবরণীর ভিতর নিম্নলিখিত ছত্রগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

(ক) "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ।
যে মানসিংহের কালে[1] প্রজার পাপের ফলে,
ডিহীদার মামুদ সরিপ॥" ইত্যাদি।
—গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

(খ) "উজির হোলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলা অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইলা যম, টাকায় আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥" ইত্যাদি।
—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ)।

চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই দিকে স্ত্রী-চরিত্র ও খল-চরিত্র অঙ্কনেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অঙ্কিত ফুল্লরা, লহনা ও দুর্ব্বলাদাসী আমাদের মানসপটে চিরকাল জীবন্ত হইয়া বিরাজ করিবে। কালকেতুর দেবীদত্ত ও বহুমূল্য অঙ্গুরিটি স্বল্পমূল্যে

(১) "অধর্ম্মী রাজার কালে"—পাঠান্তর।

ক্রয়ের লোভে মুরারী শীলের নিম্নলিখিত অল্প কথা কয়টিতে প্রতারকের চিত্রও কেমন জীবন্তভাবে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে !

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পেছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥
একুনে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
কিছু চালু ক্ষুদ লহ কিছু লহ কড়ি॥" ইত্যাদি।

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

শঠ ভাড়ুদত্তের মূর্ত্তিটী এইভাবে কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। যথা,—

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা,
আগে ভাড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটাকাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড় কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম লম্ববান॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া॥" ইত্যাদি।

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম অঙ্কিত এই খল চরিত্র দুইটি কবি-প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন এবং শাশ্বতধর্ম্মী।

কবি সংসারের ভাল ও মন্দ দুইদিক সম্বন্ধেই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং তাহাই তিনি স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন চরিত্রের সাহায্যে যথাযথ চিত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি কখনও উহা অতিরঞ্জিত করিবার প্রয়াস পান নাই।

তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক পরিমাণে ভাষা ও

ভাবকে পরিবর্ত্তিত করিতেছিল। কবির অমরকাব্যখানিতে তাহার প্রচুর নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎকৃত ফুল্লরার "বারমাসী" বর্ণনার মধ্যে—

"ভেড়েগুার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥"—প্রভৃতি উক্তির মধ্যে "ভানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ" প্রভৃতি উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। রূপবর্ণনার জন্য তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ফারসী প্রভৃতি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মুসলমান সমাজের বর্ণনার ভিতরে তাহার আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসবোধ ছিল এবং তিনি ভাঁড়ামো ও গ্রাম্যতাদোষ হইতে মুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জাতি ও সমাজের বর্ণনার মধ্যে তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন কবিই সর্ব্বদোষমুক্ত নহেন, সুতরাং মুকুন্দরামও তাহা ছিলেন না। কবির কাব্যে অনেক স্থলে বাহুল্যতা দোষের পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও কোন বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলে কবি অল্প কথায় তাহা শেষ করিতে পারিতেন না। ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিভিন্ন জাতির পরিচয় প্রভৃতি অংশে ইহা পরিস্ফুট। ইহা ছাড়া কালকেতু উপাখ্যানের বহু অংশ এমনকি তথায় ব্যবহৃত শব্দ ও ছত্রগুলি পর্য্যন্ত ধনপতির উপাখ্যানে ব্যবহার করিয়াছেন। ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাসী ইহার অন্যতম উদাহরণ। কবির বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ তাঁহার কাব্য কেন্দ্রশূন্য। ইহাতে একটি মূল-চরিত্রের বা ঘটনার চারিদিকে আবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য চরিত্র বা ঘটনা পরিস্ফুট হয় নাই। এইরূপ মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কালকেতু ও ধনপতিকে দুই ভিন্ন ঘটনার নায়ক হিসাবে ধরিলে এই অভিযোগের গুরুত্ব কমিয়া যায়।

যাহা হউক মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভার মানদণ্ডে তাঁহার করুণরসপ্রধান চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি স্বীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা ও চণ্ডী-ভক্তির চিহ্ন বহন করিয়া ইহাকে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত করিয়াছে।[১]

---

(১) Prof. E. B. Cowell মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের প্রধান ভাগ কবিতায় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, মুকুন্দরামের ন্যায় সমগ্র মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিগণের উল্লিখিত উজানি বা উজ্জয়িনী নগরী ও ইহার রাজা বিক্রমকেশরীর নাম এবং চাপাই বা চম্পক নগর সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মালব দেশের প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীকেও ইহার রাজা বিক্রমাদিত্যকে এবং অধুনালুপ্ত প্রাচীন চম্পারাজ্যকে (বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত, আমাদের স্মৃতিপথে আনয়ন করে। কবি কালিদাসের বাড়ী বাঙ্গালায় ছিল এই প্রকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। খনার সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ তো আছেই, এমন কি মিহির ও খনার

(১২) ভবানীশঙ্কর দাস[১]

কবি ভবানীশঙ্কর দাস নবদাস নামক রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের কৃষ্ণানন্দ নামক কবির এক পূর্ব্বপুরুষ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম নামক গ্রামে বসতিস্থাপন করেন। কৃষ্ণানন্দের প্রপৌত্র মধুসূদন দেবগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালা নামক অন্য গ্রামে বাস করিতে থাকেন। কবি ভবানীশঙ্কর এই মধুসূদনের প্রপৌত্র। কবির পিতার নাম নবঘনরাম ও পিতামহের নাম শ্রীমন্ত। ভবানীশঙ্করের চণ্ডীকাব্যখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ নহে। ইহা একখানি চণ্ডীমঙ্গল ও আকারে বৃহৎ। এই কাব্য-খানিতে সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী ও রচনার কাল ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ। চণ্ডীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

চণ্ডীর রূপ

(১) "কি বর্ণিব মায়ের রূপ নরাধম দীনে।
যাঁহার রূপ-আভায় ত্রিভুবন জিনে॥
প্রাতরর্কের আভা জিনি শোভে পদতল।
পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল॥
পদনখে নিন্দিয়াছে ইন্দু দ্বিতীয়ার।
নখাগ্রেতে খগাগ্রজ হৈছে একত্তর॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি দেখিতে সুন্দর।
করিকুম্ভ জিনি স্তন অতি মনোহর॥" ইত্যাদি।

—ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডীকাব্য।

(২) "পঞ্চ পঞ্চ পঙ্কজাঙ্ঘ্রি আনন্দে
কনক মকর খাড়ু সহিতে বাজিছে ঘুঙ্ঘুরু
নূপুর বাজ্যাছে পদারবিন্দে॥" ইত্যাদি।

—ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডীকাব্য।

দক্ষিণ বঙ্গে বারাসত-দেউলিতে বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও জনসাধারণ আস্থাবান। গড়বেতা (মেদিনীপুর) রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সাধনা ও তাল-বেতাল অনুচরদ্বয় প্রাপ্তি ও নানা কীর্ত্তির সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে। প্রাচীন বাঙ্গালার এই স্থানগুলির অনুসন্ধান আবশ্যক।

(১) "গজেন্দ্র-মোক্ষণ" (কমলে-কামিনী) প্রণেতা ভবানীদাস এবং উল্লিখিত ভবানীশঙ্কর দাস সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

সুশীলার বারমাসী

(৩) "মধুমাসে মনসিজ-সখা উপস্থিত।
পিক সর্ব্বে নাদ করে অতি পুলকিত॥
বৈশাখেতে নানা পুষ্প ফুটে ডালে ডালে।
গ্রথিয়া মোহন মালা দিব তোমার গলে॥" ইত্যাদি।

—ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডীকাব্য।

(১৩) জয়নারায়ণ সেন

জয়নারায়ণ সেন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও রাজনগরের নিকটবর্ত্তী জপসাগ্রাম নিবাসী ও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। এই কবি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণের পিতার নাম লালা রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের চারি পুত্রের মধ্যে জয়নারায়ণ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র রামগতি সেন সুবিখ্যাত "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রণেতা। কবি জয়নারায়ণের পিতামহের নাম কৃষ্ণরাম ও প্রপিতামহ—বিভারিজ সাহেব কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত সুবিখ্যাত গোপীরমণ সেন। কৃষ্ণরাম গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক "দেওয়ান" ও "ক্রোড়ি" উপাধি পাইয়াছিলেন। জয়নারায়ণের আনন্দময়ী নামে এক বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। আনন্দময়ীর সংস্কৃত শাস্ত্রে, বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে, প্রচুর জ্ঞান ছিল। তিনি ইহা রাজা রাজবল্লভের "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদর্শিত করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। জয়নারায়ণ আনন্দময়ীর সহযোগিতায় "হরিলীলা" নামে একখানি সত্য-নারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। ইহাতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগে আনন্দময়ী তাঁহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। জয়নারায়ণ এক-খানি চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। ইহার রচনাকাল ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ কি তাহার কাছাকাছি। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য (মঙ্গলকাব্য) মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের সহিত তুলনীয়। যদিও চরিত্র-চিত্রণে, করুণরসের স্ফুরণে ও গল্পাংশের বর্ণনামাধুর্য্যে বিশেষতঃ আন্তরিকতায় জয়নারায়ণের চণ্ডী-কাব্য মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না তবুও সংস্কৃত ভাষা ও কবিত্বের ঐশ্বর্য্য, অলঙ্কার শাস্ত্রের দক্ষ প্রয়োগ ও মধুর ছন্দ

জয়নারায়ণের গ্রন্থখানিকে বিশেষ সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছে। একটি উদাহরণ, যথা—

"মহেশ করিতে জয় রতি-পতি সাজিল।
দামামা ভ্রমর রব সঘনে বাজিল।
নব কিশলয়েতে পতাকা দশদিশেতে
উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥
ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতিবেগেতে।
ফুলধনু পিঠে ফুলশর কর পরেতে॥
ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আর হেরি আঁখি-কোণেতে।
কুসুম কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে।
বাম বাহু রতি গলে রতি বাহু গলেতে।
ভুবনমোহন শর হর মন মোহিতে॥" ইত্যাদি।

—জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য।

কবি জয়নারায়ণের যুগ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের যুগ এবং জয়নারায়ণের "চণ্ডীকাব্য" ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" রচনার অনেক পরে রচিত হয়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও তৎফলে বাঙ্গালা ভাষার যে সমৃদ্ধি এই যুগে দেখা গিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যে পাওয়া যাইবে। এই যুগের রুচির দোষগুণও (যাহা ভারতচন্দ্রের রচনায় বিশেষভাবে দেখা যায়) জয়নারায়ণ সেনের রচনাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের রুচিগত শিষ্য জয়নারায়ণ ও বৈরাগ্যমূলক "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" লেখক জয়নারায়ণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি সেনের মধ্যে রুচির আদর্শগত কত প্রভেদ!

(১৪) শিবচরণ সেন

এই কবি জয়নারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি একখানি চণ্ডীকাব্য (মঙ্গলকাব্য) রচনা করেন। ইহার রচনা মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বপূর্ণ। এই কবি "সারদামঙ্গল" নামে রামায়ণের একখানি অনুবাদ গ্রন্থও রচনা করেন।[১]

———

(১) উল্লিখিত চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ভিন্ন কবি কৃষ্ণকিশোর রায় (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী), কবি দ্বিজ কালিদাস (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী, "কালীকামঙ্গল" প্রণেতা) প্রভৃতি কবিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গলের বহু অখ্যাতনামা কবির নাম এখনও পল্লীঅঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। "গজেন্দ্র-মোক্ষণ" (কমলে-কামিনী) প্রণেতা দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ এবং রামমল্লিকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুকুন্দরাম-পরবর্ত্তী পৌরাণিক চণ্ডীকাব্যের কবিগণ

মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী চণ্ডীকাব্যের কবিগণের মধ্যে অনেকেই পৌরাণিক মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ (প্রায়শঃই ভাবানুবাদ) করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধেও এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

(১) দ্বিজ কমললোচন

দ্বিজ কমললোচন রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মিঠাপুর থানার অধীনস্থ চাকড়াবাড়ী (চরখাবাড়ী ?) নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৭৩৩ সনের (১৮১১ খৃষ্টাব্দ) একখানি হস্তলিখিত পুথি হইতে দ্বিজ কমললোচন রচিত "চণ্ডিকা-বিজয়"নামক গ্রন্থখানি রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিজ কমললোচনের "চণ্ডিকা-বিজয়" কাব্যখানির রচনাকাল ১৬০২-১৬৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে বর্ণনাবাহুল্য দৃষ্ট হয়। কবিত্ব শক্তিতে দ্বিজ কমললোচন হীন ছিলেন না। যথা,—

"সুবর্ণ আওয়াস ঘরে করে ঝলমল।
চতুর্দ্দিকে লাগাইল হাড়ীয়া চামর॥
তাহাতে লম্বিত গজ মুকুতার ঝরা।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা॥
মধ্যে মধ্যে লাগে হীরা মুকুতা খিচনি।
যুদ্ধঘর আভা যেন দেখি দিনমণি॥" ইত্যাদি।

—দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডীকাব্য।

এই পুথিখানি বা ইহার ছাপা কপি আমরা দেখি নাই। উল্লিখিত বর্ণনা ধূম্রলোচনের রথের। বোধ হয় কবি প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ তাঁহার কাব্যে করিয়াছেন। উভয় চণ্ডীর ঐক্য বুঝাইতে যাইয়া কোন কোন কবি পৌরাণিক চণ্ডীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ কি না তাহাও আমাদের জানা নাই। সেইরূপ অবস্থা হইলে অবশ্য এই গ্রন্থখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে পড়ে না। তবুও চণ্ডীর

উপলক্ষে রচিত কাব্য হিসাবে এই শ্রেণীর চণ্ডীর অনুবাদসমূহকে চণ্ডীমঙ্গলগুলির সহিত একত্রে উল্লেখ করা যাইতেছে।

দ্বিজ কমললোচন একখানি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন।

(১) ভবানীপ্রসাদ কর[১]

বৈদ্য কবি ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ছিলেন। ইঁহার নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন কাঁঠালিয়া নামক গ্রামে ছিল এবং কৌলিক উপাধি রায় ছিল। এই কবির রচিত "দুর্গামঙ্গল" (চণ্ডীকাব্য) অনুবাদের সময় ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ। দ্বিজ কমললোচনের ন্যায় ইনিও মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ করেন। কবির রচনায় বেশ বর্ণনাত্মক কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,

সমাধি বৈশ্য ও সুরথ রাজা

"সর্ব্বস্ব হারায়ে সদা অস্থির রাজন।
সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হইল দরশন॥
বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করে সুরথ রাজন।
আদি হৈতে কহে বৈশ্য আত্ম-বিবরণ॥
তাহা শুনি অসম্ভব হইল নৃপবর।
আপনার দুঃখ কহে বৈশ্যের গোচর॥
যেমত দুঃখের দুঃখী সুরথ রাজন।
সেহি মত দুঃখ কহে বৈশ্যের নন্দন॥
যার যার দুঃখ যত কহে দুইজনে।
দোঁহের মিলন হৈল সেহি ঘোর বনে॥
রাজা বলে শুন বৈশ্য বচন আমার।
বন্ধুবর্গ লাগি প্রাণ পোড়ে সদা মোর॥
বৈশ্য বলে মহারাজ করি নিবেদন।
আমার কান্দিছে প্রাণ স্ত্রী-পুত্র কারণ॥
ভাই বন্ধু সবে মোরে দিছে খেদাইয়া।
তবু তার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া॥

(১) এই কবি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (দীনেশচন্দ্র সেন) ও History of Bengali Lang. & Lit. (D. C. Sen) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কি করিব কোথা যাব স্থির নাহি পাই।
দুইজনে উঠি গেলা মেধসের ঠাঁই॥" ইত্যাদি।

— ভবানীপ্রসাদের চণ্ডীকাব্য।

কবি আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"নিবাস কাটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজাত
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ॥
জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥" ইত্যাদি।

— ভবানীপ্রসাদ করের দুর্গামঙ্গল।

অন্যস্থানে এইরূপ আছে—

"ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কূল॥
কাঁটালিয়া গ্রামে কর বংশেতে উৎপত্তি।
নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি॥
জন্মঅন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে॥"

—ভবানীপ্রসাদ করের দুর্গামঙ্গল।

কবি কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ বেশ সরল হইয়াছে। যথা,—

"যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥" ইত্যাদি।

ভবানীপ্রসাদ করের দুর্গামঙ্গল।

(৩) রূপনারায়ণ ঘোষ[১]

এই কবি অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। রূপনারায়ণের চণ্ডীকাব্যও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্যতম অনুবাদ। এই কবির পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষ। সম্ভবতঃ রূপনারায়ণ ঘোষ ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

(১) এই কবি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৭৭ (১৩০৪ সাল) ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন) দ্রষ্টব্য।

এই কবির পূর্ব্বপুরুষের আদি নিবাস যশোহর এবং পরবর্ত্তী বাস বোধ হয় (রাজা মানসিংহের সময়ে) মাণিকগঞ্জ মহকুমার (ঢাকা) অন্তর্গত আমডালা গ্রামে। কবি রূপনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত ছত্রগুলি তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞানের ও কালিদাসের রঘুবংশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে।
দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে॥
প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ।
হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন॥
পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে।
বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে॥"

—রূপনারায়ণের চণ্ডীকাব্য।

(৪) ব্রজলাল

কবি ব্রজলাল সংস্কৃত চণ্ডীর অন্যতম অনুবাদক। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ইংরেজী পুস্তকে (History of Bengali Language & Literature) এই কবির উল্লেখ দেখা যায়। এই কবি সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

(৫) যদুনাথ

কবি যদুনাথের কবিত্বশক্তির ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এই কবির চণ্ডীর অনুবাদ অন্যান্য অধিকাংশ কবি হইতেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ডাঃ সেনের অভিমত। কবি যদুনাথের পরিচয় এইরূপ। রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত চরখাবাড়ী গ্রামে কবির জন্মস্থান। কবিকৃত সংস্কৃত চণ্ডীর অনুবাদ রচনার সময় খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" প্রথম খণ্ডে আমাদের জানাইয়াছেন "ইহার (দ্বিজ কমললোচনের) পূর্ব্ব-পুরুষের নাম যদুনাথ ছিল।" অথচ তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেই আমরা জানিতে পারি দ্বিজ কমললোচনের কাব্য রচনার সময় ১৬০৯-১৬৩০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উল্লিখিত বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম ভাগ, ৩০৫ পৃষ্ঠায় কমললোচনের পূর্ব্বপুরুষ যদুনাথের গ্রামের নাম, থানা ও জেলার সহিত তাঁহার কৃত History

of Bengali Language & Literature গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কবি যদুনাথের গ্রামের নাম, থানা ও জেলার ঐক্য দৃষ্ট হয়। শুধু বঙ্গসাহিত্য পরিচয় গ্রন্থের "চাকড়াবাড়ী" ও History of Bengali Language & Literature এ উল্লিখিত "চড়খাবাড়ী" কথা দুইটির মধ্যে যা প্রভেদ। সম্ভবতঃ "চাকড়াবড়ী" কথাটি ভুল এবং "চরখাবাড়ী" কথাটি ঠিক। এমতাবস্থায় কমললোচনের পূর্ব্বপুরুষ যদুনাথ হইলে কমললোচনের অনেক পরে তিনি সংস্কৃত চণ্ডীর অনুবাদ করিলেন কিরূপে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় দুই যদুনাথই এক ব্যক্তি এবং তিনি কবি কমললোচনের পূর্ব্বপুরুষ নহেন, অধস্তন পুরুষ এবং কমললোচনের অনেক পরের কবি।

কবি যদুনাথ রচিত হরগৌরীর অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বর্ণনা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"আজি কি দেখনু সম্মিলিত হরগৌরী।
সফল ভেল রে নয়নযুগল মেরি॥
চাচর বেণী বিরাজিত কাহু।
কাহু পরলম্বিত বিনোদ জটাউ॥
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা।
গিরিগণ্ড দোলে লোহিতাক্ষমালা॥
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু।
চিতাধলিভূষণ ত্রিজগত গুরু॥
লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি সোহা।
বাঘাম্বর কাহু দলজদল মোহা॥
হরগৌরী নিরখে গোবিন্দর লোকাই।
যদুনাথ উভয় চরণে বলি জাই॥"

— যদুনাথের চণ্ডীকাব্য।

(৬) কৃষ্ণকিশোর রায়[১]

কবি কৃষ্ণকিশোর রায়ের জন্মভূমি কোথায় ছিল জানা যায় নাই। তবে কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহা জানিতে পারা গিয়াছে। ইনি উত্তরবঙ্গের কবি হওয়া অসম্ভব নহে। কবির পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত ও মাতার নাম জগদীশ্বরী। কবির পত্নীর নাম রত্নমণি। কবি কৃষ্ণকিশোরের

(১) বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় প্রথম খণ্ডে কবির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

আরও কয়েকটি ভাই ছিল, তাহাদের মধ্যে কবি সর্ব্বকনিষ্ঠ। কবির পিতামহের নাম কৃষ্ণমঙ্গল রায় ও পিতামহীর নাম সর্ব্বেশ্বরী এবং ইহাদের গাঞীর নাম "কাল্যাই"। কবি যে কোন রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতেন এবং নানা কাব্য সঙ্কলন করিয়া তাঁহার পুথি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার পুথি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। কবি কৃষ্ণকিশোরের সময় সম্ভবতঃ খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ। কবি কৃষ্ণকিশোর রায়ের চণ্ডীকাব্যখানিও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। কবির কাব্যখানির নমুনা এইরূপ :—

"ভব ভাসিল হৈল হেমন্ত-সুতা।
অতি রূপবতী সুলক্ষণযুতা॥
লোকমুখে সুখে এহি কথা শুনি।
দরশনে চলিলা নারদমুনি॥
তেজ মধ্যাহ্নকালে যেন ভানু।
অতি উজ্জ্বল প্রজ্বলিত কৃশানু॥
শিরে শোভিত লম্বিত জটাভার।
পাকশ্মশ্রু বদনে শ্বেত চামর॥
তপকষ্ট সুক্ষীণীত কৃশ তনু।
মহাভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মজনু॥" ইত্যাদি।

—কৃষ্ণকিশোর রায়ের চণ্ডীকাব্য।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রধান মঙ্গলকাব্যের শেষ অধ্যায়

(ক) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন
(খ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের শেষ অধ্যায়ের দুই প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র। এই অধ্যায় শ্রেষ্ঠতর কবি ভারতচন্দ্রের নামাঙ্কিত হইয়া যুগহিসাবে "ভারতচন্দ্রের যুগ" বলিয়া পরিচিত যাহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের "জাতি" বা শ্রেণী (Type) বিচার না করিয়া "যুগ" বিচার করেন তাহাদের মতে ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক কবি। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অবৈষ্ণব অংশে প্রথম যুগপ্রবর্ত্তক কে তাহা বলা কঠিন। তবে যে কবি প্রথমে চণ্ডীর ব্রতকথাকে কাব্যের রূপদান করিবার চেষ্টা করেন সেই কবি মাণিক দত্তকে হয়ত এই সম্মান কতকটা দেওয়া যাইতে পারে। মনসা-মঙ্গলের প্রথম অনুমিত কবি কাণা হরিদত্তও এই গৌরবের স্থান পাইতে পারিতেন কিনা জানি না, কারণ কাণা হরিদত্তের পুথি বিজয় গুপ্তের মতে "লুপ্ত হৈল কালে" সুতরাং আমাদের বিবেচনার বাহিরে। চণ্ডী-মঙ্গলের অপর কবি দ্বিজ জনার্দ্দন মাণিক দত্তের সমসাময়িক হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পুথি তখনও ব্রতকথার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রকৃত কাব্যে পরিণত হয় নাই।

মধ্যযুগের অবৈষ্ণব বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে যুগপ্রবর্ত্তক কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। চণ্ডী-মঙ্গলের এই কবির অপূর্ব্ব প্রতিভা সংস্কৃতের ভাবধারা, অলঙ্কার ও শব্দসম্পদ সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

উল্লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যের তৃতীয় যুগের বা শেষ যুগের প্রবর্ত্তক ভারত-চন্দ্র রায়গুণাকর। যে সাহিত্যিক বীজ হইতে মাণিক দত্তের সময় প্রথমে অঙ্কুর উদ্গম হয়, তাহাই মুকুন্দরামের সময় নবপত্রপল্লবে পরিশোভিত হইয়া বৃক্ষের আকার ধারণ করে, এবং পরিশেষে ভারতচন্দ্রের সময়ে উহা মনোমুগ্ধকর ফলে ও ফুলে সুশোভিত হয়।

ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেশজ ভাব ও ভাষার স্থলে সংস্কৃত ভাব ও ভাষা এমনকি আদর্শ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ

করিয়াছিল। ইহাতে ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি এবং বাঙ্গালীর জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন হইল বটে কিন্তু ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইল কি না কে জানে। এই সময়ে একদিকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইল কিন্তু অপর দিকে সাহিত্য আন্তরিকতা ও ভাবের গভীরতা হারাইল। সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষার স্থানে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের গুরুভার প্রথমদিকে সাহিত্যকে কতকটা নিপীড়িতই করিল বলিলে হানি নাই। ইহার সহিত ভাবের অগভীরতা ও জাতীয় চরিত্রের অবনতি একযোগে সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া ক্রমশঃ উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবহির্ভূত সাহিত্যের আগমনের পথ প্রশস্ত করিল। ইহার ফল একদিকে শুভই হইল, কারণ ১৯শ শতাব্দীর ধর্ম্মের সীমাবদ্ধ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া সাহিত্য বহুমুখী বিষয় অবলম্বনে পদ্য, গদ্য ও নাটকের ত্রিধারায় প্রসারিত হইবার সুযোগলাভ করিল। খৃঃ ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ধর্ম্মানুগ সাহিত্যের এইরূপে ১৯শ শতাব্দীতে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্ত্তিত হইল এবং নানাকারণ-পরম্পরা আধুনিক সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল।

সময় হিসাবে মধ্যযুগের অবৈষ্ণব সাহিত্যের তিনটি স্তরের মধ্যে খৃঃ ১৩শ শতাব্দীতে মাণিকদত্তের যুগ, ১৬শ শতাব্দীতে মুকুন্দরামের যুগ এবং ১৮শ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিবর্ত্তন কোন একজন কবি আকস্মিকভাবে আনয়ন করেন নাই। এইজন্য পটভূমিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। যুগপ্রবর্ত্তক কবি শুধু তাঁহার রচিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন অপরিস্ফুট সাহিত্যিক যুগলক্ষণগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। তাই দেখিতে পাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে পতিত হইতে যে সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল তাহা একদিনের কথা নহে অথবা ভারতচন্দ্রের সময় উহা আকস্মিকভাবে আগত হয় নাই। এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি "পদুমাবৎ" বা "পদ্মাবতী কাব্য" লেখক কবি আলোয়াল (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভূমি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। আলোয়ালেরও অন্তুতঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরামের কাব্যে এই সংস্কৃত প্রভাবের প্রথম সূচনা হইয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর কতিপয় চণ্ডীর অনুবাদক কবিগণের মধ্যেও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শব্দচয়নের অতিরিক্ত উৎসাহ দেখা যায়।

মধ্যযুগের সাহিত্যের উল্লিখিত যুগ বিভাগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অবৈষ্ণব

(প্রধানতঃ শাক্ত) সাহিত্যের দান ভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রচুর দান রহিয়াছে।[১] বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহায্যেও মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্ভবপর। শাক্ত ও অবৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিপত্তি বৈষ্ণব সাহিত্যে তেমন "ব্রজবুলি নামক" একপ্রকার মিশ্রভাষার প্রভাব। বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও চরিতাখ্যানসমূহ গতানুগতিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বৈষ্ণব গীতিকবিতা দ্বারা সাহিত্যকে চিহ্নিত করিতে গেলে চৈতন্য-পূর্ব্বযুগে, খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে, চণ্ডীদাস নামক জনৈক কবির অভ্যুদয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলির রচকগণের মধ্যে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর বৃন্দাবন দাস (চৈতন্য ভাগবত) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ (চৈতন্য-চরিতামৃত) নূতন যুগের প্রবর্ত্তক সন্দেহ নাই।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলগত আদর্শবিচার ও সাহিত্যিকদানের সমালোচনা বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনাকালে করা যাইবে। তবে, এইস্থানে মোটামুটি বলিতে গেলে খৃঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে শাক্ত মাণিক দত্ত ও বৈষ্ণব চণ্ডীদাস, খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে শাক্ত মুকুন্দরাম ও বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে শাক্ত রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক কবি বলা যাইতে পারে। সুলতান হুসেনসাহ, শ্রীচৈতন্য-দেব ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উৎসাহদাতা অথবা আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করিলেও সাহিত্যস্রষ্টার আসন ইঁহাদিগকে দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সাহিত্যিক যুগসমূহ ইঁহাদের নামে চিহ্নিত করাও সঙ্গত নহে।

(ক) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ও হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।[২] কবির পিতা রামরাম সেন দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষে রামরাম সেনের নিধিরাম নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষে চারিটি সন্তান হয়। ইঁহাদের মধ্যে অম্বিকা ও ভবানী নামে দুই কন্যা এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কবি রামপ্রসাদের পিতামহের নাম রামেশ্বর এবং আদিপুরুষ কৃত্তিবাস। কবির

---

(১) এইরূপ অনুবাদ সাহিত্যে সঞ্জয় (১৩শ শতাব্দী), মালাধর বসু (১৫শ শতাব্দী) ও কৃত্তিবাস (১৫শ শতাব্দী) যুগপ্রবর্ত্তক কবিত্রয়।

(২) (ক) এই কুমারহট্ট মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীরও জন্মস্থান। (খ) "কবিরঞ্জনে" কবির পিতার নাম দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়া ভগিনী ভবানীর জগন্নাথ ও কৃপারাম নামে দুই পুত্র ছিল। ভবানীর স্বামীর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। রামদুলালের বংশে এখন আর কেহ নাই। তবে রামমোহনের বংশ এখনও রহিয়াছে এবং অনেক কৃতি পুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কবির উল্লেখ হইতেই আমরা তাঁহার বংশপরিচয় জানিতে পারি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধিভূষিত করিয়াছিলেন এবং একশত বিঘা জমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। কবি সাধক ছিলেন। তিনি কুমারহট্টে যোগসাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি দেবী তারার অনুগ্রহ কবি অপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া কবি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। যথা,—"ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে"।

কালীভক্ত রামপ্রসাদ কোন ধনী ব্যক্তির অধীনে তাঁহার জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরির কর্ম্ম করিতেন। ভক্ত রামপ্রসাদ হিসাবের খাতার ভিতরে ইতস্ততঃ গান রচনা করিয়া রাখিতেন। এই গানগুলির একটি—"আমায় দে মা তসিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।" এই গানগুলি দৈবক্রমে কবির প্রভুর দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি রামপ্রসাদের প্রকৃত স্থান তাঁহার সেরেস্তা নহে বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং গুণগ্রাহিতাবশতঃ কবিকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিয়া অবসর দেন। কবির শ্যামাসঙ্গীত রচনার আর একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিসা মহাশয় শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। এই ব্যক্তির উৎসাহের ফলে রামপ্রসাদ "কালী-কীর্ত্তন" রচনা করেন। ১৭৭৫খৃঃ অব্দে রামপ্রসাদ পরলোক গমন করেন।

শ্যামা বা কালীভক্ত রামপ্রসাদ যেমন ভক্ত সাধক হিসাবে তেমন শাক্ত কবি হিসাবে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শাক্ত সাহিত্যে কবির দান অতুলনীয় সন্দেহ নাই এবং ইহার কোন কোন দিকে তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন। ভক্ত কবি রামপ্রসাদের রচনাবলী নিম্নলিখিত কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—

(১) কালিকা-মঙ্গল

(২) বিদ্যাসুন্দর (বা কবিরঞ্জন)

(৩) কালীকীর্ত্তন

(৪) কৃষ্ণকীর্ত্তন (৫) গান

কবির রচিত 'কালিকা-মঙ্গল' পাওয়া যায় নাই বলিয়া ডা: দীনেশচন্দ্র সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন কবিবর রচিত "বিদ্যাসুন্দর" তাঁহার "কালিকা-মঙ্গলে"র অন্তর্গত কারণ রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কৃষ্ণ-রামের[১] রচিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও তাঁহার "কালিকা-মঙ্গলের" অন্তর্গত ছিল। ডা: দীনেশচন্দ্র সেন এই মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "কালিকা-মঙ্গল" এবং "কালীকীর্ত্তন"ও এক গ্রন্থ নহে।

সাধক কবি রামপ্রসাদের রচিত "বিদ্যাসুন্দর" বা কবিরঞ্জনের কাহিনী তাঁহার কালিকা-মঙ্গলের অন্তর্গত হউক বা না হউক পুথিখানি নানাকারণে বিশেষ সমালোচনার কারণ হইয়াছে।

"বিদ্যাসুন্দর" উপাখ্যানের মূলে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন বররুচির নাম জড়িত আছে। বররুচির গল্পে উহা উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হয়। অতঃপর খৃঃ ১৬ শতাব্দীতে (?) শ্রীধর নামক জনৈক কবির (সুলতান ফিরোজ সাহের সময়) রচিত বিদ্যাসুন্দর এবং খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ময়মনসিংহ জেলার কবি কঙ্কের রচিত বিদ্যাসুন্দরই বোধ হয় বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রাচীন দুইখানি "বিদ্যাসুন্দর"। ([২]) ইহার পরে খৃঃ ১৫৯৫ অব্দে বিরচিত চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামের অধিবাসী কায়স্থ কবি গোবিন্দদাসকৃত "কালিকা-মঙ্গলে"র অন্তর্ভুক্ত "বিদ্যাসুন্দর" উল্লেখযোগ্য। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি আলোয়াল তাঁহার "ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" কাব্যদ্বয়ে বিদ্যার সুরঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বর্দ্ধমানের কথা উল্লেখ করেন নাই। অতঃপর কবি কৃষ্ণরাম দাস খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। ইহার পর রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, তৎপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য কবি প্রাণারামের বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়। প্রাণারাম লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥

---

(১) "কবি কৃষ্ণরাম" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য, ১৩০০ সন, ২য় সংখ্যা)।

(২) কবি শ্রীধর ও কবি কঙ্ক—ইঁহাদের মধ্যে প্রথম কে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না। বোধ হয় উভয়ই সমসাময়িক কবি ছিলেন। সুলতান ফিরোজ সাহের (দ্বিতীয়) রাজত্বকাল ১৫১৮-১৫৩০ খৃষ্টাব্দ। তবে ইঁহার পূর্ব্বে আর একজন ফিরোজ সাহ সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১৪৮৩ খৃ: হইতে কতিপয় বৎসর সুতরাং খৃ: ১৫শ শতাব্দী। কবি শ্রীধর এই প্রথম ফিরোজ সাহের সময়ের হইলে অবশ্য কঙ্কের পূর্ব্বের কবি।

পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

—কবি প্রাণারামের 'বিদ্যাসুন্দর'।

অবশ্য প্রাণারাম বর্ণিত কবি কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর গল্পের আদি কবি নহেন। বিদ্যাসুন্দরের গল্পাংশ বর্ণনায় এক কবির সহিত অপর কবির মিল নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে গল্পের কেন্দ্রস্থল বর্দ্ধমানের স্থানে চম্পাদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কঙ্কের মতে সুন্দরের পিতার নাম রাজা গুণসিন্ধু নহে, রাজা মালাবান এবং তাঁহার দেশও কাঞ্চীনগর নহে, পূর্ব্বদেশ। এইরূপ গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে বীরসিংহ বর্দ্ধমানের রাজা নহে, রত্নপুরের রাজা এবং সুন্দরের বাড়ী দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চী নহে গৌড়রাজ্যের কাঞ্চননগর। গোবিন্দদাসের রত্নামালিনী ও কৃষ্ণরামের বিমলা মালিনী ভারতচন্দ্রের হীরা-মালিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গল্পে বিদ্যুব্রাহ্মণী নামে একটি নূতন চরিত্র আছে এবং চোরধরার বিবরণ ভারতচন্দ্রের গল্পের সহিত মিলে না।

ময়মনসিংহের কবি কঙ্ক (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) ও চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দদাস (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ) উভয়েই ভক্ত ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদের রচিত কাব্য মোটেই অশ্লীলতাদুষ্ট নহে। বিদ্যা-সুন্দরের গল্পে যে তথাকথিত বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার আরম্ভ সম্ভবতঃ কবি কৃষ্ণরাম হইতে এবং রুচির পার্থক্য এই সময় হইতেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কায়স্থ কবি কৃষ্ণরাম ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণরামের পিতার নাম ছিল ভগবতী চরণ দাস। ইনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রথমে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের উদ্দেশ্যে "রায়-মঙ্গল" রচনা করেন। ইহার পর কবি তাঁহার "কালিকা-মঙ্গলে"র অন্তর্গত "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। কৃষ্ণরাম মহাভারতের "অশ্বমেধ পর্ব্বে"র একজন অনুবাদক। সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাম চৈতন্যভক্ত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"যথায় কীর্ত্তিত হয় চৈতন্য চরিত্র। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥" ইত্যাদি।

কবি কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" রচিত হইয়া থাকিবে।

"বিদ্যাসুন্দরের" প্রচলিত গল্পে (১) আছে বর্দ্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা খুব

---

(১) এই উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ও History of Bengali Language and Literature এবং চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর "বিদ্যাসুন্দরের গল্প ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল" প্রবন্ধ (সাঃ পঃ পঃ, ৩৬ ভাগ, ১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের "কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর" নামে প্রবন্ধও (সাঃ পঃ পঃ, ১৩৩৬, ২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

বিদুষী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা বীরসিংহ। রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা ছিল যিনি তাঁহাকে বিদ্যায় পরাজিত করিবেন তাঁহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। অপর পক্ষে সেই ব্যক্তি পরাজিত হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। এইরূপে অনেকের প্রাণনষ্ট হইলে অবশেষে ভাটমুখে বিদ্যার অপূর্ব্ব "ধনুর্ভঙ্গ" পণ শ্রবণ করিয়া কাঞ্চির গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর পড়ুয়ার ছদ্মবেশে বর্দ্ধমান আগমন করেন এবং হীরা নামে এক মালিনীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই মালিনী বিদ্যা ও সুন্দর উভয়ের দর্শনের গোপন ব্যবস্থা করে এবং ইহার ফলে সৌন্দর্য্যমুগ্ধ উভয়ের গুপ্ত প্রণয় হয়। বিদ্যা অন্তঃস্বত্বা হওয়াতে অবশেষে উহা ধরা পড়ে এবং সুন্দরকে কৌশলে বন্দী করিবার পর তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। যাহা হউক মা কালীর দয়ায় সুন্দরের শেষটা প্রাণরক্ষা হয়। সুন্দর প্রথমাবধি সন্ন্যাসীবেশে বিদ্যার সহিত তর্ক করিতে রাজার অনুমতি চাহিয়াছিল এবং রাজদরবারে যাতায়াত করিতেছিল। রাজা উহাতে মনে মনে অসম্মত থাকিয়া প্রকাশ্যে শুধু কালহরণ করিতেছিলেন। গল্পশেষে এই তর্কযুদ্ধে বিদ্যা সুন্দরের নিকট পরাজিতা হন এবং অবশেষে উভয়ের বিবাহে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিদ্যা ও সুন্দরের এই গুপ্তপ্রণয় এবং হীরা মালিনীর সেদিকে সাহায্য উপলক্ষ করিয়া কবিগণ এই গল্পে নানাপ্রকার অশ্লীলতার রং ফলাইয়াছেন বলিয়া একটি অভিযোগ আছে। এই উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। এই অশ্লীলতার তীব্রতা রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দরে" না থাকিয়া শুধুযদি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরেই" থাকিত তবে গল্পটি গোবিন্দদাসের "কালিকামঙ্গলের" ন্যায় "অন্নদামঙ্গলের" ভিতরে থাকিলেও আমাদের ইহার সমর্থনে বলিবার তত কিছু ছিল না। আমরা তখন বলিতে পারিতাম জাতীয় চরিত্রের অবনতির যুগে, মুসলমান রাজত্বের পতনের সময় কদর্য্য রাজসভার দূষিত আবহাওয়ায় উহা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় শ্যামাভক্ত ও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাবিমুখ সাধুব্যক্তি এইরূপ তথাকথিত অশ্লীল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের লেখার উপর অধিকমাত্রায়-রং ফলাইয়া উহা রচনা করিয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? আমাদের বিশ্বাস ইহা আর কিছু নয়, শুধু সংস্কৃত রসশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উদাহরণ এই বিদ্যাসুন্দরের গল্পপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সাহিত্যিক একটি রীতি বা techniqueএর প্রশ্ন—নীতি বা দুর্নীতির প্রশ্ন নহে।

দুর্নীতি মনে হইলে সম্ভবত: রামপ্রসাদ কদাচ এইরূপ লিখিতেন না। নীতি বা moralsএর প্রশ্ন, মূল দৃষ্টিভঙ্গী বা Perspectiveএর উপর অনেকখানি নির্ভর করে। একই বিষয়বস্তু বর্ত্তমান যুগে ডাক্তারি শাস্ত্রের বা Eugenicsএর দোহাই দিয়া লিখিলে দোষ হয় না, কিন্তু উহাই সাধারণ ভাবে পাঠকের জন্য লিখিলে আইনবিরুদ্ধ হয়। প্রাচীন কালের বাৎসায়নের সংস্কৃত "কামসূত্র" অথবা জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" কেহ কি দোষাবহ মনে করেন—না তাঁহাদের গ্রন্থ অপাংক্তেয় করিয়াছেন? লেখার উদ্দেশ্যের উপর শ্লীলতা ও অশ্লীলতা অনেকখানি নির্ভর করে। তাহা না হইলে কালিদাসের সংস্কৃত "কুমার-সম্ভব" অনেক অশ্লীল কথা বহন করিয়াও পণ্ডিত সমাজে এত আদরণীয় কেন? আর একটি কথা। দেবসমাজ নিয়া অনেক অশ্লীল কথা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কবি চালাইয়া গিয়াছেন। তাহা শুধু দেব-লীলা বলিয়া কাহারও আপত্তিকর হয় না বরং সেইসব লেখার ভিতরে অনেক পণ্ডিত ও হয়ত ভক্তিমান ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজিয়া থাকেন। নতুবা এক চণ্ডীদাসের পদাবলী ও হয়ত অন্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অপাঠ্য হইয়া পড়িত। সাহিত্যের এই নৈতিক গোড়ামী সমর্থন করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের বৃহৎ অংশ, বিশেষত: পদাবলী শাখা অচল হইয়া পড়ে। শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যেরও নানাস্থানে (যেমন চণ্ডীকাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে) অশ্লীল কথা রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সত্যকার অশ্লীলতা একেবারে নাই তাহাও নহে। অবশ্য সাহিত্যিক উচ্চ আদর্শহীন নগ্ন অশ্লীলতা সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহারও উদাহরণ রহিয়াছে। যেমন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। ইহা কৃষ্ণধামালী সঙ্গীত এবং ইহার অধিকাংশ ভাগ কুরুচিপূর্ণ বলা যায়। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নরলোকের না হইয়া দেবলোকের কাহিনী হইলে হয়ত কোন আপত্তিই হইত না। এইরূপই আমাদের ধারণা। বিদ্যাসুন্দরের গল্পে যে সংস্কৃত রসশাস্ত্র, অলঙ্কার এবং ছন্দসমূহের প্রভাব পড়িয়াছে এবং আলোয়ালের পরে ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে রামপ্রসাদই যে তাহার প্রধান পথ-প্রদর্শক তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। রূপগোস্বামীকৃত "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকার ভেদের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ "উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা" শচীনন্দন বিদ্যানিধি কৃত (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণিত বিষয় খুব রুচিসম্মত নহে। সুতরাং রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের অপরাধ রূপগোস্বামীর পরবর্ত্তী ব্যক্তি হিসাবে মার্জ্জনীয়।

রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইলেও

ইহা কৃষ্ণলীলার অনুকরণ মনে হয়। ইহা শাক্ত গীতিকাব্য হিসাবে আদরণীয়। কালীকীর্ত্তনের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি বাৎসল্যধারাসিক্ত হইয়া বঙ্গগৃহের জননীবৃন্দের কন্যাস্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

"গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥" ইত্যাদি।
—কালীকীর্ত্তন, রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদ রচিত কৃষ্ণকীর্ত্তন "কালিকা-মঙ্গলের" ন্যায় দুষ্প্রাপ্য। ইহার মাত্র দুই পৃষ্ঠা পাওয়া গেলেও রচনায় বেশ ভাবের গভীরতা টের পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে শাক্ত বলিয়া বৈষ্ণবদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ ছিলেন এরূপ বলা যায় না। কারণ তিনি "কৃষ্ণকীর্ত্তন"ও রচনা করিয়াছিলেন। তবু তিনি ভেকধারী সাধারণ বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার রহস্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুণ্ড গুচ্ছছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥"—ইত্যাদি।
—রামপ্রসাদ।

কেহ কেহ বলেন তিনি "শ্যাম" ও "শ্যামা" অভিন্ন দেখিতেন এবং তাঁহার কতিপয় গান হইতে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি এতদুভয়ের সমন্বয় প্রয়াসী ছিলেন। ইহা তাঁহার উদার মনের পরিচায়ক।

রামপ্রসাদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ছিলেন—তিনি আজু গোসাঞি।

শাক্ত রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব আজু গোসাঞির ছড়ার লড়াই বেশ হাস্যোদ্দীপক। যথা—

রামপ্রসাদের গান,—

"এ সংসার ধোকার টাটী।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী॥
—রামপ্রসাদ।

ইহার উত্তরে আজু গোসাঞির গান,—

"এই সংসার রসের কুটী।
খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটি॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥"
—আজু গোসাঞি।

রামপ্রসাদের সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব সঙ্গীত রচনায়। এই স্থানে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের কিছুটা মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) "কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ কাব্য রচনার জন্য নহে; তিনি গান রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুনগুন স্বরে কখনও তাঁহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধামাখা স্নেহকথা বলিতেছেন; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি—স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা মাখা,—এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাঁহার ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেশ,— শিশুর কথা,—তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য বোধগম্য; সেই সঙ্গীতের সরল অশ্রুপূর্ণ আব্দারে সাধককণ্ঠের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"
—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

(খ) রামপ্রসাদের গানে যে দুঃখবাদ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই দেশে বহু পুরাতন। বৈদান্তিক মায়াবাদ, শঙ্করাচার্য্যের মতপ্রচার প্রভৃতি দ্বারা ইহা সুদৃঢ়ভাবে বাঙ্গালী চিত্ত অধিকার করিয়াছে। সুতরাং রামপ্রসাদ জীবনের প্রতি সেই পুরাতন মতবাদ তাঁহার গানের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন,—"বহু যুগ যাবৎ ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে পৃথিবীর এই কালদিকটা হিন্দুর চোখে পড়িয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ এই দুঃখের সুরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে সংসারবিমুখতায় দীক্ষিত করিল।" —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

রামপ্রসাদের মনমাতান গানের মধ্যে একটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"মা মা বলে আর ডাকব না।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী (বা সর্ব্বনাশী),
গ্রামে গ্রামে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ছাড়া কি আর ছেলে বাঁচে না॥" —রামপ্রসাদের গান।

(খ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সম্ভবতঃ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে[১] "বর্দ্ধমান হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম যে ভুরসুট নামক পরগণার অধীন ইহা ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জমিদারীর মধ্যে ছিল। নরেন্দ্রনারায়ণের চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভারতচন্দ্র। অপর তিন ভ্রাতার নাম যথাক্রমে চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন ও দয়ারাম। কোন কারণে নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের বিরাগ-ভাজন হন। ইহার ফলে বর্দ্ধমানের অধিপতি বলপূর্ব্বক নরেন্দ্রনারায়ণের জমিদারী অধিকার করেন এবং নরেন্দ্রনারায়ণ দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। ভারতচন্দ্র বাধ্য হইয়া মাতুলালয়ের সাহায্যে তাজপুরের টোলে কিছুদিন সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করেন। ইহার পরে তাঁহার বিবাহ। তিনি পিতা ও অন্য কোন গুরুজনের অজ্ঞাতে কোন এক কেশরকুনি আচার্য্য পরিবারে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। বিবাহ ভারতচন্দ্রের সুখের হয় নাই কারণ তাঁহার গুরুজন সকলেই কবির এই বিসদৃশ কাণ্ডে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে মনোবেদনায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র মুন্সী নামে এক অবস্থাপন্ন কায়স্থের আশ্রয়লাভ করেন। এই স্থানে অবস্থিতির সময়ে তিনি ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। কবি তাঁহার প্রথম রচনা "সত্যপীরের কথা" মুন্সী মহাশয়ের

(১) বটতলার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত পুঁথি।

বাড়ীতে থাকিয়াই প্রকাশিত করেন। তিনি দুইখানি উৎকৃষ্ট "সত্যপীরের কথা" রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথম রচনার সময় বয়স মাত্র পনর বৎসর (১৭৩৭ সন) ছিল। ইহার একটিতে সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে "সনে রুদ্র চৌগুণা" (১১৪৪ বাং সাল ?)। ইহার পরে কবি কিছুদিনের জন্য নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পিতা তখন বর্দ্ধমান রাজের অনুগ্রহ পুনরায় প্রাপ্ত হওয়াতে কবি তাঁহার পিতার মোক্তার বা প্রতিনিধি স্বরূপ বর্দ্ধমানে বাস করিতে থাকেন। সেখানে থাকাকালীন তাঁহার পিতা সময় মত রাজকর প্রেরণ না করিতে পারাতে কবি বর্দ্ধমান রাজকর্ত্তৃক প্রথমে কারারুদ্ধ হন এবং পরে কারারক্ষকের দয়ায় তথা হইতে পলায়ন করিয়া পুরী যান। এই সময়ে কবির বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্তি দেখা যায় এবং তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৃন্দাবন যাইতে মনস্থ করেন। কিন্তু পথে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল গ্রামে অবস্থিত কবির শ্যালীপতির ভ্রাতার বাড়ী হইতে কবি মত পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার স্ত্রীর মনের মিল কতটা ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। তবে তিনি পরে লিখিয়াছেন, "দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায়গুণাকর॥" স্ত্রীকে তাঁহার পিতৃগৃহে রাখিয়া কবি ফরাসডাঙ্গায় গমন করেন ও ফরাসীদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নামক এক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করেন। দেওয়ান মহাশয় কিছুকাল পরে তাঁহাকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা-দৃষ্টিতে ফেলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে চল্লিশ টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার সভাকবির পদ প্রদান করেন। এই স্থানে থাকিয়াই কবির প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হয় এবং তৎকালীন সমাজের দোষ ও গুণ এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রুচির নিদর্শন তাঁহার রচনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। "অন্নদামঙ্গল", "বিদ্যাসুন্দরে"র কাহিনী প্রভৃতি সবই তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হিসাবে রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুলাযোড় গ্রাম ইজারা দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজকর্ম্মচারী উহা পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে পত্তনি নিয়া কবির সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। ইহাতে কবি দুঃখিত হইয়া রামদেব নাগের অত্যাচার বিবৃত করিয়া "নাগাষ্টক" নামক অম্ল-মধুর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই কবিতা পাঠ করিয়া কবিকে কিছু ভূমি নিষ্কর দান করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে "রায়গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে কবির বহুমূত্র রোগে মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর "অন্নদামঙ্গল" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত অন্নদামঙ্গলের আদর্শ ছিল মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল"। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে পরে ইহাতে সন্নিবেশিত করেন। রাজকন্যা বিদ্যাকে বর্দ্ধমানের রাজকুমারী কল্পনার মধ্যে কবির বর্দ্ধমান-বিদ্বেষ প্রকটিত হইয়া থাকিবে। এই বিদ্যাকে কেন্দ্র করিয়া আদি রসের ছড়াছড়ির মূলেও একই মনোভাবের আরোপ করা যাইতে পারে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠসং, পৃঃ ৮৬)। তাঁহার অন্নদামঙ্গল গ্রন্থখানির মধ্যে তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে শিবায়নের কাহিনী ও অন্নদা পূজার বৃত্তান্ত। ইহার সহিত প্রসঙ্গক্রমে হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দরের পালা। তৃতীয় ভাগে অন্নদাদেবীর ভক্ত ও অনুগৃহীত ভবানন্দ মজুমদারের কথা ও প্রসঙ্গক্রমে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোর-বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। একটি কথা এইস্থানে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে রচিত হইলেও উভয়ের বর্ণনার বিষয়বস্তু, পুথির নাম ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য অনেক। ইহা কতকটা যুগ পরিবর্ত্তনের ফল। বিদ্যাসুন্দরসহ অন্নদামঙ্গল ছাড়া কবির আর দুইখানি উল্লেখযোগ্য রচনার নাম "রসমঞ্জরী" ও "চণ্ডীনাটক"। কবি "চণ্ডীনাটক" অসম্পূর্ণ থাকিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই গ্রন্থত্রয় ছাড়া কবির রচিত আরও অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়; (যথা—চৌরপঞ্চাশৎ)।

অন্নদামঙ্গল রচনার মূলে কবির মধ্যে দেবতার প্রতি ভক্তিভাব অপেক্ষা প্রভুর প্রতি অনুরক্তিই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবির অন্নদাতা প্রভু। এই অন্নদাতা প্রভুর পূর্ব্বপুরুষ এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার। ভবানন্দ মজুমদার মহাশয় মোগল সেনাপতি মানসিংহকে একবার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। যশোহরের অধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মানসিংহ বর্ষাকালে জলপ্লাবিত বঙ্গদেশে সৈন্যদলসহ বিপদগ্রস্ত হইলে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সৈন্য-দলকে খাদ্য ও বাসস্থান জোগাইয়া বিশেষ সাহায্য করেন। ভবানন্দের স্বদেশদ্রোহিতার পুরস্কারস্বরূপ আকবর তাহাকে কৃষ্ণনগরের জমিদারী প্রদান করেন। কবির মতে অন্নদাতার পূর্ব্বপুরুষকে অন্নদাদেবীর দয়ার ফলেই রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি। শাক্তমতাবলম্বী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবির অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া একই কাব্যে পরোক্ষভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশংসা এবং শাক্তদেবী চণ্ডীর অন্নদাত্রীরূপ অন্নদাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার দ্বারা কবি

কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবি ভবানন্দ মজুমদারকে শাপভ্রষ্ট দেবতা কুবের-নন্দন নলকুবের বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচিত করিয়াছেন এবং এই পরিচয় দিবার সময় "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়। রচিল ভারতচন্দ্র রায়॥" এই কবিতাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে হয়।

"অন্নদামঙ্গল" ও ইহার অন্তর্গত "বিদ্যাসুন্দর"[১] দোষে গুণে জড়িত। ইহার মধ্যে দোষ অপেক্ষা গুণই অধিক। দোষের দিক বিবেচনা করিলে বলিতে হয় (১) বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতা দোষ ও (২) ভাবের অগভীরতা। গুণের মধ্যে (১) শব্দ-যোজনার অপূর্ব্ব কৌশল, (২) সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশলাভ ও (৩) সংস্কৃত সাহিত্যিক আদর্শকে বঙ্গভাষায় আনয়ন।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "বিদ্যাসুন্দর" আখ্যান উপলক্ষ করিয়া ভারতচন্দ্র অনাবশ্যক অশ্লীলতা করিয়াছেন এইরূপ ধারণার বশে হইয়া অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়াছেন। ডাঃ সেনের এইরূপ মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে বলিয়া মনে করি। যদিও বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা অস্বীকার করা যায় না তবুও সংস্কৃতে অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের মধ্যে আদিরসের উদাহরণস্বরূপ রচনাটিকে ধরিয়া লইলে অশ্লীলতার গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া যায়। সত্য বটে অন্নদামঙ্গলের বর্ণনা কিয়ৎপরিমাণে প্রাণহীন এবং ইহার মধ্যে উপমার বাহুল্য অত্যধিক। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বর্ণনাসৌন্দর্য্য উপেক্ষা করা যায় না। কবির দোষগুলির জন্য শুধু কবিকে দোষী না করিয়া তাঁহার যুগকে দায়ী করা উচিত। আর কোন্ কবি ও কাব্যই বা দোষহীন? আলোয়ালের সময় গুরুভার সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া ইহার শব্দসম্পদ ও ছন্দসম্পদ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রে তাহারই পূর্ণ পরিণতি। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের দুর্নীতির ছাপ থাকাও ইহাতে স্বাভাবিক। তবে হীরার ন্যায় কুটনি আমদানির ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলমান কাহারও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা সর্ব্ব যুগে, সকল জাতীর সাহিত্যেই মিলিবে।

ভারতচন্দ্র তাঁহার রচনা বৈশিষ্ট্যের জন্য কতিপয় ব্যক্তির নিকট ঋণী। প্রথমেই তাঁহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কবি মুকুন্দরামের নাম করা যাইতে পারে। অন্নদামঙ্গলের শাক্ত পরিবেশ, দেব-বন্দনা, দ্ব্যর্থবোধক কথার প্রয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে আদর্শ করিয়াছেন।

---

(১) ভারতচন্দ্রই 'বিদ্যাসুন্দরের" শেষ কবি নহেন। তাঁহার পরে এবং খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার অনুকরণে আরও কতিপয় "বিদ্যাসুন্দর" রচিত হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে দ্বিজ রাধাকান্ত রচিত "কালী-মঙ্গল"। "বিদ্যাসুন্দর", রচনা ১৮৩২ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় Asiatic Societyর গ্রন্থাগারে "কালী-মঙ্গল" নামে আর একখানি বিদ্যাসুন্দর আছে।

স্থানে স্থানে ভাষা পর্য্যন্ত মিলিয়া যায়। খুল্লনার নিকট চণ্ডীর পরিচয়দানের সহিত (চণ্ডীমঙ্গল) ঈশ্বরী পাটুনীর নিকট অন্নদাদেবীর (অন্নদামঙ্গল) আত্ম-পরিচয়দানের ভিতর "গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত" প্রভৃতি উক্তি তুলনীয়। চণ্ডীকাব্যের দুর্ব্বলা-দাসীর বেসাতি ও অন্নদামঙ্গলের হীরামালিনীর বেসাতি এই সম্পর্কে তুলনা করা যাইতে পারে। দুর্ব্বলা হীরার ন্যায় কুটনি না হইলেও তাহার চরিত্রের ছায়া কতকটা হীরামালিনীর উপর পড়িয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "ছায়ার বিলাপ" ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের "রতিবিলাপ" সমগোত্রিয়। ভারতচন্দ্রের "মানসিংহের তাঁবুতে ঝড়-বৃষ্টি" মুকুন্দরামের "কলিঙ্গে বন্যা" বর্ণনারই প্রতিচ্ছবি তবে প্রথমটি একটু বেশী হাল্কা ধরনের এই যাহা প্রভেদ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও বন্যা উপলক্ষে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রবর্ণনা করিতে যাইয়া বিষয়টি কিছু হাল্কা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সর্ব্বত্রই যে প্রাণহীন তাহাও নহে। মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় উক্তি দ্বারা বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশেও কবি মনোযোগী ছিলেন। যথা, "গণেশ-বন্দনায়" আছে—হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া, সংসার সমুদ্র পিয়া, খেলা ছলে করহ প্রলয়। ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি, পুনঃ কর বিশ্ব সৃষ্টি, ভাল খেলা খেল দয়াময়॥ এইরূপ সতীর দক্ষালয়ে গমন অংশে আছে—"পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে। প্রসবিনু বিধি বিষ্ণু তোমা তিনজনে॥ তিনজন তোমরা কারণ জলে ছিলা। তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥" ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের প্রথম ঋণ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নিকট এবং দ্বিতীয় ঋণ কবি আলোয়ালের নিকট। সংস্কৃত হইতে ভাষাগত ও কাব্যগত আদর্শ প্রচারের দিকে ভারতচন্দ্র "পদ্মাবতী"-প্রণেতা কবি আলোয়ালের কাব্য হইতে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তবে, আলোয়াল তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান প্রদর্শন করিতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন ভারতচন্দ্র তদ্রূপ বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি এবং অনুপ্রাস ও উপমা-তুলনার বাহুল্য উভয় কবির রচনাতেই প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। আলোয়াল রাজকুমারীর বিরহব্যথা বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল।
সেই দুঃখে জলদ শ্যামবর্ণ হৈল॥
স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর।
অঙ্গুরে শ্যামল তহি ভেল শশধর॥" ইত্যাদি।

—আলোয়ালের পদ্মাবৎ।

ভারতচন্দ্র রাজকুমারী বিদ্যার রূপবর্ণনা উপলক্ষে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে যে চিত্র দিয়াছেন তাহা এইরূপ—

(ক) "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥"
—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

(খ) "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"
—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

ভারতচন্দ্রের তৃতীয় ঋণ রামপ্রসাদের কাছে। এই ঋণ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল" ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য")। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ বর্ণনা আছে, ভারতচন্দ্র তাহাই অবলম্বন করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের বর্ণনা কিছু শুষ্ক, কিন্তু ভারতচন্দ্রের পদলালিত্য অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুইটি স্থান উদ্ধৃত হইল।

বিদ্যার রূপ-বর্ণনা—

(ক) "ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভস্থান॥
কিবা লোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোর দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কোন বা বড়াই কাম পঞ্চশর তূণে।
কত কোটী খরশর সে নয়ন কোণে॥"
—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

(খ) "কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
নাভিকূপে যেতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরিছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥

কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটী কোটী কালকূট সম॥"
—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

গন্ধর্ব্ব-বিবাহ (বিদ্যাসুন্দর)—
"উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়ালো বচন॥
উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমন্তিনী।
নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী॥
বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর।
মধুকর নিরব হইল বাদ্যকর॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
নূপুর কিঙ্কিনী জালে নানা শব্দ হয়।
তুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দন সময়॥
সস্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক।
দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক॥"
-রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

(খ) "বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গন্ধর্ব্ব বিহার হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয়জন।
বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিনী কঙ্কণ॥
নৃত্যকার বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়॥

নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
তুষ্টার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥"
—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

উল্লিখিতরূপ অনেক ছত্র আছে যাহা কবি হিসাবে রামপ্রসাদ হইতে ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবে। রামপ্রসাদ তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয়স্বরূপ "সহজে কলঙ্কী সে ভবাম্ভ সম নহে", "ক্ষেপ করে দশ দিক্ লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে" প্রভৃতি পদ তদ্‌রচিত বিদ্যাসুন্দরে ব্যবহার করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রচনার তুলনায় ভারতচন্দ্রের রচনা কত মধুর!

ভারতচন্দ্রের লেখাতে রামপ্রসাদের ন্যায় কোনরূপ কষ্টকল্পনা পরিশ্রম-সাধ্য ছন্দ মিলান অথবা ভাষার পাণ্ডিত্য দেখাইবার চেষ্টা নাই। ছন্দে লেখা কবি ভারতচন্দ্রের পক্ষে যেন কত স্বাভাবিক ও কত সহজ, ইহা যেন স্বতঃস্ফূর্ত। মিষ্টতা ভারতচন্দ্রের রচনায় যত্রতত্র। তাঁহার,

"কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল,
পবন ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥" (অন্নদা-মঙ্গল)

প্রভৃতি ছত্রগুলি কত কোমল। ভাষা নিয়া এইরূপ ক্রিড়া করিতে পারিতেন বলিয়া কেহ কেহ (যেমন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন) তাঁহাকে উৎকৃষ্ট 'শব্দ-কবি' বলিয়াছেন।

কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনার অশ্লীলতার ভিতর দিয়া মানিনী, প্রোষিতভর্তৃকা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি নায়িকাভেদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি বিভিন্ন প্রকার নায়িকা লক্ষণ সংক্রান্ত "রসমঞ্জরী" নামে স্বতন্ত্র কবিতাগ্রন্থও লিখিয়াছেন।

কবির উপমাবাহুল্য একটি প্রধান দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল; যথা,—

"কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥

কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥"

—ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল।

অথচ সময়ে সময়ে কবি স্থানকালোচিত গাম্ভির্য্য অবলম্বন করিয়া যে চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যথা,—

মহাদেব-বর্ণনা—"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্, ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে॥

*　　*　　*

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

—ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল।

ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় কবি সমগ্র "অন্নদা-মঙ্গল" কাব্য খানিতে ভক্তের দৃষ্টি অপেক্ষা চটুল মনের অধিক পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মেনকারাণী অতি সাধারণ নারীর ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অভিযোগ করিয়াছেন। গৌরীর মাতার উপযুক্ত করিয়া তিনি চিত্রিত হন নাই এবং সন্তানবাৎসল্যরসসিক্ত জননীর পদমর্য্যাদার দিকে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের যশোদার তুল্য করিয়াও অঙ্কিত হ'ন নাই। যাহা হউক, কবি একটি জিনিষ আমাদের দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইহা বাস্তবতা। "বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা" কৌলিন্যপ্লাবিত বঙ্গদেশে এক সময়ে কিরূপ করুণ রসের সৃষ্টি করিত তাহার কিছু পরিচয় কবি বৃদ্ধ শিবঠাকুরের সহিত তরুণী গৌরীর বিবাহের সময়

উক্তি প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন। তদুপরি সাধারণ বঙ্গগৃহের দারিদ্র্য জনিত অশান্তির সুস্পষ্ট ছবিও তিনি শিব-দুর্গার ঘরকন্নার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কবি দেব-লোকের কাহিনী নামে মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদের ঘরের যথাযথ একটি চিত্র আমাদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেবচরিত্রের প্রতি অবজ্ঞা না স্বজাতি-প্রেম ?

অন্নদা-মঙ্গলে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত বিভিন্ন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গ-ভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেন। সংস্কৃত ভাব ও ভাষা তথা সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্নমুখী সৌন্দর্য্য খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে বঙ্গ-ভাষায় প্রবেশ লাভ করে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সংস্কৃতের প্রভাব বেশ ভাল ভাবেই পড়িয়াছিল। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাবের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রকে "ছন্দের রাজা" বলা যাইতে পারে। এতদিন পয়ার ও লাচাড়ী বাঙ্গালা পদ্য সাহিত্যের প্রধান অথবা একমাত্র আশ্রয় ছিল। ভারতচন্দ্রই বঙ্গ-সাহিত্যে সংস্কৃত বিভিন্ন ছন্দের আমদানি করিয়া ইহাকে নূতন রূপদান করেন। এই দিক দিয়া তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী মুকুন্দরাম ও আলোয়াল এবং তাঁহার সমসাময়িক রামপ্রসাদ তাঁহার পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছেন। ইহার ফলে সংস্কৃত ছন্দের বৃত্তগন্ধী, ত্রিপদী (লঘু, ভঙ্গ, দীর্ঘ, হীনপদ ও মাত্রা), চৌপদী (মাত্রা, লঘু ও দীর্ঘ), মালঝাঁপ, একাবলী (একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষর), তূণক, দীর্ঘাক্ষরাবৃত্তি, তরল পয়ার, তোটক ও ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দ বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ছন্দগুলির মধ্যে অনেকগুলির উদাহরণই অন্নদা-মঙ্গলে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় লঘু-গুরু উচ্চারণ না থাকাতে ছন্দরচনায় ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই ত্রুটি খুব অল্পই পরিলক্ষিত হয়।

কবির শেষ রচনা "চণ্ডী-নাটক"। ইহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। চণ্ডী-নাটকের ভিতর দিয়া ভারতচন্দ্র এই দেশে একটি মিশ্র ভাষার প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এই চণ্ডী নাটকের ভাষা বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফারসী ও উর্দ্দু মিশ্রিত। এই নাটকখানিতে চণ্ডীদেবী সংস্কৃতঘেষা শুদ্ধ ভাষায় কথা কহেন। কিন্তু মহিষাসুর উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার উত্তর দেয়। ভাষার দিক দিয়া সামঞ্জস্যের অভাবে বিসদৃশ হইলেও উহা বেশ কৌতুকের উদ্রেক

করে। নিম্নে চণ্ডী-নাটকের ভাষার নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন"।

"খট্‌মট্‌ খট্‌মট্‌ খুরোত্থধ্বনিকৃত জগতী কর্ণপুরাবরোধঃ ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাশা নিজচলদচলতাসু বিভ্রান্ত লোকঃ সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ পুচ্ছঘাতোচ্ছলচ্ছদধি জলপ্লাবিত স্বর্গমর্ত্ত্যো ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো স্বরূপঃ।" ইত্যাদি।

"প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি"।

"শোন্‌রে গৌয়ার লোগ্‌, ছোড়্‌দে উপাস রোগ,
মনস্তু আনন্দ ভোগ, ভৈষবাক্ত যোগমে।
আগ্‌মে লাগাও ঘাউ, কাহেকো জলাও জীউ,
পকারোক্ত প্যারপিউ, ভোগ এহি লোগসে॥" ইত্যাদি

"এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ: প্রথমে হাস্য করিলেন।"

"কমঠ করটট ফণিফণা ফলটট,
দিগ্‌গজ উলটট ঝপটট ভায়রে।
বসুমতী কম্পত, গিরিগণ নম্রত,
জলনিধি ঝম্পত, বাড়বময় রে॥
ত্রিভুবন ঘূর্ণিত রবিরথ টুটত,
ঘন ঘন ছুটত, যৈও পরলয় রে।
বিজলী চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট,
অট্ট অট অট অট, আ ক্যায়া হায়রে॥" ইত্যাদি

—ভারতচন্দ্রের অসম্পূর্ণ চণ্ডী-নাটক।

সপ্তদশ অধ্যায়

অপ্রধান শাক্ত মঙ্গলকাব্য (স্ত্রী-দেবতা)

এই অংশে কতিপয় অপ্রধান স্ত্রী-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করা গেল। এই কাব্যগুলির কবি অনেক, তন্মধ্যে মাত্র কতিপয় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন কবির বিবরণ দেওয়া হইল। এই সব কবিগণের আদি কবি (প্রত্যেক দেবী সম্বন্ধে) কে ছিলেন তাহা সবসময় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও কতক অপ্রধান দেবীর পূজা যে সুদীর্ঘকাল যাবৎ এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব দেব-দেবীর অনেকেই আবার তত প্রাচীন না হওয়াই সম্ভব। ইঁহাদের আদি অবস্থার নির্ণয় দুঃসাধ্য হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে। এই দেব-দেবীগণের উৎপত্তির মূলে বাঙ্গালার প্রাচীন জাতিগুলির মনোভাব ক্রিয়া করিয়াছে। উহা—(১) সাংসারিক আধি-ব্যাধি (২) হিংস্রজন্তুর ভীতি, (৩) সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধি (৪) তাত্ত্বিক মনোভাব (সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে) (৫) মানসিক গুণাবলী (৬) যৌনতত্ত্ব (৭) ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী (৮) বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ মনোভাব (৯) মাতৃকা-পূজার প্রভাব এবং (১০) পশু-পক্ষী প্রীতি প্রভৃতি।

(১) গঙ্গা দেবী

গঙ্গা দেবী সম্বন্ধে সংস্কৃতে অনেক কাহিনী ও স্তোত্র রচিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে গঙ্গানদী পর্যান্ত আর্য্য-সভ্যতা ততটা প্রসার লাভ করিতে না পারাতে তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইত। কিন্তু বেদ-পরবর্ত্তীযুগে আর্য্যসভ্যতা ও উপনিবেশ সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রসারিত হইলে গঙ্গা দেবী পৌরাণিক দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গঙ্গা নদীর দুইকূল তখন আর্য্যভূমিতে পরিণত হওয়াতে দেবীর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয়। গঙ্গার সাগরাভিমুখি গতিরদিকে আর্য্যসভ্যতার প্রসারের সহিত দুইটী পৌরাণিক নাম জড়িত আছে—তাঁহাদের একটি বিদেহ-মাধব ও অপরটি সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ। ভগীরথের নামানুযায়ী সাগর নিকটবর্ত্তী গঙ্গার অনেকখানি অংশ ভাগীরথি নামে প্রসিদ্ধ। হিমালয়-পর্ব্বত সমুৎপন্ন গঙ্গার গোড়ারদিকের সহিত শিব-দেবতার সংস্রব রহিয়াছে। ভগীরথ তাঁহার

পূর্ব্ব-পুরুষ সগররাজার সন্তানগণের (কপিল মুনির রোষোৎপন্ন অগ্নিতে) ভস্মীভূত দেহের উপর গঙ্গা প্রবাহ আনিয়া তাঁহাদের স্বর্গলোক প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কার্য্যটি নিতান্ত সহজ ছিল না। গঙ্গাদেবী পৌরাণিক মতানুসারে বিষ্ণুপদোদ্ভবা এবং প্রথমে স্বর্গে ছিলেন। মহাদেব ভগীরথের উপর কৃপাপরবশ হইয়া স্বর্গ হইতে পতনশীল গঙ্গার বেগ স্বীয় মস্তকে ধারণ করাতেই ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্তলোকে আনয়ন করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব-পুরুষদিগের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১] এই ঘটনার পর হইতেই গঙ্গা নদীর দেবী (গঙ্গা দেবী) শিবের অন্যতমা স্ত্রীরূপে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। শিবের দুই স্ত্রী দুর্গা ও গঙ্গার মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। ইহার ফলে সপত্নী-কলহের উদাহরণস্বরূপ এই দেবীদ্বয়ের কলহের কথা মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

গঙ্গাভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে মধ্যযুগের বাঙ্গালাতে কতিপয় গঙ্গা-মঙ্গল ও গঙ্গাস্তোত্র রচিত হইয়াছে। গঙ্গা-মঙ্গলের কবিদিগের নাম যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) চণ্ডী-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি মাধবাচার্য্য (খৃঃ ১৬ শতাব্দীর শেষভাগ) একটি সুবৃহৎ "গঙ্গা-মঙ্গল" রচনা করেন।

(খ) সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্যের পরেই যে কবি "গঙ্গা-মঙ্গল" রচনা করেন তাঁহার নাম দ্বিজ কমলাকান্ত (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী)। ইনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

(গ) "গঙ্গা-মঙ্গলের" তৃতীয় প্রসিদ্ধ কবি বৈদ্যবংশোদ্ভব জয়রাম দাস (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ)। এই কবির বাড়ী ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে।

(ঘ) দ্বিজ গৌরাঙ্গ "গঙ্গা-মঙ্গলে"র অপর প্রসিদ্ধ কবি। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ)। এই কবি সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

(ঙ) খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষপাদে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ) দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ নামক জনৈক কবি তদীয় স্ত্রীর প্রতি গঙ্গাদেবীর স্বপ্নাদেশের ফলে একখানি "গঙ্গা-মঙ্গল" রচনা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই কবির পুথিখানিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি আছে। কবির নিবাস ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে। কবি রচিত পুথির নাম "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে

---

(১) বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে ভাগীরথির গতি সম্বন্ধে দুইটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন এবং ভগীরথের কাহিনীও তজ্জাতীয় কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পিতা "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামে সংস্কৃতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা কাব্যখানি ইহার অনুবাদ নহে এবং অনেক পরে (খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে) দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" প্রকাশিত হয়। রচকের পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী। এই কাব্যটির রচনা ভাল।

উল্লিখিত কবিগণ ভিন্ন আরও অনেক কবি "গঙ্গামঙ্গল" রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনেক কবি "গঙ্গাস্তোত্র"ও রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিগণের মধ্যে খৃঃ ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর অনেক কবি রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবিচন্দ্র প্রভৃতি আছেন। কতিপয় কবিচন্দ্রের মধ্যে এই কবিচন্দ্র নামে ব্যক্তিটি (ইহা উপাধিও হইতে পারে) কাহারও কাহারও মতে অযোধ্যারাম ('দাতাকর্ণ' প্রণেতা) ও অন্য মতে নিধিরাম। নিধিরামের রচিত "গঙ্গাবন্দনা" উল্লেখযোগ্য। নিধিরাম ও কবিচন্দ্র একব্যক্তি বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন। গঙ্গাবন্দনা বা গঙ্গাস্তোত্র রচনাকারীদিগের মধ্যে একটি মুসলমান কবির নামও পাওয়া যায় তিনি দরাফ খাঁ (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ)।

গঙ্গা দেবীর ন্যায় অপ্রধান শাক্ত দেবীগণের উল্লেখ উপলক্ষে একটি কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ এই দেবীগণকে লৌকিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। আমরা ইহা সমিচীন মনে করি না, কারণ গঙ্গা দেবীকে হিন্দু (আর্য্য) ও পৌরাণিক দেবী বলিয়া গ্রহণ করা সহজ হইলেও সব অপ্রধান দেবী সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল নির্ণয় করা সহজ নহে। উদাহরণস্বরূপ শীতলা দেবীর নাম করা যাইতে পারে। ষষ্ঠী দেবী ও লক্ষ্মী দেবীর বর্ত্তমানরূপের অন্তরালে কোন্ জাতি ও কোন্ সংস্কৃতির মূল অবদান রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কোন কোন দেবীকে খুব আধুনিকও বলা যাইতে পারে, যথা ওলাউঠার দেবী "ওলা" দেবী ও তৎ-সংক্রান্ত ছড়া। কালক্রমে এই সমস্ত দেবীগণের ভিতরে আর্য্যসংস্কৃতি প্রবেশ লাভ করিলেও নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের স্তর-চিহ্ন ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(২) শীতলা দেবী

(শীতলা-মঙ্গল)

শীতলা দেবী বসন্ত রোগের ও ব্রণের দেবী। এমন একদিন ছিল যখন ব্যাধি-ভীতি, জন্তু-জানোয়ারের ভীতি এতদ্দেশীয় মানব সমাজে নানা দেবতার

উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল। সুতরাং দারুণ বসন্তরোগেরও একটি দেবীর পরিকল্পনাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসন্তরোগ একটি অতি পুরাতন ব্যাধি পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের "তক্মন"দেবী ও "অপ্ দেবী"র (অথর্ব্ব বেদ) সহিত শীতলা দেবীর যথেষ্ট মূর্ত্তিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। শীতলা নামক দেবীর উল্লেখ পুরাণ ও তন্ত্রে সমভাবে বর্ত্তমান দেখা যায়। এই উপলক্ষে স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রের নাম করা যাইতে পারে। এই তো গেল বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুর দিক। আবার মহাযানী বৌদ্ধদিগের একটি দেবীর সহিতও শীতলা দেবীর গুণগত সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। ইনি হইতেছেন হারিতী দেবী। হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বেশ সৌন্দর্য্যের দ্যোতক, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত হারিতী দেবীর মূর্ত্তি সেরূপ নহে। অপর একটি সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যাইতে পারে বৌদ্ধযুগে এই বাঙ্গালাদেশে ডোমপুরোহিতগণ হারিতী দেবীর পূজা করিতেন, আবার ইহারাই বর্ত্তমানে হিন্দু শীতলা দেবীর পূজক। এতদ্দ্বারা শীতলা দেবীকে হারিতী দেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের ন্যায় কেহ কেহ মনে করেন।

কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে সাদৃশ্য থাকিলেই সর্ব্বদা দুই দেবতা এক ইহা কল্পনা করা যায় না। এরূপ সিদ্ধান্ত সকল সময় নিরাপদ নহে। একটি মত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই মতটি হইতেছে যে, ডোমগণ বৌদ্ধ দেব-দেবীর উপাসক ছিল। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে যেহেতু ডোমগণ হারিতী ও শীতলা উভয় দেবীরই প্রাচীন ও আধুনিক পূজক, সেইহেতু বৌদ্ধ হারিতী দেবীই বর্ত্তমানে শীতলা দেবীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ডোমগণ শুধু বৌদ্ধ দেবতার উপাসক ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং তাহারা শীতলাদেবীর পূজা করে বলিয়াই শীতলা দেবীকে হারিতী দেবীর সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া বৌদ্ধ দেবী বলা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ দুই দেবীর মূর্ত্তিও বিভিন্ন। এক সময় ছিল যখন একই দেবতা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজেই সমভাবে পূজা পাইতেন। উদাহরণস্বরূপ "তারা" দেবীর নাম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়ত একই দেবী "শীতলা" ও "হারিতী" এই দুই নামে পরিচিতা হইতে পারেন। তবে হারিতী রূপান্তরিত হইয়া শীতলা দেবী না শীতলা দেবীর রূপান্তর হারিতী দেবী তাহা বলা কঠিন। আবার ইহারা একই রোগ সম্পর্কে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেবী হইয়াও ডোম জাতি দ্বারা পূজিতা হইতে পারেন। এখন যে শীতলা মূর্ত্তি দেখা যায়

তাহা দুই প্রকারের। একরূপ মূর্ত্তি আকারে খুব ছোট সিন্দুরলিপ্ত ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিত এবং দেখিতে ভাল নহে। এক জাতীয় লোক এই মূর্ত্তি নিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। অন্য আর একরূপ মূর্ত্তিতে দেবীর আকার বৃহত্তর ও দেবী চতুর্ভূজা, গর্দ্দভারূঢ়া এবং সুদর্শনা। বারোয়ারী পূজামণ্ডপে এইরূপ মূর্ত্তিই সচরাচর দেখা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান শীতলা মূর্ত্তি মাত্রেই বৌদ্ধ হারিতী দেবীর নকল ইহা বলা যায় না। যাহা হউক, ইহারা দুই দেবী অথবা এক দেবীই হউন আপত্তি নাই; অন্ততঃপক্ষে হারিতী দেবী হইতে শীতলা দেবীর উদ্ভব হইয়াছে এই মত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সন্দিহান।

শীতলা দেবীর সম্বন্ধে অনেক কবি পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "এই শীতলা দেবী সম্বন্ধেও অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গীতির নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।" কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী কাশীযোড়ার (মেদিনীপুর) জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কবিবল্লভ দৈবকীনন্দনের পূর্ব্বপুরুষের আদিবাস হাতিনা (হুগলী?) গ্রামে ছিল। পরে মান্দারণ হইয়া বৈদ্যপুর গ্রামে ইহারা বসতিস্থাপন করেন। দৈবকীনন্দনের রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে শূন্য-পুরাণের অনুকরণ পাওয়া যায়। শীতলার বাহন উলূক ছিল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কবি দৈবকীনন্দনই বোধ হয় শীতলা মঙ্গলের প্রথম কবি।[১]

এই স্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেব-দেবীগণ সম্বন্ধে রচনাগুলি একটি ঘটনা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে; সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি-বিশেষ কোন একটি দেবতা-বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখাইলেই সেই ব্যক্তি দেবতার কোপে পড়িয়া প্রথম বিপদগ্রস্ত হয় এবং পরে দেবতার প্রতি ভক্তি দেখাইয়া ও পূজা করিয়া বিপদ্‌মুক্ত হয়। ইহাই এই সমস্ত কাব্যের মূল আখ্যান এবং দেবতা-বিশেষের পূজা প্রচারের সহায়ক।

---

(১) দৈবকীনন্দনের "শীতলা-মঙ্গল" সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫ সন, ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩) ষষ্ঠী দেবী

(ষষ্ঠী-মঙ্গল)

ষষ্ঠী-দেবী গৃহীর পরম মঙ্গলদায়িকা দেবী। মার্জ্জার-বাহন এই দেবী সন্তানহীনাকে বহু সন্তানবতী করেন, অপুত্রককে পুত্রবতী করেন। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গগৃহে এই দেবীর আদর স্বাভাবিক। একদিকে "শিশুমার" নামক কোন রাক্ষস যেমন শিশুদিগের প্রাণ নষ্ট করে, অপরদিকে এই দেবী শিশুদিগের রক্ষাকার্য্যে নিয়োজিতা থাকেন। ইহাই প্রাচীন বিশ্বাস। এই ষষ্ঠী-দেবী কত পুরাতনকাল হইতে এই দেশে পূজা পাইয়া আসিতেছেন তাহা আমাদের জানা নাই। ব্রতকথার আকারে এই দেবীর কাহিনী যে বহু পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য-সংস্কার অনুযায়ী শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে বিধাতা আয়ুর দিকে শিশুর ভাগ্যলিপি নির্দ্দেশ করেন। আর্য্য দেবতা বিধাতার সহিত আর্য্যেতর তান্ত্রিক মতের ছয় সংখ্যা প্রভৃতি ষষ্ঠী দেবীর পূজায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, শীতলা দেবীর ন্যায় ষষ্ঠী দেবীর মধ্যে বোধ হয় বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কৃত হয় নাই। হিন্দু পুরাণসমূহের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং ইহা ছাড়া দেবী-ভাগবতে ষষ্ঠী-দেবীর উল্লেখ আছে। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে কবি কৃষ্ণরাম একখানি "ষষ্ঠী মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির কথা বর্ণিত আছে। এই কৃষ্ণরাম (১) বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের চতুর্থ রচয়িতা সুবিখ্যাত কবি কৃষ্ণরাম দাস। কবি শ্রীধর, কবি কঙ্ক ও চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দদাসের পর ইনি "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। কবি কৃষ্ণরাম ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিকটস্থ বেলঘরিয়া ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী নিমতা গ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "কালিকা-মঙ্গলের" অন্তর্গত "বিদ্যাসুন্দরের পালা" ও "ষষ্ঠী-মঙ্গল" ছাড়া কবির অন্যান্য গ্রন্থ "রায়মঙ্গল" (ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামে) এবং সংস্কৃত মহাভারতের অন্তর্গত "অশ্বমেধ পর্ব্বের" কাব্যে বঙ্গানুবাদ।

ষষ্ঠী-দেবীর পূজার যে এক সময়ে নানাদেশে যথেষ্ট প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল ও বিশেষ ঘটা করিয়া এই দেবীর পূজা হইত তাহা কবি কৃষ্ণরামের লেখা পাঠে অবগত হওয়া যায়। কবি লিখিয়াছেন :—

---

(১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত "কবি কৃষ্ণরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—সাহিত্য, সন ১৩০০, ২য় সংখ্যা, ১১৭ পৃঃ।

"রাঢ় বঙ্গ দেখিলাম কলিঙ্গ নেপাল।
গয়া পইরাগ দেখিলাম নিষাদ কাঁপাল॥
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিনু দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ॥
সপ্তগ্রাম দেখিলাম নাহি তার তুল।
চালে চালে ঠেকে লোক ভাগিরথী কুল॥"

কবি কৃষ্ণরামের "ষষ্ঠী-মঙ্গল"।

(৮) লক্ষ্মী দেবী

(কমলা-মঙ্গল)

লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পদের, বিশেষতঃ কৃষিসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবী খুব প্রাচীনকাল হইতেই এতদ্দেশে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুদেবতার পত্নীরূপে পরিকল্পিতা হইয়া থাকেন। এই দেবীর হস্তে ধনের ঝাঁপি ও ধান্য-শীর্ষ এবং বাহন পেচক (উলূক)। একদিকে কৃষককুল ও অপরদিকে বণিককুলের প্রিয় আরাধ্যা দেবী হওয়াতে তিনি কৃষিযোগ্য ভূমি ও বাণিজ্যপথোপযোগী নদী ও সমুদ্র (অর্থাৎ জল ও স্থল) উভয়েরই সংশ্লিষ্ট দেবী। তিনি রাজত্ব-মূলক ঐশ্বর্য্যেরও দেবী সুতরাং রাজলক্ষ্মী হিসাবে দেব, দৈত্য নরকুলে সম্মানিতা। তিনি নরকুলের ক্ষত্রিয়-রাজগণের একজন প্রধানা উপাস্যা দেবী। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষে লক্ষ্মীর সমাদর। এই বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে, শাক্ত ও বৈষ্ণবে ভেদ নাই। লক্ষ্মী দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে একটি মূর্ত্তি আছে গজ-লক্ষ্মী। পৌরাণিক মতে তিনি সমুদ্রমন্থনোদ্ভবা অর্থাৎ সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। হস্তী পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সমাজে সমভাবে আদরনীয়। বিশাল বপুহেতু এই প্রাণী মর্য্যাদায় রাজা বা সম্রাটকে বহন করিবার উপযুক্ত। ইহা ছাড়া হস্তী নানা প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে। এই হস্তীর সহিত আকাশের বিশাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতসহ অষ্টগজ তাঁহার চারি মেঘের বাহন। গজ রাজশক্তির ঐশ্বর্য্য ও মহিমার প্রতীক। সুতরাং লক্ষ্মী দেবীর সহিত গজের সম্বন্ধ খুব স্বাভাবিক। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ "গজ-লক্ষ্মী" মূর্ত্তির প্রকাশ। দেবীর এই মূর্ত্তিতে দুইটি গজ দুইদিক হইতে শুণ্ডে কুম্ভ ধৃত করিয়া তাঁহাকে জলে স্নান করাইতেছে। হিন্দু তান্ত্রিক

"বগলা" মূর্ত্তির ইহা অনুরূপ। শুণ্ডে করিয়া হস্তীর জল বর্ষণ ক্রিড়া হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে কিনা কে জানে। প্রলয়কালেও দিকহস্তীর পৃথিবীতে জলধারা বর্ষণ কল্পিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে মধ্যে মধ্যে যে "জলস্তম্ভ" নামক নৈসর্গিক ব্যাপার দৃষ্ট হয় তাহাও দিকহস্তীরই কার্য্য বলিয়া এতদ্দেশীয় সংস্কার। বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণরাজগৃহে স্বর্ণনির্ম্মিত গজ-লক্ষ্মী মূর্ত্তির বর্ণনা রহিয়াছে। মহাযানী বৌদ্ধগণ প্রাচীনকাল হইতে "শ্রী" বা লক্ষ্মী-দেবীর উপাসক। বৌদ্ধমন্দির সমূহের দ্বারদেশে খোদিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে মুসলমানগণও লক্ষ্মী-পূজা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের বিধান অনুসারে বৃন্দাবনের চতুঃসীমার মধ্যে মাধুর্য্যরসের প্রতীক শ্রীরাধার অধিকার বলিয়া ঐশ্বর্য্যভাবের দ্যোতক লক্ষ্মীদেবীর এইস্থানে প্রবেশ নিষেধ। তথাপি বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ যমুনানদীর অপরতীরে অবস্থিত এবং বৃন্দাবন হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী "বেলবন" নামক গ্রামে প্রতি বৃহস্পতিবার গিয়া সাড়ম্বরে লক্ষ্মী-পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি ভক্তিমান হইলেও তাহারা লক্ষ্মীদেবীর প্রতি বীতরাগ নহেন। বাঙ্গালাদেশের একশ্রেণীর মুসলমান এখনও লক্ষ্মীর গীত গাহিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল কিনা জানা নাই। যাহা হউক লক্ষ্মী দেবী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পূজিতা। একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাখীর মধ্যে পেচক বা উলূক এবং জানোয়ারের মধ্যে হস্তীকে বৌদ্ধগণ বিশেষ সম্মান দিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। হস্তী অবশ্য বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতার স্বপ্নদেখার সহিত জড়িত বলিয়া বৌদ্ধগণের চক্ষে শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু উলূক এই বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্মঠাকুর নামক লৌকিক দেবতার বাহন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে ধর্ম্মঠাকুর বুদ্ধের ছদ্মরূপ। ইহা সত্য হইলে অবশ্য উলূকও বৌদ্ধগণের চক্ষে পবিত্র। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুমান সত্য কিনা বলা যায় না। ইহা ছাড়া হিন্দুগণ ও বৌদ্ধগণ সমভাবে এই দুইটি জীবকে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিলে হিন্দু ও বৌদ্ধ কে কাহার নিকট হইতে এই দুইটিকে লইয়াছে এই প্রশ্ন উঠে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অবশ্য বৌদ্ধগণের নিকট হইতে হিন্দুগণ এই দুইটি প্রাণীকে ধার লইয়াছে। আমরা ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক কেননা বুদ্ধজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুগণ এই দুইটী প্রাণীকে তাহাদের দেবতাদের বাহনরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রামায়ণাদি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। অবশ্য রামায়ণও বুদ্ধের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া যদি কেহ বলেন তবে আর তর্কের অবসান ঘটিবে না।

খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক কবি "লক্ষ্মী-চরিত্র" রচনা করেন। তিনি শিবানন্দ কর এবং তাঁহার উপাধি ছিল "গুণরাজ খান"। আমরা ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসুরও (খৃ ১৬শ শতাব্দী) এই উপাধি ছিল বলিয়া জানি। কবি মাধবাচার্য্য একখানি "লক্ষ্মীচরিত্র" রচনা করিয়াছিলেন। এই মাধবাচার্য্য মুকুন্দরামের সমসাময়িক চণ্ডীমঙ্গলের কবি হইলে শিবানন্দ কর অবশ্য ইহার পরবর্ত্তী কবি। "লক্ষ্মী-চরিত্র" বা "কমলা-মঙ্গলে"র আর একজন কবির নাম পরশুরাম। এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যের বিশেষ প্রসিদ্ধ কবি জগমোহন মিত্র (খৃঃ ১৮ শতাব্দী)। কবি জগমোহন রচিত "লক্ষ্মী-মঙ্গলে"র প্রথমাংশ শিব-দুর্গার কাহিনী বা শিবায়ন। জগমোহনের পর রণজিৎরাম দাস কৃত "কমলা-চরিত্র" (১৮০৬ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখযোগ্য।

(৫) সরস্বতী দেবী

(সারদা-মঙ্গল)

বাঙ্গালাদেশে অন্যান্য দেব দেবীর ন্যায় সরস্বতী দেবীরও ভক্তের অভাব ছিল না। সুতরাং এই দেবীর নামে রচিত মঙ্গলকাব্যও পাওয়া যায়। সরস্বতী দেবীর নামে স্তুতিবাচক মঙ্গলকাব্যের নাম "সারদা-মঙ্গল"। "সারদা" নামটি শুধু সরস্বতী দেবীকেই বুঝায় না। "দুর্গা" বা "চণ্ডী" দেবীর নামও "সারদা"। সুতরাং সব "সারদা-মঙ্গলই" সরস্বতী-বন্দনা বাচক নহে। উহা রামায়ণ অথবা চণ্ডী বা দুর্গা-মঙ্গলও হইতে পারে, যেমন, শিবচন্দ্র সেন প্রণীত "সারদা-মঙ্গল" রামায়ণ (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষপাদ) এবং মুক্তারাম সেন রচিত "সারদা-মঙ্গল" চণ্ডীমঙ্গল (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ)। এইরূপ দুর্গার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একাধিক "সারদা-মঙ্গল" আছে। যাহা হউক সরস্বতী দেবীর বন্দনা উপলক্ষে রচিত "সারদা-মঙ্গল" সমূহের মধ্যে মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কবি দয়ারাম। কবি দয়ারাম দাসের সময় সম্ভবতঃ খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে। এই কবির পিতার নাম ছিল প্রসাদ দাস। ভণিতায় পাওয়া যায়—"দয়ারাম দাস গান, সারদা মাতার নাম, বিরচিল প্রসাদ-নন্দন॥" মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীগাঁও পরগণার অধীন কাশীজোড়-কিশোরচক গ্রামে কবির বাড়ী ছিল। দয়ারাম নামক জনৈক ব্যক্তি খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ অনুবাদ করেন। সম্ভবতঃ "সারদা-মঙ্গল" প্রণেতা ও রামায়ণের অনুবাদক দয়ারাম দুই ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি।

কবি দয়ারাম রচিত সারদা-মঙ্গলের প্রধান চরিত্র লক্ষধর নামক রাজপুত্র।

ইহার পিতা সুরেশ্বর নামক দেশের রাজা সুবাহু। অপুত্রক রাজা সুবাহু পরম শিবভক্ত ছিলেন। শিবদেবতার দয়ায় অপুত্রক রাজা সুবাহুর অবশেষে লক্ষধর নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে রাজপুত্র লক্ষধর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই লেখাপড়া শিক্ষা করিতে না পারায় অবশেষে রাজা তাহার প্রিয়পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন; কিন্তু লক্ষধর কোতোয়ালের দয়ায় সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহের ফলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। নির্ব্বাসিত রাজপুত্র ভ্রমণ করিতে করিতে বৈদেব নামক অন্য এক দেশে গিয়া স্বীয় পরিচয় গোপন পূর্ব্বক সেই দেশের রাজকন্যাদের পাঠশালায় তাহাদের লিখনোপযোগী ধূলা ও কূটা সংগ্রহের কর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহাতে তাহার নাম হয় ধূলা-কূট্যা। যাহা হউক অনেক কষ্ট ও বিপদ অতিক্রম করিবার পর মাতা সরস্বতীর লক্ষধরের উপর দয়া হয় এবং রাজপুত্র দেবীর দয়ায় পরম বিদ্বান হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য অবশেষে রাজকন্যাদের বিবাহ করিয়া পত্নীদের সহ লক্ষধর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং পিতা সুবাহু কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। এইতো গল্প, সারদা-মঙ্গলের কাহিনী। লক্ষধরের ধূলাকূট্যা নাম হইতে সারদা-মঙ্গলের আর এক নাম "ধূলা-কূট্যার পালা"। ইহা সারদা-মঙ্গলের প্রধান অংশও হইতে পারে। দয়ারামের সারদা-মঙ্গলে সরস্বতী দেবীর বাহন রাজহংস নহে কোকিল সুতরাং সরস্বতী দেবীকে কোকিল-বাহিনী বলা হইয়াছে।[১] ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। তবে সরস্বতী দেবী বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবী এবং নানা যুগের চিহ্ন এই দেবীর সহিত সংযুক্ত আছে। "সারী" নামক পক্ষীকে কোন সময়ে সরস্বতী দেবীর নিকট বলি দেওয়া হইত।[২] দেবীভাগবত অনুসারে সরস্বতী দেবী হস্তে শুকপক্ষী ধরিয়া রহিয়াছেন। বৈদিক যুগের নদী সরস্বতী, সূর্য্যের তেজ অর্থে সরস্বতী, পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের বিদ্যাদাত্রী দেবী সরস্বতী, তান্ত্রিক (শাক্ত) মতে একাধিক সরস্বতী, পৌরাণিক ও বৈষ্ণবী সরস্বতী প্রভৃতি হইতে সরস্বতী দেবীর সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় প্রাচীন হিন্দুজাতির ধারণার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনার যোগ্য। তান্ত্রিক মতে সরস্বতী দেবীকে 'ভদ্রকালী' বলা হয়,

---

(১) সরস্বতী দেবীর বাহন তিব্বতে ময়ূর, জাপানে শ্বেত সর্প ও বাঙ্গালায় জনসাধারণের এক ধারণায় "তেঁতুলে-বিছে" নামক বৃশ্চিক।

(২) মৎসম্পাদিত দয়ারামের সারদা-মঙ্গল (Journal of the Dept. of Letters C. U. Vols. 23 & 29) দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া সারদা-মঙ্গল সম্বন্ধে History of Bengali Lang. & Literature, (D. C. Sen), Typical Selections from Old Bengali Literature, Vol. 2 (D. C. Sen), অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "সরস্বতী" নামক প্রবন্ধ (সাঃ পঃ পত্রিকা) এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস (সুকুমার সেন) দ্রষ্টব্য।

আবার কালী দেবীর এক নামও ভদ্রকালী অর্থাৎ উভয় দেবী অভিন্ন শুধু রূপ ভেদ মাত্র। এই রূপ তান্ত্রিক মতে আরও দুইটি সরস্বতী আছেন, যথা "নীল সরস্বতী" ও "পারিজাত সরস্বতী"। নীল সরস্বতী কালীমূর্ত্তিরই রূপভেদ মাত্র। কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য এবং তান্ত্রিক বর্ণনায় দেবীর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর বাহন কোকিল ধার্য্য হইয়াছে কিনা কে বলিতে পারে। আবার দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে সরস্বতী দেবীর বাহন ময়ূর। সারদা-মঙ্গল (ধূলা-কূট্যা পালা) গ্রন্থের রচনার নমুনা এইরূপ :—

রাজকন্যাগণ কর্ত্তৃক রাত্রি জাগিতে আদিষ্ট হইয়া ধূলাকূটা বলিতেছে—

"শুনিয়া কন্যার কথা কহেন কুঙর।
কেমনে জাগিব আমি থাকি একেশ্বর॥
বসিতে পালঙ্ক দেহ পাটের মশারি।
মশাল জ্বালিয়া দেহ জাগিব সুন্দরী॥
এত শুনি হাসে যত যুবতীর ঘটা।
বামন হৈয়া চান্দ ধরিতে চাহ ধূলাকূটা॥" ইত্যাদি।

—দয়ারামের "সারদা-মঙ্গল"।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অপ্রধান মঙ্গল কাব্য

(পুরুষ-দেবতা)

১। সূর্য্য দেবতা

(সূর্য্য-মঙ্গল)

অবৈষ্ণব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যযুগে ছড়া ও পাঁচালীর আকার ধারণ করিয়াছিল। বৃহদাকার ছড়াগুলির নামই পাঁচালী। পাঁচালীগুলি অবশ্য বহুলোকেব সমাবেশে গীত হইত। পৌরাণিক অনুবাদগ্রন্থগুলি বাদ দিলে এই পাঁচালীগুলির আবার দুইটি উপবিভাগ ছিল। ইহার একভাগ (নায়ক নায়িকার মধ্য দিয়া) স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোককে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া "মঙ্গল-কাব্য" নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং অপরভাগ শিব-দুর্গার কাহিনী অবলম্বনে শুধু স্বর্গলোকের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া "শিবায়ন" নাম গ্রহণ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের প্রধান ভাগ স্ত্রীদেবতা ঘটিত সুতরাং শাক্ত সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের রচনারীতির মূলেই শাক্ত সাহিত্য। শাক্ত সাহিত্য ভিন্ন মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে পুরুষদেবতার অংশও রহিয়াছে। এই দেবতাদের প্রধান দুইজন– সূর্য্য ও ধর্ম্মঠাকুর। ধর্ম্মঠাকুর যদি শিবদেবতার লৌকিক নামান্তর হয়, তবে এই অংশ শিবঠাকুরের সহিত সংযুক্ত বলা যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় নানা লৌকিক দেবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু পঞ্চদেবতার মধ্যে একমাত্র "গণেশ" ভিন্ন আর চারিটী দেবতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন উপলক্ষে সাহিত্যে অন্ততঃ "মঙ্গল" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এইদিক দিয়া "কৃষ্ণ-মঙ্গল" (ভাগবতের অনুবাদ মাধবাচার্য্য) অথবা "চৈতন্য-মঙ্গল" (জয়ানন্দ ও লোচন দাস) নাম দুইটিও উল্লেখযোগ্য। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন সাহিত্যের নামের শেষার্দ্ধে "মঙ্গল" কথাটি জুড়িয়া দিলেই "মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য" হয় না। ইহার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-রীতি স্বতন্ত্র। এইহেতু কৃষ্ণ ও চৈতন্য প্রভুর অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব মহাজনের নামসংযুক্ত তথাকথিত "মঙ্গল"-কাব্য সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত করা গিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্য সাহিত্য নানাস্থানে বৈষ্ণবপ্রভাব বিশিষ্ট হইলেও বিশেষ করিয়া "অবৈষ্ণব" বলা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের প্রধান অংশে

স্ত্রী-দেবতা ও অপ্রধান অংশে পুরুষ-দেবতা। এই পুরুষ-দেবতা সম্বলিত মঙ্গল-কাব্যের অংশও সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল-কাব্যের রচনা-রীতি অনুসরণ করে নাই। এই সাহিত্যের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ মানিয়া না চলিলেও মঙ্গল গান শুনিলে শ্রোতার মঙ্গল হয় এই হিসাবে মধ্যযুগের অবৈষ্ণব বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান ভাগই মঙ্গল-কাব্য বা তাহার অনুসরণকারি কাব্য।

মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের অন্যতম পুরুষ দেবতা "সূর্য্য" খুব প্রাচীন দেবতা। সূর্য্যপূজা যে খৃঃ পূঃ ২২০০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ ভবিষ্য পুরাণে রহিয়াছে। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব সূর্য্যপূজা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং জরথুস্ত্র (পারস্যের প্রাচীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক) সূর্য্য-পূজার বিরোধী ছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে। সূর্য্যপূজক ব্রাহ্মণগণ এই দেশে "মগব্রাহ্মণ" ও "শাকদ্বীপি" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিতি। ইহারা বাহির হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিবে। তবে কোন্ সময়ে এই দেশে ইহাদের প্রথম আগমন হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। সূর্য্য-দেবতার দুইটি প্রাচীন মন্দির ভারতবর্ষে আছে। ইহাদের একটি কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। অপরটি উড়িষ্যার বিখ্যাত কনারকের মন্দির। মার্ত্তণ্ড মন্দিরে মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্য দেবতার পদযুগল আধুনিক একপ্রকার বুটজুতা (Knee-Boots) শোভিত। উহা প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া আছে। এইরূপ জুতা শীতপ্রধান দেশের লোকেরাই পরিধান করে। সুতরাং এই দেবতার আদি উপাসকগণ কোন শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী হইবে। যাহা হউক মগব্রাহ্মণদিগের পিতৃভূমি দুইটি দেশের একটি হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয়—উহা পশ্চিম এশিয়া অথবা মধ্য-এশিয়ার কোন অঞ্চল। ভারতবর্ষে যুগ্ম বৈদিক দেবতা মিত্রাবরুণ। এই "মিত্র" দেবতা কালক্রমে সূর্য্যদেবতা বলিয়া অভিহিত হন এবং "বরুণ" প্রথমে "আকাশ" ও পরে "সমুদ্রের" দেবতা বলিয়া গণ্য হন। এই "মিত্র" দেবতা আবার বাঙ্গালা দেশে ভাষাগত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া "ইতু" নামে পরিচিত হইয়া ব্রতকথার অন্তর্গত হইয়াছেন। "মিত্র" বা সূর্য্যদেবতা বেদে "বিষ্ণু" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আবার এই সূর্য্যদেবতা বোধ হয় কোন সময় বিষ্ণুর অপর অবতার কৃষ্ণের সহিতও অভিন্ন কল্পিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পণ্ডিত মগ-ব্রাহ্মণগণ সেইজন্য নানা-নক্ষত্রবিহারী সূর্য্যদেবতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া থাকিবেন। বহুশত গোপিনীবিহারি শ্রীকৃষ্ণ ও বহুশত নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সূর্য্য তুলনীয় বটে। অনেক গোপিনীর নাম ও নক্ষত্রের নাম এক। ইহাতে সূর্য্য-দেবতার প্রভাব কৃষ্ণ-লীলার উপর পড়িয়াছে মনে

হয় না। বরং ইহাতে সূর্য্যের ছড়ার উপরে কৃষ্ণলীলা কাহিনীর প্রভাব পড়িয়াছে। এইহেতু সূর্য্যোপাসক ও কৃষ্ণায়ন সম্প্রদায়ের নৈকট্য প্রমাণে অনেকে ইচ্ছুক। আবার শৈবগণের সহিতও সূর্য্যদেবতার উপাসকগণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন সূর্য্যের গানে আছে সূর্য্যের স্ত্রী গৌরী, অথচ আমরা জানি মহাদেবের স্ত্রী গৌরী। কোন্ বিস্মৃত যুগে এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত মিলন হইয়াছিল কে বলিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহার প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কাহিনীও সূর্য্য ঠাকুরে আরোপিত হইয়াছে। আবার সূর্য্য ঠাকুর শিব ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়া মথুরায় পূজা পাইতে যাইতেছেন এইরূপ কথাও সূর্য্যের গানে আছে। সম্ভবতঃ সূর্য্যের গানে ইহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-প্রভাব। এই সব খুঁটিনাটি ব্রজলীলার সাধারণ সংস্করণ সুতরাং প্রাচীন নহে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কৃষ্ণলীলার প্রভাব জনসাধারণের মনের মধ্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সূর্য্য ঠাকুরের লৌকিক ছড়াগুলিতে তাহাই প্রমাণিত হয় মাত্র। প্রাচীন সূর্য্য-পূজকগণের সহিত ধর্ম্মপূজক ডোম হাড়িগণের কলহের অনেক বৃত্তান্ত ধর্ম্মমঙ্গল শ্রেণীর কাব্যে আছে। ইহা ছাড়া 'ইতু' পূজা বা ইতুরাল দেবতার পূজা এই বাঙ্গালা দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সূর্য্যব্রতের আর একটি সংস্করণ "মাঘ-মণ্ডলের ব্রত"। এই সব ব্রত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা পালন করিয়া থাকেন।

বরিশাল ফুল্লশ্রী গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন সূর্য্যের গানের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে বালিকা কন্যা গৌরীকে সূর্য্য ঠাকুরের বিবাহ ও গৌরীর জন্য তাহার পিতৃকুলের দুঃখ প্রকাশ, গৌরীকে সূর্য্য ঠাকুরের নৌকা-পথে যাইতে যাইতে বুঝাইবার চেষ্টা প্রভৃতি আছে।

(১) "সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ ?
সূর্য্য ওঠে আগুন-বর্ণ ॥
সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ ?
সূর্য্য ওঠে রক্তবর্ণ ॥
সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ ?
সূর্য্য ওঠে তাম্বুল বর্ণ ॥"

—সূর্য্যের গান।

(২) গৌরীর সহিত সূর্য্যের বাক্যালাপ :—

"তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি কাপড়ের দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু ॥

তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি শাঙ্খারী বসামু॥
তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি সিন্দুরের দুঃখ পামু।
নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু॥" ইত্যাদি।

—সূর্য্যের গান।

(৩) বালিকা বধূ গৌরীর শ্বশুর-গৃহে যাত্রার করুণ দৃশ্য :—

"ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই আমি মায়ের কাঁদন শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই ভাইয়ের কাঁদন শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই বুইনের কাঁদন শুনি॥"

—সূর্য্যের গান।

এইতো গেল সূর্য্যঠাকুরের নামে রচিত ছড়ার কথা। এখন, এই দেবতার নামে মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে বিশেষ ভাবে রামজীবন বিদ্যাভূষণ রচিত "আদিত্য-চরিত" নামক সূর্য্যমঙ্গলের নাম করিতে হয়। রামজীবন বিদ্যাভূষণ একখানি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন। কবি রাম-জীবনের "আদিত্য-চরিত" গ্রন্থখানি বেশ বৃহৎ এবং ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চণ্ডী-কাব্য রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রায় একশত বৎসর পরে ইহা রচিত হয়। এই গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য সংবাদ সূর্য্যপূজক গ্রহবিপ্রগণের সহিত ধর্ম্মপূজক হাড়িদের কলহ এবং এই উপলক্ষে গ্রহবিপ্রগণের হাড়িদের প্রতি অত্যাচার। এই কলহের উল্লেখ রামাই পণ্ডিতও তাঁহার "ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি"তে করিয়াছেন। এই সূত্রে ধর্ম্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের প্রতীক কল্পনা না করাই সঙ্গত। সূর্য্য-মঙ্গল বা সূর্য্যের পাঁচালীর অপর কবি দ্বিজ কালিদাস। কবি দ্বিজ কালিদাস ও তাঁহার রচিত সূর্য্য-মঙ্গলের সময় জানা যায়। এই কবি কালিদাস কবি রামজীবনের কিছু পূর্ব্বের অথবা সমসাময়িক ব্যক্তিও হইতে পারেন। বঙ্গের নানাস্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গে, সূর্য্য-দেবতার অনেক প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কোন সময়ে এই দেশে সূর্য্যপূজার প্রসার প্রমাণিত করে।

শনি দেবতা

(২) শনির পাঁচালী

শনি পূজার আড়ম্বর শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ বা আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ বিশেষ-রূপে করিয়া থাকেন। গ্রহপূজক এই ব্রাহ্মণগণই সম্ভবতঃ সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহপূজার প্রচলন করিতে গিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী গ্রহ শনিদেবতার দিকে মনোনিবেশ করেন। শনিদেবতার কোপে পড়িলে যে মানুষের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহার একাধিক গল্প শনির পাঁচালীতে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প মহাভারতের "শ্রীবৎস চিন্তা" উপাখ্যান। মূল মহা-ভারতে ইহা নাই। গল্পটি প্রক্ষিপ্ত ভাবে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা শনির পাঁচালীতে "শ্রীবৎসচিন্তার" গল্পটি পরবর্ত্তীকালে গৃহীত হইয়াছে।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই জাতীয় গল্পগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্ব্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্য-পূর্ণিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সেগুলিতে উদ্গম আছে, বিকাশ নাই। আকারে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত ধাতুখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ১১১, ষষ্ঠ সংস্করণ)। শনির পাঁচালির কবি বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামেই দুই একজন খুঁজিলে পাওয়া যায়। সুতরাং এই সংক্রান্ত কোন বিশেষ কবির নাম উল্লেখ করা গেল না।

সত্যনারায়ণ দেবতা

(৩) সত্যনারায়ণের পাঁচালী

সত্যনারায়ণ দেবতা শনি দেবতার ন্যায় বাঙ্গালার হিন্দু গৃহে অতি প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সর্ব্বদাই দেখা যায়

শনি-পূজা দিবার সময়ে সত্যনারায়ণ-পূজাও দেওয়া হয়। এইজন্য সোজা কথায় শনি-সত্যনারায়ণের পূজা কথাটি চলিয়া আসিতেছে। এই সত্যনারায়ণ দেবতারও অন্যান্য দেবতার ন্যায় ভক্তিহীনের প্রতি কোপ ও ভক্তের প্রতি কৃপার কাহিনী বর্ণিত হইয়া থাকে। শনি দেবতার ভক্ত কবিগণের ন্যায় সত্যনারায়ণ দেবতার ভক্ত কবির সংখ্যাও কম নাই। এই কবিগণের নাম উল্লেখ ও সংখ্যা নির্দ্দেশ সহজ কথা নহে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কবিচন্দ্র নামে কোন ব্যক্তি (সম্ভবতঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র বা নিধিরাম) একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ধর্ম্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ঘনরামও (জন্ম ১৬৬৯ খৃঃ) একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন।[১] সত্যনারায়ণ সংক্রান্ত দুইজন কবি ও তাঁহাদের যুগ্মপ্রচেষ্টার ফলস্বরূপ একখানি পুথির উল্লেখ করা আবশ্যক। এই কবিদ্বয় জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এবং তাঁহাদের পাঁচালীর নাম "হরিলীলা"। অন্নদামঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র প্রথম বয়সে দুইখানি "সত্যনারায়ণের পাঁচালী" রচনা করিয়াছিলেন।

"হরি-লীলা"[২] সত্যনারায়ণের পাঁচালী কিন্তু রচনা-রীতিতে এই জাতীয় কাব্য হইতে বেশ পৃথক। "হরি-লীলাতে" জয়নারায়ণ-রচিত অংশ অপেক্ষা আনন্দময়ী-রচিত অংশে সংস্কৃতজ্ঞানের প্রচুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কি ছন্দ, কি শব্দসম্পদ, কি বর্ণনারীতি, সব দিকেই এই কাব্যটি নানাস্থানে অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে সংস্কৃত-ঘেষা হইয়া পড়িয়াছে। তবুও এই গ্রন্থখানিতে জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী যথেষ্ট কবিত্বশক্তির এবং স্বাভাবিক বর্ণনার পরিচয়ও দিয়াছেন।

"চন্দ্রভাণ করযুগ ধরি সুনেত্রার।
'যাই' বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥
উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাণ।
সজল নয়নে ধনি পাছেতে পয়াণ॥
যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া।
সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥

---

(১) লং সাহেবের ক্যাটালগে জগন্নাথ মল্লিক ও রামেশ্বর আচার্য্য রচিত দুইটি সত্যনারায়ণের পুথির উল্লেখ আছে। কবিদ্বয়ের সময় লেখা নাই।

(২) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত "হরিলীলার" ভূমিকা এবং Foik Lit. of Bengal (D, C. Sen) দ্রষ্টব্য।

নিশিভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল।
রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল।"
—জয়নারায়ণের "হরি-লীলা"।

উল্লিখিত ছত্রগুলি বেশ মধুর কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি সংস্কৃতকে অস্বাভাবিকভাবে অনুকরণ করার ফলে বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। যথা,—

"হের চৌদিকে কামিনী লক্ষেলক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ও রূপে মজন্তি।
হসন্তি, খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥" ইত্যাদি।
—জয়নারায়ণের "হরি-লীলা"।

সত্যপীর দেবতা

(৪) সত্যপীরের পাঁচালী

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঐক্যের ফলে "সত্যপীর" দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল। সত্যনারায়ণ দেবতাই এই সত্যপীর দেবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণের "সত্য" ও মুসলমান সাধু বা "পীর" এই দুইটি কথার সম্মিলনে "সত্যপীর" কথাটি আসিয়াছে। মুসলমানগণ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করিবার পর সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর সমগ্র বাঙ্গালা জয় করিবার উপলক্ষে হিন্দুগণের সহিত যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহার কালিমাময় ইতিহাস আলোচনার স্থান এই গ্রন্থে নাই। কিন্তু একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। মুসলমানগণ ভারতবর্ষকে, তথা বাঙ্গালা দেশকে, তাহাদের মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের কিয়দংশ এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এবং বৃহদংশ হিন্দু হইতে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ হিন্দুগণের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছিল। অপরিচিত হিন্দুগণকে অবিশ্বাস করা অথবা তাহাদের সহিত কলহ করা অপেক্ষা পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন প্রতিবেশী হিসাবে বাস করাই তাহারা অধিক শ্রেয় ও সুবিধাজনক মনে করিয়াছিল। রাজকার্য্যে কর আদায় ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুগণের সহায়তা মূল্যবান বিবেচিত হইত। ছলে বলে কৌশলে বাঙ্গালা জয় করিয়া অবশেষে মুসলমানগণ এই দেশের হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। প্রাচীনকালে গ্রীকদিগকে জয় করিয়া রোমকদিগের অবস্থাও অনুরূপ হইয়াছিল। ক্রমে হিন্দুগণও মুসলমান সংস্কৃতির কিছু অংশ নিজ

সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশের চিহ্ন খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মুকুন্দরাম হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত নানা কবির কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান পীর ও ফকিরের প্রতি হিন্দুগণের শ্রদ্ধা এবং সিন্নি দেওয়ারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। অপরপক্ষে হিন্দু দেবতা কালীর প্রতি বহু মুসলমানের বিশেষ শ্রদ্ধার প্রমাণ শুধু বাঙ্গালা কেন সারা ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়।[১] বাঙ্গালার শীতলা-দেবীও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হন। এই সম্বন্ধে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের ঢাকার জনৈক জমিদার গরীব হোসেন চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীর পাঁচালী গায়কগণ তো সবই মুসলমান। অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত ও পদ্য লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজে জনৈক মুসলমান "যবন হরিদাস" নামে খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং কতিপয় পাঠান বৈষ্ণবের কথা বিজুলি খানের বৃত্তান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ের ঘটনা এবং চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মুসলমান কবি আলোয়াল সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পরের সম্প্রীতির ফল স্বরূপ "সত্যপীর" দেবতার পূজা প্রবর্ত্তনের সহিত গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহের নাম সংযুক্ত করিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কথিত হয়, হুসেন সাহের এক কন্যার গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর বাঙ্গালার পাঠান সুলতান হুসেন সাহ হিন্দুসাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়েরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালা দেশে সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই সম্প্রীতির সাহায্য করিতে উভয় সমাজে গ্রহণীয় সত্যপীর দেবতার উদ্ভব হয় এবং এই দেবতার প্রচার করিলেন সুলতান হুসেন সাহ। ইহা অসম্ভব নহে। নায়েক মায়াজী গাজী লিখিত "সত্যপীরের" পাঁচালীতে এই মত ব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় "সত্যনারায়ণ"

(১) ত্রিপুরার জমিদার মির্জা হোসেন আলি (একশত বৎসর পূর্ব্বে) ও ত্রিপুরার রাজধানী অধিকারকারী মনসের গাজীর নাম এই উপলক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দুগণের মুসলমান প্রীতি ও মুসলমান সমাজের হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্য প্রীতির পরিচয় জ্ঞাপক অনেক মূল্যবান তথ্যের ইঙ্গিত মৎ প্রণীত Aspects of Bengali Society, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং History of Bengali Lang and Lit. (D. C. Sen). বৃহৎ বঙ্গ (D. C. Sen) এবং Rev. Longএর Cataloguea প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ও "সত্যপীর" দেবতারা পৃথক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু উড়িষ্যায় এই দুই দেবতা অভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন।

সত্যপীর দেবতা সম্বন্ধে অনেক কবির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতিপয় কবির নাম উল্লিখিত হইল।

(১) কবি ফকিরচাঁদ রচিত "সত্যপীরের পাঁচালী।" কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পুথি রচনার সময় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ।

(২) কবি রামানন্দ রচিত "সত্যপীর"। এই কবির সময় জানা নাই।

(৩) কবি শঙ্করাচার্য্য রচিত (১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ) ও ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত "সত্যপীর নামক পুথি"। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা। এই গ্রন্থখানি সুবৃহৎ এবং ১৫শ অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৪) শিবায়নের প্রসিদ্ধ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য একখানি "সত্যপীরের কথা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম।
সাকিন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥"

—রামেশ্বরের "সত্যপীরের কথা"।

কবির সময় খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

"সত্যপীর" পাঁচালীর ভাষা সাধারণতঃ উর্দ্দু মিশ্রিত। মুসলমান প্রভাবই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই।

ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায় ও সোণা রায়

(৫) রায়-মঙ্গল

"রায়-মঙ্গল" ব্যাঘ্রের দেবতার নামে রচিত ছড়া। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীনকালে নানাস্থানে বন-জঙ্গলের আধিক্য নিবন্ধন ব্যাঘ্র-ভীতি খুব অধিক ছিল। চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু তো ব্যাঘ্রের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করিয়া তবে গুজরাট স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। সর্প-ভীতির ন্যায় ব্যাঘ্র-ভীতিও পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কৃষকসম্প্রদায়কে অল্প বিব্রত করে নাই। সুতরাং সর্পের দেবতার ন্যায় ব্যাঘ্রের একটি দেবতাও যে পরিকল্পিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সর্পের প্রতি সর্ব্বব্যাপি ভীতি, বাঙ্গালার প্রাচীন ঐতিহ্য, কোন কোন জাতির সর্প-পূজাপ্রিয়তা ও অন্যান্য কতকগুলি কারণ-পরম্পরা সর্পদেবীর গুণ-কীর্ত্তনকারী কবির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল ব্যাঘ্রের দেবতার দিকে কবির সংখ্যা তত অধিক হয় নাই। এই হেতু "মনসা-মঙ্গল"

একটি বিরাট সাহিত্যে পরিণতি লাভ করিবার সুযোগ পাইল আর "রায়-মঙ্গল" নামমাত্র ছড়ায় পর্য্যবসিত হইয়া শুধু নামের দিকেই "মঙ্গল" আখ্যা ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইল। মঙ্গলকাব্য রচনা-রীতির আদর্শ "রায়-মঙ্গলে" পাইবার সম্ভাবনা নাই।

"রায়-মঙ্গলে"র দেবতা হিসাবে সাধারণতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের "দক্ষিণরায়"কে নির্দ্দেশ করিলেও বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক ব্যাঘ্রের দেবতা ছিলেন। ব্যাঘ্রের দেবতাদের মধ্যে দক্ষিণ-বঙ্গের দক্ষিণ রায়, উত্তর-বঙ্গের (রঙ্গপুর ও পাবনা অঞ্চলে) সোণা রায় (ও তাঁহার ভ্রাতা রূপা রায়), পূর্ব্ব-বঙ্গের (ময়মনসিংহ অঞ্চলে) "বাঘাই" এবং বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে কালু রায় নামক দেবতাগণের বিশেষ প্রসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবতাগণ সকলেই নর-দেবতার মধ্যে গণ্য, সুতরাং প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের দেবতা নহেন।

দক্ষিণ রায়—সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ রায় নামক ব্যাঘ্রের দেবতার খ্যাতি রায়মঙ্গলের অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা কিছু অধিক মনে হয়। দক্ষিণ রায়ের গল্পের প্রথম কবি নিমতার অধিবাসী কবি কৃষ্ণরামের মতে মাধবাচার্য্য। আমরা দুইটি খ্যাতনামা মাধবাচার্য্যকে জানি—তন্মধ্যে একজন (খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ) মহাপ্রভুর শ্যালক ভাগবতকার মাধবাচার্য্য, অপর জন (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাধবাচার্য্য, (মুকুন্দরামের সমসাময়িক)। বৈষ্ণব মাধবাচার্য্য না হইয়া শাক্ত মাধবাচার্য্যই হয়ত রায়-মঙ্গলের প্রথম কবি হইতে পারেন। এই দুই মাধবাচার্য্য ভিন্ন অন্য কোন খ্যাতনামা মাধবাচার্য্যকে আমরা জানি না। দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে রায়-মঙ্গলের দ্বিতীয় কবি কৃষ্ণরাম (খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ)। কৃষ্ণরাম প্রণীত রায়মঙ্গলে তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিবার হেতু ও প্রথম কবি সম্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তি আছে। সেই যুগে এইরূপ গ্রন্থোৎপত্তির অলৌকিক কারণ প্রদর্শন প্রায় প্রাচীন কবির পুথিতেই পাওয়া যায়।

"শুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
যে মতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্তা তথায় একতরা বিখ্যাত॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে॥

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার ॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য্য ॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
মসান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা ॥"

—"রায়-মঙ্গল", কৃষ্ণরাম।

কৃষ্ণরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবির নিন্দায় বিজয় গুপ্তকে (মনসা-মঙ্গলের কবি) আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সোণা রায়[১]—

দক্ষিণ রায় যেরূপ দক্ষিণ-বঙ্গ বা ভাটির দেশের ব্যাঘ্র-দেবতা, সোণা রায় সেরূপ উত্তর-বঙ্গ এবং বিশেষ করিয়া রঙ্গপুর অঞ্চলের ব্যাঘ্র-দেবতা। সোণা রায়ের নামে উত্তর-বঙ্গ প্রচলিত ছড়ায় ধর্ম্ম-ঠাকুরের উল্লেখ আছে। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ এই ধর্ম্মঠাকুর উপলক্ষে রচিত। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ সাস্ত্রী ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রবীণ সাহিত্যিকগণ এই ধর্ম্মঠাকুরকে বুদ্ধের লৌকিক সংস্করণ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা এই মত গ্রহণ করিতে অক্ষম। বরং সোণা রায়ের ছড়ায় ধর্ম্মঠাকুরকে স্পষ্ট শিবঠাকুর বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই দেবতাকে বৈষ্ণব প্রভাব বশতঃ নারায়ণের সহিতও অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে। বৃন্দাবনে গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাহার পর হইতে এই গোপকুল এতদ্দেশীয় যে কোন অতিমানব অথবা অবতারকে স্বীয় অলৌকিক কার্য্যকলাপ প্রদর্শনে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে।

১। "সোণা রায়" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র রচিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Journal of Letters Vol. VIII) প্রকাশিত On the cult of Sona Ray প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগে রচিত "ডাকের বচন" নামক ছড়ার ডাককে "ডাক গোয়ালা" বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাঘ্রের দেবতা সোণা রায়ও নন্দ নামক জনৈক গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহা অতিমানব বা দেবতার পক্ষে খুব স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

সোণা রায়ের ছড়া এইরূপ :—

(ক) সোণা রায়ের জন্ম—

"ঠাকুর সোণা রায় রূপা রায়ের ভাই।
বাঘের পৃষ্ঠে চড়িয়া মইসের দুগ্ধ খায়॥
যে হাটে গোয়ালার মাইয়া দধি নিয়া যায়।
আটকুড়া বলিয়া দধি কিনিয়া না খায়॥
যে নদীত গোয়ালার মাইয়া ছান করিতে যায়।
আটকুড়া বলিয়া জল ধেনুতে না খায়॥
যে গাছের তলেতে নন্দ বসিয়া দাঁড়ায়।
আটকুড়া বলিয়া পাখী ভাবা না করয়॥

*   *   *   *

এক পাখী ডাকিয়া বোলে আর পাখী ভাই।
ছাড়রে গাছের মায়া অন্য দেশে যাই॥
পাখীর মুখেতে নন্দ এতেক শুনিল।
বিষাদ ভাবিয়া নন্দ কান্দিতে লাগিল॥
নন্দরাণী বোলে প্রভু কান্দ কি কারণ।
ধর্ম্মের সেবা করিতে লাগে কতক্ষণ॥
মুই যদি গোয়ালার মেয়ে এনাম ধরায়োঁ।
ধরমের সেবা করি পুত্রবর নেয়োঁ॥

*   *   *   *

একত্র মাথার কেশ দুই অদ্ধ করিয়া।
ধরমের সেবা করে দুই হাঁটু পাতিয়া॥
দে দেঁ ধরমঠাকুর দে ধর্ম্ম বর।
যদি তুই ধরমঠাকুর না দিস্ পুত্রবর।
স্ত্রীবধ হইব কাটারী করি ভর॥

নানা পুষ্প দিয়া পুজে নাহি লেখাজোখা।
গোয়ালিনীর সেবাতে ধর্ম্ম দিলেন দেখা॥
এগো এগো গোয়ালিনী তোকে দেই বর।
তোকে বর দিয়া জামো মুই কৈলাস শিখর॥" ইত্যাদি।

—সোণা রায়ের ছড়া।

(খ) সাধুবেশী সোণা রায়ের ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারী মোগল সৈন্য বধ—

"দিবা অবসান হইয়া নিশাভাগ হইল।
মধ্যরাত্রে সাধুর পায়ে জোড়া কুন্দা দিল॥
কুন্দাতে থাকিয়া ঠাকুর ছাড়িল হুঙ্কার।
ত্রিশ কোটী বাঘ আনি হইল আগুসার॥
উট উট অহে প্রভু স্থির কর মন।
বাঘজাতি আমাদিগে ডাক্‌ছেন কি কারণ॥
আইস আইস বাঘগণ আমার হুকুম লও।
মগলের সেনাপতিক মারিয়া যে যাও॥
বড় মগলক মারেক তুই ধরি হাতোহাত।
ছোট মগল মারেক তুই আছাড়ি পর্ব্বত॥" ইত্যাদি।

সোণা রায়ের ছড়া।

এই সব দেবতার সংখ্যা পল্লীগ্রামে কত তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। নানা ব্যাধি উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছিল তন্মধ্যে শীতলা দেবী ভিন্ন আরও দুইটি দেবতার নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের একজন জ্বরের দেবতা "জ্বরাসুর", অপরজন বিস্ফোটকের দেবতা "ঘণ্টাকর্ণ" (ঘেঁটু)। "জ্বরাসুর" ঠিক দেবতা পরিকল্পিত না হইয়া অসুরের শ্রেণীতে পড়িয়াছেন এবং এতৎসত্ত্বেও সম্ভ্রমের পাত্র হইয়াছেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

(ক) ধর্ম্ম-মঙ্গল

ধর্ম্মঠাকুরের নামে যে মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হইয়াছিল তাহার সাধারণ নাম "ধর্ম্ম-মঙ্গল" কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যের কবিও অনেক। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যসমূহ আলোচনা করিতে গেলে কতকগুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ এই ধর্ম্মঠাকুর দেবতার স্বরূপ কি? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নানা প্রমাণ সাহায্যে ধর্ম্মঠাকুরের সহিত বুদ্ধদেবের সংশ্রব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমনকি এই দেবতাকে বৌদ্ধদের দেবতা (সংগুপ্ত বুদ্ধ) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতৎ-সম্পর্কে শূন্যপুরাণের কতিপয় উক্তি, যথা "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" ও "সিংহলে ধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান", "সদ্ধর্ম্মী", "শূন্যবাদ" প্রভৃতি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় এই বৌদ্ধগন্ধী কথাগুলি বৌদ্ধপ্রভাবের দ্যোতক মাত্র অথবা পরবর্ত্তী যোজনা সুতরাং তত গ্রাহ্য নহে। তাহার পর বৌদ্ধ ত্রিশরণের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) মধ্যে ধর্ম্মই বুদ্ধের পরিবর্ত্তে শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর এবং "শঙ্খ-পাবনের" "শঙ্খ" সঙ্ঘেরই রূপান্তর চিন্তা করা অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস মনে করা যাইতে পারে। ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় সমস্ত শ্বেত দ্রব্যের প্রাধান্যও নাকি ধর্ম্মঠাকুরের বুদ্ধত্বের আর এক প্রমাণ। বৌদ্ধদের একমাত্র শ্বেতহস্তী ভিন্ন শ্বেতবর্ণের প্রতি আর কোন অনুরক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। "চূণ" বৌদ্ধদের পূজার কিরূপ অঙ্গ জানি না এবং হিন্দুদের দেবদেবীর পূজায় চূণের ব্যবহার না থাকিতে পারে কিন্তু ইহা বুদ্ধত্বের লক্ষণে কতটা সাহায্য করে চিন্তার বিষয়। বুদ্ধের বাণী "অহিংসা" ও "জীবে দয়া"। এমতাবস্থায় সাদা পাঁঠা কিম্বা অন্য কোন শ্বেতবর্ণের প্রাণীকে ধর্ম্মঠাকুরের কাছে বলি দিলে এই দেবতাকে আর বৌদ্ধদের দাবী করা চলে না। অপরপক্ষে শিবঠাকুরের সহিত এই ধর্ম্মঠাকুরের অভিন্নত্ব কল্পনা করিলে ক্ষতি কি? শ্বেতবর্ণ তো শিব দেবতারই বর্ণ এবং এই দেবতার পারিপার্শ্বিক অনেক ব্যাপারই তো শ্বেতবর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট। বলি প্রথা কতকটা জাতিগত রুচির উপর নির্ভর করে বলিয়া শিব দেবতার নিকট যে কোন কোন স্থানে বলি দেওয়া হয় ইহা হাণ্টার সাহেব তাঁহার Annals of Rural Bengalএ প্রমাণিত করিয়াছেন। এই জাতিগত রুচি আজ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ কোন পূজায় বলির প্রচলন করে নাই। পূজার দিকে ইহা বুদ্ধদেবের বাণীর সাফল্য

প্রমাণিত করে। বাঁকুড়া জেলাতে বিশেষরূপ চর্ম্ম রোগের আধিক্য লক্ষিত হয়। শ্বেতবর্ণের শিবঠাকুর "শ্বেতি"সহ নানারূপ চর্ম্মরোগের আরোগ্যকারী দেবতা হইতে পারেন। এই শিবঠাকুর রাঢ়ের ও পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীগুলির নিকট চর্ম্মরোগ আরোগ্যকারী ও পুত্রসন্তান দানকারী দেবতা ধর্ম্মঠাকুররূপে পরিচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দেশে প্রাচীন কালে শিবঠাকুরের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। চর্য্যাপদে শৈবপ্রভাব, মালদহ অঞ্চলের গম্ভীরা গান, শিবের গাজন ও সন্ন্যাস এবং রঞ্জাবতীর "শালে ভর" প্রভৃতি তান্ত্রিক আচার, ধর্ম্মঠাকুরকে শিবের সহিত অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে সাহায্য করে। কালক্রমে ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে নানা ধর্ম্মের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছাপ বেশী পড়িয়াছিল। সেইজন্য ধর্ম্ম নামক দেবতাটিকে কবিগণ কখনও কৈলাসে এবং কখনও বৈকুণ্ঠে স্থাপিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গল-গুলিতে ধর্ম্মঠাকুর একেবারে বিষ্ণুর অবতার হইয়া পড়িয়াছেন। বাঘের দেবতা সোণা রায়ের পাঁচালীতে ধর্ম্মঠাকুরকে স্পষ্ট শিব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইদিক দিয়া চর্য্যাপদ, নাথপন্থী সাহিত্য, শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য, শিবায়ন প্রভৃতি সবই শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। অবৈষ্ণব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এই হিসাবে প্রধানতঃ শৈব ও শাক্ত সাহিত্য। বাহ্যিক নানা বিষয় নিয়া বিচার না করিয়া ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলির মূল সুর নিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় এইগুলি বৌদ্ধ সাহিত্য নহে, হিন্দু সাহিত্য। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বত্র শুধু বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হয়।

সূর্য্যঠাকুরও অপর প্রাচীন দেবতা। এই দেবতার পূজকগণ এই দেশে আগমন করিয়া হাড়ি ও ডোমদের ধর্ম্মঠাকুর পূজায় বাধা সৃষ্টি করে এবং তাহার আভাষ শূন্যপুরাণে আছে। ধর্ম্ম-মঙ্গলে বর্ণিত হাকণ্ডে লাউসেন কর্ত্তৃক পশ্চিমে সূর্য্যোদয় কাহিনী ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং সম্ভবতঃ গ্রহাচার্য্যগণকে অপমানিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ সূর্য্যকে ধর্ম্মঠাকুরের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন। তাহা ঠিক মনে হয় না।

ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে রচিত পুথিগুলির মধ্যে রামাই পণ্ডিত রচিত "ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি" বা "শূন্যপুরাণ" নামক পুথি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই পুথি তিনখানা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং)। উহার একটিতে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অংশটি পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্ম-মঙ্গলের অন্যতম কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রচিত ও যোজিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "যদিও শূন্যপুরাণের অনেক স্থলে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় "দ্বিজ" শব্দ উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু এই পরিচয়ে আস্থাবান হইয়াছেন তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটি নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ অনেক কথা আছে যাহাতে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকেই সন্দেহার্হ করিয়াছেন—" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং. ৪৮ ৪৯ পৃঃ)। যে শূন্যপুরাণ-গুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আসল গ্রন্থ অবশ্য পাইবার উপায় নাই।

ময়ূর ভট্ট ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি লেখক বলিয়া পরিচিত। তিনি কোন্ সময়ের ব্যক্তি তাহা জানা যায় নাই এবং তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দিহান। এই কবির সম্পূর্ণ পুথিও পাওয়া যায় নাই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ময়ূর ভট্ট মুসলমান বিজয়ের কিছু পূর্ব্বে ও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং এই কবির পুথির নাম "হাকণ্ড পুরাণ"। নগেন্দ্রবাবুর মতে এই "হাকণ্ড-পুরাণ" রামাই পণ্ডিতের রচিত। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "হাকণ্ড-পুরাণে" লাউসেনের কাহিনী আছে এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে লাউসেনের কাহিনী নাই, লুইচন্দ্রের কাহিনী আছে। সুতরাং "হাকণ্ড-পুরাণ" ময়ূর ভট্টেরই রচিত, রামাই পণ্ডিতের নহে। আমরাও এই বিষয়ে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত একমত।

ধর্ম্মঠাকুরের স্তুতিবাচক গ্রন্থ "ধর্ম্ম-মঙ্গল" হইলেও পূজা-পদ্ধতির পুথি "ধর্ম্ম-পূজা-পদ্ধতি" বা "শূন্যপুরাণ" (রামাই পণ্ডিত রচিত) ধর্ম্ম-মঙ্গলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের অস্তিত্ব পুরাতন হওয়াই সম্ভব। এই দেবতার অস্তিত্ব খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে কি তাহারও পূর্ব্বে এবং গুপ্ত যুগের অবসানের পর থাকিতে পারে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং বঙ্গে খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে শিবঠাকুরকে বৌদ্ধগন্ধী ধর্ম্ম ঠাকুরে পরিণত করিয়াছিল কি না বলা যায় না। "যত্র জীব তত্র শিব" কথাটির আদর্শে বিশেষ শিলাখণ্ড ও নানা জন্তু-জানোয়ার (বিশেষতঃ কূর্ম্ম[১]) ধর্ম্ম-ঠাকুরের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া কোন বিশেষ গুণের নামে অথবা বিশেষ ভক্তের নামেও ধর্ম্মঠাকুর আখ্যাত হইয়া থাকিতে পারেন। ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপ্রবর্তনের কত পরে রামাই পণ্ডিতের এই পূজার পদ্ধতি রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি বা শূন্যপুরাণ এবং

---

(১) ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে কেহ কেহ "কূর্ম্ম" শব্দ হইতে "ধর্ম্ম" শব্দ নিষ্পন্ন করেন।

ইহার রচয়িতা রামাই পণ্ডিত যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। রামাই পণ্ডিত ও তাঁহার রচিত শূন্যপুরাণ নিয়া সময় সম্পর্কে মতভেদ আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শূন্যপুরাণকে খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের গ্রন্থ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গলে উক্ত হইয়াছে যে রামাই পণ্ডিত গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। এই ধর্ম্মপালকে বসু মহাশয় গৌড়ের পালবংশীয় দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল মনে করিয়াছেন এবং দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলের সময়কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা জানি গৌড়ের পালরাজবংশে নানা নূতন নামের ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তবুও বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের অভিমত অনুযায়ী পালরাজ বংশে ধর্ম্মপাল দুইজন ছিলেন না, একজনই ছিলেন। যথা—

গোপাল (খৃঃ ৮ম শতাব্দী)
|
ধর্ম্মপাল (খৃঃ ৮ম—৯ম শতাব্দী)
|
দেবপাল (খৃঃ ৮৫৪ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপির শেষ তারিখ।)
|
বিগ্রহপাল (শূরপাল ১ম)
|
নারায়ণ পাল
|
রাজ্যপাল
|
দ্বিতীয় গোপাল
|
দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল
|
মহিপাল ১ম*
|
নয়পাল
|
তৃতীয় বিগ্রহ পাল
|
তিন ভ্রাতা = { দ্বিতীয় মহিপাল | দ্বিতীয় শূরপাল | রামপাল }
|
কুমারপাল (পুত্র)
|
তৃতীয় গোপাল (পুত্র)
|
মদনপাল (রামপালের পুত্র)
|
গোবিন্দপাল
|
পলপাল (শেষ পাল রাজা—মুসলমান আক্রমণ।)
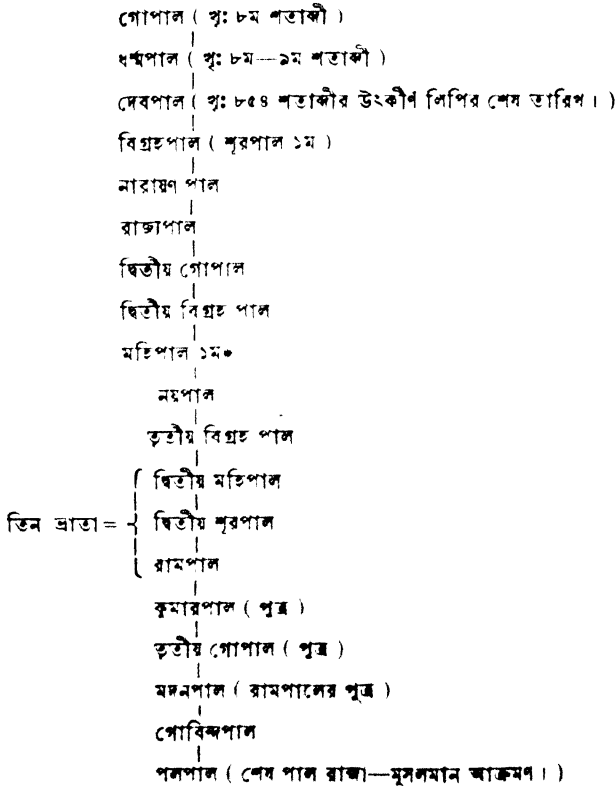
* খৃঃ ১০ম শতাব্দীর শেষ ও খৃঃ ১১শ শতাব্দীর মধ্যপাদ। এই সময় রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গালা আক্রমণ ও দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্ব উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ের সিংহাসনে পালবংশীয় একজন ধর্ম্মপাল থাকিলেও নানা স্থানের কতিপয় ধর্ম্মপালের মধ্যে অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য আর একটি ধর্ম্মপালের খবর পাওয়া গিয়াছে। ইনি কাম্বোজবংশীয় ধর্ম্মপাল এবং দণ্ডভুক্তির বা দক্ষিণ মেদিনীপুর ও বালেশ্বর অঞ্চলের রাজা। এই ধর্ম্মপাল রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক। রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালার যে রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তৎখোদিত তিরুমলয়ের শিলালিপি পাঠে (খৃঃ ১০১২) জানা যায়, তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ের রণশূর, দণ্ডভুক্তির (রাঢ়ের দক্ষিণ সীমান্তের) ধর্ম্মপাল, বরেন্দ্ররাজ্যের জনৈকরাজা মহীপাল ও বঙ্গদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গালাদেশে এতগুলি রাজার অস্তিত্ব তৎসময়ের কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্ব্বলতাই সূচিত করে। এই দুঃসময়ে দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের পরে কিছুকাল গৌড়ের সিংহাসনও অধিকার করিতে পারেন। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্ম-মঙ্গল এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-মঙ্গলে বর্ণিত ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর (উপাধি নহে—নাম) বোধ হয় দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপালের পুত্র, কারণ পালবংশের ধর্ম্মপালের পুত্রের নাম দেবপাল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপি অনুসারে দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল, গৌড়ের রাজা মহিপাল ও রাজা রাজেন্দ্র চোল সমসাময়িক। সুতরাং আমরা মনে করি রামাই পণ্ডিত এই দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপালেরই সমসাময়িক। রামাই পণ্ডিত পালবংশীয় প্রথম ধর্ম্মপাল বলিয়া অনুমিত রাজার (খৃঃ ৮ম—৯ম শতাব্দী) সমসাময়িক হইতে পারেন না। রামাই পণ্ডিতের স্বদেশ বিবেচনা করিলে উহা দণ্ডভুক্তিরই নিকটবর্ত্তী, গৌড়ের নহে, এবং ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি পালবংশীয় ধর্ম্মপালের সময়ে রচিত হইলে, উহা পালরাজবংশের বিশেষ গৌরবময় যুগ বলিয়া, পুথিতে তাহারও কিছু ছাপ থাকিত। ইহা ছাড়া পুথিতে ধর্ম্মপালের পুত্র সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর দেবপালের নামের স্থানে "গৌড়েশ্বর" নামটিই শুধু বারবার উল্লিখিত হইত না।

ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনকে কেহ কেহ দেবপালের সমসাময়িক মনে করিয়াছেন। ইহাও ঠিক বোধ হয় না, কারণ পালবংশীয় দেবপালের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল এবং তৎকর্ত্তৃক নানা দেশ জয় ও তাঁহার নানা মন্ত্রী ও যোদ্ধার বৃত্তান্ত উৎকীর্ণ লিপিসমূহে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের নামোল্লেখের সঙ্গে লাউসেনের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় লাউসেন দেবপালের সময়কার নহেন। তাহা হইলে লাউসেনের নামও অপরাপরের ন্যায় উৎকীর্ণ লিপিগুলির মধ্যে পাওয়া যাইত। তবে, এই

লাউসেন কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন? তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব হাণ্টার সাহেবপ্রমুখ অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলির বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিলে লাউসেন রাজা গৌড়েশ্বরের সমসাময়িক এবং তিনি সম্ভবতঃ পালবংশীয় নয়পালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। গৌড়েশ্বর রাজত্ব করিতেন গৌড়নগরে, এবং নিকটবর্ত্তী "রমতি"তে দুর্ব্বল রাজা নয়পালের বংশধরগণ পরবর্ত্তী সময়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া থাকিবেন। খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রথমে পালবংশীয় রাজা রামপাল গৌড় বা ইহার অংশ এই রমতী নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। রামপালের পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনে রমতির উল্লেখ আছে। রাজা গৌড়েশ্বরের যে ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা ধর্ম্ম-মঙ্গলের কাহিনীতে আছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। উহার অর্দ্ধেক অংশ রাজোচিত সাধারণ জাক-জমকের বর্ণনা ও কবির অতিশয়োক্তি বলা চলে। সত্যের অংশ বিচার করিয়া দেখিলে রাজা গৌড়েশ্বর পশ্চিম বঙ্গের ঢেকুর (গৌড়ের নিকটবর্ত্তী), রাঢ় অঞ্চলের সিমুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ভিন্ন, দূরবর্ত্তী রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়ের পালবংশীয় খ্যাতনামা নৃপতিগণের আসমুদ্র হিমাচল জয়ের নিকট ইহা কত তুচ্ছ!

ধর্ম্ম-মঙ্গল সাহিত্যের প্রথম কবি ময়ূর ভট্টের কাল কখন ছিল? শ্রীযুক্ত বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতে লাউসেন পালরাজা দেবপালের সমসাময়িক। লাউসেনের বংশতালিকা নাকি পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে রহিয়াছে :—

লাউসেন——(পালরাজা দেবপালের সমসাময়িক)
|
চিত্রসেন
|
ধর্ম্মসেন—— (ময়ূর ভট্ট এই রাজার স্থাপিত ধর্ম্ম-মন্দিরে এবং তাঁহার সময়ে পুরোহিত ছিলেন। লাউসেনের সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা এই মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।)

এই বংশতালিকা খাঁটি হইলে ধর্ম্মসেন বিগ্রহপাল কি নারায়ণপালের সমসাময়িক হইয়া পড়েন এবং ময়ূর ভট্টও খৃঃ ৯ম কি ১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক হন। ইহাও সম্ভব মনে হয় না। লাউসেন দেবপালের সমসাময়িক এবং রামাই পণ্ডিতের পূর্ব্বে কেন হইতে পারেন না তাহা উপরে বলিয়াছি। ময়ূর ভট্ট ও লাউসেন কেহই রামাই পণ্ডিতের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিতে

পারেন না। সেরূপ হইলে "রাম না জন্মিতে রামায়ণ" স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে শ্রীযুক্ত বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত পুথি মোটেই ময়ূর ভট্টের রচিত নহে। উহা নাকি ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ডাঃ সুকুমার সেন ধর্ম্ম-মঙ্গলের পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে সেইদিকে জোর না দিলেও আমরা দিয়া থাকি।

উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচার করিলে সময় সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। রামাই পণ্ডিত—খৃঃ ১০ম-১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল ও গৌড়ের রাজা মহিপালের সমসাময়িক। রামাইপণ্ডিত বাঁকুড়ার অধিবাসী ছিলেন। এই ধর্ম্মপাল ও মহিপাল তিরুমলয়ের শিলা-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন।

২। লাউসেন—খৃঃ ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। দণ্ডভুক্তির ও পরে গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের এবং পালরাজা নয়পালের সমসাময়িক। লাউসেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা পুত্র ও ময়নাগড়ের (মেদিনীপুর) রাজা কর্ণ-সেনের পুত্র। এই সময় হইতে রাঢ়ে, শূর ও সেন বংশের অভ্যুদয় ও পালবংশের ক্রমিক অধঃপতন সুরু হয়।

৩। ময়ূর ভট্ট—খৃঃ ১১শ শতাব্দীর শেষভাগ কি ১২শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেনের ও রাজা রামপালের সমসাময়িক। এই সময় সম্ভবতঃ (খৃঃ ১১শ শতাব্দীর তৃতীয় কি চতুর্থ পাদে) ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য-গুলিতে উল্লিখিত "রমতি" বা "রমাবতী" নগরী (গৌড় বা গৌড়ের অংশ) পাল-বংশীয় রাজা রামপাল সংস্কার করেন। মদনপালের তাম্রশাসনে রমতির উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম-পূজার[১] যুগ বৌদ্ধ মৌর্য্য সম্রাটগণের পতনের পরে এবং হিন্দু গুপ্তরাজগণের সময়ে বাঙ্গালায় শৈবধর্ম্মের ও শাক্তধর্ম্মের অভ্যুত্থানের যুগ। গুপ্তযুগের অবসানে নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে শৈবধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িবার ফলে হাড়ি ডোম প্রভৃতি পূজিত ধর্ম্মঠাকুর বেশে শিবঠাকুরকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সময় রাজা শশাঙ্কের অভ্যুদয়ের প্রায় সমকালে (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) ধরা যাইতে পারে। হাড়ি ও ডোম জাতি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে প্রাচীনকালে

---

(১) ধর্ম্ম-পূজা, ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য ও এতৎসম্বন্ধীয় কবিগণ সম্বন্ধে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (দীনেশচন্দ্র সেন), History of Bengali Language and Literature (D C. Sen), বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড দীনেশচন্দ্র সেন), রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল (সুকুমার সেন) এবং ময়ূর ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উন্নততর সামাজিক অবস্থায় থাকিলেও পালবংশের অধঃপতন ও সেনবংশের উত্থানের রাজনৈতিক গোলযোগের সময় এই জাতিগুলি হিন্দুসমাজের উচ্চ শ্রেণীগুলি হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিল এমন কি দেবতা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা হয় ত শৈব সেনবংশের প্রতিপত্তির ফল। লাউসেনের বংশের অভ্যুদয় কতকটা রাঢ়ে সেনগণের প্রভুত্ব বিস্তারের ইঙ্গিত দেয় বলিয়া মনে হয়।

(খ) ধর্ম্মপূজার গল্প

রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের রাজত্বকালে ঢেকুরের সামন্ত রাজা গোপবংশীয় সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঢেকুর বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এই ইছাই ঘোষ পরম কালীভক্ত ছিলেন এবং বীর বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গৌড়েশ্বর বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা ক্ষত্রিয়বংশীয় বৃদ্ধ কর্ণ সেনকে এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। কর্ণ সেনের চারি পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং কর্ণ সেন পরাজয়ের গ্লানিভোগ করিতে থাকেন। কর্ণ সেনের স্ত্রী পুত্রশোকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। কর্ণ সেনের এই দুরবস্থায় রাজা গৌড়েশ্বর ব্যথিত হন এবং তাঁহাকে পুনরায় সংসারে মনোনিবেশ করাইবার জন্য বৃদ্ধ কর্ণ সেনের সহিত স্বীয় শ্যালিকা সুন্দরী যুবতী রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মাহমদ (মাহুদ্যা) গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে গৌড়েশ্বর শুধু স্ত্রী ভানুমতীর সহিত পরামর্শক্রমে এই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। মহামদ যখন এই কথা শুনিলেন তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, তবে গৌড়েশ্বরকে প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। তিনি গোপনে সর্ব্বদা কর্ণ সেনের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে কোন সন্তান না হওয়াতে একদা মহামদ রঞ্জাবতীকে বিরক্তিমিশ্রিত শ্লেষ করিলেন। তাহাতে অপমানিতা বোধ করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত রামাই পণ্ডিত ও সামুল্যা নাম্নী একটি ধর্ম্মের সেবিকার পরামর্শক্রমে ধর্ম্মপূজা করিতে মনস্থ করেন। এই উপলক্ষে চাঁপাই গমন করিয়া "শালে ভর" দিয়া ধর্ম্মের অনুগ্রহলাভ করেন। "শালে ভর" দেওয়ার অর্থ শালে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া। যাহা হউক অবশেষে রাণী রঞ্জাবতীর লাউসেন নামক পুত্র জন্মে এবং কর্পূর নামক আর একটি পুত্রকেও লাউসেনের সঙ্গী হিসাবে তিনি ধর্ম্মের কৃপায় লাভ করেন। ধর্ম্ম-পূজার কাহিনী এই লাউসেনের কাহিনী। ধর্ম্মের ভক্ত লাউসেন বাল্যকাল

হইতেই অদ্ভুতকর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। শারীরিক বল ও বীরত্বে, জ্ঞান ও গুণে, চরিত্রবল ও স্বভাবের মাধুর্য্যে, দৈহিক সৌন্দর্য্য ও চিত্তসংযমে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লাউসেন কৈশোরেই কুম্ভীর, বাঘ, মল্ল প্রভৃতিকে পরাভূত ও বধ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সুরিক্ষা নটী ও নয়ানী নামক চরিত্রহীনা বারুই নারীর নিকট তিনি অপূর্ব্ব চিত্তসংযম দেখাইয়াছিলেন। মাহুদ্যা বার বার লাউসেনকে বধ করিবার চেষ্টা করেন, এতই তাঁহার ক্রোধ। মাহুদ্যার পরামর্শক্রমে লাউসেন ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ধর্ম্মের বরে কালীভক্ত ইছাই ঘোষ পরাভূত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। লাউসেনের বিশ্বস্ত ডোম সৈন্য ও তাহাদের নেতা কালু ডোম এবং তাহার পত্নী এই যুদ্ধের সময় অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে। পরবর্ত্তীকালে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মাহুদ্যা ময়নাগড় আক্রমণ করিলে লখার এবং লাউসেনের পত্নীদ্বয়ের বীরত্বে পরাভূত হন। এই যুদ্ধে লাউসেনের এক পত্নীর মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে মাহুদ্যার কুপরামর্শে যে কতিপয় বিদ্রোহী সামন্তরাজার বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠান হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই পরাজিত হন। ইহাদের মধ্যে কামরূপ ও সিমুলের রাজাদ্বয় উল্লেখযোগ্য। কামরূপের রাজকন্যা কলিঙ্গা ও সিমুলের রাজকন্যা কানেড়াকে লাউসেন বিবাহ করেন। লাউসেন আরও দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম সুয়াগা ও বিমলা। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম মাহুদ্যার ষড়যন্ত্রে আত্মহত্যা করে। অবশেষে মাহুদ্যার কৌশলপূর্ণ কুপরামর্শে গৌড়েশ্বর বলিয়া বসিলেন লাউসেনের ধর্ম্মঠাকুরের গুণ তিনি বুঝিবেন যদি লাউসেন হাকণ্ডে গিয়া পশ্চিমে সূর্য্যোদয় দেখাইতে পারেন। ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় এবং হরিহর বাইতি নামক একটি বাদ্যকরের সম্মুখে লাউসেন এই অসম্ভবও সম্ভব করেন। লাউসেনের হাকণ্ডে অনুপস্থিতির সময় মাহুদ্যা পুনরায় ময়নাগড়ের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হন। ইহাই ধর্ম্মের সেবক লাউসেনের গল্প এবং ধর্ম্ম-মঙ্গলের বিষয়বস্তু। এই গল্পের পূর্ব্বে ধর্ম্মঠাকুরের সেবক হিসাবে প্রথমে ভূমিচন্দ্র রাজার ও পরে হরিচন্দ্র রাজার গল্প প্রচলিত ছিল। এই গল্পে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একমাত্র ময়নাগড়ের রাজা ভিন্ন গৌড়েশ্বর ও অন্য কোন রাজাই ধর্ম্মের সেবক ছিলেন না—বরং কালীভক্ত (সুতরাং শাক্ত) ইছাই ঘোষ ও কামরূপরাজ কর্পূর ধলকে দেখা যায়। ঢেকুরের ন্যায় সিমুলগড়ের চিহ্নও অদ্যাপি ব্রাহ্মণি নদীর তীরে রহিয়াছে।

বিংশ অধ্যায়

ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবিগণ

(ক) ময়ূর ভট্ট

শূন্যপুরাণে রমাই পণ্ডিত বিরচিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি লিখিত হইলেও উহাতে কোন ভক্তের কাহিনীর বর্ণনা নাই। খুব প্রাচীনকালে ধর্ম্ম-ঠাকুরের একজন ভক্ত ছিলেন—তিনি রাজা ভূমিচন্দ্র। ভূমিচন্দ্রের কাহিনী অনেককাল ধর্ম্মের সেবকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহার পর কালক্রমে তাহা কতকটা বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গেল, এবং রাজা হরিচন্দ্রের কাহিনী তৎস্থান অধিকার করিল। হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অনেকটা মহাভারতের দাতাকর্ণের উপাখ্যানের আদর্শে রচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মঠাকুরের কাহিনীর রাজা হরিশ্চন্দ্র নামটি রামায়ণের সূর্য্যবংশীয় দানশীল রাজা হরিশ্চন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ধর্ম্মের সেবক রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী মদনা অতিথির ছদ্মবেশে আগত ধর্ম্মঠাকুরকে তাঁহার নির্দ্দেশমত পুত্র লুইচন্দ্রকে বলিদান, ঠিক রাজা কর্ণ ও রাণী পদ্মাবতীর পুত্র বৃষকেতুকে অতিথির ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য বলিদানতুল্য। কালক্রমে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীও লুপ্তপ্রায় হইল। উহা দ্বারা আর ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করা চলিল না। তখন একটি নূতন গল্পের অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই নূতন গল্পটি কর্ণগড়ের রাজপুত্র লাউসেনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল এবং তাহার প্রথম সাহিত্যিক রূপ দিলেন কবি ময়ূরভট্ট। কোন দেবতার মহিমা প্রচার করিতে গেলে ক্ষত্রিয় রাজা অথবা রাজতুল্য সমৃদ্ধ বণিকরাজ না হইলে সুবিধা হয় না। এই হিসাবে চণ্ডী-মঙ্গল ও মনসা-মঙ্গলের ন্যায় ধর্ম্ম-মঙ্গলেও রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তি গল্পের নায়ক হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। রাজপুত্র লাউসেনের কাহিনী আমরা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

ময়ূর ভট্ট রচিত ধর্ম্ম-মঙ্গলের নাম "হাকণ্ড-পুরাণ"। ময়ূর ভট্ট ও তদ্‌রচিত "হাকণ্ড-পুরাণ", উভয় সম্বন্ধেই বিরুদ্ধমত রহিয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি ময়ূর ভট্টের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই ব্যক্তি আর কেহ নহেন, সংস্কৃত সাহিত্যের জনৈক সূর্য্যস্তব লেখক কবি এবং তিনি খৃঃ ৯ম কিম্বা ১০ম শতাব্দীর লোক হইতে পারেন। ইনি রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল

সম্পাদন উপলক্ষে ভূমিকায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে "হাকণ্ড-পুরাণ"ও সূর্য্য-পূজার গ্রন্থমাত্র। লাউসেন কর্ত্তৃক হাকণ্ড নামক স্থানে পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের বৃত্তান্তে তিনি এইরূপ মনে করিয়াছেন। আমরা কিন্তু অন্য ধারণা করিয়াছি। উহা সূর্য্যপূজক আচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে জব্দ করিবার জন্যই ডোম পণ্ডিতগণের কারসাজিও হইতে পারে।

ময়ূর ভট্টের অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তবে সংস্কৃত সূর্য্যস্তবের কবিও ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি এক কি না, এই প্রশ্নে আমাদের মনে হয়, উহা নাও হইতে পারে। তবে বাঙ্গালা ধর্ম্ম-মঙ্গলের প্রথম কবি হিসাবে একজন ময়ূর ভট্ট যে ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-মঙ্গলের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে ঘনরাম (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) "হাকণ্ড-পুরাণ মতে, ময়ূর ভট্টের পথে" এবং "ময়ূর ভট্ট বন্দিব সংগীতের আদি কবি" (ঘনরাম, শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল, ১ম সর্গ) প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়া ময়ূর ভট্ট যে ধর্ম্ম-মঙ্গলের আদি কবি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কবি মাণিক গাঙ্গুলী (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) তাঁহার রচিত 'ধর্ম্ম-মঙ্গলে' ময়ূর ভট্ট সম্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তিগুলি করিয়াছেন।

(ক) বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল
—(ধর্ম্ম-মঙ্গল, দেশাগমন পালা, মাণিক গাঙ্গুলী)

(খ) বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে অনাদি মঙ্গল॥
—(ধর্ম্ম-মঙ্গল, দেশাগমন পালা, মাণিক গাঙ্গুলী)

(গ) বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্ম গুণগান॥
—(ধর্ম্ম-মঙ্গল, অঘোরবাদল-পালা, মাণিক গাঙ্গুলী)

এইরূপ উক্তি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গলের মধ্যে আরও কতিপয় স্থানে আছে। প্রাচীন কবি গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ও (সম্ভবতঃ খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) ময়ূর ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ময়ূর ভট্টের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি এবং ধর্ম্ম-মঙ্গলের এই আদি কবির সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে খৃঃ ১১শ শতাব্দীর শেষভাগ কি খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রথমভাগ তাহাও পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

(২) গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হন। এই কবি, ময়ূরভট্টের পদ হইতে সাহায্য লইয়াছেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ অনুমান করেন। কবি গোবিন্দরামের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই। বঙ্গাব্দ ১০৭১ (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) তারিখযুক্ত ও কতিপয় পত্রযুক্ত একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে মাত্র। এই কবির কতিপয় ছত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

ইন্ধা যাদুকর (লাউসেনের হাকণ্ডে অনুপস্থিতিতে) ময়নাগড়ের অধিবাসিগণকে যাদুবিদ্যাবলে নিদ্রামগ্ন করে।

"ইন্ধা বলে আদ্যা মোরে হলা কৃপাপর।
ময়নায় নিন্দ্যাটী দিব দেহ মোরে বর॥
বিপদনাশিনী বর দিয়া বাস গেলা।
দিতেছে নিন্দ্যাটী ইন্ধা ভাবিয়া মঙ্গলা॥
উত্তর করিয়া মুখ গড়ে রইলান।
নিদ্রামন্ত্র জপিয়া মারয়ে ধূলাবাণ॥
লাগ লাগ নিন্দ্যাটী হাঁকারিছে ইন্ধা চোর।
শোবামাত্র নিদ্রায় হইল লোক ঘোর॥
যাবন্তু গড়ের লোক হলা নিদ্রাতুর।
নিদ্রা গেল পক্ষী মৃগ বিড়াল কুকুর॥
কালু সিংহ নিদ্রা গেল যত বীরগণ।
চারি নারী সেনের নিদ্রায় অচেতন॥
সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আণ্ডির-পাখর।
দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর॥
সন্তান মায়ের কোরে কত নিদ্রা যায়।
সন্তানের বৌ একা গড়েতে বেড়ায়॥
ঘরে ঘরে ফেরে লক্ষ্যা নাঞি পায় সাড়া।
ডাকিয়া জাগিয়া বোলে বক্সের পাড়া॥
নিদ্রিত যতেক লোক শুনে নাকসাট।
দেখিতে চলিল চারি দুয়ারে কপাট॥
আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত॥

ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল॥" ইত্যাদি।

—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্ম-মঙ্গল।

(৩) খেলারাম

কবি খেলারামের ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনার কাল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ। এই কবির হস্তলিখিত পুঁথিতে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ছত্র দুইটি আছে বলিয়া ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥

এই ছত্র দুইটিতে যে সময়ের নির্দ্দেশ আছে তাহা ১৪৪৯ শক বা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ (কার্ত্তিক মাস)।

(৪) মাণিক গাঙ্গুলী

কবি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গল ১৫৪৭[১] খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকাসহ এই গ্রন্থখানি অনেক কাল হয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মাণিক বা মাণিকরাম গাঙ্গুলীর রচিত এই ধর্ম্ম-মঙ্গলখানি ঘনরামের রচিত ধর্ম্ম-মঙ্গলের সহিত একাসন পাইবার উপযুক্ত। মাণিক গাঙ্গুলীর গ্রন্থ ঘনরামের গ্রন্থের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। মাণিক গাঙ্গুলীর আদর্শে ঘনরাম অনুপ্রাণীত হইয়াছিলেন কি না জানা নাই, তবে সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক, ধর্ম্মগত ও জনশ্রুতিমূলক উপাদান এই উভয় কবির গ্রন্থেই প্রচুর রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটানা বর্ণনায় মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরাম উভয়েই তুল্য যশের অধিকারী। মাণিকরামের কাব্যে ঘটনা-বাহুল্য উপাখ্যানের চরিত্রগুলিকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করাতে বীর ও করুণ এই উভয় রসই তেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা শুধু মাণিকরামের নহে, ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের সকল কবিরই ইহা দোষ বলা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্যের মূল সুর ভক্তি-মূলক, দেবতার নিকট ভক্তের আত্মনিবেদনই ইহার সাফল্য

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং), পৃ ৪১৫ দ্রষ্টব্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত মাণিক গাঙ্গুলীর পুঁথিতে আছে,—

"বাণে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিতসহ যুগপক্ষ যোগ্যতার সনে॥"

এই হিসাবে রচনার তারিখ হইবে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এবং ইহার করুণরস ভক্তিভাব জাগ্রত করিতে সাহায্যকারী। চণ্ডী-মঙ্গল ও মনসা-মঙ্গলে উপরোক্ত আদর্শের প্রচুর সন্ধান মিলিবে, কিন্তু ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য গুলিতে সবই আছে, কিন্তু যেন কিসের অভাবে কবির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে সমগ্র কাব্যখানি প্রথম শ্রেণীর কবির হাতে রচিত হইয়াও ভাল জমে নাই। ইহা সম্ভবতঃ কবি অপেক্ষা এই জাতীয় কাব্যেরই দোষ। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য অতিরিক্ত ইতিহাস-ঘেষা হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার কবিগণ গৌড়েশ্বর অথবা তাঁহার কোন সামন্ত নৃপতির অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনায় যত মনোযোগী হইয়াছেন, বিপদে পড়িয়া ভক্তের ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন বর্ণনায় তত মনোযোগী হন নাই। অথচ গোপীচন্দ্রের গানও কোন ঐতিহাসিক রাজার উপলক্ষে লিখিত হইয়া শেষোক্ত গুণে কত মনোরম হইয়াছে! আর একটি কথা বলা যায় যে স্বাভাবিক পারিবারিক আবেষ্টনীর ভিতর নায়ককে রাখিয়া তাঁহার উপর দেব-কৃপার প্রভাব অন্য জাতীয় মঙ্গলকাব্যে এবং অন্য কতিপয় কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যগুলিতে পারিবারিক স্নেহ ও মায়া-মমতার চিত্র অপেক্ষা দেবকৃপায় নায়কের অতি-মানবীয় ক্ষমতা দেখাইবার প্রচেষ্টাই অধিক। সুতরাং কাব্যাংশে ধর্ম্ম-মঙ্গল ত্রুটিপূর্ণ। যাহা হউক এতৎসত্বেও এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলীর কাব্য, ঘনরামের কাব্য বাদ দিলে, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। মাণিক গাঙ্গুলীর বংশপরিচয় তৎরচিত ধর্ম্ম-মঙ্গলে এইরূপ আছে,—

"বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঞি বেলডিহায় ঘর।
পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর॥
না যায় খণ্ডন প্রভু কপালের লেখা।
দেসড়ার মাঠে যারে ধর্ম্ম দিলেন দেখা॥" ইত্যাদি।

এই দেসড়ার মাঠেই ধর্ম্মঠাকুর কবিকে ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনা করিতে উপদেশ করেন।

নিম্নে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গল হইতে উদাহরণস্বরূপ কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করা গেল। ইহা হইতে কবির ছন্দ ও বর্ণনা সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(ক) কালু সরদার সমীপে গৌড়াধিপের ভাটের আগমন।

"বাহির মহলে বসেছে বীর।
ধরণী উপরে ধনুক তীর॥

শিরে রণটোপ সুচেল গাএ।
খাসা মকমলী পাদুকা পাএ॥
ঘন গোঁফে তারা ঘুরাএ আখি।
পদ্মপত্রে যেন খঞ্জন পাখী॥
মুখে ঘোরতর গভীর ডাক।
ভয়েতে না সরে ভাটের বাক্॥
করে কলস্বরে কবিতা পাঠ।
বলে গৌড়ে ঘর রাজার ভাট॥
আছেন যেখানে অনন্তরূপা।
কালু বীরে কালী করুন কৃপা॥
বিরলে বলিব বিশেষ কথা।
শুনে সিংহ কালু নুয়াল মাথা॥
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে।
নিঃশঙ্ক হইয়ে নিকটে বসে॥
বসিতে আসন দিলেক বীর।
যথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে বীর॥
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত।
মাণিক রচিল মধুর গীত।"

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গল।

(খ) মেঘ-বর্ণন।

"আজ্ঞা পেয়ে শর্ম্মী হয়ে সমীরণ মেঘং।
চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগং॥
গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ করে কুল কুলং।
চারি মেঘ চৌদিকে বরিষয়ে জলং॥
শিলকণা ঝন্‌ঝনা পড়ে অনিবারং।
ভাজে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং॥
অবিরল সদারুণ তড়িৎ প্রকাশং।
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ঘোষ নিষ্পেষং॥" ইত্যাদি।

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গল।

মাণিক গাঙ্গুলী বর্ণিত "সর্ব্বদেব-বন্দনা" তাঁহার উদার মনোভাবের

পরিচায়ক এবং ইহাতে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানের শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে পূজিত অনেক দেব-দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) সীতারাম দাস

ধর্ম্ম-মঙ্গলের অন্যতম কবি সীতারাম দাস ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ধর্ম্মঠাকুরের গান লিখিতে যাইয়া যে স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে শুধু ধর্ম্মঠাকুরের নামই করেন নাই, তিনি অন্য নানা দেব-দেবীর নামও করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "গজ-লক্ষ্মী" দেবীও আছেন। কবি লিখিয়াছেন,—

"শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা।
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥"

কবি সীতারাম দাসের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে। তিনি কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সীতারাম দাসের কবিত্ব ধর্ম্ম-মঙ্গলের অন্যান্য কবির রচনার দোষ ও গুণসম্পন্ন, বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নাই। কবির রচনার নমুনা এইরূপ :—

কামরূপ-রাজের সহিত গৌড়েশ্বরের পক্ষে কালু ডোমের যুদ্ধ।

"কালুর উপর পড়ে গুলি শর
রাজা বলে মার মার।
কালু সিংহ রায় কামাখ্যার পায়
দণ্ডবৎ সাতবার॥
শুনহ কামাখ্যা ভক্তে কর রক্ষা
শুন ধর্ম্ম-অবতার।
সঙরিয়া হরি সন মুণ্ড কাটারি
ধীর বীর আগুসার॥
দেখিয়া বিষম কুকু-মর‍্যা ডোম
সমুদ্র কাটারি ঝাড়ে।
কলাতরু যেন সেনা হানে তেন
ফলকু সারিয়া পড়ে॥
ঢালি শর শর অস্ত্র উত্তরায়
না বাজে কালুর অঙ্গে।

সঙরিয়া কালী আনন্দে নরদলি
গাএ অস্ত্র সব ভাঙ্গে ॥
ঘোড়ার চাপান পড়ে কানে কান
কাল অস্ত্র ঝাড়্যা যায়।
ময়ুর ভট্টকে বান্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাস গায় ॥

—সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীত।

(৬) রামদাস আদক

কবি রামদাস আদক কৈবর্ত্তবংশীয় ছিলেন। কবির পিতার নাম রঘুনন্দন আদক। তাঁহার নিবাস প্রথমে হুগলী জেলার অন্তর্গত হায়ৎপুর গ্রামে ও পরে সেই জেলার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে (থানা আরামবাগ) স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কবি বংশপরিচয় প্রসঙ্গে নিম্নরূপ জানাইয়াছেন।

"ভুরসুট্টে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান ॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে ॥"

রামদাস আদকের ধর্ম্ম-মঙ্গলের নাম "অনাদি-মঙ্গল"। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত কবিকে ধর্ম্ম-ঠাকুর রক্ষা করিয়া একখানি "ধর্ম্ম-মঙ্গল" রচনা করিতে আদেশ করেন। ইহার ফলে কবি "অনাদি-মঙ্গল" রচনা করেন। ধর্ম্ম-ঠাকুরকে রামদাস বলেন,—

"পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥
খেলা ছলে পূজি ধর্ম্ম কর্ম্মজ্ঞান হীন।
জানি না ধর্ম্মের গীত তায় অর্ব্বাচীন ॥"

তখন ধর্ম্মঠাকুর আদেশ করিলেন,—

"আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি ॥
আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে ॥

সুছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার।
শ্রীধর্ম্ম মাহাত্ম্য মর্ত্ত্যে হইবে প্রচার॥"

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—"হায়ৎপুর গ্রামে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদি-মঙ্গলের ভাষা সরস ও সহজ,—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নাই।" রামদাস আদকের পুথির প্রথম আবিষ্কারক রায়নানিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

(৭) রামচন্দ্র বাড়ুয্যা

ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি রামচন্দ্র বাড়ুয্যা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চামটের অধিবাসী এই কবি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর লেখক হইতে পারেন। ইনি যে রাজার অধীনে বাস করিতেন তাঁহার নাম গোপাল সিংহ। এই কবিকে কিছু বর্ণনাপ্রিয় মনে হয়। যথা,—

ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়সৈন্যের অভিযান।

"রাজার আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল।
মারকাট ডাক ছাড়ে রাউত সকল॥
যবন সোয়ার সাজে অসি চর্ম্ম হাতে।
হানা দিল সংগ্রামে লাগাম খেঁচে দাঁতে॥
আশী হাজার খোজা সাজে বুকে লম্বা দাড়ি।
মাথায় শোভিত টয়া সোণার পাগড়ী॥
মঘবান বীর সাজে রাজার কোঙর।
কৃপাণ কামান গোলা গদির উপর॥
রাজপুত চৌহান সিপাই সাজা ঢালা।
হানা দিলে সমরে গগনে উড়ে ধূলা॥
হাজার হাজার ঢালী হাতে করি খাড়া।
যমের সমান সাজে দিয়ে গোঁফ নাড়া॥
ভীম মল্লবীর সাজে টানে বাঁশ গোটা।
পাথর বিন্ধিয়া পাড়ে দিয়ে চূণের ফোঁটা॥
সঙ্গে সব ধানুকী চামর বান্ধা বাঁশে।
নূতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে॥

ধায় সব ফরিখাল করি বীরপণা।
ফলকু সাজিয়া যায় শত হাতখানা ॥
রায়-বাঁশ্যা পাইক হাজার হাজার ধায়।
মেলা পাড়া করিতে যমের সঙ্গে চায় ॥
গৌড়েশ্বর সাজিল চাপিয়া গজমত্তা।
আড়ানী শোভিত শিরে শোভে ধবল ছাতা ॥
সরিষা না যায় তুল সেনার চাপানে।
পাখরিয়া ঘোড়া সব চলে কাণে-কাণে ॥
হেলাইয়া শুণ্ড চলে যত করিবর।
গণ্ডেতে সিন্দুর শুণ্ডে লোহার মুদ্গর ॥
আগু দলে সেনাপতি বেটে নিল বাট।
চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট ॥
রথ ভরে চলে রথী দেখি বিপরীত।
কনক-কলস চূড়ে পতাকা-শোভিত ॥
বার ভূঞা চলে ঘোড়া করিয়া তাজনী।
আচ্ছাদিত ধূলায় গগনে দিনমণি ॥"

—রামচন্দ্র বাড়ুয্যার "ধর্ম্ম-মঙ্গল"।

(৮) রূপরাম

ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি "দ্বিজ" রূপরাম "আদি" রূপরাম নামেও প্রসিদ্ধ। কবি রূপরামের নামের সহিত "আদি" শব্দের যোগ থাকিলেও ইনি এই জাতীয় কাব্যের আদি কবি নহেন। এই কবির গ্রন্থের প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইহার সময় জানা যায় নাই। তবে ইনি খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর কবি বলিয়া অনুমিত হন। একটি প্রবাদ অনুসারে ইনি ঘনরামের সহপাঠী। ইহা ঠিক হইলে রূপরাম খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক ছিলেন। এই প্রবাদ অবিশ্বাস করিবার মত কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব রূপরামের পুথিতে প্রচুর রহিয়াছে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতেই এই পুথিদ্বয়ের প্রভাবের প্রকৃষ্ট কাল। বৈষ্ণব প্রভাবের সময় সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। সুতরাং রূপরামের কাল খৃঃ ১৫শ শতাব্দী অপেক্ষা খৃঃ ১৮শ শতাব্দী (কবি ঘনরামের সমসাময়িক) ধার্য্য করিলে কোন হানি নাই। উক্ত প্রভাব সম্বন্ধে নিম্নে রূপরামের কাব্য হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) লাউসেন ও নয়ানী।

"বলিতে উচিত বাণী মনে কিবা দুঃখ।
জন্মাবধি নাই দেখি অসতীর মুখ॥
অসতী লোকের সঙ্গে করি যে আলাপ।
একথা বলিলে পুন জলে দিব ঝাঁপ॥
এত শুনি নয়ানী কাতর নাহি হয়।
কোপুরের কথা শুনি মনে লাগে ভয়॥
লাউসেনে গর্জ্জিয়া মাগী বলে বিপরীত।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥
মনে কর ধর্ম্মের তপস্বী তুমি বড়।
ইন্দ্রকে চাহিয়া তুমি কতগুণে বড়॥
কুন অপরাধে হৈল্য সহস্রলোচন।
অঞ্জনা দেখিয়া কেন ভুলিল পবন॥
দ্রুপদনন্দিনী ছিল বাখানিয়া গাই।
যার পতি বলিত পাণ্ডব পঞ্চভাই॥
অহল্যার বারতা শুনেছি রামায়ণে।
পরিণামে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-চরণে॥"

—রূপরামের ধর্ম্ম মঙ্গল।

(খ) নয়ানীর কাঁচলি।

"কাঁচলির সমুখেতে পূর্ণরাস লেখা।
মাধবেরে গোপিনী যেখানে দিল দেখা॥
সারি সারি শোভা করে ষোল শ গোপিনী।
তাহার মধ্যে দাণ্ডাএ আছেন চক্রপাণি॥
সুমধুর পাখোআজ মন্দিরা করতাল।
গোপিনী সকল নাচে বড়ই রসাল॥" ইত্যাদি।

—রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল।

(৯) ঘনরাম

ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। কবি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বর্দ্ধমান কইয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নামক

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনার কাল ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ। ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত ও মাতার নাম সীতা দেবী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রামপুরের টোলে কবি বিদ্যাভ্যাস করেন। বর্দ্ধমানের তৎকালীন মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ও উৎসাহে ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্ম-মঙ্গলখানি রচনা করেন। ঘনরাম এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥"

কবির অপর গ্রন্থ "সত্যনারায়ণের পাঁচালী"। কবি ঘনরামের জন্মসময় ১৬৬৯ খৃঃ স্বীকৃত হইলে তিনি "অন্নদা-মঙ্গলের" কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক এবং ৪৩ বৎসরের বড় ছিলেন। ভারতচন্দ্রের জন্মসময় ১৭১২ খৃষ্টাব্দ হইলে কবি ঘনরাম তৎপর বৎসর (১৭১৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য রচনা শেষ করেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলের অপর কবি দ্বিজ রূপরাম ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। উভয়ের নামসাদৃশ্য, একজাতিত্ব, সহপাঠিত্ব, সমসাময়িকতা এবং একজাতীয় কাব্যের কবি হিসাবে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয়। বিষয়টি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে প্রমাণাভাবে উহা হইতে নিরস্ত হইতে হইল। তবে রূপরামের গ্রন্থ ঘনরামের গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত হয় এবং ঘনরাম রূপরামের গ্রন্থের প্রশংসা করেন নাই।

ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গলের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ। উভয় কবিই কতকটা মহাকাব্যের অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উভয়ের লেখাতেই বর্ণনামাধুর্য্য ও সরসতা আছে। কাব্যের মধ্যে নানা রসের অবতারণা করিতে উভয়েরই প্রচেষ্টা থাকিলেও উহা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঘনরামের কাব্যে বীররস যত ফুটিয়াছে করুণরস তত ফোটে নাই। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর টোলে শিক্ষিত কবির লেখাতে অত্যধিক শাস্ত্রের উদাহরণও স্বাভাবিক। লাউসেনের চরিত্রে পৌরষ অপেক্ষা দেবানুগ্রহই অধিক প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাতে ঘনরামকে দোষী করা যায় না। সব ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যেরই ইহা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। খলচরিত্রের প্রতীক মাহুদার চরিত্র ও হাস্য-রসের প্রতীক কর্পূরের চরিত্র অঙ্কনে কবি ঘনরামের পটুতা স্বীকার করিতে হয়। কর্পূরের ভীরুতার উদাহরণগুলি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পছন্দ করেন নাই। ঘনরামের বিভৎস-রস বর্ণনার কৃতিত্ব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী (চণ্ডী-মঙ্গলের কবি)

মুকুন্দরাম ও পরবর্ত্তী (অন্নদা-মঙ্গলের কবি) ভারতচন্দ্রের সমপর্য্যায়ের বলা চলে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঘনরামের কাব্যের তত প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল* এত বিরাট ও এত একঘেয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।" তাঁহার এই সমস্ত বিরুদ্ধ মন্তব্য একটু অতিরিক্ত তীব্র মনে হয়।

(১০) নরসিংহ বসু

কবি নরসিংহ বসুর পিতার নাম ঘনশ্যাম বসু ও পিতামহের নাম মথুরা বসু। কবির পরিবারের পূর্ব্বনিবাস বসুধাম এবং মথুরা বসুর সময় হইতে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শাঁখারীগ্রাম। মথুরা বসুর সময়ে মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি ছিলেন। ভারতচন্দ্র, রূপরাম, ঘনরাম ও নরসিংহ বসু ইহারা সকলেই বর্দ্ধমান অঞ্চলের কবি ও বিভিন্ন বয়সে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। একমাত্র কবি খেলারামের সময় নিয়া গোলযোগ দেখা যায়। কবি নরসিংহকে ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য রচনা করিতে তাঁহার যে সমস্ত বন্ধু উৎসাহিত করেন তন্মধ্যে খেলারাম আচার্য্য একজন। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য ইনিও রচনা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না, তবে একজন ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি হিসাবে খেলারাম নামটি পাওয়া যায় এবং তিনি আমাদিগকে রচনার যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই সময় নির্দ্দেশক যে ছত্র দুইটি পাওয়া যায় তাহা সত্য হইলে অবশ্য খেলারাম দুইজন পাওয়া যাইতেছে। আবার নরসিংহ বসুর সমসাময়িক খেলারাম যেরূপ ধর্ম্মের সেবক ছিলেন দেখা যায় তাহাতে তিনি নিজেও একজন ধর্ম্ম মঙ্গলের কবি হইতে পারেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি হিসাবে একজন খেলারামই ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয় এবং তিনি নরসিংহ বসুর সমসাময়িক কি না এই সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। কবি নরসিংহ ধর্ম্ম-ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রত্যাদেশ পাইয়া এবং বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনা করেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনার আরম্ভ কাল ১৬৫৯ শক বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ। এই গ্রন্থখানি ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল অপেক্ষা বড়।† নরসিংহ বসুর

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন), পৃঃ ৪১৯ ও 'বিশেষ আলোচনা' পৃঃ ৪১৮-৪১৯ দ্রষ্টব্য (৬ষ্ঠ সং)। ঘনরামের পুথি বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

† বিশেষ বিবরণ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (১ম খণ্ড), ৪৫৬—৪৫৭ পৃঃ এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), ৪১০ পৃঃ (৬ষ্ঠ সং) দ্রষ্টব্য।

কাব্যখানি নানা গুণসম্পন্ন এবং পৌরাণিক প্রভাবে পরিপূর্ণ। কালু ডোমের স্ত্রী লখার চরিত্র অঙ্কনে কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কালু ডোমের প্রতি দেবী ভগবতীর অভিশাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি নিম্নরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

দেবী ভগবতীর কালুকে অভিশাপ।

"দেখহ দৈবের গতি ডোমের ফিরিল মতি
মদের সৌরভে সচঞ্চল।
না করিয়া নিবেদন ভক্ষণে দিলেন মন
মহাপূজা হইল নিষ্ফল॥
দেখিয়া দেবীর তাপ কালু বীরে দিল শাপ
সবংশেতে হইবে নিধন।
পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে ভবানীর মনস্তাপে
কালু বীর হইল তেমন॥
ক্রোধ কর‍্যা ভগবতী ঘর গেলা শীঘ্রগতি
ডোম খায় ভাঙ্গ ভুজা মদ।
বসু ঘনশ্যামাত্মজ সেবি ধর্ম্ম-পদরজ
রচিল ত্রিপদীচ্ছন্দে পদ॥"

—নরসিংহ বসুর ধর্ম্মরাজের গীত।

(১১) সহদেব চক্রবর্ত্তী

কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্ম-মঙ্গলখানি রচনা করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম কবির জন্মভূমি। কালু রায় নামক ধর্ম্ম-ঠাকুরের স্বপ্নাদেশের ফলে কবির গ্রন্থখানি রচিত হয়। কবি আমাদিগকে গ্রন্থারম্ভে জানাইতেছেন যে "দয়া কৈলে কালু রায় স্বপনে শিখালে যারে গীত"। একটি বিশেষ কারণে সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম-মঙ্গল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ডাঃ দীনেশচন্দ্রের মতে বৌদ্ধপ্রভাব কিন্তু আমাদের মতে নাথপন্থী শৈবপ্রভাব। শিবঠাকুরই যে ধর্ম্ম-ঠাকুররূপে ডোমগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন তাহার অন্যতম প্রমাণ সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম-মঙ্গল। ইহা শুধু বাহ্যিক প্রভাব নহে, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। তবে যাঁহারা নাথপন্থী সাহিত্যকে শৈব-সাহিত্য না বলিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্য বলিতে অধিক ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আমাদের কিছু বলিবার নাই। সহদেব চক্রবর্ত্তী—মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্ম-মঙ্গল লেখকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া ধর্ম্ম-মঙ্গল

সাহিত্য ও নাথপন্থী সাহিত্যের মধ্যে অপূর্ব্ব সংযোগ সাধন করিয়াছেন। অবশ্য ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সহদেব চক্রবর্ত্তীর সাহিত্যে বৌদ্ধগন্ধ পাইলেও এই দিকটা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহার মতে "নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি একেবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হরপার্ব্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে কালুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুর নিবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মদ্বেষ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচিত হইবে। এই পুস্তকে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে। 'এতিন ভূবনমাঝে, শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর ভরা।' ধর্ম্মসেবক ডোমজাতির নির্য্যাতন ও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।—" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৪১৯—৪২০)। সহদেব চক্রবর্ত্তীর রচনা স্থান বিশেষে কবিত্বময় ও স্থল বিশেষে ভক্তিসূচক ও মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

নাথপন্থী সাহিত্য গোরক্ষবিজয়ের অনুকরণে সহদেব চক্রবর্ত্তী কতকগুলি হেঁয়ালি তাঁহার ধর্ম্ম-মঙ্গলে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এইরূপ :—

সাধু গোরক্ষনাথ তদীয় গুরুদেব মীননাথকে কদলীপাটনে রমণী সৌন্দর্য্যের মোহে পড়িতে দেখিয়া বলিতেছেন,—

"গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর ছন্দে, সিন্ধু উথলিল পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল,
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে॥
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিলা নোড়াতে কোন্দল বাধিল, সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥
এত বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল
ছেলে চায় পায়রার দুধ॥" ইত্যাদি।

—সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম-মঙ্গল।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" যে অনেক পরবর্তীকালে সহদেব চক্রবর্তীর রচিত ও সংযোজিত তাহা এখন একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

(১২) অপরাপর কবিগণ

ধর্ম্ম-মঙ্গলের অপরাপর কবিগণের মধ্যে রামনারায়ণ, প্রভুরাম, শ্যাম পণ্ডিত, ধর্ম্মদাস, হৃদয়রাম, শঙ্কর কবীন্দ্র, গোবিন্দরাম, নিধিরাম, ক্ষেত্রনাথ, রামকান্ত, ভবানন্দ রায়, বলদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই কবিগণের অন্যতম কবি রামনারায়ণের ভণিতায় পাওয়া যায় তিনি রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। কবি ঘনরামের চতুর্থ (সর্ব্বকনিষ্ঠ) পুত্রের নামও রামকৃষ্ণ ছিল। তাঁহার অপর তিন পুত্রের নাম রামপ্রিয়, রামপ্রসাদ ও রামগোবিন্দ। ঘনরামের রচিত সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে উল্লিখিত তাঁহার চারি পুত্রের কথা ঠিক হইলে আর রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে পারে না। আর যদি জ্ঞাতি-ভ্রাতা ধরা যায় তবে রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ রামনারায়ণ হইতে পারেন। "রাম" কথাটি সকলের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সন্দেহ জন্মাইতেছে। রামনারায়ণের সময়ও তাঁহার লেখা হইতে জানিতে পারা যায় নাই, তবে তাঁহার সময় খৃঃ ১৭শ শতাব্দী বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন। খুব সম্ভব রামনারায়ণ ঘনরামের সমসাময়িক ছিলেন। যাহা হউক অনুমান আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে।

একবিংশ অধ্যায়

শিবায়ন

শিবায়ন বা শিব-চরিত কথা মঙ্গলকাব্যের ন্যায় লৌকিক সাহিত্যের অংশ হইলেও এই সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র। শিবঠাকুর শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যে বলি কেন, এদেশের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, চারুকলা ও কৃষি প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই তিনি প্রেরণা জোগাইয়াছেন। দেবসমাজে এই শিবঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় নিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইনিই বেদের শিব ও রুদ্রদেবতা। আবার কাহারও কাহারও মতে রুদ্রদেবতা এবং পৌরাণিক শিব একই দেবতা। কেহ কেহ শিবঠাকুরকে বুদ্ধের গুণসম্পন্ন করিতে প্রয়াসী। শিবায়নের শিবঠাকুর কৃষিদেবতা হইলেও ইনি পৌরাণিক শিবেরই রূপান্তর এইরূপ একটি প্রবল মত রহিয়াছে। ইনি পৌরাণিক শিব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা রহিয়াছে। মোট কথা বহু প্রকারের দেবতা ক্রমে এক শিবঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন, না এক শিবঠাকুর নানাজাতি ও নানা সমাজে বহুবিধভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন? এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে অন্য এক অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি। এই স্থানে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সম্ভবতঃ আর্য্যেতর আল্পাইন (পামিরীয়ান) জাতির শিশ্নদেবতা শিব কালক্রমে আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইয়া বৈদিক ও পৌরাণিক যুগদ্বয়ে বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পামিরীয় জাতির এই শিব প্রাচীন বাঙ্গালায় (কোন এক স্মরণাতীত যুগে) আর্য্যসংস্কৃতিবিহীন কৃষকদেবতারূপে সাধারণ জনগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। পৌরাণিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই দেবতাকে অনেক পরে রূপান্তরিত করিয়াছে। প্রধানতঃ পৌরাণিক মন্ত্রবলে কতিপয় স্বতন্ত্র দেবতা 'শিব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বরং একই শিব দেবতা নানা জাতি ও নানা সমাজের সংস্কৃতির পার্থক্যহেতু বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত বা গৃহীত হইলেও পৌরাণিক সংস্কৃতি এবং ভাবধারা কালক্রমে এই আপাতঃ বৈষম্যের ভিতর সাম্য ও অখণ্ড ঐক্য আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়াছে।

এই তো গেল শিব দেবতার পরিচয়ের কথা। শিবঠাকুরই বোধ হয় প্রাচীন বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম সমগ্র দেশপূজ্য সুপ্রাচীন দেবতা। এই দেবতার

বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইবার অনেককাল পরে (খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে) শৈব সম্প্রদায় আর্য্য, আল্পাইন, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে শৈবধর্ম্মের প্রধান প্রচারক দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংঘাতেও শৈবধর্ম্মই জয়ী হয়।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতেই সমগ্র বাঙ্গালায় পালরাজশক্তির অভ্যুত্থানের সময়ে প্রাকৃত পরবর্ত্তী অপভ্রংশ ভাষা হইতে আগত প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্বে রাজশক্তির দিক দিয়া খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের পৌরাণিক হিন্দু গুপ্ত রাজবংশের অধঃপতন ঘটে এবং গঙ্গানদীর দক্ষিণ অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণে (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে) হিন্দু রাজা শশাঙ্কের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার সময়েই বাঙ্গালার রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও ভাষা এক নববলে বলীয়ান হয়। ধর্ম্মের দিক দিয়া শিবঠাকুরই প্রাচীন বাঙ্গালার নবজীবন ও ঐক্যসম্পাদনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তীকালে খৃঃ ৮ম শতাব্দীর বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলেও তাহা অব্যাহত থাকে। বাঙ্গালার প্রথম সাহিত্যিক সম্পদ চর্য্যাপদগুলির উদ্ভব খৃঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীতেই হওয়া সম্ভব এবং এই রচনাগুলির মধ্যে তান্ত্রিক শিব দেবতার ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই শিব দেবতাকে খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দীতে সেনরাজবংশ যে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন তাহা তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে এই দেবতার উল্লেখেই বুঝিতে পারা যায়।

বিভিন্ন জাতিসমন্বয়ে গঠিত বাঙ্গালী জাতির শিবঠাকুরের নামে সন্ন্যাস গ্রহণ, চড়কপূজা, নীলের (শিবঠাকুরের) পূজা, শিবের গাজন, ত্রিনাথের পূজা, গম্ভীরা, নাথপন্থীদের শিবভক্তি ও বাঙ্গালীর নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে শিবভক্তির প্রাচুর্য্য প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী জাতির মনের উপর শিবদেবতার প্রভাবের সাক্ষ্যদান করে। বাঙ্গালাতে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার অন্ততঃ এক শতাব্দী পর হইতে, অর্থাৎ খৃঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে, বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ আর্য্যসংস্কৃতির আদর্শ ক্রমশঃ ভালভাবে গ্রহণ করিতে থাকে এবং খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে উহা সম্পূর্ণতালাভ করে। এই সময় পর্য্যন্ত কি আদিযুগের শূন্যপুরাণ ও কি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য—সকল সাহিত্যের একাংশ শিবের কথায় পূর্ণ থাকিত। এই দিক দিয়া শূন্যপুরাণের "শিবের গান" উল্লেখযোগ্য এবং মঙ্গলকাব্যগুলির প্রথমাংশ শিবঠাকুর সম্পর্কেই সর্ব্বদা রচিত হইত। নাথপন্থী এবং অপরাপর কতিপয় সাহিত্যও শিবের কথাতে ভরপুর দেখা যায়।

"শিবায়ন" নামে স্বতন্ত্র সাহিত্যের অস্তিত্ব খৃ: ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না, তবে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইলে অন্যকথা। আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত শিবের কাহিনীতে একেবারে সৃষ্টিতত্ত্ব, শিব-বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি কাহিনী পৌরাণিক সংস্কৃতির যুগে বিবৃত করা হইয়াছে, আর "শিবায়ন" নামে মঙ্গলকাব্য হইতে বিযুক্ত শিবের কাহিনী এই সমস্ত পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত যুক্ত প্রধানত: কৃষি-পরায়ণ অপৌরাণিক শিবঠাকুরের চিত্র। বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের সম্মুখে খনার বচনের পাশাপাশি দেখাইবার জন্যই ইহা যেন বিশেষ করিয়া রচিত হইয়াছে। কোন সময়ে কৃষককুলের জন্য রচিত শিবায়নের ছড়া প্রথমে মুখে মুখে চলিত থাকিয়া পরবর্ত্তীকালে খৃ: ১৭শ শতাব্দী হইতে লিখিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই। মধ্যযুগের সুসমৃদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে অকস্মাৎ খৃ: ১৭শ শতাব্দীতে "শিবায়ন" সাহিত্যের আবির্ভাবের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই সময় বাঙ্গালাদেশ মোগলবাদসাহদের অধীন। সম্ভবত: তৎকালীন মোগল শাসকসম্প্রদায়ের দরবারের বিলাসপরায়ণ বিকৃতরুচি হিন্দুসমাজে প্রতিফলিত হইয়া বাঙ্গালা সহিত্যে যে লিখিত নিদর্শনগুলি রাখিয়া গিয়াছে "শিবায়ন" সাহিত্য তাহার অন্যতম উদাহরণ। শিবঠাকুরের প্রতি ভক্তির আধিক্যহেতু এই দেবতার নামে কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেও রচনাকারিগণ সুরুচির পরিচয় দেন নাই, ইহা সম্ভবত: কালমাহাত্ম্য। ইহা ছাড়া কৃষকসম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুরোধেও শিবায়ন বাংক্রমে লিখিত আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অবশ্য এই সমস্ত অনুমান কতটা সত্যনির্দ্ধারণ করিতেছে তাহা বলা কঠিন।

রুচি সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইহার আদর্শ যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। কাল যাহা সুরুচি আজ তাহা কুরুচি। এমতাবস্থায় কোন সাহিত্য বা সমাজের কোন বিশেষ যুগের রুচি পরবর্ত্তী যুগে ভাল না লাগিলেও কঠোর মন্তব্য অনাবশ্যক। শিবভক্তগণ শিশ্ন-দেবতা শিবঠাকুর সম্বন্ধে এবং বৈষ্ণবগণ পুরুষ-প্রকৃতির দ্যোতক রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সব রচনার নিদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেবলীলার বর্ণনাচ্ছলে লেখকের বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দেয় কি না তাহাও বিবেচ্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

শিবায়নের কবিগণ

(১) রামকৃষ্ণদেব

শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণদেবের আত্মবিবরণী পাঠে জানা যায়, কবির পিতা "সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর" কৃষ্ণরামদেব[১] ও মাতা রাধাদাসী। কবি রামকৃষ্ণ "দাস" উপাধিও ব্যবহার করিতেন। যথা,—

"রামকৃষ্ণ দাস রচে মধুর ভারতী।
ধ্যানেতে জানিলা ব্রহ্মা দক্ষের দুর্গতি॥"

— দক্ষের শাস্তি।

কবির নাম রামকৃষ্ণ ও তাঁহার পিতার নাম উহা উল্টাইয়া কৃষ্ণরাম একটু অদ্ভুত বটে। কবির উপাধি 'কবিচন্দ্র' ছিল বলিয়াও অবগত হওয়া যায়। রামকৃষ্ণ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। কবির গ্রামের নাম রামপুর। কবি রামকৃষ্ণ যে সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার শিবায়ন পাঠেই বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত পুরাণাদির প্রভাব খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের এই কবির রচনায় থাকা স্বাভাবিক।

রামকৃষ্ণের শিবায়ন শিবের কাহিনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইলেও তৎপূর্ব্বে শিবের কাহিনী অন্য গ্রন্থগুলির অংশ হিসাবে গণ্য হইত। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে খৃঃ ১১শ শতাব্দীর রামাই পণ্ডিতের রচিত "শূন্যপুরাণে"র অন্তর্গত "শিবের গান" উল্লেখযোগ্য। এই কবির লেখা কতিপয় ছত্র এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

"ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোসাঞি কেওদাবাঘের ছড়॥

১। কবি কৃষ্ণরাম নামে আর একজন কবি শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নিমতাগ্রাম নিবাসী "বিদ্যাসুন্দরে"র কবি কৃষ্ণরাম দাস। এই কবির জন্ম সময় আনুমানিক ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ।

তিল সরিষা চাষ কর গোসাঞি বলি তব পাএ।
কতনা মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ॥
মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাষ।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চামৃতর আশ॥
সকল চাষ চষ প্রভু আর রোইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধম্ম-পূজার বেলা॥

—রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ।

এই কৃষক শিবের আদর্শই পরবর্ত্তীকালে শিবায়নের কবিগণ পৌরাণিক চিত্রের পাশাপাশি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মপূজক রামাই পণ্ডিতের এই রচনা পাঠে ধর্ম্ম ও শিবঠাকুর দুই দেবতা ও শিবঠাকুর ধর্ম্মঠাকুর হইতে নিম্নে এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনে হয় ধর্ম্মঠাকুর ও শিব একই দেবতার প্রকার ভেদ মাত্র। শিব-ঠাকুর ধর্ম্মঠাকুররূপে ধর্ম্মপূজকদিগের নিকট অধিক মান্য পাইয়া থাকিবেন। ধর্ম্মঠাকুর স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারা প্রথমে পূজিত হইলেও পরে শিবঠাকুরের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়া থাকিবেন। এইরূপ মতও গ্রহণযোগ্য কি না বিবেচ্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে[১] "শিবায়ন" প্রথমে স্বতন্ত্র কাব্য ছিল পরে অন্যান্য কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। আমাদের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ "শিবায়ন" প্রথমেই অন্যান্য কাব্যের অঙ্গীয় ছিল এবং পরে স্বতন্ত্র হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতের পক্ষে প্রমাণাভাব। শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষে "মৃগলুব্ধ" নামক ব্যাধের উপাখ্যান (রতিদেব ও রঘুরাম রায় কৃত) ও শিবায়নের উপাখ্যান অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "মৃগলুব্ধ"কে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "শিবায়নে"র সহিত একই পর্য্যায়ে ফেলিলেও উহা এক বিষয় নহে। "মৃগলুব্ধ" বা ব্যাধের কাহিনী রামকৃষ্ণের "শিবায়নে"র প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে রচিত সুতরাং ইহা শিবায়নের প্রাচীন রূপের দাবী করিতে পারে না। শিবায়ন রচনার মধ্যে অশ্লীল অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। শিবায়ন কাব্যের অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় হাস্যরস। এই হাস্যরস কতকটা অম্লমধুর, কেননা ইহাতে শিব-দুর্গার কাহিনীর ভিতর দিয়া "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হইলে পরিবারের কি দুরবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি সংস্কার যুগের কৌলিন্য প্রথার আভাষ দিয়াছেন। উল্লিখিত সংসারে সন্তান-

১। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৪০৫)।

সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি করে তাহার উজ্জ্বল চিত্র রহিয়াছে। বর্ণনা ও বিষয়-বস্তুর ভিতর দিয়া শিবায়নের কবিগণ আমাদের ঘরের কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে শিবায়ন শ্রেণীর কাব্য বেশ বাস্তবধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে। দেবলোক ও নরলোকের এই বিস্ময়াবহ সম্মেলন কবিগণ কৃতিত্বের সহিতই করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন উভয়ই বাস্তবধর্ম্মী হইলেও মঙ্গলকাব্যের নরলোকের কাহিনী শিবায়নের দেবলোকের কাহিনী অপেক্ষা অবশ্য আমাদের অধিক নিকট। শিবায়নের কাহিনী কবিগণ সাধারণতঃ অকৃত্রিম ভক্তিরস মূল ভিত্তি করিয়াই রচনা করিয়াছেন।

কবি রামকৃষ্ণের কাব্য সমালোচনা করিতে যাইয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,—

"প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র একখানি শিবায়ন প্রণয়ন করেন। ইহার পরে দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামক কবিকৃত "বৈদ্যনাথমঙ্গল" বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানিও আকারে বৃহৎ। শিবপার্ব্বতীর ঝগড়া, শিবের চাষ-আবাদের কথা, বর্ষারম্ভে ভগবতীর বিরহ, এবং মষা, জোঁক, প্রভৃতি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া শিবঠাকুরকে ধান্যক্ষেত্র হইতে কৈলাশের কুঞ্জবনে আনিবার চেষ্টা, অকৃতকার্য্য হইয়া পার্ব্বতীর বাগ্দিনীবেশে শিবকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা, বাগ্দিনীর প্রতি অনুরাগ এবং তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় ভগবতীর ভীষণ ক্রোধ, নারদের যত্নে দম্পতীর ক্রোধশান্তি এবং মিলন, শিবের নিকট পার্ব্বতীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা প্রকাশ, গৃহের অস্বচ্ছলতা নির্দ্দেশ করিয়া শিবের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, পার্ব্বতীর অভিমান এবং পিত্রালয়ে গমন, শাঁখারি বেশে শিবের হিমালয় যাত্রা এবং পার্ব্বতীর হস্তে শাঁখা পরান, উভয়ের পুনর্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায় সমস্ত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলে বিবৃত হইয়াছে। কাব্যাংশে শঙ্করকৃত "বৈদ্যনাথমঙ্গল" দ্বিজ ভগীরথের "শিবগুণমাহাত্ম্য" এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের "শিবায়ন" হীন না হইলেও বোধ হয় বটতলার আশ্রয়লাভ করিয়াই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নখানিই বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছে।"[১]

কবি রামকৃষ্ণের রচনার মধ্যে পৌরাণিক প্রভাবের কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৪০৫—৪০৬।

(ক) শিবনিন্দা

"শুন মাতঃ সত্যবতি পাগল তোমার পতি
নিমন্ত্রণ না করিনু লাজে।
কদাচার দিগম্বর অস্থিমালা অমঙ্গল
দেবের সমাজে নাহি সাজে॥
শ্মশানের ছাই মাখে ভূতপ্রেত সঙ্গে থাকে
চূড়ামণি কলঙ্কের কলা।
ধুস্তূর তাহার ভক্ষ্য সিদ্ধিতে ঘূর্ণিত চক্ষু
গরল যোড়িল সব গলা॥
বাছা গো হর নহে যোগ্যাক জামাতা।
ভ্রমে ভিক্ষুকের বেশে কেবল শিবের দোষে
পাসরিল তোমার মমতা॥" ইত্যাদি।

—রামকৃষ্ণের শিবায়ন।

(খ) দক্ষের শাস্তি

"দেবতা পলাইয়া যায় তেত্রিশক কোটি।
মহাকাল ক্রোধেতে দক্ষের ধরে ঝুটি॥
বলিতে লাগিলা দুই হস্ত বান্ধি পীঠে।
পিপীলিকার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে॥
শঙ্করের সহিত তোমার পাঠান্তর।
দেব-যজ্ঞ কর তুমি না মান ঈশ্বর॥
যেই মুখে সদাশিবে তুমি দিলে গালি।
নরক-কুণ্ডেতে সেই মুখ ছিণ্ডি ফেলি॥
রসনা ছিড়িয়া বিলাইব কাক চিলে।
কাড়াকাড়ি করি যেন অন্তরীক্ষে গিলে॥
এতেক বলিয়া মারে শতেক চপেট।
খসিল দক্ষের মুখ ললাটের হেট॥
নাকচক্ষু উপাড়িল ভাঙ্গিল দশন।
রসনা খসিয়া পড়ে ছিণ্ডিল শ্রবণ॥
কপাল চিবুক মুণ্ড হৈল তার গুড়া।
পড়িলেন দক্ষ যেন পাণ্ডুয়া কুমুড়া॥" ইত্যাদি।

—রামকৃষ্ণের শিবায়ন।

(২) জীবন মৈত্রেয়

কবি জীবন মৈত্রেয় বগুড়া সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত করতোয়া নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত লাহিড়ীপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "বিষহরি পুরাণ" নামে একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য এবং ১৬৬৬ শকে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) একখানি শিবায়ন রচনা করেন। এই কবির মনসা-মঙ্গল অপেক্ষা শিবায়নখানি স্থানে স্থানে অধিক কবিত্বপূর্ণ ও জীবন্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তাঁহার "শিব-দুর্গার কোন্দল" বর্ণনার মধ্য দিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের আন্তরিক দুঃখের কথা বড় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

শিব-দুর্গার কোন্দল

"শিব বলে কৈতি পারি পাষাণের ঝি।
কার কারণে কোন দোষে ভিক্ষা করিয়াছি॥
তোমাকে বিভা করি আমার কোন দিন নাই সুখ।
আদি কথা কহিলে পাইবা বড় দুঃখ॥
যেদিন সম্বন্ধ হইল তত্ব পাইনু মুই।
সেদিন হারাইল আমার ঝুলি সিয়া সুঁই॥
নিরীক্ষণ পত্র হইল যেহি দিন।
আচম্বিত হারাইল পরনের কৌপীন॥
যেদিন তোক বিভা করিয়া লইয়া আইনু ঘরে।
চৌদ্দ আটি ভাঙ্গ সেহি দিন নিল চোরে॥
যেদিন বৌভাত খাইনু নির্ব্বংশিয়ার বিটি।
সেদিন হারাইনু মোর ভাঙ্গ ঘোঁটা লাঠি॥
কুড়া গেল মুখারি গেল গেল ভাঙ্গের ঝুলি।
তোর কারণে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই ধুলি ধুলি॥
আর ইহার দুইটা বেটা তারা হইয়াছে মোর কাল।
কে জানিবে মোর দুঃখ গৃহের জঞ্জাল॥
গণেশের ইন্দুর আমার নিত্য কাটে ঝুলি।
প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্য সিয়া জোড়া করি॥
কার্ত্তিকের ময়ূরে আমার সর্প ধরিয়া খায়।
কহ দেখি এত দুঃখ কার প্রাণে সয়॥"

—শিবায়ন, জীবন মৈত্রেয়।

(৩) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শিবায়নের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বনিবাস মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম এবং পরে উক্ত পরগণার অন্তর্গত অযোধ্যাবাড় গ্রাম। কবি কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহারই উৎসাহে "শিব-সংকীর্ত্তন" নামে আর একখানি শিবায়ন অনুমান ১৭৫০ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। কবি "সত্যপীরের কথা" নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি যদুপুর গ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন ও প্রপিতামহের নাম নারায়ণ ও মাতার নাম রূপবতী। কবির উৎসাহদাতা রাজা যশোবন্ত সিংহ ১৭৩৪ (?) খৃষ্টাব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদ পাইয়াছিলেন। কবির দুই স্ত্রী ছিল—তাঁহাদের নাম সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবির দুই ভ্রাতার নাম শম্ভুরাম ও সনাতন। এতদ্ব্যতীত কবির তিন ভগিনীও ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবিরচিত শিবায়নের ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুথির কথা তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার ফলে তৎসম্পাদিত "বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে" কবির "শিবায়ন" রচনার কাল ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ অনুমান করিয়াছেন। ইহা হওয়া অসম্ভব নহে।

কবি রামেশ্বরের রচনার মধ্যে পৌরাণিক ও কৃষক-দেবতা হিসাবে শিবের দুই রূপই বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। পৌরাণিক অনেক অবান্তর প্রসঙ্গও রামেশ্বরের গ্রন্থে প্রচুর রহিয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"রামেশ্বরের রচনা অতিরিক্ত অনুপ্রাসদুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না। কিন্তু "শিব-সংকীর্ত্তনের" আদ্যন্ত কবির মার্জ্জিত মৃদু হাস্যের রশ্মিতে সুন্দর"।[১]

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের এই সমালোচনা সুন্দর ও সমর্থনযোগ্য হইলেও একটি কথা বলা চলে। গভীর ভাবের আংশিক অভাব এই কবির কেন, শিবায়নের প্রায় সব কবির রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার এক কারণ দেবতার কথা বলিতে গিয়া কবিগণ আমাদের ঘরের কথা বলিয়াছেন। ভক্ত কবি ও ভগবানের একান্ত নৈকট্যই ইহার অন্যতম কারণ। এই

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং (দীনেশচন্দ্র সেন), পৃঃ ৪০৬—৪০৭।

হিসাবে দেখিলে রামেশ্বরের লেখাতে কোন গভীর ভাবের একান্ত অভাব রহিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করাও চলে না।

কবির বর্ণনামাধুর্য্য গৃহিণী অন্নপূর্ণার চিত্র অঙ্কনে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—

(ক) পুত্রগণসহ শিবকে দুর্গার অন্নদান

"যোত্র করি পুত্র দুটী লয়ে দুই পাশে।
পাতিত পুরট পীঠে পুরহর বসে॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি॥
তিনজনে একুনে বদন হৈল বার।
গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ী পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা॥
মূষগ মাএর বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
* * *
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥
* * *

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥" ইত্যাদি।

—শিবায়ন, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

(খ) নিম্নে কৃষি-দেবতা শিবের বর্ণনা দেওয়া গেল।

শিবের কৃষিকার্য্য

"ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশান দিলা বলে।
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চেলে॥
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বাবচে বরাটে চেঁচুড়া ঝাড়া উড়ি।
গুলামুখি পাতি মারে পুঁতে যায় ঝুড়ি॥
দলদুর্ব্বা শোনা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে দূর দূর॥
খর খর খুঁজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলি ধরি ধাইল ধান্যের ধরি ঝাড়॥

*　　　*　　　*

জানিলা যোগিনী জটিলের মনোরথ।
জলে স্থলে জলৌকা পাঠালা তুই মত॥
ছোট ছোট ছিনে জোঁক ছুটে বুলে ঘাসে।
জলে বুলে জেতে জোঁক রুধিরের আশে॥" ইত্যাদি।

—শিবায়ন, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কবি রামেশ্বরের শিবায়নের শিবানুচর ভীমকে আমরা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্যপুরাণেও দেখিতে পাই। এই কবির শিবায়নে তান্ত্রিক, পৌরাণিক ও কৃষক শিবের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।

(৪) দ্বিজ কালিদাস

শিবায়নের কবি দ্বিজ কালিদাস কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সমসাময়িক। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই কবি শিবায়ন শ্রেণীর সাহিত্যের শেষ প্রসিদ্ধ কবি। দ্বিজ কালিদাসের শিবায়নের নাম 'কালিকা-

বিলাস'; বা ,'কালিকা-মঙ্গল'। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলের" অনুকরণে কবির গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। 'কালিকা-মঙ্গল' আকারে বৃহৎ ও গুণে প্রাঞ্জল এবং উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই কবির পরিচয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। কবির রচনার নমুনা এইরূপ ;—

(ক) গিরিরাজের কৈলাসে আগমন

"এইরূপে গিরিবর হরিষ অন্তরে।
উত্তরিলা তদন্তরে কৈলাস শিখরে॥
কৈলাসের দ্বারে নন্দী, দুয়ারী আছিল।
গিরিবরে হেরে দূত উঠে দাঁড়াইল॥
চরণের ধূলি লয়ে নিল মস্তকেতে।
আস আস বলে গিরি তোষে বচনেতে॥
নন্দী বলে ঠাকুরদাদা আছহে কেমন।
কেমন আছেন আইবুড়ী শুনি বিবরণ॥
বৃদ্ধকালে নারী ফেলে এলে কেন বুড়া।
সেথা পাছে আইবুড়ী করে ঘরযোড়া॥
আইরে সপিয়া বল এলে কার স্থানে।
হয় সন্দ বুঝি দ্বন্দ্ব হয়েছে দুই জনে॥
বুড় ভেবে বুড়ী বুঝি ঔদাস্য ভাবিয়া।
ঠাকুরদাদা তোমারে বা দিছে তাড়াইয়া॥
গিরি বলে ওহে নাতি মন দিএ শুন।
বুড়াতে বুড়াতে ভাব ভাঙ্গে কি কখন॥" ইত্যাদি।

—দ্বিজ কালিদাসের কালিকা-বিলাস।

(খ) মেনকার উমা-বিরহ

"উমা বিনে গিরিরাণী পাগলের প্রায়।
অন্নদা অভ্যাবে অন্নজল নাহি খায়॥
উমা ভেবে অবিরত মৌনী হএ রয়।
কালেতে শরৎ ঋতু হইল উদয়॥
গগনেতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা ঝরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে সরস অন্তরে॥

ঘোর নাদে জলধর গগনে গর্জ্জয় ।
সরোবরে সরোজ সুখেতে প্রকাশয় ॥
কেতকিনী অমনি প্রফুল্ল হএ উঠে ।
পায় গন্ধ মকরন্দলোভে ভৃঙ্গ ছুটে ॥
বাঢ়এ শশীর আভা অপরূপ শোভা ।
চকোর চকোরী উড়ে সুধা সাধে শোভা ॥
শরৎ দেখিয়া সুখী হইলা ত্রিসংসারে ।
শারদা সেবার চেষ্টা সাধ সব করে ॥
হেনকালে মেনকার যত প্রতিবাসী ।
রাণীকে ভৎ‍র্সনা করি সবে কহে আসি ॥
কেমনেতে হে গো রাণি আছ প্রাণ ধরে ।
সুবর্ণ প্রতিমা উমা সঁপে পাগলেরে ॥" ইত্যাদি ।

—দ্বিজ কালিদাসের কালিকা-বিলাস ।

(গ) কুচনী নগরে শিব

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভব ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
রসের কুচনী পাড়ায় উত্তরিলা গিয়া ॥
কৃত্তিবাসে হেরি যত কোচের রমণী ।
বুড়া আইল বলে হেসে তোষে সব ধনী ॥
কোন ধনী কহে ওহে রসিকের চূড়া ।
আমা সভা ভুলে কোথা ছিলে ওহে বুড়া ॥
তোমারে না হেরে বুড়া মনোদুঃখে মরি ।
এত বলে হেসে ঢলে পড়ে সব নারী ॥"

—দ্বিজ কালিদাসের কালিকা-বিলাস ।

এই স্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য । শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন রচনা করিয়া কেহ তাহা কালী বা দুর্গার নামে পরিচিত করেন না । অথচ দ্বিজ কালিদাসের এইরূপ করিবার এক কারণ এই হইতে পারে যে তাঁহার গ্রন্থখানি চণ্ডী-মঙ্গল ও শিবায়ন উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের গুণসম্পন্ন সুতরাং গ্রন্থখানির নাম কালিকা-বিলাস । নিজ নাম কালিদাস হওয়াতেও সম্ভবতঃ কবির এইরূপ নামকরণ করিবার ভক্তিমূলক অভিপ্রায় থাকিতে পারে । ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের "অন্নদা" কথাটি গ্রন্থে দেবীর "কালী" নাম প্রয়োগে কবিকে প্রেরণা যোগাইতেও পারে ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্য

(পৌরাণিক সংস্কার যুগ)

(রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ গ্রন্থ)

অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই দেশের সাহিত্যে ও সমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবেশের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর্য্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শে রচিত এই জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ প্রকাশ খৃ: ১৫শ শতাব্দী হইতে খৃ: ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত। এই কতিপয় শতাব্দীকে "সংস্কার যুগ" বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালাদেশ মূলত: আর্য্যেতর জাতির দেশ। এই দেশে বিভিন্ন আর্য্যেতর জাতির আগমনের অনেক পরে আর্য্যগণ আগমন করিয়াছেন। ইহা খৃষ্টজন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। বৈদিক সাহিত্যে জানা যায় এই আর্য্যেতর জাতিগণ বা "ব্রাত্যগণ" অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিল। আর্য্যগণ এই বাঙ্গালা বা "প্রাচ্য" দেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিতেন এবং প্রাচ্যান্তর্গত বঙ্গদেশকে "বঙ্গরাক্ষসৈ:" বা বঙ্গরাক্ষসগণের বাসভূমি মনে করিতেন। এই দেশকে কাকপক্ষীর দেশও বলিতেন। অত:পর খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দলে দলে তাহারা ক্রমশ: এই দেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাটগণের আমলে তাহারা এই দেশের অধিবাসীরূপে গণ্য হইয়াছে। খৃ: ৪।৫ শতাব্দীতে হিন্দু গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে তাহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন অবস্থা হইতে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতেছিল। খৃ: ৭ম শতাব্দী হইতে আর্য্যজাতীয় ব্রাহ্মণগণ দলে দলে বিভিন্ন শাখায় ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। ইহারা বৈদিক, সারস্বত ও সপ্তশতি নামে পরিচিত। কিন্তু তাহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলে (খৃ: ১১শ শতাব্দীতে) পুনরায় প্রতিষ্ঠা হারাইয়া বসিল। অবশেষে বাঙ্গালায় হিন্দু শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূর (খৃ: ৮ম শতাব্দী) ও তৎপরবর্ত্তী সেনরাজগণের আমলে (খৃ: ১২শ শতাব্দী) "কোলাঞ্চ" (কান্যকুব্জ ?) হইতে আগত নূতন ব্রাহ্মণদল "রাঢ়ী" ও তৎসংশ্লিষ্ট "বারেন্দ্র" নামে পরিচিত হইয়া এই দেশে বাস করিতে থাকে এবং নূতনভাবে পৌরাণিক আর্য্যগণের আদর্শে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিতে থাকে। এই সামাজিক বিপ্লবের সময় খৃ: ৮ম।৯ম শতাব্দীতে

আদিশূরের সময় তাহারা প্রথম নূতন আদর্শ স্থাপন করে। খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেন রাজা বল্লাল সেনের সময় (রাজত্বকাল খৃঃ ১১৬৭ পর্যান্ত) প্রথমে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কতিপয় জাতির মধ্যে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুনরায় খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথম হইতে মুসলমান রাজত্ব এতদ্দেশে স্থাপিত হওয়ার ফলে সামাজিক বিপ্লব ভীষণভাবে প্রকট হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ আমল হইতেই বাণিজ্যব্যপদেশে দেশবিদেশে জলপথে গমনহেতু সামাজিক বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজনৈতিক বিপ্লবে উহা আরও প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু মুসলমানগণ প্রথম দুইশত বৎসর দেশ অধিকারে অধিক মনোযোগী হয় এবং ক্রমে হিন্দু সমাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকে। বরং মুসলমান রাজশক্তি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম জানিবার অন্যতম উপায়স্বরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে অভিলাষী হয়। এই সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার সুবিখ্যাত "অষ্টবিংশতি তত্ত্ব" রচনা করিয়া হিন্দুসমাজ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও সহপাঠী ছিলেন। একদিকে শ্রীচৈতন্য হরিভক্তি প্রচার দ্বারা বিভিন্ন হিন্দুসমাজের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করিতেছিলেন অপরদিকে রঘুনন্দন কঠোর নিয়মের গণ্ডি বাঁধিয়া তৎরচিত স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে হিন্দুসমাজ রক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলেন। রঘুনন্দনের পূর্ব্বে খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক তাঁহার "মেল বন্ধন" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন অধোগামী কৌলিন্যপ্রথার সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেন। রঘুনন্দন ও দেবীবর উদারতার মধ্যেও যে কঠোরতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন তাহা সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে। উহার এক সময়ে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উদারতাকে সমাজের ভিত্তি না করিয়া শুধু নিয়মের গণ্ডি দিয়া যে সমাজ রক্ষা করা যায় না এবং যুগে যুগে যে উহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের পরবর্ত্তী অধঃপতনে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক এই খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ ও সাহিত্যে "সংস্কার-যুগ" আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রথমে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের বাঙ্গালায় অনুবাদ অনুমোদন না করিলেও এই সময় হইতে ক্রমে বাঙ্গালার মুসলমান রাজশক্তির ও ধনী সম্প্রদায়ের উৎসাহে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কিয়দংশের বাঙ্গালা অনুবাদ আরম্ভ হয়। ইহাই অনুবাদ সাহিত্যের জন্ম-বিবরণ। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রধান। শাস্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন অন্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থও কালক্রমে অনূদিত

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ রক্ষণশীল মনোবৃত্তির ফলে প্রথমে বিরোধিতা করিলেও কালক্রমে তাহার "ভাষা" বা বঙ্গভাষায় অনূদিত ভারতপুরাণাদির সাহায্যে তাঁহাদের মত প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুধু পুরাণাদির অনুবাদের সাহায্যে কেন, লৌকিক সাহিত্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের নূতন মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচলনে তাঁহারা দুইটি মূলতত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি। দেবতার সমপর্য্যায়ে নিজেদের ফেলিয়া তাঁহারা "ভূদেব" আখ্যা নিয়াছিলেন এবং সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ থাকিয়া কালে সমাজের অন্যান্য অঙ্গকে কৃশ করিয়া হিন্দুসমাজকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

লৌকিক ও অনুবাদ সাহিত্য উভয়ই পুরাণধর্ম্মী কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের মতবাদ প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে এবং ইহা ভিন্ন ইহাদের একটির প্রভাবও অপরের উপর পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ লৌকিক সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের গল্প এবং আদর্শের অজস্র উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যে যথা, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মধ্যে লৌকিক সাহিত্যের বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের ইঙ্গিত এবং তান্ত্রিকতার প্রভাব, লৌকিক সাহিত্যের পারিবারিক চিত্রের আদর্শের অনুকরণ এবং সংস্কৃত অলঙ্কারের পার্শ্বে দেশজ অলঙ্কারের ব্যবহার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যেও লৌকিক সাহিত্যের সারল্য ও অনুবাদ সাহিত্যের সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃষ্ণপ্রেম এবং ভক্তিতত্ত্বের প্রচার লৌকিক ও অনুবাদ সাহিত্যকে (বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পরে) প্রায় সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অনুবাদ দুই প্রকারের হইতে পারে,—(১) শব্দ এবং অর্থানুবাদ ও (২) ভাবানুবাদ। এই দুই প্রকারের অনুবাদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রায়শঃ ভাবানুবাদ এবং কদাচিৎ শব্দ ও অর্থানুবাদ। আমরা ভাগবতের অনুবাদগ্রন্থগুলির আলোচনা পরে বৈষ্ণবসাহিত্য আলোচনার সময় করিব। লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্গত চণ্ডীকাব্যের সঙ্গে সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান অধ্যায়ে প্রথমেই শুধু রামায়ণ ও মহাভারতের কবিগণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া অন্যান্য নানা অনুবাদ গ্রন্থের কবিগণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

(পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্য)

রামায়ণের কবিগণ

(১) কৃত্তিবাস

কবি কৃত্তিবাস[১] বাঙ্গালা রামায়ণ রচনাকারিগণের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া প্রথম[২] এবং তাঁহার রচনা গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃত্তিবাস কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নিয়া মতভেদ আছে। কথিত হয় কৃত্তিবাস তাঁহার বংশপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জন্মবৎসর সম্বন্ধে একেবারে নীরব। তদুপরি তাঁহার রামায়ণ রচনার আদেশ ও প্রেরণাদাতা কোন গৌড়েশ্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই রাজার নামটি লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আর একটি সমস্যা আছে। কবি ও তাঁহার উৎসাহদাতা নৃপতি সম্বন্ধে অনেক খুঁটি-নাটি তথ্যপূর্ণ অথচ প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অভাবসমন্বিত তাঁহার "আত্মবিবরণ"টি কবি সম্বন্ধে জানিবার আমাদের একমাত্র সূত্র, অথচ ইহা প্রামাণিক কি না তাহা বলিবার উপায় নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায় সর্ব্বপ্রথম হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় একটি মাত্র সুপ্রাচীন পুথিতে উহা অর্থাৎ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণিটি প্রথমে পাইয়াছিলেন এবং উহা নকল করিয়া বহুদিন পূর্ব্বে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে পাঠাইয়াছিলেন। ডাঃ সেন উহা বিশ্বাস করিয়া তখনই তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত করিয়া-

---

(১) কবি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা উপলক্ষে নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, History of Bengali Language and Literature এবং Typical Selections from Old Bengali Literaure. Part I, 1st edition (C. U.), Descriptive Catalogue (Bengali Mss. Vol. I), C. U. এবং মৎরচিত Raja Ganesh দ্রষ্টব্য।

(২) "আমরা কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত চৈতন্য-মঙ্গলের মুখবন্ধে জয়ানন্দ কবি কৃত্তিবাসের পাঁচালীর উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ, ইঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—"করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ।" (অনুসন্ধান, ১৩০২ ২৩৫ পৃঃ) এবং পরবর্ত্তী বহু লেখক ইঁহাকে বন্দনা দিয়া অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল। অনেকে খুব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং উহাতে তরণীসেন বধ, বীরবাহু বধ, শ্রীরামের দুর্গা পূজা প্রভৃতি মূল বিবর্জ্জিত প্রসঙ্গ পাই নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—'শ্রীরামচন্দ্রের ভগবতী পূজা' ও 'রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন' প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ৮৩"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ১০০ পৃঃ, (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)।

ছিলেন। হারাধন দত্ত মহাশয়ের পুথিখানি খুব প্রাচীন, কারণ ১৫০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ১২৫, ৬ষ্ঠ সং)। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও উহা প্রমাণিক বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। অনেক কাল পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক আর একখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতেও নাকি এই "আত্মবিবরণ"টি আছে অথচ অপর বহু পুথি সংগৃহীত হইলেও সেই সব পুথিতে উহা নাই।

যাহা হউক কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা "বেদানুজ" নামে যে রাজার পাত্র ছিলেন সেই রাজার নাম নিয়াও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ "বেদানুজ" নামে কোন রাজাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অবশেষে স্থির হইয়াছে উহা লিপিকর প্রমাদ। কথাটি হইবে "যে দনুজ" অর্থাৎ "দনুজমর্দ্দন" নামক বা উপাধিযুক্ত কোন রাজা।

কৃত্তিবাস[১] সম্বন্ধে আর এক সমস্যা কবিবর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ-গণের নাম নিয়া। উহাদের কোন কোন নাম নাকি সঠিকভাবে লিপিকার লেখেন নাই। কোন কোন নাম একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বেশ ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে পাওয়া যায়।

অপর এক সমস্যা আত্মচরিতে লিখিত "পূণ্য মাঘ মাস" নিয়া। উহা "পূণ্য" মাঘ মাস, না "পূর্ণ" মাঘ মাস? সর্ব্বোপরি সমস্যা কৃত্তিবাসের পুথি নিয়া। কবির রচিত ও তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুথিতো পাওয়াই যায় নাই। যে সব পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কৃত্তিবাসের লেখা কতখানি আছে ও যুগে যুগে পুথির ভাষারই বা কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

এখন, এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের মন্তব্য বিবৃত করিতেছি।

কৃত্তিবাসের লেখা বলিয়া পরিচিত "আত্মবিবরণ" যে পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সঠিক প্রমাণিত না হইতেছে সে পর্য্যন্ত ইহা কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই। ইহাতে বর্ণিত নরসিংহ ওঝার প্রভু ও আশ্রয়-দাতা রাজা "বেদানুজ" সম্ভবতঃ "যে দনুজ" বা "দনুজমর্দ্দন" দেবই হইবেন। এই "দনুজমর্দ্দন"কে আমরা উপাধিবিশেষ এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত ভাতুড়িয়ার মুসলমানবিজয়ী রাজা গণেশ (খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) বলিয়া অনুমান

১। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে Descriptive Catalogue, vol I, C U. এবং মৎরচিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" দ্রষ্টব্য।

করি। অবশ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দনুজমর্দ্দনকে রাজা গণেশের কোন সামন্ত রাজা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কৃত্তিবাস বর্ণিত তাঁহার উৎসাহদাতা রাজা "গৌড়েশ্বর" তাহিরপুরের রাজা কংশনারায়ণ (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) হইবেন। রাজা কংসনারায়ণের সমৃদ্ধির ফলে তাঁহার তোষামোদকারী কবিগণ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে এইরূপ উপাধি দিয়া থাকিবেন। নরসিংহ ওঝা হইতে তাঁহার বংশতালিকা পর্য্যালোচনা করিলে কবি কৃত্তিবাস কংসনারায়ণের সমসাময়িক হইয়া পড়েন।

কৃত্তিবাসের বংশতালিকা

গৌড়েশ্বরের সভাসদগণের (যথা জগদানন্দ রায়, পণ্ডিত মুকুন্দ ভাদুড়ী, তৎপুত্র শ্রীবৎস বা শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রপৌত্র জগদানন্দ প্রভৃতির) নামের কোন কোনটির একটু পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিলেই দেখা যাইবে তাঁহারা অনেকেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং কংসনারায়ণের আত্মীয় এবং এই সামান্য পরিবর্ত্তন নামগুলিদৃষ্টে অপরিহার্য্য মনে হয়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস (২৪শ বিলাস) ইহার সাক্ষ্যদান করে। প্রেমবিলাসের মতে এই গ্রন্থ রচনার সময় কংসনারায়ণের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কংসনারায়ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বৈষ্ণব গ্রন্থের ২৪শ বিলাসকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, কারণ অনেক সামাজিক সত্য বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া কথিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী"তে কৃত্তিবাসের উল্লেখ হয়ত প্রক্ষিপ্ত এবং "মালাধরী মেল" প্রবর্ত্তনের ঘটনা দ্বারা কৃত্তিবাসের সময় নির্দ্ধারণ সহজ নহে এবং এই সম্পর্কে অত্যধিক অনুমানও নিরাপদ নহে। যাহা

হউক অন্ততঃপক্ষে কৃত্তিবাসকে খৃঃ ১৫শ।১৬শ শতাব্দীর কবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রেমবিলাসের মতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব কংসনারায়ণের প্রভাবের সময় হইয়াছিল সুতরাং কৃত্তিবাস যখন প্রৌঢ়, শ্রীচৈতন্য তখন তরুণ। এই তরুণ বয়সেই শ্রীচৈতন্য কৃত্তিবাসকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবেন।

কৃত্তিবাসের আত্মচরিতে "পূন্য মাঘ মাস" না "পূর্ণ মাঘ মাস" লিখিত আছে। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "পূর্ণ" কথাটি গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োগে খৃঃ ১৪৩২ অর্থাৎ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পরে নিজেই এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অপরপক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লেখকের টানটিকে রেফ মনে করেন নাই এবং কথাটি "পূন্য" মাঘ মাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনই ঠিক, কারণ রেফ না থাকিলেও লেখকের এইরূপ লিখিবার রীতি এক সময় প্রচলিত ছিল এবং বৎসরের কতিপয় পূন্য মাস বলিয়া কথিত মাসের মধ্যে মাঘ মাস অন্যতম। তবে তিনি কখনও ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কখনও ১৪শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বলিয়া কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় নিরূপণ করিয়াছেন। কখনও রাজা গণেশ কখনও কংসনারায়ণকে কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বলিয়াছেন এবং বেদানুজকে স্বর্ণগ্রামের রাজা দনৌজমাধব বলিয়া তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (ইংরেজী সংস্করণ) মন্তব্য করিয়াছেন। কংসনারায়ণের সময়ও নানাস্থানে নানারূপ বলিয়াছেন। রাজা কংসনারায়ণের সময় নিয়া কিছু মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তিনি ১৬শ শতাব্দীর প্রথম কি মধ্য ভাগে জীবিত ছিলেন। কৃত্তিবাস[১] এই রাজারই সমসাময়িক অনুমান করি সুতরাং খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর লোক। যে সব সমালোচক কবিকে খৃঃ ১৪শ কি ১৫শ শতাব্দীর লোক মনে করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। কবির জন্ম বৎসর নিয়া মতভেদ থাকিলেও তিনি মাঘ মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মবিবরণ পাঠে ইহা বুঝা যায়।

কবি কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ও পিতামহের নাম মুরারী

---

(১) কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে ও দনুজমর্দ্দন এবং কংসনারায়ণ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত Raja Ganesh (Journal of Letters Vol. 23 এবং "বাঙ্গালা রামায়ণ", পাক্ষিক, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪ সন, C. U. দ্রষ্টব্য।

ওঝা এবং ইঁহারা মুখুটি। কবির মাতার নাম মালিনী। কবির ছয় সহোদর ও এক ভগিনী ছিল। নিম্নে কবির আত্মবিবরণ[১] উদ্ধৃত করা গেল।

কবি কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ (?) মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্র পৌত্র বাড়য় সন্তুতি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ তাঁহার তনয়॥

১। কতিপয় বিশেষজ্ঞের ন্যায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ "সাহিত্য পরিষদে" রক্ষিত একখানি পুঁথির আদিকাণ্ড হইতে মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি ইহাতে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মুদ্রিত আত্মবিবরণ (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) পাশাপাশি মুদ্রিত করিয়া ডাঃ সেনের পাঠের মারাত্মক প্রভেদ দেখাইয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথির লিপিকার প্রমাদগুলি (যাহা দেখিলেই বুঝা যায়) ডাঃ সেন সংশোধন করিয়া ভালই করিয়াছেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজী History of Bengali Language & Literature গ্রন্থদ্বয়ে কৃত্তিবাসের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করিয়াছেন।

জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাতপুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্ম চর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তুমি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী।
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরাল গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥

* * * *

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য ?) মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণ গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈল কোলে॥

দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগাড় নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥

*　　　*　　　*

গুরুর স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥

*　　　*　　　*

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাদিকারিণী॥
মুকুন্দরাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চ দেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥

—আত্মবিবরণ, রামায়ণ, কৃত্তিবাস রচিত।

কৃত্তিবাসের "আত্মবিবরণ" কবিরই রচিত কি না তাহা নিয়া সন্দেহের অবকাশ আছে।

একে তো ইহাতে অশোভন অতিরিক্ত আত্মপ্রশংসা কবির রচনা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়। তাহার পর ভাষা। কৃত্তিবাসের রচনা হইলে আত্মবিবরণের ভাষা যত প্রাচীন হওয়া উচিত ছিল ইহা সেইরূপ নহে, বরং অত্যন্ত আধুনিক। যুগে যুগে কৃত্তিবাসের নিজ ভাষা অপর কবিগণ কর্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা সত্য বটে। আত্মবিবরণের অংশও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যেও এই পরিবর্ত্তিত আত্মবিবরণ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। বরং যে দুইখানি পুথিতে উহা পাওয়া যায় তাহাও পুরাতন বলিয়া কথিত। এমতাবস্থায় প্রাচীন পুথিদ্বয়ের ভাষার সহিত আত্মবিবরণের আধুনিক সরল ভাষার কোন সামঞ্জস্যই হয় না। যাহা হউক আমাদের সন্দেহ সত্য কি না তাহা বিচার সাপেক্ষ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদর্শ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা ব্যাসের নামে চলিত পদ্মপুরাণের (পাতাল-খণ্ড) অন্তর্গত রামায়ণের কাহিনী কৃত্তিবাস অধিক অনুসরণ করিয়াছেন[১]। এইস্থানে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। রামায়ণের কাহিনী উত্তর-ভারতে বাল্মীকির পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবতঃ গায়কগণ ইক্ষ্বাকু বংশের কাহিনী নানা স্থানে গাহিয়া বেড়াইত। এইরূপ রাবণের কাহিনীও বহু প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে বাল্মীকি মুনি রামের কাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা জনরঞ্জক সঙ্গীত রচনা করেন এবং রাবণের কাহিনী ইহার সহিত সংযুক্ত করেন। বাল্মীকির রামায়ণ প্রথমে পাঁচ পরে ছয় ও সর্ব্বশেষে উত্তরকাণ্ড যোগ হইয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণে পরিণত হয়। দক্ষিণ-ভারত সম্বন্ধে বাল্মীকির অজ্ঞতা রাক্ষসদিগকে বীভৎসভাবে চিত্রিত

১। রামকৃষ্ণ রায় রচিত বাল্মীকি-রামায়ণের ছন্দে বাঙ্গালায় ভাষানুবাদ ও তৎসম্পর্কে ভূমিকা এবং পাদটীকা দ্রষ্টব্য। মৎরচিত "বাঙ্গালা রামায়ণ" (প্রবর্ত্তক শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪) এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের Bengali Ramayanas (C. U. Pub) দ্রষ্টব্য।

করিবার হেতু। বাল্মীকির মূল রামায়ণ পাওয়া যায় না। ইহার ভাষা ও নানা বস্তু মিলিয়া গুপ্তযুগের সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছে এবং বোম্বাই, গৌড়ীয় ও পাশ্চাত্য (ইউরোপীয়) তিনটি নানা প্রভেদপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্মীকির হিন্দু ও সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া দাক্ষিণাত্যে রামায়ণ বা রাবণায়ন গ্রন্থে উত্তরাকাণ্ডই প্রথমে সংযুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ ও জৈন দুই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের বাহিরে যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে ও শ্যামদেশে বিভিন্ন রুচির বিকাশপূর্ণ রামায়ণ তদ্দেশীয় ভাষায় প্রচলিত আছে। এতদ্দেশে বৌদ্ধ জাতক দশরথ-জাতকেও (পালি ভাষায়) রামায়ণের ঘটনা অনেক দূর পর্যান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রুচির দিকে বলা যায় বৌদ্ধ মতানুসারে সীতা রামচন্দ্রের ভগিনী এবং স্ত্রী দুইই। বৌদ্ধগ্রন্থ "লঙ্কেশ্বর" সূত্রে রাবণের বুদ্ধদেবের সহিত তর্কবিতর্ক এবং শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা আছে। জৈনমতে রাবণ যোগসাধনায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। এই প্রকার নানা ভাষার নানা গ্রন্থে মতান্তর রহিয়াছে। অপরদিকে শুধু এই সাধারণ রামায়ণ ছাড়া আরও নানাপ্রকার বিশেষ রামায়ণ রহিয়াছে; যথা—"অদ্ভুত রামায়ণ" (রাবণ-রামায়ণ), "অধ্যাত্ম রামায়ণ" এবং "যোগবাশিষ্ট রামায়ণ"। "অদ্ভুত রামায়ণে" সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের কথা আছে। ইহাতে আছে সীতাদেবী স্বয়ং রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণদ্বয়ে নানা দার্শনিক কথার মধ্যে বিশেষভাবে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে।

বাঙ্গালা রামায়ণের কবিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা উক্ত রামায়ণসমূহ হইতে ইচ্ছানুরূপ বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্ততঃ ইহার ইঙ্গিত তাঁহাদের রচিত রামায়ণগুলিতে রহিয়াছে। তাঁহারা শুধু বাল্মীকির নামে প্রচলিত সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই বাঙ্গালা রামায়ণের কবিগণ সর্ব্বদা ভাবানুবাদ করিয়াছেন এবং ইচ্ছানুরূপ তাহার ব্যতিক্রমও করিয়াছেন। ভাষানুবাদ অথবা সংস্কৃত ভাষার অন্ধ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের মহাকাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহারা মূল গল্প পর্য্যন্ত ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই দিক দিয়া বাল্মীকি ভিন্ন ব্যাস-রচিত "পদ্মপুরাণ" ও দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ কি জৈন রামায়ণ অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসও ইহা হইতে বাদ যান নাই।

কৃত্তিবাসের মূলপুথি না পাওয়া যাওয়াতে বহুপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের পুথিগুলির

মধ্যে স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের পুথিগুলি কিছু বাল্মীকি-রামায়ণ ঘেঁষা। এখন যে কলিকাতা-বটতলায় ছাপা পুথির জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের সারা বাঙ্গালায় এত প্রচার সেই বটতলার রামায়ণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের পুথিগুলির বেশ ঐক্য আছে। শুধু বটতলার ছাপা পুথি অথবা পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যে নিবদ্ধ অতিরিক্ত বৈষ্ণবী ভক্তির সহিত পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিগুলির আদর্শগত মিল নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বীর রাক্ষস অতিকায় বটতলার রামায়ণ অনুসারে বলিতেছেন—

"চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যা-নন্দন॥" ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গের পুথিগুলিতে এই ছত্রসমূহ নাই। এইরূপ বীরবাহু ও তরণীসেনের রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি লেখকের উপর বৈষ্ণব প্রভাবেরই সূচনা করে। অথচ রামচন্দ্র কর্তৃক শাক্তদেবী দুর্গার পূজার কথাও কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। ইহাতে বর্ণিত রাবণের দুর্গার (দেবী উগ্রচণ্ডার) প্রতি ভক্তিও অল্প ছিল না। অনেকে, এমন কি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও মনে করিয়াছেন যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ কর্তৃক কালক্রমে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না। কৃত্তিবাসের রচনা শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) বলিয়া আমাদের ধারণা। ইহা সত্য হইলে কবির নিজের উপরই বৈষ্ণব প্রভাব পড়িবার কথা এবং তাহার ফলেই কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণব প্রভাবের এত বাহুল্য। শাক্ত প্রভাবের ফলে দুর্গা-পূজার উল্লেখ কৃত্তিবাসী রামায়ণে থাকা খুবই স্বাভাবিক কারণ রামায়ণ ও মহাভারতের মূল সুর দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি উপলক্ষ করিয়াই পৌরাণিক গল্পগুলির সাধারণে প্রচার। দেবতাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে উভয় শ্রেণীর দেবতা থাকিলেও বাঙ্গালাদেশে কালক্রমে বৈষ্ণবভাবে এই দুই পুরাণ অথবা মহাকাব্য পরিপূর্ণ হয়। ইহা সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রভাবের ফল। অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত শাক্ত ও বৈষ্ণব মতদ্বয়ের মধ্যে সংযোগসাধক সেতুর কাজ করিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া পরিচিত তদীয় রামায়ণের অনেক অংশ অপরের রচিত। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কবিদের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি নাম বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তাহাদের একজন "কবিচন্দ্র" এবং অপরজন জয়গোপাল গোস্বামী। এই "কবিচন্দ্র" নাম না উপাধি তাহা নিয়া মতভেদ থাকিলেও মধ্যযুগে অনেক কবির উপাধি যে "কবিচন্দ্র"

ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আবার "কবিচন্দ্র" উপাধিযুক্ত শঙ্কর নামক কোন ব্যক্তির রচিত রামায়ণও পাওয়া গিয়াছে। এই কবির কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের "অঙ্গদ রায়বার" অংশ অনেকের মতে এই "কবিচন্দ্র" রচিত। শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় (খৃঃ ১৯শ শতাব্দী) কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে অনেক প্রাচীন শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণকে আধুনিক কালের লোকের পাঠোপযোগী করিয়া গিয়াছেন। নতুবা ইহার ভাষা বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলেই দুর্ব্বোধ্য বা রুচিবহির্ভূত হইত। স্থানে স্থানে কতিপয় ছত্র যোগ দিয়া গোস্বামী মহাশয় পুথিখানির উন্নতি বিধানই করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের নিম্নলিখিত ছত্রগুলি জয়গোপাল গোস্বামীর (তর্কালঙ্কারের) হওয়া অসম্ভব নহে। যথা,—

"গোদাবরী নীরে আছে কমলকানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এতদিনে॥"

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

জয়গোপাল গোস্বামীই বটতলায় ছাপা রামায়ণের স্থানে স্থানে ভাষাগত অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসের সময়ের দুর্ব্বোধ্য ভাষা এইরূপে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশবিশেষ এই প্রাচীন ভাষার সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই ভাষা এখন অপ্রচলিত সুতরাং সুখপাঠ্য নহে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালী চিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার এক কারণ যুগোপযোগী ভাষার পরিবর্ত্তন। অপর কারণগুলির মধ্যে ভক্তিবাদ প্রচার এবং রাম-সীতার চরিত্রগত মৃদুতা ও কমনীয়তা উল্লেখযোগ্য।

বাল্মীকি অঙ্কিত রাম ও কৃত্তিবাস অঙ্কিত রামে অনেক প্রভেদ। প্রথমটি মানবশ্রেষ্ঠ কিন্তু দ্বিতীয়টি অবতার। কৃত্তিবাস চিত্রিত শ্রীরামচন্দ্রের পিতামাতা, পত্নী (সীতাদেবী) ও ভ্রাতৃগণ আমাদের পারিবারিক জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই দিক দিয়া কৃষ্ণায়ন অপেক্ষা রামায়ণ বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের নির্ম্মল আদর্শ হিসাবে অধিক আকর্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী করুণরসের ভক্ত এবং অত্যধিক ভক্তি ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ জাতি। সুতরাং বাল্মীকি বর্ণিত দৃঢ় দেহ, দৃঢ় চিত্ত ও রাবণবিজয়ী রাম অপেক্ষা কৃত্তিবাস বর্ণিত পিতৃমাতৃভক্ত ও পত্নীগতপ্রাণ রামচন্দ্রই বাঙ্গালীর অধিক প্রিয়। আদর্শ ভ্রাতা হিসাবে লক্ষ্মণাদির চিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে মনোরমভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। করুণরসের দিকে চিরদুঃখিনী সীতার কথা এবং সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখময় কাহিনী বাঙ্গালীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। রাবণের ন্যায় মহাবীরকে পরাজয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাঙ্গালীর চিত্ত তত অধিকার করেন নাই। কৃত্তিবাস-রচিত লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ-বর্ণনা ইহার প্রমাণ। এই অংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছায়াপাত করিয়াছে।

কৃত্তিবাস রচিত অপর পুথিগুলির মধ্যে "যোগাদ্যার বন্দনা", "শিবরামের যুদ্ধ" ও "রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী" উল্লেখযোগ্য। এই কবির নামে রচিত "অদ্ভুত রামায়ণ" সত্যই তাঁহার রচিত কি না সঠিক বলা যায় না।

(২) শঙ্কর কবিচন্দ্র

রামায়ণের কবি শঙ্কর (ভবানীশঙ্কর) বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুধু রামায়ণই অনুবাদ করিয়া যান নাই। তিনি মহাভারত এবং ভাগবতেরও অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের আরও অনেক কবির ন্যায় শঙ্করেরও সম্ভবতঃ উপাধি ছিল "কবিচন্দ্র"। কবির রামায়ণে তাঁহার এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

"সাগরদিয়ার বন্দ্য, রবিকরী সর্ব্বানন্দ, গোবিন্দতনয় বিজয়রাম।
তস্য পঞ্চপুত্র দ্বিজ ভবানী শঙ্করাগ্রজ"—ইত্যাদি।

অপর একস্থলে আছে—"বন্দিয়া জানকীনাথে শ্রীশঙ্কর গায়"। শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রণীত লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড পাওয়া যায় নাই কিন্তু আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। শঙ্কর কবিচন্দ্র যে লঙ্কাকাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কৃত্তিবাসের রচিত লঙ্কাকাণ্ডে প্রমাণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের পুথির লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত "অঙ্গদ-

রায়বার" কবিচন্দ্রের রচিত। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের রচিত বলিয়া সাধারণে পরিচিত লঙ্কাকাণ্ডে অনেক কবির রচনাই রহিয়াছে এবং এই শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। অনন্তরাম কৃত রামায়ণে শঙ্করের উল্লেখ রহিয়াছে "কবিচন্দ্র" ও "শঙ্কর" এই দুই নাম স্বতন্ত্রভাবে এবং একত্রে নানা পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। শঙ্কর কবিচন্দ্রের পুথিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ পুথি বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ইহাদের অনেকগুলির হস্তাক্ষর "বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের।" পুথিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তারিখ-যুক্ত থাকিলেও আমরা হস্তাক্ষর এত পুরাতন মনে করি না কারণ শকাব্দ ও মল্লাব্দের গোলযোগ। বিভিন্ন প্রকারের ৪৬ খানি পুথি একই অঞ্চলে কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত থাকাতে অনেক কবিচন্দ্র এবং কোন কোনটির মধ্যে শঙ্কর নামও যুক্ত থাকাতে শঙ্কর কবিচন্দ্রই এই পুথিগুলির রচনাকারী মনে হয়। কবি শঙ্করের ভাগবতের অনুবাদে (ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল মধ্যে) কবির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

"কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্নয়ায় বসতি ॥"—শঙ্করের ভাগবত।

ভাগবতের অনুবাদের অপর একস্থানে আছে—

"চক্রবর্ত্তী মণিরাম অশেষ গুণের ধাম।
তস্যসুত কবিচন্দ্র গায় ॥" –ভাগবতামৃত (সাঃ পঃ ১১৩নং পুথি)।

কবিচন্দ্রকৃত মহাভারতে আছে,—

"শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে।
সংক্ষেপে ভারতকথা কবিচন্দ্র ভাষে ॥"

—মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, সাঃ পঃ ১৩০৮ নং পুথি।

কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এইরূপ প্রয়োগও পুথিগুলিতে আছে। শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ অনেক কাল পাওয়া না গেলেও শুনা যায় কবির দৌহিত্র বংশীয় শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় নাকি কবিরচিত অনেকগুলি পুথি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কবির রচিত অনেক পুথিই নাকি সংগ্রহ করিয়াছেন।

"শঙ্কর কবিচন্দ্রের জন্ম ৯০৩ মল্লাব্দ (১৫৯৬ খৃঃ)। ইনি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন। ১৭১২ খৃঃ ১১৬ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। 'শিবায়ন' নামক কাব্য রচনার সময় ইহার বয়স ছিল ৮৫। ইনি বিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর, রঘুনাথ সিংহ, বীরসিংহ এবং গোপাল সিংহ এই নৃপতি চতুষ্টয়ের রাজত্বকালে বিদ্যমান

ছিলেন। বৈষ্ণবগণোদ্দেশের সিদ্ধান্তমতে ইনি ব্রজলীলার ইন্দিরা সখী।"[১]

অঙ্গদের রায়বার, শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণে

ইন্দ্রজিতের প্রতি অঙ্গদের পরিহাস।

"অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহিস ইন্দ্রজিতা।
এতগুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা॥
(ইহার) কোন্ রাবণ দিগ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে।
কোন্ রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে॥
চেড়ীর উচ্ছিষ্ট খালেক কোন রাবণ পাতালে।
কোন্ রাবণ বান্ধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্ব-শালে॥
কোন্ রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ।
কোন্ রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ॥
কোন্ রাবণ ধনুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা।
তুলিতে কৈলাস-গিরি কোন্ রাবণ গেছিলা॥
কোন্ রাবণ সুরাপানে সদা থাকে মত্ত।
কোন্ রাবণের ভগিনী হর্যা নিলেক মধুদৈত্য॥
তোরে একে একে কঞা দিলাম সকল রাবণের কথা।
ইহা সভাতে কায নাইক যোগী রাবণটি কোথা॥
শূর্পনখা রাণ্ডী তারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক-কাননে সে মাঁগি খালেক ভিক্ষা॥" ইত্যাদি।

(৩) অনন্ত

রামায়ণের কবি অনন্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যেটুকু জানা যায় তাহা নিয়াও মতভেদ রহিয়াছে। বিষয়টি সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবি অনন্তকে কৃত্তিবাসের পরেই রামায়ণের

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৪৫৫)—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার রচিত The Bengali Ramayanas গ্রন্থে রামায়ণকার কবিচন্দ্র ও ভাগবতকার কবিচন্দ্র (উভয়েই ভবানীশঙ্কর) মতান্তরে অভিন্ন হইলেও দুই ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। রামায়ণকার কবিচন্দ্রের লেখা কিছুটা অশ্লীল ও ভারতচন্দ্রের যুগের চিহ্নযুক্ত বলিয়া তিনি তাঁহাকে পরবর্ত্তী কবি অনুমান করিয়াছেন। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য চণ্ডীকাব্যের কবি মুকুন্দরামের এক ভ্রাতার নামও নিধিরাম (মতান্তরে অযোধ্যারাম) কবিচন্দ্র ছিল। ভবানীশঙ্কর কবিচন্দ্র "শিবায়ন" সত্যই রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই, তবে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র নামক এক কবি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে একখানি শিবায়ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সমসাময়িক একজন কবিচন্দ্র ছিলেন। Descriptive Catalogue (C. U. Beng. Mss.) নামক বিবরণে অনেক কবিচন্দ্রের উল্লেখ আছে (সময় অজ্ঞাত)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভাগবতকার কবিচন্দ্র রামায়ণের কবি হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর কবি। মৎরচিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনতম কবি মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালার "পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তরস্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্পর্কে তিনি ভাষার প্রাচীনত্বের কথা বলিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে এখনও বাঙ্গালার অতি অভ্যন্তরের পল্লী অঞ্চলে অনেক জটিল এবং প্রাচীন শব্দ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং শুধু ইহা দ্বারা প্রাচীনত্ব স্থির করা নিরাপদ নহে। অন্য কথা হইতেছে যে "চ" স্থানে "ছ"র ব্যবহার পুথিটির বৈশিষ্ট্য। শ্রীহট্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণ এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ করেন। কিন্তু পুথিটির উক্তরূপ অক্ষরের ব্যবহার রচকের না হইয়া লেখকেরও হইতে পারে। পুথিখানি মূল পুথি বলিয়াও স্থিরিকৃত হয় নাই। পুথিখানির সংগ্রাহক করুণানাথ ভট্টাচার্য্য নামক কোন ব্যক্তি এবং তাঁহার আবিষ্কৃত এই পুথির পশ্চাতের অতি মূল্যবান কতিপয় পত্র নাই। এই অংশেই সাধারণতঃ কবির পরিচয় এবং তাঁহার ও লেখকের সময় সম্বন্ধে সন, তারিখ প্রভৃতি থাকে। যাহা হউক এত অসুবিধার মধ্যেও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পুথিখানি "ন্যূনপক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা মানিয়া লইলে কবির সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে ধার্য্য করিতে হয়। অবশ্য কবিকে এত পুরাতন বলিয়া মানিয়া না লইলে কোন ক্ষতি নাই। তাঁহাকে খৃঃ ১৭শ শতাব্দী, অন্ততঃ শঙ্কর কবিচন্দ্রের পরবর্ত্তী, বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি অনন্তের দেশ সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধ-মত আসাম প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। তথাকার শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করেন এই কবি কামরূপের অধিবাসী (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) এবং জাতীতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবি "অনন্ত কন্দলী" নামে আসামে পরিচিত এবং অপর নাম রাম সরস্বতী। ইনি আসামের শঙ্কর দেবের (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) শিষ্য ছিলেন। ডাঃ সেন কবিকে আসামের অধিবাসী বলিতে তত আপত্তি না করিলেও এবং "অনন্ত কন্দলী" ও কবি অনন্ত এক ব্যক্তি বলিয়া মানিতে প্রস্তুত থাকিলেও আসামী ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে আসামী ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে প্রাচীনকালে পৃথক্ ছিল না। আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র করিলে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত ভাষারও বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক ও স্থানীয় রূপকে মূল বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক্ করা সম্ভব ও সঙ্গত নহে। সুতরাং

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

অনন্ত কন্দলী সম্পর্কে আসামবাসীর পৃথক্ গৌরব লাভের প্রচেষ্টা অনর্থক। আমাদেরও ইহাই মত। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নিয়াও আসামবাসিগণ আসামের দাবী সম্বন্ধে অনুরূপ বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। আসামে আরও একজন রামায়ণের কবির "অনন্ত" নাম ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ নহেন, উপাধি "দাস" এবং শঙ্করদেবের পৌত্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। যাহা হউক, অনন্তরামায়ণের একটি মাত্র স্থলে আসামের বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেবের (খৃ: ১৬শ শতাব্দী) উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে একটি ভণিতা এইরূপ—

"জয় জয় শ্রীমন্ত শঙ্কর পূর্ণকাম।
কীর্ত্তনের ছন্দে বিরচিল গুণ নাম॥" অনন্তরামায়ণ।

ডা: দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "অনন্তরামায়ণ মূলত: বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে।"[১] কবি নিজেকে "মূর্খ" বলিয়া পরিচয় দিলেও পুথিতে তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যেমন ব্যাসদেবের পদ্ম-পুরাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন কবি অনন্ত তেমনই বাল্মীকিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। কবির ভাষা সুখপাঠ্য না হইলেও প্রাণস্পর্শী। বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা বাদ দিলে মূল কৃত্তিবাসের পুথিও সুখপাঠ্য নহে। বাল্মীকির রামায়ণ যে কবি সংক্ষেপে অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত আমরা কবিরচিত আরণ্যকাণ্ডে রাবণ ও সীতার বাক্যালাপের মধ্যে প্রাপ্ত হই। সীতা ক্রুদ্ধা হইয়া তপস্বীবেশী রাবণকে তিরস্কার করিতেছেন,—

"হেন সুনি ক্রোধে সিতা বলিলন্ত 'বাণি'।
তুর শুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘুপ্রাণি॥
নিকৌট গোটর তোর এত মান সাষ।
তুবার ডাকুলি হুঁয়া গঙ্গাস্থানে যাষ॥
রাঘবর ভার্য্যাতে তোহর ভৈল মন।
তিখাল খাস্তাত জিহ্বা ঘষস তুহন॥
হাতে তুলি কালকুট গিলবাক চাস।
সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ব্বনাষ॥
আনো বহুতর বাক্যে বুলিলন্ত আই।
সংক্ষেপ পদত ধিক দিবেন্তু জুআই॥"— আরণ্যকাণ্ড, অ.রা.।

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং (দীনেশচন্দ্র সেন), পৃ: ১০৭।

শেষের লাইনে "সংক্ষেপ পদত" কথাটি কবির রামায়ণ যে বাল্মীকির রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ তাহার আভাষ দিতেছে। বাল্মীকির বর্ণিত চরিত্রগুলি এইজন্য সম্পূর্ণভাবে আমরা অনন্তরামায়ণে পাই না। তবুও বলা যায় স্থানে স্থানে কবি বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ বিশেষ ভাবেই করিয়াছেন। এইজন্য বাল্মীকির রচিত "কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি" ও "জিহ্বয়া লেঢ়ি চক্ষুষম্" প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দ, লালিত্য ও শব্দঝঙ্কার-চ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৩৮)।

(৪) মহিলা কবি চন্দ্রাবতী

রামায়ণের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি বংশীদাস। তাঁহার মাতার নাম সুলোচনা। বংশীদাসের উক্ত গ্রন্থ ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে তদীয় কন্যা চন্দ্রাবতীর ও তৎপ্রণয়ী জয়চন্দ্রের অনেক কবিতা সংযুক্ত আছে। চন্দ্রাবতীর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রামে ছিল। চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁহার রামায়ণখানি রচনা করেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে তাঁহার বংশ-পরিচয় এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।—

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছাউনি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥
বাড়ীতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসা-পদ পূজে ভক্তিভরে।
চাল কড়ি কিছু পান মনসার বরে॥

দূরিতে দারিদ্র্য দুঃখ দিলা উপদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিল আদেশ॥
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোড়।
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥
মায়ের চরণে মোর কোটী নমস্কার।
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার॥
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥

* * * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥

* * * *

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥"

—বংশপরিচয়, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার কিছু ইতিহাস আছে। চন্দ্রাবতী বাল্যে স্বীয় গ্রামে যে পাঠশালায় পড়িতেন জয়চন্দ্র নামক একটি বালকও তথায় পড়িত। ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরক্তি যৌবনকালে প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। জয়চন্দ্র হঠাৎ কোন মুসলমান যুবতীকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপে এমন মুগ্ধ হয় যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। বজ্রাঘাত তুল্য এই দুঃসংবাদ চন্দ্রাবতীর কর্ণগোচর হইলে এই গুণবতী মহিলা আজীবন কৌমার্যাব্রত গ্রহণ করেন এবং পিতার নির্দ্দেশে শিব-পূজায় মনোনিবেশ করেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর চঞ্চলমতি যুবক জয়চন্দ্রের পুনরায় মতি পরিবর্ত্তন হয় এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে চন্দ্রাবতীর সহিত দেখা করিবার মানসে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখে। পিতার অনুমতি লইয়া চন্দ্রাবতী এই পত্রের উত্তর দিলেও জয়চন্দ্রকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না। ইহাতে মনোদুঃখে জয়চন্দ্র ফুলেশ্বরী নদীতে আত্মবিসর্জ্জন করে। এই দুর্ঘটনার সংবাদ চন্দ্রাবতীর কর্ণগোচর হইলে তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। শিবমন্দিরেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং অল্প পরেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বংশীদাস তাঁহার বিদুষী কন্যাকে জয়চন্দ্রের ইসলামধর্ম্ম গ্রহণের দুঃসংবাদে

মুহ্যমান দেখিয়া শিবপূজা করিয়া ও রামায়ণ রচনা করিয়া কাল কাটাইতে উপদেশ করেন। ইহার ফলেই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচিত হয়।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের আদর্শ কৃত্তিবাস বা অনন্তের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন। কৃত্তিবাস ব্যাসদেবকে এবং কবি অনন্ত বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন। অপরপক্ষে চন্দ্রাবতী দাক্ষিণাত্যের খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর কবি হেমচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উত্তরাকাণ্ডে চন্দ্রাবতী চিত্রিত কুকুয়া-চরিত্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সীতা কর্ত্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও তৎফলে শ্রীরামচন্দ্রের সীতার চরিত্রে সন্দেহ জৈন রামায়ণের আদর্শে রচিত। জৈন রামায়ণের মতে সীতা তাঁহার সপত্নীর অনুরোধেই নাকি এইরূপ প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর বর্ণনায় কৈকেয়ীর কুকুয়া নামক এক কন্যার দুরভিসন্ধি এবং অনুরোধে তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। কুকুয়ার কথা একমাত্র কাশ্মীরী রামায়ণে রহিয়াছে। এই প্রকার দুষ্টা চরিত্রের বর্ণনা তিব্বত, ইন্দো-চীন ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে অবশ্য এই চরিত্রটি নাই। এমনকি পরবর্ত্তীকালে যোজিত বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও সীতার প্রতি রামের এইরূপ সন্দেহের কোন উল্লেখ নাই।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের সম্পূর্ণ ভাগ রচনা করেন নাই। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতাকে বনে প্রেরণ পর্য্যন্ত তাঁহার রামায়ণে আছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কবিত্বপূর্ণ। অনাড়ম্বর বর্ণনা এই রামায়ণখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রামায়ণখানি করুণ রসে পরিপূর্ণ। স্বীয় দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন তিনি সীতাচরিত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিম্নে চন্দ্রাবতীর রচনার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

"ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম গো আমরা তিনজন।
গোদাবরীর নদীর কূলে গো পঞ্চবটী বন॥
এইখানে রঘুনাথ গো কহিলা লক্ষ্মণে।
কুটির বান্ধিয়া গো বাস করি এইখানে॥
লতাপাতা দিয়া গো কুটির বান্ধিল লক্ষ্মণ।
কুটিরের মধ্যে গো থাকি মোরা দুইজন॥
বৃক্ষতলে দাণ্ডাইল গো দেবর লক্ষ্মণ।
ধনুহাতে দিবানিশি গো রহে জাগরণ॥

দেবরের গুণ আমি গো না পারি কহিতে।
অরণ্য ভাঙ্গিয়া গো ফল তুলি দেয় হাতে॥
রসাল রসের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাজ্যপাট গেলাম ভুলিয়া॥
লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল।
পদ্মপত্রে আনি আমি গো তমসার জল॥
চরণ ধুইয়া প্রভুর গো তৃণশয্যা পাতি।
মনের আনন্দে কাটি গো বনবাসের রাতি॥
করিবে রাজ্যসুখ গো রাজ সিংহাসনে।
শত রাজ্যপাট আমার গো প্রভুর চরণে॥
ভোরেতে উঠিয়া মালা গো গাঁথি বনফুলে।
আনন্দে পরাই মালা গো প্রভু রামের গলে॥
সুন্দর দীঘল প্রভুর গো বাহু উপাধান।
প্রত্যেক রজনী গো সীতার এমতি শয়ান॥
মৃগ ময়ুর আর গো বনের পশুপাখী।
সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখের দুঃখী"॥—ইত্যাদি।

—চন্দ্রাবতীর রামায়ণ।

চন্দ্রাবতী রামায়ণ ভিন্ন "দেওয়ান ভাবনা" ও "দস্যু কেনারামের পালা" নামক দুইটি চমৎকার গীতিকাও (Ballads) রচনা করিয়াছিলেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত "ময়মনসিংহ-গীতিকা" গ্রন্থ মধ্যে এই দুইটি গীতিকা বা পালা গান সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫) দ্বিজ মধুকণ্ঠ

দ্বিজ মধুকণ্ঠের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। এই কবিরচিত রামায়ণের কতিপয় খণ্ডিত অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই খণ্ডিত অংশগুলির একখানিতে লেখকের তারিখ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ। দ্বিজ মধুকণ্ঠকে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকের অথবা খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলিয়া ধারণা হয়। এই কবির রামায়ণে ব্রাহ্মণ-শাসিত সংস্কার-যুগের চিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত কালকেতু উপাখ্যানের (চণ্ডীমঙ্গল) ছায়া যেন দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণে পড়িয়াছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর আধিপত্যের বর্ণনা উভয়ের কাব্যে একইরূপ

দেখা যায়। দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

বনগমনের পূর্ব্বে মাতা কৌশল্যার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি—

"যুবতীর পতি গতি পতিগুরু মৃত্যুসাথী
গুরু-বাক্য লঙ্ঘিবে কেমনে।
দূর কর যত তাপ লঙ্ঘিলে হবেক পাপ
অতএব যাত্যে হল্য বনে॥
পতি যুবতীর ত্রাতা জীবন-যৌবন-কর্ত্তা
মরিলে মরিবে তার সনে।
নাশিলে তাহার কথা পরকালে ঠেক সেথা
নিবেদিয়ে তোমার চরণে॥
রাজকুলে যাতে জন্ম জানহ সকল ধর্ম্ম
বনে যাত্যে না কর অন্যথা।
চৌদ্দবৎসর যাব কোন কষ্ট নাঞি পাব
মনে না ভাবিহ তুমি ব্যথা॥
রামচন্দ্র যত কয় রাণীর মনে নাঞি লয়
পুত্রের সমান নাই কেহো।
উথলিল শোক-সিন্ধু ম্লান হৈল মুখ-ইন্দু
লোচনে বাখিতে নারে লোহ॥
দ্বিজ মধুকণ্ঠ কয় রাণী স্থিরতর নয়
বিনাঞা বিনাঞা রাণী কান্দে।
পুত্র যায় বনবাস রাণী হৈল নৈরাশ
শোকাবেশে বুক নাঞি বান্ধে॥"

—দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণ।

(৬) রামশঙ্কর দত্ত

এই কবি বৈদ্যবংশে খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পরিবার খৃঃ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের আদি নিবাস বৈদ্যবাটী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বায়রা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখন কবির বংশধরগণ এই জেলার অন্তর্গত পাটগ্রামে

বাস করিতেছেন। কবি রামশঙ্করের রচনা সরল এবং কবিত্বপূর্ণ। খৃ: ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার রামায়ণ রচিত হয়।

কুব্জা দাসী।

"স্ত্রীপুরুষে অযোধ্যায় করে জয়নাদ।
হেন রঙ্গে কুবজীয়ে পাড়িল প্রমাদ॥
কৈকেয়ীর দাসী কুবজী নাম তার।
গণ্ডগোল অযোধ্যাতে সদায় তাহার॥
নগরে প্রবেশ করি দেখিল উল্লাস।
যত প্রজাগণ মিলি নৃত্যগীত হাস॥
কুবজী বলে প্রজাগণ কহ বিবরণ।
আজ অযোধ্যাতে কেন গীত ও নাচন॥" ইত্যাদি।

--রামায়ণ, রামশঙ্কর দত্ত।

(৭) ঘনশ্যাম দাস

কবি ঘনশ্যাম দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। এই কবিকৃত রামায়ণের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। কবি ঘনশ্যাম দাস সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ নাও করিতে পারেন, কারণ অনেক কবি রামায়ণ ও মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবি ঘনশ্যাম দাসের অনূদিত মহাভারতের কিয়দংশও পাওয়া গিয়াছে। ১০৩৫ বাং সালে (খৃ: ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) লিখিত কবির পুথির একখানি প্রতিলিপি হইতে নিম্নে কবির রচনার কিছু নমুনা দেওয়া গেল। কবির পুথির প্রতিলিপি যখন খৃ: ১৭শ শতাব্দীর রহিয়াছে তখন কবি ঘনশ্যামকে খৃ: ১৬শ শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। করুণ-রস এই পুথিখানির বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া পুথিখানি ভক্তিরসপূর্ণ এবং ইহাতে কৃষ্ণ-ভক্তির স্পর্শ রহিয়াছে, কারণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়।—

(ক) "ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বোলে ঘনশ্যাম দাস॥"

—ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ।

(খ) "রোদন করেন সীতা স্মরিয়া শ্রীরাম।
কৃষ্ণের কিঙ্কর কহে দাস ঘনশ্যাম॥"

— ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ।

(গ) "শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে।
ঘনশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণের চরণে॥"

—ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ।

ভণিতায় উল্লিখিত উক্তিগুলি হইতে এই কবি বৈষ্ণব ছিলেন বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাস এবং ঘনশ্যাম দাস নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ নরহরি চক্রবর্ত্তী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

সীতার বনবাস উপলক্ষে লক্ষণ ও সীতার কথোপকথন।

"হেট মাথে কান্দেন লক্ষণ সকরুণে।
মোহ করি লোহ কত ঝরএ নয়নে॥
শোকে গদগদ হৈয়া সীতারে বলিল।
মুনির মন্দির পাবে ধীরে ধীরে চল॥
কহিতে বিদরে বুক দুঃখ উঠে মনে।
শ্রীরামের বাক্য আমি লঙ্ঘিব কেমনে॥
লোক অপবাদে তোমা করিল নৈরাশ।
শ্রীরাম পাঠান তোমা দিতে বনবাস॥
লক্ষণের বোলে সীতা করিল রোদন।
কোন্ দোষে প্রভু রাম করিলা বর্জ্জন॥
শুনহ লক্ষণ মোর প্রাণের দোসর।
আমাকে করিলে রক্ষা দণ্ডক-ভিতর॥
প্রাণের দেবর তুমি আমার লাগিয়া।
পরিচর্য্যা কৈলে কত ফল মূল খায়্যা॥
নিদাঘ বরষা শীত নাহি রাত্রি দিনে।
নিদ্রা নাঞি গেলে তুমি আমার কারণে॥
হেন জনে কেমনে দিলেহে বনবাস।
কি করিয়া দাণ্ডাইবে শ্রীরামের পাশ॥
পর্ণ-শালা চিত্রকূটে কৈলে মোর তরে।
তাহাতে গাণ্ডীব লয়্যা থাকিলে বাহিরে॥
অরণ্যের মধ্যে মোর কোন গতি হব।
শ্রীরাম লক্ষণ বিনে কে মোরে রাখিব॥
তুমি গেলে আমি আজি তেজিব জীবন।
এই অরণ্যের মাঝে কে করিব রক্ষণ॥

বস্ত্র না সম্বরে সীতা আউদর চুলি।
ধরণী লোটায় সীতা কান্দিয়া আকুলি॥
শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে।
ঘনশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণের চরণে॥"

ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ।

(৮) দ্বিজ দয়ারাম

দ্বিজ দয়ারাম খৃঃ ১৭ শতাব্দীর কবি। এই কবির রচিত অথবা সঙ্কলিত রামায়ণের দুইশত বৎসরের পুরাতন প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। দ্বিজ দয়ারাম নামে কোন কবি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে (সম্ভবতঃ মধ্যভাগে) "সারদা মঙ্গল" (ধূলা-কুট্যার পালা) নামে সরস্বতী বন্দনার একখানি পুথি রচনা করেন। মনে হয় রামায়ণের কবি দ্বিজ দয়ারাম (খৃ ১৭শ শতাব্দী) এবং সারদা-মঙ্গলের কবি দ্বিজ দয়ারাম (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) উভয়ে একই ব্যক্তি। এই অনুমান সত্য হইলে সারদা-মঙ্গলের প্রমাণানুসারে দয়ারামের পিতার নাম প্রসাদ দাস এবং কবি কাশীজোড়-কিশোরচক নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রাম মেদিনপুর জেলায় অবস্থিত খুব সম্ভব দ্বিজ দয়ারাম বৈষ্ণব ছিলেন। রামায়ণের কবি দ্বিজ দয়ারাম ও সারদা-মঙ্গলের কবি দয়ারাম দাসকে এই দিক দিয়া অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণও নামের শেষে "দাস" উপাধি ব্যবহার করিতেন। দ্বিজ দয়ারামের রামায়ণ বৈষ্ণবভক্তিতে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণবভক্ত হিসাবে বটতলা সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভীষণপুত্র তরণী সেনের চিত্রটি দয়ারামের রামায়ণের তরণী সেনের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। যথা,—

যুদ্ধক্ষেত্রে তরণী সেনের
রামচন্দ্রকে স্তব

"রণেতে আইলা রাম নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম
ক্রোধে অতি ভাই মূর্চ্ছা রণে।
শ্রীরাম বলেন দুষ্ট মোর ভায়ে দিল কষ্ট
তার শাস্তি দিব এই ক্ষণে॥
আছিল তরণী রথে নামে বীর অবনীতে
প্রণমিল শ্রীরামের পায়।

যোড় হস্তে করে স্তুতি তুমি দেব লক্ষ্মীপতি
নরাকৃতি হয়্যাছ মায়ায় ॥
তব পদ সেবে বিধি দেব পঞ্চানন আদি
মুনিগণ ও পদ ধেয়ানে।
অদ্য মোর দিন শুভ হইল পরম লাভ
রাঙ্গা-পদ পাম্নু দরশনে ॥
* * * * *
তরণীর দেখি ভাব হাতে ধরে পদ্ম-নাভ
কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে।
দুহে পুলকিত গাত্র ঝুরএ দোহার নেত্র
যেন পিতা-পুত্রে কুলাকুলি ॥
তরণী বলিছে প্রভু দয়া না ছাড়িবে কভু
স্থল দিহ চরণ-কমলে।
হয়্যাছি রাক্ষসজাতি তুমি অগতির গতি
কোল দিলে পাষণ্ড-চণ্ডালে ॥
তুমি দেব-দেব হরি সঙ্গে যুদ্ধ ইৎসা করি
তব অস্ত্রে যেন যায় প্রাণ।
তুমি দেব মহাপ্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
অন্ত কালে কর পরিত্রাণ ॥”

—দয়ারামের রামায়ণ।

শ্রীচৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব লেখকের শেষ ছত্রের আগের ছত্রে ব্যবহৃত “মহাপ্রভু” শব্দটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কথাটির প্রচ্ছন্নার্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হওয়া অসম্ভব নহে।

(৯) কৃষ্ণদাস পণ্ডিত

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত নামক জনৈক কবি সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সার সংগ্রহ করিয়া অতি সংক্ষেপে ইহার কাহিনী বর্ণনা করেন। তাঁহার রচনাকে সম্পূর্ণ রামায়ণ বলা যায় না। কবির পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই। তবে রচনা দেখিয়া এই কবিকে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার রচনায় উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তবুও এই পুথির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সমগ্র রামায়ণের সম্বন্ধে বক্তা

শ্রীরাম ও শ্রোতা নারদ ঋষি। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিবার পর অযোধ্যায় ফিরিয়া যান। সেইখানে তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর কোন একদিন নারদ ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের সভায় আগমন করেন। শ্রীরামচন্দ্র নারদ ঋষির প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার জীবনের সমগ্র ঘটনা নারদকে শ্রবণ করান। এইভাবে কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের রামায়ণ বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনা উত্তরাকাণ্ডের উপযুক্ত এবং ইহাতে সীতার বনবাসের কথা (রামচন্দ্র কর্তৃক) নাই। দুই একটি বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত কথাও আছে। যথা বালী বধের জন্য অঙ্গদ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে তিরস্কার :

"এত শুনি দুই ভায়ে হরষিত হয়ে।
বালিকে করিনু বধ প্রকার করিয়ে॥
অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল।
আমাকে নিন্দিয়া সে অনেক কহিল॥"

—কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধ

"পাষাণে জলধি-জল করিয়া বন্ধন।
লঙ্কায় প্রবেশ করি করি ঘোর রণ॥
এক লক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সোওয়া লক্ষ।
সংহার করিলাম কত রথী যে বিপক্ষ॥
অবশেষে রাবণেরে করিনু সংহার।
হরষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার॥
বিভীষণে নরপতি করিয়া লঙ্কায়।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে আমি অযোধ্যায়॥
শুনহ নারদ এই পুরাণের সার।
রাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার॥
রামের চরিত কথা, অমৃত-সমান।
কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান॥"

—কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের রামায়ণ।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত রামায়ণকে "পুরাণের সার" বলিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত যে কোন সময়ে পুরাণ বলিয়া গণ্য হইত ইহা বহু প্রাচীন কবির রচনা পাঠে বুঝিতে পারা যায়। কবি কৃষ্ণদাস পণ্ডিত মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস হইতে পারেন।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের রচিত ভণিতা—

"রামের চরিত কথা অমৃত-সমান।
কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান॥"

কাশীরাম দাসের ভণিতা—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

ইহাদের একটি ভণিতা যেন অপরটির প্রতিধ্বনি।

(১০) ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন[১]

কবি ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন খুব সম্ভব খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্রে অনেক পুথি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মাপুরাণ (মনসা-মঙ্গল) প্রধান। পিতা ষষ্ঠীবরের অনেক অসম্পূর্ণ রচনা পুত্র গঙ্গাদাস সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত পুথিগুলির দুইশত বৎসরের পুরাতন প্রতিলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠীবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাখ্যান পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবি ষষ্ঠীবর ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাসের বাড়ী দীনারদ্বীপে ছিল। কবিদ্বয়ের উল্লিখিত "দীনারদ্বীপ" "ঝিনারদি" বলিয়া কেহ কেহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে কবিদ্বয়ের বাড়ী হয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মহেশ্বরাদি পরগণায় ছিল অথবা ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ছিল। গঙ্গাদাস সেন একখানি মনসার ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নিজেকে বণিকবংশীয় বলিয়াছেন। ঝিনারদি গ্রামে এখনও অনেক সুবর্ণবণিকের বাস। সুতরাং এই কবিদ্বয়কে বৈদ্য মনে না করিয়া সুবর্ণবণিক জাতীয় বলিয়াই বোধ হয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। ষষ্ঠীবর শ্রীনিবাস (অদ্ভুত আচার্য্যের পিতামহ), মালাধর বসু ও হৃদয় মিশ্রের ন্যায় "গুণরাজ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপাধি ষষ্ঠীবর উল্লিখিত জগদানন্দ নামক কোন প্রতিপত্তিশালী আশ্রয়দাতা কবিকে দিয়া থাকিবেন। একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে ইহা উল্লিখিত আছে। কবি ষষ্ঠীবরের রচনা কিছু সংক্ষিপ্ত ধরণের এবং গঙ্গাদাসের রচনা কিছু বাহুল্যযুক্ত। তবে উভয়ের রচনাই বেশ সরস ও কবিত্বপূর্ণ। গঙ্গাদাস বর্ণিত সীতার চরিত্রে দৃঢ়তা অপেক্ষা মৃদুতা সুন্দররূপে প্রতিফলিত

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন, ৬ষ্ঠ সং), পৃঃ ৪৪২—৪৪৩।

হইয়াছে। বাল্মীকির সীতাচরিত্র হইতে এই দিক দিয়া গঙ্গাদাস-অঙ্কিত সীতাচরিত্র একটু ভিন্ন প্রকার হইলেও কবি আমাদের রুচিরই অনুসরণ করিয়াছেন। কবি গঙ্গাদাস তাঁহার রচনার সর্ব্বত্র স্বীয় পিতা ও পিতামহের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"পিতামহ কুলপতি পিতা যষ্ঠীবর।
যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥"

—গঙ্গাদাসের রামায়ণ।

সীতার পাতাল-প্রবেশ

"বারংবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি।
নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী॥
অপমান মহাদুঃখ না সএ পরাণে।
মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥
তবে তুমি পবে আর নাহি মোর গতি।
জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘুপতি॥
এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদুঃখে।
মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে॥" ইত্যাদি।

—গঙ্গাদাসের রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড।

(১১) দ্বিজ লক্ষ্মণ

দ্বিজ লক্ষ্মণের পরিচয় ও সময় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে এই কবি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম কি মধ্যভাগের হইতে পারেন। কবি লক্ষ্মণকৃত দুই প্রকার রামায়ণ রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ এবং অপরটি অধ্যাত্ম-রামায়ণ। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক কবি সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণের অনুবাদ করেন। খুব সম্ভব দ্বিজ লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় একই ব্যক্তি। উভয় পুথিই খণ্ডিত।

রাবণ বধের পর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক
সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিবার আদেশ।

"হরিষ বিষাদে রাম আশীষ করেন।
জানকীর পানে চায়্যা বিরূপ বলেন॥
শুনহ জানকী আমি বলি তব ঠাঞি।
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর কার্য্য নাঞি॥

আমি আর গৃহিণী না করিব তোমায়।
যথা ইচ্ছা তথা যায় দিলাম বিদায়॥
শুনিয়া রামের মুখে দারুণ কাহিনী।
চক্ষু বায়্যা পড়ে জল জনক-নন্দিনী॥
বজ্রাঘাত সম বাক্য শুনি বুদ্ধিহারা।
লোচন বাহিয়া ছুটী পড়ে জলধারা॥
এই মোর নিবেদন শুন নারায়ণ॥—
হনূরে পাঠালো যবে তত্ত্ব করিবারে।
রামচন্দ্র তখন কেনে না বর্জ্জিলে মোরে॥
অগ্নিকুণ্ড কর‍্যা কিম্বা জলে প্রবেশিয়া।
পরাণ তেজিতাঙ আমি কাঁতি গলে দিয়া॥
দেয়র লক্ষ্মণ একবার চায় মোর পানে।
আমা লাগ্যা বল কিছু শ্রীরাম-চরণে॥
আমি সীতা অভাগিনী না করি কোন পাপ।
একবার চায় রাম ঘুচুক সন্তাপ॥
অগ্নিকুণ্ড কর‍্যা দেহ দেয়র লক্ষ্মণ।
অগ্নিতে প্রবেশ কর‍্যা তেজিব জীবন॥
আমার নিমিত্তে রাম কেন পাবে ক্লেশ।
পাপিনী পুড়িয়া মরুক তোমরা যাও দেশ॥
অশ্রু ঝুরে লক্ষ্মণ রামের পানে চান।
অভিপ্রায় বুঝিয়া বলেন ভগবান্॥
অলঙ্ঘ্য রামের বাক্য লঙ্ঘে কোন জন।
কুণ্ড খুড়িবারে গেলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥"

—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, দ্বিজ লক্ষ্মণ।

(১২) দ্বিজ ভবানী

ভবানী নামক কতিপয় কবি রামায়ণের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন। এই কবিদের মধ্যে দ্বিজ ভবানী নামক কবি রচিত "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়"খানি পাঁচ হাজার শ্লোক-পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ। এই কবির পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। দ্বিজ ভবানী তাঁহার উৎসাহদাতা এক রাজার নাম ভণিতায় করিয়াছেন। উহা এইরূপ,—

(১) "জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ।
পদবন্দে ইতিহাস করিল রচন॥"

(২) "পুণ্যবন্ত রাজা নরপতি জয়চন্দ্র।
শ্লোকভাঙ্গি অভিষেক কৈল পদবন্দ॥
উত্তম ভবানী দ্বিজ রচিল পয়ার।
ইতিহাস ভবসিন্ধু পাপ তরিবার॥"

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে "নোয়াখালির নিকট কোন স্থানে এই জয়চন্দ্র নৃপতির রাজধানী ছিল। এই পুস্তক তাঁহারই আদেশে দ্বিজ ভবানী কর্ত্তৃক রচিত হয়।"—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮০, পাদটীকা। ডাঃ সেন উল্লিখিত সংবাদ কোথায় পাইয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানান নাই। যাহা হউক, ইহা সত্য হইলে দ্বিজ ভবানী নোয়াখালি অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়। ভবানী দাস নামক অপর একজন রামায়ণের অংশবিশেষের রচকের সহিত ডাঃ সেন দ্বিজ ভবানীকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। আমাদের তাহা মনে হয় না। "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ের" কবি দ্বিজ ভবানী, ভবানী দাস নহেন এবং উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব প্রথানুসারে দ্বিজগণ "দাস" উপাধি গ্রহণ করিলেও এখানে উভয় কবির বাসস্থানের যে পরিচয় পাই তাহাতে উভয় স্থানের অত্যধিক দূরত্ব উভয় কবির একত্বের বিশেষ বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবানী দাস "রামের-স্বর্গারোহণ" রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কবি ভবানী দাসের পরিচয় এইরূপ আছে।—

"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য।
যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য॥
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।
তাহাতে বসতি করে ভবানী দাস নাম॥
বামনদেব পিতা যশোদা জননী।
সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি॥"

এই সমস্ত পরিচয়ও সম্পূর্ণ নির্ভর করা নিরাপদ নহে, কারণ প্রাচীন পুথিসমূহে লেখকগণের দোষে নানাপ্রকার পাঠবিকৃতি দেখা যায়। তাহাতে কোন কবির সঠিক পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। মহাভারত হইতে "পারিজাত-হরণ" গল্প এক ভবানীনাথ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনিই বা কোন ভবানীনাথ! নাম দৃষ্টে মনে হয় ইনি হয়ত ভবানীনাথ দাস হইবেন। দ্বিজ

ভবানী ও ভবানী দাস উভয়েরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও উভয় কবিই খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন। দ্বিজ ভবানী সম্বন্ধে ডাঃ সেন এইরূপই অভিমত দিয়াছেন। দ্বিজ ভবানী বাল্মীকি-রামায়ণের আদর্শ হইতে এতটা সরিয়া গিয়াছেন যে তিনি লক্ষ্মণকে দিগ্বিজয়ে পাঠাইয়া "চন্দ্রকলা" নাম্নী এক নারীর প্রেমে মুগ্ধ করাইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এই কবির কাব্যে ভরত ও শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয় উপলক্ষেও এই জাতীয় নানা কথা আছে। কবি কোন্ স্থান হইতে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই।[১]

দ্বিজ ভবানী তাঁহার রামায়ণের আখ্যানবিশেষ রচনা সম্বন্ধে আমাদের ইহাও জানাইয়াছেন যে,—

"জয়চন্দ্র নরপতি রাম ইতিহাস অতি
যত্নে সে করিল পদবন্ধ।
দ্বিজবর ভবানী আপনা সাক্ষাৎ আনি
দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান॥
শুন শুন দ্বিজবর ভবসিন্ধু পার কর
লিখিয়া রামের গুণকথা।
আক্ষার যে অধিকার প্রজা সব দুর্ব্বার
দিনে দিনে যত পাপ করে।
করএ অশেষ পাপ মহাদুঃখ সন্তাপ
এহা হতে উদ্ধার আমারে॥"

—দ্বিজ ভবানীর লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়।

(১৩) কবি দুর্গারাম

কবি দুর্গারাম নামক কোন ব্যক্তি একখানি রামায়ণ রচনা করেন। এই পুথির আবিষ্কারক ঢাকা জেলার অধিবাসী অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়। পুথিখানি সরস এবং কবির উক্তি অনুযায়ী কৃত্তিবাসের পরে রচিত। কবির পরিচয় ও পুথি রচনার কাল অজ্ঞাত। দ্বিজ দুর্গারাম নামক কোন কবি সংস্কৃত "কালিকা পুরাণের" অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই উভয় দুর্গারাম বোধ হয় একই ব্যক্তি। কবি দুর্গারাম খৃঃ ১৭শ কিম্বা ১৮শ শতাব্দীর কোন সময়ে বর্ত্তমান

(১) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কৃত Bengali Ramayanas নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই জাতীয় নানা কথা আছে।

ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ সংস্কৃত বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদসমূহ প্রধানতঃ এই সময়ই হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়।

(১৪) জগৎরাম ও রামপ্রসাদ

কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ পিতা-পুত্র। কবি ষষ্ঠীবর ও কবি গঙ্গাদাসের ন্যায় ইঁহারা পিতাপুত্রে গ্রন্থরচনা করিতেন। কবি জগৎরাম জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ও রাণীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ভুলই গ্রামে ছিল। জগৎরামের সময় খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ কি শেষভাগ। জগৎরামের পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী ছিল। কবির উৎসাহদাতা রাজার নাম পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপ। জগৎরামের অপর কাব্য "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"। ইহার বিষয়-বস্তু কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গা-পূজা। এই ঘটনারও বাল্মীকি-রামায়ণে কোন উল্লেখ নাই। ষষ্ঠী হইতে বিজয়াদশমী পর্য্যন্ত পাঁচদিনের দুর্গা-পূজার বিবরণ গ্রন্থখানিতে পাঁচ পালায় বিভক্ত হইয়াছে। নবমী ও দশমীর পালা রামপ্রসাদ রচিত। পুত্র রামপ্রসাদ এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"নবমী দশমী দুই দিবসের গান।
বর্ণনা করিতে মোরে দিল আজ্ঞা দান॥
আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার।
যেমন মশকে লয় মাতঙ্গারের ভার॥
বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে।
পঙ্গু লংঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥
তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে।
আগুপাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥"

—দুর্গাপঞ্চরাত্রি, রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদ "কৃষ্ণলীলামৃত রস" নামক অপর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

জগৎরামের রচনায় নিন্দার ছলে প্রশংসার অংশগুলি বেশ মনোরম হইয়াছে।

শিব কর্ত্তৃক দুর্গার নিন্দা

"শুনলো শিবা বলিব কিবা
তোমার গুণের কথা।

কহিলে মরম পাইবে সরম
গণপতির মাতা ॥
পূর্ব্বকালে রণস্থলে
রক্তবীজের নাশে।
ভীষণ আকার করে মার মার
দেবতা পলায় ত্রাসে ॥
বরণকালী মুণ্ডমালী
লহ লহ করে জিহ্বা।
করাল বদন বিকট রসন
গলিত বসন কিবা ॥
ঘন তর্জ্জন ঘোর গর্জ্জন
ভূমেতে লোটে জটা।
প্রখর খড়্গে দনুজ-বর্গে
দলিলে দানব ঘটা ॥
হইয়া অধীর খাইলে রুধির
খর্পর পুরি যবে।
লোহিত বর্ণ নয়ন ঘূর্ণ
কর্ণ-ভূষণ সবে ॥
যোগিনী সঙ্গ সব উলঙ্গ
তোমার সঙ্গে নাচে।
অসুর অমর করে থর থর
ভয়ে না আসে কাছে ॥
গুহ গজানন ভাই দুইজন
মা বলি কাছে গেল।
মায়ের সজ্জা দেখিয়া লজ্জা
সাগরে ডুবেছিল ॥" ইত্যাদি।

—জগৎরামের দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

(১৫) শিবচন্দ্র সেন

শিবচন্দ্র সেন রামায়ণের অন্যতম কবি। এই কবি রাবণ-বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গা-পূজা উপলক্ষ করিয়া তৎরচিত রামায়ণের নাম "সারদা-

মঙ্গল" রাখিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একাধিক "সারদা-মঙ্গল" রহিয়াছে এবং ইহাদের বিষয়-বস্তুও এক নহে, যথা কবি দয়ারাম রচিত "সারদা-মঙ্গল"। দয়ারামের "সারদা-মঙ্গল" সরস্বতী-বন্দনা উপলক্ষে রচিত। কবি শিবচন্দ্র সেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। কবির পূর্ব্ব-পুরুষের নিবাস কোন সময়ে সেনহাটি ছিল। কবির নিবাস ছিল ঢাকা—বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁটাদিয়া গ্রামে। কবির কাল খঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্য কি শেষ ভাগ। "সারদা-মঙ্গলে" কবি শিবচন্দ্র নিজ বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন।

কবির পরিচয়

"বৈদ্যকুলে জন্ম চিন্ন সেনের সন্ততি।
সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্ব-পুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র গুণধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত।
রত্নেশ্বর গুণবান তাহার তনয়।
রতন স্বরূপ কুলে হইলা উদয়॥
এ হেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত।
রামনারায়ণ সেনঠাকুর আখ্যাত॥
সেনঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল।
রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল॥
গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র।
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুচরিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরি বংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান।
গঙ্গাপ্রসাদ সেনঠাকুর কীর্ত্তিমান॥
জন্মিল তাঁহার এই তৃতীয় সন্তান।
শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম॥"

—সারদামঙ্গল, শিবচন্দ্র সেন।

উপরের বর্ণনা হইতে জানা যায় কবি বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁটাদিয়া গ্রামবাসী গঙ্গাপ্রসাদ সেনের তিনপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই পরিবার পদবি হিসাবে শুধু "সেন" স্থলে "সেনঠাকুর" ব্যবহার করিতেন। কবি শিবচন্দ্রের "সারদামঙ্গলের" রচনা প্রশংসনীয় ছিল এবং এক সময়ে

পূর্ব্ব-বঙ্গে ইহা খুব জনপ্রিয় ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে একবার পুথিখানি মুদ্রিতও হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর শিবচন্দ্র সেনের মুদ্রিত "সারদা-মঙ্গল" পাওয়া যায় না।

(১৬) রামানন্দ ঘোষ ("বুদ্ধদেব")

রামানন্দ ঘোষ নামক কোন কবি নিজেকে বুদ্ধের অবতার হিসাবে ঘোষণা করিয়া একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এই কবি নিজেকে "বুদ্ধ", "শুভ্র" ও "মহাকালী"র উপাসক বলিয়াছেন, অপর পক্ষে তিনি বৈষ্ণবগণ ও মুসলমানগণের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের প্রতি বিরোধিতা এবং "দারু"ব্রহ্মকে যবন হস্ত হইতে উদ্ধারের তীব্র বাসনায় তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। এই প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাবের অন্যতম ফলস্বরূপ তাঁহার রামায়ণখানি রচিত হয়। এই পুথিখানি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংগ্রহ করেন এবং ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পুথিখানি দেখিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, ৪৪৮-৪৫১ পৃঃ) গ্রন্থে এই সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। রামানন্দ ঘোষের লেখা পুথি পাওয়া যায় নাই, তবে রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী শিমুলবনাই গ্রামের রামসুন্দর চন্দ নামক কোন ব্যক্তি ইহা নকল করেন। তদীয় মাতুল বেকট্যানিবাসী রামকানাই হাজরা নামক ব্যক্তির আদেশেই এই পুথিনকল সম্পন্ন হয় এবং কালক্রমে ইহা নগেন্দ্রবাবুর হস্তগত হয়। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উভয়েই পুথিখানি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। পুথিখানি নকলের সময় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ।

এই পুথিখানি বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা স্বাভাবিক। পুথিরচকের "বুদ্ধ" নাম ও নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করাই ইহার প্রধান কারণ। রামানন্দ ঘোষের সময় জানিতে পারা যায় নাই। তবে তিনি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং আওরাঙ্গজেব প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি এক্রাম খাঁ কর্ত্তৃক জগন্নাথ বিগ্রহের উপর আক্রমণের ফলে যবনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হন। এমনকি বৈষ্ণবগণ যে মন্দিরের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল তাহাও তিনি স্বচক্ষে দেখেন-নাই। তাঁহার লেখাতে এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত শ্রদ্ধেয় সমালোচকদ্বয় আমাদিগকে জানাইয়া-

ছেন। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে সম্ভবতঃ কবি তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা উড়িষ্যার ১৬শ শতাব্দীর কবিগণের ভবিষ্যৎবাণীর ফল। এই সব অনুমান কতখানি সত্য বলা যায় না। পুথিটির বর্ণিত বিষয় ও রচনাকারী সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বিস্মিত হইব না। পুথিটিকে স্বীকার করিলে আমাদের কিন্তু মনে হয় কবি রামানন্দ নিজেকে "বুদ্ধ" বলিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে রামভক্ত "রামাৎ" সম্প্রদায়ের লোক এবং "কৃষ্ণায়ন" বা কৃষ্ণভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিরোধী ছিলেন। বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও দলাদলির কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবি জয়দেব "কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর" লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিষ্ণুর অন্যতম অবতার রামচন্দ্রের সহিত বুদ্ধের বিরোধিতা খৃঃ ১৭শ।১৮শ শতাব্দীর রামভক্তগণের চক্ষে সম্ভব নয়। শক্তিলাভ করিয়া রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র দুর্গা-পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদুদ্দেশে রামভক্ত কবি মহাশক্তি-রূপিণী "মহাকালীর" বর প্রার্থনা করিবেন ইহা বিচিত্র কি? জনসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাস এবং শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলনসূচক এইরূপ ঘটনা খুব অসাধারণ নহে। বিশেষতঃ তান্ত্রিকতা এই সময় বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

আওরঙ্গজেবের সময় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দির অপবিত্র করিবার কাহিনী ও উড়িষ্যার খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর কবিগণের বুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী রামানন্দ ঘোষকে হয়ত নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে উৎসাহিত বা উত্তেজিত করিয়া থাকিবে। এই সম্বন্ধে আমাদের মতবিরোধ নাই। তবে বৌদ্ধগণের শক্তি পরীক্ষার শেষচিহ্ন রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ বহন করিতেছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বড় জোর রামানন্দের উপর বৌদ্ধ প্রভাব থাকিতে পারে এই পর্য্যন্ত। Sterling সাহেব রচিত উড়িষ্যার ইতিহাসে জানা যায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় বৌদ্ধগণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া বৈষ্ণবগণ তথায় প্রবল হন, সুতরাং রামানন্দ ঘোষের রামায়ণে কবি বৌদ্ধপক্ষ হইতে বৈষ্ণবগণের বিরোধিতা করিয়া থাকিবেন। এইরূপ মতও আমরা সমর্থন করি না। কবির লেখা দেখিয়া মনে হয় কবি বাঙ্গালী, উড়িষ্যাবাসী নহেন। উড়িষ্যার রাজদরবারের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন কারণে ক্রোধ থাকিতে পারে। ইহার কারণ হয়ত তিনি নিজে বৈষ্ণব-তান্ত্রিক এবং রামাৎসম্প্রদায়ভুক্ত সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন;

নতুবা একযোগে উড়িষ্যার দারুব্রহ্ম, মহাকালী ও রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন এবং নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া প্রচারের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার কবির লেখায় উড়িষ্যায় ম্লেচ্ছ আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইলে তথায় হিন্দুরাজত্বের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা সময়ের দিক দিয়া কি করিয়া সামঞ্জস্য করা যায়? সুতরাং উড়িষ্যায় হিন্দুরাজত্বের বৈষ্ণব প্রভাবের যুক্তি চলিতে পারে না। কবিকে তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধ বলিলে তাঁহার রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির সহিত কোন সামঞ্জস্য হয় না। কবির মুসলমান-বিরোধী মনোভাবের কারণ রহিয়াছে। কিন্তু ম্লেচ্ছ হস্তচ্যুত দারুব্রহ্মের উদ্ধারের ঐকান্তিক আগ্রহ রামসেবক ও রামায়ণ লেখকের কেন হইল ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। উড়িষ্যার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রবল ঘটনা উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী কোন অঞ্চলের বাঙ্গালী কবিকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের উড়িষ্যাবাসের স্মৃতি ও তথাকার বাঙ্গালী প্রভাব বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি উড়িষ্যার দিকে সুদীর্ঘকাল নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। কবির দেশ আমরা জানি না। উহা উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী মেদিনীপুর হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। কবি রামানন্দের কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম কি মধ্য ভাগে হইতে পারে। কবির কয়েকটি মূল্যবান উক্তি নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) "সর্ব্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলিযুগে রামানন্দ বৌদ্ধ অবতার॥"

(খ) "শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লৈয়াছিল।
বৌদ্ধবেশ ধরি এই তত্ত্ব লিখি গেল॥"

(গ) "বৌদ্ধদেব কহে বৃথা জন্মিলে সংসারে।
লয়্যা যাহ মহাকালী ভৈরব নগরে॥"

(ঘ) "বৌদ্ধদেব কহে কালী না দেখি উপায়।
রক্ষ রক্ষ ভগবতী কাল কাটি যায়॥"

(ঙ) "বৈষ্ণবী পূজা জগতে ঘুচাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব॥"

(চ) "যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥"

এই পুথিখানি খণ্ডিত। ইহাতে উত্তরাকাণ্ডের কোন চিহ্ন নাই এবং অপর কাণ্ডগুলির মধ্যেও কতকগুলি পত্রের অভাব। পুথিখানির নাম "রামলীলা"। দারুব্রহ্মকে মুসলমানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তবে

এই দেবতার সম্মুখে পুঁথিখানি পাঠের ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ধনী ও দানশীল বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং বৃদ্ধকালে পুঁথিখানি লিখিয়াছেন।

(১৭) রঘুনন্দন গোস্বামী

রামায়ণের সুবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি রঘুনন্দন গোস্বামী ১৭৮৫খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি রঘুনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশীয় এবং এই মহাপুরুষ হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ। কবির পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী ও মাতার নাম উষা দেবী। কবি রঘুনন্দনের এক বিমাতা ছিলেন। তাঁহার নাম মধুমতী দেবী কবির পিতামহের নাম বলদেব গোস্বামী। রঘুনন্দন তাঁহার পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। গণেশ বিদ্যালঙ্কার নামে জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনন্দনের গুরু ছিলেন। রঘুনন্দনের পিতা কিশোরীমোহন অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন গোস্বামীর "ভাগবত" নামে অপর একটি নাম বা উপাধি ছিল। কবি রঘুনন্দন "রামরসায়ন" নামে একখানি রামায়ণ রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কবিরচিত অপর একখানি গ্রন্থ আছে। উহা বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং নাম "শ্রীরাধামাধবোদয়"।

বৈষ্ণব কবি রঘুনন্দনকৃত রামায়ণের অনুবাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি মূলতঃ বাল্মীকি এবং স্থানে স্থানে হিন্দী রামায়ণ প্রণেতা তুলসীদাসের পথ অবলম্বন করিলেও বৈষ্ণব প্রভাব তাঁহার রচিত রামায়ণের সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। রঘুনন্দনের রামায়ণে অন্যান্য বাঙ্গালা রামায়ণ অপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব প্রভাব পড়িয়াছে। কবি খাঁটি বৈষ্ণবোচিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার রামায়ণ হইতে করুণ বিষয়গুলি বাদ দিয়াছেন। ইহার ফলে "সীতার বনবাস" ও "পাতাল প্রবেশ" প্রভৃতি করুণরসাত্মক বৃত্তান্ত তাঁহার "উত্তরাকাণ্ডে" প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কবি রঘুনন্দনের রচনারীতি সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও বৈষ্ণবরীতি অনুযায়ী স্বল্প হিন্দীমিশ্রিত, তবে অনেক স্থানেই লালিত্যবর্জ্জিত নহে। নানা ছন্দের ব্যবহারও তাঁহার রামরসায়নে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি হইতে কবির রচনামাধুর্য্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রাম বন্দনা

(ক) "অতি সকরুণ নিরমল গুণ

অমর-মুকুট-হীর।

জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর বীর ॥
সুরভি-অবনি সব সুরমুনি
ভয় হর রণধির।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর ধীর ॥
অপরিগণিত মহিমখচিত
বচন-মন-বিদূর।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর শূর ॥
অচল সচল প্রভৃতি সকল
ভুবন সৃজন ধাত।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর তাত ॥
দশমুখ-বল হর-ভুজবল
মধুরিম-রসকূপ।
জয় রঘুবর জয় রঘুবর
জয় রঘুবর ভূপ ॥" ইত্যাদি।

—রঘুনন্দনের রামরসায়ন।

বিষ্ণুর নৃসিংহাবতার

(খ) "কিবা চমৎকার রূপ তার অতি অনুপম।
মুখ সিংহাকার অঙ্গ আর মনুষ্যের সম ॥
অতি উচ্চতর কলেবর মহাভয়ঙ্কর।
কোটি নিশাপতি জ্যোতিঃ জিতি কান্তি মনোহর ॥
শিরে জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দোলয়।
যেন শম্ভুশিরে শোভা করে কাল-সর্পচয় ॥
দ্রবীভূত স্বর্ণ- তুল্য বর্ণ তিনটী লোচন।
যাহা দেখি ভয় মগ্ন হয় এ তিন ভুবন ॥" ইত্যাদি।

—রঘুনন্দনের রামরসায়ণ।

রঘুনন্দনের রামরসায়ণ কবির গৃহদেবতা শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

(১৮) রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটেরি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার রামায়ণ রচনার কাল ১৭৬০ শক অথবা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। কবির রচনায় ভক্তি-রসের এবং ভারতচন্দ্রীয় যুগের ভাষাগত অলঙ্কারের প্রাধান্য দেখা যায়। রামমোহনের রচনায় স্থানে স্থানে ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও অলঙ্কারই অধিক। বিদ্রুপাত্মক রচনায়ও কবির খুব দক্ষতা ছিল। কবির পিতা বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ও একখানি সুললিত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কুল-দেবতা মাধব বিগ্রহের নামে তাঁহার গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন।

রামের রূপবর্ণনা

(ক) "কুটিল কুন্তলে শিরে শোভে জটাভার
বিশাল সুন্দর অতি কপাল তাহার।
কামের কামান জিনি চারু ভ্রু-যুগল।
আকর্ণ নয়ন তার জিনিয়া কমল॥
তিলফুল নহে তুল রামের নাসার।
ওষ্ঠাধর মনোহর তুলনা নাহি তার।
মুখশশী রূপরাশি সুচারু দশন
হাস্যকালে দ্যুতি খেলে তড়িৎ যেমন॥
সুন্দর চিবুক গজস্কন্ধ চিত্তহর
আজানুলম্বিত বাহু যিনি করি কর।
চারু বক্ষ চারু কক্ষ নাভি সরোবর
সিংহ জিনি কটিখানি চলন সুন্দর॥" ইত্যাদি

রামমোহনের রামায়ণ।

বর্ষাকালে শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিরহ

(খ) "কুটীরে করেন বাস কমললোচন।
সীতার কারণে সদা ঝোরে দুনয়ন॥
সান্ত্বনা করেন সদা সুমিত্রা সন্তান।
তার গুণে রাঘবের দেহে রহে প্রাণ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন।
যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥

ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব।
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥
রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে।
যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥
ময়ূর করয়ে নৃত্য সব মেঘ দেখি।
রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥
সদা জলধারা পড়ে ধরণী-উপরে।
সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে॥" ইত্যাদি।

—রামমোহনের রামায়ণ।

কবি রামমোহন পিতৃ আদেশক্রমে স্বগৃহে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং হনুমানের আদেশে তদীয় রামায়ণ রচনা করেন।

"কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান্।
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥
রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে।
সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতষষ্ঠি শকে॥"

—রামমোহনের রামায়ণ।

(১৯) অদ্ভুতাচার্য্য

রামায়ণের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি অদ্ভুতাচার্য্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ইঁহার নিবাস ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত বড়বাড়ী গ্রামে। এই গ্রাম সোনাবাজু পরগণার অন্তর্গত এবং সাঁচোর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। কবি নিম্নরূপ নিজের পরিচয় দিয়াছেন :—

"প্রপিতামহো বন্দ্যো যাহার বাস খণ্ড।
তাহার পুত্র নামেতে প্রচণ্ড॥
তাহার তনয় হ'ল নাম শ্রীনিবাস।
গুণরাজ উপাধি মহাশয় তেঁহ রামচন্দ্রের দাস॥
তাহে পুত্র উপজিল মাণিক প্রচার।
জন্মিল চারিপুত্র চারি সহোদর॥
চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি।
ভারতীর প্রসাদে হইল অলক্ষিত সিদ্ধি॥

সোণারাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম॥
মহাপুরুষ তবে জন্মিল সংসারে।
যত যত সংকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে॥
দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার।
অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার॥
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি।
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হৈল নাম সেই সে কারণ॥
যজ্ঞোপবীত নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর।
রামায়ণ গাহিতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর॥
জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ।
যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥
পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার।
তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার॥"

—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনায় কবির পরিচয় সুপরিস্ফুট। তবে কবির সময় নিয়া কিছু গোলযোগ আছে। এই কবির অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে তিনখানি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একখানি পুথি রসিকচন্দ্র বসু ও অপর তুইখানি যথাক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপরি লিখিত ছত্রগুলি রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতে আছে। তাঁহার পুথিতে রচনাকাল এইরূপ আছে:—

"সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বিন্দুতে।
সপ্তমি রেবতি যুত বার ভৃগুসুতে॥
কর্কটাতে স্থিতি রবি পঞ্চদশমীতে।
কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে॥"

—রসিকচন্দ্র বসুর সংগৃহীত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

এই পংক্তিগুলি হইতে অভিজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন ইহা ১৭৬৪ শক। তবু রসিক বসুর মতে ইহা "শক" নহে "সম্বৎ"। কবির লেখা সমাপ্তির কাল ১৭৬৪ শক হইলে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হয় এবং ১৭৬৪ সম্বৎ হইলে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হয়।

যাহা হউক আমরা কালটি "শক" বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহা রচকের না লেখকের তারিখ? খুব সম্ভব ইহা রচকের নতুবা লেখকের নাম ও পরিচয়ের সহিত ইহা সংযুক্ত থাকিত। অবস্থা দৃষ্টে কবির রচনা সমাপ্তির কাল ১৭৬৯ শক অর্থাৎ ইং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া মনে হয়। এই তারিখটি লেখকের স্কন্ধে আরোপ করিয়া রীতি অনুযায়ী কবির সময় ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ ধার্য্য করিয়া একশত বৎসর পিছাইবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। কবির স্বীয় পরিচয়ে নিজেকে "মহাপুরুষ" আখ্যা দিয়া যথেষ্ট আত্মশ্লাঘার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পর কবি নিজেকে নিরক্ষর পরিচয় দিয়া উপনয়নের পূর্ব্বে মাত্র সাত বৎসর বয়সে রামায়ণ রচনার আদেশ রূপ শ্রীরামের অনুগ্রহ লাভের যে চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা অদ্ভুত বলিয়াই স্বীয় নাম অদ্ভুতাচার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক। বোধ হয় বাল্যকাল হইতেই তিনি রামায়ণ রচনার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিতেন ইহা তাহারই আভাষ। কবি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়াও তো মনে হয় না।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। রচনার নমুনা এইরূপ -

রামচন্দ্রের বরবেশ

"বিবিধ বিনোদ মালে ছড়াব আটুনি।
আধলম্বিত ভালে বিনোদ টালনি॥
চন্দন তিলক আর অলকা বিলোলে।
চন্দ্র বৈঠল যৈছে জলধর কোলে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা তাহে কামদেব-বাণ।
হেন বুঝি কামদেব পূরিছে সন্ধান॥
নীলাব্জ নয়নে খেলে অপাঙ্গ তরঙ্গ।
আছুক নারীর কায মোহিছে অনঙ্গ॥
খগপতি জিনি নাসা অধর বান্ধুনি।
তাহাতে বিচিত্র সাজে দশন সুরনি॥" ইত্যাদি।

—অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

উল্লিখিত বর্ণনা ভারতচন্দ্রের যুগের কবির পরিচয় দেয়।

(২০) রামগোবিন্দ দাস

কবি রামগোবিন্দ দাসের পিতার নাম শিবরাম দাস ও পিতামহের নাম কুঞ্জবিহারী দাস। কবি রামগোবিন্দের সময় ও দেশ সম্বন্ধে কোন সংবাদ

জানা যায় নাই। রামগোবিন্দ দাসের রামায়ণ কবিত্বপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ। ইহার শ্লোকসংখ্যা পঁচিশ সহস্র। এই কবির কাল রঘুনন্দনের পরে বলিয়া মনে হয়। ইহা ঠিক হইলে ইনি খৃ: উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি হইতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন বহু অখ্যাতনামা কবি রামায়ণের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় কঠিন। অনেক পল্লীকবি আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে রামায়ণের অংশানুবাদক কতিপয় কবির নাম করা যাইতেছে। যথা,—

(১) কৌশল্যা চৌতিশা (রামজীবন রুদ্র)
(২) লবকুশের যুদ্ধ (লোকনাথ সেন)
(৩) রামের স্বর্গারোহণ (ভবানী চন্দ্র)
(৪) ভুষণ্ডী রামায়ণ (রাজা পৃথীচন্দ্র, পাকুড়)
(৫) লঙ্কাকাণ্ড (ফকীররাম)
(৬) কালনেমীর রায়বার (কাশীনাথ)
(৭) শতস্কন্ধ রাবণবধ (অদ্ভুতাচার্য্য)
(৮) অদ্ভুত রামায়ণ (কৈলাস বসু)
(৯) রামায়ণ (গুণরাজ খান)
(১০) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (দ্বিজ তুলাল)
(১১) রামভক্তিরসামৃত (কমললোচন দত্ত)
(১২) রামভক্তিরসামৃত (রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহার)
(১৩) রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড)—(দ্বিজ মহানন্দ)
(১৪) রামায়ণ (গঙ্গাপ্রসাদ ও রাজকৃষ্ণ রায়)
(১৫) অধ্যাত্ম রামায়ণ (ভবানীনাথ)
(১৬) রামায়ণ (দ্বিজ সীতাসুত)
(১৭) রামায়ণ (হটুশর্ম্মা)
(১৮) রামায়ণ (রামরুদ্র)
(১৯) রামায়ণ (দ্বিজ মাণিকচন্দ্র)
(২০) রামায়ণ (জাতদেব দাস)
(২১) লক্ষ্মণের শক্তিশেল (শিবরাম দাস)
(২২) রামায়ণ (রামানন্দ যতি)
(২৩) রামায়ণ (কৃষ্ণদাস)

(২৪) রামায়ণ (গোবিন্দরাম দাস)

(১৫) রামায়ণ (রামকেশব)

(১৬) রামায়ণ (শিবচন্দ্র সেন) এবং "অঙ্গদরায়বার" রচক—ফকিররাম, খোশাল শর্ম্মা, রামনারায়ণ, দ্বিজ তুলসীদাস। কুম্ভকর্ণের রায়বার—কবিচন্দ্র। বিভীষণের রায়বার (দ্বিজরাম)। সূর্পনখার রায়বার (অজ্ঞাত)। কুম্ভকর্ণের পালা (মতিরাম)। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে কতিপয় রামায়ণের পদ, ভিকন গুরুদাসের রামায়ণ, ইত্যাদি। Descriptive Catalogue (Bengali Mss., Vol. I, C. U) এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (অনুবাদ সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু) দ্রষ্টব্য।

অঙ্গদ রায়বারের প্রথম রচক ফকীররাম কবিভূষণ। ইহার ভাষা ভাঙ্গা হিন্দী। তৎপর কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাস। "শিবরামের যুদ্ধ" প্রণেতা দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র।

বাঙ্গালা রামায়ণ আলোচনা করিতে গেলে এই জাতীয় অনুবাদ গ্রন্থের কতিপয় বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমতঃ বাঙ্গালা অনুবাদ সংস্কৃত অথবা অপর কোন ভাষা হইতে আক্ষরিক অনুবাদ নহে; ইহা ভাবানুবাদ এবং তাহাও আংশিক। সুতরাং বাঙ্গালা রামায়ণে অনেক নূতন তথ্য এবং চরিত্রচিত্রণের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই দিক দিয়া বাঙ্গালা রামায়ণকে অনুবাদ বলা নিরাপদ নহে তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি একই কথা মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাঙ্গালা রামায়ণের একমাত্র আদর্শ নহে। ব্যাসের রচিত সংস্কৃত রামায়ণের আখ্যান ও অধ্যাত্ম, অদ্ভুত প্রভৃতি নানাশ্রেণীর রামায়ণ এবং পালী (বৌদ্ধ), জৈন প্রভৃতি নানা-জাতীয় রামায়ণ বাঙ্গালা রামায়ণগুলির উপাদান জোগাইয়াছে। বাঙ্গালী জাতীর ঘরের কথা ও বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা রামায়ণের চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বাঙ্গালা রামায়ণ কেহ কেহ সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ডই অনুবাদ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার রামায়ণের সপ্তকাণ্ডই সংক্ষিপ্ত করিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন একই পুথির অংশতঃ পিতা এবং অংশতঃ পুত্র বা অপর কেহ রচনা করিয়াছেন।

ইহার উপর গায়ক, লিপিকার প্রভৃতির ইচ্ছা অথবা অজ্ঞতা হেতু নানারূপ প্রমাদ ও পরিবর্ত্তনের ফলে আসল হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশের বাহুল্যই বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ নিজের নাম লুকাইয়া অন্যের রচনায় নিজ রচনা মিশাইয়া দিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ভণিতায় প্রকাশ্যে উহা

ব্যবহার করিয়াছেন। বিস্মৃত অংশ অন্য কবিগণের লেখা হইতে জোড়াতাড়া দিয়া কোন সুবিখ্যাত প্রাচীন কবির রচনা প্রকাশ করিতে গিয়া প্রাচীন সঙ্কলনকারী মূল কবির ভণিতার সহিত অন্য বহু কবির ভণিতা সংযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রাচীন পুথিগুলির প্রথম অথবা শেষের দিকেই প্রায়শ: রচনাকারী কবির পরিচয় থাকে। লেখকের পরিচয়ও শেষের দিকে থাকে। প্রাচীন পুথি প্রায়ই এই সমস্ত অংশে কীটদষ্ট অথবা ছিন্ন হইলে, কিম্বা পত্রখানি হারাইয়া গেলে, কিম্বা কতিপয় অক্ষর সম্পূর্ণ বা আংশিক মুছিয়া গেলে কবির সঠিক সময় ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়ে এবং প্রায়শ: ঘটেও তাহাই। ইহার উপর পুথি প্রাপ্তির নানা অসুবিধা আছে এবং ব্যক্তিবিশেষের অভিসন্ধি-মূলক হস্তক্ষেপেও পুথি বিকৃত সুতরা পাঠ বিকৃত হইতে দেখা যায়।

আমাদের এই মন্তব্য শুধু রামায়ণ সম্বন্ধে নহে, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া প্রাচীন পুথিসমূহের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মন্তব্য সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের পুথিসমূহের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত রামায়ণ গ্রন্থ ছাড়া কুচবিহার রাজগণের উৎসাহে বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে কতিপয় রামায়ণও উল্লেখযোগ্য। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (১৫৮৭-১৬২৭ খৃ:) উৎসাহে মাধব দেব (বৈষ্ণব ধর্ম্মসংস্কারক) রামায়ণের আদিকাণ্ড রচনা করেন। ইহা ছাড়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭৬৩-৬৫ খৃ:) কোন অজ্ঞাতনামা কবি সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করেন। রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বসময়ে (১৭৬৫-১৭৮২) দ্বিজ রুদ্রদেব রামায়ণ আরণ্যকাণ্ডের অনুবাদ করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮২-১৮৩৯ খৃ:) রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের অনুবাদ করেন। "কুচবিহারে সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞানচর্চ্চা"—অমূল্যরতন গুপ্ত (কুচবিহার দর্পণ, আষাঢ়, ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

(পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্য)

রামায়ণ ও মহাভারত

মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী সংস্কৃত দুই মহাকাব্যের অনুবাদ হিসাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত না হইয়াও এই দুই মহাকাব্য সংস্কৃত পুরাণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালা মহাভারতকে সাধারণ কথায় "ভারত পুরাণ"ও বলিয়া থাকে। বাঙ্গালা রামায়ণকে সোজাসুজি "পুরাণ" আখ্যায় ভূষিত না করিলেও মহাভারতের সমশ্রেণীর পৌরাণিক কাহিনীপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই দুই গ্রন্থে মহাকাব্যের গুণ এবং পুরাণের সহিত সংশ্রব থাকিলেও উভয় গল্পের কাঠামো এবং রীতি এক নহে। এই দুই গ্রন্থের সংস্কৃত আদর্শও বিভিন্ন। রামায়ণের গল্প অনেকটা সরল এবং অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রের পারিবারিক কাহিনীপূর্ণ। অপরপক্ষে কুরু-পাণ্ডবের কথা মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু হইলেও ইহাদের কথা অবলম্বন করিয়া ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত প্রাচীন ভারতীয়গণকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে চতুর্বর্গ ফলের শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এত অবান্তর নানা বিষয় ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে একটি কথা এদেশে প্রচলিত আছে - "যা নাই ভারতে (অর্থাৎ মহাভারতে) তা নাই ভারতে" (ভারতবর্ষে)। সংস্কৃত রামায়ণ অবতারবাদ প্রচারে আগ্রহশীল নহে এবং ভক্তিবাদ প্রচার ইহার মূল উদ্দেশ্যও নহে। আদর্শ মানবচরিত্র অঙ্কনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। অপরপক্ষে বেদান্তের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ও কর্মবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই যেন সংস্কৃত মহাভারতের মূল গল্পটি রচিত হইয়াছে। ব্যাসদেব মহাভারত অবলম্বনে ভক্তিমার্গের গুণ প্রচারে বিশেষতঃ "কৃষ্ণ-ভক্তি" প্রচারে অল্প আগ্রহান্বিত নহেন। বাল্মীকির সংস্কৃত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সরল গল্পপ্রধান। ইহাতে দার্শনিক বা অন্য কোন তথ্যের প্রচার অবান্তর। কিন্তু সংস্কৃত মহাভারত জটিল এবং শাখা উপশাখা সমন্বিত বহু গল্পের আকর, অথচ ইহাই এই গ্রন্থের মূল কথা নহে। প্রধান গল্পগুলি উদ্দেশ্যমূলক এবং কোন নীতি বা তত্ত্ব প্রচারে প্রয়াসী। ইহার গল্পসমূহ শুধু এই নীতি ও তত্ত্ব প্রচারের উদাহরণ হিসাবে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। ইহার

ফলে মহাভারতের ক্ষুদ্র মূল কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী বহু যুগের বহু কবি ও দার্শনিকের হস্তক্ষেপে বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে। এই বিশাল মহাভারত মহিরুহের অঙ্গ আশ্রয় করিয়া কত বিভিন্ন অবান্তর গল্প যে পরগাছা ও লতার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রামায়ণও কালক্রমে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ" নামে ও "অধ্যাত্ম রামায়ণ" নামে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছে। তবে এই দুইটি রামায়ণ "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ" নহে এই যা কথা। সংস্কৃত মহাভারত কত পুরাতন বলা কঠিন। সংস্কৃত রামায়ণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। যাহা হউক উভয়ের মতে গল্পাংশ কাব্যাকার প্রাপ্ত হইবার আগে যে বহু পুরাতন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগ। এই শেষোক্ত যুগের কোন সময়ে উভয় গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। ক্রমে ভাষার পরিবর্ত্তন ও গ্রন্থদ্বয়ে নানারূপ গল্প ও তত্ত্বের সংযোজন লাভে খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে গ্রন্থদ্বয়ের বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকিবে। এখন একটি প্রশ্ন হইতেছে যে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ আগে রচিত হইয়াছিল না মহাভারত আগে রচিত হইয়াছিল? এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে "নানা মুনির নানা মত" দেখা যায়। কেহ রামায়ণকে আগে এবং কেহ মহাভারতকে আগে রচিত বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। মতদ্বৈধ থাকিলেও ভৌগোলিক বর্ণনাকে প্রধান করিলে মহাভারতকে পরে রচিত বলিতে হয়। সামাজিক ও পারিবারিক শুচিতা ও শৃঙ্খলা বিবেচনা করিলে রামায়ণকে পরে রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ভাষা উভয়েরই পরবর্ত্তী সংস্কৃত যুগের। উভয় গ্রন্থের জাতি ও রাজবংশের তালিকা বিবেচনায় ও প্রচলিত মতানুযায়ী আমরাও রামায়ণের গল্পাংশ ও আদি রচনাকে মহাভারতের পূর্ব্বে গণ্য করিবার পক্ষপাতী। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হওয়াতে উভয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা দুরূহ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রামায়ণের ভাষার রীতি কাব্যের এবং মহাভারতের রচনার রীতি আরও পুরাতন।

বাঙ্গালা মহাভারতগুলি সংস্কৃত মহাভারতের অনুকরণে ব্যাসদেব অপেক্ষা জৈমিনিকেই প্রধানতঃ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই জৈমিনি শঙ্করাচার্য্যের (খৃঃ ৮ম শতাব্দী) কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন বাঙ্গালা মহাভারতসমূহে এই জৈমিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা রামায়ণ যেরূপ বাল্মীকি অপেক্ষা পদ্মপুরাণকার ব্যাসদেবকে অধিক অনুসরণ করিয়াছে বাঙ্গালা মহাভারত সেইরূপ ব্যাসদেব অপেক্ষা জৈমিনির সংক্ষিপ্ত মহাভারতের

আদর্শ অধিক গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ বলে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। কারণ তাহাই মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই মত ঠিক নাও হইতে পারে।

বাঙ্গালা মহাভারত সংস্কৃত আদর্শ মূলতঃ গ্রহণ করিয়া তাহার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় ভক্তির রং ফলাইয়াছে। বাঙ্গালা মহাভারত শুধু সংস্কৃত মহাভারতের অন্ধ ভাষানুবাদ নহে। ইহাতে আদর্শ ও রুচিগত পার্থক্য বিশেষভাবে বর্ত্তমান। সংস্কৃত রামায়ণের ন্যায় সংস্কৃত মহাভারতে যুগ যুগ ব্যাপী প্রাচীন হিন্দুজাতির বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস, কতক স্তরে স্তরে এবং কতক বিক্ষিপ্তভাবে, সজ্জিত রহিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের আদর্শ অনুযায়ী ইহা এক বিরাট "মহাদ্রুমের" সহিত তুলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ইহার মূলরূপে গণ্য করা হইয়াছে। বাঙ্গালা মহাভারত কৃষ্ণভক্তির এই মূল সুরটি সংস্কৃত মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছে এবং কি রামায়ণ ও কি মহাভারত উভয় মহাকাব্যই বৈষ্ণবভক্তি প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দিক দিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালার আদর্শ এক। এতদ্ভিন্ন অবান্তর গল্পসমূহের খনি হিসাবে সংস্কৃত মহাভারতকে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা মহাভারত যথাসম্ভব এই সব অতিরিক্ত গল্পসমূহ প্রচারে ব্রতী হইয়াছে। অপরপক্ষে বাঙ্গালা মহাভারত যেমন ভক্তির আতিশয্যে তেমনই চরিত্র-চিত্রণেও সংস্কৃত মহাভারত হইতে ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির আদর্শ, রুচি ও সমাজিক চিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালা মহাভারতের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। বীরত্ব অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি ও করুণরস প্রচারে বাঙ্গালা মহাভারতের অধিক আগ্রহ। বাঙ্গালা মহাভারতে একদিকে ১৬শ শতাব্দীর সংস্কারযুগের ব্রাহ্মণ্য আদর্শ এবং অপরদিকে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশিত প্রেম ও ভক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের ঋষি বৈশম্পায়ন প্রথম বক্তা ও পরীক্ষিৎ-পুত্র রাজা জন্মেজয় শ্রোতা। এই কৌশলে অনেক অবান্তর গল্পও যোজিত হইয়াছে। বাঙ্গালা মহাভারতও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃতের অনুকরণে উপমন্যু ও আরুণির উপাখ্যান, উতঙ্ক মুনির উপাখ্যান প্রভৃতি উপগল্প বাঙ্গালা মহাভারতেও রহিয়াছে। মূল মহাভারতে বোধ হয় এই সব গল্প ছিল না।[১] এই গল্পগুলিই সংস্কৃত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সাবিত্রী-সত্যবানের

(১) মূল মহাভারতের ২৪ হাজার শ্লোক কালক্রমে লক্ষাধিক শ্লোকে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" দ্রষ্টব্য।

উপাখ্যান এবং শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যানও মূল সংস্কৃত মহাভারতে দেখা যায় না। বাঙ্গালা মহাভারত যথাসম্ভব এই গল্প স্বীয় অঙ্গে যোজিত করিয়াছে।

আমরা পরের অধ্যায়ে একে একে বাঙ্গালা মহাভারত রচনাকারী কবিগণ ও তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বাঙ্গালা মহাভারতের রচনাকারী কবিগণের সংখ্যা অল্প নহে, ইহা অসংখ্য। তবে সকলেই যে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন তাহা নহে। অনেক কবিই সংস্কৃত মহাভারত আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন কেহ কেহ দুই একটি পর্ব্ব মহাভারত হইতে অনুবাদ করিয়াই সম্পূর্ণ মহাভারতের কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইহার কারণ অপর কবিগণ প্রথম কবির কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তাঁহারা প্রধান কবির নামের অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ দুই একটি পর্ব্ব ভিন্ন সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদে প্রয়াস পান নাই। কোন কোন সময় আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভাল ছত্রগুলি স্বীয় মহাভারতে আত্মসাৎ করিয়া পরবর্ত্তী কবি নিজের বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন ও যশস্বী হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ পরবর্ত্তী কবিগণের নামের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। আবার এমনও হইয়াছে যে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এবং প্রচারকার্য্যের সহায়তায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কবির রচনা অধিক প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছে। ইহার সহিত আধুনিক কালের পুথি সংশোধকগণ প্রাচীন ভাষার সংস্কার সাধন করিয়া প্রাচীন মহাভারতকে নববেশ পরিধান করাইয়াছেন। যুগোপযোগী ভাষা ও কাহিনীর পরিবর্ত্তন এবং কলিকাতার বটতলার মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারকার্য্য যে সব প্রাচীন পুথিকে এইরূপে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, কতিপয় প্রাচীন কবির মহাভারত তন্মধ্যে অন্যতম। ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই হইয়াছে।

বাঙ্গালা রামায়ণ ও বাঙ্গালা মহাভারতের মধ্যে রামায়ণের গল্প কতকটা গীতিকা-ধর্ম্মী এবং মহাভারতের গল্পে মহাকাব্যের উপাদানই প্রচুর রহিয়াছে। বাঙ্গালী চিত্ত গীতধর্ম্মীই অধিক। এই দিক দিয়া বিচার করিলে গীতধর্ম্মী ও করুণরসের নির্ঝর রামায়ণের গল্পই বোধ হয় বাঙ্গালী জনগণের অধিক প্রিয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ও সমাজের নানা ব্যক্তি ও নানা স্থানের নাম মহাভারত যত জোগাইয়াছে এত রামায়ণ জোগায় নাই। ইহার কারণ হয়ত প্রাচীন শিক্ষিত সমাজের মহাভারতের গল্পের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনীতিপ্রীতি এবং কৃষ্ণভক্তিমূলক ঘটনাবাহুল্যের প্রতি জনসাধারণের একান্ত অনুরাগ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

(পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্য)

মহাভারতের কবিগণ

(১) সঞ্জয়

কবি সঞ্জয় বাঙ্গালা মহাভারতের আদি কবি বলিয়া পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবির পরিচয় বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন, "খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অত্যন্ত দুর্লভ।" ইহার "একখানি মাত্র স্বর্গীয় অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম।"[১] সঞ্জয়ের মহাভারতের দ্বিতীয় পুথিখানা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়ে রহিয়াছে। তাহাতে লেখকের পরিচয় এইরূপ আছে।—

"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক, শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইয়াছে। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মণঃর ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অল্পপত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হৈয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২১ তারিখ ১৫শে কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রীমূলগ্রাম লেখকের নিজগ্রাম।" এই পুথি তত পুরাতন নহে, কারণ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম অংশে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) ইহা লিখিত হইয়াছে।

সঞ্জয় স্বীয় পরিচয় নিম্নরূপ দিয়াছেন। ইহাতে মহাভারতোক্ত সঞ্জয়ের নাম যে তিনি ধারণ করিয়াছেন এই হেতু সম্ভবতঃ কিছু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতের সঞ্জয় অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমীপে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ মৌখিক বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর সঞ্জয় সেই কাহিনী রচনা করিয়াছেন। সুতরাং কবি একদিকে যেমন দুইজনের পার্থক্য দেখাইয়াছেন অপরদিকে দুই নাম একত্র লিখিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন।

(ক) "ভারতের পুণ্যকথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥"

—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পুথি, ৫৭৭ পত্র।

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৩১।

(খ) "সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা শুনি,
শুনিলে আপদ হৈলে তরি।"

—ঐ, ৫৩৬ পত্র।

(গ) "প্রথম দিনের রণ ভীষ্মপর্ব্বে পোথা।
সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥"

—ঐ, ২৩৬ পত্র।

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সংগৃহীত পুথিতে কবির সামান্য পরিচয় এইরূপ আছে :—

"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম॥"

—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টর পুথি, ৪৩৬ পত্র।

ইহা হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজ বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ জুড়িয়া এক সময়ে যে সঞ্জয়ের মহাভারতের আদর ছিল তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। এই কবির মহাভারত বিক্রমপুর, ফরিদপুর, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানা জেলায় পাওয়া যাওয়াতে এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে। সমগ্র পূর্ব্ব-বঙ্গে, এমনকি উত্তর-বঙ্গেও, যে কবির পুথির এত প্রসার ইহাতে তাঁহার বাড়ী পূর্ব্ব-বঙ্গে থাকার সম্ভাবনাই অধিক। তাঁহার বাড়ী পূর্ব্ব-বঙ্গের বিক্রমপুরই ছিল কি না বলা কঠিন। কবির বাড়ী বিক্রমপুর হইলে তাঁহার তথাকার কোন প্রাচীন ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদ্য পরিবারে জন্মলাভ করিবার সম্ভাবনা। তিনি নিজে কোথাও নিজের জাতির কথা স্পষ্ট করিয়া না বলাতে এইরূপ অনুমান হয়ত চলিতে পারে। আবার কাহারও কাহারও মতে সঞ্জয় শ্রীহট্টদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফল কথা এই সবই অনুমান মাত্র।

সঞ্জয়ের সময় স্থির করা আর এক সমস্যা। সুবিখ্যাত কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারত বাঙ্গালার পাঠান সুলতান হুসেন সাহের সময় (রাজত্বকাল ১৪৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ) রচিত হয়। প্রায় সর্ব্বত্র কবীন্দ্র রচিত মহাভারতের মধ্যে প্রাচীনতর হস্তলিপিযুক্ত কয়েক পত্র সঞ্জয়ের মহাভারতও পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে সঞ্জয়কে কবীন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা স্বাভাবিক। কবিকে এই প্রমাণে খৃঃ ১৪শ শতাব্দীর বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি অবশ্য খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কি শেষার্দ্ধের কবিও হইতে পারেন। আমাদের মনে হয় কৃত্তিবাস খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি

হইলে সঞ্জয় খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেরও হইতে পারেন, এবং এই মহাকবিদ্বয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

মূল সঞ্জয়ের মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্বই লিখিত ছিল কি না সন্দেহ। সঞ্জয় বোধ হয় মহাভারত আংশিক রচনা করিয়াছিলেন। অপর কবিগণ সঞ্জয়ের মহাভারতে বিভিন্ন অংশ সংযোগ করিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। কবি সঞ্জয়ের লেখা আংশিক লোপ পাওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছিল অথবা সঞ্জয় আদৌ সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেন নাই। ইহার কোনটি ঠিক বলা যায় না। সঞ্জয়ের লেখার অংশবিশেষ সত্যই যে লোপ পাইয়াছিল তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সঞ্জয়-মহাভারতের অন্তর্গত "অশ্বমেধ-পর্ব্ব" কবি গঙ্গাদাসের রচনা এবং "দ্রোণ-পর্ব্বের" কবি গোপীনাথ। এই মহাকাব্যে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যানের কবি রাজেন্দ্রদাস।

কবি সঞ্জয় সামান্য কতিপয় পত্রে মহাভারতের বৃহৎ পর্ব্বগুলি যথা, "বন-পর্ব্ব", "অনুশাসন-পর্ব্ব", "মহাপ্রস্থানিক-পর্ব্ব" ও "সৌপ্তিক-পর্ব্ব" শেষ করিয়াছেন। এইরূপ সংক্ষিপ্ত রচনা অবশ্য কবির প্রাচীনত্ব সূচিত করে। এতদ্ভিন্ন সঞ্জয়ের মহাভারতের পরবর্ত্তী যোজনাগুলি ভাষার অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের দিক দিয়া বেশ নজরে পড়ে। কবীন্দ্র রচিত মহাভারতের পুথিগুলিতে সর্ব্বদা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হস্তাক্ষরের চিহ্নযুক্ত সঞ্জয়-মহাভারতের পত্রগুলিও এই কবিগণ হইতে সঞ্জয়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। সঞ্জয়ের ভণিতাগুলিও কবির প্রাচীনত্ব প্রমাণে কতকটা সাহায্য করে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের পুথিতে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত নিম্নলিখিত ছত্র দুইটিও সঞ্জয়কে মহাভারতের আদি বাঙ্গালা অনুবাদক গণ্য করিবার স্বপক্ষে যায়। যথা,—

"অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর।
পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জল॥" বাঃ গঃ পুথি।

সঞ্জয়ের "মহাভারত-পাঞ্চালী" রচনা তত সুখপাঠ্য নহে। ইহা অমার্জ্জিত গ্রাম্য ভাষা ও জটিলতা দোষদুষ্ট হইলেও চরিত্র চিত্রণে, বিশেষতঃ বীররসের উদ্দীপনায় কবি যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সঞ্জয়কে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসরণ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের রচনা আলোচনা কালে ইহা দেখান যাইবে। সঞ্জয়ের চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত। নিম্নে সঞ্জয়ের রচনার দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(ক) কর্ণ-পর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের প্রতি শল্যের উত্তর।

"কোপ বাড়িবার শল্য বলে আর বার।
ফুটিলে অর্জ্জুন বাণ না গর্জ্জিবে আর॥
সুহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে।
অগ্নিতে পতঙ্গ নরে তারে কেবা রাখে॥
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতূহলে॥
সেই মত কর্ণ তুমি বোলয়ে দারুণ।
রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অর্জ্জুন॥
চোঁকা ধার ত্রিশূলেতে ঘষ কেন গাও।
হরিণের ছায়ে যেন সিংহরে বোলাও॥
মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থূল।
সিংহের ডাকএ সেই হইতে নির্ম্মূল॥" ইত্যাদি।

—সঞ্জয়ের মহাভারত, বাঃ গঃ পুথি, ৪৭৭ পত্র।

(খ) বিরাট-পর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রতি বিরাটরাজা।

"অর্জ্জুনক ভূপতিএ করন্ত পরিহার।
একবাক্য মহাশয় পালিব আহ্মার॥
যদি তুহ্মি মোরে কৃপা হয়ত আপন।
তবে মোর কন্যা তুহ্মি করহ গ্রহণ॥
যুধিষ্ঠির প্রণয় করএ পুনি পুনি।
আপনে করহ আজ্ঞা ধর্ম্ম মহামণি॥
নৃপতি কহেন ভাই নহে অনুচিত।
বিরাট কুমারী গৃহে আহ্মার কুৎসিত॥" ইত্যাদি।

সঞ্জয়ের মহাভারত।

(২) কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বাঙ্গালা মহাভারতের অনুবাদক কবিগণের আলোচনা নানা কারণে বিশেষ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত মূলে ক্ষুদ্র থাকিলেও যুগে যুগে বহু ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালা মহাভারতের কবিগণ ব্যাসঋষিকে আংশিক গ্রহণ করিলেও বিশেষভাবে খৃঃ ৭ম (?) শতাব্দীর জৈমিনির সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত মহাভারত আশ্রয় করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকলেই মহাভারতের অংশানুবাদক, সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদক নহেন। এই সমস্ত লেখাতেও নানা হস্তচিহ্ন পরিস্ফুট এবং অনেক কবিরই সম্পূর্ণ পরিচয়জ্ঞাপক পুথির পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই। সর্ব্বোপরি সকলেরই লেখায় অপূর্ব্ব সাদৃশ্য। অনেক কবির সঠিক কাল না জানাতে কে যে কাহার কাছ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন বলা দুষ্কর। সুতরাং প্রায় সমস্ত কথাই শুধু অনুমানের কুহেলিকাচ্ছন্ন পন্থার উপর নির্ভর করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় সত্য আবিষ্কার করা কঠিন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা মহাভারতগুলির এই অপূর্ব্ব সাদৃশ্য, হয় দেশে দেশে ভ্রমণকারী বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের ভাট-ব্রাহ্মণগণের রচিত গানের আদর্শের ফল নতুবা বহুভ্রমে আবিষ্কৃত সঞ্জয় কবির সংক্ষিপ্ত মহাভারত পরবর্ত্তী মহাভারতগুলির আশ্রয়স্থল। প্রথম কারণটি যতটা সম্ভব শেষের কারণ ততটা সম্ভব নহে। সঞ্জয় কবির রচিত বলিয়া যে অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে শুধু তাহাই পরবর্ত্তী বাঙ্গালা মহাভারতগুলি অনুকরণ করিতে পারে, সব অংশে তাহা সম্ভব নহে, কেন না সঞ্জয় সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। সঞ্জয় কৃত্তিবাসের ন্যায় বারবার তাঁহার পাঞ্চালী সম্বন্ধে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে অতি অন্ধকার "মহাভারত সাগর"কে তাঁহার রচিত "ভারত-পাঞ্চালী "উজ্জ্বল" করিয়াছে। ইহাতে সঞ্জয়কে অবশ্য আদি কবি বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী মহাভারতের কবির আসন কে পাইবেন? তিনি সম্ভবতঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র জানা গিয়াছে যে তিনি বাঙ্গালার সুলতান হুসেন সাহের (১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ) সমসাময়িক, কারণ, এই সুলতানের চট্টগ্রামস্থ সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মহাভারত-খানি রচনা করেন। অবস্থা দৃষ্টে অনুমান হয় কবীন্দ্র চট্টগ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। পরাগল রস্তি খান নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র। পরাগলের পুত্রের নাম ছুটি খান। এই ছুটি খান সম্বন্ধে পরেও উল্লেখ করা যাইবে। কবীন্দ্রের রচিত মহাভারত "পরাগলী ভারত" নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদ নহে। ইহাতে ১৭০০০ হাজার শ্লোক রহিয়াছে। কবীন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত পুথি পাওয়া যায় নাই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন যে তিনি কবি সঞ্জয়ের পুথির ন্যায় কবীন্দ্র রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুথি ক্রয় করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাগারে দিয়াছেন। তিনি আরও

দুইখানি কবীন্দ্রের মহাভারত পাইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।[১] এই সব পুথিতে যে নানা ভেজাল আছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কবীন্দ্র "আদি" হইতে "অশ্বমেধ পর্ব্বের" পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ "স্ত্রী পর্ব্ব" পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র পরাগল খান সম্বন্ধে নিম্নরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্রপৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

—কবীন্দ্রের মহাভারত,
বাঃ গঃ পুথি, ১ম পত্র।

কবীন্দ্রের মহাভারতের সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্যমূলক "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" একটি নূতন প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা দুই ব্যক্তি না একই ব্যক্তি? বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত মুদ্রিত হইয়াছে। এই মহাভারতের ছত্রগুলির সহিত কবীন্দ্রের মহাভারতের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। উভয় গ্রন্থই একজনের লেখা বলিয়া মনে হয়। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভণিতায় বিজয়-পাণ্ডব কথা অমৃতলহরী" পদটি একটি মূর্খ লিপিকারের হস্তে "বিজয়-পণ্ডিত কথা অমৃত-লহরী" হইয়া গিয়াছিল—(বঃ ভাঃ ও সাঃ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৮৫৫, পাদটীকা)। এই মতটিই সমীচীন মনে হয়।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সংস্কৃত জ্ঞান ভালই ছিল। তিনি ব্যাসের মহাভারতের স্থানে স্থানের সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের ভাষা

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, ৬ষ্ঠ সং পৃঃ ১৪৮, পাদটীকা।

অনেক স্থানে দুর্ব্বোধ্য। কবির প্রাচীনত্ব ও চট্টগ্রামে বাসভূমি ইহার কারণ হইতে পারে। সঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত রচনাকে কবীন্দ্র বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়া ভিতরের ভাবকে ভালরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। নিম্নে "পরাগলী ভারতের" কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ।

(ভীষ্ম পর্ব্ব)

"তবে-কৃষ্ণ সৈন্যক যে প্রশংসা করন্ত।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুঁই অন্ত॥
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির রাজাক যে দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ।
হাতে চক্র লৈয়া যাএ প্রসন্ন বদন॥
রথত্যাজ্য হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যাএ ত্রিজগত-নাথে॥
কৃষ্ণের যে পদভরে কাঁপে বসুমতী।
মৃগেন্দ্র ধরিতে যাএ যেন পশুপতি॥
অস্ত্রক লইয়া ভীষ্ম হাতে ধনুঃশরে।
নির্ভয় বোলন্ত ভীষ্ম রথের উপরে॥
জগতের নাথ আইলা মারিবার মোক।
রথ হোতে পড়ে মোক দেখতক লোক॥
তুম্মি মোক মারিলে তরিমু পরলোক।
ত্রিভুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক॥
দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডুর নন্দন।
রথ হোতে ত্যাজ্য হৈয়া ধরিল চরণ॥" ইত্যাদি।

—কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত।

বোধ হয় "পরাগলী ভারতের" নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহের আদেশে একখানি "ভারত পাঞ্চালী" রচিত হয়। এই পুথিখানি পাওয়া যায় নাই সুতরাং পুথিখানির রচনার সঠিক তারিখও জানা যায় নাই। শ্রীকরণ নন্দীর "অশ্বমেধ পর্ব্ব" এই "ভারত পাঞ্চালীর"ই অন্তর্গত কি না বলা কঠিন।

(৩) শ্রীকরণ নন্দী

শ্রীকরণ নন্দী চট্টগ্রামে হুসেন সাহের শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি ছুটি খানের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ছুটি খান তাঁহার পিতা পরাগল খানের মৃত্যুর পর বাঙ্গালার সুলতান হুসেন সাহ কর্ত্তৃক পিতার পদ প্রাপ্ত হন। পরাগল খান কবীন্দ্রকে দিয়া মহাভারতের "স্ত্রীপর্ব্ব" পর্য্যন্ত অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ছুটি খানও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীকরণ নন্দীকে দিয়া খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাভারতের "অশ্বমেধ পর্ব্ব" অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শ্রীকরণ নন্দী বিস্তৃতভাবে তাঁহার মহাভারত রচনার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষে হুসেন সাহ ও তৎপুত্র নসরৎ সাহ এবং পরাগল খান ও তৎপুত্র ছুটি খান সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাসূচক উক্তি করিয়াছেন। যথা,-

"নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥

* * *

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নিঙএ ছুটি খান মহাশয়॥

* * *

পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগৎ সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরণ নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥"

—শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত।

এই শ্রীকরণ নন্দীই সুলতান নসরত সাহের শাসনকালে "ভারত-পাঞ্চালী" লিখিয়াছিলেন কি না সঠিক বলা যায় না। ছুটি খান অবশ্য সুলতান হুসেন সাহ কর্তৃক চট্টগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হন। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ এবং ছুটি খানের পিতা পরাগল খান উভয়েই চট্টগ্রামে সামরিক অভিযানে হুসেন সাহ কর্তৃক প্রেরিত হন। ছুটি খান হুসেন সাহ ও তৎপুত্র নসরত সাহ উভয়ের সময়েই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। পরাগল খান ও ছুটি খান এই পিতা-পুত্রের অনেক স্মৃতি চট্টগ্রাম জেলায় 'পরাগলপুর' নামক স্থানটি বহন করিতেছে। এমন হওয়া অসম্ভব নহে যে শ্রীকরণ নন্দী "অশ্বমেধ পর্ব্ব" রচনা করিলে কবির প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং সুলতান নসরত সাহ কবিকে একখানি সম্পূর্ণ "ভারত-পাঞ্চালী" রচনা করিতে আদেশ দেন। খুব সম্ভব উহা বেশী দূর রচনা করিবার পূর্ব্বেই কবি ইহলোক ত্যাগ করেন এবং "ভারত-পাঞ্চালী" ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া নামেমাত্র পর্য্যবসিত হয়। এই সব কথা অনুমান মাত্র। ইহা মানিয়া না লইলেও কোন ক্ষতি নাই।

শ্রীকরণ নন্দীকে নিয়া একটি সমস্যা রহিয়াছে। একখানা প্রাচীন পরাগলী মহাভারতে আছে—

"কহে কবি গঙ্গা নন্দী, লেখক শ্রীকরণ নন্দী।"

কবীন্দ্রের মহাভারতে গঙ্গা নন্দী নামক আর একজন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে লেখক হিসাবে শ্রীকরণ নন্দীর নাম রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে একটি অনুমান করা যাইতেছে। কবীন্দ্রের অসম্পূর্ণ রচনা সম্পূর্ণ করিবার ভার সম্ভবতঃ গঙ্গা নন্দী নামক কবির উপর প্রথমে ন্যস্ত হয়। ইনি "নন্দী" উপাধি ধারণ করিতেন বলিয়া শ্রীকরণ নন্দীর পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ হইবেন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কবির আকস্মিক মৃত্যুর পর লেখক শ্রীকরণ নন্দী কবির আসন পাইয়া থাকিবেন। হয়ত কবি হিসাবেও তাঁহার যশ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য ছুটি খান কবীন্দ্রের রচনা সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকরণ নন্দীকে "অশ্বমেধ পর্ব্ব" রচনা করিতে আদেশ দেন। আর অধিক অনুমান না করিয়া এইখানেই নিরস্ত হইলাম।

মহাভারত অনুবাদ উদ্দেশ্যে শ্রীকরণ নন্দী জৈমিনি ভারতের আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের ন্যায় শ্রীকরণ নন্দীর ভাষাও প্রাচীন, সুতরাং স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য অথবা অপ্রচলিত শব্দপূর্ণ। তবুও বলা যায় ইহা একেবারে কবিত্বরস বর্জ্জিত নহে।

যজ্ঞাশ্ব আনিতে ভদ্রাবতী-পুরীতে ভীমকে একাকী প্রেরণ করিতে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা প্রকাশ।

"ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি।
পাছু না বিচারিয়া প্রতিজ্ঞা করহ ভারতী॥
সংশয় ব্যসয়ে ভীম ভদ্রাবতী-জয়।
একাকী যাইবা তুম্মি অশক্য রণয়॥
রাজাএ যদি এমত বোলে ভীমক গর্জ্জন্ত।
বৃষকেতু কর্ণপুত্র বুলিলন্ত॥
মোকে সঙ্গে নেয় ভীম তোম্মার দোসর।
যৌবনাশ্ব জিনিমু মুঞি করিয়া সমর॥
ভীম বোলে বৃষকেতু তুম্মি মহাবীর।
সুরাসুর সমবেত নির্ভয় শরীর॥
কি পুনি তোম্মার পিতা রণেত মারিল।
তোব মুখ না চাহোম লজ্জায় আবরিল॥" ইত্যাদি।

— শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব)।

(৪) ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন

কবি ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন সুবর্ণবণিক জাতীয় ছিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে "দীনার দ্বীপ" বা দিনারদি গ্রাম। অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে এই গ্রাম ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত "ঝিনারদি" গ্রাম। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে এই নামের একটি গ্রামে কবিদ্বয়ের নিবাস ছিল মনে করিয়াছেন। মোট কথা এই কবিদ্বয়ের জাতি ও বাসভূমি সবই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সাব্যস্ত করিতে হইতেছে। ইঁহারা পিতাপুত্রে একত্র হইয়া রামায়ণ, মনসা-মঙ্গল (পদ্মা-পুরাণ) ও মহাভারত রচনা করিয়া প্রচুর যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে পদ্মা-পুরাণ ও রামায়ণ অধ্যায় দুইটিতে আলোচনা করা গিয়াছে। এই কবিদ্বয়ের কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ছিল বলা যাইতে পারে। কবি গঙ্গাদাস সেন বেশ রসাল করিয়া বিস্তৃতভাবে নানারূপ বর্ণনা করিতে নিপুণ ছিলেন। ষষ্ঠীবর কিছু সংক্ষিপ্ত রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। গঙ্গাদাস সেন "আদি" ও "অশ্বমেধ" পর্ব্ব

রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মহাভারতের মধ্যে গঙ্গাদাসের রচনা এইরূপ :—

দেবযানীর সহিত যযাতির সাক্ষাৎ।

"একদিন দেবযানী হৃদয় হরিষ গণি
শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজসুতা।
ঋতু-রাজ মধুমাস ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ
চলি আইল পুষ্প-বন যথা॥
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে বন আমোদিত
ফুটিয়া লম্বিত হইছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি শুনিতে বিদরে প্রাণী
ভ্রমরে করয়ে কোলাহল॥
সানন্দিত বন দেখি মিলিয়া সকল সখী
ক্রীড়া যত করয়ে হরিষে।
মলয়া সমীর বাও ধীরে ধীরে বহে গাও
প্রাণ মোহিত গন্ধবাসে॥
হেন সমে যযাতি বিধাতা-নির্ব্বন্ধ-গতি
মৃগয়া-কারণে সেই বন।
ভ্রমিয়া কাননচয় মৃগ কথা নাহি পায়
কন্যা সব দেখে বিদ্যমান॥
তার মধ্যে দুই কন্যা রূপে গুণে অতি ধন্যা
জিনি রূপ রম্ভাহ উর্ব্বশী।
অধর বান্ধুলি-জ্যোতিঃ দশন মুকুতা-পাঁতি
বদন জলয়ে যেন শশী॥
নয়নকটাক্ষ-শরে মুনি-মন দেখি হরে
ভ্রুযুগ কামধেনু-ধারা।
চারিদিভিতে সহচরী বসি আছে সারি সারি
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা॥"

—গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত।

কবি ষষ্ঠীবরের "স্বর্গারোহণ পর্ব্বে"র মধ্যে কবি সমগ্র মহাভারত রচনার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠীবরের সরল বর্ণনার নমুনার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

"স্বর্গ হইতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী।
পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথ-গামিনী॥
উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার।
পৃথিবী পরেছে যেন মালতীর হার॥"

—যষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, মহাভারত।

"আদি পর্ব্ব ও "অশ্বমেধ পর্ব্ব" রচক গঙ্গাদাস সেনের রচিত অনেক অংশ কবি কাশী দাসের রচিত সেই সেই অংশ হইতে কবিত্বগুণে হীন নহে।

(৫) রাজেন্দ্র দাস

কবি রাজেন্দ্র দাসের সময় ও পরিচয় জানা যায় নাই। ইনি একখানি মহাভারত আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শকুন্তলার উপাখ্যানের অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে। সঞ্জয়-ভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানটির সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই। ইহা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোন সময়ে সঞ্জয়ের মহাভারতের সহিত রাজেন্দ্র দাসের রচনা, গঙ্গাদাস সেন ও গোপীনাথ দত্তের রচনার ন্যায়, সংযুক্ত হইয়াছে। রচনাদৃষ্টে কবি রাজেন্দ্র দাসের সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। রাজেন্দ্র দাসের রচনার পুথিগুলি প্রায়ই ২০০।২৫০ বৎসরের হস্ত-লিখিত বলিয়া দেখা যায়। রাজেন্দ্র দাসের রচনায় বর্ণনা মাধুর্য্যের উদাহরণ এইরূপ :—

রাজা দুষ্মন্তের কণ্বমুনির তপোবনে আগমন।

"মৃগয়া দেখি সেই বন মধ্যে যাইতে।
কেবা মোহ না যাএ সে বন দেখিতে॥
শীতল পবন বহে সুগন্ধী বহে বাস।
ফল মূলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ॥
করন্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণ।
অতি বড় প্রীতে খেলে পক্ষিণীর সন॥
মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষসব নড়ে।
ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে॥
নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর।
থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর।

নির্ম্মল বৃক্ষের তল পুষ্প পড়ি আছে।
লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে ॥
নানা বর্ণ সরোবর দেখি তার কাছে।
জলচর পক্ষীসব যাহাতে শোভিয়াছে ॥
হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল।
হেন পদ্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর ॥
হেন ভৃঙ্গ নাহি এখানে না ডাকে মত্ত হৈয়া।
কেবা মোহ না যায় যে সে বন দেখিয়া ॥
সুখ-দরশনে রাজা সব বিস্মরিল।
তপোবনের শোভা দেখি হৃদয় মোহিল ॥"

--রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলোপখ্যান।

(৬) গোপীনাথ দত্ত

কবি গোপীনাথ দত্ত "দ্রোণপর্ব্ব" রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র দাস ও গোপীনাথ দত্তের ন্যায় অনেক কবিই মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। গোপীনাথ দত্ত সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। এই কবির রচিত "দ্রোণ পর্ব্ব" সঞ্জয়ের মহাভারতের সহিত সংযুক্ত আছে। গোপীনাথ ও রাজেন্দ্র দাস প্রভৃতি কবির রচনায় মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস ও সুদীর্ঘ বর্ণনা সঞ্জয়ের সরল ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যলাভ করিতে পারে নাই। কবি গোপীনাথ দত্তের সময় অজ্ঞাত। ইহার সময় খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ অথবা খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে পারে।

(৭) দ্বিজ অভিরাম

দ্বিজ অভিরামকৃত "অশ্বমেধ পর্ব্ব" পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এই পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পুথির হস্তলিপি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ৩০০ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন। ইহা ঠিক হইলে কবি দ্বিজ অভিরাম খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষ অথবা খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে পারে। কিন্তু কবির "অশ্বমেধ পর্ব্ব" সুরচিত ও সংস্কার-যুগের প্রভাবযুক্ত। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগের চণ্ডীমঙ্গলের সুপ্রসিদ্ধ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনার সাদৃশ্য দ্বিজ অভিরামের পুথিতে সুস্পষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ মুকুন্দরাম বর্ণিত কালকেতু নির্ম্মিত গুজরাটপুরী ও দ্বিজ অভিরাম বর্ণিত মণিপুর নগরী রচনার দিকে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। কোন কবি কাহার নিকট ঋণী জানা নাই। দ্বিজ অভিরাম কবিকঙ্কণকে অনুকরণ করিয়া থাকিলে তিনি বোধ হয় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি।

মণিপুর বর্ণনা

"হৃদয় পরম সুখে আখি অনিমিখে দেখে
মণিপুর অতি সুমোহন।
অনুপম পুরী-শোভা জগজন মনোলোভা
সভে তথি কৃষ্ণপরায়ণ ॥

* * * *

গৃহে গৃহে সুনিকট বিচিত্র দেউল মঠ
ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি।
ধূপ দীপ উপহারে কৃষ্ণ আরাধন করে
কি পুরুষ কিবা নারী তথি ॥
দেখি মণিপুরময় গৃহে গৃহে দেবালয়
বিচিত্র চৌখণ্ডী শাস্ত্রশালা।
সভে রূপ গুণময় অঙ্গে আভরণচয়
শত শত শিশু করে খেলা ॥" ইত্যাদি।

—দ্বিজ অভিরামের অশ্বমেধ পর্ব্ব।

(৮) নিত্যানন্দ ঘোষ

কবি নিত্যানন্দ ঘোষ সম্ভবতঃ পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। এই কবি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত কাশীদাসের মহাভারতের পূর্ব্বে লিখিত হয় এবং এক সময়ে পশ্চিম-বঙ্গে এই মহাভারতখানির বিশেষ খ্যাতি ও প্রচলন ছিল। কবি নিত্যানন্দ সম্বন্ধে সামান্যমাত্রই জানিতে পারা যায়। "গৌরীমঙ্গল" কাব্যের কবি পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ) ভূমিকায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ ॥"

—গৌরীমঙ্গল কাব্য, পৃথ্বীচন্দ্র।

পশ্চিম-বঙ্গেই নিত্যানন্দ ঘোষের সম্পূর্ণ মহাভারত পাওয়া গিয়াছে। এই পুথিপ্রাপ্তি পশ্চিম-বঙ্গে যত সুলভ পূর্ব্ব-বঙ্গে তত নহে। পূর্ব্ব-বঙ্গে সঞ্জয়ের মহাভারত নিত্যানন্দের অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের" ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে তিনি নিত্যানন্দ ঘোষ নামে কোন কবির একখানি মহাভারতের "আদি পর্ব্বের" সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই কবি পশ্চিম-বঙ্গের প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ ঘোষ হওয়া অসম্ভব নহে। এই পুথিখানির প্রাপ্তিস্থান ত্রিপুরা জেলার (সদর) রাজাপাড়া গ্রামে এবং গৃহস্বামীর বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে পুথিখানাও নাকি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পুথিখানির হস্তলিপি একশত বৎসরেরও পূর্ব্বের বলিয়া ডাঃ সেন জানাইয়াছেন। যাহা হউক পুথিখানিতে নাকি এইরূপ ভণিতা আছে :—

"কাম্য করি যে শুনিল ভারত পাঁচালী।
সকল আপদ তরে বাড়ে ঠাকুরালী॥
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে শুন সর্ব্বজন।
আসে নাই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিবরণ॥"

—ত্রিপুরায় প্রাপ্ত নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত।

কবি নিত্যানন্দ ঘোষ রচিত মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কাশীদাসের মহাভারতের শেষের অনেক পর্ব্বেই নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা মিশ্রিত আছে। নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা জীবন্ত, সুখপাঠ্য এবং স্থানবিশেষে করুণরস বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা,—

দুর্য্যোধনের মৃতদেহ দর্শনে গান্ধারীর বিলাপ।

"দেখ কৃষ্ণ মহাশয় কুরু-নিতম্বিনী।
কেমনে এ দুঃখ সহে মায়ের পরাণী॥
দেখ কৃষ্ণ মরিয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেনে না দেখি রাজন।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় গান্ধার-নন্দন॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য আর কোথা পরিবার।
একেলা পড়িয়া আছেন আমার কুমার॥
কহ দুঃশাসন কোথা গেল পুত্রগণ।
সহোদর ছাড়ি কেন একা দুর্য্যোধন॥

একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়॥
সুবর্ণের খাটে যায় সতত শয়ন।
ধূলায় ধূসর তনু হয়্যাছে এখন॥
জাতি যুথী পুষ্প আর চম্পা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এসকল পুষ্পপাতি যাহার শয়ন।
সে তনু লোটায় ভূমে নাহি সম্বরণ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী।
লেপন করয়ে সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে ভেস্যাছে দেহ কর্দ্দমে শয়ন।
আহা মরি কোথা গেলে বাছা দুর্য্যোধন॥
তেজিয়া আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ করিবারে বাছা ডাকে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র তেজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদা যুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
ভীমার্জ্জুন ডাকে তোমায় করিবারে রণ॥
প্রতি-উত্তর নাহি দেহ কেন দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইলেন অচেতনা।
প্রিয় বাক্যে নারায়ণ করেন সান্ত্বনা॥
শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একমন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন॥"

—মহাভারত, স্ত্রী-পর্ব্ব, নিত্যানন্দ ঘোষ।

কবি নিত্যানন্দ ঘোষ খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের কবি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ ঘোষের ছত্রগুলির সহিত কাশীরাম দাসের ছত্রগুলির অপূর্ব্ব মিল আমরা কাশীরাম দাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব।

(৯) কবিচন্দ্র

কবিচন্দ্র উপাধি মাত্র। কবির প্রকৃত নাম শঙ্কর। এই কবির পরিচয় সম্বন্ধে আমরা রামায়ণ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। কবিচন্দ্রের কাল

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ। শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থত্রয়ের খণ্ডবিশেষের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবিত্বগুণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিলিপিগুলিতে কবিচন্দ্র রচিত "অঙ্গদ রায়বার" যোজিত হইয়াছে। কবিচন্দ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত অন্ততঃ ৪৭ খানি গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। অক্রুর-আগমন
২। অজামিলের উপাখ্যান
৩। অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ
৪। অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা
৫। উঞ্ছবৃত্তি পালা
৬। উদ্ধব-সংবাদ
৭। একাদশী ব্রতপালা
৮। কংসবধ
৯। কর্ণমুনির পারণ
১০। কপিলা-মঙ্গল
১১। কুন্তীর শিবপূজা
১২। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ
১৩। কোকিল সংবাদ
১৪। গেড়ু চুরি
১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান
১৬। দশম পুরাণ
১৭। দাতাকর্ণ
১৮। দিবারাস
১৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
২০। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর
২১। ধ্রুব-চরিত্র
২২। নন্দবিদায়
২৩। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ
২৪। পারিজাত-হরণ
২৫। প্রহ্লাদ-চরিত্র
২৬। ভারত উপাখ্যান
২৭। মহাভারত—বনপর্ব্ব
২৮। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব
২৯। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব
৩০। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব
৩১। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব
৩২। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব
৩৩। মহাভারত—গদাপর্ব্ব
৩৪। রাধিকা-মঙ্গল
৩৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড
৩৬। রাবণ-বধ
৩৭। রুক্মিণীহরণ
৩৮। শিবরামের যুদ্ধ
৩৯। শিবি উপাখ্যান
৪০। সীতাহরণ
৪১। হরিশ্চন্দ্রের পালা
৪২। অধ্যাত্ম রামায়ণ
৪৩। অঙ্গদ-রায়বার
৪৪। কুম্ভকর্ণের রায়বার
৪৫। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ
৪৬। দুর্ব্বাসার পারণ
৪৭। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

উল্লিখিত তালিকায় ভারত উপাখ্যানসহ মহাভারতের পর্ব্বগুলি একত্র ধরিলে ৮খানা স্থলে একখানা পুথি হয়। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেই রাবণ-বধ, অঙ্গদ-রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পাঁচখানা স্থলে একখানা রামায়ণ গ্রন্থ হয়। এমতাবস্থায় ১১খানা পুথি স্বতন্ত্রভাবে আর গণনা করিতে হয় না এবং কবিচন্দ্রের মোট রচিত পুথির সংখ্যা কমিয়া প্রকৃতপক্ষে ৩৬খানায় দাঁড়ায়। ইহার মধ্যে অনেক পুথি, বিশেষতঃ মহাভারতের পর্ব্বগুলি, অধিকাংশই খণ্ডিত। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামে এবং এতদঞ্চলেই এই পুথিগুলি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পুথিগুলি এক কবিরই লিখিত মনে হয়। শঙ্কর কবিচন্দ্র নামক এই কবি নিত্যানন্দ ঘোষ নামক অপর একজন প্রসিদ্ধ মহাভারত রচকের সমসাময়িক ছিলেন এবং শেষোক্ত কবি হইতে অধিক যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কবিচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এইরূপ উল্লেখ তাঁহার পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রায়শঃই কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কথা দুইটি ভণিতায় দেখিয়া মনে হয় 'শঙ্করের' ন্যায় "কবিচন্দ্র" কথাটিও উপাধি অপেক্ষা নামরূপেই কবি যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন। শুধু "কবিচন্দ্র"ও তিনি নামের স্থলে ব্যবহার করিতেন, যথা,—"সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র ভাষে"।

(১০) ঘনশ্যাম দাস

কবি ঘনশ্যাম দাসের পুথি জৈমিনির মহাভারতের সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। কবির রচিত পুথির একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার তারিখ ১০৪০ সাল বা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ। ইহার লেখক শ্রীসীতারাম দাস এবং প্রাপ্তিস্থান বাঁকুড়া, পাত্রসায়ের গ্রাম। ইহাতে মনে হয় ঘনশ্যাম দাস খৃ: ১৬ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি। লেখক সীতারাম দাস ঘনশ্যাম দাসের পুত্র হওয়া অসম্ভব নহে। ইহাদের কৌলিক উপাধি "সেন" কিন্তু বৈষ্ণব প্রভাব বশতঃ ঘনশ্যাম "দাস" উপাধি ব্যবহার করিতেন; বৈষ্ণব কবি রচিত নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

"কৃপা কর নারায়ণ ভকত জনায়।
জৈমিনি ভারত পোথা এত দূরে সায়॥
হরিদাস সেনে কৃপা কর নারায়ণ।
গোবিন্দ সেনের সুতে কর কৃপায়ণ॥

রাখিব অচলা ভক্তি বুদ্ধিমন্ত খানে।
কৃপা কর নারায়ণ দুর্ব্বাসা সেনে ॥
সহ পরিবারে কৃপা কর শ্রীনিবাস।
তোমার চরণে কহে ঘনশ্যাম দাস ॥"

—ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত

সম্ভবতঃ দুর্ব্বাসা সেন (উপাধি বুদ্ধিমন্ত খান) কৃষ্ণভক্ত কবি ঘনশ্যামের পিতা ছিলেন। কবি কর্ত্তৃক জৈমিনি ভারতের উল্লেখে বলা যায় বাঙ্গালার অধিকাংশ কবির ন্যায় তিনিও জৈমিনির সংস্কৃত মহাভারত হইতেই তাহার বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রহাস-বিষয়ার কাহিনী।

বিষয়ার পূর্ব্বরাগ।

"নিদ্রা যায় চন্দ্রহাস সুস্নিগ্ধ হৃদয়।
সরোবরে আস্তে কন্যা এমন সময় ॥
কুলিন্দী রাজার কন্যা চম্পক মালিনী।
বিষয়া আইল সঙ্গে মন্ত্রীর নন্দিনী ॥
সংহতি সকল কন্যা নবীন বএস।
পুষ্পের বিহারে চলে করি নানা বেশ ॥
প্রবেশ করিল সভে পুষ্পের উদ্যানে।
দেখিল হস্তিনীগণ পুষ্পের কাননে ॥

*　　*　　*

শ্রমে হৈয়া ঘর্ম্মমুখী সভে যায় জলে।
হাতাহাতী মত্ত হৈয়া সভে কুতূহলে ॥
বিহার করেন সভে জলে প্রবেশিয়া।
অন্যোন্যে জল সভে দিছেন ফেলিয়া ॥
পদ্মের মৃণালে জল তোলয়ে চুম্বকে।
ফুকরি ফুকরি জল দেয় মুখে মুখে ॥
এই মত জলক্রীড়া সভে সাঙ্গ দিয়া।
পরিলেন বস্ত্র সভে কূলেতে উঠিয়া ॥
হেনকালে চন্দ্রহাসে বিষয়া দেখিল।
সহসা মোহিত কন্যা চিত্ত মগ্ন হৈল ॥

আমার সমান পতি এই কৈল মনে।
তবে জানি বিধি মোর হয়ে সুপ্রসন্নে॥
ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাস।"
ভকতি করিয়া বন্দে ঘনশ্যাম দাস॥"

—ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত।

(১১) চন্দন দাস মণ্ডল (দত্ত)

মহাভারতের কবি চন্দন দাস মণ্ডল সম্বন্ধে কবির উক্তি হইতে সামান্য কিছু বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কবির আগুরি বংশে জন্ম এবং কৌলিক উপাধি দত্ত। তবে "দত্ত" বলিয়া কবির পরিবার তত পরিচিত ছিলেন না। সকলে এই পরিবারের "মণ্ডল" আখ্যা দিয়াছিল। কবির নিবাস যে গ্রামে ছিল তাহার নাম আকুরোল। আগুরিগণ পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী বলিয়া এই গ্রাম পশ্চিম-বঙ্গেরই কোন জেলায় হওয়া সম্ভব। কবি চন্দন দাসের পিতার নাম পুরুষোত্তম দত্ত এবং পিতামহের নাম নারায়ণ দত্ত। কবির পরিবার বোধ হয় বৈষ্ণব ছিলেন, সেইজন্য নামের শেষে কবি "দাস" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কবি ভণিতায় এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণ-পদ-রেণু-আশে কহিল চন্দন দাসে
ভজ ভাই "অভয়চরণ।"

চন্দন দাসের মহাভারত।

কবির বংশ-পরিচয় এইরূপ।—

"কহিল চন্দন দাস করিয়া পয়ার।
শুনিতে পরম ভক্তর জন্ম নাই আর॥
সভার চরণে আমি নিবেদন করি।
অল্পজ্ঞান হঞা জাতি কি বলে তেজ করি॥
মূর্খমত্ত হই আমি জ্ঞান কিছু নাই।
ভাল-মন্দ বিচার মাত্র জানেন গোসাঞি॥
আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি।
পিতামহ নারাণ দত্ত কহিয়ে গোচরি॥
পিতা পুরুষোত্তম দত্ত করি নিবেদন।
আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সর্ব্বজন॥

দত্ত পদ্ধতি মোদের কেহো নাই জানে।
মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সর্ব্বজনে ॥
এই নিবেদন আমি করি সভার ঠাঁই।
ভালমন্দ দোষ মোর ক্ষমিবে সভাই ॥
শ্রীশিবরাম নন্দী পুথি লিখন করিল।
পুথির রচনাকালে সঙ্গতি আছিল ॥

—চন্দন দাস মণ্ডলের মহাভারত।

উল্লিখিত আত্মবিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় কবি খুব বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিজেকে "মূর্খমস্ত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুথির লেখকের নাম শ্রীশিবরাম নন্দী এবং হস্তলিপির তারিখ ১৫৪৩ শক বা ১৬৩১ খৃষ্টাব্দ। কবি চন্দন দাস সম্ভবতঃ খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। কবি চন্দন দাস প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধে প্রমীলার অর্জ্জুনের প্রতি অনুরাগ যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কবির রসজ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

"পার্থেরে দেখিয়া রাণী হাসিছেন নিতম্বিনী
এই স্বামী শিব দিল মোরে।
এত মনে ভাবে রাণী বন্দিল চরণখানি
তবে রণ করে দুই বীরে ॥
বাণে বাণ হানাহানি করিছে প্রমীলা রাণী
পার্থ-বাণ করয়ে সংহার।
নিবারিয়া পার্থ-বাণ বলে নারী হান হান
নাচে রাণী রথের উপর ॥"

—চন্দন দাসের মহাভারত।

(১২) কাশীরাম দাস

মহাভারতের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। কাশীরাম দাস সম্ভবতঃ খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যস্থ সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কবির পিতার নাম কমলাকান্ত দেব, পিতামহের নাম সুধাকর দেব ও প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর দেব। কমলাকান্তের কৃষ্ণদাস ("শ্রীকৃষ্ণবিলাস" নামক ভাগবত প্রণেতা), কাশীরাম দাস ও গদাধর ("জগন্নাথ-মঙ্গল" বা "জগৎমঙ্গল" গ্রন্থের রচক) নামক তিন পুত্রের

মধ্যে কাশীরাম দাস মধ্যম পুত্র ছিলেন। কাশীরাম "দেব" স্থলে "দাস" কৌলিক উপাধিরূপে ব্যবহার করিতেন দেখা যায়। সেই যুগে "দাস" উপাধি বৈষ্ণব প্রভাবে বিশেষ মর্য্যাদা পাইয়াছিল মনে হয়। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে অনেক কবিই নামের শেষে "দাস" কথাটি ব্যবহার করিতেন। সম্ভবতঃ কবির পরিবার বৈষ্ণব ছিল। কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের পুত্র নন্দরাম দাস মহাভারতের কিয়দংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ অনুবাদক। সিঙ্গিগ্রামে "কেশেপুকুর" নামে একটি পুষ্করিণী এবং "কাশীর ভিটা" নামে কোন স্থান জনপ্রবাদ অনুসারে এখনও কাশীরামের স্মৃতি বহন করিতেছে। কাশী দাসের সময় নির্দ্দেশে নিম্নলিখিত তিনটি প্রমাণ সাহায্য করিতেছে। যথা,—

(১) রাইপুর রাজবাড়ীতে কাশীরাম দাসের একখানি সম্পূর্ণ মহাভারত রহিয়াছে। উহা গদাধরের[১] হস্তলিখিত। ইহার তারিখ ১০৩৯ সাল বা ১৬৩১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইহার কিছু পূর্ব্বে কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

(২) রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একখানি দানপত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা কাশীরাম দাসের পুত্র কর্ত্তৃক স্বীয় পুরোহিতগণকে বাস্তুভিটা দান উপলক্ষে লিখিত এবং ইহার তারিখ ১০৮৪ সাল বা ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ।

(৩) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কাশীরাম দাসের বিরাটপর্ব্বের একখানি প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। সেই পুথিতে এই দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে—

"চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশী দাস কয়॥"

প্রবন্ধ (রাঃ ত্রিবেদী), ১৩০৭ সাল,
১ম সংখ্যা সাঃ পঃ পত্রিকা।

ইহাতে বিরাটপর্ব্ব সমাধা হওয়ার যে তারিখের ইঙ্গিত আছে তাহা ১৫২৬ শক (১০১১ বাং) বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ।

এই তিনটি প্রমাণের অন্ততঃ একটিও বিশ্বাস করিলে কবি কাশীরাম দাসের কাল খৃঃ ১৬—১৭শ শতাব্দী এবং জন্ম সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ সাব্যস্ত করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহাই ঠিক। কবি কাশীরাম দাস মেদিনীপুর

---

(১) গদাধর দাস তাঁহার "জগন্নাথ-মঙ্গল" কাব্যে স্বীয় বংশ-পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—"দ্বিতীয় শ্রীকাশী দাস ভক্ত ভগবানে। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে।"—গদাধর দাসের "জগন্নাথ-মঙ্গল"। এই সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায় দ্রষ্টব্য। একাধিক কবি "জগন্নাথ-মঙ্গল" নাম দিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

জেলার অন্তর্গত আওসগড়ের রাজার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। কবি তথাকার পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন এবং এইস্থানে বাসকালেই তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন।

কাশী দাস বা কাশীরাম দাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত সম্পূর্ণ মহাভারতখানা প্রকৃতপক্ষে সবটাই কাশীরাম দাসের রচনা নহে। একটি চলিত কথা আছে,—

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা লিখি কাশী দাস গেলা স্বর্গপুর॥"

কাশীরাম দাস বিরাটপর্ব্বের কিছু অংশ রচনা করিয়া কাশীরূপ স্বর্গপুরে যাত্রা অথবা লোকান্তরেই গমন করুন, অন্ততঃপক্ষে তিনি যে মহাভারতের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি রচনা করেন নাই তাহা অপর কবিগণের রচনা তাঁহার মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়াতেই বুঝিতে পারা যায়। কত কবির রচনা যে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অঙ্গে লীন হইয়া আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রাচীনকালের পুথি লেখার রীতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত স্বল্পযশা কবিগণের নাম প্রায়ই চাপা পড়িয়া যায়। এইরূপ অল্পখ্যাতিসম্পন্ন এক কবির নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম দাস। কাশীরাম দাসের মহাভারতের একখানি পুথির "শল্য" এবং "নারী"পর্ব্বে এই কবির ভণিতা রহিয়াছে। এই দেশে পূর্ব্ব হইতেই কবি ও কথকগণ প্রচারিত নলরাজার উপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার উপাখ্যান, প্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতিও কাশী দাসের মহাভারতের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রথিতযশা কবিগণের মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের আদি-পর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণ-পর্ব্ব, গঙ্গাদাস সেনের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্বগুলির রচনার অনেকস্থল প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় কাশীরাম দাসের মহাভারতের গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে। নন্দরাম দাসের দ্রোণ-পর্ব্ব এবং কাশীরাম দাসের দ্রোণ-পর্ব্ব একই রচনা, কোন প্রভেদ নাই। কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস যে দ্রোণ-পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী, দ্বিজ রঘুনাথ এবং নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারতের রচনাগুলি হইতেও বহুস্থত্র কাশীরাম স্বীয় মহাভারতে গ্রহণ করিয়াছেন। কাশী দাসের মহাভারতে প্রাচীন কবিগণের কিছু অমার্জ্জিত অথচ সরল রচনা এবং পরবর্ত্তী কবিগণের রচনার অলঙ্কারবাহুল্য ও সরসতা এই উভয় প্রকার রচনার গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হইয়াছে।

কাশী দাস প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের কবি। পূর্ব্ববঙ্গে কাশী দাসের পুথি দুষ্প্রাপ্য। তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত কলিকাতা বটতলার ছাপাখানার সাহায্য পাইয়া এখন বাঙ্গালার উভয় অঞ্চলেই সমভাবে

প্রচারিত হইয়াছে। কাশী দাসের নিজের রচনায় প্রতিভার বিকাশ তত নাই সুতরাং নূতন চরিত্র-সৃষ্টি বা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীরও প্রয়াস নাই। ইহাতে শুধু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অমার্জ্জিত রচনাকে কিছু মার্জ্জিত করিবার প্রয়াস আছে মাত্র। কাশী দাসের রচনা[১] দেখিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের ন্যায় কাশীরাম দাসও যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন উহা সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃত ও দেশজ ভাব ও ভাষা প্রকাশের সন্ধিযুগ। কাশী দাসের মহাভারতেও সংস্কৃত পন্থা অনুসরণকারী অনুপ্রাসপ্রিয় কবিগণের চিহ্নপাত কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে। যথা, "মুখরুচি, কত শুচি", "অগ্নি অংশু যেন পাংশু" ইত্যাদি। পরবর্ত্তীকালে খৃ: ১৮শ শতাব্দীতে এই অনুপ্রাসপ্রিয়তা ও সংস্কৃত অলঙ্কারবাহুল্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কাশীরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার সহিত কাশীরামের রচনার সাদৃশ্য এইরূপ :—

(ক) যযাতির পতন

"অষ্টক বোলেন্ত তুমি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন॥
অগ্নিপ্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিত সাক্ষাৎ।
কোন পাপে অধর্ম্মে হইল স্বর্গপাত॥" ইত্যাদি

সঞ্জয়-মহাভারত, আদি-পর্ব্ব।

"অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন।
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥" ইত্যাদি।

—কাশী দাসের মহাভারত, আদি-পর্ব্ব।

(খ) কৃষ্ণের ভীষ্মের প্রতি ক্রোধ

"রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মকে মারিতে যায় দেব জগন্নাথে॥

১। এই উপলক্ষে ম: ম: ডা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারত (আদি-পর্ব্ব), ডা: দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারত ও পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয়ের সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পৃথিবী বিদার হএ চরণের ভারে।
ক্রোধ দৃষ্টি এ যেন জগৎ সংহারে॥
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল।
ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন যাএ মৃগপতি॥" ইত্যাদি।

—কবীন্দ্রের মহাভারত, ভীষ্ম-পর্ব্ব।

"অস্থির হইলা হরি কমল লোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥" ইত্যাদি।

- কাশী দাসের মহাভারত, ভীষ্ম-পর্ব্ব।

(গ) যুবনাশ্বরাজাকে বৃষকেতুর পরিচয় জ্ঞাপন

"আকর্ণ পুরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল॥
অতি শিশু দেখি তুহ্মি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার॥" ইত্যাদি।

—শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

"বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন॥" ইত্যাদি।

—কাশী দাসের মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

(ঘ) গান্ধারী বিলাপ

"কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥

পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধরী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥" ইত্যাদি।

—নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, স্ত্রী-পর্ব্ব।

"কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥" ইত্যাদি।

—কাশী দাসের মহাভারত, স্ত্রীপর্ব্ব।

এই সব সাদৃশ্য কাশী দাসের মহাভারতে অন্য কবিগণের রচনার অভাব প্রমাণিত করে না বরং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কাশী দাস পূর্ব্ববর্ত্তীগণের রচনা একটু সংস্কার করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। যাহা হউক কাশী দাসের কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমরা সর্ব্বদা খণ্ডাকারে মহাভারতের বঙ্গানুবাদগুলি পাইয়া থাকি। সেরূপ স্থলে কাশীরামের মহাভারতে নানা স্থান হইতে রচনা বা ভাব সংগৃহীত হইলেও ইহার সমগ্রতা আমাদিগের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। কাশীরাম অন্য কবিগণের কাছে স্বয়ং ঋণী। ইহা ছাড়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস ও অপর কবিগণ ইহাতে নানা বিষয় সংযোজন ও সংশোধন করিয়া গ্রন্থখানির একপক্ষে সম্পূর্ণতা আনিয়া মর্য্যাদা বৃদ্ধিই করিয়াছেন। তদুপরি সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ কাশীরামের কবিত্বগুণও অল্প ছিল না। এই কবির বর্ণনা সরল ও স্বাভাবিক এবং চরিত্রগুলি ওজোগুণবিশিষ্ট। দুইএক স্থান হইতে নিম্নে কাশীরাম দাসের রচনা উদ্ধৃত করা গেল।

সমুদ্রমন্থন উপলক্ষে পার্ব্বতীর তিরস্কারে শিবের ক্রোধ।

(ক) "পার্ব্বতীর কটুভাষ শুনি ক্রোধে দিগ্বাস
টানিয়া আনিল বাঘবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বান্ধিল বেড়ি
তুলিয়া লইল যুগপাশ॥

কপালে কলঙ্কি-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কঙ্ককি কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজূটে।
রজত-পর্ব্বত আভা কোটি-চন্দ্রমুখ শোভা
ফণিমণি বিরাজে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ
ত্রিশূল ভ্রুকুটি লইয়া করে।
পদভরে ক্ষিতি নড়ে চিত্কার ছাড়িয়া চলে
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে॥
ডম্বরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
অমর ঈশ্বর ভীত আর সভে সচিন্তিত
এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে॥"

—কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীবেশ ও হরি-হর মিলন।

(খ) "আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ শশিশুক্ল শ্যাম হইলা অর্দ্ধেক॥
অর্দ্ধ জটাজূট ভেল অর্দ্ধ চিকুর।
অর্দ্ধ কিরীট অর্দ্ধ ফণী-দণ্ডধর॥
কৌস্তুভ তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধগলে হাড়মালা অর্দ্ধ বনমালা॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি-কুণ্ডল।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল॥
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ-কটি পীতাম্বর॥
একপদে ফণী এক কনক-নূপুর।
শঙ্খচক্র করে শোভে ত্রিশূল ডম্বুর॥

একভিতে লক্ষ্মী একভিতে দুর্গা সাজে।
কাশী দাস কহে দুহার চরণ সরোজে॥"

—কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদি পর্ব্ব।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের শেষপর্ব্বগুলির অধিকাংশই নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার চিহ্ন বহন করিতেছে। মহাভারত ভিন্ন কাশী দাস আর তিনখানি ক্ষুদ্রাকার কাব্য রচনা করেন। তাহাদের নাম—(ক) স্বপ্নপর্ব্ব, (খ) জলপর্ব্ব ও (গ) নলোপাখ্যান।

কাশীরাম দাস মহাভারতের শুধু রচনাকারী না হইয়া বোধ হয় মহাভারতের গায়কও ছিলেন। তাঁহার একটি ভণিতা যথা,—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" এই দুই ছত্রে ধারণা হয় যে বোধ হয় গায়ক হিসাবে কবি "কাশীরাম কহে" এবং "শুনে পুণ্যবান" কথা দুইটির ব্যবহার করিয়াছেন।

(১৩) নন্দরাম দাস

নন্দরাম দাস মহাভারতের প্রসিদ্ধ কবি কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। কবি নন্দরামের পিতার নাম গদাধর দাস। গদাধর কাশীরামের কনিষ্ঠভ্রাতা এবং "জগন্নাথমঙ্গল" নামক গ্রন্থ প্রণেতা। কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব নন্দরাম দাস রচিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫০০শত। কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পূর্ণ করিতে গদাধর দাস ও নন্দরাম দাস উভয়েই সাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ[১] ("অশ্বমেধ পর্ব্বের" অনুবাদক) প্রভৃতি কবিগণের রচনাও কাশী দাসের মহাভারতের শেষাংশে স্থানলাভ করিয়াছে। কবি নন্দরাম দাসের "দ্রোণ পর্ব্ব" রচনাকাল ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ। এই কবির রচনা সরল, সরস ও কবিত্বপূর্ণ। বীররস অপেক্ষা ভক্তির প্রেরণা রচনায় অধিক। কবি "দ্রোণ পর্ব্ব" রচনায় ব্যাসকে অনুসরণ করিয়াছেন।

দ্রোণ-বধে দুর্য্যোধনের শোক।

"কাটিল দ্রোণের শির ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর
নিজ রথে আইলা ততক্ষণ।
দ্রোণের নিধন দেখি দুর্য্যোধন মহাদুঃখী
হাহাকার করেন রোদন॥

(১) দ্বিজ রঘুনাথ সম্বন্ধে (উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সমসাময়িক) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, ১৩০৫ সন) রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। দ্বিজ রঘুনাথ "অশ্বমেধ পর্ব্ব" রচনা করিয়াছিলেন।

মহানাদে শব্দ করি কান্দে কুরু-অধিকারী
পড়ি গেল ধরণী উপর।
মহাশোকে রাজা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
আকুল হইলা নৃপবর॥
ব্যাস বিরচিত কথা ভারত অপূর্ব্ব-কথা
ইহা বিনে সুখ নাহি আর।
রক্ত-কোকনদ-পদ ভক্তগণ-অনুগত
অকিঞ্চন জনের আধার॥
নানা রূপে অবতরি দৈত্যগণ ক্ষয় করি
পাতকীর পরিত্রাণ হেতু।
এ ঘোর সংসার-মাঝে উদ্ধারিব দেবরাজে
নিজ নামে বান্ধি দিল সেতু॥
অভয় চরণ তোমার ভকতি রহুক মোর
এই মাত্র মোর নিবেদন।
সংসার-সাগর-ঘোরে পরিত্রাণ কর মোরে
নন্দরাম দাস বিরচন॥"

—নন্দরাম দাসের দ্রোণ-পর্ব্ব।

(১৪) অনন্ত মিশ্র

কবি অনন্ত মিশ্র সম্ভবতঃ খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। কবির যে পুথি পাওয়া গিয়াছে উহা লেখার তারিখ ১৬২১ শক অথবা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং রচনা-রীতিও খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর। কবির পিতার নাম কৃষ্ণরাম মিশ্র। একজন কবি অনন্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই দুই কবি প্রকৃতপক্ষে এক কবি হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা সত্য হইলে এই কবির সময় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ হওয়াই সঙ্গত। অসমীয়াগণ ইহাতে কি বলিবেন জানি না। ভক্ত কবি অনন্ত মিশ্রের মহাভারতের আদর্শ জৈমিনি-ভারত। মহাভারতের কবি অনন্ত মিশ্রের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা ইনি অনন্ত-রামায়ণেরও রচনাকার। ইহা ঠিক হইলে কবি সম্বন্ধে অপর কিছু বিবরণ রামায়ণ অধ্যায়েই জানা যাইবে। কবির রচনা সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং ভক্তিভাবের দ্যোতক।

শ্রীকৃষ্ণের রাজা ময়ূরধ্বজকে পরীক্ষা।

"স্নান করি তাম্রধ্বজ রাণী কুমুদ্বতী।
নহিল কাতর দুহে রাজ-অনুমতি॥
স্নান করি বসিলা রাজা মহাহৃষ্ট মন।
ধ্যান করি চিত্তে কৃষ্ণরূপে নিরঞ্জন॥
পরম কারুণ্য জৌউ শরীর-মণ্ডলে।
নিরন্তর বিষ্ণু থাকেন সহস্রেক দলে॥
স্থিরচিত্তে মগ্ন তাহে হইয়া নরপতি।
চিরিতে শরীর শীঘ্র দিলা অনুমতি॥
চিরিতে লাগিলা দুহে করাতের ঘাতে।
ভ্রমিতে ভ্রূমধ্যে শির চিরিয়া ত্বরিতে॥
নাসার উপরে মাত্র আসিতে করাত।
বাম চক্ষে নৃপতির হয় অশ্রুপাত॥
অশ্রুপাত দেখি বিপ্র বলেন বচন।
আর কার্য্য নাহি দেহ চির কি কারণ॥
পূর্ব্বে ব্যাঘ্র বলিল আমার গোচরে।
দেহ-দানকালে রাজা হয়ত কাতরে॥
তবেত দক্ষিণ অঙ্গে নাহি মোর কায।
শরীর-দানকালে ক্রন্দন মহারাজ॥
শুনিয়া হাসিল রাজা বিপ্রের বচন।
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন॥
চিরকাল এই দেহ রাখিল চেতনে।
সর্ব্বদেহ সমর্পিব কৃষ্ণের চরণে॥
দ্বিজকার্য্যে সব্যভাগ কৃষ্ণার্পণ হয়।
বামভাগ ব্যর্থ হয় ব্রাহ্মণে না লয়॥
তেই বামচক্ষুর জল পড়েত আমার।
হরিষ দক্ষিণ অঙ্গ পুণ্য করিবার॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হইলা অস্থির।
চতুর্ভুজ রূপ হৈয়া ধরিলা তার শির॥

* * * *

রাজার শিরেতে কৃষ্ণ দিলা পদ্ম-হাত।
ঘুচিল দারুণ রেখ করাতের ঘাত॥

*　　*　　*　　*

জয়মিনি-ভারত কৃষ্ণ ভক্তির নিদানে।
মিশ্র অনন্ত ভণে কৃষ্ণ আরাধনে॥"

—অনন্ত মিশ্রের মহাভারত।

(১৫) শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ[১] বা দ্বিজ শ্রীনাথ সংস্কৃত মহাভারতের "আদি পর্ব্বের" সম্পূর্ণ ও "দ্রোণ পর্ব্বের" আংশিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবির কৌলিক উপাধি "চক্রবর্ত্তী" ছিল এবং মধ্যে মধ্যে ভণিতায় উহা ব্যবহার করিয়াছেন। "দ্রোণ পর্ব্বের" প্রথম দিকে নিজ বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন।—

"মল্লমহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর।
শুক্লধ্বজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর॥
তাহার পাঠক মহামাত্য ভবানন্দ।
কামরূপ দ্বিজকুল কুমুদিনী চন্দ্র॥
নামত পণ্ডিতরাজ তাহার তনয়।
রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয়॥
তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর সুক্ষ্মমতি।
শ্রীনাথ হৈলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি॥"

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের দ্রোণ-পর্ব্ব।

এই পরিচয় অনুসারে কবির পিতার নাম রামেশ্বর এবং পিতামহের নাম ভবানন্দ ছিল। কবি শ্রীনাথ কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। এই রাজার রাজত্বকাল (১৬৩২-১৬৬৫ খৃঃ), সুতরাং কবি শ্রীনাথের কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কবি "দ্রোণ পর্ব্বের" পুথিতে মহারাজ প্রাণনারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"জয় জয় মহারাজ প্রাণনারায়ণ।
জঙ্গম জগদীশ ডাক বলে সর্ব্বজন॥

---

(১) কবি শ্রীনাথ ও দ্বিজ কবিরাজ সম্বন্ধে "কোচবিহার দর্পণ", ৮ম বর্ষ, ৯ম ও ১১শ সংখ্যা, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যা, সন ১৩৪২ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ দুইটির নাম "মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভা-কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ" ও "মহারাজ মোদনারায়ণের সভাকবি দ্বিজ কবিরাজ"—লেখক অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন।

দানে বলি কর্ণরূপে মেদিনীমদন।
বলে বৈরিবারণ দারুণ পঞ্চানন॥
কবিতা গুণত অভিনব কালিদাস।
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য বিপুল সাহস॥
জার ভুজ প্রতাপে উচ্ছন্ন বৈরীপুর।
ঘরের চালত গজাইল তৃণাঙ্কুর॥
পুণ্যকীর্ত্তি ব্যাপিল জগত সমুদায়।
শঙ্খ-মুক্তা-মৃণাল-কুমুদ-কুন্দ প্রায়॥
জার তুলাপুরুষ দানত পায়া ধন।
দরিদ্রের স্ত্রীর হৈল সোণার কঙ্কণ॥"

— শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের দ্রোণ-পর্ব্ব।

কবি শ্রীনাথের আর বেশী পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কবি রচিত "আদি পর্ব্ব" কোচবিহার সাহিত্যসভার গ্রন্থাগারে আছে। কবির "দ্রোণ পর্ব্বের" পুথিখানা কোচবিহার রাজের গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। কবি শ্রীনাথ "দ্রোণ পর্ব্বের" সব অংশ রচনা করেন নাই। পুথিখানির পত্র সংখ্যা ২০৮ (৪১৬ পৃষ্ঠা)। তন্মধ্যে কবি শ্রীনাথ ১১৮ পত্র পর্যান্ত অর্থাৎ অর্দ্ধেকের সামান্য বেশী রচনা করিয়াছেন। অবশিষ্ট অংশ যে কবি রচনা করিয়া পুথিখানিকে সম্পূর্ণ করেন তাঁহার নাম দ্বিজ কবিরাজ। এই দ্বিজ কবিরাজ রাজা প্রাণনারায়ণের মধ্যম পুত্র এবং পরবর্তী রাজা মোদনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। রাজা মোদনারায়ণের রাজত্বকাল ১৬৬৫-১৬৮০ খৃষ্টাব্দ। রচনা দেখিয়া বোধ হয় এই উভয় কবিই সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত (ব্যাসের) মহাভারতের ভাবানুবাদ করিলেও উভয় কবি স্থানে স্থানে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। কবি শ্রীনাথ দ্বিজ কবিরাজ হইতে শ্রেষ্ঠতর কবি ছিলেন। দ্বিজ কবিরাজ মহারাজ মোদনারায়ণের আজ্ঞায় কবি শ্রীনাথের "দ্রোণ পর্ব্ব" সম্পূর্ণ করেন। কবি শ্রীনাথের রচনায় ভাবমাধুর্য্য এবং শব্দাড়ম্বরের বাহুল্য দেখা যায়। উভয় কবির রচনাই ভক্তিমূলক। প্রাদেশিক শব্দের এবং অমার্জ্জিত রচনার বাহুল্যে "আদি পর্ব্ব" ও "দ্রোণ পর্ব্ব" খুব সরস ও প্রাঞ্জল হইতে পারে নাই।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রশংসা উপলক্ষে শ্রীনাথ ভণিতায় জানাইতেছেন,—

প্রাণদেব নৃপবরে ভূমিপদে পুরন্দরে
বিদ্বান পুরুষ কেশরি।
তার আজ্ঞা পরমাণে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে ভণে
সভাসদ বোল হরি হরি॥

কবি শ্রীনাথের মহাভারতের রচনার নমুনা এইরূপ,—

"পাণ্ডব সবাক সবে পুছে নানা কথা।
কথা হন্তে আইলা তোরা সব জাও কথা॥
ব্রাহ্মণ বর্গক যুধিষ্ঠির নিগদতি।
একচক্রাপুর হতে আসিস্তি সম্প্রতি॥"

—দ্রোণ-পর্ব্ব, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ।

কবি শ্রীনাথ তিনখানা পুথি লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "বিশ্বসিংহ চরিতম" নামক কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজবংশের বিবরণ সংস্কৃতে রচিত। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের "আদিপর্ব্ব" ও "দ্রোণ-পর্ব্ব" (আংশিক) রচনা করিয়াছিলেন। এই কবি রচিত "দ্রৌপদীর সয়ম্বর" নামক পুথির সংবাদ কোচবিহারের ইতিহাস প্রণেতা খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা সাহেব তদীয় গ্রন্থে দিয়াছেন। "দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর" প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। উহা "আদি পর্ব্বের" অন্তর্গত। স্বয়ম্বর-সভায় দ্রৌপদীর বর্ণনা এইরূপ,—

রাজপুত্র দ্রৌপদির এই যোগ্য বর।
দেখ ব্রাহ্মণের কেমন শরীর সুন্দর॥

* * *

সিংহবক্ষু বিশাল ইহার বৈরস্থল।
প্রফুল্ল কমলদল লোচন যুগল॥
সুঠাম কঠিন বাহু আজানুলম্বিত।
রম্য উরুযুগল কামিনীর মনস্থিত॥
শ্যামল সুন্দর তনু যেন নবঘন।
কুলবধূ রমণী উন্মাদ কারণ॥

—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দ্বিজ শ্রীনাথ।

উল্লিখিত কোচবিহারের ইতিহাসের মতে মহারাজ প্রাণনারায়ণের আদেশে কবি শ্রীনাথের পিতা রামেশ্বরও মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তবে এই সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু জানা নাই। কৃষ্ণমিশ্র

নামে বোধ হয় এই রামেশ্বরের অপর পুত্র "প্রহ্লাদ-চরিত" রচনা করেন। সম্ভবত: এই পরিবারে "মিশ্র" উপাধিও চলিত ছিল।

ডা: দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়", প্রথম খণ্ডে শ্রীনাথ[1] ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ইনি সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ সেন মহাশয়ের "কোচবিহার দর্পণে" লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষত: ডা: দীনেশচন্দ্র সেন উদ্ধৃত "মুষল পর্ব্ব" যদি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনাই হয় তবে এই রচনার সহিত কোচবিহারে রক্ষিত গ্রন্থ হইতে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ সেন উদ্ধৃত শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনার কোনই মিল নাই। ডা: দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত "মুষল পর্ব্ব" হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে দেওয়া গেল। যথা,—

মুষল পর্ব্ব

"হস্তিনা পুরীর রাজা হৈল ধর্ম্মরায়।
পুত্রের অধিক করি পালয়ে প্রজায়॥
নানা যজ্ঞ নানা দান কৈল নৃপতি।
নৃত্যগীত নানা রঙ্গ কৌতুক করে নিতি।
বীণা বাঁশী বাজায় বাজায় শঙ্খনাদ।
পটহ মৃদঙ্গ বাজায় নাহি অবসাদ॥
নটীগণ নাট করে গায়নে গীত গায়।
শুনিলে মধুর ধ্বনি কোকিলে পলায়॥"

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৭০৫, ১ম খণ্ড, দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত (সংগ্রাহক ডা: দীনেশচন্দ্র সেন)।

দ্বিজ কবিরাজের রচনা নিম্নরূপ :—

"জয় মোদনারায়ণ নৃপতি প্রখ্যাত।
কলিধর্ম্ম মাত্রে কিঞ্চিতেক নাহি জাত॥
পরদারা পরনিন্দা পরসম্পত্তিক।
স্বপ্ন অবস্থাতো মানে বিষ্ঠাতো অধিক॥

(১) কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময়ে (১৭১৪—১৭৬৩ খৃঃ) কামতানগরবাসী আর ও একজন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। "কোচবিহারে সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞানচর্চা" (অমূল্যরতন গুপ্ত রচিত) দ্রষ্টব্য, আষাঢ় ১৩৫৩।

কবিরাজ দ্বিজ ভণে তাঁহার আজ্ঞায়।
দ্রোণপর্ব্ব পদরম্য বাণীর কৃপায়॥"
—দ্রোণপর্ব্ব, রাজা মোদনারায়ণের প্রশস্তি, দ্বিজ কবিরাজ

(১৬) বাসুদেব আচার্য্য

কবি বাসুদেব আচার্য্যের সমগ্র মহাভারত পাওয়া গিয়াছে কি না জানা নাই। হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় রঙ্গপুর হইতে পুথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পুথিখানি অন্ততঃ ১৫০শত বৎসরের প্রাচীন। কবি বাসুদেব নিজ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন।—

"শিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তুতি।
ভবানীর সেবা করি কৈল রসবতী॥
মৈথিল ব্রাহ্মণ তাকে জানিবা নিশ্চয়।
শ্রীরামঠাকুর হেন লোকত বোলয়॥
তার উপাসক এক জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ।
বাসুদেব নাম তার কহে সর্ব্বজন॥"

কবি বাসুদেবের আরও কিছু পরিচয় "স্বর্গারোহণ পর্ব্বে" পাওয়া যায়। যথা,

"রামঠাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ।
স্বর্গ-আরোহণ পদ করিল সৃজন॥
নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস।
বাসুদেব নৃপতির রাজ্যত বাস॥
তার সম মূঢ়মতি নাহি একজন॥
গোষ্ঠি কুটুম্বক ছাড়ি করিলু ভ্রমণ॥
সাধুর চরণে পড়ি করহো কাকুতি।
মরণে জীবনে হোক কৃষ্ণ ভকতি॥"
—স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, বাসুদেব আচার্য্য।

রামোপাসক ব্রাহ্মণ বাসুদেবের সংসার ত্যাগ, সাধুসঙ্গলাভ ও কৃষ্ণভক্তির পরিচয় এই অল্প কয়েক ছত্রে পাওয়া যায়। কবি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল শিবদেব ঠাকুর। কবি আচার্য্য ব্রাহ্মণ বা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবির সময় আনুমানিক খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। কবির রচনা হইতে কতিপয় ছত্র এইস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

"সন্ন্যাসীর বেশ ধরি যায় পঞ্চভাই।
তার পাছত যায় পাটেশ্বরী আই॥
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ ভাই যায় বন।
নগরীয়া লোকে দেখি করন্ত ক্রন্দন॥
ভৃত্য বন্ধুগণ কান্দে অনেক নৃপতি।
আমাক ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন ভিতি॥
নটে ভাটে ব্রাহ্মণে কাঁদন্ত উচ্চ করি।
কি কারণে রাজ্যভার যাও পরিহরি॥
নারী সব কান্দে পাণ্ডবের মুখ চাই।
হস্তি ঘোড়া পদাতিক কাঁদন্ত ঠাই ঠাই॥
অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোয়াল।
তীর্থ বনে কান্দে বেড়ি সন্ন্যাসী সকল॥
নদী তীর্থক্ষেত্র গ্রাম গৃহ বাহিরত।
গলা বান্দি কান্দে নর নারী শতে শত॥"

—যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, বাসুদেব আচার্য্য।

কবি বাসুদেবের রচনা করুণ ও ভক্তিভাবমিশ্রিত। কবিত্বপূর্ণ সরল বর্ণনাও বাসুদেবের রচনাকে মধুর করিয়াছে।

(১৭) বিশারদ

মহাভারতের বিশারদ নামে এই কবি কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। কবির পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশারদ নাম না উপাধি? সম্ভবতঃ ইহা উপাধি মাত্র। রঙ্গপুর জেলা হইতে হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় পুথিখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। পুথিখানি কবির স্বহস্তলিখিত হইতে পারে। কবি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের কবি, কারণ ইহার তারিখ ১৫৩৪ শক বা ১৬১২ খৃষ্টাব্দ। কবি সংস্কৃত মূল অনুযায়ী অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই এই কবির বিশেষত্ব। কবি "বিরাট পর্ব্ব" অনুবাদ করিলেও সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন কি না জানা নাই। কবি বিশারদ তাঁহার পুথি রচনার তারিখ নিম্নরূপ দিয়াছেন।

"বিরাট-পর্ব্বের পুণ্য-কথা অবধান।
ইচ্ছা অনুসারে কহি কর অবধান॥

বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে।
চৈত্র শুক্লদিনে পদ বিশারদ ভণে ॥"

—বিশারদের বিরাট পর্ব্ব।

রচনার নমুনা :—

উত্তর গোগৃহে কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বিরাটরাজার পুত্র উত্তরের প্রতি বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন।

"উত্তর বদতি শুনিয়ক মহাশএ।
মুঞি তহ সারথি হইল নিশ্চয় ॥
যাক্ যুঝিবার তুমি কর মনোরথ।
তাহার উপরে আমি চালাইবো রথ ॥

* * *

অর্জ্জুন বদতি প্রীত হইলো তোমার।
এখনে দেখিবা তুমি প্রতাপ আমার ॥
ভৈরব বিমঙ্গ (বিমর্দ্দ ?) আমি করিবো সমরে।
শক্র-সৈন্য-সমুদ্র মথিব দিবা শরে ॥
সম্প্রতিক বিলম্ব করিবার নাঞি ফল।
রথে তুলি দিল যত আয়ুধ সকল ॥
আর কথা কহি শুন রাজার কুমার।
দেব-শাপে নপুংসক অজ্ঞাত বৎসর ॥
নপুংসক হয়া মোর তেজ হইছে হীন।
বৃহন্নলা-বেশে আছিলো এতদিন ॥
অজ্ঞাত বৎসর ঘুচি হইলাঙ প্রবীণ।
অজ্ঞাত বৎসর যায়া বেশী ছয় দিন ॥
অজ্ঞাত বৎসর আমার নানা ক্লেশ গেল।
পূর্ব্বের অর্জ্জুনের বল ধর্ম্মে আনি দিল ॥
দুর্য্যোধনে দিল আমাক দুখ যে মতে।
কিছু ধায় (ধার) আজি স্তজিব (শুধিব) সংগ্রামেতে ॥"

—বিশারদের বিরাট পর্ব্ব।

কবির ভাষা প্রাচীন ও প্রাদেশিকতার চিহ্নযুক্ত হওয়াতে তত সুখপাঠ্য নহে। তবুও বলা যায় কবির নিপুণ তুলিকাপাতে চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হইয়াছে।

(১৮) সারল বা (শারণ)

মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক সারল কবির পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। কেহ কেহ কবিকে "শারণ" নাম দিবার পক্ষপাতী। সম্ভবতঃ শারণ লিখিতে "সারন" লিখিয়া লেখক এই মতান্তর সৃষ্টির কারণ হইয়াছেন। রামায়ণের উপাখ্যানে রাবণের মন্ত্রী শুক ও শারণের কথা আছে। সুতরাং শারণ নাম কাহারও থাকা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন হস্তলিপিতে "ল" ও "ন" প্রায়শঃ একইভাবে লিখিত দেখা যায়। যাহা হউক আমরা "সারল" নামটিও অগ্রাহ্য করিলাম না। প্রাচীন মহাভারতের পুথিগুলি একদিকে যেমন খণ্ডিত, অপরদিকে কবিগণ তেমন সমগ্র মহাভারতের বিরাটকায় দর্শনে ইহার অংশবিশেষ অনুবাদেই যেন অধিক আগ্রহবান ছিলেন। মহাভারতের পর্ব্বগুলির মধ্যে "বিরাট পর্ব্ব" ও "অশ্বমেধ পর্ব্ব" দুইটি তাঁহাদিগকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং এই হেতু এই দুই পর্ব্বের অনুবাদই অধিক পাওয়া যাইতেছে। সারল কবির রচিত "বিরাট পর্ব্বের" যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা দুইশত বৎসরের প্রাচীন। রচনাদৃষ্টে এই কবির কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সারল কবি রচিত বিরাটপর্ব্বের কয়েকছত্র নিম্নে দেওয়া গেল

দ্রৌপদীর প্রতি বিরাট রাজমহিষী সুদেষ্ণা।
"শুনিয়া সুদেষ্ণা বলে শুন রূপবতী।
আমি স্থির হৈতে নারি হয়্যা স্ত্রী-জাতি॥
তোমার সমান রূপ কথাহ না দেখি।
আপন কণ্টক কি করিব তোমা রাখি॥
মোর প্রাণনাথ যদি দেখএ তোমায়।
তোমা দেখি অনাদর করিব আমায়॥
তেকারণে তোমা আমি নারিব রাখিতে
শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী বলে মধুর বাক্যেতে॥
আপন প্রকৃতি আমি তোমারে যে কই।
নিশ্চয় জানিহ আমি সে রীতের নই।" ইত্যাদি।

—সারল কবির বিরাট পর্ব্ব।

সারল কবি উৎকলে বাস করিতেন। তাঁহার রচনা মধুর ও অনেক পরিমাণে আধুনিক গুণসম্পন্ন।

(১৯) দ্বিজ কৃষ্ণরাম

কৃষ্ণরাম নামে একাধিক বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সাহিত্যের কবি ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন কৃষ্ণরাম কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। মহাভারতের প্রসিদ্ধ কায়স্থ কবি কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামও ছিল কৃষ্ণদাস অথবা কৃষ্ণরাম দাস। ইনি পরম ভক্ত ছিলেন এবং বিখ্যাত ভাগবতের অনুবাদক। তাঁহার গ্রন্থখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" এবং সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। কৃষ্ণরাম দাস নামক ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতানিবাসী জনৈক কায়স্থ কবি ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে (খৃঃ ১৬৮৭ অব্দে) কৃষ্ণরাম দাস "ষষ্ঠীমঙ্গল" রচনা করেন। ইনি একখানি "শীতলা-মঙ্গল"ও রচনা করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায় সম্বন্ধে "রায়-মঙ্গল" এই কবির অপর গ্রন্থ। এই কবির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। ইনি বাঙ্গালায় এই কাহিনীর দ্বিতীয় কবি। তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী ভারতচন্দ্রের পর "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া কৃষ্ণরামকে তদীয় গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি বলিয়াছেন। আর একজন কৃষ্ণরামের নাম পাওয়া যায়। ইনি "হরিলীলার" প্রসিদ্ধ কবি জয়নারায়ণ সেনের পিতামহ। ইঁহার উপাধি দেওয়ান ছিল। দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ব্যক্তি। ইনি কবি ছিলেন কি না জানা নাই। কবি হিসাবে অপর একজন কৃষ্ণরামের কথা জানা গিয়াছে। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি কবি কৃষ্ণরাম বা দ্বিজ কৃষ্ণরাম ও মহাভারতের আংশিক অনুবাদক। দ্বিজ কৃষ্ণরামের কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁহার রচিত "অশ্বমেধ পর্ব্ব" পাওয়া গিয়াছে। এই কবির রচনায় সরল বর্ণনা ও পদলালিত্য প্রশংসনীয় এবং প্রাপ্ত পুথি লেখার তারিখ ১২০৮ সাল বা ১৮০০ খৃষ্টাব্দ। দ্বিজ কৃষ্ণরামের রচনার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

"কৃষ্ণ বোলে নরপতি তুমি কৈলে মনে।
নিশাকালে এথাতে আইলাঙ তে কারণে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আজি কি পুছ আমায়।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আজি করনে না যায়॥

পৃথিবীতে হয় যে ইন্দ্রসম শূর।
সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নৃপবর॥
ভুজবলে বিজয় করিতে পারে ক্ষিতি।
সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নরপতি॥"

—দ্বিজ কৃষ্ণরামের মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব।

(২০) রামচন্দ্র খাঁ

মহাভারতের কবি রামচন্দ্র খাঁ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি রামচন্দ্রের "লস্কর" উপাধি ছিল। কবির পিতার নাম মধুসূদন ও মাতার নাম পুণ্যবতী। এই কবিও অশ্বমেধ-পর্ব্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবি রামচন্দ্র তাঁহার পুথি রচনা শেষ হওয়ার তারিখ এই ভাবে দিয়াছেন—

"সে মুনি ভাগবতাঙ্ক সপ্তদশ শাকেন্দুরে।
যুগান্তে পুরাণমালোক্য প্রাকৃত কথা প্রচারে॥"

—কবি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব্ব।

সংস্কৃতজ্ঞ কবির এই ছত্র দুইটির সঠিক অর্থ বাহির করা সহজ নহে। অনুমান হয় তিনি গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ হিসাবে ১৭১৪ শক বা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কবির রচনায় পয়ার ছন্দের বেশ সাবলীল গতির পরিচয় দেয়। কবি নিজ পরিচয় উপলক্ষে জানাইয়াছেন,—

"স্বদেশে বসতি ভাল গঙ্গাস্নানে পুণ্যে।
জঙ্গীপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে॥
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী॥"

—কবি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব্ব।

যজ্ঞাশ্ব-সহ পাণ্ডবগণের প্রত্যাবর্ত্তন।
অর্জ্জুনের পর অন্যান্য বীরগণের যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ।

"যৌবনাশ্ব প্রণমিল যোড়ি দুই করে।
অনুশাল্ব প্রণমিল বিনয় বিস্তরে॥
নীলধ্বজ প্রণমিল মানবৃদ্ধ রাজা।
হংসধ্বজ প্রণমিল করএ প্রশংসা॥

চন্দ্রহাস প্রণমিল হরিকৃত পূজা।
বৃষকেতু প্রণমিল মহাপুণ্য তেজাঃ॥
বভ্রুবাহন প্রণমিল অর্জ্জুন নন্দন।
কৃষ্ণপুত্র প্রণমিল শাম্ব মহাজন॥
প্রত্যুম্ন আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন।
মহাদেবপুর-রাজা মধুলবন॥
তার পুত্র প্রণমিল নাম ত লক্ষণ॥
বীর ব্রহ্মা প্রণমিল অগ্নির শ্বশুর।
কোল দিল ধর্ম্মরাজ বলেন মধুর॥
দুঃশীলার পুত্র নরোত্তম নারায়ণ।
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিল আনন্দিত মন॥
মান্য অমান্য যত বয়োবৃদ্ধ রাজা।
ধর্ম্মরাজ করিলেন সভার ভক্তি-পূজা॥"

—কবি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব্ব।

(২১) লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "কুশধ্বজের পালা"টি পাওয়া গিয়াছে। ইহা লেখার তারিখ বাং ১২১১ সন অর্থাৎ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ দেওয়া আছে। পুথিলেখক কবি স্বয়ং না হইলে অবশ্য তিনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর অন্ততঃ শেষের দিকে ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। কবি কুশধ্বজের করুণ কাহিনী বর্ণনায় সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলা যায়।

কুশধ্বজের বিদায় গ্রহণ।

"ছাড়ায়্যা মায়ের হাত কুশধ্বজ আইসে।
হতজ্ঞান ব্রাহ্মণী হইলা শোকাবেশে॥
মুদগর মস্তকে মারে হয় আত্মঘাতী।
কুশধ্বজ পিতাকে বুঝায় কর‍্যা স্তুতি॥
যোড়হাত কর‍্যা বোলে কিছু নাহি ভয়।
বিকাইয়াছি যাব আমি অন্যমত নয়॥

বিদায় হইয়া যাই মাএ কর‍্যা শান্ত।
অবশ্য যাইব আমি অযোধ্যা নিতান্ত॥
এত শুনি পুনশ্চ ধরিয়া মাত্র তোলে।
মুখে জল দিয়া শিশু হিত পথ বলে॥
রোধমান মাগো রোদন কর বৃথা।
বিক্রীত হয়্যাছি আমি বেচ্যাছেন পিতা॥
পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফল ভোগ করে যত নর।
স্বামি-সেবা করা না বলিহ দুরক্ষর॥"

—কুশধ্বজের পালা, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২২) রামেশ্বর নন্দী

কবি রামেশ্বর নন্দীর (খণ্ডিত ?) মহাভারত ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। পুথিটি আনুমানিক প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন। কবি সমগ্র মহাভারতের অনুবাদক বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন।[১] তিনিই এই পুথির সংগ্রাহক। কবির সময় বা পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। কবি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের হইতে পারেন। এই সময়ের সংস্কৃত প্রভাবযুক্ত বর্ণনাপ্রিয়তা রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

আশ্রম-বর্ণনা (দুষ্মন্ত উপাখ্যান)।

"স্থলপদ্ম মল্লিক মালতী বিরাজিত।
লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত॥
নানা জাতি বৃক্ষলতা সব পুলকিত।
কৃষ্ণবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত॥
পুষ্প-মধুপানে মত্ত মধুকরগণ।
নানা স্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন॥
অঙ্গে অঙ্গে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে।
যাহারে শুনিলে কাণে মুনি-মন হরে॥
নানা জাতি পক্ষীনাদ করে সুললিত।
বৃক্ষমূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য॥"

—রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫৩ (দীনেশচন্দ্র সেন)।

২৩) অপরাপর কবিগণ

উল্লিখিত কবিগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত কবিগণও মহাভারতের অংশ বিশেষ রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিগণের পুথিসমূহ প্রায়ই খণ্ডিত এবং তাহার ফলে ইঁহাদের সকলের পরিচয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার উপায় নাই।

১। কৃষ্ণানন্দ বসুর মহাভারত (আদি-পর্ব্ব ?), খণ্ডিত, খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

২। দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত (দ্রোণ-পর্ব্ব, খৃঃ ১৭শ শতাব্দী)।

৩। ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর মহাভারত (আদি-পর্ব্ব ?), খণ্ডিত, ১৭শ শতাব্দী।

৪। নিমাই দাসের মহাভারত।

৫। বল্লভদেবের মহাভারত।

৬। দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

৭। লোকনাথ দত্তের নলোপাখ্যান (মহাভারতের অন্তর্গত)।

৮। মধুসূদন নাপিতের নলোপাখ্যান (মহাভারতের অন্তর্গত)।

৯। শিবচন্দ্র সেনের সাবিত্রী ও অপরাপর কতিপয় উপাখ্যান (মহাভারতের অন্তর্গত)। কবি বিক্রমপুর কাঁটাদিয়াবাসী।

১০। ভৃগুরাম দাসের মহাভারত।

১১। দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাসের অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

১২। ভারত পণ্ডিতের অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

১৩। মাধবদেব (কুচবিহার) রচিত মহাভারত কবি আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছিলেন এবং রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় (১৫৮৭-১৬২৭) বর্ত্তমান ছিলেন।

১৪। দ্বিজ রামেশ্বরের মহাভারত (কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের সময় ১৬৩২-১৬৭৫ খৃঃ)।

১৫। কৃষ্ণমিশ্রের প্রহ্লাদ-চরিত (মহারাজা প্রাণনারায়ণের সময়)।

১৬। বিশারদের বিরাট-পর্ব্ব ও কর্ণ-পর্ব্বের অনুবাদ (মহারাজা প্রাণনারায়ণের সময়)।

১৭। শ্রীনাথব্রাহ্মণের বিরাট-পর্ব্ব (মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কাল ১৭১৪—১৭৬৩)।

১৮। মহারাজা (কুচবিহার) হরেন্দ্রনারায়ণের মহাভারতের শল্য-পর্ব্বের পদ্যে অনুবাদ (রাজত্বকাল ১৭৮৩—১৮৩৯ খৃঃ)।

১৯। কুচবিহারের সুকবি মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে

(১৮৩৯—১৮৫৭ খৃঃ) ও তাঁহার উৎসাহে মহীনাথ শর্ম্মা, মাধবচন্দ্র দ্বিজ, দ্বিজ বৈষ্ণনাথ (মনসা-মঙ্গল রচয়িতা), দ্বিজ রুদ্রদেব ও দ্বিজ ধর্ম্মেশ্বরের রচিত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, চণ্ডিকার ব্রতকথা, মহাভারতের "আদি পর্ব্ব" ও "অশ্বমেধ পর্ব্ব", শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ কুচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন গুপ্ত মহাশয় রচিত "কুচবিহারে সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞানচর্চ্চা" নামক প্রবন্ধ (কুচবিহার দর্পণ, আষাঢ়, ১৩৫৩ সন) দ্রষ্টব্য। এই স্থানে একটি কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রাচীনকালে ত্রিপুরা, কুচবিহার, মিথিলা ও কামরূপের রাজগণ নানাদিক দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার "রাজমালা" গ্রন্থ এবং কুচবিহারের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষিত অথবা রাজবংশীয় ব্যক্তিগণ লিখিত নানা গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। কামরূপের রাজগণ লিখিত প্রাচীন পত্রাবলী অথবা তদ্দেশীয় নানা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। মিথিলার বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালার দাবী কম নহে। মিথিলার অপর বহু কবির মধ্যে রাজা প্রতাপ সিংহের রাজত্বকালে (১৭৬০—১৭৭৬ খৃঃ) মোদনারায়ণ এবং কেশব নামক তাঁহার দুই সভাকবির নাম এই স্থলে করা যাইতে পারে।

২০। মহীন্দ্র ও উমাকান্তের দণ্ডীপর্ব্ব।

২১। রাজীব সেনের উদ্যোগপর্ব্ব।

২২। কুমুদ দত্তের স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

২৩। জয়ন্তীদেবের স্বর্গারোহণপর্ব্ব। (২০ সংখ্যা হইতে ২৩ সংখ্যা পর্যান্ত মহাভারতের অংশবিশেষগুলি সম্বন্ধে "বাঙ্গালা সাহিত্য", ২য় খণ্ড, অনুবাদ-সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু রচিত, দ্রষ্টব্য।)

———

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বিবিধ অনুবাদ

(প্রধানতঃ পৌরাণিক)

সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি অবলম্বনে খৃঃ ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে বহুবিধ বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগ্রন্থগুলি অনুবাদ শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও আক্ষরিক অনুবাদ নহে ভাবানুবাদ মাত্র। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির ও কবিগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

১। হরিবংশ—দ্বিজ ভবানন্দ অনূদিত।

২। দণ্ডীপর্ব্ব—রাজারাম দত্ত।

৩। প্রহ্লাদ-চরিত্র—দ্বিজ কংসারি।

৪। পরীক্ষিৎ সংবাদ—রচনাকারীর নাম নাই (রামায়ণের গল্পসম্বলিত)

৫। ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান—দ্বিজ মুকুন্দ।

৬। নৈষধ—(রামায়ণের গল্পসহ) রচনাকারী—লোকনাথ দত্ত।

৭। ক্রিয়াযোগসার—(পদ্মপুরাণ হইতে) অনন্তরাম শর্ম্মা।

৮। ক্রিয়াযোগসার—কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ। ইনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহী রাজার পিতা মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে রাজসভার পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কতিপয় পণ্ডিত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মাধব দেব ও গোবিন্দ মিশ্র উঁহাদের অন্যতম।

৯। প্রভাস খণ্ড—শিবরাম দাস।

১০। প্রভাস খণ্ড—ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে "রঘুবংশের অনুবাদ, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বায়ু-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকলগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ-উপাখ্যান, সুধন্বাবধ, ধ্রুব-উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃ ৪১৫)।

১১। ক্রিয়াযোগসার—অনন্তরাম দত্ত (পূর্ব্ববঙ্গ, মেঘনাতীরবাসী)—পিতা রঘুনাথ।

উপরিলিখিত কাব্যসমূহ ভিন্ন এই স্থানে সংক্ষেপে কয়েকজন বিশিষ্ট কবির অনুবাদ গ্রন্থের আলোচনা করিব।

১। মধুসূদন নাপিতের নলদময়ন্তী কাব্য।

২। জয়নারায়ণ ঘোষের কাশীখণ্ড।

৩। রামগতি সেনের মায়াতিমিরচন্দ্রিকা।

পৌরাণিক চণ্ডীর অনুবাদগুলি শাক্ত মঙ্গলকাব্যসমূহের সহিত ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব অনুবাদ গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ ভাগবত। সুতরাং ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থসমূহ বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির সহিতই পরে আলোচিত হইবে।

(১) মধুসূদন নাপিত

মহাভারতের অন্তর্গত "নলদময়ন্তী" উপাখ্যান রচয়িতা কবি মধুসূদন নরসুন্দরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া অনুমান হয়। এমন এক যুগ ছিল যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার প্রচারে অত্যধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের কাছে তত সমাদর লাভ করিত না। সুতরাং সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ তাঁহারা মোটেই পছন্দ করিতেন না। অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ "ভাষা" অর্থাৎ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে তাঁহাদের মতে "রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" অপর একটি চলিত কথা "কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, বামুনঘেষে। এই তিন সর্ব্বনেশে" ইহার সমর্থন করে। কিন্তু ক্রমে বাঙ্গালা ভাষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতির মধ্যেই যে সাহিত্যিক চেতনা দেখা যায় তাহাতে একটি নরসুন্দর বংশীয় ব্যক্তিও মহাভারতের উপাখ্যানবিশেষ বাঙ্গালায় অনুবাদে সাহসী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সাধারণ টোলে ব্রাহ্মণগণের সহিত বণিকপুত্রও যে সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিত, চণ্ডী-মঙ্গলের অন্তর্গত শ্রীমন্তের গল্পে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, কবি মধুসূদন তাঁহার "নলদময়ন্তী" কাব্যে স্বীয় কবিত্ব শক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেকে নাপিত বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। কবি স্বীয় পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব।
যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব॥

তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়।
পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয়॥
তাহার তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন।
শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লসিত মন॥"

—নলদময়ন্তী উপাখ্যান, মধুসূদন নাপিত।

এই পরিচয়ে বুঝা যায় কবিত্বশক্তি মধুসূদন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। কবি মধুসূদনের রচনা মার্জ্জিত ও সরল এবং সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার রচনার নমুনা এইরূপ:—

রাজা নল।

"কতদূর গিয়ে দেখে রম্য এক স্থান।
দিব্য সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান॥
তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত।
দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত॥
কোকিলের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য।
ভ্রমরা নাচয়ে তথ' ভ্রমরী গাহে গীত॥
পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়।
স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয়॥
ছায়া, বারি, শীতল পবন মনোহর।
নদীতীরে ভ্রমে রাজা সরল অন্তর॥"

—নলদময়ন্তী উপাখ্যান, মধুসূদন নাপিত।

(২) জয়নারায়ণ ঘোষাল

কলিকাতা-খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ ভূকৈলাস জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র, পিতামহের নাম কন্দর্প ও প্রপিতামহের নাম বিষ্ণুদেব। কবি জয়নারায়ণের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর একখানি তাম্রফলকে জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিবরণ অনুসারে জয়নারায়ণ ১১৪৯ সালে অর্থাৎ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে, ৩রা আশ্বিন, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির পূর্ব্বপুরুষ বদুনাথ পাঠক ২৪ পরগণা জেলায়

অনেক ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন। কবি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার দিল্লীর সম্রাটদত্ত "রাজা" উপাধি ছিল। সাধারণে তিনি রাজা জয়নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। কাশীবাস কালে তিনি তথায় অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে জয়নারায়ণ কলেজ অন্যতম। রাজা জয়নারায়ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "কাশীখণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ। এই অনুবাদ তিনি একা করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে রাজা জয়নারায়ণই পুথিখানি সম্পাদন করেন।

বাঙ্গালা "কাশীখণ্ড" সংস্কৃত "কাশীখণ্ডের" ভাবানুবাদ নহে। ইহা মূলানুযায়ী অনূদিত সরল এবং সুপাঠ্য। ছন্দবৈচিত্র্য গ্রন্থখানির অপর বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থখানি অনুবাদ উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিবরণ উল্লেখযোগ্য :—

"কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর।
কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর ॥
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥
মিত্র শত চৌদ্দশক পৌষ মাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হৈল তবে ॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী ॥
তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ।
ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ ॥
তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খাড়া।
মুখুয্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া ॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া ॥
এই মতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে।
বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হৈল তবে ॥
ভাদ্রমাসে মুখুয্যা গেলেন নিজ বাটী।
বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী ॥

পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়।
বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥
পচন্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা।
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা॥
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ।
এই দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥
পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা।
শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥
যদ্যপি নয়নদুটি দৈবযোগে অন্ধ।
তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥
ইষ্টনিষ্ট বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম।
পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী মর্ম্ম॥
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর।
গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর॥
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান।
তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥
নিজে তার সহিত করিয়া পর্যাটন।
ছয় মাসে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন॥
ঋতুমাস তিথিবার বর্ষযাত্রা যত।
পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥
তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম।
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান॥
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্বগ্রন্থের প্রচার॥[১]
ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ।
এইখানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ॥
তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া।
রামতনু মুখোপাধ্যায় লইলা লিখিয়া॥

---

(১) একখানি হস্তলিখিত পুথিতে ইহার পর আরও দুইটি ছত্র আছে। যথা—

"নগর বর্ণন যোর গ্রন্থের কারণ।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তাহা যথার্থ বর্ণন।"

সেই বহি দৃষ্টি করি নকলবিদী।
কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরানিবাসী ॥"

—জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশীখণ্ড।

এই বর্ণনা অবলম্বনে "মিত্রশত চৌদ্দ শক" কথাটির "মিত্র" অর্থ ১৭ ধরিলে "কাশীখণ্ড" রচনারম্ভের তারিখ ১৭১৪ শক অর্থাৎ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ। বহু বাধাবিঘ্নের ফলে মধ্যে মধ্যে অনুবাদকার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়। এই জন্য গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে প্রায় চারি বৎসর সময় লাগে সুতরাং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কাশীখণ্ডের যে প্রতিলিপি হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার লেখকের নাম প্রেমানন্দ এবং পুথিখানির তারিখ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হইলে ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি "কাশীখণ্ড" রচনা করেন। কবির জন্মস্থান জানা নাই। কাশীর বিভিন্ন স্থান বর্ণনায় এবং লোকচরিত্র অভিজ্ঞতার যে পরিচয় কবি জয়নারায়ণ দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কবি রচনার ভিতরে "লামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃস্পট" এবং কপট চরিত্র পাণ্ডাদের "কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী" প্রভৃতি উক্তিগুলি দ্বারা এক একটি মনোরম ও জীবন্ত চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। মোটের উপর "কাশীখণ্ড" গ্রন্থখানি যে উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের "কাশীখণ্ড" ভিন্ন অপরাপর রচনা—

১। শঙ্করী-সঙ্গীত, (২) ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা, (৩) জয়নারায়ণকল্পদ্রুম ও (৪) করুণানিধানবিলাস।

(৩) রামগতি সেন

কবি রামগতি সেন লালা রামপ্রসাদ সেনের পাঁচপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইঁহারা সকলেই নামের পূর্ব্বে "লালা" কথাটি ব্যবহার করিতেন। জয়নারায়ণ সেন রামগতি সেনের দ্বিতীয় পুত্র। অন্য তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে কীর্ত্তি-নারায়ণ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ। রামপ্রসাদ সেনের স্ত্রীর নাম সুমতী দেবী। রামগতি সেনের বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পয়োগ্রাম (খুলনা জেলা) নামক গ্রামের অধিবাসী পণ্ডিত

অযোধ্যারাম সেনের সহিত আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। রাজনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিদেব বিদ্যালঙ্কারের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করিয়া এবং রাজা রাজবল্লভকে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া আনন্দময়ী বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আনন্দময়ী হরিদেব বিদ্যাবাগীশের পিতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের ছাত্রী ছিলেন। রামগতি সেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন ও রামগতি সেনের পিতা দানবীর লালা রামপ্রসাদ সেন উভয়ে এক নাম গ্রহণ করিলেও বিভিন্ন দিকে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর, রাজনগর নিবাসী বৈদ্য বংশীয় রাজা রাজবল্লভ (নবাব সিরাজুদ্দৌলার সমসাময়িক) ও রামগতি সেন একই বংশের বিভিন্ন শাখায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লালা রামপ্রসাদের পুত্রগণ মধ্যে রামগতি, জয়নারায়ণ এবং রাজনারায়ণ বিদ্যাবত্তায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রামগতি সেনের চতুর্থ ভ্রাতা রাজনারায়ণ "পার্ব্বতীপরিণয়" নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামগতি সেনের বাড়ী রাজনগরের নিকটবর্ত্তী জপ্সা গ্রামে (বিক্রমপুর) ছিল।

রামগতি সেনের "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ীর "হরিলীলা" রচনার (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে রচিত হয়। "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" বৈরাগ্যমূলক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি রূপকের আকারে লিখিত। রামগতি ও জয়নারায়ণ মনের দিক দিয়া একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। রামগতি বাল্যে রঘুনন্দন নামে তদীয় খুল্লপিতামহের আকস্মিক সংসার-বৈরাগ্য ও তৎফলে কাশীবাস দর্শনে খুব ভাবপ্রবণ ও ক্রমশঃ সংসারে বিতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপরপক্ষে জয়নারায়ণ ভোগবিলাসী এবং সাহিত্যক্ষেত্রে রসচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া কবি ভারতচন্দ্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগতি সেন ৫০ বৎসর বয়সোর্দ্ধে সংসার ত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন এবং প্রথমে কালীঘাটে ও পরে কাশীবাসী হন। তিনি ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী সহমরণে যান। রামগতি বোধ হয় কাশীবাসের পরে তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের একখানি সংস্কৃত ও অপরটি বঙ্গভাষায় লিখিত। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থখানির নাম "যোগকল্পলতিকা"। তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" সংস্কৃত নাটক "প্রবোধচন্দ্রোদয়ের" অনুকরণে বা আদর্শে রচিত। কবি রামগতি সেন সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ইহার মায়াপাশ কাটাইতে উপদেশ করিয়াছেন। কবি যে

তাঁহার বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলে "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই দুইটি ছত্রে বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

"পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃকাল।
কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল॥"

কবি রামগতি সেন রূপকের মধ্য দিয়া নিম্নলিখিতভাবে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন :

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়।
যথা বসে নানা রসে সদাজীব রায়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী।
দম্ভপাটে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটী॥
পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার।
দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥
শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীলা নারী।
মান করি রাজপুরি নাহি যায় চারি॥
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী।
পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী॥
নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে।
এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥" ইত্যাদি।

—রামগতি সেন রচিত "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা"।

রামগতি সেন তাঁহার এই গ্রন্থমধ্যে যোগশাস্ত্রের নানারূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ কঠিন তত্ত্বের আলোচনা করিলেও গ্রন্থখানির কাব্য হিসাবে সৌন্দর্য্য হানি হয় নাই। বরং গতিশীল ছন্দে এবং ভাষার লালিত্যে রচনার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা

বৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ধর্ম্মের দিক দিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্য বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বনে রচিত সুতরাং বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ধর্ম্মগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বাঙ্গালায় ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

বৈষ্ণবগণ পৌরাণিক হিন্দুগণের পঞ্চশাখার অন্যতম শাখার অন্তর্গত। এই পঞ্চশাখা,—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌরী (সূর্য্য উপাসক) ও গাণপত্য (গণেশ পূজক) নামে প্রসিদ্ধ। "বৈষ্ণব" কথাটির মূলে অবশ্য "বিষ্ণু" দেবতা রহিয়াছেন। এই "বিষ্ণু" দেবতা ও তাঁহার নানাবিধ নাম ও বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আদর্শ দেবতা "শ্রীকৃষ্ণ" ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"বিষ্ণু"দেবতা কত পুরাতন এবং প্রথমে তিনি কোন্ জাতির দেবতা ছিলেন? আর্য্যজাতির প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বিষ্ণুদেবতার উল্লেখ আছে এই দেবতা অতি প্রাচীনকালে সূর্য্যদেবতার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। "মিত্রা-বরুণ" সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ্মদেবতা। মিত্র দেবতাই সূর্য্যদেবতা এবং বরুণ আকাশের দেবতা। বরুণদেবতা পরবর্ত্তী কালে বর্ণ ও বিশালত্বের সাদৃশ্য হেতু জল এবং বিশেষ করিয়া সমুদ্রের দেবতা হইয়াছেন। বাল্মীকির আদিকাণ্ডে বর্ণিত রামচন্দ্র ছিলেন "বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে, সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।" এখানে "বিষ্ণু" কথাটি "সূর্য্য" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন মন্ত্রাদিতে "বিষ্ণু" "সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী" বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন।

আর্য্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় শীতপ্রধান উত্তরাঞ্চলের ককেশীয় (Nordic Caucasian) দলভুক্ত ছিল এবং প্রাচীন ইরাণীয়গণ ও দ্রাবিড়গণ সম্ভবতঃ সামুদ্রিক ককেশীয় (Proto-Mediterranean Caucasian) জাতিভুক্ত ছিল। আর্য্যগণ প্রথমে সূর্য্যদেবতার উপাসক এবং ইরাণীয়গণ অগ্নিদেবতার পূজক ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ইরাণীয়গণের অগ্নি-পূজার

প্রথম প্রবর্ত্তক জরাথুস্ত্র সূর্য্য-পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সংস্কৃত "ভবিষ্য-পুরাণে" ইহার সমর্থন আছে। কোন এক অজ্ঞাত প্রাচীন সময়ে সূর্য্যপূজক মগ-ব্রাহ্মণগণ ইরাণদেশে সম্মান না পাইলেও ভারতীয় আর্য্যসমাজে সম্মানিত হন। মগ-ব্রাহ্মণগণ আর্য্যজাতীয় হওয়াই সম্ভব। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্বের কুষ্ঠব্যাধি হইলে সূর্য্য-পূজা করিয়া এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে মগ-ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মূলসাম্বপুরে বা মুলতানে উপনিবিষ্ট হন।

আকাশের নক্ষত্ররাজির জ্যোতিষিক নামসমূহের, যথা রোহিণী, অনুরাধা, চিত্রা, বিশাখা, রেবতী প্রভৃতির, পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত গোপীগণের নামের সহিত সাদৃশ্য বিস্ময়কর। নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যদেবতা ও গোপীগণ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সাদৃশ্যমূলক। বৈষ্ণবগণ ভিন্ন শৈবগণের সহিতও সূর্য্য-উপাসকগণের মিল অল্প নহে। সূর্য্যের স্ত্রীর নাম বাঙ্গালা প্রাচীন ছড়াগুলির মতে "গৌরী"। আবার শিবের স্ত্রীর নামও "গৌরী"। এমন কি মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের মনসা-দেবীর নামও "জগৎ-গৌরী"। সুতরাং প্রথমে "গৌরী" নাম কোন্ দেবীর ছিল তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য বটে।

প্রাচীন আর্য্যগণ সূর্য্যদেবতা ও বিষ্ণুদেবতার মধ্যে ঐক্যসম্পাদন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে ঋষিরা ঋক্ মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুদেবতার পূজা করিতেন। বৈদিক সাহিত্যে "বিষ্ণু" ও বৈষ্ণব" সম্বন্ধে "বিষ্ণুদেবতা যস্য বৈষ্ণবঃ" কথাটি পাওয়া যায়। এই বিষ্ণুই "পরমদেবতা"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও পাণিনিতেও বিষ্ণুদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। "তৈত্তিরীয়" সংহিতার অন্তর্গত "নারায়ণোপনিষদ"খানা বৈষ্ণবদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ। "শতপথ" ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ব বেদান্তর্গত "বৃহন্নারায়ণোপনিষদে" নারায়ণ, হরি, বিষ্ণু, বাসুদেব প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া "ছান্দোগ্য" উপনিষদে "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ আঙ্গিরস" এবং "অথর্ব্বশির" উপনিষদে "দেবকীপুত্র মধুসূদনের" কথা আছে। মহাভারতেও "নারায়ণীয় অধ্যায়" আছে। বেদ ও বৈদিক গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন নামে এইরূপে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর উল্লেখ থাকিলেও বিষ্ণুদেবতার প্রাচীনতম উপাসক কাহারা? আমাদের অনুমান তাহারা সুপ্রাচীন দ্রাবিড়জাতি। সামুদ্রিক ককেশীয় (Proto-Mediterranean) জাতির অন্তর্গত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথে প্রথমে এই দেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

ইহারা সম্ভবতঃ আদি বিষ্ণু-পূজক ও সমুদ্রযাত্রাপ্রিয় ছিল। আর্য্যগণ এই দ্রাবিড়গণের নিকট হইতে বিষ্ণু-পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে এবং নিজেদের সূর্য্যদেবতার সহিত বিষ্ণুদেবতাকে মিশাইয়া ফেলিয়া থাকিবে। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও এই দুই দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রহিয়াই গিয়াছে। দ্রাবিড়গণ যেরূপ বাণিজ্য ও সমুদ্রপ্রিয় জাতি তাহাদের দেবতা বিষ্ণুরও সমুদ্রের সহিতই সম্বন্ধ অধিক।

দ্রাবিড়গণ ভারতে প্রবেশের পরে কালক্রমে পামিরীয় জাতীয় (পাহাড়ী বা আল্লাইন) ককেশীয়গণও আর্য্য (উত্তরদেশীয় বা নর্ডিক) জাতীয় ককেশীয়গণ দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যেও পরবর্ত্তীকালে আর্য্যসভ্যতা প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুর পরিকল্পনা নানারূপ উপাখ্যানের আকার ধারণ করে এবং সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিষ্ণুদেবতার পত্নী বা শক্তি লক্ষ্মীদেবী শুধু বাণিজ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্যেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহেন, তিনি কৃষি ও সাংসারিক সুখসম্পদেরও দেবী। এই দেবীর উদ্ভব কোনরূপ অষ্ট্রিক বা মঙ্গোলীয় প্রভাবের ফল কি না বলা যায় না। বিষ্ণুর গাত্রবর্ণ, সমুদ্র-জলের বর্ণ এবং দ্রাবিড়জাতির গাত্রবর্ণ বিশেষ সাদৃশ্যব্যঞ্জক। বিষ্ণুর বাহন উড্ডিয়মান গরুড়পক্ষীর সহিত দ্রাবিড় জাতির পালতোলা সমুদ্রগামী পোতের তুলনা করা যাইতে পারে। বিষ্ণুর কারণসমুদ্রে অনন্তশয্যার ও দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের ন্যায় পৌরাণিক কাহিনীগুলি জাতিবিশেষের সামুদ্রিক বাণিজ্যজাত ঐশ্বর্য্যের প্রতীক এবং দ্রাবিড় সংশ্রবের আভাষসম্পন্ন বলিয়া অনুমান করিলে ক্ষতি নাই। এই সমস্ত উপাখ্যান বাণিজ্যপ্রিয় জাতির আদরণীয় হইবার কথা।

এই ঐশ্বর্য্যময় প্রাচীন বিষ্ণুদেবতা কালের বিচিত্র গতিতে ভক্তিশাস্ত্র ও মাধুর্য্যরসের দেবতা হইয়া পড়িলেন। দ্রাবিড়গণ না আর্য্যগণ এই নূতনত্বের জন্য দায়ী তাহা বলা কঠিন। এই ঐশ্বর্য্যভাব, ভক্তিমার্গ ও মধুররসের অপূর্ব্ব সম্মেলন বৈষ্ণব দর্শন ও সমাজে সংঘটিত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্যগ্রন্থ "নারদপঞ্চরাত্র" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ। ক্রমে এই ভক্তিবাদ কান্তাপ্রেমরসে (ব্রজগোপীদিগের ভক্তিমিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমে) এবং অবশেষে মাধুর্য্যরসে পরিণতি লাভ করিল। ভক্তি, প্রেম ও মাধুর্য্যরসের বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণ-ভারত। বাঙ্গালাদেশে ইহার পরবর্ত্তী পরিণতি।

আর্য্যগণ দক্ষিণ-ভারতে বিতাড়িত অথবা উপনিবিষ্ট দ্রাবিড়গণের দেশে পৌরাণিক যুগে আগমন করিয়া দ্রাবিড়িদের ধর্ম্ম ও সমাজকে আর্য্য

আদর্শে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তান্ত্রিক-পৌরাণিক শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহার ফলে দক্ষিণ-ভারতে যথেষ্ট প্রসারলাভ করে। এইরূপে আর্য্য-দ্রাবিড়ি সংস্কৃতির প্রচেষ্টায় মুসলমানগণের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে নূতন জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে বহির্ভারতে, যথা, ইন্দো-চীন ও ইন্দোনেশিয়ায়, এই সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশেও ধর্ম্মের দিকে অনেক বিপ্লব ও নূতন নূতন তত্ত্বের অভ্যুদয় হয়। ইহার একাংশ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ ছাড়া ঐতিহাসিক যুগেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। বেশনগর খোদিত লিপিতে (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর শেষভাগ) "বাসুদেব" নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। নানাঘাট খোদিত লিপিতে (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) "বাসুদেব" ও "সঙ্কর্ষণ" এই উভয় নামই দেখিতে পাওয়া যায়। এই খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতেই ঘুসুণ্ডি ও হাতিবাড়ার খোদিত লিপিদ্বয়ে "অনিরুদ্ধের" নাম উল্লিখিত আছে। সুতরাং খোদিত লিপির ঐতিহাসিক প্রমাণানুসারে "বাসুদেব" নামটি "চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত চারিটি নামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে "ভাগবত" সম্প্রদায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "ভাগবত" সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর কেহ কেহ "চতুর্ব্ব্যূহ" তত্ত্বের উৎপত্তির কথা স্বীকার করেন। এই চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত চারিটি বৈষ্ণবদেবতা হইতেছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। মহাভারতের বহুপূর্ব্ব হইতেই বাসুদেব ও কৃষ্ণের[১] পূজা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত লিপিগুলি ছাড়া খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে হেলিয়াডোরাস (Heliadorus) নামক একজন গ্রীকদূতের বিষ্ণুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তরাজগণের "পরমভাগবত" আখ্যা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করে।[২]

(১) ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। যথা,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। —ব্রহ্মসংহিতা।

(২) প্রাচীন মুদ্রাতেও (Punchmarked coins) বৈষ্ণবদিগের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণের প্রতীক তাল, মীন (মকর) ও গরুড় চিহ্নযুক্ত (circa 500 B. C.) আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। (J. Allan—Catalogue of Indian Museum Coins) দ্রষ্টব্য। কুশানরাজ হুবিষ্কের (দ্বিতীয় শতাব্দী) একটি শীলমোহর (Seal) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুর মূর্ত্তি খোদিত আছে। শকরাজ ময়ূস (Maues)এর মুদ্রায় (circa 1st century A. D. বা আনুমানিক খৃঃ প্রথম শতাব্দী) বিষ্ণুর শক্তির (লক্ষ্মীর) গ্রীকভাবের মূর্ত্তি খোদিত আছে। (White-head—Catalogue of the Punjab Museum Coins দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে J. N. Banerjee—Development of Hindu Iconography, p. 141, দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার ও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে গেলে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও তাহাদের আদর্শগত বিভিন্নতার কিয়ৎপরিমাণে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আনন্দগিরি রচিত "শঙ্কর-দিগ্বিজয়" গ্রন্থপাঠে জানা যায় তখন বৈষ্ণবদিগের ছয়টি সম্প্রদায় ছিল। যথা,—ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন। অতি প্রাচীনকালে বৈষ্ণবধর্ম্মকে সাত্বতধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম ও পঞ্চরাত্রধর্ম্ম নামে অভিহিত করিত। পুরাণসমূহের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ সাত্ত্বিকপুরাণ। "সাত্বত" বিধি এই সব গ্রন্থে পালন করিতে বলা হইয়াছে। এই বিধি 'বলি' প্রথার বিরোধী। অপরপক্ষে শৈব শঙ্করাচার্য্য "মায়াবাদ" সমর্থন করিতেন এবং "পঞ্চরাত্র" ও "ভাগবত" বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধ ছিলেন। জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভক্ত, ভাগবত প্রভৃতি ছয় প্রকার বৈষ্ণব ভিন্ন আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিল। উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে—

(ক) ভক্তদের প্রধান উপাস্য দেবতা বাসুদেব।

(খ) ভাগবতদের প্রধান উপাস্য দেবতা জনার্দ্দন (কেশব ও নারায়ণ)।

(গ) বৈষ্ণবদের প্রধান উপাস্য দেবতা নারায়ণ।

(ঘ) পঞ্চরাত্রদের প্রধান উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

(ঙ) বৈখানসদের প্রধান উপাস্য দেবতা নারায়ণ।

(চ) কর্ম্মহীনদের (কর্ম্মকাণ্ডত্যাগীদের) উপাস্য দেবতা বিষ্ণু।

মহাভারতের কালের বহুপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের পূজা এতদ্দেশে প্রচলিত থাকিলেও অনেক পরবর্ত্তী "শঙ্কর দিগ্বিজয়" গ্রন্থে অথবা "শঙ্কর ভাষ্যে" শ্রীকৃষ্ণের উপাসক সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কৃষ্ণোপাসক স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় তখনও গড়িয়া উঠে নাই।

কালক্রমে বৈষ্ণব সমাজে নূতন বিভাগ দেখা দিল। ইহারা সংখ্যায় চারিটি। যথা,—শ্রী, ব্রহ্ম (বা মাধ্বী), রুদ্র ও সনক। সংস্কৃত পদ্মপুরাণে এই চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা,—

"কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকো বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

ইহা ছাড়া নারায়ণের সনক সনন্দাদিতে চারিবিকাশ অবলম্বন করিয়া সনক হইতে "চতুঃসন" সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই "চতুঃসন" সম্প্রদায় হইতে "নিম্বার্ক" সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই শাখাগুলি ছাড়া আরও অনেক শাখা-উপশাখার উৎপত্তি উপলক্ষে ভারতবর্ষে বৈষ্ণব সমাজের

বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বাঙ্গালার "গৌড়ীয়" বৈষ্ণব সম্প্রদায় সুবৃহৎ বৈষ্ণব সমাজের এক প্রধান অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবগণ মধ্যে শ্রীরাম, নারায়ণ, বাসুদেব, শ্রীহরি ও শ্রীকৃষ্ণের পূজার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় এই সব নামের মধ্যে বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা এই দেশে সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বর: পরম: কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ:" বাক্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আনন্দস্বরূপ ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি মূলে রহিয়াছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের কৃষ্ণরূপ বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। মাধুর্য্যরসের মূলেও এই আনন্দ রহিয়াছে। এই সব বিভিন্ন দেবতার বিগ্রহ নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্রে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মুসলমান আক্রমণের ফলে এই দেশে যে সব দেবদেবী মূর্ত্তি পুষ্করিণী বা নদীগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল ইহাদের অধিকাংশই বাসুদেব মূর্ত্তি। বোধ হয় এক সময়ে বাসুদেব দেবতার প্রভাব এই দেশে অধিক ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দেবতার প্রভাব বাসুদেব দেবতার পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। খৃ: ১২শ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় সভাকবি উমাপতি ধর (তিন সেন রাজার সময়েই বর্ত্তমান) ও জয়দেব (লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি) ইহার সাক্ষ্যদান করে। এই দুই কবির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ উল্লেখযোগ্য। সেন রাজগণ প্রথমে শৈব থাকিলেও গুপ্ত রাজগণের ন্যায় লক্ষ্মণ সেনের সময় এই বংশ বৈষ্ণব মত আশ্রয় করে। জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হিসাবেই রচিত হয়। ঠিক কবে হইতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজা আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে এই দেবতার পূজা আর্য্যগণ দ্বারা বঙ্গদেশে আনীত এবং দক্ষিণ-ভারতীয়গণ দ্বারা পুষ্ট বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার সেন রাজগণ দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এইরূপ একটি মতবাদ রহিয়াছে। ইহা সত্য হইলে সেন রাজগণ কর্ত্তৃক এই দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের মূলে দ্রাবিড়ি প্রভাবই থাকিবার কথা।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রাধা। উভয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির দ্যোতক। শ্রীরাধা লক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালা দেশে কোন্ সূত্রে আগমন করিলেন ইহা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক সাহিত্য পর্য্যন্ত এবং এমন কি তৎপরেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু "রাধা" নাম বেদে ত নাইই, পুরাণের মধ্যে প্রধানত: "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণ ও কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ (যথা প্রাকৃত-পিঙ্গল) ভিন্ন অন্য কোথায়ও শ্রীরাধার উল্লেখ নাই। এই "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণখানি পৌরাণিক

সাহিত্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। হরিবংশ, মহাভারত এবং ভাগবতে শ্রীরাধার উল্লেখ নাই, তবে গোপীগণের উল্লেখ আছে। ইহাদের একজন প্রধানা গোপী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণ অবলম্বনে প্রধানা গোপীর স্থলে শ্রীরাধা গৃহীতা হইয়াছেন। এই "রাধা" গোলকবাসিনী দেবীও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। বৈষ্ণবমতে গোলকের স্থান বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে এবং শ্রীরাধা তথায় লক্ষ্মীদেবীর আসন অধিকার করিয়াছেন। কোন কারণে অভিশাপ-গ্রস্ত হইয়া এই দেবী মর্ত্ত্যলোকে ব্রজমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিনী দেবী বিরজা অভিশাপের ফলে যমুনা নদীতে পরিণত হন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে এই বিরজা দেবী হইতে চন্দ্রাবলী সখীর উদ্ভব হইয়াছে। ইনি কখনও শ্রীরাধা স্বয়ং আবার কখনও শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কবি উমাপতি ধর ও "গীতগোবিন্দের" কবি জয়দেব খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মালাধর বসুর ভাগবতের প্রথম বঙ্গানুবাদের মধ্যে গোপীস্থলে সর্ব্বপ্রথম শ্রীরাধার উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী) পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কবিদ্বয় রাসেশ্বরী শ্রীরাধাকে মাধুর্য্যরসের প্রতীক করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উল্লেখ বাদ দিলে শ্রীরাধা বাঙ্গালীর নিজস্ব পরিকল্পনা এবং এই দেবী সূক্ষ্মরস-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের মূলে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান তিনটি। যথা—বৃন্দাবন, মথুরা, ও দ্বারকা। পরবর্ত্তীকালে নীলাচল (পুরী) এবং নবদ্বীপও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যভক্তদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানরূপে গণ্য হয়। মাধুর্য্যরসপ্রিয় বাঙ্গালী এই রসের অভাব হেতু মথুরা ও দ্বারকা সম্বন্ধে তত আগ্রহবান নহে। শেষোক্ত দুইস্থান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাবের পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত ব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবন বাঙ্গালী বৈষ্ণবের অতি প্রিয় স্থান। ইহার পর নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র বা পুরী) ও নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের সংস্রব হেতু বৈষ্ণব বাঙ্গালীর পক্ষে পরম তীর্থক্ষেত্র।

বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্গত নানা সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বাঙ্গালার গৌড়ীয় সম্প্রদায় কর্তৃক আমাদের জাতীয় সাহিত্যে দান অল্প নহে। সুতরাং এই সম্প্রদায় আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

বৈষ্ণব সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদের মূলে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ মহাপ্রভুর সহচর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও বিশেষ করিয়া তৎপুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় মহাপ্রভুর মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ রাগানুগাভক্তি ও কান্তাপ্রেম। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের নয়টি বা ছয়টি মূলরসের সহিত এই মতে আর একটি রস যুক্ত হইয়াছে। ইহা "মাধুর্য্যরস" এবং সর্ব্বরসের সার বা শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বীকৃত। ইহার পরে সখ্য ও বাৎসল্য রসের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাবান।

ভয় হইতে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা হইতে মানব মনে ক্রমে ভক্তির সঞ্চার হয়। এই ভক্তি ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে গিয়া একশ্রেণীর ভক্ত ভগবানকে আমাদেরই মত একজন করিয়া দেখিতে ভালবাসেন। তাঁহারা মোক্ষ চাহেন না। "সামীপ্য", "সালোক্য" ও "সাযুজ্য" মুক্তির মধ্যে তাঁহারা "সামীপ্য" মুক্তি চাহেন। ভগবানের সহিত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী অথবা স্ত্রী এইরূপ একটি সম্বন্ধস্থাপনে তাঁহারা অভিলাষী। এই ভক্তগণ শ্রীভগবানের তদনুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া ও পারিবারিক ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া অঙ্গরাগাদি ও সেবা করিতে ইচ্ছা করেন। শূন্যমূর্ত্তি বা নিরাকারব্রহ্ম চিন্তা করা যায় না বলিয়াই তাঁহাদের এই ব্যবস্থা। সাংখ্য মতের পুরুষ-প্রকৃতির মতবাদ এই বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেদান্তের মায়াবাদ ও ভক্তিতত্ত্বও বিশেষার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু "দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ছিলেন বলা যায় এবং এইমত শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈত মতবাদের বিরোধী। পৌরাণিক "মহামায়ার" প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাইয়া এই সম্প্রদায় "যোগমায়ার" উপরে আস্থা দেখাইয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতীক বৈকুণ্ঠের উপরে মাধুর্য্যের প্রতীক গোলকের স্থাপন করিয়াছেন। কালক্রমে এই সম্প্রদায় তান্ত্রিক মত গ্রহণ করিয়া মূল মতবাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলেন। এই বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শৈব, শাক্ত ও মহাযানী বৌদ্ধদের প্রচলিত পথই অবলম্বন করেন। সহজিয়া বৈষ্ণবগণই ইহা বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। "রাধাতন্ত্র" গ্রন্থ, রাধাচক্র, শ্রীরাধার নাম শ্রীকৃষ্ণের নামের পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া উচ্চারণ, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শাখার মধ্যে সহজিয়া শাখায় স্ত্রীসাধনা ও নানা তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহার, গোপ-গোপীদের তান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তান্ত্রিকতার নিদর্শন। বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলে রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণ যে সমস্ত বিশেষ মত পোষণ করেন অন্যান্য বৈষ্ণবসমাজে তাহা সর্ব্বথা স্বীকৃত নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে পিতা বা মাতাভাবে, সখা বা সখীভাবে এবং কান্তাভাবে ভগবানকে ভজনার মধ্যে গোপীদিগের ভক্তিমিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শে কান্তাভাবে ভজনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য ইহার পর সখা বা সখীভাবে ভজনা শ্রেষ্ঠ। এই বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ সুতরাং স্বামী হিসাবে দেখিতে হইবে। জীবমাত্রেই স্ত্রীতুল্য। ভগবানের সহিত ভক্তের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধস্থাপন চেষ্টা অপূর্ব্ব চিন্তাধারার নিদর্শন সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় মানব-সমাজের স্ত্রী-পুরুষঘটিত প্রেমের অনুরূপ করিয়া ভগবৎ-ভক্তিকে পরিণত করার মধ্যে নূতনত্ব আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই কান্তা-প্রেমকে আরও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রেম অপেক্ষা পরপুরুষের সহিত বিবাহিত পরনারীর প্রেমের গভীরতা, আকুলতা ও বিঘ্ন অধিক। ভক্ত-ভগবানে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার সুযোগ ঘটে এবং জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ দৃঢ়তর-ভাবে পরিস্ফুট হয়। সুতরাং কৃষ্ণভক্তির প্রথম পরিণতি সাধারণ প্রেম এবং চরম পরিণতি পরকিয়া প্রেম বা রাগানুগাভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। নিজ স্বামীর প্রতি অনুরাগ "বৈধী" ভক্তি অপেক্ষা পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ (ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেম) বা"রাগানুগা"ভক্তি শ্রেষ্ঠতর। প্রথমে মহাপ্রভু সমর্থিত"রাগানুগা" ভক্তি মনোজগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক জগতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইলেও ইহার পার্থিব দিকটা ভুলিলে চলিবে না। সাধারণ বৈষ্ণবদিগের ক্ষেত্রে এই উচ্চভাব বা "মহাভাব" গ্রহণ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তান্ত্রিক মহাযানী তথা মঠবাসী বৌদ্ধদিগের অধঃ-পতনের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। কালক্রমে এই "পরকীয়া" সাধনা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সহজিয়া শাখায় যে বীভৎসতা সৃষ্টি করিল তাহা তান্ত্রিকতার অধঃপতনের যুগের চরম নিদর্শন। বৈষ্ণব সহজিয়াগণের মূল আদর্শ খুব উচ্চ হইলেও তাহার ব্যবহারিক পরিণতি ভয়াবহ এবং বৌদ্ধ সহজিয়াগণের অবনতির সহিত তুলনীয়। কামকলুষবর্জ্জিত বৈষ্ণব গোস্বামীগণের সহিত একটি পরস্ত্রী বা "মঞ্জরী" কল্পনা বিকৃত বৈষ্ণব সহজিয়াগণের অপূর্ব্ব রুচির সাক্ষ্য দান করে। যাহা হউক ব্রজের গোপী বা সখী হিসাবে সাধনা ভক্তের পরম কাম্য হইলেও "রাধা" ভাবে সাধনা একমাত্র মহাপ্রভু দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কৃষ্ণবিরহ উপলব্ধি করিবার

জন্যই গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃঢ় অভিমত।

শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট সর্ব্বশাস্ত্র ও পুরাণাদি হইতে অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের "ঐশ্বর্য্য"ভাবের বর্ণনা আছে, "মাধুর্য্য"রস ও "রাগানুগা" ভক্তির কথা নাই। এই মতবাদের প্রথম সৃষ্টি বাঙ্গালাতে না হইয়া দক্ষিণ-ভারতেও হইতে পারে, অথবা দক্ষিণ-ভারত বাঙ্গালায় এই মতবাদ সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইতে পারে।

বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই যেন "রাগানুগা" ভক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল। খৃ: ১২শ শতাব্দীতে কবি উমাপতি ধর[1] ও জয়দেব (গীতগোবিন্দের কবি) "কান্তাপ্রেম" প্রচার করিয়াছিলেন। এই কবিদ্বয় শ্রীরাধাকে "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া মর্ত্ত্যের ধূলিতে প্রতিষ্ঠা করেন। খৃ: ১৩শ শতাব্দীর গোলযোগে এই সম্বন্ধে আর কিছু শুনা যায় না। কিন্তু খৃ: ১৪শ শতাব্দীতে মিথিলার বিদ্যাপতি ও বাঙ্গালার চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকে উপলক্ষ করিয়া পুনরায় কান্তাপ্রেম প্রচারে মনোযোগী হন। ঐশ্বর্য্যভাবপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা সংস্কৃত ভাগবতের আদর্শ। কিন্তু বাঙ্গালাতে ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) শ্রীচৈতন্যের জন্মের অল্প পূর্ব্বে "ঐশ্বর্য্যের" সহিত কিছু "কান্তা-ভাব" মিশ্রিত করিয়া তাঁহার ভাগবত রচনা করেন। ভাগবতানুবাদের পূর্ব্বেই কবি চণ্ডীদাস আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি "পরকীয়া" তত্ত্ব তাঁহার "সহজ" মতের ভিতর দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই "পরকীয়া" তত্ত্ব ও "কান্তাপ্রেম" মিশ্রিত হইয়া মহাপ্রভু দ্বারা "রাগানুগা" ভক্তিতে পরিণত হইল। এইখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব। শ্রীচৈতন্যশিষ্য রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে প্রথম প্রভেদ আনয়ন করেন বলিয়া আর একটি মত আছে।

বঙ্গদেশের অধিবাসী মাধবেন্দ্র পুরী (খৃ: ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কিছু আদর্শ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রথম সংগ্রহ করেন।

---

(১) উমাপতি ধরের কাল Aufrecht সাহেবের মতে ১১শ (খৃষ্টীয়) শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ, কিন্তু গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে ও মিথিলার প্রবাদ অনুসারে তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। বিদ্যাপতির কাল সম্ভবতঃ খৃ: ১৪শ-১৫শ শতাব্দী। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তরুতমল্লিককৃত প্রামাণ্য বৈষ্ণবকুলজী গ্রন্থের (১৫৭২ খৃ:) প্রমাণ প্রয়োগে উমাপতি ধরকে বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। বাঙ্গালা পদসংগ্রহ গ্রন্থ "পদ-সমুদ্রে" উমাপতি ধরের পদ পাওয়া গিয়াছে।

মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই বৈষ্ণব মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত। নরোত্তম দাসের "সাধ্যসাধনতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে এই দুই ছত্র পাওয়া যায়—

"সাবধানে বন্দিব আজি মাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তি পথের প্রথম অবতরি॥"

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে আছে—

"মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্রে হয় অচেতন॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মাধবেন্দ্রপুরীর কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মাধবেন্দ্রপুরীর জন্ম ১৮০০ খৃষ্টাব্দে (আনুমানিক) তাঁহার লোকান্তর গমনের কালে শ্রীচৈতন্যের শৈশবাবস্থা ছিল। মাধবেন্দ্রপুরীই অদ্বৈত প্রভুকে ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত শ্রীপর্ব্বতে তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর একবার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অদ্বৈত প্রভু, কেশব ভারতী, ঈশ্বরপুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মাধবেন্দ্রপুরীই প্রথম বৃন্দাবনে স্বপ্ন দেখিয়া গোপাল বিগ্রহ মৃত্তিকা নিম্ন হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী আবিষ্কৃত বর্ত্তমান বৃন্দাবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাধ্বী সম্প্রদায়ের ১৪শ গুরু ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল "ভক্তিচন্দ্রোদয়"। কবিকর্ণপুরের "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে (১৫২৬ খৃঃ) মাধ্বী সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু মধ্বাচার্য্য বা মাধবাচার্য্যের জন্মকাল ১১৯১ খৃঃ। তাঁহার অপর নাম আনন্দতীর্থ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাবের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হন। মাধ্বী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জয়ধর্ম্ম নামক দশম গুরুর জনৈক শিষ্য বিষ্ণুপুরী সংস্কৃত ভাগবত বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রচারের চেষ্টা করেন। এই সংক্রান্ত তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থের নাম "ভক্তিরত্নাবলী"। খৃঃ ১৩শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের ইহাই একরূপ প্রথম প্রচেষ্টা। মাধবাচার্য্য হরি ও হর উভয়ের প্রতি সমভাবে ভক্তি নিবেদন করিতেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যবাসী এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বল্লভাচার্য্য (রুদ্র সম্প্রদায়) বালগোপালের ভক্ত ছিলেন। রামানুজ (শ্রীসম্প্রদায়, জন্ম ১০৭০ খৃষ্টাব্দ) কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী এই যুগ্মদেবতার প্রতি এবং তৎশিষ্য বিষ্ণুস্বামী (দাক্ষিণাত্যবাসী) কৃষ্ণ ও গোপীগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। গীতগোবিন্দের বাঙ্গালী কবি জয়দেব বিষ্ণুপুরীর পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালায় যে কৃষ্ণভক্তি

প্রচার করেন তাহার কাল খৃঃ ১২শ শতাব্দী। তিনি সনক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা অবশ্য মাধ্বী সম্প্রদায় এবং জয়দেব মাধবাচার্য্যের প্রায় সমসাময়িক। সনক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নিম্বাদিত্য রাধাকৃষ্ণলীলা জয়দেবেরও পূর্ব্বে প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালায় ভক্তিধর্ম্মের প্রথম প্রচারে খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে সনক সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্বাদিত্য ও জয়দেব গোস্বামী এবং খৃঃ ১৩শ শতাব্দীতে মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত বিষ্ণুপুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে রামানুজের (শ্রীসম্প্রদায়) শিষ্য বিষ্ণুস্বামী রাধাকৃষ্ণপ্রেম প্রচারে মনোযোগী হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের প্রচারিত ভক্তি ও প্রেম একত্রীভূত করিয়া তদুপরী তাঁহার পরকীয়া তত্ত্ব প্রবর্ত্তিত করেন। এই তত্ত্ব প্রকাশে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব থাকিবার কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সংগঠনে যেরূপ নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্য রসকে স্বতন্ত্র করিয়া প্রচার করিতেন শ্রীচৈতন্য-শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামীও সেইরূপ করিতেন। চণ্ডীদাসের ন্যায় বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহিতও শ্রীরূপগোস্বামীর নাম বিশেষভাবে জড়িত আছে। শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিকাশস্বরূপ ঐশ্বর্য্যলীলা ও ভাব জয়দেব ও বিষ্ণুপুরী প্রবর্ত্তিত ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীচৈতন্য ভক্তির মধ্যে বৈধী ভক্তির অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তির প্রতি অধিক অনুরক্ত হন। এই ভক্তিভাবের রস মাধুর্য্যরস (রাগানুগা প্রেম) এবং তত্ত্ব পরকীয়া তত্ত্ব। বাঙ্গালার সহজিয়া বৈষ্ণবগণের মতবাদ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া তান্ত্রিকতা মিশ্রিত হইয়াছে। মহাপ্রভু যেমন মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও মতবাদে এই সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র সেইরূপ মহাপ্রভুর পরকীয়া মতবাদের উপর নির্ভরশীল হইয়াও সহজিয়া সম্প্রদায় মহাপ্রভুর পথ হইতে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। অবশ্য সহজিয়া মতবাদের এই দেশে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কবি চণ্ডীদাসের নাম রহিয়াছে এবং তিনি মহাপ্রভুর প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। মহাযানী বৌদ্ধ সমাজে ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সহজিয়া মতের প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যের "রাগানুগা" ভক্তির মধ্যে দাক্ষিণাত্যের ভক্ত মহাজনগণ ও বাঙ্গালার চণ্ডীদাসের প্রভাব থাকিবার কথা। শ্রীচৈতন্যকে এই মতের প্রবর্ত্তক না বলিয়া সংস্কারক বলা যাইতে পারে। এই "রাগানুগা" ভক্তির উপরই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

সংস্কৃত শাস্ত্রের আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে কোন কোন দিকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার একটি রস ও অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে অপরটি কীর্ত্তন গান সম্বন্ধে। সংস্কৃত "নবরস" বা "ষড়রস" মধ্যে মাধুর্য্যরসের

কোন স্থান নাই। অথচ বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ মাধুর্য্যরস সংস্থাপনে মনোযোগী হইয়া ইহাকে "সর্ব্বরস-সার" বলেন এবং প্রধান রস বলিয়া স্বীকার করেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বৈষ্ণব সংস্করণ রূপগোস্বামীর অপূর্ব্ব গ্রন্থ "উজ্জ্বলনীল-মণি"। শ্রীভগবানের নাম গান বা আলোচনাকে সাধারণতঃ সাধুভাষায় "সংকীর্ত্তন" (বা সম্যকরূপে কীর্ত্তন) বলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইহা হইতে একটি বিশেষ ধারায় গীতের সৃষ্টি বা সংস্কার করেন। ইহার নাম কীর্ত্তন গান। কীর্ত্তন গানে সংস্কৃত রীতিসম্মত ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি ধারার সংমিশ্রণ রহিয়াছে। বাঙ্গালার তিনটি স্থানে কীর্ত্তনগানের বিশেষ চর্চ্চার ফলে প্রসিদ্ধিলাভ ইহার চারিটি মুখ্য শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ হইয়াছে। এই চারিটি শ্রেণীর নাম মনোহরসাহী, গরাণহাটী, রেনেটী ও মান্দারণী।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈষ্ণব শাখা যে তিনটি ভাগে বিভক্ত তাহা অনুবাদ সাহিত্যের বৈষ্ণব অংশ, গীতি-সাহিত্য ও জীবনী-সাহিত্য। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে একে একে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বৈষ্ণব অনুবাদ সাহিত্য

(ক) সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ

১। মালাধর বসু

খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর কবি মালাধর বসু সংস্কৃত ভাগবত গ্রন্থের প্রথম ছন্দে বঙ্গানুবাদ করেন। ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদক। মালাধর বসু বর্দ্ধমান কুলীনগ্রামের প্রতিপত্তিশালী বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী[১] এবং আদিশূর আনিত পঞ্চকায়স্থ মধ্যে অন্যতম দশরথ বসু হইতে অধস্তন ১৪ পুরুষ। ইনি বল্লাল সেনের সমসাময়িক কৃষ্ণ বসু হইতে অধস্তন একাদশ স্থানীয় ছিলেন। বংশলতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও নিম্নে উহা দেওয়া গেল।

(দশরথ বসু বংশায়) কৃষ্ণ বসু (বল্লাল সেনের সমসাময়িক)

ভবনাথ
|
হংস
|
মুক্তি
|
দামোদর
|
অনন্ত
|
গুণাকর
|
শ্রীপতি
|
যজ্ঞেশ্বর
|
ভগীরথ
|
মালাধর বসু। গুণরাজখান।
|
রামানন্দ বসু (পুত্র অথবা পৌত্র, সম্ভবতঃ পুত্র)

১। বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাহা হৈতে হৈল মোর নারায়ণে মতি।
—মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

মালাধর বসুর ভাগবতের নাম "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"। কোন কোন পুথিতে নাম আছে "গোবিন্দ-বিজয়।" কবির একখানি মাত্র পুথিতে এই দুইছত্র পাওয়া যায়। যথা—

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"

এই পুথিখানি হুগলী বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় প্রাপ্ত হন। এই পুথি দৃষ্টে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় একখানি "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" মুদ্রিত করেন। এই একটিমাত্র পুথিতে রচনার সময় উল্লেখ থাকাতে কেহ কেহ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলেও কবির সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ আলোচনা করিলে এই ছত্র দুইটি সত্য বলিয়াই মনে হইবে। এই ছত্র দুইটি অনুসারে পুথি রচনা আরম্ভের কাল ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ এবং পুথি সমাপ্তির কাল ১৪০১ শক বা ১৪৮০ খৃঃ কেহ কেহ "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" পুথিকে সনতারিখযুক্ত প্রথম ও একমাত্র পুথি মনে করেন। ইহা এই বিষয়ে প্রথম পুথি হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র পুথি নহে। মহাভারতের কবি কাশী দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস "জগন্নাথমঙ্গল" নামে জগন্নাথ মাহাত্ম্য-সূচক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে পুথি রচনাকাল সম্বন্ধে আছে—

"সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখামতে॥"

—জগন্নাথমঙ্গল, গদাধর দাস।

ইহার অর্থ পুথি-রচনাকাল ১৫৬৭ শক অথবা ১০৫০ বাং সন। (বঃ ভাঃ ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৬৯, ৬ষ্ঠ সং)।

সনতারিখযুক্ত বহু পুথি বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে, তবে উহা লিখিবার ধারা স্বতন্ত্র ছিল সুতরাং ঘুরাইয়া প্রকাশ করার দরুণ বুঝিতে অসুবিধা হয়, এই যা কথা। স্পষ্ট সনতারিখযুক্ত পুথি হিসাবেও মালাধর বসুর ভাগবত যে একমাত্র পুথি নহে তাহা উল্লিখিত একটি উদাহরণেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

কবি মালাধরের "গুণরাজখান" উপাধি ছিল। যথা,—

"গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান॥"

—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, মালাধর বসু।

কবি কৃত্তিবাসের "গৌড়েশ্বরের" ন্যায় মালাধর বসুর "গৌড়েশ্বর"ও সমালোচকবৃন্দের[১] বহু জল্পনাকল্পনার কারণ হইয়াছেন। "নানা মুনির নানা মত" বলিয়া একটি কথা আছে। যাহা হউক এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বাঙ্গালার পাঠান সুলতানগণের নাম ও শাসনকালের সময় এইরূপ :—

১। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ—১৪৬০ ১৪৭৪ খৃঃ
২। সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ—১৪৭৪—১৪৮১ খৃঃ
৩। দ্বিতীয় সেকেন্দর (কতিপয় মাস),
তৎপর জালালুদ্দিন ফতে শাহ—১৪৮১-১৪৮৬ খৃঃ
৪। বরবক (খাজা) সুলতান সাহজাদা—১৪৮৬ খৃঃ
৫। মালিক ইন্দিল (ফিরোজ শাহ)—১৪৮৬ খৃঃ
৬। নাসিরুদ্দিন (মামুদ শাহ, ২য়)—১৪৮৯ খৃঃ
৭। সিদি বদর (সামসুদ্দিন মুজাফর শাহ)—১৪৯০-১৪৯৩ খৃঃ
৮। হুসেন শাহ—১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ
৯। নসরত শাহ—১৫১৮—১৫৩৩ খৃঃ

উল্লিখিত সুলতানগণের রাজত্বকাল দৃষ্টে বুঝা যায় মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের পুথি অনুসারে রুকনুদ্দিনের সময় আরম্ভ হইয়া সামসুদ্দিনের সময় শেষ হইয়াছিল। গ্রন্থ অনুবাদে যে সাত বৎসর লাগিয়াছিল তাহার শেষের পাঁচ বৎসরই সামসুদ্দিনের রাজত্বকাল। আবার, কবিকে "গুণরাজ খান" উপাধি হুসেন সাহ দিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। "রিয়াজুস সালাতিন" গ্রন্থে দেখা যায় সামসুদ্দিন খুব ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এমতাবস্থায় কবিকে "গুণরাজ খান" উপাধি কোন্ সুলতান দিলেন? সাধারণতঃ দেখা যায় গ্রন্থকার আত্মপরিচয় অংশ সর্ব্বশেষ রচনা করিয়া স্বীয় গ্রন্থের প্রথম দিকে জুড়িয়া দেন; ইহাই রীতি। ইহা ছাড়া পুথি শুনিয়া সন্তুষ্ট না হইলে কোন সুলতান বা রাজা কবিবিশেষকে উপাধিভূষিতই বা করিবেন কেন? এই পুথি রচনা উপলক্ষে "গুণরাজ খান" উপাধি না পাইলে পুথির গৌরববর্দ্ধনার্থ "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান" উপাধিই বা কবি মালাধর স্বীয় ভাগবতে উল্লেখ করিলেন কেন? ছত্রগুলি পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় কবি বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে "গুণ নাই,

১। এই সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন মন্তব্য করিয়াছেন।

অধম মুই" প্রভৃতি লিখিয়া গৌড়েশ্বর প্রদত্ত উপাধিটি উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ না পায়। মালাধর বসু প্রথমাবধিই কবি খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং কোন সুলতানের আদেশে ভাগবতানুবাদ আরম্ভ করেন এমন কোন প্রমাণ বা উল্লেখও কোথায়ও নাই। বরং আছে,—

"কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥"

তাহা থাকিলে আমরা রুকনুদ্দিনকেই উপাধিদাতা সুলতান মনে করিতাম। তদভাবে আমরা সুলতান সামসুদ্দিনকেই "গুণরাজখান" উপাধিদাতা সাব্যস্ত করিতেছি। হুসেন সাহ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কবি মালাধর তাঁহার বহু পূর্ব্বে কবি উমাপতি ধরের ন্যায় একাধিক সুলতানের সময় জীবিত ছিলেন। রুকনুদ্দিনের শাসনকাল আরম্ভ হইতে হুসেন সাহের শাসনকালের শেষ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ৬৬ বৎসর দেখা যায়। সুতরাং কবি মালাধর বসু নিতান্ত আনুমানিক ত্রিশ বৎসরের সময় (১৪৭৩ খৃঃ) গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেও সামসুদ্দিনের সময় (১৪৮০ খৃঃ) উহা শেষ করিয়া হুসেন সাহের রাজত্ব শেষে (১৫১৮ খৃঃ) কবির বয়স ৭৫ বৎসর কি তাহার কাছাকাছি হইবার কথা। তবে, খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যের বাল্যকালে কবি মালাধরের প্রৌঢ়াবস্থা এবং সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর জীবিত না থাকিয়া ৬০ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে পরলোকগমন করিয়া থাকিবেন। বয়সের মাপকাঠি অনুমানে রামানন্দ বসুকে (সত্যরাজ খানকে) কবির পৌত্র না বলিয়া পুত্র অনুমান করিলেই যেন ঠিক হয়। এই সমস্ত অনুমান সবই কতকটা নির্ভর করিতেছে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের পুথি নির্ভর করিয়া। মালাধর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে উক্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় মালাধর শ্রীচৈতন্যের যৌবনকালে জীবিত ছিলেন না। মহাপ্রভু মালাধরের পুত্র (?) রামানন্দ বসুকে পরম বৈষ্ণব পরিবারে জন্মহেতু এবং মালাধরের ভাগবত রচনা পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পার্ষদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মালাধরের ভাগবত সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহা নিম্নরূপ আছে।—

"গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাহে একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥"

—মধ্যলীলা, ১৫ অধ্যায়, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,
কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

কবি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থের "বিজয়" কথাটি কেহ "মৃত্যু" এবং কেহ "যাত্রা" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের শেষ স্কন্ধে (১২শ স্কন্ধ) শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। মালাধর বসু ১০ম-১১শ স্কন্ধদ্বয় মাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অসুরবিজয়ী ও ঐশ্বর্যভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণের "বিজয়-যাত্রা" অর্থে "বিজয়" শব্দটি গ্রহণ করাই বোধ হয় অধিক সঙ্গত। বিশেষত: শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগরূপ মর্ম্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের রুচিসম্মতও নহে। সম্ভবত: এই জন্যই কবি মালাধর বসু ইচ্ছা করিয়াই ভাগবতের শেষ স্কন্ধ বা ১২শ স্কন্ধের অনুবাদ করেন নাই।

মালাধর বসু সম্ভবতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগবতানুবাদ ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও স্থানে স্থানে মূলের অবিকল অনুবাদ রহিয়াছে। নিম্নে একটি মূল গদ্যানুবাদ ও মালাধরের পদ্যানুবাদ পাশাপাশি দেখান যাইতেছে।[১]

মূল—

"কোন কোন গোপাঙ্গনা গোদোহন করিতেছিল। তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধপান করাইতেছিল, অন্য কয়েকজন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেল। অন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু)।

"ছাওয়ালেরে স্তন পান করে কোন জন।
নিজ পতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোতুহলে॥
ভোজন করয়ে কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোন জন॥

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৫৭-১৫৯) দ্রষ্টব্য।

কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবারে যায়।
তৈল দেহি কোহুজন গুরুজন পায়॥
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে॥
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যে মনে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, মালাধর বসু।

কবি মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে" শ্রীকৃষ্ণের বেণুর প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা মালাধরের বৈশিষ্ট্য এবং পরবর্ত্তী বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যে মাধুর্য্যরসের সহায়করূপে গৃহীত হইয়াছে। অথচ সংস্কৃত ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাগবতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের গীতের কথা, মালাধর সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের উল্লেখ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত উদাহরণেও তাহা দেখা যাইবে।

মহাপ্রভু যে "কান্তাভাব" প্রচারে মনোযোগী হন বাঙ্গালায় তাহার অগ্রদূত হিসাবে প্রথমে জয়দেব তাঁহার পরে চণ্ডীদাস ও তৎপর মালাধর বসু। শ্রীচৈতন্যের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রায় সমসাময়িক বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারব্রতী মাধবেন্দ্রপুরী এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক তৎভক্ত শ্রীরূপগোস্বামী ও অন্যান্য গোস্বামিবৃন্দ। ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া এই ভাব প্রচারে প্রথম ব্রতী হন মালাধর বসু। মালাধর বসু কান্তাভাব ও মাধুর্য্যরস প্রচারে বাঙ্গালায় প্রথম নহেন এবং মহাপ্রভুর একমাত্র আদর্শ নহেন। যাহা হউক, দেখা যায় মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যগুণশালী ও এই বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ভাগবতের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাগবতে নাই এমন অনেক বিষয়ও তাঁহার অনুবাদে স্থান পাইয়াছে। যথা, উদ্ধব কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ দর্শন, বৃন্দাবনে গুবাক ও নারিকেল গাছ রোপণ ইত্যাদি।

ভাগবতের বর্ণনা ব্যতিক্রম করিয়া কবি মালাধর বসুর গ্রন্থে প্রধানা গোপীস্থলে শ্রীরাধার প্রথম উল্লেখ এবং ভাগবত বহির্ভূত "দান-খণ্ড", "নৌকা-খণ্ড" প্রভৃতির বর্ণনা দেখা যায়। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" (বড়ু চণ্ডীদাস রচিত) গ্রন্থের "দান-খণ্ড", "নৌকা-খণ্ড" প্রভৃতির আদর্শ মালাধর বসুর গ্রন্থ কি না তাহা বিবেচ্য।

মালাধর বসুর রচনা, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রকাশক, ভাবমূলক,

প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থখানি যে গীত হইত তাহা রচনার প্রতি অংশে রাগরাগিণীর নাম লেখা থাকাতেই বুঝা যায়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তিনি তখনও দেবতার আসনে রহিয়াছেন। ভাগবতে গোপীগণের প্রেম নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে দেখান হয় নাই। ইহা উপাস্যদেবতার প্রতি ভক্তিমিশ্রিত প্রেম। কিন্তু মালাধরের চিত্রিত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের একজন করিয়া দেখিয়াছেন। এখানে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাতে মান-অভিমান, ক্রোধ প্রভৃতি সবই আছে। সর্ব্বোপরি উভয় পক্ষের প্রেমের আদান-প্রদান আছে। শ্রীকৃষ্ণ নৌকা-খণ্ডে গোপীগণকে যমুনা পার করিতে গেলে নৌকা ডুবিবার মত হইল। তখন গোপীগণ ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিপদ উদ্ধার করিতে পারিলে নানারূপ পুরস্কারের লোভ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান"। ইহাতে শ্রীরাধিকা অবশ্য ক্রোধের অভিনয় করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, —"কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই। নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই।"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। ইহা মধুর রসের অপূর্ব্ব বিকাশ বলিয়া সমালোচকগণ স্বীকার করিয়াছেন। তবুও বলিতে হয় মালাধর বসুর ন্যায় অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ প্রেম-লীলার যে অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে ভগবদভক্তি মিশ্রিত ভক্তির আকুলতা ও আধ্যাত্মিক ভাবের অন্তর্নিহিত প্রবাহ থাকিলেও বহিরঙ্গের প্রকাশ অনেক স্থলে তত সুরুচির পরিচায়ক নহে।

কবি মালাধর বসু ঐশ্বর্য্যভাবের দ্যোতক শ্রীকৃষ্ণকে অতি সূক্ষ্মভাবে অল্প কথায় মাধুর্য্যরসের আধার করিয়াছেন। ইহাতেই মহাপ্রভু মালাধর বসু ও তাঁহার ভাগবতের উপর অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। মালাধরের ভাগবতের অনুবাদের একস্থানে আছে "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"। (পাঠান্তর "বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ")। এই "প্রাণনাথ" কথাটি কান্তাভাবের দ্যোতক বলিয়া মহাপ্রভু মালাধরের উপর এত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি মালাধরের পুত্র (মতান্তরে পৌত্র) রামানন্দ বসুকে (সম্ভবতঃ ইনিই সত্যরাজ খান) তাঁহার পার্ষদ করিয়াছিলেন এবং মালাধর ও তাঁহার ভাগবত সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথের রথ টানিবার "পট্টডোরীর যজমান" বা নির্ম্মাণকারীরূপে রামানন্দ বসু ও তৎপরিবারবর্গকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। নীলাচলযাত্রী ভক্ত বৈষ্ণবগণ কুলীনগ্রাম হইয়া বসু-

পরিবার হইতে এই "পট্টডোরী" নিয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীক্ষেত্রে গমন করিত। শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশে কুলীনগ্রামের বসুপরিবার এই পট্টডোরী বা "রেশমের দড়ি" নির্ম্মাণের ভার পাইয়া কৃতার্থ হন।

সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর কয়েক বৎসর মধ্যেই কবি মালাধর বসু দেহত্যাগ করেন।

মালাধর বসুর রচনা।

কংস বধ। মেঘমল্লার রাগ।

"কংসের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল।
সবাকে মারিতে দুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল॥
এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে।
যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংস নৃপবরে॥
কৃষ্ণ দেখি কংস রাজা সত্বরে উঠিল।
সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল॥
খাণ্ডা বাহিয়ে যুঝয়ে নৃপবর।
মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাঁপে গদাধর॥
বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি।
ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লইল শ্রীহরি॥
মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা ভূমের উপর।
লাফ দিয়া বুকে তার বসিল গদাধর॥
সংসারের ভর হৈল সকল শরীরে।
সেই ভরে মরিল রাজা দুষ্ট কংসাসুরে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, মালাধর বসু।

(২) মাধবাচার্য্য

কবি মাধবাচার্য্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্কে শ্যালক এবং তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ছাত্রও বটেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নামেই তিনি তাঁহার ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদখানি উৎসর্গ করেন। মাধবাচার্য্য খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল"। অনেক ভক্ত কবিই ভাগবতের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদগুলির মধ্যে মাধবাচার্য্যের অনুবাদখানি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। কবি রচনাতে সংস্কৃত ভাগবত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও ঐশ্বর্য্যভাবের প্রকাশেই অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের রচনা প্রাঞ্জল ও ভক্তিরসমধুর।

গোচারণের মাঠে ধেনুক বধের পূর্ব্বে ও পরে
ব্রজবালকগণ।

"শিশু সঙ্গে রঙ্গে মজিল চিত।
চরণে চলিল পাল চারিভিত॥
পালটি চাহি নাহি এক গাই।
দণ্ডপাণি রণে চাহি বেড়াই॥
গোঠের মাঝে রহি বনমালী।
আয় আয় ডাকে ধবলী কালী॥ ধ্রু॥

*　　*　　*　　*

দ্বিজ মাধব কহে বালকেলি।
চৈতন্য ঠাকুর রসগুণশালী॥

*　　*　　*　　*

এই সব কুতূহলে শ্রমযুত হৈয়া।
বৃক্ষতলে বলভদ্র থাকেন শুতিয়া॥
এক বালকের ঊরু করিয়া শিয়র।
আপনে চরণ চাপে নন্দের সুন্দর॥
জনে জনে ব্রজশিশু সব বিদ্যমানে।
কুসুমে রচিত করে লৈয়া ধেনুগণে॥
তবে তাহা সভা লৈয়া দেব গোবিন্দাই।
নবীন পল্লবশয্যা রচিল তথাই॥
শয়ন করিল প্রভু ব্রজবাল-সঙ্গে।
কেহ কেহ চরণ জাতিছে রঙ্গে রঙ্গে॥

*　　*　　*　　*

ধেনুক বধিয়া হলধরে।
তাল খাওয়াইল সব সহচরে॥
দিবস বুঝিয়া অবসানে।
চলিলা বালক রামকানে॥

যত্নচান্দ চাঁচর-কুন্তল শ্যামতনু।
বদন প্রসন্ন হসিত মন্দবেণু॥
সঙ্গে সব শিশু পশুগণ।
আগে আগে চালাএ গোধন॥
ঘন শিঙ্গা পুরে জনে জন।
নৃত্যগীত বরজ মিলন॥
গোঠে হইতে আইল বনমালী।
শুনিঞা গোপিনী উতরোলী॥
ধাওত সব গোপীগণ।
পিয়রূপ বিরহ-মোচন॥
প্রেমে জননী আলিঙ্গনে।
করাইল স্নান-ভোজনে॥
আনন্দে গোবিন্দ নন্দবাসে।
দ্বিজ মাধব রস ভাষে॥"

— মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল।

(৩) শঙ্কর কবিচন্দ্র

কবিচন্দ্র নামধেয় কোন কবি রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অংশ-বিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। "কবিচন্দ্র" নাম নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা উপাধি। কবির প্রকৃত নাম শঙ্কর। শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্বন্ধে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদক কবিগণের আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কবি শঙ্কর সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকাল ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ ও মৃত্যুবয়স ১৭১২ খৃষ্টাব্দ সুতরাং তিনি ১১৬ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কবিচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারত রচনার ন্যায় ভাগবত রচনা করিয়াও বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কবির অনূদিত ভাগবতের নাম "গোবিন্দ-মঙ্গল"। কবিচন্দ্রের ভাগবতের প্রসিদ্ধি এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাধিক। কবির সম্পূর্ণ ভাগবতখানা পাওয়া যায় নাই। তবে বিচ্ছিন্নভাবে নানা অংশ পাওয়া গিয়াছে। এই অংশগুলি স্বতন্ত্রভাবে জন-সমাজে পরিচিত হইলেও ইহারা মূল পুথিরই অন্তর্গত। কবির অধিকাংশ পুথি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ার গ্রাম এবং তৎসন্নিহিত স্থানগুলিতে পাওয়া যাওয়াতে মনে হয় ভাগবতের এই সব উপাখ্যানগুলি এক কবিচন্দ্রেরই রচনা।

বিশেষতঃ ভণিতা সব পুথিতেই একই প্রকার। যথা, "ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়" "গোবিন্দমঙ্গল কবিচন্দ্রের বিরচন" ইত্যাদি। পাকুড়ের রাজা পৃথ্বিচন্দ্রের "গৌরীমঙ্গল" কাব্যের ভূমিকায় কবিচন্দ্রের "গোবিন্দমঙ্গল" নামক ভাগবতের উল্লেখ আছে এবং "কবিচন্দ্র" যে উপাধি তাহাও লিখিত আছে। কবিচন্দ্রের ভাগবত রচনা যে খুব সরস হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাবও যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে। শঙ্কর কবিচন্দ্রের "গোবিন্দমঙ্গলে" শ্রীরাধিকার নামোল্লেখ তো আছেই, তাহা ছাড়া শ্রীরাধিকাকে অবলম্বন করিয়া মধুর রস প্রচারের চেষ্টাও পুথির স্থানে স্থানে আছে। কবি ব্যাসের আদেশে ভাগবত রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পালার শেষে সেই সেই স্কন্ধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকা

"রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার।
রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার॥
কাজলে মিশিল যেন নব-গোরচনা।
নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচাসোনা॥
কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম।
কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপাম॥
পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে।
কালিন্দীর জলে যেন শশধর দোলে॥"

—কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল।

রুক্মিণীর রূপ

"সখীর ধরিয়া কর রুক্মিণী বাহ্যায়।
রুক্মিণী দেখিয়া সভে অতি মোহ পায়॥
কি কব রূপের সীমা ভুবনমোহিনী।
সিংহ-মধ্যা বিম্ব-ওষ্ঠী বিদ্যুৎ-বরণী॥
চাঁচর চিকুরে দিব্য বান্ধিয়াছে খোঁপা।
মল্লিকা মালতী বেড়া পৃষ্ঠে পেলে ঝাঁপা॥
কপালে সিন্দুর-বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলধর-কোলে যেন চাঁদ দিল দেখা॥

নয়নে কাজল কামভুরু চাপ বাণে।
চাহিয়া চেতন হরে কে বাঁচে পরাণে॥
চরণে যাবক রেখা বাজন নূপুর।
চলিতে পঞ্চম গতি বাজে সুমধুর॥"

—কবিচন্দ্রের "গোবিন্দমঙ্গল"।

(৪) কৃষ্ণদাস

(লাউড়িয়া)

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত বৈষ্ণব ভক্তকবি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র (?) এবং ইঁহারা প্রথমে শ্রীহট্ট লাউড়ের অধিবাসী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে (নদীয়া) বসতি স্থাপন করেন। কৃষ্ণদাস তৎপিতা অদ্বৈতাচার্য্যের এক জীবনী রচনা করেন। ইহাতে অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যজীবন বর্ণিত আছে। পুথিখানির নাম "বাল্যলীলা সূত্র"। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাগবতের সারসংগ্রহ করিয়া একখানি ভাগবত রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থখানির নাম "বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী"। বিষ্ণুপুরী রচিত "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই হিসাবে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে। ইহা সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ মাত্র। কৃষ্ণদাসের মাতার নাম সীতাদেবী এবং বিমাতা শ্রীদেবী। অদ্বৈত প্রভুর ও সীতাদেবীর পাঁচপুত্রের মধ্যে কৃষ্ণদাস সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহা ছাড়া শ্রীদেবীর গর্ভেও এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম শ্যামাদাস।

(৫) রঘুনাথ পণ্ডিত (ভাগবতাচার্য্য)

রঘুনাথ পণ্ডিত খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (রচনাকাল ১৫১০-১৫১৫ খৃঃ) ভাগবতের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরম বৈষ্ণব গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ "ভাগবতাচার্য্য" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই গদাধর পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের সহযোগে জয়ানন্দকে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করিতে আদেশ করেন। রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবত বেশ হৃদয়গ্রাহী রচনা। পুথিখানি খণ্ডিত হইলেও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি

মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিকর্ণপুরের "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা"ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবতাচার্য্যের এই অনুবাদখানি ও তাহার রচয়িতার উল্লেখ আছে। রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্যের এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"। "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা"য় আছে—

"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥"

এই অনুবাদ গ্রন্থখানি রচনাপারিপাট্যে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদে বৃন্দাবনের অবস্থা।
"বেণুনাদে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতিসুত তেজিয়া সেবয়ে যদুমণি॥
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত দয়া।
হেন প্রভু বিহরে গোপালরূপ হঞা॥
কুন্দকুসুমদাম সুললিত বেশ।
ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষীকেশ॥
যখনে তোমার পুত্র করিয়া বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার॥
যখনে মলয় বায়ু বহে সুশীতল।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায়॥
এই গোপী-গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেম ভক্তি বাঢ়ে তার পুণ্য দিনে দিনে॥
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম-তরঙ্গিণী॥"
—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী।

(৬) সনাতন চক্রবর্ত্তী

কবি সনাতন চক্রবর্ত্তীর ভাগবতের অনুবাদের কাল ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ। এই অনুবাদখানি বঙ্গবাসী প্রেস হইতে আংশিক মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহাতে

আওরঙ্গজেব ও সুজার যুদ্ধ সময়ে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানির উল্লেখ উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন,— "ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবশ্যই বহুসংখ্যক কবিই রচনা করিয়াছেন। জয়ানন্দের ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "কৃষ্ণমঙ্গল" প্রভৃতি এই স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে কাশীদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাসের ভাগবতানুবাদের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।" —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৭২—৪৭৩, ৬ষ্ঠ সং।

(৭) অভিরাম গোস্বামী (দাস)

ভাগবতের কবি অভিরামের গ্রন্থখানির নাম "গোবিন্দ-বিজয়" এবং গ্রন্থকর্ত্তার উপাধি "দাস"। যথা,—

"গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানে।
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দাস ভণে॥"

—ভণিতা, গোবিন্দ-বিজয়, অভিরাম দাস।

ভণিতায় সর্ব্বদা এই দুই ছত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এই অভিরাম দাস ও অভিরাম গোস্বামী এক ব্যক্তি কি না তাহা বিবেচ্য। বৈষ্ণবরীতি অনুযায়ী অভিরাম গোস্বামী "দাস" উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। অভিরাম গোস্বামী সুপ্রসিদ্ধ "চৈতন্য-মঙ্গল" প্রণেতা কবি জয়ানন্দের মন্ত্রগুরু ছিলেন। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদে জয়ানন্দের জন্ম হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং জয়ানন্দের গুরু অভিরাম গোস্বামী খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। একেবারে খৃঃ ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহার জীবদ্দশা ধার্য্য করা নিরাপদ নহে। অথচ ভাগবতের কবি হিসাবে অভিরাম দাসকে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, আমাদের মনে হয় অভিরাম দাস ও অভিরাম গোস্বামী একই ব্যক্তি এবং তিনি ভাগবত অনুবাদ করিয়াছিলেন ও কবি জয়ানন্দের মন্ত্রগুরু ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ এবং খৃঃ ১৭শ শতাব্দী নহে। মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমানন্দের (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) রাজিব ও অভিরাম নামে দুই পুত্র ছিল। এই অভিরাম দাস শাক্ত কবির পুত্র এবং এই ব্যক্তি সম্বন্ধেও কোন সংবাদ জানা না থাকাতে ইঁহাকে ভাগবতের কবি

অভিরাম দাস বলিয়া সাব্যস্ত করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ প্রাপ্ত পুথির নকল দুইশত বৎসরের পুরাতন হইলে কবি স্বয়ং আরও একশত বৎসরের পুরাতন হওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমানক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবি ভাগবত অনুবাদ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। অবশ্য সবই আমাদের অনুমান ছাড়া কিছু নহে।

গোচারণের মাঠে দাবাগ্নি-ভীত গোপবালকগণ।

"কি জানে বনের পশু পীরিতি কি বুঝে।
তবে কেনে তোমার পীরিতে মন মজে॥
হের দেখ ধেনু সব বাচ্ছা লঞা কোলে।
তোমা পানে চাঞা সব কান্দিছে আকুলে॥
হের দেখ বন-জন্তু উভমুখ হঞা।
কান্দিছে সকল পশু তোমার মুখ চাঞা॥
মরি মরি কানুভাই তারে নাঞি যাই।
মইলে তোমার লাগ পাছে নাঞি পাই॥
অনেক জনম তপ কর্যাছিলু দেখি।
তোমা হেন ঠাকুর পাইল এই তার সাখী॥
যে হৌক সে হৌক কৃষ্ণ আমা সভাকার।
তুমি মেনে প্রাণ লঞা যাহ আপনার॥
নন্দ-যশোদার প্রাণ গোকুলের চান্দা।
সভাকার প্রাণ তোমার ঠাঞি বান্ধা॥
বলিতে বলিতে কানু আইলা নিকট।
তরাসে ব্রজ-শিশু করে ছটফট॥
শিশুর কাতর দেখি কমললোচন।
লাফ দিয়া ঝাঁপ দিল অনলে তখন॥"

—অভিরাম দাসের গোবিন্দ-বিজয়।

(৮) কৃষ্ণদাস (কাশীরামের ভ্রাতা)

কবি কৃষ্ণদাস (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ) মহাভারতের প্রসিদ্ধ অনুবাদক কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণদাস, কাশী দাস ও গদাধর দাস। কৃষ্ণদাসের

ভাগবতের নাম "শ্রীকৃষ্ণবিলাস"।[১] কৃষ্ণদাসের গুরু আজীবন ব্রহ্মচারী গোপাল দাস নামক জনৈক সাধু ব্যক্তি ছিলেন। পরমবৈষ্ণব ও ধার্ম্মিক কৃষ্ণদাসের গুরুদত্ত নাম "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।" যথা—

"সেইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা।
আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞা॥" —শ্রীকৃষ্ণবিলাস।

কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের "জগন্নাথ-মঙ্গলে" আছে :—

"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥" —জগন্নাথ-মঙ্গল।

কৃষ্ণদাস তাঁহার অনূদিত ভাগবত-গ্রন্থের ভণিতায় অনেক স্থলে "কৃষ্ণকিঙ্কর" নাম ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচনা সরল ও মধুর।

(৯) শ্যামাদাস

শ্যামাদাসের উপাধি "অধিকারী" এবং জাতিতে কায়স্থ। এই কবি "দুঃখী শ্যামাদাস" নামে পরিচিত। মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী হরিহরপুর গ্রাম কবির জন্মস্থান। বৈষ্ণব শ্যামাদাস জাতিতে কায়স্থ হইলেও তাঁহার বংশধরগণ বৈষ্ণব সমাজে গুরুগিরি ব্যবসা করিয়া থাকেন। কবি শ্যামাদাসের কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। কবির পুথিখানির নাম "গোবিন্দ-মঙ্গল"। কবির রচনার স্থানে স্থানে অনুপ্রাসবাহুল্য থাকিলেও সুখপাঠ্য। যথা,—

কালীয়দমনে চেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ।

(ক) "গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল।
ঠেলিয়া ফেলিল যত ভুজঙ্গম-জাল॥
কেবল কুলিশ-অঙ্গ কমল-লোচন।
শরীর বাড়িল ছিণ্ডি পড়ে নাগগণ॥
কালিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে।
অনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ-কলেবরে॥
অমিয়-সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়।
বজ্র-অঙ্গ ঠেকি দন্ত খণ্ড খণ্ড হয়॥

(১) কৃষ্ণদাসের "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" গ্রন্থের আবিষ্কারক রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয়। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭ সন, ৪র্থ সংখ্যায় এই সম্বন্ধে উক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কালির বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে।
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে॥"

—দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দ-মঙ্গল।

(খ) কবি শ্যামাদাস-রচিত "শ্রীরাধিকার বারমাস্যা"তে শ্রীরাধার বিরহ ব্যথার সুন্দর প্রকাশে কবির কৃতিত্ব সূচিত হইয়াছে। যথা,—

শ্রীরাধিকার বারমাস্যা

"ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায়॥
উদ্ধব, ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥" ইত্যাদি।

—দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দ-মঙ্গল।

(১০) কবি পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ

কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহের প্রথম পুত্র রাজা নরনারায়ণ ও দ্বিতীয় পুত্র শুক্লধ্বজ (নরনারায়ণের সেনাপতি)। রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৫-১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। নরনারায়ণ গৌড়ের রাজসভা হইতে কবি পীতাম্বরকে আনয়ন করেন। তাঁহার সভাসদ কবি পীতাম্বর খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসুর প্রায় একশত বৎসর পরে ভাগবতের দশম স্কন্ধের একখানি সুন্দর অনুবাদ রচনা করেন। ভাগবতের প্রথম অনুবাদক রাঢ়ের মালাধর বসুর গ্রন্থ রচনার প্রায় একশত বৎসর পরে কোচবিহার রাজ্যে রাজা নরনারায়ণের সময় বিশেষ করিয়া সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি অনুবাদের খুব উৎসাহ দেখিয়া মনে হয় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বপ্রান্তে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। কোচবিহার প্রথমে কামরূপ রাজ্যের অধীন থাকিয়া ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করে এবং পরবর্ত্তীকালে ইংরাজরাজের করদরাজ্যে পরিণত হয়। ইহার ফলে কামতা ও কামরূপদেশীয় বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কোচবিহার অঞ্চলে বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। ক্রমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এই

অঞ্চলের বাঙ্গালা ভাষাকে প্রভাবিত করে। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় ভাষার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও এই উপলক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১১) রামকান্ত দ্বিজ

ভাগবতের কবি মৈত্রকুলোদ্ভব দ্বিজ রামকান্ত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি হইতে পারেন। কবির আদি নিবাস রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামে এবং পরবর্ত্তী বাস রঙ্গপুর জেলার ব্রাহ্মণীপুণ্ডা গ্রামে ছিল। কবি ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ ভাগবত গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা নাই। রঙ্গপুরের হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় পুথিখানার সংগ্রাহক।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে গোপীগণের আত্ম-বিস্মৃতি।

"উন্মত্ত হৈয়া গোপী পুছে গোপীগণে।
তোরা কি দেখ্যাছ যাইতে নন্দের নন্দনে॥
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপ।
আমাকে কহিবে তুমি করিয়া স্বরূপ॥
শুনহ অশ্বত্থ বট কহ সাবধানে।
প্রাণহরি নন্দসুত গেলা এহি বনে॥
কহ কুরুবক তরু পলাশ অশোক।
কহরে কেতকীগণ কহরে চম্পক॥
গোপীগণ পুছে তোরা দেখেছ এ পথে।
বলরাম অগ্রজ সহজে অনুমতে॥
নারীদর্প হরে তার এহি সে বড়াই।
সহজেই শিশুবুদ্ধি চপল কানাই॥
* * * *
এহি মতে তরুলতা পুছিয়া বেড়ায়।
বৃন্দাবনে ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায়॥
ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কতজন॥
কত কত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে।
গোপীগণ যেই যেই লীলারূপ ধরে॥

রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়।
শুনিলে দুরিত খণ্ডে হরে ভব ভয়॥
গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত।
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত॥"

—রামকান্ত দ্বিজ রচিত ভাগবতের দশম স্কন্ধ।

(১২) গৌরাঙ্গ দাস

কবি গৌরাঙ্গ দাস সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইনি যে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের ব্যক্তি তাহা নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। এই কবি রচিত ভাগবতের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানির হস্তলিপি ১৬৯০ শক অর্থাৎ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের। সুতরাং ভাষা দেখিয়া গৌরাঙ্গ দাসকে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ অথবা খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলা যাইতে পারে। কবির রচনা ভাল এবং বর্ণনা বেশ স্পষ্ট।

মউরধ্বজের পালা।

নারদ মুনিকে শ্রীকৃষ্ণ-দান করিয়া সত্যভামার আক্ষেপ।

"ঘন উঠে ঘন পড়ে বাতুলের প্রায়।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহায়॥
না চাহিয়ে ব্রত না চাহিয়ে ফল তার।
বাহুড়িয়া প্রাণনাথ দেহত আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্যভ্রষ্ট হৈলে।
সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলে॥
এখনে বলিলে ব্রতে নাই প্রয়োজন।
দান লৈয়া ফির্যা দিব কিসের কারণ॥
তবে সত্যভামা দেবী কি কর্ম্ম করিল।
রুক্মিণী দেবীর কাছে উপনীত হৈল॥
প্রকার বিশেষ করি কহিল লক্ষ্মীকে।
সত্বরে চলিয়া আইলা গোবিন্দ-সম্মুখে॥
জানিঞা রুক্মিণী দেবী তথায় আইল।
সত্যভামার তরে তবে অনেক ভর্ৎসিল॥
লক্ষ্মী সত্যভামা হরি তিনজনে দেখা।
কত মায়া জান প্রভু অর্জ্জুনের সখা॥

ক্ষণেক অন্তরে প্রভু দূর কৈলে মায়া।
মায়া ত্যাগ কৈলে প্রভু রুক্মিণী দেখিয়া॥" ইত্যাদি।

– গৌরাঙ্গ দাসের ভাগবত।

(১৩) নরহরি দাস (সরকার)

প্রসিদ্ধ নরহরি দাস সম্ভবতঃ খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৪৭৮-১৫৪০ খৃঃ) ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কবিরচিত একখানি ভাগবতের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১২। কবি নরহরি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য বিষয়ক পদ প্রথম রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি পদকর্ত্তাও বটেন। ভাগবতের পুথিখানির নাম "কেশব-মঙ্গল"। কবির বর্ণনা বেশ বাস্তব ও জীবন্ত। কবি অঙ্কিত রুক্মিণী দেবীর কৃষ্ণ অনুরাগ, গোপশিশুগণের চিত্র এবং ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

ঋতুবর্ণনা।

* * *

"নিদাঘ হইল গত বরিষা আইসে॥
রবিকর-তাপেতে তাপিত অষ্টমাস।
তাপ দূরে গেল হৈল মেঘের প্রকাশ॥
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জ্জন।
দমকে দামিনী ঝুরঝুর বরিষণ॥
ধারাধর-বরিষণে ধরা ভেল সুখী।
সন্তোষে সর্ব্বথা নৃত্য করে সব শিখী॥
কলকল করি ভেক করি কোলাহল।
বেদ-গান-বক্তা যেন বিদ্বান সকল॥
তরুলতা তাপেতে তাপিত ছিল দৈন্য।
পুনঃ প্রীতি পাইল পল্লব পরিপূর্ণ॥
মৃত্তিকা হইতে উঠিল বহু তৃণ।
ব্যাপক হইয়া নিবারিল পদচিহ্ন॥
পুরিল তরাগ কূপ দিঘী সরোবর।
নদ-নদীগণ স্রোত বহে খরতর॥" ইত্যাদি।

—নরহরি দাসের কেশব-মঙ্গল।

(১৪) কবিশেখর

(দৈবকীনন্দন)

দৈবকীনন্দনের পদবী "সিংহ" এবং উপাধি "কবিশেখর"। কবি দৈবকীনন্দনের পিতার নাম চতুর্ভুজ ও মাতার নাম হরাবতী। যথা,—

"সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি।"

—গোপাল-বিজয়, দৈবকীনন্দন।

দৈবকীনন্দন মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং পদকর্ত্তা হিসাবেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা.—১) গোপালচরিত (মহাকাব্য) (২) কীর্ত্তনামৃত (সঙ্গীতমালা), (৩) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল অথবা গোপাল-বিজয় পাঁচালী (ভাগবতের অনুবাদ) ও (৪) গোপীনাথ-বিজয় (নাটক)। কবিশেখরের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে আছে, "গোপাল-বিজয় কথা শুনিতে মধুর।" সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" ও "গোপাল-বিজয়" একই গ্রন্থ। গোপাল-বিজয়ে ভাগবত-বহির্ভূত নানারূপ কাহিনী রচনা করিয়াছেন বলিয়া কবি স্বীকার করিয়াছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। কবি জানাইতেছেন,—

"আর একখানি দোষ না লবে আমার।
পুরাণের অতিরেক লিখিব অপার॥
অবিচারে আমারে না দিও দোষ-ভার।
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার॥"

—গোপাল-বিজয়, দৈবকীনন্দন।

"গোপাল-বিজয়" কবির প্রশংসনীয় রচনা। "গোপাল-বিজয়ের" একখানির পুথির তারিখ ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খৃঃ রহিয়াছে। কবি-রচিত শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল অর্থাৎ গোপাল-বিজয়ের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণের বিলাপ।

"প্রাণ পাইল করি পদচিহ্ন ভালে।
দেখিতে না দেখে কেহো লোহের হিল্লোলে॥

কৃষ্ণ-পদচিহ্ন ভালে সব গোপীজনে।
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে॥
সে হেন কেশের রাশি ধূলায় ধূসরে।
গাএর বসন কেহো ভালে না সম্বরে॥
সেই চরণের চিহ্ন কৃষ্ণ হেন মানি।
বিরহে বিদহে গোপী বলে চাটুবাণী॥"

—শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, কবিশেখর।

(খ) গোপাল-বিজয়।

কংস-বধকারী শ্রীকৃষ্ণ। ফলশ্রুতি।

"কথায় হাতের শঙ্খ দর্পণেতে দেখি।
কংসের কথা শুনিলে আনের কথা লেখি॥
আর কি কহিব যার বধের কারণ।
অজ হঞা গর্ভবাস কৈল নারায়ণ॥
গোপাল-বিজয় নর শুন মনোহরে।
বিনি নায়ে পার হবে সংসার-সাগরে॥
কহে কবিশেখর সংসার পরিহরি।
মথুরার লোক দেখে আপন আঁখি ভরি॥"

গোপাল-বিজয়, দৈবকীনন্দন।

একস্থানে 'কবিশেখর' স্থানে ভণিতায় "রায়শেখরও" দেখা যায়।

(১৫) হরিদাস

কবি হরিদাস রচিত ভাগবতের আংশিক অনুবাদের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। কবি সম্বন্ধে আমরা কিছু অবগত নহি। তবে রচনা দৃষ্টে কবি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম কি মধ্য-ভাগের কবি বলিয়া মনে হয়। কবির ভাগবতের নাম "মুকুন্দ-মঙ্গল"। কবির বর্ণনাপ্রিয়তা লক্ষণীয়। নিম্নে কয়েক ছত্র উদাহরণ দেওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ ও গোধনসহ বনযাত্রা। বনে
শ্রীকৃষ্ণের সাজসজ্জা।

"নানা ফুল ফুটিয়া আছএ বৃন্দাবনে।
তুলিয়া সভার বেশ করে শিশুগণে॥

মাএ পরাইল রত্ন মুকুতার হার।
আর কত আভরণ সুবর্ণবিকার॥
তাহার উপর পরম্পর শিশু মেলি।
নবীন পল্লব ফুল ফল তুলি তুলি॥
চূড়ায় চম্পক কেলি-কদম্বের কলি।
শ্রবণে পরিল সভে নবীন মঞ্জরী॥
নানা ফুলে গাঁথিঞা পরিল বনমালা।
মদনমোহন-রূপ বন কৈল আলা॥" ইত্যাদি।

—মুকুন্দ-মঙ্গল, হরিদাস।

(১৬) নরসিংহ দাস

প্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংস্কৃত "হংসদূত" রচনা করেন। ইহা ভাগবত অবলম্বনে রচিত হয় এবং কবি নরসিংহ দাস তাহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। নরসিংহ দাসের পরিচয় জানা না থাকিলেও তাঁহার রচনা কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর (সম্ভবতঃ শেষার্দ্ধ) বলিয়া স্থির হইয়াছে। কবির রচনা সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা।

"হেনকালে কোকিলের শব্দ আচম্বিতে।
শুনিঞা রাধিকা দেখি হইলা মূর্চ্ছিতে॥
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সখী আকুলিত হৈয়া।
কেহো জল আনি দিছে মুখেতে ঢালিয়া॥
রাধা রাধা করি কেহ ডাকে তার কাণে।
কেহ বলে রাইর বাহির হল্য প্রাণে॥
অগুরু চন্দন চুয়া দেখি সুশীতল।
পদ্মপত্রে করি কেহ আনি দেয় জল॥
ললিতা বসিলা তারে কোলেতে করিয়া।
কেহ বা দেখয়ে তার কণ্ঠে হাত দিয়া॥
ধিকি ধিকি করে কণ্ঠে শ্বাস মাত্র আছে।
কেহ বা বাতাস করে রয়্যা তার কাছে॥
সতত আছিলা রাই বিরহিণী হঞা।
কুকার্য্য করিনু মোরা বনেতে আসিয়া॥

একে সে নিকুঞ্জ তাতে কোকিলের ধ্বনি।
তাহাতে কেমনে প্রাণ ধরে বিরহিণী ॥"

—নরসিংহ দাসের হংসদূত।

(১৭) রাজারাম দত্ত

কবি রাজারাম দত্ত (সম্ভবতঃ ১৭ শতাব্দীর শেষভাগ) রচিত ভাগবতের অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। একখানি পুথি লেখার তারিখ ১৭০৭ শক অথবা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দে। পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে (কলিকাতা) রক্ষিত আছে। ১২৩৭ বাং সনে অথবা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত কবির অপর একখানি পুথি হইতে দণ্ডীরাজার কাহিনীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দণ্ডীরাজা ও উর্ব্বশীর কাহিনী।

"ভীমসেন জিজ্ঞাসিল শুন দণ্ডীরাজ।
আপন বৃত্তান্ত তুমি কহ কুন কায ॥
কৃষ্ণের সহিত তোমার বিসম্বাদ কেনে।
কি হেতু তোমারে ক্রোধ কৈল নারায়ণে ॥
শুনিয়া নৃপতি ভয়ে বলিল বচন।
আদ্যোপান্ত কহেন আপন বিবরণ ॥
প্রাণরক্ষা কর মোর শুন ভীমসেন।
মিথ্যা ক্রোধ আমারে করেন নারায়ণ ॥
রাজার বচন শুনি কহে বৃকোদর।
শুন দণ্ডীরাজা তুমি না করিহ ডর ॥
অভয় বচন রাজা দিলাম তোমারে।
কিছু ভয় না করিহ আমার গোচরে ॥
সুভদ্রা আমাতে কথা হইল সকল।
চিত্ত স্থির হয়্যা থাক না হয় বিকল ॥
ভীমের অভয় পায়্যা দণ্ডী যে কহিল।
শুনিয়া সুভদ্রা দেবী মহাতুষ্ট হৈল ॥
ভীমেরে সুভদ্রা দেবী নমস্কার কৈল।
সকল মর্য্যাদা আজি আমার রহিল ॥

ভীমেরে বহুত স্তুতি সুভদ্রা করিয়া।
আপনার পুরে গেল হরষিত হইয়া॥
শ্রীভাগবতের কথা অমৃত সমান।
রাজারাম দত্ত বলে শুনে পুণ্যবান্॥
শ্রদ্ধা করিয়া যেবা করএ শ্রবণ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাজন॥"

—রাজারাম দত্তের ভাগবত।

কবির সবিশেষ পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। কবির রচনা প্রাঞ্জল এবং ভণিতার ছত্র দুইটি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১৮) অচ্যুত দাস

কবি অচ্যুত দাস বা অচ্যুতানন্দ দাস খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর উড়িষ্যার কবিগণের অন্যতম ছিলেন। এই কবি উড়িষ্যাবাসী হইলেও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। এইরূপ অনুমান করিলে উড়িষ্যাবাসী এই কবি ও বাঙ্গালা ভাগবতের অন্যতম রচনাকারী অচ্যুত দাস হয়ত একই ব্যক্তি হইতে পারেন। এমতাবস্থায় ভাগবতের কবি অচ্যুত দাস খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর না হইয়া খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর কবি হইয়া পড়েন। অবশ্য দুইজন স্বতন্ত্র অচ্যুত দাসের অস্তিত্বও অসম্ভব নহে। সবই অনুমান মাত্র। শুনা যায় উড়িষ্যার অচ্যুতানন্দ দাস নিজেকে বুদ্ধদেবের পঞ্চশক্তির অন্যতম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদ্‌রচিত "শূন্য সংহিতায়" শত্রু দমনের জন্য বুদ্ধদেবের পুনর্জ্জন্মের কথার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। এই কথা সত্য হইলে বাঙ্গালাতে বুদ্ধদেব কৃষ্ণের অন্যতম অবতাররূপে গণ্য হওয়াতে বুদ্ধভক্ত কবির কৃত "কৃষ্ণ-লীলা" নামক ভাগবতের অনুবাদ দেখিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বৌদ্ধ "শূন্য" কথাটি বাঙ্গালা সাহিত্যে বুদ্ধনাম সহ কিছু পরিমাণে থাকিলেও সকল সময় উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক নহে। উহা শৈব হিন্দুমতের অন্তর্গত। অচ্যুত দাসের "কৃষ্ণ-লীলার" একখানি মাত্র খণ্ডিত পুথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনুমান খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল সুতরাং কবির কোন পরিচয়বিহীন এই খণ্ডিত পুথিখানির লেখক অপরে হইলে কবি খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর হইতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা

যখন শুনিল কৃষ্ণ যাব মথুরারে।
সেইক্ষণে সর্ব্ব সখী পড়িলু অন্তরে॥
করুণা করিঞা মোরা কান্দি জনে জনে।
কোন গোপী মূরছিঞা হয় অচেতনে॥
কোন গোপী ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ বলি কান্দে উভরায়॥
কোন গোপী বলে চল রহি গিয়া পথে।
ধরিঞা রাখিব কৃষ্ণ মথুরা যাইতে॥
কোন গোপী বলে তারে কেমনে রাখিব।
রথে চড়াইঞা কৃষ্ণ অক্রুরে লইঞা যাব॥
সেইত পাপিষ্ঠ অক্রুর কংশ-অনুচরে।
করুণা করিঞা সভে বলিব তাহারে॥
চরণে ধরিব তার লজ্জা তেয়াগিয়া।
দাসী হইলু তোমার মোরা যাহ কৃষ্ণ থুঞা॥
তবে যদি সেই কথা না শুনে অক্রুরে।
গলাতে কাটারি দিয়া মরিব সত্বরে॥
এইরূপে সর্বগোপী হৃদে করি মনে।
নিশি জাগরণ করি শ্রীকৃষ্ণ ধেয়ানে॥
এবেত সুসজ্জ হইঞা সর্ব্ব গোপনারী।
পথেত রহিল গিঞা এইত বিচারি॥
কহিল অচ্যুত দাস শুনহ গোপীনী।
নিজে মথুরার পথে যান চক্রপাণি।"

—ভাগবত, অচ্যুতদাস।

(১৯) গদাধর দাস

মহাভারতের প্রসিদ্ধ অনুবাদক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি গদাধর দাস "জগন্নাথ-মঙ্গল" বা "জগত-মঙ্গল" নামে একখানি ভাগবত ১০৫০ সালে অর্থাৎ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে রচনা শেষ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি স্বীয় বংশ-পরিচয় ও গ্রন্থবিবরণ যেরূপ দিয়াছেন তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

(ক) বংশ-পরিচয়

"ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রায়নী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥
তুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন।
তুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন॥
তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।
তাহাতে জন্মিল গুণ এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
অনু সুধাকর মধুরাম যে রাঘব॥
সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার।
ভূমেন্দু কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশী দাস ভক্তি ভগবানে।
রচিলা পাঁচালি ছন্দ ভারত-পুরাণে॥
জগত-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দিন গদাধর দাস॥"

—ভূমিকা, জগন্নাথ-মঙ্গল, গদাধর দাস।

(খ) গ্রন্থ-পরিচয়

"স্কন্দ-পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্ম-পুরাণের প্রভুর চরিত্র॥

না বুঝায় পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে।
তে কারণে রচিলাম পাঁচালির মতে ॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্ব্বজন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহ পঞ্চশতে।[১]
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে ॥
নরসিংহ নামে দেখ উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি ॥
জগন্নাথ-সেবা বিনে নাহি জানে আন।
(?) রাজ্য হরি রাজ্য প্রাণধন ॥
অনেক করিল কার্য্য প্রভু জগন্নাথ।
দুষ্টজন দলন দুঃখিত জন তাত ॥
পুত্রসম পালে প্রজা রাজ্য প্রজাগণ।
জিনিঞা চম্পকপুষ্প অঙ্গের বরণ ॥
রাজচক্রবর্ত্তী সেই উৎকলের পতি।
ধর্ম্ম-ন্যায় তোষণ করিল বসুমতী ॥
মহালয়া তাপি হয় বেরিজ সহর।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর ॥
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর।
বিশ্বেশ্বরের বাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িয়া পুরাণে।
শুনিয়া পুরাণ বড় ইৎসা হৈল মনে ॥
পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।
নাহি সন্ধি-জ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ ॥
আমি অতি মূঢ়মতি করিনু রচন।
ভাগবত-গ্রন্থ করে শ্রীহরি-কীর্ত্তন ॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে।
যদি বা অশুদ্ধ হরি-প্রসঙ্গ জানিবে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মযে করি আশ্রয়।
ভব আদি পাদ-পদ্ম মাগয় অভয় ॥

---

(১) ১৫৬৭ শক।

দীন হীন চাহি আমি সে পদ-শরণ।
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডুকের মন॥
সভে মাত্র ভরসা আছএ এক আর।
পতিত-পাবন দীনবন্ধু নাম যার॥
সেই নাম বিনে নাই আমার নিস্তার।
গদাধর করিয়াছে ভরসা যাহার॥
তার মনোরম্য অর্থ কষ্টেতে বিস্তার।
জগত-মঙ্গল কহে দাস গদাধর॥"

—জগন্নাথ-মঙ্গল (জগত-মঙ্গল), গদাধর দাস।

জগন্নাথ-মঙ্গলের রচনা কবিত্বপূর্ণ ও ভক্তিরসের আধার। শ্রীচৈতন্য বন্দনা।

"ধন্য শচী গুণবতী গুপ্তেতে কৌশল্যা মূর্ত্তি
অনসূয়া আকৃতি অদিতি।
দৈবকী দেবহুতি ধাৰ্ম্মিকা যশোমতী
রোহিণী রেণুকা সত্যবতী॥
ধন্য সে জঠর ধন্য যাহে বসে শ্রীচৈতন্য
ক্ষিতিতলে অঞ্জলি অঞ্জন।
তীর্থ হেম অতি আভা শশী কোটি মুখ-শোভা
বার বেলা পাষণ্ড-দলন॥
সঙ্গেতে অদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণব-প্রধান শম্ভু
সীতা ঠাকুরাণী হৈমবতী।
অজরূপে হরিদাস দেবঋষি শ্রীনিবাস
মুরারি ভূপতি রঘুপতি॥
সুন্দর গোপী আনন্দ গৌরীদাস ভবানন্দ
পুরুষোত্তম দাস অনুপাম।
ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত পরম শাস্ত্রেতে জ্ঞাত
সদা গোবিন্দের গুণগান॥
পুরহ কমলাকর পুরুষোত্তম মনোহর
বিনোদিয়া কালিয়া কানাই।
সংসার আছিল যত কৃষ্ণে ভক্তিহীন মৃত
বিষয়ী বিষয় মূৰ্ত্তিমান॥" ইত্যাদি।

—জগন্নাথ-মঙ্গল, গদাধর দাস।

(২০) দ্বিজ পরশুরাম

ভাগবতের অংশ বিশেষের অনুবাদক কবি দ্বিজ পরশুরামের পরিচয় অজ্ঞাত ও পুথি খণ্ডিত। রচনা দেখিয়া তাঁহাকে খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি মনে হয়। কবি পরশুরামের ভাগবতের "সুদামা-চরিত্র" হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই পুথির তারিখ বাং ১২৩১ সাল বা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ। এই কবি "ধ্রুব-চরিত্রও" রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুদামা আনিত ক্ষুদ ভক্ষণ।

(ক) "আহা আহা প্রিয় সখা লজ্জা কর কেনে।
বড় সন্তুষ্ট আমি এই উপায়নে॥
এত বলি কৃষ্ণ সুদামার ক্ষুদ লইয়া।
এক মুষ্টি খাইলা কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হৈয়া॥
আর এক মুষ্টি যেই লইলা খাইতে।
হেনকালে লক্ষ্মীদেবী ধরিলেন হাতে॥
যে খাইলে সেই ভাল না খাইও আর।
কতদিনে শুধা যাবে সুদামার ধার॥
বিপ্রের বিষম ধার বলিলাম তোমারে।
কতকাল খাটিব গিয়া সুদামার ঘরে॥
কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মীদেবী জানিছি সকল।
শুনেছ আমার নাম ভকত বৎসল॥
সুদামার ক্ষুদ প্রভু খাইলা নারায়ণ।
তবে ত সুদামা বিপ্র আনন্দিত মন॥
হরিষে শয়নে রহিলা কৃষ্ণের মন্দিরে।
অনুক্ষণ মনে ভাবেন দেব গদাধরে॥
দ্বিজ পরশুরামে গান পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার॥"

—ভাগবত, দ্বিজ পরশুরাম।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় ভক্ত সুদামার দারিদ্র্য মোচন।

"দুঃখিনী ব্রাহ্মণী হইল লক্ষ্মীর সমান।
তপস্যার ফলে দয়া কৈল ভগবান॥
সুবর্ণের ঘর দুয়ার সুবর্ণের পিড়া।
জরা মৃত্যু রোগ শোক কার নাহি পীড়া॥

এই সব বিশ্বকর্ম্মা করিয়া নির্ম্মাণ।
চারিদিকে চাহিয়া দেখে নিশি অবসান ॥
কোকিলের কলরব ডাকে কাকগণ।
বিপ্রের স্থান হইল যেন বৃন্দাবন ॥
লক্ষ্মীর আজ্ঞায় হইল সকলি নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহায় গেলা নিজ স্থান ॥
হেথা অন্তরে জানিয়া লক্ষ্মী করিল গমন।
চন্দ্রের কিরণ দেখি বিপ্রের ভবন ॥
একরূপে লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
আর রূপে রহিলেন বিপ্রের গৃহেতে ॥
ভবসিন্ধু মহাশয় কেমনে হব গতি।
দ্বিজ পরশুরাম গান গোবিন্দ ভকতি ॥"

—ভাগবত, দ্বিজ পরশুরাম।

(২১) শঙ্কর দাস

কবি শঙ্কর দাসের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ কবি ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবি শঙ্কর দাসের কাল আনুমানিক খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। কবি রচিত "দোল-লীলা" পাওয়া গিয়াছে। শঙ্কর দাসের রচনা দেখিয়া মনে হয় কবি বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন।

(ক) দোল-লীলা উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বেশ।

"স্বর্গ-গঙ্গাজল তবে ব্রহ্মাএ লইয়া।
কৃষ্ণকে করায় স্নান আনন্দিত হইয়া ॥
স্নানোদক শিরে দিল সর্ব্ব-দেবগণ।
কৃষ্ণেরে করায় সর্ব্ব অঙ্গ-মার্জ্জন ॥
ইন্দ্র পরায় তবে বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল অগুরুচন্দন ॥
চরণে নূপুর দিল রশনা কোমরে।
নানা রত্নে নিরমিত বলয় দুই করে ॥
ভুজযুগে তার দিল অতি মনোহর।
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে দেখিতে সুন্দর ॥

নানা রত্নে নিরমিত গজমতি হার।
আজানুলম্বিত দিল গলে বনমাল॥
ভালে গোরোচনা দিল দিব্য করি ফোটা।
নীল মেঘেতে যেন বিজলীর ছটা॥
মস্তকে মুকুট দিল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তুলনা দিবার নাহি তাহার সমান॥
শ্রীকৃষ্ণের বেশ কৈল দেব পুরন্দর।
মহেশ থুইল নাম দেবের ঈশ্বর॥"

—শঙ্কর দাসের ভাগবত, দোল-লীলা।

(খ) দোল-লীলা উপলক্ষে শ্রীরাধিকার বেশ।

"(তবে) আমলকী লইয়া কুন্তল ঘসিল॥
স্নান করে বিষ্ণুতৈল অঙ্গেত মাখিয়া।
কিশোরী করয়ে বেশ চিরুণী লইয়া॥
অগুরুচন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তূরী।
অঙ্গে অনুলেপন করেন পত্রাবলী॥
পায়ের অঙ্গুলির মধ্যে পিছিয়া পরিল।
কনক নূপুর দুই চরণেতে দিল॥
দিব্য বস্ত্র পরিলেন সকল রমণী।
তথির উপরে দিল কনক-কিঙ্কিণী॥
গজ-দন্ত-শঙ্খ দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণ-কঙ্কণ দিল তথির উপর॥
নানা রত্ন-নিরমিত বাজুবন্দ সাজে।
বিচিত্র নির্ম্মাণ তাড় দিল ভুজমাঝে॥
করের অঙ্গুলি মধ্যে রতন অঙ্গুরী।
হৃদয়ে পরিল সবে লক্ষের কাঁচুলি॥
কর্ণে কনকপাতা পরিল সুন্দর।
সাতলরী হার পরে অতি মনোহর॥
রজত কাঞ্চন গজ-মুকুতা প্রবাল।
গাঁথিয়া পরিল হার দিব্য রত্ন-মাল॥
নাসিকাতে নাক-স্বানা বিচিত্র গঠন।
শ্রবণে পরিল সভে স্বর্ণের ভূষণ॥

নয়ন খঞ্জনযুগে পরিল কজ্জল।
ললাটে সিন্দুর তার করিছে উজ্জ্বল॥
সিন্দূরের চারিদিকে চন্দন শোভয়।
সুধাকর মধ্যে যেন অরুণ উদয়॥
কাঞ্চন নির্ম্মিত শিরে মুকুট পরিল।
লক্ষের জাদ দিয়া কুণ্ডল বান্ধিল॥
নিতম্বে দোলয়ে বেণী দেখিয়ে সুন্দর।
বিচিত্র সুতলী দিল মস্তক উপর॥
করিল অঙ্গের বেশ সব ব্রজরামা।
ত্রিজগতে দিতে নাহি তাহার উপমা॥"

—শঙ্কর দাসের ভাগবত, দোল-লীলা।

(২২) জীবন চক্রবর্ত্তী

কবি জীবন চক্রবর্ত্তী ভাগবতের উপাখ্যানভাগের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবি-রচিত ভাগবতের নাম "কৃষ্ণ-মঙ্গল"। জীবন চক্রবর্ত্তীর পিতার নাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। বোধ হয় কবির কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। এই কবি রচিত প্রাপ্ত পুথির তারিখ বাং ১২০৩ (?) সাল বা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ। জীবন চক্রবর্ত্তীর রচনায় "বড়াই" বুড়ির উল্লেখ দেখা যায়। কবির রচনা ভাল। ইনি ভাগবতে উল্লিখিত "সুদামা-চরিত্র"ও রচনা করিয়াছিলেন।

(ক) নৌকা-খণ্ড

যমুনা-পার উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

"গোপীগণ দূরে চায় তরী দেখিবারে পায়
নায়্যা বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কেহ দেই করসান মনে হরষিত কান
তরী লইয়া আইলা তখন॥
কথো দূরে রাখি তরী গোপীর বদন হেরি
বলিতে লাগিলা কর্ণধার।

ডাকিলে কিসের তরে কেনে নাহি বল মোরে
কোথা ঘর কি নাম তোমার ॥
গোপী বলে শুন নায়্যা আমরা গোপের মায়্যা
ঘর মোর গোকুল-নগরে।
গিয়াছিলাঙ মধুপুরী দধি বেচা কেনা করি
পুনরপি সভে যাই ঘরে ॥
আপনার দান লেহ সভা পার করি দেহ
বিলম্ব না করহ কর্ণধার।
শুনিঞা গোপীর বাণী হাসিলা রসিক-মণি
বলিতে লাগিলা পুনর্ব্বার ॥
আমার বচন শুন মোরে ডাক কি কারণ
বিবরিয়া কহিবে সকল।
চক্রবর্ত্তী নারায়ণ তস্য পুত্র জীবন
রচিলেন শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥"

— শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, জীবন চক্রবর্ত্তী।

(খ) নৌকা-খণ্ড।

পুরাতন তরীতে যমুনা-পার করিতে শ্রীকৃষ্ণের আপত্তি
ও গোপীগণের দুশ্চিন্তা।

"শুনিঞা সকল গোপী যত যতজন।
চাতুরাই করি সভে ভাবে মনে মন ॥
ঠেকিল দানীর হাতে কিবা পুনর্ব্বার।
সেই মত যত কথা কহে কর্ণধার ॥
রূপ শোভা দেখি যেন নবীন যৌবন।
কেহ বলে নায়্যা কিবা করিল এমন ॥
অন্তর জানিঞা কেহ না করে প্রকাশ।
বড়াইরে কৈল গোপী হইল জাতি নাশ ॥
আজি কর্ণধার যদি নাই করে পার।
ভবনে গমন তবে না হইবে আর ॥" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, জীবন চক্রবর্ত্তী।

(গ) নৌকা-খণ্ড।

নৌকাতে রাই-কানুর কথাবার্ত্তা।

"পাএ ধরি কর্ণধার রাখ এইবার।
জাতিকুলশীল ছিল না রহিল আর॥
নায়্যা বলে শুন রাই আমার বচন।
সকল পাইবে আগে রাখহ জীবন॥
বসন ভূষণ রাখি ধর মোর করে।
যদি তরী ডুবে তবে ঝাঁপ দিব নীরে॥
তোমাকে করিব আমি সাঁতারিয়া পার।
উপায় না দেখি রাই ইহা বিনা আর॥
তবে যদি লাজ কর শুন বিনোদিনি।
আপনি বাহিয়া আন আমার তরণী॥
জলে ঝাঁপ দিয়া আমি পালাইয়া যাই।
তরণীর ভাল মন্দ তুমি জান রাই॥
বহু টাকা মোর লাগিয়াছে এই নায়।
তরণী ডুবিলে তুমি দিবে তার দায়॥"

—শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, জীবন চক্রবর্ত্তী।

(২৩) ভবানন্দ সেন

কবি ভবানন্দ সেন ভাগবতের আংশিক অনুবাদক। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উল্লিখিত (৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৪৭১-৪৭৩) ভাগবতের কবি দ্বিজ ভবানন্দ এবং তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে" উল্লিখিত কবি ভবানন্দ সেন একই ব্যক্তি কি না জানিতে পারা যায় নাই। কবি ভবানন্দ সেনের ভাগবত পুথির কাল বাং ১২১১ সাল অর্থাৎ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ। এই পুথির "ঘুঘু-চরিত্র" হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। সম্ভবতঃ কবি কর্ত্তৃক পুথি রচনার কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দী।

ঘুঘু-চরিত্র।

মথুরাতে বিরহী শ্রীকৃষ্ণের ঘুঘুর সহিত আলাপ।

"কহ কহ ওরে পক্ষ ব্রজের বারতা।
কেমনে আছেন মোর যশোমতী মাতা॥

কেমনে আছেন মোর পিতা নন্দ ঘোষ।
বিবরিয়া কহ পক্ষ চিত্তের সন্তোষ॥
ধবলী শ্যামলী মোর আর যে সিউলী।
কেমনে আছেন মোর রাধাচন্দ্রাবলী॥
কেমনে আছেন মোর সুবল আদি সখা।
কেমনে আছেন মোর ললিতা বিশাখা॥
পক্ষ বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন।
বিবরিয়া কি কহিব ব্রজের কথন॥
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
জীবন ছাড়িলে তনু কোন প্রয়োজন॥
মৃত তনু পড়্যা আছে যত গোপীগণ।
তব মাতা পিতা আছয়ে অন্ধ-সম॥
শাঙলী ধবলী গাই বহু ক্ষীরবতী।
তোমার বিহনে দুগ্ধ না দেয় একরতি॥
রাধিকার বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে ঘন কালা।
সতত তোমার নাম তাহার জপমালা॥
রাধিকার কিবা গুণা হইলা দেব হরি।
কি লাগিয়া তাহারে আইলা পরিহরি॥
ভবানন্দ সেন বলে প্রভু-পদতলে।
বৃন্দাবন ছাড়ি কেনে মথুরায় রহিলে॥"

—ঘুঘু-চরিত্র, ভবানন্দ সেন।

(২৪) উদ্ধবানন্দ

খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি উদ্ধবানন্দের ভাগবতানুবাদের নাম "রাধিকা-মঙ্গল"। সাধারণতঃ ভাগবতের কবিগণ "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" নামের প্রতি অত্যধিক রুচির পরিচয় দিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীরাধা নামের উল্লেখ নাই। সুতরাং কবি উদ্ধবানন্দের "রাধিকা-মঙ্গল" নামের ভিতর একটু নূতনত্ব আছে। এই ভাগবতখানি সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"য় (১৩০৩ সাল, ২২৫ পৃষ্ঠা) একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "রাধিকা-মঙ্গলের" শেষ কয়েকটি ছত্র এইরূপ।—

বালিকা শ্রীরাধার বেশ।

"কৃত্তিকা বলেন তবে বৃকভানু রাজে।
আভরণ দিব আমি যেখানে যা সাজে॥
কামিলা আনিয়া আভরণ সজ্জ কর।
কটিমাঝে পরাইব সোণার ঘুঙ্গুর॥
কামিলা আনিঞা রাজা আদেশ করিল।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আভরণ সজ্জ কৈল॥
আভরণ দিছে রাজা বহু যতন করি।
চাঁচর কেশে সোণার ঝাঁপা পিছে দোলে ঝুরি॥
সুন্দর সরল পদ্ম কত চিত্র তায়।
কনকের চুড়ি রাণী যতনে পরায়॥
চরণে ধরিয়া রাণী নূপুর পরায়।
বাহুতে ধরিয়া রাণী রাধারে নাচায়॥
বৃকভানু-পুরের লোক ডেকে ডেকে বলে।
গগন ছেড়্যা চান্দ কিবা ভূমি চলি ভুলে॥
বরণ-কিরণ এ রাইর যেন কাঁচা সোণা।
রাধিকা-মঙ্গল উদ্ধবানন্দের রচনা॥
অগাধ সমুদ্র লীলা কহনে না যায়।
এতদূরে রাধিকা-মঙ্গল হৈল সায়॥"

—রাধিকা-মঙ্গল, উদ্ধবানন্দ।

বলা বাহুল্য "রাধিকা-মঙ্গল" ভাগবতের সামান্য অংশের অনুবাদ মাত্র। কবি উদ্ধবানন্দ পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস হইলে ইনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ব্যক্তি এবং "পদকল্পতরু" নামক প্রসিদ্ধ পদসংগ্রাহক বৈষ্ণবদাসের বন্ধু কৃষ্ণকান্ত। উদ্ধবদাস বা কৃষ্ণকান্তের জন্মভূমি টেঞা (বৈদ্যপুর)।

(২৫) ঈশ্বরচন্দ্র সরকার

কবি ঈশ্বরচন্দ্র সরকার ভাগবতের কতকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অংশের নাম "প্রভাস-খণ্ড"। এই গ্রন্থের রচনাকাল খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। গ্রন্থখানি কলিকাতা বটতলার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা সাধারণ ও ইহাতে ভাষাগত আধুনিকতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

(ক) মথুরায় রজকের বিবরণ।

পূর্ব্ব-জন্মের কথা।

"রামের নিকটে রজক আইল তখন।
গলে বাস দিয়া বলে শুন নারায়ণ॥
আমি অতি দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমার কথায় হৈল জানকীর বন॥
কত অপরাধ কৈনু না যায় বর্ণন।
নিজহস্তে কর মম মস্তক ছেদন॥
পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি।
স্বহস্তে মস্তক ছেদ কর ধনুর্দ্ধারী॥
শ্রীরাম বলেন যদি বধিব তোমাকে।
নিন্দুকের অপরাধ ভুগিবেক কে॥
মম হস্তে দেহত্যাগ করে সেই জন।
অপরে গোলকে কিম্বা বৈকুণ্ঠে গমন॥
এই হেতু বলি তোমায় রজক-কুমার।
বর দিনু কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার॥
বর পেয়ে রজক-পুত্র অতি সমাদরে।
দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরা নগরে॥
বস্ত্র উপলক্ষ মাত্র শুনহ রাজন।
এই হেতু করিলেন রজক-নিধন॥
সংক্ষেপে কহিনু রাজা[১] শুন তত্ত্ব তার।
ঈশ্বরচন্দ্র রচিল রজক-উদ্ধার॥"

—ভাগবত, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

(খ) শঙ্খচূড়-বধ।

"শঙ্খচূড় বলে আমি দেখেছি নয়নে।
ঐ কাল শিশু বধেছে কৌবল[২]-জীবনে॥
ঐ কালশিশু হয়ে পর্ব্বত-আকার।
কৌবলের দন্ত ধরি করিল বিদার॥

---

(১) রাজা জন্মেজয়। রাজা জন্মেজয় ও মুনি বৈশম্পায়নের কথোপকথন হইতেছিল।

(২) কংসের হস্তী কুবলয়াপীড়।

স্বচক্ষে দেখেছি আমি শুনহে রাজন।
হস্তী বধি শিশুরূপ করেছে ধারণ॥
ঐ কালটি দুষ্টের শেষ শুন নরবর।
ঐ কালটি বধেছে তব কৌবল কুঞ্জর॥
অতি শান্ত দান্ত শিশু শ্বেতবর্ণ যিনি।
ঐ কালটি প্রায় দুষ্টের শিরোমণি॥
এই কথা শঙ্খচূড় বলিল যখন।
ক্রোধভরে বলেন তখন দেব নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন শুন ওরে শঙ্খচূড়।
মুষ্ট্যাঘাতে তোমার এবার দর্প করিব চূড়॥
ইহা বলি ক্রোধ-ভরে দেব গদাধর।
মুষ্ট্যাঘাত করে তার মস্তক উপর॥
পড়িল যে শঙ্খচূড় ভূতলে লোটায়।
শঙ্খচূড়-বধ-গীত সরকার গায়॥"

—ভাগবত, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

(২৬) রাধাকৃষ্ণ দাস

কবি রাধাকৃষ্ণ দাসের ভাগবতের নাম "দ্বারকা-বিলাস"। অনুমান হয় ইনি ভাগবতের কিছুটা অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ দাস সম্ভবতঃ খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি। ইনি "দাস" উপাধি গ্রহণ করিলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ত্রিপুরার "রাজমালায়" বঙ্গ-ভাষাকে "সুভাষা" বলা হইয়াছে। এই কবিও আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

"রাধকৃষ্ণ রাঙ্গা পায় বিক্রীত করিল কায়
মনে ভেবে যুগল-চরণ।
সেই রাধাকৃষ্ণ দাস এই দ্বারকা-বিলাস
সুভাষায় করিল রচন॥"

—ভাগবত, রাধাকৃষ্ণ দাস।

অপর এক স্থলে ভণিতায় কবি নিজকে "দাস" ও "দ্বিজ" উভয় আখ্যাই দিয়াছেন। যথা,—"হেন রূপে সখী সবে রঙ্গ আরম্ভিল।
রাধাকৃষ্ণ দাস দ্বিজ ভাষায় রচিল॥"

—ভাগবত, রাধাকৃষ্ণ দাস।

শুধু "দাস" ভণিতা এইরূপও আছে। যথা,—

"এত বলি মুনিরাজ হইল বিদায়।
দ্বারকা-বিলাস রাধাকৃষ্ণ দাসে গায়॥"

—ভাগবত, রাধাকৃষ্ণ দাস।

কবি রাধাকৃষ্ণ দাসের রচনা সুখপাঠ্য তবে কিছু অনুপ্রাস-বহুল।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে (বিবাহ উপলক্ষে)

রুক্মিণীর স্তব।

"দেবী রুক্মিণী দুঃখিনী হয়ে মনে।
বলে হে হরি হে মরি হে জীবনে॥
আমি কৃষ্ণ-প্রাণী সদা কৃষ্ণে মতি।
করুণা কর কিঞ্চিৎ দীন-পতি॥
তার বিপদে শ্রীপদে ভিক্ষা করি।
রাখ দাসীজনে দীন-বন্ধু হরি॥
জেনে অসীম মহিমা ও নামেতে।
প্রাণ সঁপেছি হে তোমার প্রেমেতে॥
নাহি অন্য গতি তোমা ভিন্ন হরি।
যদি না তার হে তবে প্রাণে মরি॥
হে শ্রীকান্ত নিতান্ত অধিনী বলে।
দেহ কৃপাবারি মনোদুঃখানলে॥
তোমা বিহনে স্বপনে নাহি জানি।
দুঃখে ত্রাহি মে ত্রাহি মে চক্রপাণি॥
শুনি ভক্তজনে তুমি হিতকারী।
ভাবি ভক্তিভাবে তার হে মুরারি॥
আমি নিশ্চিত বিক্রীত শ্রীপদেতে।
কর পূর্ণ আশা মরি দুর্গমেতে॥
কৃপাসিন্ধু তুমি পুরাণে শুনেছি।
যতনে চরণে শরণ লয়েছি॥
কর হিত উচিত হে বংশীধারী।
শরণাগত হে আমি যে তোমারি॥

রাধাকৃষ্ণ দাসে বিনয়েতে ভাষে।
হরি তার হে তার হে দীন দাসে ॥"

—ভাগবত, রাধাকৃষ্ণ দাস।

ভারতচন্দ্রের যুগের প্রভাব কবির উপর কিরূপ পড়িয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ছত্রগুলি পাঠেই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা,—

রুক্মিণীর রূপ-বর্ণনা।

"সাগরে মুক্তার স্থিতি শুনি গো শ্রবণে।
এবে কি করেছে বাস ইহার দশনে ॥
হেরে বুঝি কুচপদ্ম পদ্ম লাজ ভরে।
মন দুঃখে সদা থাকে সলিল ভিতরে ॥
চাঁচর চিবুক কিবা দেখি চমৎকার।
হেন জ্ঞান যেন নব মেঘের সঞ্চার ॥
কি কব কটির কথা আহা ম'রে যাই।
হেরে বুঝি লাজে সিংহ বনবাসী তাই ॥
ইহার নিতম্ব বুঝি করিয়া দর্শন।
খেদে ক্ষিতি মাটি হল হেন লয় মন ॥" ইত্যাদি।

—ভাগবত, রাধাকৃষ্ণ দাস।

(খ) অপর কতিপয় কবি

আমরা ভাগবতের যে কতিপয় কবির নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের ছাড়াও ভাগবতের অন্ততঃ আংশিক অনুবাদক আরও অনেক কবির নাম অবগত হওয়া যায়। ইহারা অনেকেই ভাগবতান্তর্গত নানা উপাখ্যানের অনুবাদক। এইরূপ কতিপয় কবির নাম এইস্থানে দেওয়া গেল। যথা,—

১। জয়ানন্দের ধ্রুব-চরিত্র ও প্রহ্লাদ-চরিত্র
২। দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ-চরিত্র
৩। নন্দরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল
৪। কবিবল্লভের গোপাল-বিজয়
৫। ভক্তরামের গোকুল-মঙ্গল
৬। দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের কৃষ্ণ-মঙ্গল
৭। নন্দরাম ঘোষের ভাগবত

৮। আদিত্যরামের ভাগবত
৯। দ্বিজ বাণীকণ্ঠের ভাগবত
১০। দামোদর দাসের ভাগবত
১১। যদুনন্দনের ভাগবত
১২। যশশ্চন্দ্রের ভাগবত
১৩। মাধব গুণাকরের হংসদূত
১৪। কৃষ্ণচন্দ্রের হংসদূত
১৫। সীতারাম দাসের প্রহ্লাদ-চরিত্র
১৬। মাধবের উদ্ধব-সংবাদ
১৭। রাম সরকারের উদ্ধব সংবাদ
১৮। রামতনুর উদ্ধব সংবাদ
১৯। গোবিন্দ দাসের সুদামা-চরিত্র
২০। পীতাম্বর সেনের উষাহরণ
২১। শ্রীকণ্ঠদেবের উষাহরণ
২২। কমলাকণ্ঠের মণিহরণ
২৩। রামতনু কবিরত্নের বস্ত্রহরণ
২৪। বিপ্র রূপরামের গুরু-দক্ষিণা
২৫। শ্যামলাল দত্তের গুরু-দক্ষিণা
২৬। অযোধ্যারামের গুরু-দক্ষিণা
২৭। শঙ্করাচার্য্যের গুরু-দক্ষিণা
২৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

উল্লিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশই খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

ত্রিংশ অধ্যায়

পদাবলী সাহিত্যের সূচনা

(ক) চণ্ডীদাস

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে ও বৈষ্ণব অংশে চণ্ডীদাসের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। সত্য বটে খৃ: ১২শ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি উমাপতি ধর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা বিষয়ক কতিপয় পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং একই সময়ে অন্যতম সভাকবি জয়দেব সংস্কৃতে তাঁহার প্রসিদ্ধ "গীত-গোবিন্দ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু "বৈষ্ণব পদাবলী" নামে ধারাবাহিক এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃজনে কবি চণ্ডীদাসের নামই অগ্রগণ্য। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসই বাঙ্গালা "বৈষ্ণব পদাবলী" সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা।

অন্তর্নিহিত ভাব-প্রকাশের দিকে এই শ্রেণীর সাহিত্য সংস্কৃত রস-শাস্ত্রের নিকটই অধিক ঋণী। সুপণ্ডিত এবং কবি চণ্ডীদাস সংস্কৃত পুরাণ ও অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ইহার এক অনবদ্য ও নূতন রূপ দান করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের জীবন-কথা ও তৎরচিত পদাবলী নিয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এই স্থানে জটিল বিষয়গুলির যথাসম্ভব সরল ও সহজ সমাধানের চেষ্টা করিব।

চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে তিনি আনুমানিক খৃ: ১৪শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগ হইতে খৃ: ১৫শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের জন্ম ১৩৩৯ শকে (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে) এবং মৃত্যু ১৩৯৯ শকে (১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে) হইয়াছিল বলিয়া একজন মতপ্রকাশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে 'সোমপ্রকাশ', ১৩৮০ সাল, পৌষ সংখ্যায় জনৈক লেখকের একটি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অবশ্য এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। ডা: দীনেশচন্দ্র সেন কবি চণ্ডীদাসের সময় উল্লিখিত মতানুযায়ী খৃ: ১৫শ শতাব্দী মনে না করিয়া কবির সময় খৃ: ১৪শ শতাব্দী মনে করিয়াছিলেন। এখন আবার কেহ কেহ কবিকে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী মনে করিয়া তাঁহাকে খৃ: ১৬শ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করেন।

'সোমপ্রকাশে'র উক্ত লেখকের মতে চণ্ডীদাস বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

ছিলেন। কবির পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী ছিল বলিয়া তিনি উ... করিয়াছেন। ইহা সত্য কি না আমাদের জানা নাই। এই স্থানে একটি ক... বলা ভাল। এখন বহু চণ্ডীদাসের প্রশ্ন উঠিয়াছে। সুতরাং আমরা কো... চণ্ডীদাসের কথা বলিতেছি? বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, চৈতন্য-পূর্ব্বজ ও তৎসমসাময়ি... পদকর্ত্তা নরহরি সরকার যে চণ্ডীদাসের কথা বলিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভু ... চণ্ডীদাসের পদগান করিয়া আনন্দলাভ করিতেন বলিয়া চৈতন্য চরিতামৃতে... উল্লিখিত আছে এবং বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত পদকল্পতরুতে যে চণ্ডীদাসের পদাবলী স্থান পাইয়াছে আমরা সেই চণ্ডীদাসের কথাই আলোচনা করিতেছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে আরও বহু চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের স্থান এই চণ্ডীদাসের নিম্নে এবং তাঁহাদের যথাযোগ্য স্থান পরে বিবেচ্য।

যাঁহারা এই পদাবলীর প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী মনে করেন তাঁহাদের যুক্তি খুব স্পষ্ট নহে। উল্লিখিত প্রমাণগুলি থাকিতে এই কবি চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী বলা সঙ্গত নহে। অবশ্য কেহ যদি মহাপ্রভুর চণ্ডীদাসের পদ-প্রীতি, মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে নরহরি সরকার কর্ত্তৃক তৎরচিত পদাবলীতে চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ এবং বৈষ্ণবদাসের পদসংগ্রহে এই চণ্ডীদাসের পদসমূহের উল্লেখ অবিশ্বাস করেন তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই।

কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মধ্যে প্রাচীনত্বের অভাব কবির জনপ্রিয়তাই সূচিত করে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন যুগের বৈষ্ণব গায়কগণ এই ভাষা পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী। প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতেও প্রাচীন ভাষার এইরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তন সাধারণ কথা। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলীর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ "সুর" লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উল্লিখিত মুদ্রালক্ষণগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) অন্ততঃ দুইবার একই কথার পুনরুক্তি। যথা, "একথা কহিবে সই, একথা কহিবে। অবলা এরূপ তপঃ করিয়াছে কবে।"

(২) চণ্ডীদাসের পদগুলিতে "অবলা" শব্দের আধিক্য।

(৩) চণ্ডীদাস-রচিত ত্রিপদীগুলির বৈশিষ্ট্য। "অপরাপর কবিরা সাধারণতঃ অষ্ট অক্ষরের, কখনও কখনও ষড় অক্ষরের অর্দ্ধছত্রের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ আর একটি অর্দ্ধছত্র যোজনা করেন, তৎসঙ্গে কবিতাটির অর্দ্ধছত্রের মিল থাকে। কিন্তু চণ্ডীদাস অনেক স্থলেই গোড়ায় একটিমাত্র অর্দ্ধছত্র দিয়া আরম্ভ করিয়া তাহা কবিতার চতুর্থ অর্দ্ধছত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, যথা—

"(সখি) কি আর বলিব তোরে, অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলে ঘরে।' 'সই এত কি সহে পরাণে। কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী, শুনিলি আপন কাণে।' কখনও কখনও প্রথমটা ঠিক প্রচলিত ত্রিপদীর মতই আরব্ধ হয়; তারপর দ্বিতীয় কবিতার প্রারম্ভে হঠাৎ ঐরূপ আর একটি অর্দ্ধছত্র প্রদত্ত হয়, 'কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মনব্যথা, যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই, কাণাকাণি শুনি সেই কথা……।' এই চণ্ডীদাসের সুর; কবির করুণ ও মিষ্টি সুরে ভ্রম হওয়ার অবকাশ নাই।"[১]

(৪) চণ্ডীদাসের কবিতা সাধারণতঃ ভাবপ্রধান এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-বাহুল্য বর্জ্জিত। ইহাতে অল্প কয়েকটি কথায় এক একটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে মাত্র। উহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

চণ্ডীদাসের রচনায় যেমন নিকৃষ্টভাব অপেক্ষা উচ্চভাব অধিক নিবদ্ধ রহিয়াছে তেমন ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য অধিক রহিয়াছে। উচ্চস্তরের প্রেমরাজ্যের আভাষ এবং হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ চণ্ডীদাসের পদগুলিতে সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে।

এইসব বৈশিষ্ট্য কবি চণ্ডীদাসের প্রাচীনত্ব প্রমাণে সাহায্য করে সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভু যে কবি চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন চৈতন্যচরিতামৃতে এবং নরহরি সরকারের ন্যায় বহু পদকর্ত্তা রচিত পদগুলিতে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে অথবা ইঙ্গিত আছে। ইহা ইতিপূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। বহু পদকর্ত্তা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে কবি বিদ্যাপতির সহিত কবি চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে ইনি কোন বিদ্যাপতি? একাধিক চণ্ডীদাসের ন্যায় একাধিক বিদ্যাপতিরও সন্ধান পাওয়া যায়।[২] উভয় কবির এই মিলনকে "ভাব-সম্মেলন" বলে। রামানন্দ রায় এবং মহাপ্রভুতেও এইরূপ ভাব-সম্মেলন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সঠিক কাল নিয়া

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৯৮।

(২) চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গের মতানৈক্যের অবধি নাই। এই উপলক্ষে বিশেষ করিয়া দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র রায়, বসন্তরঞ্জন রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সারদাচরণ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রমোহন বসু, গ্রীয়ারসন সাহেব, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ এবং সুকুমার সেনপ্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ "দীন" ও "দ্বিজ" চণ্ডীদাসকে এক ব্যক্তি মনে করেন। আবার কেহ কেহ কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতির সহিত অপ্রসিদ্ধ কোন চণ্ডীদাসের (নব-চণ্ডীদাসের) সাক্ষাৎ হইয়াছিল অনুমান করেন। কেহ কেহ বড়ু চণ্ডীদাসকে শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী) এবং পদাবলীর প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসকে শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী (১৬শ শতাব্দী) বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ কেহ এই ব্যক্তিকেই "দীন" চণ্ডীদাস বলেন।

তর্ক থাকিলেও তিনি যে খৃঃ ১৪শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কি মধ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হওয়াই সম্ভব। কেহ কেহ পদকল্পতরুর প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে চণ্ডীদাস খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষের কবি এবং বিদ্যাপতি নামে কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, তবে তিনি মৈথিলী বিদ্যাপতি নহেন—তিনি বাঙ্গালী বিদ্যাপতি (নব-বিদ্যাপতি)। এই বিতর্কেরও সুমীমাংসা হয় নাই। আমাদের কিন্তু অনুমান পদাবলীর প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস প্রধানতঃ খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর ব্যক্তি এবং চৈতন্য-পরবর্ত্তী না হইয়া চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মৈথিলী কবির সহিতই তাঁহার সাক্ষাতের অধিক সম্ভাবনা। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও "কবিরঞ্জন" উপাধিযুক্ত কোন কবি নাকি একই ব্যক্তি। কেহ কেহ এই সঙ্গে "কবিশেখর" উপাধিও যোগ করেন।[১]

এই কবি চণ্ডীদাস কে তাহাই এখন প্রধান সমস্যা। এই নামে এক কবিই ছিলেন না বহু কবি ছিলেন? নামের পূর্ব্বে "আখর" দেওয়া প্রাচীন রীতি। এই হিসাবে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের নামের পূর্ব্বে নানারূপ উপাধি দেখা যায়। "দীন" বলরাম দাস, "দীন" গোবিন্দ দাস, "দীনহীন" রামানন্দ দাস, "পাপী" রাধামোহন দাস, "হীন" রামানন্দ, "দুর্ম্মতি" বৈষ্ণব দাস, "দুঃখিয়া" শেখর দাস, "পামর" মাধব দাস, "অকিঞ্চন" বল্লভ দাস, "পতিত" রাধামাধব ইত্যাদি।[২] চণ্ডীদাসের ভণিতার মধ্যেও "দীন" চণ্ডীদাস, "আদি" চণ্ডীদাস, "দ্বিজ" চণ্ডীদাস, "বাসুলী সেবক" চণ্ডীদাস, "বড়ু" চণ্ডীদাস প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামের পূর্ব্বে এই উপাধিগুলি রহিয়াছে। শুধু "বড়ু" চণ্ডীদাসের রচনা পদাবলীর অন্তর্গত নহে, উহা ভাগবতের অনুবাদ বলা যাইতে পারে—নাম "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন"। এই কবিগণ সকলেই কি এক ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন চণ্ডীদাস? পদাবলীর প্রচলিত বাসুলি-সেবক চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসকে নিয়াই বিতর্ক চরমে উঠিয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে একটি কথা বলা সঙ্গত। চণ্ডীদাসের নামে যে পদগুলি চলে তাহার সবগুলিই প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস রচিত নহে। ইহা ছাড়া অন্য পদকর্ত্তার নামে প্রচলিত পদগুলির মধ্যেও চণ্ডীদাসের পদ

---

(১) "বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলন পদাবলী" (সুকুমার সেন রচিত, কোচবিহার দর্পণ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৫২) এবং "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দ্বয়" (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত, কোচবিহার দর্পণ, চৈত্র সংখ্যা, ১৩৫২ দ্রষ্টব্য)।

(২) পদকল্পতরু দ্রষ্টব্য।

লুক্কায়িত আছে। কোন কোন কবি আবার চণ্ডীদাসের পদ সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ রচিত পদ বলিয়া চালাইয়াছেন। কেহ কেহ "চণ্ডীদাস" নামের আশ্রয়ে স্বরচিত পদ প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত মন্তব্য মানিয়া লইলে দীন চণ্ডীদাস ও বাসুলী-সেবক মূল চণ্ডীদাসকে এক বলা যায় কি? দেখা যায় দীন চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির অধিকাংশই প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের রচিত পদসমূহের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট নহে। ইহা ঠিক হইলে দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। কোন অখ্যাতনামা কবি নিজে পদ রচনা করিয়া সহজিয়া কবিগণের ন্যায় উহা মূল চণ্ডীদাসের নামে প্রকাশ করিতে পারেন। আর সত্যই উহা আসল চণ্ডীদাসের রচনা হইয়া থাকিলে ভণিতায় নানা উপাধির মধ্যে স্বয়ং কবি বা গায়কগণ "দীন" কথাটি যোগ দিতে পারেন। যাঁহারা মনে করেন দীন চণ্ডীদাসই আসল চণ্ডীদাস এবং তাঁহার রচিত পদগুলিই আসল চণ্ডীদাসের পদ আমরা তাঁহাদের মত সকল ক্ষেত্রে সমর্থন করি না। তবে এই "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদের প্রণেতা দীন চণ্ডীদাস নামে কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তী মনে করেন। অবশ্য ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। হয়ত সময়ের দিকে তিনি শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তীই হইবেন। আমাদের বিশ্বাস চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির অন্তর্গত অপ্রসিদ্ধ অথবা বেনামী পদগুলির মধ্যে "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতার অনেকগুলি পদ রহিয়াছে। অবশ্য আসল চণ্ডীদাসের কোন কোন পদেও "দীন" আখ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির অনেকগুলিই আসল চণ্ডীদাস রচিত নহে। সুতরাং দীন চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়াও আসল চণ্ডীদাসের নাম ও তৎসঙ্গে "দীন" নামক অন্যতম ভণিতা অনেকক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়া প্রচলিত হইয়া আছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইলে এক বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন ভণিতার অপর উপাধিসমূহ এক চণ্ডীদাসকেই নামতঃ নির্দ্দেশ করিতেছে এবং অনেক কবি এই প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের নামের অন্তরালে দীন চণ্ডীদাসের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। এক চণ্ডীদাসের বেনামীতে এরূপ কয়জন চণ্ডীদাস আছেন তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

পূর্ব্বে উল্লিখিত 'সোমপ্রকাশে'র লেখকের মত অভ্রান্ত হইলে মৃত্যুকালে কবি চণ্ডীদাসের বয়স ৬০ বৎসর (আমাদের মতে আরও কিছু বেশী বয়স) হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে তিনি যে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে, মৈথিলী কবি নাকি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। কবি

চণ্ডীদাস কবি বিদ্যাপতি ও কবি মালাধর বসুর সমসাময়িক হইতে পারেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়া নানা কিম্বদন্তী ও পদ প্রচলিত আছে। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কাহারও কাহারও মতে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রাম এবং বিরুদ্ধমতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম।[১] শেষোক্ত গ্রামের পক্ষেই অভিমত বেশী পাওয়া যাইতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে নান্নুর গ্রামবাসিগণের উৎসাহে এবং বীরভূমের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত একদল বিশেষজ্ঞ চণ্ডীদাসের স্মৃতি উদ্ধারকল্পে যত্নবান হ'ন এবং কবির জন্মভূমি বলিয়া কথিত স্থানটি খনন করেন। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগও এইদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। তবে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আশানুরূপ যথেষ্ট নূতন তথ্য তথায় আবিষ্কৃত না হইলেও এই পর্য্যন্ত যতটা জানিতে পারা গিয়াছে তাহারও বিশেষ মূল্য আছে। কতিপয় রক্তবর্ণে রঞ্জিত হাড়িকাঠ এখনও প্রসিদ্ধ শাক্ত-পীঠস্থান লাভপুরের সন্নিকটবর্ত্তী এই গ্রামে শাক্ত-প্রভাবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। বহু নরকপাল ও একটি নরকঙ্কালও ভূগর্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানটি পালরাজাদের সময়ের (খৃঃ ৮ম—১১শ শতাব্দী) প্রাচীর, মৃৎপাত্রাদি ও অন্য নানাপ্রকার প্রাচীন চিহ্ন বহন করিতেছে। নরকঙ্কালটি চণ্ডীদাসের কি না তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে পরীক্ষিত হইয়া স্থির হয় নাই। কবির মৃত্যুকাহিনীর সহিত স্থানটির অনেক পরিমাণে মিল আছে। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব-প্রধান নান্নুরে শাক্তচিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহার প্রাচীনতর আবেষ্টনী শাক্ত। শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ন্যায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থস্থানগুলিতেও পূর্ব্বতন শাক্ত প্রভাবের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কবির জন্মভূমি সম্বন্ধে বলা যায় যে হয়ত চণ্ডীদাস ছাতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও অন্ততঃ কোনরূপ আত্মীয়তাসূত্রে তথায় কিছুকাল

---

(১) এখনও দেখা যায় ছাতনার "বাশুলী" দেবীর এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধি ছিল। ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি মাণিক গাঙ্গুলী "সর্ব্বদেব বন্দনায়" লিখিয়াছেন—"বন্দিব বেলায় চণ্ডী ছাতনায় বাশুলী"। তিনি নান্নুরের কোন নামোল্লেখ করেন নাই। ইহাতে নান্নুর অপেক্ষা ছাতনার প্রসিদ্ধিই অধিক প্রকাশ পাইতেছে। রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গলেও ছাতনার বাশুলীর কথা আছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ছাতনার নিকটে এক নান্নুর পল্লীর সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। নামসাদৃশ্য উপলক্ষে বলা যায় ঢাকা জেলায় বাবলাই থানার অন্তর্গতও এক নান্নার গ্রাম আছে। এইরূপ চণ্ডীদাস ও নান্নুর নামের আধিক্য বাঙ্গালা দেশে অনেক থাকিতে পারে। ঢাকা জেলায় নান্নার গ্রামে চণ্ডীদাসের নামের প্রচলন থাকিলে সেখানেও এক নূতন ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাস আবিষ্কৃত হইলে বিস্মিত হইব না।

বসবাস করিয়া থাকবেন। চণ্ডীদাসের তথায় বাল্যে শিক্ষালাভ করাও অসম্ভব নহে। যাহা হউক, বীরভূম জেলা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়দেবের বাসভূমি কেন্দুবিল্ব গ্রামের সহিত চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হিসাবে নান্নুর গ্রামকেও দাবি করে। সম্ভবতঃ এই দাবি খুব অযৌক্তিকও নহে।

কথিত আছে চণ্ডীদাসের পিতা বাশুলীদেবীর মন্দিরে পূজকের কাজ করিতেন। মন্দিরটির মালিক সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী গ্রাম কীর্ণাহারের রাজা। বাশুলী দেবীকে চণ্ডী দেবী বলিয়া স্বীকার করিলেও সরস্বতী দেবীর সহিত এই দেবীমূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। দেবীমূর্ত্তিটি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই দেবী পদ্মাসনা এবং চারিহস্ত; তন্মধ্যে দুই হস্তে বীণা, এক হস্তে পুথি ও এক হস্তে জপমালা। দেবীমূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। নিম্নে একজন ভক্তের মূর্ত্তি। এই দেবীমূর্ত্তি হয়ত শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ফল। বীণা সরস্বতীর ন্যায় বৈষ্ণবী দেবীর দ্যোতক। তবে ইনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বিদ্যাও হইতে পারেন। দেবীর কৃষ্ণবর্ণ কালী বা চণ্ডী দেবীর বর্ণবিশেষ। মোটের উপর বাশুলী দেবীকে শাক্তদেবী বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। নান্নুরের অধিবাসিগণ এই দেবীকে "বাগীশ্বরী" (সরস্বতী দেবী) ধার্য্য করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ইনি বৈষ্ণবী-দেবী অথচ চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন "মদ্য মাংস দিয়া কেহ বাশুলী পূজয়"। এই মতানুসারে বাশুলী দেবী শাক্তদেবী। সরস্বতী দেবীর একটি শাক্ত দিক আছে। এই দেবীর মন্ত্রে "ভদ্রকালী" কথাটি ব্যবহৃত হয়। নান্নুর গ্রামের এই দেবী নীল প্রস্তরে নির্ম্মিতা। বৈদিক সাহিত্যেও "নীল-সরস্বতী"র উল্লেখ আছে। বাঙ্গালা দেশে বাশুলী দেবীর অভাব নাই। ছাতনা গ্রামেও বাশুলী দেবী আছেন। বোধ হয় ইনি শক্তিদেবী। নান্নুর গ্রামের বাশুলী মূর্ত্তি কিছু অদ্ভুত রকমের। এইরূপ নাকি এই পর্য্যন্ত আর দুইটি মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দেবীমূর্ত্তি শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয়ের ফল। যাঁহারা একেবারে শাক্ত-সংস্রবশূন্যা শুধু সরস্বতী (বাগীশ্বরী) মূর্ত্তি হিসাবে নান্নুরের এই দেবীকে দেখেন তাঁহারা অবশ্য এই মূর্ত্তিকে বাশুলী বলেন না। অথচ এই দেবী বাশুলী না হইলে "বাশুলী-পূজক" চণ্ডীদাসের কথা এই গ্রামের সম্পর্কে বাতিল করিয়া দিতে হয়। ইহাতে নান্নুরবাসিগণ রাজী হইবেন কি? পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস তৎস্থানে মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন। এই মন্দিরের এক সেবিকা ছিল, তাহার নাম রামমণি। জগবন্ধু ভদ্রমহোদয়ের মতে

তাহার নাম "রামতারা" এবং নরহরি সরকার মহাশয়ের মতে "তারাধুবনী"। সাধারণতঃ এই নারী "রামমণি" নামে পরিচিতা। রামমণি ও চণ্ডীদাসের পরস্পরের প্রতি আসক্তি সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। "তারা" নামটিকে "রামী" বা রামমণিতে পরিণত করিতে উক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের "রামতারা" নামটি অবিষ্কার কি না বলা কঠিন।

এতদুভয়ের প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। "চণ্ডীদাস" শাক্ত নাম এবং কবিও "বাশুলী" নামে শাক্তদেবীর মন্দিরের পুরোহিত কবির পিতার নাম "দুর্গাদাস" হইলে ইহাও শাক্ত নাম। কবির পিতা কবির নামও শাক্ত "বাশুলী" বা "চণ্ডী"দেবীর দাস অর্থে "চণ্ডীদাস" রাখিয়া থাকিবেন। সুতরাং স্থানীয় আবেষ্টনির প্রভাব শাক্ত বলিতে হইবে। রামমণি জাতিতে ধোবানী ছিল এবং তান্ত্রিক মতে যে পঞ্চকন্যা সাধনার অঙ্গ, "রজক কন্যা" তন্মধ্যে অন্যতমা। সুতরাং শাক্তদেবীর দাস ও তান্ত্রিক সাধক হিসাবে চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রীতি খুব স্বাভাবিক। ভারতের বহু শাক্ত তীর্থস্থানের ন্যায় নান্নুরও কিয়ৎপরিমাণে শাক্ত তীর্থপদবাচ্য হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সুধীবৃন্দ যে খনন-কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে এই ধারণাই সুস্পষ্ট হয়।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচার আছে যে তিনি বাঙ্গালার "সহজিয়া" নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিগুরু। তিনি আদিগুরু কি না বলা যায় না, তবে বিশেষ প্রসিদ্ধ গুরু সন্দেহ নাই। সহজিয়াগণ পরস্ত্রীর প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া "পরকিয়া" সাধক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভু এই "পরকিয়া" মত (সম্ভবতঃ আধ্যাত্মিক ও আলঙ্কারিক অর্থে) সমর্থন করিতেন। "সহজ" মত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই খুব প্রাচীন। বাঙ্গালায় চণ্ডীদাস প্রবর্ত্তিত অথবা পৃষ্ঠ-পোষিত সহজ মতের পূর্ব্ব হইতেই মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের (মহাযানী) মধ্যে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান নামক চারিশাখার প্রসিদ্ধি আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে "রসিকভক্ত" নামক এক শ্রেণীর সাধক সম্প্রদায় নারী-প্রেমের ভিতর দিয়া সাধনার তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল। ইহারা কিশোরী সাধনা করিত। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের কিশোর-লীলার ধারণা ইহাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহা বিবেচ্য। কিশোরী-সাধনা তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পন্থা। সহজিয়াগণের পর-নারী নিয়া

সাধনার "পরকীয়া" মত তান্ত্রিক মতেরই সমর্থন করে। চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ "কিশোরী-সাধক" হিসাবেই পরকীয়ার পথে সহজিয়া মতের সমর্থন করিয়া থাকিবেন[1]। অবশ্য তাঁহার প্রেমপাত্রী বিবাহিতা ছিল কিনা এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাস শাক্ত তান্ত্রিক হইয়াও যে আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহাতে ক্রমে তিনি বৈষ্ণব তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়েন বলিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিশোরী সাধনায় আগ্রহ এবং এই সম্বন্ধে "রাধা-কৃষ্ণ" লীলার আদর্শ গ্রহণ কবির মত পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারে। শাক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির বৈষ্ণবমত গ্রহণ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির শাক্তমত গ্রহণের উদাহরণ এতদ্দেশে আরও আছে। প্রথমোক্ত দলে চণ্ডীদাস ও দ্বিতীয় দলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে গ্রহণে আপত্তি হওয়া উচিত নহে। আবার শুধু সাহিত্য-রচনা দিয়াও কাহারও ধর্ম্মমত নির্দ্দেশ করা নিরাপদ নহে। বিদ্যাপতি শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের উপযোগী রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ উদাহরণ আরও মিলিতে পারে। চণ্ডীদাসের সাধনপন্থা গূঢ় এবং ইহা বিশেষ উচ্চাঙ্গের মনে হয়। "কোটিতে গোটিক হয়," "সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি," "সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই" প্রভৃতি উক্তিগুলি ইহার প্রমাণ। চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদগুলি অনেক ক্ষেত্রেই হেঁয়ালীর ভাষায় রচিত।[2]

চণ্ডীদাস সহজিয়া মতের সমর্থক ছিলেন এবং তাঁহার নামে অনেক সহজিয়া পদ এখনও চলিতেছে বলিয়া এই সমস্ত তথাকথিত চণ্ডীদাসের পদ সবগুলিই তাঁহার রচিত নাও হইতে পারে। ইহা হয়ত চণ্ডীদাস-ভক্ত পরবর্ত্তী সহজিয়াগণের কীর্ত্তি। সহজিয়াগণ রূপগোস্বামীর নামেও অনেক সহজিয়া মত প্রচার করিয়াছে। এই সমস্ত মতের ভিতরে এমন বীভৎস রুচির পরিচয় আছে যে তাহার সহিত সংসারবিমুখ স্ত্রীজাতিসম্পর্করহিত রূপগোস্বামীর সংশ্রব কল্পনা করা শক্ত। সহজিয়াগণের মূল আদর্শ যত উচ্চই হউক না কেন বহিরঙ্গের সাধন-প্রণালী নিম্নস্তরের তান্ত্রিক আচার মিশ্রিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর সহজিয়াগণের প্রীতিকর হইয়া থাকিবে। এই হিসাবে তাহাদের বীভৎস আচরণ হিন্দু সমাজের ভীতির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। নেতৃস্থানীয় নির্ম্মল চরিত্র বৈষ্ণব মহাজনগণের নামে তাহাদের বিস্ময়কর প্রচার-

---

(১) চণ্ডীদাসের নামে একটি প্রচলিত পদে আছে —
"রজকিনীরূপ, কিশোরীস্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়" — চণ্ডীদাসের পদ।

(২) এই উপলক্ষে তান্ত্রিক নাথ-পন্থী সাহিত্যের গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থ তুলনীয়।

কার্য্য স্বীয় দলের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে করাই সম্ভব। এই শ্রেণীর সহজিয়াগণ তাহাদের মত সমর্থনে প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজনগণের "মঞ্জরী" নামে একটি করিয়া প্রেমপাত্রী স্থির করিয়াছে। স্বয়ং মহাপ্রভুকেও তাহারা বাদ দেয় নাই। সম্ভবতঃ নিজেদের মত প্রচারের অত্যধিক আগ্রহও ইহার অন্যতম কারণ।

তবুও বলা যায় চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম-কাহিনী শুধু সহজিয়াগণেরই সৃষ্ট নহে। ইহা বিশ্বাস করিবার কিছু কারণ আছে। কবি নরহরি সরকারের নাম এই মতবাদের সমর্থনে উল্লেখযোগ্য। বিল্বমঙ্গল-চিন্তা, জয়দেব-পদ্মাবতী এবং অভিরাম (ঠাকুর)-মালিনীর প্রেম-কাহিনী এই উপলক্ষে তুলনীয়। চণ্ডীদাস ও রামমণির প্রেম অবলম্বনে এতদ্দেশে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। একটি প্রবাদ আছে যে রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের প্রেমের কথা গ্রামের লোক জানিতে পারিয়া চণ্ডীদাসকে একঘরে করে। কবির জ্ঞাতি ভ্রাতা নকুলঠাকুর সমাজচ্যুত চণ্ডীদাসকে সমাজে উঠাইবার জন্য গ্রামের লোকজনকে অনেক বুঝাইয়া বলেন। নকুল ঠাকুরের প্রস্তাবে তাঁহার গ্রাম-বাসিগণ সম্মত হয় এবং এই উপলক্ষে এক সামাজিক নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে স্বজাতিবর্গের সহিত আহারে বসিয়া চণ্ডীদাস অদূরে রোরুদ্যমানা রামমণিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান। ইহার ফলে নকুলঠাকুরের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। এই ঘটনাটি অবলম্বনে কতিপয় পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস নাকি উল্লিখিত নিমন্ত্রণে ভোজনে বসিয়া রামমণির মধ্যে জগৎজননী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ছিলেন। কবির নামে একটি প্রচলিত পদে এই প্রসঙ্গে রামীকে "মাতৃ পিতৃ" সম্বোধনের কথা আছে। যথা, "তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃপিতৃ। ত্রিসন্ধ্যাযাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী"।—ইত্যাদি উক্তি আছে।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু নিয়া কতিপয় বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে। যথা—

(১) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৬ সালের ২য় সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে একখানি পুরাতন পুথির কতিপয় পত্রের উল্লেখ করেন। তদনুসারে চণ্ডীদাস "কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন।

শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।" হাতীর পীঠে বন্ধনাবস্থায় চণ্ডীদাসকে নাকি বাজপাখী বারবার ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলে এইরূপ একটি কথাও আছে।[১]

(২) নান্নুর ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম কীর্ণাহারে প্রচলিত একটি কিম্বদন্তি রাজা-ঘটিত নহে, নবাব-ঘটিত। তাহাতে জানা যায় "সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়মন্ত্র, তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী, যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাব সাহেবের বেগম একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল।"[২] ইহার ফলে নবাবের নাটশালায় কীর্ত্তনগানরত চণ্ডীদাসকে সদলবলে নবাবসৈন্যের কামানের গোলার আঘাতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে হইল। বলাবাহুল্য নাটশালাটি ইহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রবাদে "রাজা" স্থলে "নবাব" স্থান পাইয়াছে এবং এই নবাব সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব।

(৩) বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত দুইশত বৎসরের পুরাতন একটি হস্তলিপি সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকাগারে আছে। উহা রামীরচিত একটি পদ। ইহাতে আছে গৌড়ের নবাবের আদেশে হস্তী-পৃষ্ঠে কষাঘাতে চণ্ডীদাস মারা যান। অন্যান্য ঘটনা (১) ও (২) সংখ্যক বিবরণের প্রায় অনুরূপ। এই (৩) সংখ্যক বিবরণে দেখা যায় পরগণার নবাবের স্থানে গৌড়ের নবাব উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের সময় গৌড়ের কোন "নবাব" ছিলেন বলিয়া জানা নাই। তখন "নবাবের" স্থলে "সুলতান" ছিলেন। বোধ হয় ক্রুদ্ধ নবাব কর্ত্তৃক প্রবাদোক্ত বাশুলী মন্দির ধ্বংস পরে সাধিত হইয়াছিল।[৩] আরও জানা যায় "নান্নুরে বাশুলী মন্দিরের নিকটে যে ভগ্নগৃহের চিহ্নাদিসহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে নাটশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবনবিজয়ী কীর্ত্তনের দলসহ সেই নাটশালায়ই সমাহিত হন।[৪]

(৪) কীর্ণাহার অঞ্চলের একটি প্রবাদ অনুসারে রামীর সহিত চণ্ডীদাস কীর্ণাহারে কীর্ত্তন গাহিবার সময় ভূমিকম্পের ফলে তথাকার নাট-মন্দির চাপা

১। "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-দ্বন্দ্ব", হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চবিহার দর্পণ, চৈত্র, ১৩৪২ সাল।

২। বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" ভূমিকা, ২০ পৃষ্ঠা এবং "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ষষ্ঠ সং, ২১৪—২১৬ পৃষ্ঠা।

৩। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঐ সং, পৃঃ ২১৫।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকা। বসন্তরঞ্জন রায়।

পড়িয়া মারা যান। তথাকার একটি ভগ্ন-মন্দিরের স্তূপকে চণ্ডীদাসের সমাধিস্থান বলা হয়।

চণ্ডীদাস ও রামীর একসঙ্গে কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইবার কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না।

এই সমস্ত জনশ্রুতি ও প্রাচীন পুথিপত্রাদি হইতে যে সত্যটুকু উদ্ধার করা যায় তাহা এই যে চণ্ডীদাস কোন নাট-মন্দির চাপা পড়িয়া মারা যান। এইরূপ দুর্ঘটনার কারণ কোন স্থানীয় রাজা বা নবাব অথবা গৌড়ের রাজা বা নবাব সুলতান?)। অপর পক্ষে কোন ভূমিকম্পের ফলেও এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে। বরং ভূমিকম্পের ফলে চণ্ডীদাসের মৃত্যুঘটার সম্ভাবনাই অধিক মনে হয়। কবি চণ্ডীদাসের বয়স সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে মৃত্যুকালে উহা ৬০ বৎসর কি তদূর্দ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহা সত্য হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে কবি চণ্ডীদাসের কোন রাণী বা বেগমের প্রেমে পড়ার কাহিনী কিয়ংপরিমাণে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় নাকি? চণ্ডীদাসকে "রসিকচূড়ামণি" প্রমাণের উদ্দেশ্যে ইহা ভক্তগায়কগণের কীর্ত্তি নহে তো? সোমপ্রকাশের লেখকের চণ্ডীদাসের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে উক্তি কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না, কারণ তাঁহাদের মতে উপযুক্ত প্রমাণাভাব। এমতাবস্থায় চণ্ডীদাসের মৃত্যু যৌবনেও হইতে পারে। তাহা হইলে চণ্ডীদাসের অবৈধ প্রেমের ফলে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নহে। ৩নং এর প্রবাদে আছে শুধু গৌড়ের নবাবের বেগম যে চণ্ডীদাসকে ভালবাসিতেন তাহা নহে, চণ্ডীদাসও বেগমকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বেচারী নবাবের দুঃখপূর্ণ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ২১৫ পৃঃ)। এই ঘটনাটি সত্য হইলে অবশ্য ইহাতে চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রীতির আরও প্রমাণ পাওয়া গেলেও বৃদ্ধকালে চণ্ডীদাসের রুচির প্রশংসা করা কঠিন। তবে যদি তাঁহার যৌবনে ইহা ঘটিয়া থাকে তবে অন্য কথা।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন চণ্ডীদাসকে খৃঃ ১৪শ শতাব্দীর মনে করিয়া কবিকে গৌড়ের রাজা গণেশের পুত্র যদুর বা জীতমল্লের (মুসলমান হওয়ার পর নাম—সুলতান জালালুদ্দীন) সমসাময়িক বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্থানীয় রাজা হইলে কীর্ণাহারের হিন্দুরাজা হইতে পারেন। চণ্ডীদাসের রাজকবি হওয়ার কথা কোন পুথির কবিতায় আছে।[১] ইনি কীর্ণাহারের রাজা কি না তাহা বিবেচ্য। পরগণার নবাব হইলে তিনি কে? হিন্দুরাজা

(১) "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-দ্বয়", শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার দর্পণ, চৈত্র ১৩৩২ সাল।

হইলে তাঁহার দ্বারা হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক কার্য্য। কীর্ণাহারের কিঙ্কিন নামক এক হিন্দু রাজার কথা শুনা যায়। প্রবাদ চণ্ডীদাস নাকি এই রাজার সভাকবি ছিলেন। কিলগির খান নামক পাঠান এই রাজাকে হত্যা করে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিলগির খানের বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া কবির প্রতি আসক্ত হইলে এই পাঠান নবাব কবিকে বধ করেন। এইরূপ একটি প্রবাদও আছে। তরণীরমণ নামক একজন পদকর্তার "চণ্ডীদাস" নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে ও বর্ত্তমানে উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রহিয়াছে। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস ও তাহার সুহৃদ কোন রাজা (সম্ভবতঃ কীর্ণাহারের কিঙ্কিন রাজা) ঘটিত অনেক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

এই সমস্ত প্রবাদ কতখানি বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। তবে বৃদ্ধাবস্থায় চণ্ডীদাসের চরিত্রগত দুর্ব্বলতার কাহিনী সত্য হইলে কোন প্রবল ব্যক্তির কোপে পড়িয়া তাঁহার অপমৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে। চারিটি প্রবাদের একটি মাত্র প্রবাদ ভূমিকম্প সমর্থন করে। অপর তিনটি প্রবাদেই কোন রাজরোষের বর্ণনা পাওয়া যায়। তথাপি মনে হয় ভূমিকম্পের কথাই ঠিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেরিত বিশেষজ্ঞগণও চণ্ডীদাসের ভিটা খনন করিয়া তথায় কোন সময়ের ভূমিকম্পের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন।

ধোপানী রামীকে বিদুষী নারী গণ্য করিবার স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তির অভাব। চণ্ডীদাস সংস্কৃতে পণ্ডিত, সুগায়ক ও কবি হইলে রামীকেও যে কবিগুণান্বিতা হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। রামীর রচিত পদ বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহা সত্যই কি রামীর রচিত, অথবা উহা রামীর নাম দিয়া সহজিয়া গায়কগণ রচিত ? এমন কবিত্ব শক্তির বিকাশ যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভর করে মন্দিরের পরিচারিকা রামী ধোপানীতে তাহা সম্ভব ছিল কি ? যাহা হউক এই সম্বন্ধে শুধু সন্দেহ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক গ্রন্থখানি ঠিক পদাবলীর অন্তর্গত নহে। বরং উহা ভাগবতের ভাবানুবাদ বলা চলে। গ্রন্থের ভিতর প্রত্যেক কাহিনীর শিরোনামায় দুই ছত্র করিয়া সংস্কৃত কবিতা কবির ভাগবত অনুসরণের এবং সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। এই পুথিখানির আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এবং প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। পুথিখানি উক্ত রায় মহাশয় লিখিত সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ এবং

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধসহ মুদ্রিত হইলে সুধীসমাজে পুথি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা আরম্ভ হয়।[১] ইহা পদাবলীর চণ্ডীদাস রচিত কি না, সুতরাং পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কি না, এই সম্বন্ধে এবং পুথি রচনার কাল সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বিষয়ে বিতর্কের কারণ পুথিখানিতে রচনাকাল সম্বন্ধে এবং লেখক সম্বন্ধে বিবরণ সম্বলিত পত্রের অভাব, সুতরাং পুথিখানি খণ্ডিত। এই পুথিখানি সম্বন্ধে আমাদের মতামত সংক্ষেপে জানাইতেছি।

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত এক শ্রেণীর অশ্লীল গ্রাম্য-সঙ্গীতকে "ধামালী" গান বলে। রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক এই প্রকার গানের নাম "কৃষ্ণ-ধামালী"। ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকে—আসল ও শুকুল (শুক্ল)। এই গানগুলি দেবতার নামাঙ্কিত থাকিলেও অশ্লীলতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। "আসল" ধামালী এত বেশী অশ্লীল যে উহা গ্রামের ভিতরে গাহিতে দেওয়া হয় না। এই গান গ্রামের সীমার বাহিরে গাহিতে হয়। "শুকুল" ধামালী অশ্লীল হইলেও উহা পরিমাণে "আসল" হইতে কম বলিয়া গ্রামের ভিতরে গাহিতে দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ জয়দেবের সংস্কৃত গীতগোবিন্দের অশ্লীল রুচি সেন রাজত্বের শেষভাগে বাঙ্গালা ধামালী গানরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল এবং "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" "শুকুল" ধামালীর অন্যতম উদাহরণ।

এই গ্রন্থে এক "রাধা-বিরহ" অংশ ভিন্ন "দানখণ্ড", "নৌকা-খণ্ড" প্রভৃতি একদিকে জয়দেবের অমার্জ্জিত রুচির পদাঙ্কানুসরণে এবং অপরদিকে বাঙ্গালী ভাগবতানুবাদকগণের অনুকরণে গ্রন্থবিভাগ করিয়া কবি রসস্ফূর্ত্তির প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। জয়দেবের বিলাস-কলার আদর্শের তথা ধামালী-জাতীয় গানের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে চরম বিকাশ। শাক্ত কবি ভারতচন্দ্র ও বৈষ্ণব-কবি বড়ু চণ্ডীদাস উভয়েরই আদর্শগত পার্থক্য অল্প। উভয়েরই কবিত্ব প্রশংসনীয়, উভয়েই সংস্কৃত পণ্ডিত এবং উভয়েরই রুচি গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট। কিন্তু এই রুচির অপরদিকও আছে। কবি-রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং বাঙ্গালা কবিতা সবই ভারতচন্দ্রের ন্যায় সংস্কৃত রসশাস্ত্র স্মরণে লিখিত এবং কামলালসার উদ্দীপক। যাহা হউক সংস্কৃত কামশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের বাঙ্গালা উদাহরণ হিসাবে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে"র মূল্য আছে। ইহা ধামালী গান বলিয়া স্বীকার করিলে রুচিগত আক্ষেপেরও কারণ নাই।

---

(১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অক্ষর বিশেষজ্ঞগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তিনরকমের হস্তাক্ষর আছে এবং লেখার কাল ১৩৫০--১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ এই পুথিখানি বড়ু চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত নহে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচনাকারী বড়ু চণ্ডীদাসকে আসামনিবাসী "অনন্ত" নামক কবি ও গায়ক বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। তাহারা এই গ্রন্থের ভাষাতে কামরূপ অঞ্চলের গন্ধ পান। আমরা কিন্তু ইহাতে রাঢ়দেশের প্রভাবই বিশেষরূপে দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে আসাম (কামরূপ), বঙ্গ, রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন রূপ বিচারে বলিতে হয়, অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত হইলেও তিনি আসামের অধিবাসী নাও হইতে পারেন। তবে তিনি রাঢ় অঞ্চলের কোথাকার অধিবাসী ছিলেন তাহা জানা যায় না। চণ্ডীর নামের সহিত ব্যক্তিবিশেষ ও স্থান-বিশেষের নামের সংযোগ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত "চণ্ডী" নামের সংশ্রবের উদাহরণ কবি চণ্ডীদাস। আর স্থানবিশেষের সহিত চণ্ডীনামের সংযোগও অল্প নাই; যথা, মাকর-চণ্ডী (মাকড়দহ— হাওড়া), বোড়াই-চণ্ডী ইত্যাদি। হুগলীর নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বের ফরাসী-চন্দননগরের একটি পল্লীর নাম "বোড়াই-চণ্ডী-তলা"। "বড়ু" (বটু বা ছোট) চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বড় চণ্ডীদাস বা পদাবলীর চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি সেইজন্য ইনি বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কবির বড়াই বুড়ি (বৈষ্ণব-মতে যোগমায়া) একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বড়ু চণ্ডীদাসের বাড়ী এই বোড়াই বা বড়াই চণ্ডীতলা ছিল কি না কে জানে। বড়ু চণ্ডীদাসের বড়াইর চণ্ডীর প্রতি ভক্তি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলায় সহায়ক হইয়া থাকিবে। এই কবির চণ্ডীভক্তি বৈষ্ণব ভাবেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আদর্শের দিক দিয়া বৃন্দাবনের গোপ-গোপীগণের "কাত্যায়নী" দেবীর পূজা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য আমাদের এইসব অনুমান গ্রহণীয় নাও হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী একার্থবাচক। রাধাই চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী নামটি শ্রীরাধার গৌর-কান্তি ও সৌন্দর্য্যের দ্যোতক। ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী পৃথক্ ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। ইহার কারণ কি? ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে গোলকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন বিরজাদেবী এবং উভয়েই পরস্পরকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাগবত শ্রীরাধাকে স্বীকারই করে নাই, শুধু শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীতা হিসাবে একটি প্রধানা গোপী স্বীকার করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাগবতগুলি পুরাণোক্ত শ্রীরাধাকে স্বীকার করিয়াছে। ইহার উপর দানখণ্ড, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতির আমদানি করিয়াছে। বাঙ্গালা পদাবলী সাহিত্যেও বাঙ্গালা ভাগবতের এই সমস্ত কাহিনী

স্বীকৃত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া মাধুর্য্য রসের দ্যোতক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও কিয়ৎ পরিমাণে বাৎসল্য-রস পরিবেশ করিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বতন্ত্র চন্দ্রাবলী গোপীর প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং আখ্যানবস্তুতে ভাগবত অনুসরণকারী পদাবলী ও ধামালী গানে শুধু শ্রীরাধাই আছে—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে চন্দ্রাবলী গোপী নাই। অথচ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রেমরসের উৎকর্ষবিধায়ক এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-সম্মত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কাল নিয়া মতান্তর থাকিলেও ইহা যে পুরাতন অবস্থা হইতে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারও প্রমাণ আছে। যাহা হউক চন্দ্রাবলীকে স্বতন্ত্র গোপী হিসাবে পরিকল্পনা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের আদর্শে পরবর্ত্তী সহজিয়া বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও ভাগবত উভয় সংস্কৃত গ্রন্থই প্রাচীন সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ধামালীতে রাধা-চন্দ্রাবলীর একত্ব দেখিয়া ইহার রচনাকে খৃঃ ১৪শ শতাব্দী বলিয়া ধার্য্য করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন চৈতন্য-পরবর্ত্তী বলিয়া আমাদের ধারণা এবং ইহাতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রীয় যুগের রুচি ও ভাব বর্ত্তমান। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের আদর্শ অনুযায়ী রাধা-চন্দ্রাবলীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও পুরাতন হইতে পারে। তবে তাহার সাহিত্যিক বিকাশ খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীতে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ভাষা, ভাব ও আদর্শগত পার্থক্য অত্যধিক। দুই এক স্থানে, যথা—"রাধা বিরহ" অংশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণনা চণ্ডীদাসের পদাবলীর গ্রাম্য সংস্করণ মাত্র। উভয় কবির উহা একত্ব প্রতিপাদক নহে। এই মত যাঁহারা পোষণ করেন দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহাদের সমর্থন করি না। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনায় সাধারণ কামবিলাসের পরি-পোষক ছত্রের অভাব নাই। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাকুক বহিরঙ্গে বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত প্রাকৃতজনোপযোগী কামভাবের দ্যোতক। ইহা সত্ত্বেও উচ্চ-ভাবমূলক ছত্রেরও নিদর্শন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ইহার একান্ত অভাব। বরং প্রেমকে কামের গণ্ডীতে আনিয়া লালসা-পূর্ণ উক্তিতে ইহা পরিপূর্ণ। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি ধামালী গানের আদর্শ বিস্মৃত হন নাই। ভারতচন্দ্র যেরূপ বাহিক অন্নদা-মঙ্গল নামটি রাখিয়া ভিতরের বিশেষ এক অংশে বিদ্যাসুন্দরের কামোদ্দিপক কাহিনী লিখিয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসও বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নাম রাখিয়া ভিতরে ধামালী গানের অশ্লীল রুচির পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। যেটুকু উচ্চাঙ্গের কথা আছে তাহাও চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। পদাবলীর চণ্ডীদাসের যৌবনের লেখা বড়

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নহেন। ইঁহারা এক ব্যক্তি এবং ভিন্ন হইলে বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচীনতর, এই উভয় প্রকার মতই আমরা স্বীকার করি না। পদাবলীর চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী, এই মতেরও আমরা বিরোধী।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে কিশোরীভজক ও সহজিয়াদের প্রভাব সুস্পষ্ট। খৃঃ ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে ইহাদের প্রভাব খুব অধিক ছিল। রাজনৈতিক আবহাওয়াও এই শতাব্দীতে ইহাদের কুরুচির সহায়ক ছিল। সুতরাং খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে পদাবলীর চণ্ডীদাস ও ভাগবতের মালাধর বসু, খৃঃ ১৬শ।১৭শ শতাব্দীতে "মঞ্জরী" ব্যাখ্যাকারী সহজিয়াগণ ও তাহার পরে খৃঃ ১৭শ।১৮শ শতাব্দীতে ধামালীরচক ও গায়ক বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথির সব পত্রের হস্তাক্ষরই একরূপ, এক সময়ের এবং খুব পুরাতন বলিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাচীনত্ব প্রয়াসী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেন নাই। বরং তাঁহার মতে ইহাতে তিন জনের হস্তাক্ষর বর্ত্তমান এবং লেখার কাল ১৪৫০-১৫১৫ খৃঃ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পুথিখানিতে ভুল-ভ্রান্তিও কিছু আছে। পুথি লেখার এই নির্দ্দিষ্ট কাল মানিলে বড়ু চণ্ডীদাস অন্ততঃ খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ব্যক্তি হইয়া পড়েন। কিন্তু হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞগণের মত অকাট্য কি না বলা যায় না। এইরূপ হস্তাক্ষর আরও ১০০।১৫০ বৎসর পরও পাওয়া যায় বলিয়া জানি। ইহা ছাড়া পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। হস্তাক্ষরের অনুমানই সব নহে। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে এই পুথিখানা ছিল কি না জানা নাই, এবং থাকিলেও পুথিটির সময়ের প্রাচীনত্ব ও আদর্শগত উচ্চভাব শুধু এই হেতু স্বীকার করা যায় না।

নিম্নে পদাবলীর চণ্ডীদাস, রামী এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে সামান্য কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

(ক) পদাবলীর চণ্ডীদাস।—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
পিরিতি-রসেতে ঢালি প্রাণ মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি
মন নাহি আন ভায়॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোমার চরণ খানি॥"

(খ) "রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রস-তত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি-দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদম্ব-তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী চারিদিগ হেরি যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান তব প্রেমে হয়ে ভোর॥
চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরিতি জগতে আর কি হয়।
এমন পিরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয়॥"

(গ) চণ্ডীদাসের সহজিয়া[১] পদ।—

"শুন শুন দিদি প্রেম সুধা-নিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেয়ালা দল॥

---

(১) পাদটীকা—

পূর্ববঙ্গগীতিকার ভূমিকায় সহজিয়া মত সম্বন্ধে মন্তব্য উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন, "বিশেষ করিয়া আমরা এখানে এই গীতিগুলির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব গীতি সাহিত্যের সম্বন্ধের কথা বলিব। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের 'একান্তিকার' সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যৌন সম্বন্ধ ধর্মের ভিত্তিতে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ পুরাণেও যৌনসম্পর্কের

কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কিলাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত ভারী
না জানি কি ধন আছে।
* * * *
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ[১]-করুণা যাহার হইয়াছে
সেই যে সহজ বান্ধা॥"

রামীর পদ।—

"নাথ আমি যে রজকবালা।
আমার বচন না জান রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুণ সন্ধান ঘাতে।
এতদুখ্ খ দেখিয়া বিদরএ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিণী শুন গুণমণি
জানিলাঙ তোমার রীতি।
বাসুলি বচন করিলে লঙ্ঘন
সুনহ রসিক-পতি॥"

বড়ু চণ্ডীদাস।—

* * * *
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ ভবে বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।

আনন্দের সঙ্গে বারংবার ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দ্বারা আমরা বঙ্গের সহজিয়া ধর্ম্মের মূল কোথায় তাহার আভাস পাই। চণ্ডীদাসের কবিতা পাঠে জানা যায় তাঁহার সময়ে সহজ সাধনা তরুণ তরুণীদের একটা বিশেষ আচরিত পন্থায় পরিণত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস এই 'তরুণ সাধকদিগকে' ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। এই পথে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা প্রায় আকাশ-কুসুমবৎ কোটিকে গোটিক হয়" ইত্যাদি।
—ভূমিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ৮৩, দীনেশচন্দ্র সেন।

(১) এই শ্রীরূপ-করুণা কথাটিতে এই সহজিয়া পদটির মধ্যে পরবর্ত্তী কালের কোন গায়কের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রূপ গোস্বামী চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্ত্তী ব্যক্তি।

চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ। মো অনুমতী
দেখিলোঁ। মো তুঅজ পহরে ॥
তি অজ পহর নিশী মোঝে কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
মেহানিলোঁ। তাহার বদনে।
ঈসত বদন করি মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভৈয়িলোঁ। মদনে ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল অন্ধার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, বড়ু চণ্ডীদাস।

(খ) বিদ্যাপতি

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং কবি চণ্ডীদাসের সহিত ইনি একাসনে বসিবার উপযুক্ত। তবে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী কবি নহেন, মৈথিলী কবি, সুতরাং তাঁহার পদাবলীও বাঙ্গালায় রচিত না হইয়া মৈথিলী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এই ভাষা হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে এক নবরূপ ধারণ করে তাহার নাম "ব্রজবুলি"। "ব্রজবুলি" একরূপ সরল ও সরস সাহিত্যিক ভাষা এবং বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদগুলিতে "ব্রজবুলির" প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে। বিদ্যাপতির আদর্শে এবং বাঙ্গালার উপর মিথিলার আংশিক প্রভাবের ফলে এই "ব্রজবুলি" বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষরূপে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং "ব্রজবুলি" বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের একজন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে বলা যায়। নতুবা বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে মৈথিলী কবিকে গ্রহণ করা সঙ্গত কার্য্য নহে। কবি বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবিগণ এমন আপন করিয়া লইয়াছেন যে তাহাদের অনেকে বিদ্যাপতির আদর্শে পদ রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার সহিত মিথিলার রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক পুরাতন। মিথিলা (উত্তর-বিহার) বাঙ্গালার সেন রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। বাঙ্গালার নব্যন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চ্চার মূলে মিথিলার বা ত্রিহুতের আদর্শ ও প্রভাব বিদ্যমান। কেহ কেহ অনুমান করেন মিথিলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি "বৃজি"গণের ভাষা এই ব্রজবুলি। অবশ্য ইহা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কবি বিদ্যাপতির কাল নিয়া নানারূপ মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। খুব সম্ভব কবি

বিদ্যাপতি সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন এবং মিথিলার একাধিক রাজার মন্ত্রী, সভাসদ বা রাজকবি হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। কবির সময় স্থির করিতে দুইটি প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়। উহাদের একটি রাজা শিবসিংহ প্রদত্ত ভূমিদানপত্র ও অপরটি মিথিলার রাজপঞ্জীতে উল্লিখিত রাজা শিবসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ। রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতির কবিত্বগুণে পরিতুষ্ট হইয়া বিস্ফী নামক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে যে তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে ২৯৩ লক্ষ্মণ সংবত বা ১৪০০ খৃষ্টাব্দ ভূমিদানপত্রের কাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] অপরপক্ষে মিথিলার রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের সিংহাসনারোহণের যে কাল রহিয়াছে তাহা দেখা যায় ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ। যিনি ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসিলেন তিনি রাজা হিসাবে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ভূমিদান কিরূপে করিতে পারেন? সম্ভবতঃ উভয় প্রমাণই ভুল। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১২৮৯ সনের আশ্বিন সংখ্যার "ভারতী"তে এক প্রবন্ধে ভূমিদানপত্রখানি জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার অনুমানই ঠিক। রাজপঞ্জীর সাক্ষ্যও অবিশ্বাস্য বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন, (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২২৫)।

বিদ্যাপতির নিজ রচিত একটি পদে উল্লেখ করিয়াছেন যে রাজা শিবসিংহ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে উপবেশন করেন (বঃ ভাষা ও সাঃ)। বিদ্যাপতির এই পদ জাল না হইলে রাজপঞ্জীর তারিখ ভুল এবং তাম্রশাসনের কাল নির্দ্দেশ হয়ত ঠিক। আবার এমনও হইতে পারে ইহাদের একটিও ঠিক নহে, উভয় প্রমাণই ভুল। সুতরাং কবি বিদ্যাপতির সময় মোটামুটি অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কবি বিদ্যাপতি যে খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন তাহার কয়েকটি প্রমাণ আছে। যথা,—

(ক) রাজা শিবসিংহের সভাসদ হিসাবে রাজধানী গজরথপুরে অবস্থিতি। বিদ্যাপতির নির্দ্দেশে সংস্কৃত "কাব্যপ্রকাশ" নামক গ্রন্থের একটি টীকা দেবশর্ম্মা নামে কোন ব্রাহ্মণ নকল করেন। ইহার শেষ ছত্রে তারিখ এইরূপ দেওয়া আছে। যথা,—"সমস্ত বিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎশিবসিংহদেব সম্ভুজ্যমানতীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীবিদ্যা-

---

(১) স্যর জি, এ, গ্রিয়ারসন ভূমিদানপত্রে অনেক পরবর্ত্তী কালের সন (আকবর বাদশাহের আমলের সন) সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে জাল ভুলের নকলও হইতে পারে।

পণ্ডী নামাঞ্জয়া গোয়ালসং শ্রীদেবশর্ম্ম বলিয়াসসং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা পুস্তীতি ল সং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০।" এই বর্ণানুসারে পুথিখানি লেখার তারিখ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ। পুথিখানির সংগ্রাহক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(খ) কবি বিদ্যাপতির "লিখনাবলী" নামক সংস্কৃত পুস্তকের উল্লিখিত তারিখ ল সং ২৯৯ অথবা ১৩৩০ শক (১৪০৮ খৃষ্টাব্দ)।

(গ) কবি বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত "ভাগবত" গ্রন্থের রচনার তারিখ ১৪০০ খৃষ্টাব্দ।

(ঘ) কবি বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীর মধ্যে বাঙ্গালার সুলতান নসিরা সাহ, সুলতান গিয়াসুদ্দিন, মালিক বহারদিন, সুলতান হুসেন সাহ, রাজা কংসনারায়ণ এবং তাঁহার রাণী সরমাদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন।

ইঁহাদের কাহারও কাহারও কাল খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইলেও সকলের সময় এই রাজা কংসনারায়ণের শতাব্দীতে পড়ে না। তিনি ১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালার তাহিরপুরের রাজা না হইয়া মিথিলার কোন রাজা হইতে পারেন। নসরৎ সাহের (হুসেন সাহের পুত্রের) সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দী। এই নামগুলি নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত মহাশয়ের সংগৃহীত বিদ্যাপতির পদাবলীতে আছে এবং এইগুলির অধিকাংশ প্রক্ষিপ্ত ভিন্ন আর কি বলিব। তিনি অনাবশ্যকভাবে বিদ্যাপতির নামে এমন বহুছত্র সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা সম্ভবতঃ আদৌ বিদ্যাপতির রচনা নহে।

(ঙ) ঈশাননাগরের "অদ্বৈত-প্রকাশ" পাঠে অবগত হওয়া যায় অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত কবি বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অদ্বৈত প্রভুর জন্ম-সময় ১৪৩৪ খৃঃ এবং তাঁহার বয়স যখন কুড়ি কি একুশ বৎসর তখন উভয়ের দেখাশুনা হইয়াছিল। সুতরাং এই ঘটনার কাল ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়। এই ঘটনা বিশ্বাস করিলে বিদ্যাপতি খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

(চ) বিদ্যাপতি একটি পদে শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণের কাল লিখিয়াছেন ১৪০০ খৃষ্টাব্দ।[১] ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক)চিহ্নিত অংশে বর্ণিত পুথিখানির (কাব্যপ্রকাশের টীকা) বিদ্যাপতির নির্দ্দেশে বা আদেশে ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে নকল করা হইলে এই সময় কবিকে অন্ততঃ যুবক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাহা অনুমান করিলে কবির বয়স এই সময় ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। এইরূপ বয়সেই পুথি লিখিতে নির্দ্দেশ দেওয়ার যোগ্যতা থাকা সম্ভব। কবি রচিত "লিখনাবলী" আরও

(১) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃঃ, ১৩০৭ সাল।

পরিণত বয়সের লেখা বলিয়া অনুমান হয়, কারণ উহা পাকা হাতের লেখা। ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে অদ্বৈত প্রভু এবং বিদ্যাপতির মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিলে এই সময় কবির বয়স ৮৭ বৎসরের কাছাকাছি ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কল্পিত বয়স ও অদ্বৈত প্রভুর বয়স এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) বিদ্যাপতি—জন্ম আনুমানিক খৃঃ ১৩৭৮ কি কাছাকাছি।
মৃত্যু আনুমানিক খৃঃ ১৪৬০ কি কাছাকাছি।

(২) চণ্ডীদাস— জন্ম আনুমানিক খৃঃ ১৪১৭ কি কাছাকাছি।
মৃত্যু আনুমানিক খৃঃ ১৪৭৭ কি কাছাকাছি।
(সোমপ্রকাশ মতে)

(৩) অদ্বৈতাচার্য্য—জন্ম খৃঃ ১৪৩৪ (অদ্বৈতপ্রকাশ)।
মৃত্যু আনুমানিক খৃঃ ১৫৩৯ (প্রেমবিলাস মতে এবং খৃঃ ১৫৮৪ অদ্বৈতপ্রকাশ মতে)।

এই অনুমান অনুসারে বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ ৯২ বৎসর কি তন্নিকটবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস আনুমানিক ৬০ (কিম্বা ৬৫ বৎসর ?) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বোধ হয় ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন (প্রেমবিলাস মতে)। উল্লিখিত বয়সানুমানে ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতাচার্য্য যখন ২১ বৎসরের যুবক বিদ্যাপতি তখন ৮৭ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ এবং এই সময়েই এতদুভয়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময়ে চণ্ডীদাসের বয়স ছিল ৩৮ বৎসর। অদ্বৈত-বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার ঘটিলে আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বিদ্যাপতির ৮২।৮৩ বৎসর এবং চণ্ডীদাসের ৩৩।৩৪ বৎসর বয়সের সময় উভয়ের মিলন হইয়াছিল। ভাগবতের অনুবাদক (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) মালাধর বসুর জন্ম ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে কল্পনা করিলে এবং তাঁহার মৃত্যুকালে ৬০ বৎসর বয়স ধারণা করিলে উহা ১৫০৩ খৃষ্টাব্দ হয়। মহাপ্রভুর জন্মসময় অবশ্য ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ ও তিরোভাব ১৫৩৩ খৃঃ। সুতরাং মহাপ্রভুর বয়স যখন ১৭ তখন মালাধর বসুর মৃত্যু হয়। মহাপ্রভুর জন্মের ৯ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের মৃত্যু ঘটে। বিদ্যাপতির মৃত্যুর প্রায় ২৬ বৎসর পর মহাপ্রভুর জন্ম হয়। মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় ৬ বৎসর পরে অদ্বৈত প্রভু পরলোকগমন করেন। এই হিসাব অনুসারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং মালাধর বসু ও অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বয়স সম্বন্ধে এই সমস্ত অনুমানে প্রচুর ভুল থাকা স্বাভাবিক হইলেও

পরস্পরের পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝিতে ইহা অনেকটা সাহায্য করিবে বলিয়া কল্পনা ও অনুমানের আশ্রয়ে কতকগুলি বয়স সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করা গেল।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ পাণ্ডিত্যগুণে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি ঠাকুর এবং তাঁহাদের গাঞি 'বিষয়বারবিস্ফী'। বিদ্যাপতির নিবাস এই বিস্ফী গ্রামখানি মিথিলার মহারাজ শিবসিংহ প্রদত্ত এবং ইহা সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত। কবি বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির বংশধরগণ এখন সৌরাটিনামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির পিতা গণপতি ঠাকুর "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী" নামক (সংস্কৃত ?) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবির পিতামহ জয়দত্ত ধার্ম্মিক ও সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া "যোগীশ্বর" উপাধি প্রাপ্ত হন। কবির প্রপিতামহের নাম বীরেশ্বর। ইনি প্রসিদ্ধ "বীরেশ্বর পদ্ধতি" নামক স্মৃতিগ্রন্থের প্রণেতা। মিথিলাধিপতি মহারাজা কামেশ্বর তাঁহাকে এইজন্য বিশেষ বৃত্তিদান করেন। কবির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি মহারাজ হরি সিংহের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধর্ম্মাদিত্য (কাহার কাহারও মতে কর্ম্মাদিত্য) হইতে সকলেই মিথিলা রাজের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিয়াছেন।

বাঙ্গালা পদসংগ্রহের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ "পদসমুদ্রে" বিদ্যাপতির পরিচয় এইরূপ আছে।—

"জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর
মৈথিলীদেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেই নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে,
রহতহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে,
বিদ্যাপতি ইহা ভণে॥"

—বিদ্যাপতির পদ, পদসমুদ্র।

কোন কোন বাঙ্গালী সমালোচক জনৈক বাঙ্গালী বিদ্যাপতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাধি "কবিরঞ্জন" ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন। কেহ কেহ আবার "কবিশেখর" উপাধিটিও ইহার সহিত যোগ করেন। ডাঃ দীনেশ

চন্দ্র সেনের মতে মৈথিলী বিদ্যাপতিরই উপাধি ছিল "কবিরঞ্জন"। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, তাঁহার উপাধি 'কবিরঞ্জন' ছিল,—'চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলিল' ও 'পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে' প্রভৃতি পদদৃষ্টে সেরূপও বোধ হয়।"[১] চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে এই উপাধি দুইটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন মহারাজ শিবসিংহ কবিকে "কবিকণ্ঠহার" উপাধি দিয়াছিলেন।[২] কবি বিদ্যাপতি স্বীয় সুদীর্ঘজীবন হেতু সম্ভবতঃ একাধিক মিথিলা রাজের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কবির রচনাতে নানা প্রসঙ্গে কতিপয় রাজা ও রাজবংশের লোকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই রচনা-সমূহে মহারাজ কীর্ত্তিক সিংহ, মহারাজ ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) মহারাজ রামভদ্র (রূপনারায়ণ) মহারাজ শিবসিংহ ও মহারাজ নরসিংহ দেবের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মহারাজ দেবসিংহ, শিবসিংহের আত্মীয়া রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবী ও তাঁহার রাজ্ঞী লছিমা দেবীর নামোল্লেখও আছে।

কবি বিদ্যাপতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

(১) পুরুষ-পরীক্ষা। এই গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত ও মহারাজা শিবসিংহের আদেশে রচিত। ইহাতে শিবসিংহকে শৈব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) শৈব সর্ব্বস্বহার। শৈবধর্ম্মমূলক সংস্কৃত গ্রন্থ ও রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবীর আদেশে রচিত।

(৩) গঙ্গাবাক্যাবলী। সংস্কৃত গ্রন্থ ও রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞাক্রমে রচিত।

(৪) কীর্ত্তিলতা। সংস্কৃত গ্রন্থ। মহারাজা কীর্ত্তিক সিংহের আদেশে রচিত।

(৫) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। মহারাজ ভৈরবসিংহ বা হরিনারায়ণের রাজত্বকালে যুবরাজ রামভদ্র বা রূপনারায়ণের উৎসাহক্রমে এই সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়।

(৬) দানবাক্যাবলী। সংস্কৃত স্মৃতি গ্রন্থ।

(৭) বিভাগসার। সংস্কৃতে রচিত স্মৃতিগ্রন্থ।

---

(১) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" (৬ষ্ঠ সং) পাদটীকা, পৃঃ ২২১।

(২) "ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটি হুঁন ঘটীয় দিবস অভিসার।"
—স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন উল্লিখিত Maithil Songs, A. S. J. Extra No. 193

(৮) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী। ব্রজবুলি মিশ্রিত মৈথিলী ভাষায় এবং মহারাজা শিবসিংহের পত্নী রাজ্ঞী লছিমা দেবীর উৎসাহে রচিত। পদাবলীতে বাঙ্গালার পাঠান সুলতান নসিরা সাহের উল্লেখ আছে। এই সুলতানের জীবনকাল ১৪২৬-১৪৫৭ খৃঃ।

(৯) লিখনাবলী। সংস্কৃত গ্রন্থ। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত।

(১০) ভাগবত। কবির নিজের হাতের লেখা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার কাল ১৪০০ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া বিদ্যাপতি অশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু দেখিয়া মনে হয় কবি নানা ধর্ম্মমতের পরিপোষক গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মমতের গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয়। সুতরাং কবির ধর্ম্মমত প্রকৃত কি ছিল জানা যায় না। মহারাজা শিবসিংহ "পুরুষ-পরীক্ষা" গ্রন্থে কবির বর্ণনা মতে পরম শৈব। কবির "শৈব সর্ব্বস্বহার" নামক সংস্কৃতে রচিত শৈব গ্রন্থ রাজ্ঞী বিশ্বাস দেবীর আদেশে রচিত। বোধ হয় ইঁহারা উভয়েই শৈব ছিলেন। অপরদিকে রাজ্ঞী লছিমা দেবীর পদধ্যান করিয়া কবি কতকগুলি বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লছিমা দেবী রাধা কৃষ্ণের উপর ভক্তিমতী ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি কর্ত্তৃক লছিমা দেবীর বারম্বার অত্যধিক অনুরাগপূর্ণ উল্লেখের হেতু বুঝা যায় না এবং উভয়ের সম্বন্ধ যেন রহস্যাবৃত মনে হয়। কবির রচনাতে বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রবর্ত্তিত লক্ষ্মণাব্দের (লসং) ব্যবহার মিথিলার সহিত বাঙ্গালার নৈকট্যের অন্যতম প্রমাণ। হিন্দু রাজত্বকালে মিথিলা অনেককাল বাঙ্গালার রাজশক্তির অধীন থাকিয়া সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় তৎপ্রবর্ত্তিত "লক্ষ্মণাব্দ" গ্রহণ করিয়াছিল।

কবি বিদ্যাপতির "রাধা-কৃষ্ণ" বিষয়ক পদগুলি অতি উৎকৃষ্ট রচনা। কবি সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাবলী রচনার ভিতর দিয়া তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসেরও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল, কিন্তু তাঁহার রচনা ভাবমাধুর্য্যপূর্ণ, সরল ও অনাড়ম্বর। অপরপক্ষে কবি বিদ্যাপতির রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং উপমাবাহুল্য মণ্ডিত। তবে উভয় কবিই ঈশ্বরদত্ত কবিত্ব শক্তির অধিকারী। উভয়েই সুন্দরের উপাসক। এই সৌন্দর্য্য প্রকাশের ভঙ্গী একজনের আলঙ্কারিক, অপরজনের স্বাভাবিক। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—"উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে

তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি—সৌন্দর্য্যের একটি পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,—কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি।"[১] শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত।......এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায় শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে কবি অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রেমে-বাঁধা আট-সাঁট নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা জীবনের চাঞ্চল্য দেখাইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর কবিতায় এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।"[২]

কবি বিদ্যাপতির রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি নিয়া চণ্ডীদাস রচিত পদাবলীর ন্যায় নানা গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে। বিদ্যাপতির নামে যে পদগুলি সাধারণে প্রচলিত আছে প্রকৃতপক্ষে উহার সবগুলিই বিদ্যাপতির রচনা নহে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

"কোন সম্পাদক বিদ্যাপতির পদসংখ্যা ৮০।১০০টি দিলেন, জগদ্বন্ধু ভদ্রের পর গ্রীয়ারসন এবং তৎপর সারদা মিত্র পদসংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন, তারপর অক্ষয় সরকার মহাশয় আরও কিছু উপকরণ বাড়াইয়া নৈবেদ্যসজ্জা করিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরে নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অতিকায় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এবার সত্যের ক্ষেত্র হইতে অনুমানের রাজ্যে পা' দিয়া স্বীয় এলাকা অসম্ভবরূপ বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন," ইত্যাদি।

যাহা হউক কবি বিদ্যাপতির রচিত পদগুলি ও কবি চণ্ডীদাসের রচিত পদগুলি সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইয়া কবিদ্বয়ের প্রকৃত পদগুলি সাব্যস্ত হইলেই মঙ্গল। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ আবিষ্কার করিয়াছেন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিয়াছেন। এইগুলি কতকটা বিশ্বাসযোগ্য পদ হইতে পারে। কবি বিদ্যাপতির কতিপয় পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং দীনেশচন্দ্র সেন), পৃষ্ঠা ২২৮।
২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশচন্দ্র সেন) পৃষ্ঠা ২৩০।

(১) শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি

“কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপলগতি লোচন লেল।
অব সব খনে রহু আঁচর হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয় বাত॥
কি কহব মাধব বয়সক-সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ-মন রহু বন্দী॥
শুনইতে রস-কথা থাপয় চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনএ সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানয়ে জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সে তনু ছোড় নাহি পারি॥
দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝে ভেল খীন॥
আবে মদন বঢ়ায়ল দিঠ।
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ॥
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ॥
খনে খন নয়ন-কোণ অনুসরই।
খনে খন বসন ধূলি তনু ভরই॥
খনে খন দশন ছটাছট হাস।
খনে খন অধর আগে করু বাস॥
চঙকি চলয়ে খন খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়ক-মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আচর দেই খনে হোয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিঅ জেঠ কনেট॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নহি না জান॥

খন ভরি নাহি রহ গুরুজন-মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাপয় লাজে॥
বালাজন সঙ্গে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তঁহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটল রমণী।
কে কহু বালা কে কহু তরুণী॥
কেলিক রভস যব শুনে আনে।
আনতএ হেরি ততহি দেএ কাণে॥
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখি হসি দেএ গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা-চরিত রসিক-জন জানে॥"

—বিদ্যাপতির পদ।

(২) মাথুর—

"অনুখন মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জরজর জীবইতে ভেলি সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী কাতর-দিঠি হেরি ছল ছল লোচন-পানী।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি আধা আধা বাণী॥
রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহুঁ দিশ দাব-দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥"

(৩) "হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে।
অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নব-যৌবন বিরহে গোঙায়ব কি করব সো পিয়া লেহে॥
হরি হরি কি ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু-নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যদি সৌরভ ছোড়ব শশধর বরখব আগি।
চিন্তামণি যদি নিজগুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগী॥

শাঙণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখব সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥"

—বিদ্যাপতির পদ।

(৪) ভাব-সম্মিলন—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দ।
জীবন যৌবন সফল করি মানলু দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্ব॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকয়ু লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয়-পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহুঁ পিয়া-সঙ্গ হোয়ত তবহি মানব নিজ-দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অল্পভাগী নহ ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥"

—বিদ্যাপতির পদ।

— — —

একত্রিংশ অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পুষ্টি ও বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যের আরম্ভ

শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপার্ষদগণ

(ক) শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনার পূর্ব্বে এই যুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-সময়ে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম এক বিশেষ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। এই সময় অবৈষ্ণব সমাজে শৈবপ্রভাবের স্থলে শাক্তপ্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। "মঙ্গল-চণ্ডীর গান নিশি জাগরণে। দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥"— প্রভৃতি বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্য-ভাগবতের উক্তিগুলি তাহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তম-বিলাসের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে গোড়া বৈষ্ণবগণের যত তাচ্ছিল্যের সুরই মিশ্রিত থাকুক না কেন শাক্তদেবীগণ যে এই দেশে তখন খুব সমাদরের সহিত পূজিতা হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্বৈতপ্রভু এই জ্ঞানপথচারী শাক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-ভক্তি প্রচারে যত্নবান হইয়া শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে উল্লসিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব প্রধানগণ এই সময়ে রাধা-কৃষ্ণ পূজা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং এতৎসঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারেও আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যসাধনোদ্দেশে বৈষ্ণবগণ বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিকে ভগবৎপ্রেমে পরিণত করিবার যে নূতন তত্ত্ব ইঁহারা প্রচার করিলেন তাহাতে যৌনসম্বন্ধজ্ঞাপক স্ত্রী-পুরুষের প্রেম পরিকল্পিত হইল। এইরূপে ভক্তিভাব মাধুর্য্যরসে পরিণত হইল।

ঐশ্বর্য্যভাবপ্রধান ভাগবতের আদর্শ দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে মাধুর্য্যদ্যোতক লীলার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের হরি-হর উপাসক বৈষ্ণব মাধ্বি-সম্প্রদায় ততটা যত্নবান না হইলেও ইঁহাদের গৌড়ীয় শাখা যে তদ্বিষয়ে গভীর মনোযোগী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।[১] স্বয়ং মহাপ্রভুর

১। বাঙ্গালী জয়দেবের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের "সনক" সম্প্রদায়ের এক শাখার নেতা নিম্বাদিত্য (ভাস্করাচার্য্য) "রাধা-কৃষ্ণ" পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন। "রুদ্র" সম্প্রদায়ের নেতা বল্লভাচার্য্য (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) বাল-গোপালের উপাসক ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের ভিন্ন মত পোষণ করেন।

অলৌকিক কার্য্যাবলীই তাহার প্রধান প্রমাণ। দাক্ষিণাত্যের প্রভাবের ফলে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের মধ্যে বাসুদেব পূজার রাধা-কৃষ্ণ পূজায় রূপান্তর হয় এবং শৈব সেন রাজগণের পরবর্ত্তীকালে এই ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহের ফলে কবি জয়দেব রাধা-কৃষ্ণের মধুরলীলা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহার পর আসিলেন চণ্ডীদাস ও মালাধর বসু। চণ্ডীদাস পদাবলীর মধ্য দিয়া বিশেষভাবে এবং মালাধর বসু ভাগবতের সাহায্যে আংশিকভাবে যৌন-সম্বন্ধজ্ঞাপক মধুর রসের মধ্য দিয়া ভগবতারাধনার পথ প্রশস্ত করিলেন। এই ধারণার পূর্ণবিকাশ ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। এই মত প্রচারের প্রধান সহায় পদাবলী, ভাগবত নহে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তৎপরে ভাগবত অপেক্ষা গীতি-সাহিত্যের জন-সাধারণের মধ্যে অধিক প্রসারে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

কিন্তু, বৈষ্ণবধর্ম্মের আর একটি পরিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যের সময়ে গীতি-সাহিত্যের প্রচারের মধ্য দিয়া মাধুর্য্যরস প্রচারে সমধিক মনোযোগী বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব জীবনের আদর্শে এতটা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পটভূমি করিয়া মহাপ্রভুর মধুর জীবনালোচনায় অধিক মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহারই অমৃতময় ফল বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য। শ্রীচৈতন্যযুগে এই বিশেষপ্রকার সাহিত্যের নানাদিকে বিকাশ হইয়াছিল। বৈষ্ণবকাব্য, নাটক ও দর্শন ইহারই বিশেষ প্রকাশ মাত্র।

বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম "গৌড়ীয়" বৈষ্ণবধর্ম্ম আখ্যালাভ করিয়াছে। মহাপ্রভু প্রদর্শিত এই মতবাদের দার্শনিক দিকটার বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব আছে। শ্রীচৈতন্যভক্ত শ্রীজীব গোস্বামী তৎপ্রণীত "ষট্‌সন্দর্ভে" এই দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মূলকথা নিম্নরূপ—

(ক) ব্রহ্মই পরমাত্মা ও ভগবান এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান এবং তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের বহু শক্তি, তবে তন্মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—সন্ধিনী, সংবিত ও হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ পরিকল্পিত হয় ও ইহারা স্বরূপশক্তিরূপে গণ্য হয়।

(গ) ভগবান স্বরূপশক্তি ও জগৎ মায়াশক্তি। জীবের ভিতর স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তি উভয়েরই বিকাশ আছে।

(ঘ) এই মতবাদ শঙ্কর প্রচারিত বেদান্তের জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান

এবং "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" (রজ্জুতে সর্পভ্রম) নামক মতবাদ (মায়াবাদ) বিরোধী। এই বৈষ্ণব মত অনুসারে "জীবের স্বভাব হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।"

(ঙ) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের ভেদ ইহা স্বীকার করে। এই প্রকার বৈষ্ণব মতানুসারে জগৎ প্রাকৃত, কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধে এক জগৎ আছে তাহা অপ্রাকৃত বা নিত্য।

চৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামী বর্ণিত এই সিদ্ধান্ত তাঁহার গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংক্ষেপে ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মের দার্শনিক মূলতত্ত্ব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীব নারীরূপে গণ্য। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমসাধনার ন্যায় সাধনার মধ্য দিয়া এই বৈষ্ণবগণ ভগবানের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন। ইহারা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার স্থান গোলক মনে করেন এবং "সামিপ্য" মুক্তি কামনা করেন। এই বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের মতবাদে কিছু "রহস্য-বাদের"ও স্থান দিয়াছেন। ইহার মূলে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আকর্ষণ রহিয়াছে। এইদিক দিয়া যোগ-পন্থাবলম্বী সন্ন্যাসীগণের সহিত এই বৈষ্ণবগণ তুলনীয়। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণের মধ্যেও এই প্রকার অনেক রহস্যবাদীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান সম্বন্ধে অপূর্ব্ব অনুভূতি এবং সমস্ত বাসনাকামনার ঊর্দ্ধে একরূপ বিশেষ অবস্থা প্রাপ্তির আভাষ এই রহস্যবাদীগণ দিয়াছেন।

মর্ত্ত্যে রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনায় ইহার ভৌগোলিক দিক যতটা কাল্পনিক ততটা বাস্তব নহে। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ আবিষ্কৃত শ্রীবৃন্দাবন ভাগবত কথিত শ্রীবৃন্দাবন কি না তাহা সঠিক বলা যায় না। মুসলমান যুগের ফকিরাবাদ গ্রামকে ইহারা পুরাণবর্ণিত প্রাচীন শ্রীবৃন্দাবন ধার্য্য করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডল বা শূরসেন দেশ বলিতে আগ্রার নিকটবর্ত্তী ৮৪ ক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট ও যমুনানদী প্রবাহিত যে দেশ রহিয়াছে তাহা এবং তন্মধ্যে প্রাচীন রাজধানী মথুরা, গোকুল ও বৃন্দাবন নামক স্থানত্রয় বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যান্য স্থানগুলির উল্লেখ তাঁহারা তত প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। এই স্থানগুলির মধ্যে মাধুর্য্যরসের কেন্দ্রস্থলরূপে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীবৃন্দাবন অতি প্রিয় স্থান। যমুনাতীরে অবস্থিত বৃন্দাবন রাধা-কৃষ্ণলীলার কেন্দ্রস্থল পরিকল্পিত হওয়াতে এই স্থান সম্বন্ধে পদ লিখিয়া ও বাঙ্গালা ভাগবতে উল্লেখ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলার স্থানগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা

যায় মথুরাতে কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় এবং সেই রাত্রিতেই যমুনানদীর অপরতীরে গোকুলের অন্তর্গত মহাবন নামক স্থানে নন্দের বাড়ীতে তাঁহাকে লুকান হয়। তথা হইতে তাঁহাকে অল্পদিন মধ্যেই কংসভয়ে সরাইয়া এগার ক্রোশ দূরে নন্দগ্রাম নামক স্থানে রাখা হয়। মথুরা ও যমুনা হইতে অনেক দূরে, অথচ যমুনানদীর একই তটে অবস্থিত এই স্থানটি নন্দঘোষ স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করেন এবং মহাবনের নিকটবর্ত্তী রাউলগ্রাম (শ্রীরাধার জন্মস্থান) হইতে আসিয়া নন্দগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বর্ষানগ্রামে শ্রীরাধাসহ বৃকভানু গোপ বসবাস করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় গোকুলে বাল্যলীলা দেখান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব। এক গোচারণ ভিন্ন বৃন্দাবনের ঝোপঝাড়পূর্ণ অরণ্যভূমিতে এবং মথুরা হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে শ্রীকৃষ্ণের যাতায়াতও সম্ভব নহে এবং তাহা হইলেও কদাচিৎ হওয়াই সম্ভব। এই বৃন্দারণ্য কোন গ্রাম নহে এবং কংসানুচরগণের এই অঞ্চলে যাতায়াতের খুবই সম্ভাবনা। সুতরাং এমন অবস্থায় নন্দঘোষ যমুনানদীর এককূল "দানী" হইলেও বালক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধা এবং অপর গোপ-গোপীগণসহ তথায় "লীলা" দেখান কিরূপে সম্ভব বুঝা যায় না। অথচ বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ গোকুল, শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনানদী সম্পর্কে কত উচ্ছ্বসিত পদই না রচনা করিয়াছেন! গোপবালকগণসহ শ্রীকৃষ্ণ কয়েকটি কংসানুচর নিধন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবদ্যোতক এই বীরত্বপূর্ণ কার্য্যের সহিত পুতনা-বধের, গোবর্দ্ধন-ধারণের ও শ্রীরাধার সহিত লীলার কোন সামঞ্জস্য হয় না। পুতনা-বধকারী শ্রীকৃষ্ণ শিশু এবং শ্রীরাধার সহিত প্রেমলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের অন্ততঃ কিশোর বয়স কল্পনা করিতে হয়। বিভিন্ন বয়সে শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত লীলা দেখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু যশোদার বাৎসল্যরসস্ফুরণের বর্ণনায় বালক শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে যাইতেছেন দেখা যায়। আবার এই বয়সেই শ্রীরাধাকে প্রেমদানও করিতেছেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে বড় বলিয়াও দেখান হইয়াছে। ইহার মূলতত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত। অবশেষে উভয়কে কিশোর-কিশোরী প্রতিপন্ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" সুতরাং তিনি সব কার্য্যই করিতে পারেন। এই মতানুসারে তিনি কিশোর বয়সে কংসকে বধ করিবেন তাহাতে আমাদের বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অনেক পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে গোকুল হইতে কংসের ধনুর্যজ্ঞে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় তাঁহার প্রকৃত বাসভূমি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সর্ব্বোপরি কথা এই যে বাঙ্গালী আবিষ্কৃত শ্রীবৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের

লীলাভূমি অপেক্ষা ছয়জন বাঙ্গালী গোস্বামীর এবং কতিপয় বৈষ্ণব মহাজনের বাসস্থানে পরিণত হওয়াতে এবং বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যের আগমন হেতু স্থানটির মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হওয়াতে উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এত প্রিয়স্থান হইয়াছে। মাধুর্য্যরসব্যাখ্যায় স্থানটির মূল্য মহাপ্রভুর শেষজীবনের লীলাভূমি শ্রীক্ষেত্র হইতেও বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণের নিকট অধিক বলিয়া মনে হয়।

যে যুগাবতার মহামানব শ্রীচৈতন্যের জীবনী বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের নবচেতনা জাগ্রত করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে, নিম্নে তাঁহার জীবন-কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহের নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, সন্ধ্যার কিছু পরে এবং চন্দ্রগ্রহণকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়।[১] মহাপ্রভু বংশপরিচয়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেণীর ছিলেন। এই পরিবারের পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট ও আদি নিবাস উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে ছিল। তৎকালে নবদ্বীপের টোল সংস্কৃতচর্চ্চায় খুব প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং জগন্নাথ মিশ্র অল্পবয়সে এই স্থানের টোলে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। পাঠসমাপন করিতে আসিয়া তিনি এই স্থানেই শচীদেবীকে বিবাহ করেন এবং বসবাস করিতে থাকেন। শচীদেবীর গর্ভে ৮ কন্যা ও ২ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার সবকয়টি কন্যাই অল্পবয়সে মারা যায় এবং শুধু দুই পুত্র জীবিত থাকে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বড়টির নাম বিশ্বরূপ এবং ছোটটির নাম বিশ্বম্ভর। এই বিশ্বম্ভর নিমাই, মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য বা শুধু চৈতন্য নামেও পরিচিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অধ্যয়ননিরত অবস্থায় অকস্মাৎ বৈরাগ্যোদয়ে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চিরতরে অদর্শন হন। তাঁহার পিতামাতা পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহদিনের পূর্ব্ব-রাত্রে তিনি পলায়ন করেন। সুতরাং একমাত্র নিমাই পিতামাতার নয়নের মণি হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। নিম্ববৃক্ষতলে অবস্থিত আতুরঘরে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করাতে বাল্যে তিনি নিমাই বা "নিমাঞি" নামে সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাঙ্গালার পাঠান সুলতান সুবিখ্যাত হুসেন সাহ গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন।

১। নবদ্বীপ নগরের যে পল্লীতে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন তাহার নাম মিঞাপুর বা মায়াপুর। বর্ত্তমান নবদ্বীপ প্রাচীন ও প্রকৃত নবদ্বীপ কি না তাহা নিয়া প্রবল মতান্তর আছে।

শ্রীচৈতন্যের বংশলতা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিশুদ্ধ মিশ্র
(বাৎস্যায়ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যা-যাজপুরের অধিবাসী)

মধুকর মিশ্র
ইনি ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেব ভ্রমরবরের ভয়ে যাজপুর ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে বসতিস্থাপন করেন কেহ কেহ ঢাকা দক্ষিণ স্থানে বড়-গঙ্গাগ্রাম এবং কেহ কেহ (যথা জয়ানন্দ) জয়পুর গ্রাম অনুমান করেন।

উপেন্দ্র (বিবাহ—কমলাবতী) | [illegible] | কীর্ত্তিদা | কান্তিদাস

কংসারি | পরমানন্দ | পদ্মনাভ | সর্ব্বেশ্বর | জগন্নাথ (অন্যনাম পুরন্দর মিশ্র। ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি নবদ্বীপে বসতিস্থাপন করেন। বিবাহ—শচীদেবী, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা।) | জনার্দ্দন | ত্রৈলোক্যনাথ

আট কন্যা (বাল্যে মৃত।) | বিশ্বরূপ (ইনি ১৬ বৎসর বয়সে ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চিরতরে অদর্শন হন।) | বিশ্বম্ভর (অথবা কৃষ্ণ চৈতন্য বা চৈতন্য—সন্ন্যাস গ্রহণের পরের নাম। জন্ম ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ
বিশ্বম্ভরের দুই বিবাহ
১ম—লক্ষ্মী, নিঃসন্তান ও সর্পাঘাতে মৃত্যু
২য়—বিষ্ণুপ্রিয়া, নিঃসন্তান)

শ্রীচৈতন্যের মাতামহ বংশ।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী
(বৈদিক ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্টাগত এবং নদীয়ার অন্তর্গত বেলপুকুরিয়া পল্লীতে বাস।)

যোগেশ্বর পণ্ডিত | রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য্য | শচীদেবী (বিবাহ—জগন্নাথ মিশ্র) | সর্ব্বজয়া দেবী (বিবাহ চন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীহট্ট।)

লোকনাথ
(বিশ্বরূপের সহিত একসঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ। ইনি "শঙ্করারণ্য পুরী" নামে পরিচিত।)

শ্রীচৈতন্যপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার বংশলতা।

দুর্গাদাস মিশ্র
(বৈদিক ব্রাহ্মণ, বিবাহ—বিজয়াদেবী)

সনাতন
(বিবাহ—মহামায়া)
বিষ্ণুপ্রিয়া (একমাত্র সন্তান)

কালিদাস
(বিবাহ—বিধুমুখী)
মাধবাচার্য (শ্রীচৈতন্যের ছাত্র ও ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অনুবাদক)

চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত ও Chaitanya and his Companions (D. C. Sen) দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ প্রাচীনকাল হইতেই নানাদিকে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। কেহ কেহ নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যায় ইহার অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের নাম করেন। আতাপুর, সিমুলিয়া, মজিতাগ্রাম, বামনপুখুরিয়া, হাটডাঙ্গা, রাতুপুর, বিদ্যানগর, বেলপুখুরিয়া, চাঁপাহাটি, মানগাছি, বাল্লপুর, মিশ্রাপুর (মায়াপুর), গন্ধবণিক-পাড়া, মালাকার-পাড়া, শাঁখারি-পাড়া, তাঁতি-পাড়া ইত্যাদি নামে এই সুবৃহৎ নগরটি নানা অংশে বিভক্ত ছিল। কাহারও কাহারও মতে "নবদ্বীপ" অর্থ গঙ্গানদীর মধ্যে নূতন দ্বীপ। হিন্দু রাজত্বকালে নবদ্বীপ সেনরাজগণের অন্যতম রাজধানী ছিল। মুসলমান আমলেও নগরটির প্রসিদ্ধি কমে নাই। তখনও, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের সময়ে ইহা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ন্যায়শাস্ত্র "নব্যন্যায়" নামে নূতন টীকা বা ব্যাখ্যা সহ নূতন ভাবে অধীত হইতে থাকিলে মিথিলার ন্যায়-শাস্ত্রের যশ চির অস্তমিত হইল এবং নবদ্বীপের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার ফলে নবদ্বীপ বাঙ্গালার রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য হইল। মিথিলার অতি বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্থাপিত নব্যন্যায়ের টোল হইতে তিনজন কৃতি ছাত্র বাহির হইয়াছিল—তাঁহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন বাসুদেবের ছাত্র। রঘুনাথ নব্যন্যায়ে ও রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রে যে যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রীচৈতন্য বাসুদেবের ছাত্র না হইয়াও অধিক জ্ঞান ও গুণের পরিচয় দিয়াছেন। তৎকালে বাঙ্গালা দেশ তান্ত্রিকতার ও জ্ঞানমার্গের সাধনায় বিশেষভাবে লিপ্ত ছিল। শ্রীচৈতন্য জ্ঞানচর্চ্চা পরিত্যাগ

করিয়া ভক্তি-মার্গ অবলম্বন করিলেন এবং পাণ্ডিত্য অপেক্ষা স্বীয় জীবনে দেবত্বের বিকাশ দেখাইলেন। এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব।

নবদ্বীপের জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস তাঁহার রচিত চৈতন্য-ভাগবতে সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়াছেন। যথা,—

"নবদ্বীপের সমৃদ্ধি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব করে।
বালকে হো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥"

—বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত।

শ্রীচৈতন্যের শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবতকার যে উজ্জ্বল ও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে শ্রীচৈতন্যের শিশুসুলভ চাঞ্চল্যের বর্ণনায় ভক্তরচিত চরিতাখ্যান মধ্যে অতিরঞ্জনের অভাব নাই। ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের অতিমানুষী লীলার সহিত তাহা প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছে—অথবা শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে পরিগৃহীত মহাপ্রভু সেই প্রাচীন ধারার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। পাঁচ বৎসর বয়স্ক নিমাইর নামে একটি অভিযোগ এইরূপ,—"কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।"—(চৈতন্য-ভাগবত)। মাতা শচীদেবী তাঁহাকে একদিন কোন কারণে তিরস্কার করিলে শিশু চৈতন্য উত্তর দিলেন,—

"প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খবিপ্র জানিব কি মতে॥
মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান।" —(চৈতন্য-ভাগবত)

শিশু নিমাই মাতাকে শুনাইতেছেন—"সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান।" এতৎসম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক। এই সব অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি হইতে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যায় যে নিমাই বাল্যে খুব দুরন্ত ও চঞ্চল এবং কৈশোরে খুব পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম বয়সে যে তিনজন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস

ও সুদর্শন। পড়াশুনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে তিনি অপূর্ব্ব মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার ফলে অল্প বয়সে তিনি অত্যন্ত তার্কিক হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কৈশোরের রহস্য-প্রিয়তার প্রাবল্যে কখনও কখনও গুরুজনের সহিত বাক্যালাপে মর্য্যাদার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও প্রাচীন মুরারী গুপ্তকে তর্ক প্রসঙ্গে উক্তি করিতেছেন—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী দঢ় কর॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"

—(চৈতন্য-ভাগবত, আদি)

এইরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ গদাধর পণ্ডিতকেও তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ শ্রীহট্টের অধিবাসীগণকেও নবদ্বীপে দেখিতে পাইয়া রহস্য করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার এই রহস্যপ্রিয়তার মাত্রা এত অধিক ছিল যে ঈশ্বরপুরী ভক্তিশাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মে মতি আনিতে সচেষ্ট হইলে তিনি এই শ্লোকগুলির মধ্যে ব্যাকরণের দোষ দেখিতে পাইতেন এবং ঈশ্বরপুরিকে একদা বলিয়াছিলেন—"প্রভু কহে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।" মহাপ্রভুর এইরূপ ব্যবহার তাঁহার বহিরঙ্গ মাত্র। অন্তরে তিনি গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠগণকে শ্রদ্ধা করিতেন। ভগবদ্ভক্তির অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীও তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবাহিত ছিল।

প্রায় কুড়ি বৎসর বয়সে নিমাই বিদ্যাসমাপন করিয়া স্বয়ং একটি টোল খুলিলেন। প্রসিদ্ধ ভাগবতকার ও তদীয় শ্যালক মাধবাচার্য্য এই টোলের ছাত্র ছিলেন। নিমাই বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যাকরণশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন এবং এই বিষয়ে একখানি টীকাগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা বা টিপ্পনীর নাম "বিদ্যাসাগর টীকা"। যথা—

(ক) দিনে দিনে ব্যাকরণে চৈতন্য চমৎকার।
ব্যাকরণের করয় টিপ্পনী আপনার॥"

—ভক্তি-রত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

(খ) "বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাহার রচিত॥"

—অদ্বৈত-প্রকাশ।

"অদ্বৈত-প্রকাশ" পাঠে জানা যায় শ্রীচৈতন্যের "বিদ্যাসাগর" উপাধি ছিল। মহাপ্রভু টোলে অধ্যাপনা করিবার কালে ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইহার ফলে এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দিগ্বিজয় লাভ ঘটে না এবং নিমাই পণ্ডিতের যশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহার পর মহাপ্রভু একবার পূর্ব্ব-বঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে ও নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। প্রেমবিলাস প্রামাণ্যগ্রন্থ হইলেও শেষাংশ (বিংশ বিলাসের পর তিন বিলাস) তত প্রামাণ্য নহে বলিয়া মতভেদ আছে। চৈতন্যভাগবতকারের মতে শ্রীচৈতন্য পদ্মানদীর তীরস্থ কতিপয় গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র বাইস বৎসর ছিল। এই সময় হইতে তিনি নিজের ভিতরে ভগবৎ প্রেমোচ্ছ্বাস অনুভব করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে উহা গোপন রাখিতেন। শ্রীচৈতন্যের "বিদ্যাসাগর" নামক ব্যাকরণের টীকা তখন অনেক টোলে পড়ান হইত, সুতরাং সকলে তাঁহাকে ব্যাকরণে পণ্ডিত বলিয়া জানিত—তাঁহার ভিতরের আধ্যাত্মিকতার কথা তখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যের পদধূলিস্পর্শে স্বীয় গ্রামটিকে সাধারণের চক্ষে যাহাতে পবিত্র দেখায় এই জন্য কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তি অহেতুক শ্রীচৈতন্যের আগমনের সহিত স্বীয় গ্রাম জড়িত করেন। যাহা হউক মোটা-মুটি তিনি নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে গিয়াছিলেন।

১। শ্রীহট্ট—স্বদেশ-দর্শন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইলে তদীয় পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও বাটীস্থ আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় গ্রাম ঢাকা-দক্ষিণেও গিয়াছিলেন। তিনি তদীয় পিতামহী কমলাবতীপ্রদত্ত একটি কাঁঠালের স্বাদ গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিয়াছিলেন। ঢাকা-দক্ষিণ (অথবা বড়গঙ্গা) গ্রামে অবস্থিতির সময় মহাপ্রভু স্বীয় পিতামহের ব্যবহারের জন্য স্বহস্তে সংস্কৃত চণ্ডীর একখানি নকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উহা উপহার দিয়াছিলেন।

২। স্বদেশ যাত্রাপথে তিনি প্রথমে ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া কোটালিপাড়া গ্রাম দর্শন করেন ও ঢাকা-বিক্রমপুরে পৌঁছেন। তথায় তিনি নূরপুর ও সুবর্ণগ্রাম নামক গ্রাম দুইটিতে গমন করেন। কথিত আছে পদ্মা-তীরে তাঁহার সহিত তপন মিশ্র নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হয়। তপন মিশ্রের পুত্রই বৃন্দাবনের অন্যতম প্রধান গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট।

৩। অতঃপর আরও পূর্ব্বদিকে, ক্রমে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া

এগারসিন্ধু নামক স্থানে পৌছেন। এগারসিন্ধু পরবর্ত্তী কালে খুব প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহার পর তিনি নিকটবর্ত্তী বেতল গ্রামে পৌছেন এবং তৎপরে ভিটাদিয়া গ্রামে আগমন করেন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পদ্মগর্ভ আচার্য্য এই ভিটাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। পদ্মগর্ভের পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর জীবিতকালে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ভিটাদিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরুষোত্তম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপ-দামোদর নাম গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় বারানসীধামে মহাপ্রভুর সহিত স্বরূপ-দামোদরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ "কড়চা" লেখক এবং চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার গ্রন্থ হইতে স্বীয় গ্রন্থ রচনার অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভিটাদিয়া হইতে মহাপ্রভু স্বগ্রাম ঢাকা-দক্ষিণ বা বড়গঙ্গা (মতান্তরে) উপস্থিত হন, এবং স্বল্পদিন তথায় থাকিয়া পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্ব-বঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রথম বিবাহ হয়। তিনি গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীদেবী নামে একটি মেয়েকে প্রায়ই দেখিতে পাইতেন। ক্রমে উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হন এবং শচীদেবী ইহা অবগত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীচৈতন্যের বিবাহ দেন। এই বিবাহে প্রথমে শচীদেবীর তত মত ছিল না। শুধু পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ শুভ হয় নাই। স্বল্পকাল মধ্যেই শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ব-বঙ্গ ভ্রমণে গেলে লক্ষ্মীদেবীর সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। তিনি গৃহে ফিরিয়া এই মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনার সংবাদ জানিতে পারেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে সংসার-বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যতম কারণও হইতে পারে। যাহা হউক তাঁহার অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা শচীদেবী তাড়াতাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া নামে অন্য একটি মেয়ের সহিত শ্রীচৈতন্যের বিবাহ দেন। বিশ্বরূপের ন্যায় বিশ্বম্ভরও সন্ন্যাসী হইবে ইহা শচীদেবীর ইচ্ছা ছিল না।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেন। যথা-সময়ে শ্রীচৈতন্য পিতৃপিণ্ড দানের জন্য গয়া যাত্রা করেন। পথে কুমারহট্ট গ্রামে ঈশ্বরপুরীর ভক্তিপ্রাবল্য দর্শনে তিনি অতিমাত্র আকুল হইয়া পড়েন। চৈতন্য-ভাগবতে আছে—"প্রভু বলে কুমারহট্টের নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥" সংসার-বৈরাগ্য সম্বন্ধে ও ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে শ্রীচৈতন্যের উপর যে মহাজনের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পড়িয়াছিল তিনি অদ্বৈত প্রভু। বৃদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর প্রতি শচীদেবী সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনিই বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-

গ্রহণের একমাত্র হেতু বলিয়া শচীদেবী স্থির করিয়াছিলেন। পুত্র নিমাইকে অধিক পড়াশুনা করাইতে পর্য্যন্ত তিনি ভয় পাইতেন এবং যত সত্বর পারেন তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। যখন তিনি স্বামী ও সন্তানগণ হারাইয়া একমাত্র পুত্র নিমাইকে চক্ষের মণি করিয়া ঘরসংসার করিতেছেন এবং অল্পদিন পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন এমন সময় সদ্য গয়াপ্রত্যাগত পুত্রের বৈরাগ্যদর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তখন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শচীদেবী মনোদুঃখে বলিয়াছিলেন, "কে বলে অদ্বৈত হয় এ বড় গোঁসাই। চন্দ্রসম একপুত্র করিয়া বাহির। এই পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥" — চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

শচীদেবী শিবাদিঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগেও নিমাইর উচ্ছ্বাস ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি সারাইতে অপারগ হন। ইহা যে সাধারণ ব্যাধি নহে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ শ্রীচৈতন্যের মানসিক অবস্থা দর্শনে গদাধর, অদ্বৈত প্রভু, শ্রীধর, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উল্লসিত হইলেও শচীদেবীর মাতৃহৃদয় ইহাতে অত্যন্ত ব্যথাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের অবস্থাও যে খুব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ইহা সহজেই অনুমেয়।

যে তিনজন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম অদ্বৈত প্রভু, কেশব ভারতী ও ঈশ্বরপুরী। এই তিনজন মহাজনের মধ্যে অদ্বৈত প্রভুর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপে, তথা সমগ্র বঙ্গদেশে, তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র প্রচারে ঐকান্তিক আগ্রহ সর্ব্বজন-বিদিত। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তিনি লোকপরিত্রাণের জন্য তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বাঞ্ছিত নবদেবতা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং প্রথম যৌবনেই গয়াতে পিতৃপিণ্ডদান উপলক্ষে যে ভাবাবেশের লক্ষণ দেখাইলেন তাহাতে অদ্বৈত প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহার ঘন ঘন ভক্তির উচ্ছ্বাস ও মূর্চ্ছা দর্শনে তাঁহার সঙ্গিগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা অতি কষ্টে তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন বটে কিন্তু তিনি পণ্ডিত গদাধরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ভাবাবেশে কাঁদিতে লাগিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে তিনি নিত্য ভক্ত শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তনে সকলকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়া এই সময়ে প্রত্যহ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করিতেন এবং প্রায়শঃ সদলে নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইতেন। ইহাতে গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিল এবং "ভট্টাচার্য্যগণ" (তাহাদের নেতাগণ) মুসলমান কাজির নিকট অভিযোগ

উপস্থিত করিল। কাজিও মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। সমস্ত নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভগবৎ প্রেমের বন্যা বহিয়া গেল। তার্কিক নিমাইর এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে সকলে বিস্মিত হইল। এইভাবে কিছুকাল কাটিলে "ভট্টাচার্য্যগণের" বিরোধিতায় বিরত শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপত্যাগে মনস্থ করিলেন। অবশেষে একদিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শচীদেবী এই সংবাদ শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং পুত্রকে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার আকর্ষণে ঘরে রাখিতে চেষ্টিতা হইলেন। কিন্তু সবই বিফল হইল।[১]

নিমাই কাঁটোয়া গমন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এইস্থানে মস্তকমুণ্ডন করিয়া এবং কেশবভারতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া নবজীবনের সূত্রপাত করিলেন। এখন হইতে তিনি "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম গ্রহণ করিলেন। এই সময় (১৫০৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ২৪ বৎসর হইয়াছিল। এইস্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈত প্রভু, ঈশ্বরপুরী এবং কেশবভারতী, তিনজনই মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। এই মহাজনগণের মধ্যে কেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু হইলেও তাঁহার দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী বৈষ্ণবমন্ত্রে শ্রীচৈতন্যকে দীক্ষিত করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা যাত্রা করেন। এই দেশে আসিয়া তিনি পুরীতে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সাক্ষাৎ পান। বাসুদেব প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু উত্তরে শ্রীচৈতন্য যখন বলিলেন ভগবৎ প্রেমে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু সন্ন্যাসী হইবার স্পর্দ্ধা রাখেন না তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। বাসুদেব উপনিষদ ও গীতা ব্যাখ্যা করিবার পর শ্রীচৈতন্য তাহার যে চমৎকার ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শ্রবণে এবং ব্যাখ্যার সময় শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগ দর্শনে বাসুদেব স্বীয় ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে এইস্থানে তিনজন বিশেষ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের পরম-ভক্ত হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা বাসুদেব সার্ব্বভৌম, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র এবং তাঁহার মন্ত্রী রামানন্দ রায়। বলা বাহুল্য, বাসুদেব অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য ব্যাখ্যাত দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেন।

---

(১) সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের একটা অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধিমন্ত খানের বাটীতে "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকে তিনি রুক্মিণীর পার্ট নিয়াছিলেন। উহার খুব প্রশংসা হইয়াছিল। শচীদেবী পর্য্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। শ্রীবাস নারদ সাজিয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নাটকে উহার প্রশংসা সূচক উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং মালাধর বসুর ভাগবত শুনিতে ভালবাসিতেন ও ভাবে বিভোর হইতেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে।

উড়িষ্যায় কিছুদিন থাকিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দদাস (গোবিন্দ কর্ম্মকার) নামে ভৃত্য এবং কালা-কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালা-কৃষ্ণদাস কিছুদূর গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের আদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন শুধু গোবিন্দদাসকে সঙ্গে নিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন এবং ১৫১১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।[১] তিনি এই ভ্রমণে যে সব স্থানে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গোদাবরী, ত্রিমন্দ, সিদ্ধবটেশ্বর, মুন্না, বেঙ্কট, বগুলাবন, গিরিশ্বর, ত্রিপদীনগর, পান্না-নরসিংহ, বিষ্ণু-কাঞ্চি, কলাতীর্থ, চাইপল্লী (ত্রিচিনপল্লী), নাগর, তাঞ্জোর, পদ্মকোটা, রঙ্গধাম, রামনাথ, রামেশ্বর, মধিকাবন, কন্যাকুমারী (তাম্রপর্ণী নদী উত্তীর্ণ হওয়ার পর), ত্রিবঙ্কু (ত্রিবাঙ্কুর), পয়োষ্ণী, মৎস্যতীর্থ, কাছড়, চিতোল (চিৎলদ্রুগ), গুর্জ্জরী, পূর্ণা (পুনা), পাটন, জাজুরি, চোরানন্দীবন, নাসিক, ত্রিম্বক, দমন, ভরোচ, বরোদা, আহাম্মদাবাদ, ঘোগা, সোমনাথ, দ্বারকা, দোহদনগর, আমঝোরা, কুকসী, মন্দুরা, দেওঘর, চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর, স্বর্ণগড়, সম্বলপুর, দাসপাল, আলালনাথ উল্লেখযোগ্য। তাহার পর তিনি পুরীতে ফিরিয়া আসেন।

১৫১১ খৃষ্টাব্দে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল পরে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি বলদেব ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং এই ভ্রমণে প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। কটক হইয়া ঝাড়খণ্ডের (ছোটনাগপুরের) পথে বারাণসী ও প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। বারাণসীধামে প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী নামে তথাকার প্রধান শৈব সন্ন্যাসীকে মহাপ্রভু ভক্তিশাস্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য খণ্ডে) সবিস্তরে বর্ণিত আছে। ইহার পর পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রায় ১৮ বৎসর তথায় বাস করেন। এই স্থানে, মাত্র ৪৮ বৎসর ৪ মাস বয়ঃক্রমকালে, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় (জুলাই) মাসে তাঁহার তিরোধান হয়।

পুরীতে বাসকালে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শনে নিত্য ভাবাবেশ, রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যভক্তি, বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণবের রথযাত্রাকালে প্রতি বৎসর শ্রীচৈতন্যদর্শনে পুরীতে আগমন, ভাগবতকার মালাধর বসুর পুত্র (?) সত্যরাজখানকে জগন্নাথদেবের রথ টানিবার পট্টডোরি প্রতিবৎসর সংগ্রহে মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে ও জগন্নাথদেবের মন্দির পরিচর্য্যায়

(১) চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত ও গোবিন্দদাসের কড়চা দ্রষ্টব্য।

ভাবাবেশ ও উল্লাস—এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু ঘটনা তাঁহার পুণ্য স্মৃতি-চিহ্নাদিসহ শ্রীক্ষেত্র বা পুরী নগরকে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। মহাপ্রভু পুরীতে থাকিবার সময় তাঁহার মাতা শচীদেবীকে একেবারে বিস্মৃত হন নাই। তিনি প্রতি বৎসর জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া মাতার খবর লইতেন। অতি দুঃখিতচিত্তে একবার মাতাকে তিনি নিম্নরূপ জানাইয়াছিলেন—

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইবু আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥"

—চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

মহাপ্রভুর তিরোধানের স্বল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে অদ্বৈত মহাপ্রভু জগদানন্দ মারফৎ এই কয়েকছত্র হেয়ালীপূর্ণ কথা মহাপ্রভুকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যথা,—

"বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

—চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা,
১৯ পরিচ্ছেদ।

এই কথাকয়টির প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা আর কেহই বুঝিতে না পারিলেও মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের সময় আসন্ন বলিয়া অদ্বৈত প্রভু কোন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। এখন পর্য্যন্ত এই ছত্র কয়টির ব্যাখ্যা নিয়া তর্ক চলে। মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিছু বক্র মন্তব্য মাঝে মাঝে শ্রুত হওয়া যায়। যথা,—

(১) বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্পর্কিত অতিপ্রাকৃত ঘটনা (নারায়ণী দেবী সম্পর্কে।

(২) পুরীতে দেব-দাসীর নৃত্যদর্শনে আনন্দ লাভ এবং মাধবী ও ছোট হরিদাসের কাহিনী।

(৩) দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে "সিদ্ধবটেশ্বর" নামক স্থানে তীর্থরাম নামক এক দুষ্টবুদ্ধি যুবক প্রেরিত সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক দুইটি

বারবণিতাকে কৃষ্ণপ্রেম দান সম্পর্কিত ঘটনা। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী ঘোগাগ্রামে বারমুখী নামক বারবণিতাকে উদ্ধার।

(৮) দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে অবৈষ্ণব দেবতাগণকে ভক্তি দেখাইবার ঘটনা।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে যাহারা কূট ও অপ্রীতিকর মন্তব্য করিতে ইচ্ছুক তাহারা তাহা করিতে পারেন। আমরা শ্রীচৈতন্যের অসামান্য দেবচরিত্রে বিশ্বাসী এবং তাহাই থাকিব। সুতরাং ইহা নিয়া বিতর্ক করিতে আমরা একান্ত অনিচ্ছুক এবং প্রশ্নগুলি আমাদের চক্ষে একান্ত অবান্তর তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

(ক) "বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,—ইঁহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব্ব কথা প্রচার করিতেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইঁহাদের সকলের মিলন হইয়াছিল। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে—পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ও শ্রীচৈতন্যবল্লভ দত্ত। বূঢ়নে—হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে—শ্রীনিত্যানন্দ। ইঁহারা দীপশলাকা; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না কে বলিবে?"

"শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে।...তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার

"Let us now analyse what it was that made Chaitanya the centre of universal admiration in our country Rupa, Sanatan and Raghunatha Das had passed through great hardships and sacrifices for their love of him and so did Haridas the Mahomedan convert What difference is there between their lives and his Chaitanya did not practise austerities as Raghunatha did He had no princely fortune to give up for spiritual pursuits like the first named three amongst his followers. As a Sannyasi he was not very strict; for he was often taken to task by Damodara Pandit for violating the rules of his order, and he frankly told Raghunatha that he did not know the details of Vaisnava theology as Svarupa did He was no organiser of the Vaishava community as Nityanada was....... He was no doubt a great scholar But scholarship, however lofty, does not make any lasting impression in this country ...Other lives, great as some of them no doubt are, represent more or less the struggle of the spiritual soul for the attainment of its final goal, whereas Chaitanya's life shows not the worry and strife in pursuit of perfection but at once its full blown beauty—its bloom and fragrance." —Chaitanya and his Companions, D. C. Sen

নয়নাশ্রুর ন্যায় কোনটিই অলৌকিক নহে। যে প্রেমে তাঁহার শরীর কদম্বকোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের ন্যায় তাঁহার জীবনে কিছুই অপূর্ব্ব কি মনোহর হয় নাই।"

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃ: ১৬৪-১৬৫।

মহাপ্রভু জাতিভেদ প্রথা বিশেষ মানিতেন বলিয়া মনে হয় না। ভক্তি থাকিলে নীচ জাতিও তাঁহার কাছে পূজনীয়।

"মুচি যদি ভক্তিভরে ডাকে ভগবানে।
কোটি নমস্কার মোর তাহার চরণে॥"

—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

"প্রভু কহে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
হরিভক্তি হরি সেই পায় সর্ব্বথায়॥"

—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে নানা অলৌকিক গল্প ও নানা মতদ্বৈধ বর্তমান।

(১) এই সম্বন্ধে জয়ানন্দ তদীয় "চৈতন্য-মঙ্গলে" লিখিয়াছেন যে আষাঢ় মাসে একদিন কীর্ত্তনরত অবস্থায় পুরীর পথে শ্রীচৈতন্যের পায়ে একখণ্ড ইষ্টকের আঘাত লাগে। তাঁহার পায়ে বেদনা হয় ও তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহার ফলেই কতিপয় দিন পরে তাঁহার তিরোধান ঘটে।

(২) অপর একখানি চৈতন্য-মঙ্গলকার লোচন দাসের মতে মহাপ্রভু জগন্নাথকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় দেহে লীন হইয়া যান। যথা,

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥
কৃপাকর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥"

— লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল।

(৩) চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর তিরোধানের কথা বর্ণিত হয় নাই। তবে চৈতন্যচরিতামৃতকার অত্যধিক ভাববিহ্বলতার ফলে দুর্ব্বল ও কৃশকায় অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটিয়াছিল এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন।

(৪) কথিত আছে পুরীর সম্মুখস্থ সমুদ্রের নীলজল ও আকাশের কৃষ্ণমেঘ যুগপৎ দেখিয়া একদা মহাপ্রভুর ভাবাবেশ ঘটে এবং তিনি "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া জলে ঝাপ দেন। তখনই সমুদ্র-তীরের জেলেরা তাঁহার দেহ জল হইতে কষ্টে উদ্ধার করিলেও ইহার ফলে তাঁহার তিরোধান হয়। পুরীতে ভক্ত-বৃন্দের কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে মহাপ্রভুর দেহ জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তির সহিত মিশিয়া গিয়াছে আবার কেহ কেহ জগন্নাথ দেবের স্থানে তোটা-গোপীনাথ দেবের সহিত এইরূপ অলৌকিক সংশ্রব বিশ্বাস করেন।

এইরূপ নানাবিধ প্রবাদ শ্রীচৈতন্যের দেহাবসান সম্বন্ধে প্রচলিত থাকিলেও জয়ানন্দ বর্ণিত ইষ্টকাঘাতের কথাটিই বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। যাঁহারা মহাপ্রভুর লীলাবসানে অলৌকিকত্ব না দেখিলে সন্তুষ্ট নহেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই।

কথিত আছে মাতৃ আজ্ঞায়, তাঁহার যথাসম্ভব নিকট থাকিবেন বলিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন ও পুরীর মধ্যে পুরীতে গিয়া বাস করেন। কিন্তু পুরীর দিকেই তাঁহার লক্ষ্য বেশী হইবার আরও কারণ থাকিতে পারে। ইহার প্রকৃত কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মধুর-রসের কেন্দ্র হিসাবে রাধা-কৃষ্ণের লীলাস্থলে নিজে শুধু একবার ভ্রমণ করিয়া আসিলেন কিন্তু রূপ-সনাতনাদি ছয় ভক্ত গোস্বামীকে তথায় বাস করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ভক্তগণকে প্রায়শঃ পুরী না থাকিয়া বৃন্দাবনে থাকিতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহার স্বয়ং পুরীতে থাকিবার কারণ সম্ভবতঃ তিনটি—(ক) পুরী নবদ্বীপ সম্পর্কে বৃন্দাবন হইতে অধিক নিকটবর্ত্তী—সুতরাং মাতা ও স্ত্রীর সংবাদ পাওয়া অধিকতর সহজসাধ্য। (খ) স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের নিবাস উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর বলিয়া উড়িষ্যার প্রতি অধিকতর আকর্ষণ। বিশেষতঃ উড়িষ্যার বৈষ্ণব রাজা মহাপ্রভুর স্বদলকে রাজশক্তির আশ্রয়ে রাখিলে তথায় বাসে সুবিধা এবং জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ না হইলেও তৎপ্রতি অনুরাগ। (গ) দাক্ষিণাত্যের মাধুর্য্যরস ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত অধিকতর যোগাযোগ স্থাপন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে মহাপ্রভুর নানাভাষায় দক্ষতারও পরিচয় পাওয়া যায়। রাধাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলতা বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরদিন প্রভাব বিস্তার করিবে।

(খ) শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণ

(১) অদ্বৈত প্রভু

পরমভক্ত অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৈষ্ণব। তিনি প্রথমে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউরের ও পরে শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের জন্ম সময় তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল অদ্বৈতের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। অদ্বৈতের প্রকৃত নাম কমলাকর ভট্টাচার্য্য; অদ্বৈত তাঁহার নাম নহে উপাধি। নিম্নে অদ্বৈত প্রভুর বংশলতা দেওয়া গেল। তাঁহার বংশপরিচয় তদ্বংশীয়গণ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নরূপ দিলেও নরসিংহ হইতে তাঁহার বংশ পরিচয়ে কোন মতান্তর নাই।
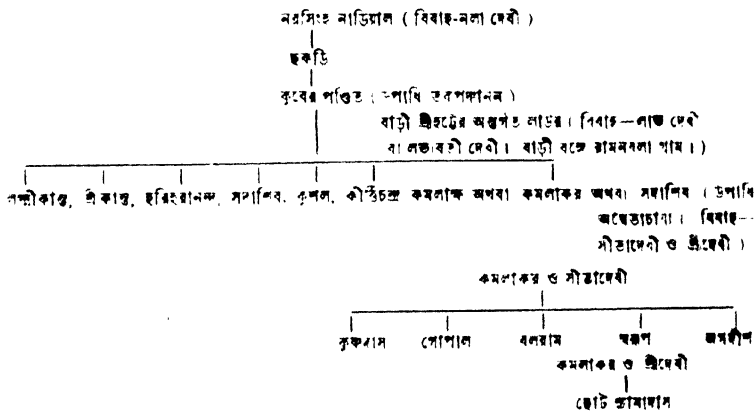
রাজা গণেশ ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সুলতান গিয়াসুদ্দিনকে পরাজিত ও বধ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈশান নাগর কৃত 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামক গ্রন্থে আছে,—

> "যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
> সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত ॥
> যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
> সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥
> যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
> গৌড়ের বাদসাহ মারি গৌড়ের হৈল রাজা ॥

যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি ॥"

—অদ্বৈত-প্রকাশ (ঈশান নাগর কৃত)।

অদ্বৈত প্রভুর পিতৃদেব কুবের পণ্ডিত লাউরের রাজা কৃষ্ণদাসের সভাসদ ছিলেন। অদ্বৈত প্রভু পাঠসমাপন করিবার জন্য প্রথমে শান্তিপুরে ও পরে নবদ্বীপে আগমন করেন। পরে তিনি শান্তিপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শান্তিপুরে শান্তাচার্য্য নামক জনৈক অধ্যাপকের কাছে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। শান্তিপুরে স্থায়ীবাস নির্ম্মাণ করিলেও তিনি নবদ্বীপেই অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রের অমর্য্যাদা দর্শনে অতিমাত্র ব্যথিত হন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রচারে আকুল আগ্রহ সেই সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিপথের মধ্যে তিনি ভক্তিপথের সমর্থন করিতেন। নবদ্বীপের অধিবাসিগণ তৎকালে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি যত আগ্রহ দেখাইত কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতি তত আকর্ষণ দেখাইত না। অদ্বৈত প্রভুর নিকট ভক্তিহীন জ্ঞানচর্চ্চার কোন মূল্য ছিল না। তৎকালে নবদ্বীপবাসিগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে ভগবানের নিকট অদ্বৈত প্রভুর ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলেই ভক্তিহীন বাঙ্গালাদেশে ভক্তির বন্যা বহাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মাতার ধারণা জন্মিয়াছিল যে অদ্বৈতপ্রভুর উৎসাহ এবং উপদেশেই বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি অদ্বৈত প্রভুর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে অদ্বৈত প্রভু যোগদান করিতেন। এই আঙ্গিনার ধূলি অতি পবিত্রজ্ঞানে সংগ্রহ করিয়া অদ্বৈত প্রভু একদা বলিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বদা স্পর্শপূত শ্রীবাসের আঙ্গিনার এই ধূলির জন্য শ্রীবাস ধন্য। তাঁহার সেই সৌভাগ্য কোথায়? সংস্কৃত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকের এই উপলক্ষে ছত্রটি এইরূপ—"শ্রীবাসস্যৈব জন্মে তাদৃশং সৌভাগ্যং যস্য ভবনে প্রতিদিনমেব সেবিতং দেবেন।" শান্তিপুরে একদা যবন হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর অতিথি হওয়াতে তথায় অত্যন্ত সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তবে, পরে উহা থামিয়া যায়। অদ্বৈত প্রভু নরসিংহ ভাদুড়ী নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সীতা ও শ্রী নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। নরসিংহ ভাদুড়ীর স্ত্রীর নাম মেনকা। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

অদ্বৈত প্রভু সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র লেখক নিত্যানন্দের মতে তিনি ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 'অদ্বৈত প্রকাশে'র লেখক ঈশান নাগরের মতে উহা ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ। প্রথম মতে তিনি ১০৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মতানুসারে তিনি ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম মতই ঠিক। মৃত্যুকালে তাঁহার বংশে অনেক পুত্র পৌত্রাদি জীবিত ছিল। তাঁহার বংশের অনেকে এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার বংশের গোস্বামী নামে পরিচিত প্রধান দুই শাখা ঢাকা জেলার অন্তর্গত উথলি গ্রামে এবং পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপুরে রহিয়াছে। অদ্বৈত প্রভুর অনেক শিষ্যসেবক ছিল, তন্মধ্যে কবিকর্ণপুরের গুরু শ্রীনাথ আচার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও অদ্বৈত বংশীয়গণের অনেক শিষ্যসেবক রহিয়াছেন।

অদ্বৈত প্রভু জীবিতকালে প্রতিবৎসর রথের সময়ে মহাপ্রভুর সন্দর্শন লাভের জন্য একবার পুরী যাইতেন। মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মধ্যে মধ্যে পত্রবিনিময় হইত এবং ইহাতেই মহাপ্রভু তাঁহার মাতা ও দ্বীপের সংবাদ জানিতে পারিতেন। অদ্বৈত প্রভু শেষ সংবাদ জগদানন্দ মারফৎ মহাপ্রভুকে বলিয়া পাঠান। তাহার অল্পদিন পরেই মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়। সেই হেয়ালীপূর্ণ সংবাদ প্রেরণের সহিত মহাপ্রভুর তিরোধানের কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না।

(২) নিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু এই তিনজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শীর্ষস্থানীয় তিন মহাপুরুষ এবং ইহার প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানে নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-লতা।

সুন্দরমল্ল (বা নকড়ি চাটুতি—বাড়ী একচাকা গ্রাম, ইহার আধুনিক নাম গর্ভবাস, জেলা বীরভূম)

|

মুকুন্দ (বা হাড়াই ওঝা, বিবাহ—পদ্মাবতী)

|

চিদানন্দ | কৃষ্ণানন্দ | সর্বানন্দ | ব্রহ্মানন্দ | পূর্ণানন্দ | প্রেমানন্দ

ব্রহ্মানন্দ (বা নিত্যানন্দ, জন্ম ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ, বিবাহ—বসুধা ও জাহ্নবী)

|

বীরভদ্র (বা বীরচন্দ্র পুত্র ও কন্যা গঙ্গা, মাতা—জাহ্নবী)
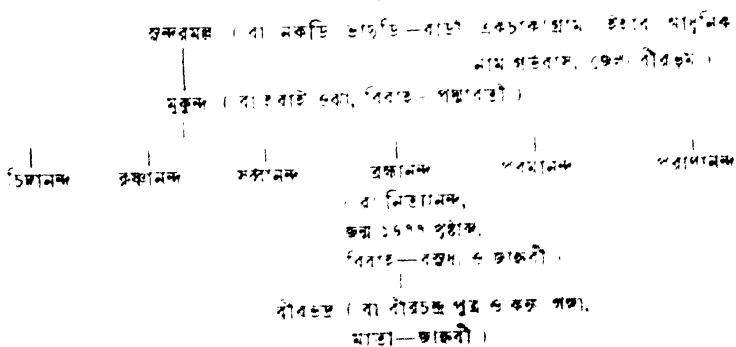
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যের পরেই নিত্যানন্দের স্থান। ইনি অদ্বৈত অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। ইনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং ভক্তি থাকিলে চণ্ডালও দ্বিজোত্তম হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিষয়ে তিনি মহাপ্রভুর মতই সমর্থন করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্রের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠাতা বীরচন্দ্র। খড়দহে আড়াই হাজার বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে ("নেড়ানেড়ী" নামে পরিচিত বৌদ্ধগণকে) ইনিই বৈষ্ণব সমাজে স্থান দান করেন। বাঙ্গালার বণিকসমাজ (বিশেষ করিয়া সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক সমাজ) নিত্যানন্দ প্রভুর চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গৃহীত হয়। তিনি আচণ্ডাল সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিতেন। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিককুলোদ্ভব উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ ধনী বণিকগণ নিত্যানন্দ প্রভুর পরমভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥"

তিনি নদীয়াতে শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইলে জগাই ও মাধাই (জগন্নাথ ও মাধব)[১] নামে দুই ভ্রাতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। এই ভ্রাতৃদ্বয় ধনী ও মদ্যপ ছিল এবং তাহারা দস্যুবৃত্তি করিত। কথিত আছে তাহারা সংকীর্ত্তনরত নিত্যানন্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটি মৃৎকলসী নিক্ষেপ করিলে তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হয়। ইহাতেও নিত্যানন্দ প্রভু ক্রুদ্ধ না হইয়া এই পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়কে কৃষ্ণপ্রেমকথা শুনাইলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া জগাই ও মাধাই তাহাদের অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে যে একবার পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট নদীয়ার রামদাস নামক এক ব্রাহ্মণ অভিযোগ করে যে নিত্যানন্দ প্রভু বণিক সম্প্রদায় প্রদত্ত বিলাস-দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু তদুত্তরে রামদাসকে জানান যে

---

(১) জগাই-মাধাইর কথা প্রেমবিলাসে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সুবানন্দ রায় নামক এক ধনী ও কুলীন ব্রাহ্মণকে গৌড়ের সুলতান 'রাজা' উপাধি দান করেন। তাঁহার দুই পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দন। রঘুনাথের পুত্র জগন্নাথ (জগাই) ও জনার্দনের পুত্র মাধব (মাধাই)। ইহারা এত ক্ষমতাশালী ছিল যে কাজীর কোতোয়াল ইহাদের দমনে অসমর্থ ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে জগাই ও মাধাই সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। ডাকাচুরি পরগৃহ দাহ অনুক্ষণ।" —চৈতন্যভাগবত।

নিত্যানন্দ প্রভু অন্তরে প্রকৃত সন্ন্যাসী। তাঁহাকে বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া বিচার করা চলে না। "নিত্যানন্দ বংশবিস্তার" নামক গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে আছে—

"চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধিয়ায়।
উচ্চ শব্দ করিয়া সদা গৌরাঙ্গ গুণগায়॥
আপনি গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দসুতে॥"

—বৃন্দাবন দাসের "নিত্যানন্দ বংশবিস্তার"।

প্রৌঢ় বয়সে নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসাশ্রম ভঙ্গ করিয়া কালনার সূর্য্যদাস সারখেলের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা দুইটির নাম বসুধা ও জাহ্নবী। কথিত আছে তিনি নাকি মহাপ্রভুর আদেশেই এই কার্য্য করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সকলেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে নবগঠিত বৈষ্ণব সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কাতেই বিবাহ করিয়া বৈষ্ণবগণের সম্মুখে নিত্যানন্দ প্রভু নব আদর্শ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। সূর্য্যদাস সারখেলের (জ্যেষ্ঠ?) ভ্রাতা গৌরীদাস সারখেল মহাপ্রভুর প্রথম জীবনে তাঁহার পার্ষদ ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' এই বিবাহের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। নিত্যানন্দ-ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত এই বিবাহের প্রস্তাবক ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর খুব প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। গঙ্গাদেবী ও বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) এই জাহ্নবীদেবীর কন্যা ও পুত্র। ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ বাসকালে তাঁহার দ্বিতীয় কায়ার ন্যায় সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েই নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তনকালে ইহার কেন্দ্ররূপে গণ্য হইতেন। মহাপ্রভুর পুরীবাসকালে নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে থাকিতেন, তবুও বলা যায় অন্তরে এই দুই মহাপুরুষের বিচ্ছেদ কদাপি হয় নাই।

(৩) শ্রীবাস

শ্রীবাসের আদি নিবাস শ্রীহট্ট। শ্রীবাসের আরও তিনটি ভ্রাতা ছিল। তাহাদের নাম শ্রীকণ্ঠ (বা শ্রীনিধি), শ্রীরাম ও শ্রীপতি। শ্রীবাসকে শ্রীনিবাসও বলা হইত। অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীবাস এক সঙ্গে পাঠসমাপন করিতে শ্রীহট্ট হইতে

নবদ্বীপ আগমন করেন। নবদ্বীপে শ্রীবাসের পরিবার বেশ বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়াই খ্যাতি ছিল। এই শ্রীবাসের বাড়ীর বাহিরের দিকের এক ঘরে একটি মুসলমান দরজী বাস করিত। এই ব্যক্তি কালক্রমে বৈষ্ণবপ্রধান যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীচৈতন্যের জন্ম সময়ে শ্রীবাস প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার স্ত্রী মালিনী শ্রীচৈতন্যের জন্মের সময় জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতেই ছিলেন। একদিকে শ্রীবাস ও জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যে এবং অপর দিকে মালিনী ও শচীদেবীর মধ্যে খুব সখ্যতা ছিল। বাল্যে শ্রীবাস সম্বন্ধে গল্প আছে যে তিনি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন যে তিনি আর মাত্র এক বৎসর বাঁচিবেন। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সত্যই বাড়ীর দরজায় এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সেই সন্ন্যাসীও তাঁহাকে একই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহাতে কিশোর শ্রীবাসের বড় ভয় হইল। তিনি আহার নিদ্রা এককপ পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বল্পভাষী হইয়া পড়িলেন। দিবারত্রি মৃত্যু-চিন্তা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি স্বপ্ন ও সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত পরিবারস্থ কাহাকেও বলিলেন না। তাঁহার দুর্দ্দান্ত স্বভাবের একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। একদিন হঠাৎ "বৃহৎ নারদীয় পুরাণের" দুইটি ছত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহা এই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

—বৃহৎ নারদীয় পুরাণ।

এখন হইতে এই ছত্র দুইটি তাঁহার জপমালা হইল এবং স্বীয় জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করিল। যাহা হউক এইরূপে এক বৎসর শেষ হইতে চলিল। বৎসরের শেষদিনে তিনি দেবানন্দ আচার্য্যের গৃহে ভাগবত শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আবার সেই সন্ন্যাসীর আগমন হইল। সকলে যে সময় শ্রীবাসকে মৃত কল্পনা করিয়াছে সেই সময় সন্ন্যাসী শ্রীবাসকে স্পর্শ করিয়া উঠিতে বলিলেন এবং সম্মুখে তাঁহাকে অনেক অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

জীবনের এই পরিবর্ত্তনের পর শ্রীবাস অদ্বৈত প্রভুর সদা সঙ্গীরূপে থাকিতেন। সুকণ্ঠ শ্রীবাসের কৃষ্ণনাম গানে বিমুগ্ধ নবদ্বীপবাসিগণ তাঁহার বাড়ীতে সর্ব্বদা ভীড় করিত। এইরূপে ভাবপ্রবণ শ্রীবাসের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীবাস স্নেহমধুর কণ্ঠে বালক শ্রীচৈতন্যকে মাঝে মাঝে

মৃদুভর্ৎসনা করিতেন। যথা, "কোথায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি" (চৈতন্য-ভাগবত)। শ্রীবাস শ্রীচৈতন্যকে যৌবনে টোলের অধ্যাপকতা করিতে দেখিয়া উহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যকে ভক্তি-মার্গে বিচরণ করিতে বারম্বার বলিতেন। গয়া প্রত্যাগত শ্রীচৈতন্যের ভগবানে নিবিষ্টচিত্ততা এবং ভক্তির আতিশয্যে ভাবাবেগের কথা শ্রীবাস শুনিলেন। ইহার পর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য ভক্ত বৈষ্ণবগণসহ নিত্য শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সমবেত হইতেন ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। একদিন সন্ধ্যায় তাহার বাড়ীতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত উহা চলিতে থাকে। শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র সেই দিন সন্ধ্যার পর মারা গেলেও উহা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন নাই। সংকীর্ত্তনের বিঘ্ন হইবে বলিয়া কাহাকেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তনের শেষভাগে শ্রীবাসের বিপদের কথা জানিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যকে শ্রীবাস এই সময় বলিয়াছিলেন,—"পুত্রশোক না জানিল যে মোহর প্রেমে।
তেন তব সঙ্গ মুই ছাড়িব কেমনে॥"

—চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য এই শ্রীবাসের আঙ্গিনাতেই শ্রীধর নামক একটি দরিদ্র অথচ সাত্ত্বিক প্রকৃতি ব্রাহ্মণের সহিত প্রায়ই শাস্ত্রালোচনা করিতেন। হরিদাসের ন্যায় নিত্যানন্দ প্রভুও দুই বৎসর (১৫০৮-১৫১০ খৃষ্টাব্দ) শ্রীবাসের গৃহে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীবাস[১] যতদিন জীবিত ছিলেন মহাপ্রভু সন্দর্শনে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ তিনি পুরী যাইতেন। শ্রীবাসের দুইস্থানে বাড়ী ছিল। এই স্থান দুইটির একটি নবদ্বীপ অপরটি কুমারহট্ট।

(৪) বাসুদেব সার্ব্বভৌম

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। বাসুদেবের বিদ্যাবাচস্পতি উপাধিযুক্ত একটি ভ্রাতাও ছিল। বাসুদেবের পুত্রের নাম দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ। ইনি বোপদেবের ব্যাকরণের একজন টীকাকার। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাড়ী নবদ্বীপে ছিল। অল্প বয়সে বাসুদেব কাশীতে উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া পরে তিনি মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের

(১) চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীবাসের চরিতাখ্যান দ্রষ্টব্য।

ছাত্র হন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত ন্যায় শাস্ত্রের "চিন্তামণি" নামক টীকা তথায় পড়ান হইত। পক্ষধর মিশ্র ছাত্রগণকে উহার কোন অংশ নকল করিয়া নিতে দিতেন না। এইরূপে তিনি ন্যায়শাস্ত্রে সমগ্র ভারতের মধ্যে মিথিলার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কোন অনুলেখন না থাকাতেই পক্ষধরের এই সুবিধা হইয়াছিল। অবশেষে বাসুদেব টীকাটীপ্পনিসহ সমগ্র গ্রন্থখানি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং উহা পুনরায় লিখিয়া লন। এতদ্ভিন্ন "কুসুমাঞ্জলী" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থেরও অধিকাংশভাগ এইরূপে কণ্ঠস্থ করেন। বাসুদেবের এই অদ্ভুত কার্য্যের ফলে ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার একচেটিয়া প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং নবদ্বীপে বাসুদেব স্থাপিত টোল ভারতের নানা-দিগ্‌দেশের ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "নব্যন্যায়" নামে পরিচিত এখানকার ন্যায়শাস্ত্রে বাসুদেবের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতি ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি। এই টোলের অপর ছাত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। শ্রীচৈতন্যও এই টোলে পড়িয়াছিলেন তবে তিনি বাসুদেবের কাছে পড়েন নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার স্থাপিত টোলে যশের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ইহার পর সুলতান হুসেন সাহ হঠাৎ হিন্দুবিদ্রোহের আশঙ্কায় কিছুকাল নবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে হিন্দুগণের উপর অত্যাচার করেন। সেই সময় বাসুদেবের পরিবারস্থ সকলে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নানাদিকে ছড়াইয়া পড়েন। বাসুদেবের পিতা কাশীবাস করেন এবং বাসুদেব পুরীতে চলিয়া যান। উড়িষ্যার হিন্দুরাজা প্রতাপরুদ্র বাসুদেবের ভারতব্যাপি যশের কথা অবগত ছিলেন। তিনি তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে অপর একটি স্বর্ণসিংহাসন বাসুদেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন। শ্রীচৈতন্য ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরী গমন করিলে তথায় আশি বৎসর বয়সের বৃদ্ধ বাসুদেবের সহিত যুবক শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি শ্রীচৈতন্যকে অল্পবয়সে সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য তিরস্কার করেন। পরে একদিন তাঁহার ভাবাবেশ চিত্তে উপনিষদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বিমুগ্ধ হন এবং শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। শ্রীচৈতন্যের উপলক্ষে বাসুদেব সার্ব্বভৌম "গৌরাঙ্গাষ্টক" নামক সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বাসুদেবের মনোভাবজ্ঞাপক নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি প্রণিধানযোগ্য।

"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥

* * *

নাচিতে লাগিলা সোয় বাহু পশারিয়া।
সার্ব্বভৌম পদতলে পড়িল লুটিয়া॥
হাতজোড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল।
তোমার বিরহবাণ হৃদয়ে বিন্ধিল।
বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া॥
এত দিন আছি মুই পরাণ ধরিয়া॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ১৫২০ খৃষ্টাব্দে কি তাহার কাছাকাছি সময়ে পরলোকে গমন করেন।

(৫) বৃন্দাবনের ছয়জন গোস্বামী

বৃন্দাবনে ছয়জন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্যের আদর্শে ও আদেশে এবং তাঁহার জীবিতকালে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচজন বাঙ্গালার ও একজন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। বাঙ্গালী পাঁচজন হইলেন সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট এবং দাক্ষিণাত্যের একজনের নাম গোপাল ভট্ট। এই বৈষ্ণব মহাজনগণের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন একই পরিবারের ব্যক্তি। সনাতন ও রূপ দুইজন সহোদর ভ্রাতা। ইঁহাদের মধ্যে সনাতন জ্যেষ্ঠ ও রূপ কনিষ্ঠ। শ্রীজীব ইঁহাদের পরলোকগত তৃতীয় ভ্রাতা বল্লভ বা অনুপমের পুত্র।

শ্রীরূপ ও সনাতন সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত এবং গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও মুসলমান রুচিসম্পন্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় জ্যেষ্ঠ সনাতনের নাম সাকর মল্লিক এবং কনিষ্ঠ রূপের নাম দবির খাস ছিল। হুসেন সাহের প্রিয়পাত্র এই ভ্রাতৃদ্বয়ের হিন্দু নাম শ্রীচৈতন্য প্রদত্ত। উভয় ভ্রাতা গৌড়ের সন্নিকটবর্ত্তী রামকেলি নামক স্থানে মহাপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন। ইহার পর প্রথমে রূপ ও পরে সনাতনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই বৈরাগ্য গ্রহণ সম্বন্ধে রূপ ও সনাতনকে নিয়া অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীরূপের সহিত মহাপ্রভুর বারাণসীধামে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিতে আদিষ্ট হন। তথায় থাকিয়া তিনি ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি অনেক মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করেন। শ্রীরূপ সংসারত্যাগের সময়

ভ্রাতা সনাতনকে নিম্নলিখিত ছত্র কয়েকটি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। যথা,—

"যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতে ক্ব গতোত্তরকোশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য মনঃ কুরু সুস্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্যেব ধারয়॥"

বৈরাগ্যের ইঙ্গিতজ্ঞাপক উক্ত ছত্র কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়া সনাতনও সংসারত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। সুলতান হুসেন সাহ মন্ত্রী শ্রীরূপের বৈরাগ্য গ্রহণেই বিব্রত হইয়াছিলেন। এখন অপর মন্ত্রীর একইরূপ সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া তিনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তিনি বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করেন। হাজিপুরের পথে বারাণসীধামে উপস্থিত হইয়া সনাতন মহাপ্রভুকে সন্দর্শন করেন। তাঁহার উপদেশক্রমে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং মথুরাতে ভ্রাতা শ্রীরূপের সাক্ষাৎ পান। তথা হইতে ছোটনাগপুরের পথে তিনি পুরী গমন করিয়া মহাপ্রভুর সহিত পুনবায় দেখা করেন। এই সময়ে পথেই তিনি দারুণ চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় তিনি মহাপ্রভুর সহিত দেখা করিতে অভিলাষী না হইলেও মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে কোল দেন। কতিপয় মাস পুরীতে অবস্থান করিয়া সনাতন বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। সনাতন বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীরূপের সহিত কতিপয় মাস পরে মিলিত হন, কারণ সনাতনের বৃন্দাবনে উপস্থিতির সময় শ্রীরূপও পুরী গিয়াছিলেন। সনাতন ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে থাকিয়া অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দুই জ্যেষ্ঠতাত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীজীবও তাঁহাদের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অল্প বয়সে একদিন তাঁহার বিধবা মাতাকে বিস্মিত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হন। তিনিও ভক্তিশাস্ত্রমূলক বহু সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে বিখ্যাত ও প্রতিপত্তিশালী কায়স্থ ভ্রাতৃদ্বয় বাস করিতেন। ইঁহারা ধনী, দাতা ও শিক্ষিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইঁহাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্য অপুত্রক হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধনের একটি মাত্র পুত্র ছিল। তাঁহার নাম রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ বলরাম আচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পণ্ডিত বলরাম আচার্য্য তৎকালে

একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব "যবন" হরিদাস মধ্যে মধ্যে সপ্তগ্রাম আসিয়া বলরাম আচার্য্যের অতিথি হইতেন। এই দুইজনের সংশ্রবে আসিয়া রঘুনাথ সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যেরও খ্যাতি ছিল। যাহা হউক কোন আকর্ষণই রঘুনাথকে আর সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন কড়া পাহারা দিয়া নজরবন্দী রাখিয়াও রঘুনাথকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্যের নিষেধ পর্য্যন্ত সাময়িক কার্য্যকরী হইলেও অবশেষে বিফল হইল। মাতা ও পত্নীর ক্রন্দন ও অনুরোধ সবই নিষ্ফল হইল। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ একদিন পলায়ন করিলেন এবং অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া নিলাচলে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার শ্রীচৈতন্যের সহিত দেখা হইল। পুরীতে রঘুনাথ মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে ১৬ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার যখন ৩৫ বৎসর বয়স সেই সময় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার অনেক বৈষ্ণবভক্ত পুরী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান। রঘুনাথও এই সময় বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি ৮৬ বৎসর বয়সে (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন (পদকল্পতরু দ্রষ্টব্য)।

শ্রীসনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর বংশলতা এইরূপ।
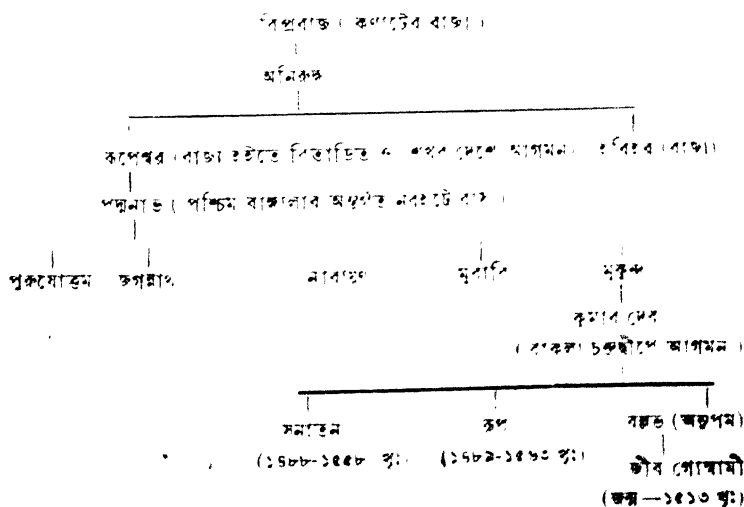
উল্লিখিত চারিজন ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীতীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র নামক স্থানের অধিবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট (১৫০০—১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ) এবং পদ্মাতীরস্থ তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টও মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সহিত তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্যের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি (তপন মিশ্র) ইহার পর বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। রঘুনাথ ভট্টের বৃন্দাবনে জন্ম হয়। এই ছয়জন গোস্বামীই বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তিশাস্ত্র প্রচারে ব্রতী হন এবং বৃন্দাবনের প্রধান ছয় গোস্বামী নামে পরিচিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট ইঁহাদের রচিত অথবা সমর্থিত গ্রন্থই[১] প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। এই গোস্বামীগণের অমূল্য গ্রন্থরাজি সংস্কৃতে রচিত। শুধু সনাতন গোস্বামী, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংস্কৃত গ্রন্থ ভিন্ন কিছু বাঙ্গালা পদও রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের গ্রন্থসমূহের বিশেষ বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকর' এবং রঘুনাথ দাসের বাঙ্গালা পদ সম্বন্ধে 'পদকল্পতরু'তে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৬) অন্যান্য ভক্তগণ

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের ও সমসাময়িক ভক্তগণের মধ্যে সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস (যবন হরিদাস), বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রামানন্দ রায়, জগদানন্দ, গদাধর দাস, চিরঞ্জীব সেন, মুরারী গুপ্ত, ভূগর্ভ, লোকনাথ গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি সরকার (দাস), লোচনদাস, বংশীবদন, বাসুদেব ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গৌরীদাস, পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপুর), উদ্ধারণ দত্ত, কাশীশ্বর, চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস, শ্রীধর, শুক্লাম্বর, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত, স্বরূপ-দামোদর, ছোট হরিদাস, প্রতাপরুদ্র, গোবিন্দ (কর্ম্মকার), শিবানন্দ সেন, জয়ানন্দ প্রভৃতির

---

(১) সনাতন গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—হরিভক্তিবিলাসের টীকা (দিকপ্রদর্শনী) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা (বৈষ্ণব-তোষিণী), ভাগবতামৃত (পীতাম্বর ও টীকাসহ দুইখণ্ডে)।

রূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, কৃষ্ণ জন্মতিথি, গৌড়গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, আনন্দমহোদধি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, পদ্যাবলী, লঘুভাগবতামৃত ইত্যাদি।

জীব গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপালবিরুদাবলী, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা ইত্যাদি।

রঘুনাথ দাস রচিত গ্রন্থাবলী—বিলাপকুসুমাঞ্জলী, রাধাষ্টক, মানশিক্ষা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া রঘুনাথ দাসের বাঙ্গালা পদও আছে।

নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ কেহ বৃন্দাবনে এবং কেহ কেহ পুরীতে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর পুরীর বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের কতকাংশ বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং কেহ কেহ বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের মধ্যে দ্বাদশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি "দ্বাদশ গোপাল" নামে প্রসিদ্ধ। এই বৈষ্ণব মহাজনগণের বাসস্থান "পাট" নামে পরিচিত। যথা,—

	নাম	শ্রীপাট
১।	শ্রীঅভিরাম গোস্বামী	—খানাকুল।
২।	শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত	—শীতলগ্রাম।
৩।	শ্রীকমলাকান্ত পিপলাই	—মাহেশ।
৪।	শ্রীমহেশ পণ্ডিত	—যশীপুর (বা পালপাড়া)
৫।	শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর	—সুখসাগর।
৬।	শ্রীকানাই ঠাকুর	—বোধখানা।
৭।	শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর	—মহেশপুর।
৮।	শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত	—অম্বিকা।
৯।	শ্রীউদ্ধারণ দত্ত	—উদ্ধারণপুর।
১০।	শ্রীনাগর পুরুষোত্তম	—নাগরদেশ।
১১।	শ্রীপরমেশ্বর ঠাকুর	— বিশখালাগ্রাম (বা তড়া-আটপুর)।
১২।	শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত	—নবদ্বীপ।

বাঙ্গালাদেশ (নবদ্বীপ), উড়িষ্যা (পুরী) ও সংযুক্তপ্রদেশের (বৃন্দাবন-মথুরা) ন্যায় আসামের বৈষ্ণবগণও শঙ্কর দেবের সময় হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং কামরূপের পনরঞ্জন গোস্বামী এই সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রগণ্য ছিলেন। আসামের অধিবাসিগণ (বৈষ্ণব) তাঁহাদের বৈষ্ণব সাধুপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে পালন করিয়া থাকেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য

(ক) সাধারণ কথা ও পদকর্ত্তাগণের তালিকা

বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ভাবসম্পদ, প্রাণের নিবেদন ও অধ্যাত্মিকতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। পদাবলী সাহিত্য মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। ইহা যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে রচিত তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সাহিত্য ভক্তি ও প্রেমের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের উপর প্রতিষ্ঠিত। "রাধা-কৃষ্ণ" লীলা অবলম্বনে ইহা রচিত এবং জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা ইহার পটভূমিকায় রহিয়াছে। বাহ্যিক প্রকাশ অনেক স্থানে সাধারণ গৃহীর জীবন-যাত্রা এবং সাধারণ মানুষের যৌন-বাসনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পদসমূহ রচিত হইলেও ইহাই এই শ্রেণীর রচনার মূলকথা বা শেষকথা নহে। নির্ম্মল আন্তরিক ভাব ও ভগবৎ প্রেমের নিগূঢ় কথাটি অনেক স্থানেই ধরা দিয়াছে। বৈষ্ণব পদগুলির সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গী অতিসুন্দর এবং প্রেমাস্পদের প্রতি আর্ত্তির চমৎকার প্রকাশ। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে "রাধা-কৃষ্ণ" কথা অবলম্বনে পদগুলি রচিত হইলেও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্‌কাল হইতে ইহাদের ব্যঞ্জনা একটি নূতন ধারা আশ্রয় করে। তখন কৃষ্ণ-প্রেমের বিশেষতঃ শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ বুঝিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-ভাবের মধ্য দিয়া তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়। সুতরাং "রাধা-কৃষ্ণে"র কিয়ৎ পরিমাণে পটভূমিকার আশ্রয়ে "শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা" প্রদর্শনই চৈতন্য-যুগের পদকর্ত্তাগণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ক্রমে এই বৈষ্ণব পদগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া রস-শাস্ত্রের "মান", "বিরহ" প্রভৃতি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে "কীর্ত্তন" গান রচিত হইতে লাগিল এবং এই শ্রেণীর গানের ভূমিকা-স্বরূপ "গৌর-চন্দ্রিকা" বা গৌরাঙ্গ-প্রশস্তি গাহিবার প্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে "রাধা-কৃষ্ণ"-লীলা কিছুটা গৌণ এবং গৌরাঙ্গ-লীলা অনেকাংশে মুখ্য হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে "বিরহের" অংশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পদকর্ত্তাগণ "শ্রীচৈতন্য" নাম অপেক্ষা "গৌরাঙ্গ" বা "গৌর" নামেরই অধিক পক্ষপাতী দেখা যায়।

কবি চণ্ডীদাস ও কবি বিদ্যাপতি অবশ্য শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ববর্ত্তী। কবি

চণ্ডীদাসকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিবার কারণ পূর্ব্বেই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য পদকর্ত্তাগণ (যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছেন) সকলেই হয় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নয় তৎপরবর্ত্তী। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পদ-সংগ্রহের প্রামাণ্য ও প্রধান গ্রন্থগুলি[১] অবলম্বনে পদকর্ত্তাগণের একটি "বর্ণানুক্রমিক তালিকা" তৎপ্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অবশ্য ইদানীং কতিপয় পদকর্ত্তা আবিষ্কৃত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হইতে পারেন।

	নাম	পদসংখ্যা		নাম	পদসংখ্যা
(১)	অনন্ত দাস	৪৭	(২০)	গিরিধর	১
(২)	আচার্য্য	২	(২১)	গুরুদাস	১
(৩)	আকবর এবং আকবর		(২২)	গোকুলানন্দ	১
	সাহ আলি	২	(২৩)	গোকুলদাস	১
(৪)	আত্মারাম দাস	৯	(২৪)	গোপাল দাস	৬
(৫)	আনন্দ দাস	৩	(২৫)	গোপাল ভট্ট	২
(৬)	উদ্ধবদাস	১১০	(২৬)	গোপীকান্ত	১
(৭)	কবির	১	(২৭)	গোপীরমণ	১
(৮)	কবিরঞ্জন	৯	(২৮)	গোবর্দ্ধন দাস	১৭
(৯)	কমরালী	১	(২৯)	গোবিন্দ দাস	৪৫৮
(১০)	কানাই দাস	৪	(৩০)	গোবিন্দ ঘোষ	১২
(১১)	কানুদাস	১৪	(৩১)	গৌরমোহন	২
(১২)	কামদেব	১	(৩২)	গৌরদাস	২
(১৩)	কালীকিশোর	১৭৯	(৩৩)	গৌরসুন্দর দাস	৩
(১৪)	কৃষ্ণকান্ত দাস	২৯	(৩৪)	গৌরী দাস	২
(১৫)	কৃষ্ণদাস	১২	(৩৫)	ঘনরাম দাস	১৪
(১৬)	কৃষ্ণপ্রমোদ	২	(৩৬)	ঘনশ্যাম দাস	৩১
(১৭)	কৃষ্ণপ্রসাদ	৫	(৩৭)	চণ্ডীদাস	প্রায় ৯০০ শত
(১৮)	গতিগোবিন্দ	১	(৩৮)	চন্দ্রশেখর	৩
(১৯)	গদাধর	৩	(৩৯)	চম্পতি ঠাকুর	১৩

(১) পদকল্পতরু, রস-মঞ্জরী, গীতচিন্তামণি ও পদকল্পলতিকা প্রভৃতি। পদকর্ত্তাগণের মধ্যে কতিপয় মুসলমান পদকর্ত্তাও রহিয়াছেন।

নাম	পদসংখ্যা	নাম	পদসংখ্যা
(৪০) চূড়ামণি দাস	৯	(৭০) পরমেশ্বর দাস	১
(৪১) চৈতন্য দাস	১৫	(৭১) পীতাম্বর দাস	২
(৪২) জগদানন্দ দাস	৫	(৭২) পুরুষোত্তম	৯
(৪৩) জগন্নাথ দাস	৯	(৭৩) প্রতাপনারায়ণ	১
(৪৪) জগমোহন দাস	২	(৭৪) প্রমোদ দাস	৫
(৪৫) জয়কৃষ্ণ দাস	১	(৭৫) প্রসাদ দাস	১
(৪৬) জ্ঞানদাস	১২৪	(৭৬) প্রেমদাস	৩১
(৪৭) জ্ঞানহরিদাস	১	(৭৭) প্রেমানন্দ দাস	৫
(৪৮) তুলসীদাস	১	(৭৮) ফকির হবিব	১
(৪৯) ধরণীদাস	১	(৭৯) ফতন	১
(৫০) দলপতি	১	(৮০) বলদেব	১
(৫১) দীন ঘোষ	১	(৮১) বলরাম দাস	১৩১
(৫২) দীনহীন দাস	৩	(৮২) বলাই দাস	২
(৫৩) দুঃখিনী	১	(৮৩) বল্লভদাস	২৬
(৫৪) দুঃখী কৃষ্ণদাস	৪	(৮৪) বংশীবদন	৩৮
(৫৫) দৈবকীনন্দন দাস	৪	(৮৫) বসন্ত রায়	৩৩
(৫৬) নটবর	১	(৮৬) বাসুদেব ঘোষ	১৩৭
(৫৭) নন্দন দাস	১	(৮৭) বিজয়ানন্দ দাস	১
(৫৮) নন্দ (দ্বিজ)	১	(৮৮) বিদ্যাপতি	৮০০
(৫৯) নরসিংহ দাস	১	(৮৯) বিন্দুদাস	৪
(৬০) নরহরি দাস	১	(৯০) বিপ্রদাস	৬
(৬১) নরোত্তম দাস	৬১	(৯১) বিপ্রদাস ঘোষ	১৬১
(৬২) নবকান্ত দাস	১	(৯২) বিশ্বম্ভর দাস	২
(৬৩) নবচন্দ্র দাস	২	(৯৩) বীরচন্দ্র কর	১
(৬৪) নরনারায়ণ ভূপতি	১	(৯৪) বীরনারায়ণ	২
(৬৫) নয়নানন্দ দাস	২২	(৯৫) বীরবল্লভ দাস	১
(৬৬) নসির মামুদ	১	(৯৬) বীর হাম্বীর	২
(৬৭) নৃপতি সিংহ	১	(৯৭) বৃন্দাবন দাস	৩০
(৬৮) নৃসিংহ দেব	৪	(৯৮) বৈষ্ণব দাস	২৭
(৬৯) পরমানন্দ দাস	১২	(৯৯) ব্রজানন্দ	১

নাম	পদসংখ্যা	নাম	পদসংখ্যা
(১০০) ভূপতিনাথ	৭	(১৩০) রাধাবল্লভ	২৯
(১০১) ভুবন দাস	২	(১৩১) রাধামাধব	১
(১০২) মথুর দাস	১	(১৩২) রাধামোহন	১৭৫
(১০৩) মধুসূদন	৫	(১৩৩) রামানন্দ	১৫
(১০৪) মহেশ বসু	১	(১৩৪) রামানন্দ দাস	১
(১০৫) মনোহর দাস	৬	(১৩৫) রামানন্দ বসু	৯
(১০৬) মাধব ঘোষ	৯	(১৩৬) রূপনারায়ণ	৩
(১০৭) মাধব দাস	৩৫	(১৩৭) লক্ষ্মীকান্ত দাস	১
(১০৮) মাধবাচার্য্য	৫	(১৩৮) লোচন দাস	৩০
(১০৯) মাধবী দাস	১৭	(১৩৯) শঙ্কর দাস	৪
(১১০) মাধো	৩	(১৪০) শচীনন্দন দাস	৩
(১১১) মুরারী গুপ্ত	৫	(১৪১) শশিশেখর	৩
(১১২) মুরারি দাস	১	(১৪২) শ্যামচাঁদ দাস	১
(১১৩) মোহন দাস	১৭	(১৪৩) শ্যামদাস	৩
(১১৪) মোহিনী দাস	৭	(১৪৪) শ্যামানন্দ	৭
(১১৫) যদুনন্দন	৯৪	(১৪৫) শিবরায়	১
(১১৬) যদুনাথ দাস	১৭	(১৪৬) শিবরাম দাস	১৫
(১১৭) যদুপতি	১	(১৪৭) শিবাই দাস	৭
(১১৮) যশোরাজ খান	১	(১৪৮) শিবানন্দ	৪
(১১৯) যাদবেন্দ্র	৩	(১৪৯) শিবাসহচরী	১
(১২০) রঘুনাথ	৩	(১৫০) শ্রীনিবাস	৫
(১২১) রসময় দাস	২	(১৫১) শ্রীনিবাসাচার্য্য	২
(১২২) রসময়ী দাসী	১	(১৫২) শেখর রায়	১৭৬
(১২৩) রসিক দাস	৩	(১৫৩) সদানন্দ	১
(১২৪) রামকান্ত	১	(১৫৪) সালবেগ	১
(১২৫) রামচন্দ্র দাস	৪	(১৫৫) সিংহ ভূপতি	৭
(১২৬) রামদাস	২	(১৫৬) সুন্দর পাল	২
(১২৭) রামরায়	১	(১৫৭) সুবল	১
(১২৮) রামী	৪	(১৫৮) সেখ জালাল	১
(১২৯) রাধাসিংহ ভূপতি	৪	(১৫৯) সেখ ভিক	১

নাম	পদসংখ্যা	নাম	পদসংখ্যা
(১৬০) সেখলাল	১	(১৬৩) হরিবল্লভ	৪
(১৬১) সৈয়দ মর্ত্তুজা	১	(১৬৪) হরেকৃষ্ণ দাস	২
(১৬২) হরিদাস	৭	(১৬৫) হরেরাম দাস	১

এতদ্ভিন্ন পদাবলী এবং পদকল্পতরুতে সনাতন গোস্বামী, শ্রীদাম দাস, দ্বিজ ভীম ও রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতির কতিপয় ভণিতাহীন পদও পাওয়া গিয়াছে। এই তালিকা অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পদরচনাকারী চণ্ডীদাস এবং তাঁহার পরই বিদ্যাপতি। এই কবিদ্বয়ের নামে প্রচলিত পদগুলির অনেক পদ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি শুনা যায়। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কয়েকজন সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন বর্ত্তমান। গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বিপ্রদাস ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, কালীকিশোর, বলরাম দাস ও উদ্ধব দাস, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পর অধিক সংখ্যক পদের রচনাকারী। দুইটি স্ত্রী কবির নাম রামী ও রসময়ী দাসী। মাধবী দাসী সত্যই স্ত্রীলোক না পুরুষ সঠিক জানা যায় না। স্ত্রীলোক হইলে তিনি শিখি মাহিতীর ভগিনী। আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম। আকবর, আকবর সাহ আলী, কমরালী, কবির, ফকির হবিব, ফতন(?), সেখ জালাল, নসীর মামুদ, সেখ ভিক, সেখ লাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা ও সালবেগ (?) নামক মুসলমান কবিগণ এই তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। এই তালিকাবহির্ভূত আলোয়াল, অলিরাজা, চাঁদকাজি ও গরিব খাঁ নামক মুসলমান কবিগণের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"শিবাসহচরী" প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোক নহেন। তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে কবি শিবানন্দ। দুঃখিনীও স্ত্রীকবি নহেন। ইনি পুরুষ এবং প্রকৃত নাম শ্যামানন্দ। রামী অবশ্য স্ত্রীলোক। তিনি সত্যই নিজে পদরচনা করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির বঙ্গীয় সংস্করণে যে অপর বহু কবির পদ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির প্রকৃত পদগুলি সংখ্যায় অনেক অল্প। চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। বৈষ্ণব মাত্রেই পদরচনার কিছু কিছু প্রয়াস পাইতেন। এই হিসাবে পদকর্ত্তাগণের সংখ্যা অগণিত হইয়া পড়ে। পদকর্ত্তাগণের সংখ্যা এইভাবে গ্রহণ না করিয়া শুধু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৈষ্ণব কবিগণকেই পদকর্ত্তারূপে গ্রহণ করিলে ভাল হয়। পদকর্ত্তাগণকে নিয়া আর এক সমস্যা নাম সম্বন্ধে। একই নামের একাধিক পদকর্ত্তা রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় নামের গোলযোগ এবং একের পদ অন্যের উপর আরোপ করা

পদসংগ্রাহক পক্ষে অসম্ভব নহে। পদ-সাহিত্যের কবি-সমস্যা অল্প নহে। শুধু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নিয়াই নহে অন্য অনেক পদকর্তাকে নিয়াও নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কবি গোবিন্দ দাসের নাম করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস এতদ্দেশের বৈষ্ণবগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। মিথিলার (দ্বারবঙ্গের) রাজবংশেও এক গোবিন্দ দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বাঙ্গালী কবি গোবিন্দ দাসের উৎকৃষ্ট অনেক পদ মৈথিল কবির উপর আরোপ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অবশ্য ইহাতে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহাদের আপত্তি করা অসঙ্গতও মনে হয় না। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবি গোবিন্দ দাস[১] ভিন্ন এই নামের অপর কতিপয় কবির নাম নিম্নে দেয়া যাইতেছে। যথা,—

(১) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী— নবদ্বীপবাসী এবং শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ।

(২) গোবিন্দ আচার্য্য (গতিগোবিন্দ)— শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র। ইনি মালিহাটী নিবাসী।

(৩) গোবিন্দ ঘোষ (বা দাস)—কুলীনগ্রামবাসী।

(৪) গোবিন্দ দত্ত—পিতার নাম গিরীশ্বর দত্ত।

(৫) গোবিন্দ—উৎকলের অধিবাসী।

(৬) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—মুর্শিদাবাদ, বোরাকুলি নিবাসী এবং শ্রীনিবাসের শিষ্য।

এতদ্ভিন্ন কড়চার লেখক প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কর্ম্মকার আছেন।

এইরূপ পদকর্ত্তা বলরাম দাসের নামও কতিপয় ব্যক্তি গ্রহণ করিতেন, দেখা যায়। যথা,—

(১) প্রেমবিলাস প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের অপর নাম বলরাম।

(২) নরোত্তম-বিলাস বর্ণিত পূজারি বলরাম।

(৩) বলরাম কবিরাজ (নরোত্তম-বিলাস)।

(৪) কবি ঘনশ্যামের নাম বলরাম।

(৫) রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য "কবিপতি বলরাম" (প্রেমবিলাস)।

(৬) শ্রীনিবাস শাখার বলরাম।

(৭) মহাপ্রভুর সময়ে পুরীর শিঙ্গা-বাদক বলরাম দাস।

(৮) "বৈষ্ণব বন্দনা"তে বর্ণিত কানাই-খুটিয়ার পুত্র বলরাম।

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৮০—২৮৫।

(৯) সঙ্গীতজ্ঞ বলরাম দাস ("বৈষ্ণব-বন্দনা")

(১০) উৎকলবাসী বলরাম দাস ("বৈষ্ণব-বন্দনা")।

(১১) অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্র বলরাম।

এই স্থানে উল্লিখিত সব বলরামই স্বতন্ত্র ব্যক্তি না হইতে পারেন।

পদকর্ত্তা দুইজন যদুনন্দন ছিলেন। একজন যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী অপরজন যদুনন্দন দাস। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীও "দাস" উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই ব্যক্তির বাড়ী কাটোয়া এবং ইঁহার এক কন্যা নারায়ণীকে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন।

পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নরহরি সরকার এবং চরিত-লেখক নরহরি চক্রবর্ত্তী (বা ঘনশ্যাম) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(খ) প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণ।

(১) গোবিন্দ দাস

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরই পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের স্থান। ইনি "দাস" উপাধি গ্রহণ করিলেও ইঁহার প্রকৃত কৌলিক পদবী "সেন"। ইনি গোবিন্দ কবিরাজ নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। বৈদ্যবংশীয় চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যের অন্যতম প্রিয় সহচর ছিলেন। গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামচন্দ্র কবিরাজ বা "কবিনৃপতি সঙ্গীতমাধব" এবং মাতামহ শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত ও কবি দামোদর, গোবিন্দ দাসের মাতার নাম সুনন্দা। চিরঞ্জীব সেনের আদি নিবাস কুমার-নগর। বিবাহের পর তিনি শ্রীখণ্ডে আগমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। চিরঞ্জীব শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় রামচন্দ্র ও গোবিন্দ পরবর্ত্তীকালে পুনরায় কুমার-নগরে কিছু দিনের জন্য ফিরিয়া যান। এই স্থানের শাক্তগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ভ্রাতৃদ্বয় কুমার-নগর চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গভাষাতেও কিছু পদরচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর রচনা—দুইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ, যথা, "স্মরণ-দর্পণ" এবং "বঙ্গজয়" (মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-বঙ্গে ভ্রমণ বৃত্তান্ত)। গোবিন্দ দাস[১] ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে (ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী), ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে (মুরারিলাল

---

(১) সাহিত্য, ১৯৯৯, আশ্বিন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৮৬-২৮৮। প্রেমবিলাস, ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী, পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অধিকারী) অথবা ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে (দীনেশচন্দ্র সেন) শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তিনি তেলিয়া-বুধরী গ্রামে লোকান্তর গমন করেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাঁহার পিতা শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সহচর ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার পুত্র কিরূপে শাক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন বুঝা যায় না। যাহা হউক, ৪০ বৎসর বয়সে গ্রহণীরোগে অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে নাকি তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে) বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দদাস পদরচনায় বিদ্যাপতির অনুসৃত পথে চলিতেন, সুতরাং বিদ্যাপতির পদসমূহের অনুকরণে গোবিন্দদাসের পদসমূহেও অলঙ্কার এবং "ব্রজবুলির" আধিক্য দেখা যায়। গোবিন্দদাসের পদলালিত্য ও রসমাধুর্য্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। ইনি "সঙ্গীত-মাধব" নাটক এবং "কর্ণামৃত" কাব্য নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। শেষ-জীবনে কবি গোবিন্দদাস স্বীয় পদসমূহের সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী গোবিন্দ দাসের ভক্তিমধুর পদগুলি শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। গোবিন্দ দাস যশোহরের রাজা প্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বলিয়া কোন কোন পদে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের পদসমূহের সামান্য পরিচয় এই স্থানে দেওয়া গেল। বিদ্যাপতির কতিপয় পদে গোবিন্দ দাসের ভণিতা পাওয়া যায়। তবে ইনি বাঙ্গালী গোবিন্দ দাস না মৈথিলী গোবিন্দ দাস তাহা জানা নাই।[১]

গোবিন্দ দাসের পদাবলী।

গৌরচন্দ্রিকা

(ক) "নীরদ-নয়নে নবঘন সিঞ্চনে পূরল মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখনু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনী-তীরে উজোর॥

---

(১) এই প্রসঙ্গে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (ব-ভাঃ ও সাঃ পৃঃ ২৮৮, সং ৬ষ্ঠ) মন্তব্য করিয়াছেন, "এক কবির পদের সঙ্গে অন্য কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—"শ্রীগোবিন্দ দাস কহ মতিমন্ত। ভুলল যাহে বিজরাজ বসন্ত।" "রামদাসের পহু সুন্দর রসময় গৌরীদাস নাহি জানে। অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস ভণিতা ভাণে।"—পদকল্পতিকা।

চঞ্চল চরণ-তলে ঝঙ্করু ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধায়ই অহর্নিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেমরতন-ফল-বিতরণে অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দদাস রহ দূর॥"

—পদাবলী, গোবিন্দ দাস।

(খ) "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খনে দেখিনু ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিঁধিতে ধায়॥
মালতী-ফুলের মালাটী গলে হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপাল চন্দন-ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কয়॥"

—পদাবলী, গোবিন্দ দাস।

(গ) "একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ চিহ্ন মোর দেখিল বাটে॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলন পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস॥"

—পদাবলী, গোবিন্দ দাস।

(ঘ) "সিনান দুপুর সময়ে জানি।
তপত পথে ঢালয়ে পানি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥

তাম্বুল ভোখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলা গিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন-তলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি যমু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দ দাসের জীবন হেন।
পীরিতি বিষম মানহ কেন॥"

- পদাবলী, গোবিন্দ দাস।

(২) জ্ঞানদাস

পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ও কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জন্মকাল ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞানদাসের বংশ প্রভু নিত্যানন্দের বংশের এক শাখার অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানদাস প্রসিদ্ধ খেতুরির বৈষ্ণব মহোৎসবে ১৫০৮ শক অথবা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে যোগদান করিয়াছিলেন। কবির নামে কাঁদড়া গ্রামে একটি মঠ বর্ত্তমান আছে। জ্ঞানদাস সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি চণ্ডীদাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পদরচনা করিতেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। কবির পদাবলীর কোমলতা ও ভাবের গভীরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কবি জ্ঞানদাসের পদাবলী।
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

(ক) "রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
কি আর বলিব সই কি আর বলিব।
যে পণ করাাছি চিতে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে।
লহু লহু কহে কথা পীরিতি মিশালে॥
ঘরের সকল লোক করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাব আগুনি॥"

—পদাবলী, জ্ঞানদাস।

প্রেম-বৈচিত্র্য

(খ) "আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ-সৌরভ যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখনে সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিন সে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী পীরিতে বান্ধল তায়॥"

—পদাবলী, জ্ঞানদাস।

(গ) "সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদে সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উঠিনু উঠিতে পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি মরণ-অধিক শেল॥"

—পদাবলী, জ্ঞানদাস।

(৩) বলরাম দাস

অনেক বলরাম দাসের মধ্যে পদকর্ত্তা এই বলরাম দাসটি কোন ব্যক্তি ইহা এক সমস্যা বটে। ইনি "প্রেমবিলাস" গ্রন্থের লেখক নিত্যানন্দ দাসের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন, কারণ এই নিত্যানন্দ দাস বৈদ্য জাতীয় এবং শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। ইনি বৈদ্যজাতীয় সুতরাং "কবিরাজ"। নিত্যানন্দের

অপর নামও বলরাম দাস। পদকল্পতরুতে পদকর্ত্তা বলরাম[১] দাসকেও "কবিরাজ" ("কবিনৃপবংশজ") বলা হইয়াছে। এই বলরাম দাস গোবিন্দ দাসের সম্পর্কে ভাগিনেয় ছিলেন। পদকর্ত্তা বলরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রও "কবিনৃপতি" ছিলেন। প্রেমবিলাসের লেখক নিত্যানন্দ বা বলরাম দাসের ন্যায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসও বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। উভয়েই নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। এমতাবস্থায় উভয়েই এক ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। যাহা হউক এই সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। জয়কৃষ্ণ দাসের "বৈষ্ণব দিগদর্শন" (১৭শ শতাব্দী) গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক উড়িষ্যাবাসী এক বলরাম দাসের পরিচয় আছে। যথা,—"উৎকলে জন্মিলা উড়া বলরাম দাস"। পদকর্ত্তা বলরাম দাসের পিতা আত্মারাম দাস এবং মাতা সৌদামিনী। এই আত্মারাম দাস রচিত কতিপয় পদের উল্লেখ পদকল্পতরুতে রহিয়াছে। কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবার পদকর্ত্তা বলরাম দাসকে ব্রাহ্মণ বংশীয় বলিয়া ও নিজ পরিবার সম্পর্কিত বলিয়া দাবী করেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। পদকর্ত্তা বলরাম দাস নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কবি বলরাম দাস পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের ন্যায় চণ্ডীদাসের আদর্শে পদরচনা করিতেন। জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস উভয়েই কবি গোবিন্দ দাসের সমসাময়িক ছিলেন। বলরাম দাসের পদ-লালিত্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

বলরাম দাসের পদাবলী।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

"কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি
জাগিতে স্বপন দেখি কালরূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন-নাচনে॥
কিরূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে নয়ন ফাঁপর॥

(১) "কবিনৃপজ বংশজ জয় ঘনশ্যাম, বলরাম।"—পদকল্পতরু। বলরাম দাসের (কবিরাজের) কথা নরোত্তম-বিলাসে আছে এবং "বৈষ্ণববন্দনাতে" এই ব্যক্তিকে "সঙ্গীতকারক" ও "নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পদকল্পতরুর উল্লেখ অনুসারে পদকর্ত্তা বলরাম দাসের অপর নাম "ঘনশ্যাম" ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৮৮-২৮৯ দ্রষ্টব্য। পদকল্পতরুর উক্ত ছত্র অবলম্বনে কেহ কেহ কবিকে গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র বলিয়া অনুমান করেন।

সহজে মুরতিখানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈলে চুর॥
আর তাহে কত রূপ ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধী॥
দেখিতে সে চাঁদ-মুখ জগমন হরে।
আধ-মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥"

—পদাবলী, বলরাম দাস।

প্রেম-বৈচিত্র্য

"রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে আলুঞা আলস ভরে।
শুতল কিশোরী আপনা পাসরি পরাণ-নাথের কোরে॥
সখি হের দে আসিয়া বা।
নিঁদ যায় ধনী চাঁদ-বদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া সিথান বিথরে বসন-ভূষা।
নিশাসে দুলিছে নাসার বেশর হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল দাস বলরাম ভণে॥"

—পদাবলী, বলরাম দাস।

(৪) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী

কবি গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) শ্রীচৈতন্যের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। এই পদকর্ত্তার বাড়ী নবদ্বীপ ছিল। ইনি চণ্ডীদাসের আদর্শে কতিপয় পদরচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী রচিত
শ্রীরাধার বারমাসী।

* * * *

"অম্বরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী-বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লিত-বল্লী তরুবর চারু চৌদিশে সঞ্চারে।
উত্তাপে তাপিত ধরণী-মণ্ডলে নিরখি নব নব জলধরে॥

পাপীয়া পাখীর পিয়াসে পীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাপীয়া॥
পাপীয়া শাঙন মাস।
বিরহী-জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর-রজনী দশদিশ গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই ময়ূর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিঁদ লোচনে জাগি সগরি রাতিয়া॥" ইত্যাদি।

—পদাবলী, গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী।

(৫) মুরারি গুপ্ত

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টে ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুরারি গুপ্ত ন্যায় ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রসিদ্ধ শ্রীবাস ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সঙ্গে একত্র ইনি শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। ইনি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহার বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভু প্রথম জীবনে মুরারি গুপ্তের সহিত নানা শাস্ত্র বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেন এবং শ্রীহট্টের ভাষা নিয়া ইহাকে ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িতেন না। শ্রীচৈতন্য মুরারি গুপ্তকে প্রকৃত পক্ষে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুরারি গুপ্ত আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঠিক সময়ে মহাপ্রভু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়াতে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। মুরারি গুপ্ত রামোপাসক ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে ইনি হনুমানের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর সহিত পুরীতে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেন এবং প্রথম সাক্ষাৎ চৈতন্য-চরিতামৃতকারের মতে অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। কবি মুরারি গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জীবনী সংস্কৃতে রচনা করেন। এই গ্রন্থ "মুরারি গুপ্তের কড়চা" নামে প্রসিদ্ধ। মুরারি গুপ্ত কতিপয় বৈষ্ণব-পদও রচনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

নয়ন-পুতলী করি লয়্যাছি মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি
জাতিকুলশীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিএ শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এতনু ভাসাঞাছি
কি করিব কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে
বঁধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হৈলে
তার যশ তিনলোকে গায়॥"

—পদাবলী, মুরারি গুপ্ত

(৬) সনাতন গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ভক্ত ও বয়োজ্যেষ্ঠ বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী (খৃঃ ১৫শ-১৬শ শতাব্দী) সংস্কৃতে অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিলেও কয়েকটি বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন। তৎরচিত একটি পদ এইরূপ—

"অভিনব কুট্মল-গুচ্ছ সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কুন্তল-ভার।
প্রণয়িজনোচিত বন্ধনসহকৃত মিলিত যুগলরূপ সার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট বৃন্দাবন-তট নিহিত বসন্ত-বিহার॥
চটুল মনোহর ঘন কটাক্ষ-শর-রাধা-মদন-বিকার।
ভুবন-বিমোহন মঞ্জুল নর্তন-গতি বিগলিত মণিহার॥
অধর বিরাজিত মন্দতর স্মিত অবলোকই নিজ পরিবার।
নিজ বল্লভ জন সুহৃৎ সনাতন বিমোহিত চিত্ত উদার॥"

—পদাবলী, সনাতন গোস্বামী।

(৭) বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর সমসাময়িক (১৬শ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ আরও দুই ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের নাম মাধব ও গোবিন্দানন্দ।

ইঁহারা তিন সহোদরই পদকর্ত্তা এবং যশস্বী। বাসুদেবের আদি নিবাস কুমারহট্ট এবং পরবর্ত্তীকালে ভ্রাতৃত্রয় নবদ্বীপবাসী হন। শ্রীহট্টের বুড়নগ্রামে ইঁহাদের মাতুলালয়। প্রবাদ বাসুদেব ঘোষ বা বাসু ঘোষ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী এই দেশে মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনের প্রভাবে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইতে থাকে। এই শ্রেণীর পদরচকগণের পথপ্রদর্শক নরহরি সরকার। বাসুদেব ঘোষ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যশস্বী হন। বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহারা তিনজনেই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন। বাসুদেব ঘোষ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং দিনাজপুরের রাজবংশ গোবিন্দানন্দ ঘোষের বংশধর বলিয়া কথিত। কিন্তু কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বাসুদেব ঘোষকে সদ্গোপজাতীয় বলিতে অভিলাষী। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকৃত প্রসিদ্ধ রাজা গণেশকে কেহ কেহ কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া দিনাজপুর রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থাপন করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন। বাসুদেব ঘোষ অথবা রাজা গণেশের সহিত এই রাজপরিবারের সম্বন্ধ নিঃসন্দিগ্ধভাবে এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্য দিয়া শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আর্ত্তি দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। যথা,—

"আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ-নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥"

—পদাবলী, বাসুদেব ঘোষ।

উল্লিখিতভাবে রাধাসম্বন্ধে ভাবিত হইয়া মহাপ্রভুর মধ্যে রাধাভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি নিজেই শ্রীরাধাতে পরিণত হইয়াছিলেন এইরূপ একটি বৈষ্ণব মত প্রচলিত আছে। দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরহ-ব্যাকুলতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে।

(৮) নরহরি সরকার[1]

সুবিখ্যাত নরহরি সরকার (দাস) মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ এবং পুরীতে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। ইঁহার কাল ১৪৭৮ খৃঃ—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ ইনিই গৌরাঙ্গ-লীলা বিষয়ক পদ রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক এবং প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষ এই শ্রেণীর পদরচনায় নরহরির পথই অনুসরণ করিয়াছিলেন। নরহরি সরকার লোচন দাসের গুরু ছিলেন এবং তাঁহার উৎসাহেই লোচন দাসের প্রসিদ্ধ "চৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থ রচিত হয়। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ দেব সরকার। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য এবং বল্লাল সেনের সেনাপতি প্রসিদ্ধ পশুদাসের (১১০০ খৃঃ—১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) বংশোদ্ভব। এই পশুদাস সম্বন্ধে বৈদ্যকুলজী গ্রন্থ "চন্দ্রপ্রভা"তে "সংগ্রামদক্ষঃ হতবৈরীপক্ষ" প্রভৃতি প্রশংসাসূচক উক্তি আছে। উক্ত কুলজী গ্রন্থানুসারে পশুদাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বালিনছি গ্রামে বাস করিতেন। পরবর্ত্তীকালে পশুর বংশধরগণ এই স্থান হইতে প্রথমে ময়ূরেশ্বর (বর্দ্ধমান) গ্রামে এবং পরে শ্রীখণ্ডে (বর্দ্ধমান) বসতি স্থাপন করেন। নরহরি শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। (জন্মকাল ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ)। নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহের চিকিৎসক ছিলেন। পূতচরিত্র নরহরিকে মহাপ্রভু এত ভালবাসিতেন যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে অজ্ঞানাবস্থায় একবার তিনি নরহরিকে স্মরণ করিয়াছিলেন। যথা,—"কখন বলেন কোথা প্রাণ-নরহরি। হরিনাম শুনে তোমা আলিঙ্গন করি॥"—গোবিন্দ দাসের কড়চা। নরহরির শ্রীখণ্ডস্থ বংশধরগণ "শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-গোস্বামী" নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্যের বাল্য-লীলা।

"পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো হামাগুড়ি ফিরায় অঙ্গনে॥
মুচাঁদ-বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো অমনি আইল শচী ধাঞা।
কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো তা দেখি বিদরে মোর হিয়া॥
কত যতন করি তবু প্রবোধ না মানে গো হাসয় তাহার গলা ধরিয়া।
সবাই হরষ হইয়া হরি হরি বলে গো নিতাই নাম্বিয়া কোলে হইতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো হাত দিয়া জননীর হাতে॥

(১) "গৌরপদতরঙ্গিণী" (জগদ্বন্ধু ভদ্র) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সবাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি-পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেপানো করিতে ভাল জানে ॥"

—পদাবলী, নরহরি সরকার।

(৯) রায়শেখর[১]

"রায়শেখর" নাম না উপাধি জানা যায় না। "শেখর রায়" ধরিলে অবশ্য ইহা নাম। ইনি গৌরাঙ্গ প্রভুর সময় বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পরাণ গ্রামে ছিল। কাটোয়ার যদুনাথ দাসের "সংগ্রহ-তোষিণী" গ্রন্থে এই পদকর্ত্তার উল্লেখ আছে। পদকর্ত্তা রায়শেখরের পদাবলীর নাম "দণ্ডাত্মিকা-পদাবলী"। আরও একজন "রায়শেখর" ছিলেন। তিনিও পদকর্ত্তা। তবে এই "রায়শেখর" উপাধি এবং শশীশেখর ও চন্দ্রশেখর নামে সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনের এই উপাধি ছিল বলিয়া মনে হয়। উভয়েই পদকর্ত্তা এবং বিশিষ্ট কীর্ত্তন-গায়ক। ইহাদের পিতার নাম গোবিন্দদাস ঠাকুর। এই ভ্রাতৃদ্বয় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদের বাড়ী বর্দ্ধমানের কাঁদড়া গ্রাম এবং ইহারা জাতিতে ("মঙ্গল" বংশীয়) ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বাড়ীও এই কাঁদড়া গ্রামে ছিল। বর্ত্তমান কীর্ত্তন-গায়কগণ এই দুই ভ্রাতার পদাবলীর মধ্যে শশীশেখরের পদগুলি খুব ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের কাল "পদকল্পতরু"র সঙ্কলনকারী বৈষ্ণবদাসের কিছু পূর্ব্বে বলিয়া ধরা যায়।

শ্রীরাধার অভিমান

"সেকাল গেল বয়্যা বঁধু সেকাল গেল বয়্যা।
আখি ঠারিঠারি মুচকি হাসি কত না করেছ রয়্যা ॥
বেশের লাগ্যা দেশের ফুল না রইত বনে।
নাগরী সনে নাগর হল্যা আর চিনবে কেনে ॥
কুলি বেড়ায়্যা নাম লৈয়া ফিরিতে বংশী বায়্যা।
মুখের কথা শুনতে কত লোক পাঠাইতে ধায়্যা ॥

(১) রায়শেখর, শশীশেখর ও চন্দ্রশেখর তিনজনই একব্যক্তি বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়" (২য় খণ্ড) নামক সংগ্রহ গ্রন্থে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। পদকর্ত্তা ও ভাগবতকার দেবকীনন্দন সিংহেরও "কবিশেখর" এবং "রায়শেখর" উপাধি তৎরচিত ভাগবতে পাওয়া যায়। দেবকীনন্দনও মহাপ্রভুর সমসাময়িক। পরাণ গ্রামের "রায়শেখর" দেবকীনন্দনও হইতে পারেন।

হাতে কর‍্যা মাথায় কৈলুঁ কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥"

—পদাবলী, রায়শেখর।

(১০) ঘনশ্যাম

পদকর্ত্তা "ঘনশ্যাম" বোধ হয় অন্ততঃ তিনজন ছিলেন। তাঁহাদের একজন সুবিখ্যাত "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তম-বিলাস" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী (খৃঃ ১৬শ-১৭শ শতাব্দী) এবং দ্বিতীয় জন সুপ্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাসের বা গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্য সিংহের পুত্র ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি প্রসিদ্ধ প্রেমবিলাসের রচনাকারী নিত্যানন্দ দাস। পদকল্পতরুর "কবিনৃপচন্দ্র ভুবন-বিদিত যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম" ছত্রটিতে ঘনশ্যাম ও বলরাম নাম দুইটি উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবির একজনকে চিহ্নিত করিয়া থাকিবে। নিত্যানন্দ দাস গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় এবং তিনি ও দিব্যসিংহের পুত্র "ঘনশ্যাম" উভয়েই বৈদ্য ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পদকল্পতরুর ছত্রটির সহিত সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ বংশীয় নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোন সম্পর্ক নাই। তবে অবশ্য তিনিও অপর ঘনশ্যাম নামক কবি। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামের (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) রচিত "গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী" হইতে নিম্নে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

(ক) গৌর-চন্দ্রিকা

"পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচি দেওত মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম॥
অবহু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পূর।
হেরইতে নয়ন অধম মরুভূমহি হোয়ত পুলক অঙ্কুর॥
নাম হিয়াক তাপ মোর মেটই তাহে কি চাঁদ উপামে।
কহে ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি একুঠামে॥"

—পদাবলী, ঘনশ্যাম দাস.

(খ) শ্রীরাধার অভিসার

"সহজই কুঞ্জরপতি জিতি মন্থর অব তাহে ঘন-আন্ধিয়ার।
প্রতিপদ নিরখি নিরখিত দোঁহো যব চলইতে চরণ-সঞ্চার॥
সুন্দরি সমুচিত করহ সিঙ্গার।
কানু-সম্ভাষণে শুভক্ষণ মানিয়ে পহিলে রজনী-অভিসার॥

নীল-রতনগণ-বিরচিত ভূষণ পহিরহ নীলিমবাস।
মৃগমদে ভরু কুচ কনক-কলস যাহে শ্যামর অধিক উল্লাস॥
লুপত বেকত করু কিঙ্কিণী নূপুর এ দুহুঁ রহুঁ মঝু পাশ।
কেলি-নিকুঞ্জ নিকট পহিরায়ব কহ ঘনশ্যাম দাস॥"

—গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী, ঘনশ্যাম দাস।

(১১) রামানন্দ বসু

"শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" গ্রন্থপ্রণেতা কুলীনগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পুত্র বা পৌত্র রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। অনেকের মতে তাঁহার উপাধি "সত্যরাজখান" ছিল। সম্ভবতঃ "গুণরাজখান" উপাধিধারী মালাধর বসুর ইনি পুত্রই হইবেন। রামানন্দের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি বেশ মিষ্ট। যথা,—

"আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া সহচর মিলিয়া খেলায়॥
প্রিয় গদাধর-সঙ্গে পূরব রভস-রঙ্গে নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবডুবু করে না বহয়ে বিষম বা দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল দুকূলে নদীয়া-লোক দেখে।
ভুবন মোহন নায়িয়া দেখিয়া বিবশ হইয়া যুবতী ভুলল লাখে লাখে॥
জগজন-চিত-চোর গৌরসুন্দর মোর যা করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ-কন্দে বঞ্চি রহিনু মুই এক॥"

—পদাবলী, রামানন্দ বসু।

(১২) রায় রামানন্দ

রায় রামানন্দ উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মাধুর্য্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক আলোচনা "ভাব-সম্মেলন" নামে বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। রায় রামানন্দ উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্যানগরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে তিনি রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে একবার স্বয়ং বিদ্যানগর গমন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে "মিত্র" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। রামানন্দ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি "রসিক-ভক্ত" নামে খ্যাত এবং "জগন্নাথ-

বল্লভ" নামক সংস্কৃত নাটক রচনাকারী। রায় রামানন্দের কতিপয় বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদও আছে।

(১৩) জগদানন্দ

জগদানন্দ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ ইহার পূর্ব্বপুরুষ। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি-দক্ষিণখণ্ডে বাস করিতে থাকেন। জগদানন্দ ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্র না থাকিয়া বীরভূমের অন্তর্গত জোফলাই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। জগদানন্দ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর কবি এবং তাঁহার মৃত্যুকাল ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ। তিনি কতিপয় পদরচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অপর একজন জগদানন্দ মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। তিনি পুরীতে মহাপ্রভুর সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একবার সনাতন গোস্বামী ইহার সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন,—

"জগদানন্দে পীয়াও আত্মীয়তা সুধারসে।
মোরে পীয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিষিন্দা রসে॥"

— চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

(১৪) গদাধর পণ্ডিত

পণ্ডিত গদাধর শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় এবং নবদ্বীপবাসী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কৈশোরে তিনি মুরারি গুপ্ত ও গদাধর পণ্ডিতের সহিত নানারূপ রহস্য করিতেন। পথে গদাধর পণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া একদা মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"হাসিয়া দুই হাত প্রভু রাখিয়া ধরিলা।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন।
প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ॥"

— চৈতন্য-ভাগবত, আদিখণ্ড

গদাধর পণ্ডিত কতিপয় বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন।

(১৫) যদুনন্দন দাস

পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইহার নিবাস মালিহাটি গ্রামে এবং জন্ম ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে। প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য যদুনন্দন দাসের

"প্রভু" ছিলেন। ইনি গুরু-কন্যা শ্রীমতী হেমলতার আদেশে তাঁহার বিখ্যাত "কর্ণানন্দ" গ্রন্থ রচনা করেন। "পদকল্পতরু" গ্রন্থে আছে "প্রভুসুতাচরণসরোরুহ মধুকর জয় যদুনন্দন দাস।" যদুনন্দনের অপর দুই গ্রন্থ সংস্কৃতের সুন্দর পয়ারানুবাদ। ইহাদের একখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজের "গোবিন্দলীলামৃত" ও অপরখানি রূপগোস্বামীর "বিদগ্ধমাধব"। যদুনন্দনের পদকর্তা হিসাবেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল।

(১৬) যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য এবং পদকর্ত্তা। ইহার বাড়ী কাটোয়া ছিল। এই যদুনন্দন শ্রীচৈতন্যের একজন চরিত-লেখক। ইনি স্বীয় নামের সঙ্গে স্থানে স্থানে "দাস" পদবীও ব্যবহার করিয়াছেন। "ভক্তি রত্নাকরে" এই কবি সম্বন্ধে এই কয়ছত্র পাওয়া যায়। যথা,—

"যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য।
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়।
বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥"

- ভক্তিরত্নাকর।

(১৭) পুরুষোত্তম

কবি পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত অপর নাম "প্রেমদাস"। ইহার পিতার নাম গঙ্গাদাস এবং বাড়ী নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাদাস বৃন্দাবনবাসী হইয়া তথাকার গোবিন্দ মন্দিরের পৌরহিত্য করিতেন। পুরুষোত্তম কতিপয় বৈষ্ণব পদ রচনা ছাড়া "বংশীশিক্ষা" ও কবিকর্ণপুরের "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন। "বংশীশিক্ষা" রচনার কাল ১৭১২ খৃষ্টাব্দ।

প্রেমদাসের পদ (মিলন)।

"নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঞ্জে॥
বঁধুহে কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখ মুঞি সব আঁধিয়ারে॥

পাইয়াছি তোমারে বঁধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার॥
এক তিল তোমা বঁধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীনা নারী॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া॥"

—পদাবলী, প্রেমদাস।

(১৮) বংশীবদন

পদকর্ত্তা বংশীবদনের বাড়ী পাটুলীগ্রামে ছিল। তাঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। বংশীবদনের দুই পুত্রের নাম চৈতন্য দাস ও নিত্যানন্দ দাস এবং দুই পৌত্রের নাম রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। ইঁহারা চৈতন্য দাসের দুই পুত্র। রামচন্দ্র ও শচীনন্দন দুই ভ্রাতাই বিখ্যাত পদকর্ত্তা। চৈতন্য দাসও কতিপয় পদ রচনা করিয়াছিলেন। বংশীবদনের জন্মকাল ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায় অনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। বিল্বগ্রামের "শ্রীগৌরাঙ্গ" মূর্ত্তি এবং নবদ্বীপের "প্রাণবল্লভ" বিগ্রহ বংশীবদনের প্রতিষ্ঠিত। বংশীবদনের পদাবলী ভিন্ন অপর রচনা "দীপান্বিতা" নামক কাব্যগ্রন্থ। পদকর্ত্তা রামচন্দ্রের রাধানগরে ও বাঘনাপাড়া এই দুই স্থানেই বাড়ী ছিল। তিনি জাহ্নবীদেবীর নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন। পদকর্ত্তা শচীনন্দন (কনিষ্ঠ ভ্রাতা) "গৌরাঙ্গবিজয়" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থেরও প্রণেতা।

শ্রীরাধার অভিসার-সজ্জা

"রাই সাজে বাঁশী বাজে না বাঁধিল চুল।
কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচড়ে রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥

বংশীবদনে কহে যাই বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি॥"

—পদাবলী, বংশীবদন।

(১৯) রঘুনাথ দাস

বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী এবং সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস রচিত কতিপয় পদ পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথ দাস খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর অধিকাংশ ভাগ জীবিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা

"আর এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সখা দুই চারিজন মোর আছে।
কহি শুন তার কথা পাছে হেট কর মাথা ননী চুরি কর যার কাছে॥
যত সব গোপ-নারী লইঞা দধির পসারি মথুরার দিকে যায় তারা।
পথ আগোরিয়া রও দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও একি তোমার অনুচিত ধারা॥
নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী কুলবধূ কর দাসী কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া॥
খাওয়াও পরের ধন্দ এখনি করিব বন্দ লইয়া যাব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথে কয় শুনিতে লাগএ ভয় চমকিত হইল যদুবীরে॥"

—পদাবলী, রঘুনাথ দাস।

(২০) বৃন্দাবন দাস

চৈতন্যভাগবতকার প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন দাস (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) অনেকগুলি মধুর বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরাধার মুরলী-শিক্ষা

"বহুদিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন-মুরলী॥
তুমি লহ মোর নীল সাড়ী।
তব পীত ধড়া দেহ পরি॥
তুমি লহ মোর গজমতি।
মোরে দেহ তোমার মালতী॥

ঝাপা-খোপা লহ খসাইয়া।
মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া ॥
তুমি লহ সিন্দূর কপালে।
তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥
তুমি লহ কঙ্কণ কেয়ূরী।
তোর তাড় বালা দেহ পরি ॥
তুমি লহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমারি ভূষণ ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন ॥"

—পদাবলী, বৃন্দাবন দাস।

(২১) রায় বসন্ত

দুইজন পদকর্ত্তা "রায় বসন্ত" ছিলেন। একজন পদকর্ত্তা রায় বসন্ত বা দ্বিজ বসন্ত রায় (খৃঃ ১৬।১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন ও শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। এই নামের অপর পদকর্ত্তা যশোহরের সুবিখ্যাত কায়স্থ রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। বাঙ্গালার তদানীন্তন ইতিহাসে বসন্ত রায় সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। বসন্ত রায়ের পুত্রের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ "কচু" রায়। দ্বিজ বসন্ত রায়ের পদকর্ত্তা ও পরম বৈষ্ণব হিসাবে অধিক খ্যাতি ছিল। বোধ হয় "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তম-বিলাসে" তাঁহারই নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার অভিসার

"সখীর বচনে ধনী-হিয়া আনন্দিত পিয়া-মিলন-অভিলাষে।
নয়ন বয়ান পুন পরশ বিলোকন সহচরী পরম উল্লাসে ॥
কেহ কঙ্কতি করে কেশ বেশ করু কবরী মালতী-মালে।
পরিকরে দরপণ বদন বিলোকই বিমল করত সীঁথি ভালে ॥
সুন্দর সিন্দুর তাহে বনায়ই অঞ্জন অঞ্জই নয়ানে।
মৃগমদ চন্দন তিলক নব কুসুম পত্রাবলী-নিরমাণে ॥
কেহ তহিঁ সোপল রতন-সীঁথি-ফল সো ছবি উপমা কি আনে।
যনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল হেন মানে ॥

নাশায়ে বেশর মোতিম মধুর ছবি মণিকুণ্ডল দোলে শ্রবণে।
মাধবিক কঙ্কণ বিবিধ ভূষণ নীল বসন পরিধানে॥
উর-উপর মতিম হার মনোহর কিঙ্কিণী-সুমধুর কলনে।
মণিময় মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বাজত কলয়তি রাতুল-চরণে॥
করিবর-ভাতি গমন অতি মন্থর কত লাবণি অভিসারে।
পদ-পল্লব ভুবন-পাবন ভেল ভূষিত রায় বসন্ত বলিহারে॥"

—পদাবলী, রায় বসন্ত (রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত)।

(২২) লোচন দাস

প্রসিদ্ধ কবি লোচন দাস "চৈতন্য-মঙ্গলের" রচনাকারী। কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান কোগ্রাম এবং পিতার নাম ছিল ত্রিলোচন দাস। কবির জন্মকাল ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ। কবি লোচন দাস অনেক মধুর বৈষ্ণব-পদ রচনা করিয়াও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ।

(ক) "এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
(আমার) অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
(বঁধু) তোমায় যখন পড়ে মনে (আমি) চাই বৃন্দাবন-পানে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি গো
তাহে পরিজন-পরিবাদ।
বাজন-নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচন দাসের এই সাধ॥"

—পদাবলী, লোচন দাস।

গৌরাঙ্গ-বারমাসী।

(খ) "ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ-চাঁদ পূর্ণিমা-দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়াস আর ধূপদীপ-গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্প-মধু খাই মত্ত গুঞ্জরে মধুপে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাব কিরূপে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি।
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥" ইত্যাদি।

—পদাবলী, লোচন দাস।

(২৩) নরোত্তম দাস

সুপ্রসিদ্ধ নরোত্তম দাস চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম বৈষ্ণবপ্রধান ছিলেন। ইনি রাজসাহী খেতুরির রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে বৈরাগ্যোদয়ে পদব্রজে বৃন্দাবন গমন করেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থে এই বৈষ্ণব মহাপুরুষের কথা বর্ণিত আছে। ইনি খৃ: ১৬শ শতাব্দীতে (শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী সময়ে) বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীরাধার বিরহ।

"তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুয়্যা জুড়াব পরাণী॥

মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণগুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনয়্যা বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পীরিতির ফাঁদ॥"

পদাবলী, নরোত্তম দাস।

(২৪) বীর হাম্বীর

বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দী। তিনি প্রথম জীবনে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন এবং দস্যুতা করিতেন। বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় প্রেরিত অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি তাঁহার নিযুক্ত দস্যুগণ লুণ্ঠন করিয়াছিল। "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থখানিও ইহাদের মধ্যে ছিল। যাহা হউক পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গ্রন্থগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় বৈষ্ণবপদ রচনা করেন এবং স্থানবিশেষে "চৈতন্যদাস" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুতপ্ত ভক্তের আর্ত্তি।

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলা মোর আশ
তুয়া বিনা গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয়-কীট বড়ই লাগিল মিট
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার॥
করিতু গরল পান সে ভেল হানিল বাণ
দেখাইল অমৃতের ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন
এমতি প্রেমের ব্যবহার॥
রাধা-পদ সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরা-পদে বান্ধি দিল চিত।
শ্রীরাধার মন-সহ দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ
জানাইলা দুহুঁ প্রেম-প্রীত॥

যমুনার কূলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাধাকানু বিলসয়ে রূপ।
এ বীর হাম্বীর-হিয়া ব্রজপুর সদা ধিয়া
পদ্মে যেন বিহরে মধুপ॥"
—পদাবলী, বীর হাম্বীর (চৈতন্য দাস)

(২৫) দুখিনী

সম্ভবতঃ দুখিনীর প্রকৃত নাম শ্যামানন্দ। শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। ইনি বৃন্দাবনে বাস করিবার পর "শ্যামানন্দ" নাম প্রাপ্ত হন। ইঁহার অপর আরও দুইটি নাম "দুঃখী" ও "কৃষ্ণদাস"। শ্যামানন্দ জাতিতে সদেগাপ এবং নিবাস উৎকলের ধারেন্দা-বাহাদুর গ্রামে ছিল। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস গৌড় দেশ। শ্যামানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যায় বসতি স্থাপন করেন। শ্যামানন্দের দীক্ষা গুরুর নাম হৃদয়-চৈতন্য। কবি তাঁহার জীবনের শেষ সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত নৃসিংহপুরে বাস করিতেন। এই প্রদেশে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে এবং তন্মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারির নাম উল্লেখযোগ্য। উৎকলের বহু প্রসিদ্ধ ও ধনী পরিবার রসিকানন্দের বংশীয়গণের শিষ্য। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা তাঁহাদের অন্যতম। রসিকানন্দের পিতার নাম অচ্যুতানন্দ। শ্যামানন্দের কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দী এবং তাঁহার জন্ম সময় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরাধার নৃত্য।

"না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥
বিষম সঙ্কট-তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥
যেমন বলেন শ্যাম-নাগর তেমনি নাচে রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই॥
সবাই বলেন রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
দুখিনী কহিছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে॥"
—পদাবলী, দুখিনী

(২৬) দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি এবং ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রামের নাম স্নানপুর বা গোসাইপুর। কবির সময় খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। দ্বিজ মাধব (মাধবাচার্য্য) কতিপয় বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন।

যশোদার বাৎসল্য।

গোষ্ঠ।

"বিপিনে গমন দেখি হয়্যা সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লয়্যা প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দুখানি রাঙ্গা পায় বান্ধা রাখুন তায়
জানু রক্ষা করুন দেবগণ।
কটিতট সূর্য্যাবর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলী রাখিবেন বনমালী
কণ্ঠ রাখুন দিনমণি।
পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব মস্তক রাখুন শিব
অধঃঅঙ্গ রাখুন চক্রপাণি॥
জল-স্থল গিরি-বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশদিক্ দশদিগ্‌পাল।
যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করুন সর্ব্বত্র
নহে তুমি হইও তার কাল॥
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হাত ধরি
গো-মূত্রের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দ্বিজ মাধবে কয় নন্দ-রাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল॥"

—পদাবলী, দ্বিজ মাধব।

(২৭) মাধবী দাসী

মহাপ্রভুর নীলাচল বাসকালে তাঁহার পরম ভক্ত শিখী মাহিতীর ভগ্নী মাধবী দাসীর মহাপ্রভুর প্রতি অসামান্য ভক্তি ছিল। মহাপ্রভুর অন্যতম

সহচর ছোট হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট সামান্ত ভিক্ষা চাহিবার জন্ত তিনি (ছোট হরিদাস) মহাপ্রভু কর্তৃক তিরস্কৃত ও তাঁহার সম্মুখ হইতে বহিষ্কৃত হন। "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥" (চৈ, চ, অন্ত্যখণ্ড)। মাধবী দাসী রচিত কতিপয় বৈষ্ণব পদ রহিয়াছে।

শচী দেবীর নিকট নদীয়ায় মহাপ্রভুর প্রেরিত জগদানন্দ।

"নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথো দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে চায়॥
লতাতরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী মুদি দুটী আখি
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকারি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর পণ্ডিত ঠাকুর
পড়িলা আছাড়ে গা॥"

—পদাবলী, মাধবী দাসী।

(২৮) রঘুনন্দন গোস্বামী

নিত্যানন্দ প্রভুর বংশীয় ও রামায়ণের (রামরসায়নের) প্রসিদ্ধ রচনাকারী রঘুনন্দন গোস্বামী বর্দ্ধমান জেলার মাড়োগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মকাল ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ। কবি রঘুনন্দন পদকর্ত্তাও ছিলেন।

রাধা-কৃষ্ণ মিলন।

"হেন মতে রাই করত আশ
কভু নিরখত দেহ-বাস
কভু করতঁহি নর্ম্ম-হাস
গদ গদ গদ ভাষে।
হেনই সময়ে নাগররাজ
করিয়া দিব্য নটবর-সাজ
আওল দেখি সখী সমাজ
কহত রাই-পাশে॥
দেখহ সখী নয়ন ভাবি
আওত ঘরে বংশীধারী
গোকুলপুর-যুবতী-নারী
চিত্ত-হরণকারী।
নীলরতন জলদ-শ্যাম
জিনিয়া কোটি কোটি কাম
শশধর শত-লক্ষ-ধাম
ধৈরয-ধনহারী॥

* * * *

গিরিতট-সম উরঃ বিশাল
তাহঁ দোলত মুকুতা-মাল
কনক-যূথী-দাম-ভাল-
সৌরভে অলি ধায়ে।
কটিতটে শোভে পীতবাস
গজবর জিনি গতি-বিলাস
রঘুনন্দন নাম দাস
সঙ্গে করি আয়ে॥"

—পদাবলী, রঘুনন্দন গোস্বামী।

(গ) অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।*

(১) গৌরীদাস পণ্ডিত—ইনি সূর্য্যদাস সারখেলের ভ্রাতা। সূর্য্যদাস সারখেল নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর ছিলেন। ইঁহাদের নিবাস অম্বিকাগ্রামে। পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত নিম্বকাষ্ঠনির্ম্মিত শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ স্বগ্রামে স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত একখানি গীতা তাঁহার নিকট ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। গৌরীদাসের অপর ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও একজন পদকর্ত্তা। পদকর্ত্তা অনেক "কৃষ্ণদাস" ছিলেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজও একজন পদকর্ত্তা।

(২) পীতাম্বর দাস—ইনি "রসমঞ্জরী" নামক পদ-গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা এবং পদকর্ত্তা। তাঁহার পিতা রামগোপাল দাসও (গোপাল দাস) পদকর্ত্তা এবং "রসকল্পবল্লী" প্রণেতা। "রসকল্পবল্লী"র রচনাকাল ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ। রামগোপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন রায় চৌধুরী "গোবিন্দলীলামৃত" অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশে "রায় চৌধুরী" উপাধি ব্যবহার ছিল।

(৩) পরমেশ্বরী দাস—ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং বাড়ী কাউগ্রাম ছিল। পরমেশ্বরী দাস জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে "তড়া-আটপুর" গ্রামে শ্রীরাধাগোপীনাথ (শ্যামসুন্দর) বিগ্রহ স্থাপন করেন।

(৪) যদুনাথ আচার্য্য—ইঁহার উপাধি "কবিচন্দ্র" এবং ইনি নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। যদুনাথের পূর্ব্বনিবাস বুরুঙ্গাগ্রামে (শ্রীহট্ট জেলা) ছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে—"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহাকে সদয়॥"

(৫) প্রসাদ দাস—শ্রীনিবাসের শিষ্য। কবির বাড়ী বিষ্ণুপুর ছিল এবং পিতার নাম করুণাময় দাস (মজুমদার)। কবির উপাধি "কবিপতি" ছিল।

(৬) উদ্ধব দাস—কবির অপর নাম কৃষ্ণকান্ত। ইনি টেঞা (বৈদ্যপুর) নিবাসী এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন।

(৭) রাধাবল্লভ দাস—ইঁহার পিতার নাম সুধাকর মণ্ডল ও মাতার নাম শ্যামাপ্রিয়া। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল কাঞ্চনগড়িয়া। ইনি রঘুনাথ গোস্বামী রচিত "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"র অনুবাদক।

(৮) পরমানন্দ সেন—ইঁহার বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়া এবং ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পরমানন্দের পিতার নাম প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশচন্দ্র সেন) দ্রষ্টব্য।

(শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ)। কবি পরমানন্দের জন্মকাল ১৫২৪ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার "কবিকর্ণপুর" উপাধি মহাপ্রভু প্রদত্ত। ইনি প্রসিদ্ধ "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের রচনাকারী। ইঁহার অপর গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (ক) "গৌর গণোদ্দেশ-দীপিকা", (খ) "আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূ", (গ) "কেশবাষ্টক" এবং (ঘ) "চৈতন্য-চরিত কাব্য"। তাঁহার এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত।

(৯) ধনঞ্জয় দাস—ইনি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহার বাড়ী ছাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে (বর্দ্ধমান জেলা) ছিল।

(১০) গোকুল দাস—এই পর্যন্ত চারিজন গোকুল দাসের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। যথা,—(ক) জাজীগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ গোকুল দাস কীর্তনিয়া। (খ) শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোকুল দাস (নিবাস—কাঞ্চনগড়িয়া)। (গ) বনবিষ্ণুপুরের গোকুল দাস মহান্ত—ইনি বীর হাম্বীরের সময়ে বর্তমান ছিলেন। (ঘ) পঞ্চকোট-সেরগড় নিবাসী গোকুল "কবীন্দ্র" ("ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত")।

(১১) আনন্দ দাস—জগদীশ পণ্ডিতের শাখাভুক্ত আনন্দ দাস হইতে পারেন। এই আনন্দ দাস "জগদীশচরিত্র বিজয়" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

(১২) কানুরাম—এই পদকর্তা শ্যামানন্দের শাখাশিষ্য এবং ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত ছিলেন।

(১৩) গতিগোবিন্দ—পদকর্তা গতিগোবিন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র ও পদকর্তা কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ গতিপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। শ্রীগতিপ্রভু বা গতিগোবিন্দ "বীররত্নাবলী" নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

(১৪) গোকুলানন্দ সেন—ইনি বৈষ্ণব দাস নামে পরিচিত এব সুবিখ্যাত "পদকল্পতরু" নামক বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্কলনকারী। ইনি জাতিতে বৈদ্যবংশোদ্ভব এবং নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর। ইঁহার সময় খৃ: ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ।

(১৫) গোপাল দাস—ইনি শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য এবং পীতাম্বর দাসের পিতা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া এবং নিবাস বুধইপাড়া গ্রামে ছিল।

(১৬) গোপাল ভট্ট গোস্বামী—ইনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী এবং ইঁহার কাল ১৫০০-১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হইয়াও কতিপয় বাঙ্গালা পদ রচনা করিয়াছিলেন।

(১৭) গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী--ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য এবং নিবাস বুধরী গ্রামে ছিল। "রসিকমঙ্গল" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১৮) চম্পতি রায়—ইঁহাকে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের টীকায় "দাক্ষিণাত্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তসমাজ" ভুক্ত ব্যক্তি এবং "গীতকর্ত্তা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১৯) দৈবকীনন্দন—পদকর্ত্তা দৈবকীনন্দন মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। প্রবাদ আছে যে ইনি প্রথম জীবনে বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন। ইহার ফলে ইনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন এবং মহাপ্রভুর শরণ নিয়া বৈষ্ণবভক্তির চিহ্নস্বরূপ "বৈষ্ণব-বন্দনা" রচনা করেন এবং নিদারুণ রোগ হইতে মুক্ত হন। ইনি ভাগবত ও অপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উপাধি "কবিশেখর" এবং একস্থানে ভাগবতে "রায়শেখর" আছে।

(২০) নরসিংহ দেব—ইনি নরোত্তমের "স্বগণ" এবং পক্কপল্লীর রাজা ছিলেন। প্রেমবিলাসে ইহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(২১) নয়নানন্দ—ইহার পিতার নাম বাণীনাথ। বাণীনাথ চৈতন্য পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা। নয়নানন্দ চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছেন।

(২২) মাধো—ইনি নীলাচলবাসী ছিলেন। ইহার গুরু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ।

(২৩) রাধাবল্লভ-ইহার পিতার নাম সুধাকর মণ্ডল। রাধাবল্লভ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

(২৪) হরিবল্লভ—ইনি হয় সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ("সাহিত্য-দর্পণ"কার) নতুবা তাঁহার অন্য নাম কৃষ্ণচরণ। যাহা হউক "হরিবল্লভ" নামের ভণিতাযুক্ত পদগুলি সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীরই রচিত। ইহার পদাবলীর সঙ্কলন গ্রন্থখানির নাম "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি"। বিশ্বনাথের ভাগবতের টীকার নাম "সারার্থদর্শিনী" (১৭০৪ খৃঃ)। ইনি বহু মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

(২৫) তরণীরমণ—ইহার স্বকীয় রচনাসমেত একটি পদসংগ্রহগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা বৃহৎ গ্রন্থ। এই কবির চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থও আছে। তাহাতে সহজিয়া মতের ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

উল্লিখিত পদকর্ত্তাগণ ভিন্ন গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন, অনন্ত দাস, যদুনন্দন (মালিহাটি নিবাসী), যদুনাথ দাস (রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র), যাদবেন্দ্র, শ্রীদাম দাস, পুরুষোত্তম (প্রেম দাস), জগন্নাথ দাস ("রসোজ্জ্বল" গ্রন্থপ্রণেতা), দ্বিজ ভীম, কামদেব দাস, রাজা নৃসিংহ দেব ও জয়কৃষ্ণ দাস প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) মুসলমান পদকর্ত্তাগণ[১]

(১) **আলোয়াল**—কবি আলোয়াল খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইঁহার বাড়ী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর। ইনি "পদ্মাবতী" নামক বাঙ্গালা কাব্যের রচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি হিন্দী "পদ্মাবং"এর বাঙ্গালা অনুবাদ। যৌবনে ঘটনাক্রমে ইনি আরাকানবাসী হইয়াছিলেন। নানা রচনার সঙ্গে তিনি কতিপয় বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াও বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

"ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ ধ্রু ॥
ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ কিসে বিলম্ব করিলি ॥
প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিয়া পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে ভ্রমর-দংশনে মৈলুম ॥
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অবশেষে ভেল ॥
সীঁথের সিন্দুর নয়নের কাজল সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর দারুণি পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি কুলে নাইক সীমা।
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে জগৎমোহিনী রামা ॥"

— পদাবলী, আলোয়াল।

(২) **অলিরাজা**—কবি অলিরাজার বাড়ী চট্টগ্রাম ছিল। ইনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন এবং ফেণী-নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁহার বাড়ী ছিল।

"বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেবমুনি
ত্রিভুবন হএ জরজর।
কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণ বংশী-স্বর ॥

(১) বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের মধ্যে অনেক মুসলমান কবির নাম ও পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির পরিচায়ক। মুসলমান কবিগণ রচিত পদাবলী সম্বন্ধে রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ও মুন্সী আব্দুল করিম সাহেবের পদাবলী সংগ্রহ দ্রষ্টব্য। মুন্সী সাহেবের সংগৃহীত এইরূপ অনেক পদ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় ২য় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

জত ধর্ম্ম কুলনীতি তেজি বন্ধু-সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণী হরে
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ-বাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণ-নাথ
গুরু-পদে অলিরাজা কয় ॥"

—পদাবলী, অলিরাজা।

(৩) চাঁদকাজি—

"বাঁশী বাজান জানো না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী আর আমি মইরি লাজে ॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাও।
জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও ॥
চাঁদকাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি ॥
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥"

—পদাবলী, চাঁদকাজি।

(৪) গরিব খাঁ—

"শরমে শরম পেলায়ে গেল।
রাই-কানু দুটি তনু যামন দুধে জলে মালায়ে গেল ॥
চাঁদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুব্যা অবশ হল।
সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনম ভর ডুব্যা রহিল ॥
গরিব তাই ছাথার লাগি মনের দুখে মন গুমরি পাগল হল।
সে রসের পাথার পেল না কোথায় শ্যাবে আচট ভূঁয়ে পড়িয়ে মল ॥
জানি কার রূপ পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে।
যামন কারে বাসত ভাল, স্যা ওর মনমত আছিল ॥

ওর মন আছিল স্তা রূপের কাছে।

গরিব কয় ধরমু বলে ডুবা৷ প্যালে না তাই খ্যাপি নদেয় এয়েছে ॥"

—পদাবলী, গরিব খাঁ।

(৫) ভিখন—

"কেমন বনালে চূড়া শ্রবণে দুলিছে ঘন
মেলিতে নার দুটী আঁখি।
নাই যে বঙ্কিম হেলা কি কব চূড়ার খেলা
শ্যাম-অঙ্গে লাগিয়াছে সাধী॥
কুঙ্কুম-কস্তুরী আর সুগন্ধী তাম্বুল
থুইয়াছিনু শিয়র-উপরে।
হা হরি হা হরি করি জাগিয়া পোহাঁনু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে॥
সেখ ভিখনে ভণে বড় দুখ রাইয়ের মনে
পাসরিলে কুঞ্জবন-লীলা।
আমার করম-দোষে তুমি থাক অন্য-পাশে
রাধার পরাণ লৈয়ে খেলা॥"

পদাবলী, ভিখন।

(৬) সৈয়দ মর্ত্তুজা—

"তরু-মূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
কত কত নাগরী রহে চাঁদ-মুখ চাহিয়া॥
জিনি শশী দিবাকর বদন উজ্জ্বল।
মোহিত হইল যত ব্রজ-রমণী সকল॥
কপালে তিলক চাঁদ জিনি তারাগণে।
চিকুর জিনিয়া ছটা সুপীত-বসনে॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে নাগর রসিয়া।
ভুলায়ল গোপ-নারী মুরলী শুনায়া॥"[১]

—পদাবলী, সৈয়দ মর্ত্তুজা।

---

(১) এইস্থানে উল্লিখিত মুসলমান পদকর্ত্তাগণের রচিত বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(ঙ) বৈষ্ণব পদসংগ্রহ

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পদসমূহ একত্র করিয়া অনেকগুলি পদসংগ্রহ গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কতিপয় সংগ্রহ গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা, –

নাম	সংগ্রাহক
(১) পদ-সমুদ্র	বাবা আউল মনোহর দাস
(২) পদামৃতসমুদ্র	রাধামোহন ঠাকুর
(৩) পদকল্পতরু	বৈষ্ণব দাস ("শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" চারিখণ্ডে সমাপ্ত হইয়া মূল্যবান ভূমিকা সহ – সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় সাঃ পঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।)
(৪) পদকল্পলতিকা	গৌরীমোহন দাস
(৫) গীতিচিন্তামণি	হরিবল্লভ
(৬) গীতচন্দ্রোদয়	নরহরি চক্রবর্ত্তী
(৭) পদচিন্তামণিমালা	প্রসাদ দাস
(৮) রসমঞ্জরী	পীতাম্বর দাস
(৯) লীলাসমুদ্র	
(১০) পদার্ণব সারাবলী	
(১১) গীতকল্পতরু	
(১২) সংগ্রহ-তোষিণী	যদুনাথ দাস
(১৩) গীতকল্পলতিকা	
(১৪) গৌরপদ-তরঙ্গিণী	জগবন্ধু ভদ্র (আধুনিক কালে)
(১৫) গীতরত্নাবলী	

ইহা ছাড়া জগবন্ধু ভদ্রের ন্যায় আধুনিক যুগে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ, নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাসের পদসংগ্রহ এবং সারদাচরণ মিত্র, দুর্গাদাস লাহিড়ী, দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির পদসংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। পদসংগ্রাহক বলিয়া কথিত বাবা আউল মনোহর দাস পদকর্ত্তা জ্ঞান দাসের বন্ধু ছিলেন সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী)। মনোহর দাস সংগৃহীত পদসমুদ্রের পদসংখ্যা পনর হাজার। গ্রন্থখানি যে বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত হয়।

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের অল্প পরেই রাধামোহন ঠাকুর (শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র) পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলিত করেন। রাধামোহন ঠাকুর তংকৃত পদ-সংগ্রহে নিজ রচিত অনেক পদ যোগ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গ্রন্থের মধ্যে স্বরচিত সংস্কৃত টীকাও সংযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি শব্দ বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুই বোধহয় এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার চারি শাখায় মোট পদসংখ্যা তিন হাজার একশত একটি। ইহাতে তাঁহার স্বরচিত পদসংখ্যা সাতাইশটি এবং তাহাও বন্দনাসূচক মাত্র। এই সংগ্রহ কিয়ং পরিমাণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কারণ সূচীপত্রানুযায়ী সব পদ গ্রন্থ মধ্যে নাই। ইহা ছাড়া গ্রন্থের সমস্ত পদকেই উংকৃষ্ট বলা যায় না। তবুও বলিতে হয় এই সংগ্রহই সর্ব্বোংকৃষ্ট। এই পদগুলি নির্ব্বাচন করিতে অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী রস-বোধের রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। অন্য কোন রীতি অনুসরণ করা হয় নাই। নায়ক-নায়িকার প্রণয় প্রসঙ্গে তাহাদের বিভিন্ন অবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে এবং প্রথমে রাধা-কৃষ্ণ লীলা এবং পরে শ্রীচৈতন্য-লীলার ভিতর দিয়া ইহা দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। প্রেম ও ভক্তির অতি উচ্চসুরে পদগুলি বাধা। তবে বর্ণনাভঙ্গী অনবদ্য হইলেও পদগুলির বাহ্য প্রকাশে ও অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতায় সকল স্থানে সামঞ্জস্য হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বৈষ্ণব পদগুলির আদর্শ ও বাহ্যপ্রচারে সর্ব্বত্র সঙ্গতি না থাকিলেও আদিরসাত্মক পদগুলির ভিতর পদকর্ত্তাগণের নায়ক-নায়িকার সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পদকর্ত্তাগণ ও সংগ্রাহকগণ ইহাদের অনেকেই সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ধীর নায়ক, ধীরোদাত্ত নায়ক প্রভৃতির, মানিনী, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা অবস্থার নায়িকা প্রভৃতির, স্বকীয়া নায়িকা, পরকীয়া নায়িকা ও সামান্য নায়িকার বিভেদ প্রভৃতির, বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণ-লীলার প্রসঙ্গে মিলন, মাথুর, মান প্রভৃতির এবং রসশাস্ত্রের বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস প্রভৃতির ব্যাখ্যায় পদকর্ত্তাগণ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধুর রসের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং পদসংগ্রহ ও বিভাগ কার্য্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

বৈষ্ণব চরিতাখ্যান

বৈষ্ণব চরিতাখ্যান বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে। পূর্ব্বে জনসাধারণ দেবলীলা শ্রবণেই শুধু অভ্যস্ত ছিল, দেবোপম মানব-চরিত্রও যে বর্ণনার বিষয় হইতে পারে এই ধারণা তাহাদের ততটা ছিল না। অবশ্য ইহা যে তাহাদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহাও নহে, নাথপন্থী সাহিত্য তাহার প্রমাণ। বৈষ্ণব চরিতাখ্যানসমূহে ভক্তিবাদপ্রচারের মধ্য দিয়া সংস্কৃতশাস্ত্রের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে রক্ষণশীল শৈব-শাক্ত অংশের সহিত উদারনৈতিক বৈষ্ণব অংশের প্রচুর সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ই সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির সাহায্যে স্বীয় দলের মত প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইয়াছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শুধু শাস্ত্রের উপরই নির্ভরশীল ছিল না। ইহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় পূত-চরিত্র মহাজনগণের জীবনের উদাহরণ তাহাদের মত-প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই মানব-শ্রেষ্ঠগণের তিরোধানের পরও তাঁহাদের জীবনালেখ্য বৈষ্ণব-সমাজের কাজে লাগিয়াছিল। ভক্তবৃন্দ এই সাধু বৈষ্ণব প্রধানগণের জীবন-চরিত রচনা করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জীবন-কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল এবং একাধিক ভক্ত উহা রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অদ্বৈত প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত এবং চৈতন্যোত্তরযুগে নরোত্তম ও শ্রীনিবাস-চরিত্র বর্ণনা এবং শ্যামানন্দের জীবনী প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের আদর্শ সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই জীবন-চরিতসমূহের দুইটি দিক আছে। ইহার একদিকে শাস্ত্রের সাহায্যে শাস্ত্রজ্ঞ রক্ষণশীল সমাজের সহিত সংঘর্ষ দ্বারা বৈষ্ণবগণ স্বীয় মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহারা বৈষ্ণব মহাজনগণের মধ্যে স্থানবিশেষে অলৌকিকত্বের আরোপ করিয়া জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন কারণ এই পথেই সাধারণ ব্যক্তিগণের মন আকৃষ্ট করিতে অধিক সুবিধা। অবশ্য যাহারা অলৌকিক গল্পগুলিতে সত্যই আস্থাবান্ তাহাদের বিশ্বাসে আঘাত দিবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই। এই অলৌকিক বা অতিমানুষিক ঘটনাগুলি

বিষ্ণু মূর্ত্তি

প্রধানতঃ মহাপ্রভুতেই আরোপিত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনীই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছে। অলৌকিকত্বের দিক দিয়া নাথপন্থী সিদ্ধাগণের জীবনী এবং মহাপ্রভুর জীবনী সাদৃশ্য-মূলক। তবে জ্ঞান-পন্থী এই সাধুব্যক্তিগণ শৈব ছিলেন এবং বৈষ্ণবপন্থায় সংস্কৃতশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বৈরাগ্য প্রচার করিতেন। এই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের কাছে এই সন্ন্যাসীগণের অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনীই তাঁহাদের মত প্রচারে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কামজয়ী পূত-চরিত্র সন্ন্যাসীগণের কাহিনীও সাধারণের মনে স্বাভাবিক ভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব-গোস্বামী ও নাথ-পন্থী সাধু উভয়েই বৈরাগ্যের মত প্রচারে উৎসাহী হইলেও উভয়েই অবশেষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম কতকটা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মধুররসব্যাখ্যাকারী এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত বৈষ্ণব প্রধানগণ স্ত্রী-পুরুষঘটিত বিষয়ে গার্হস্থ্যধর্ম্মের অতিরিক্ত বিশেষ মনোভাবও প্রচার করিয়াছিলেন। নাথপন্থী অতদূর অগ্রসর হন নাই। মহাপ্রভু নিজে বিষয়টি যে দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা দেখিয়াছিলেন তাহাতে "অন্তরঙ্গ" ও "বহিরঙ্গের" সম্বন্ধে বিভিন্ন আদর্শ ছিল। তান্ত্রিক মত-বাদ নাথপন্থী ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটি বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-জাতিকে দূরে রাখিবার প্রচেষ্টা নাথ-পন্থী যতটা করিয়াছে বৈষ্ণব ততটা করে নাই এবং এই বিষয়ে উভয়ের আদর্শেরও কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। নাথ-পন্থী মায়াবাদী শৈব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মায়াবাদ বিরোধী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য উপাসক।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানগুলি শুধু যে বৈষ্ণব-প্রধানগণের পবিত্র জীবন-কথা ও বৈষ্ণব মতবাদই প্রচার করিয়াছে তাহা নহে। এইগুলি পাঠ করিলে আমরা মধ্যযুগের বাঙ্গালার সামাজিক, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের উদ্ভব, পরিপুষ্টি এবং সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যও এই চরিত-কথাসমূহ অবলম্বনেই অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ছাড়া সরল ও অনাড়ম্বর ভাব-প্রকাশে এবং ভক্তের আন্তরিক ভক্তিপ্রকাশে বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলির তুলনা নাই। শাক্ত-মঙ্গলকাব্যগুলিতে কবিগণ দেবতাকে মানুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে মানুষকে দেবতার পর্য্যায়ে গণ্য করিয়াছেন। ইহার ফলে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনেকে দেবতার অবতাররূপে স্বীকৃত ও প্রচারিত হইয়াছেন। এই অবতার-বাদ প্রচারে

বৈষ্ণবগণ বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে অলৌকিকত্ব দেবত্বের অঙ্গীয়ও বটে। ইহার ফলে দেবত্বপ্রয়াসী নকল ব্যক্তিগণের আবির্ভাবের কথাও বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে।

বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। কতিপয় বৈষ্ণব-চরিতাখ্যান শ্রীচৈতন্য-যুগে রচিত এবং অপরগুলি শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে রচিত। শেষোক্ত গ্রন্থগুলি মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে তাঁহার কতিপয় ভক্তের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়। এই ভক্তগণের অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে অবশ্য মহাপ্রভুর জীবনীই প্রধান।

শ্রীচৈতন্য-যুগে ও তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত প্রধান জীবন-চরিতসমূহ।

(১) মুরারী গুপ্তের "কড়চা"
(২) স্বরূপ-দামোদরের "কড়চা"
(৩) গোবিন্দ (দাসের) কর্ম্মকারের "কড়চা"
(৪) কবিকর্ণপুরের "চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক"
(৫) জয়ানন্দের "চৈতন্য-মঙ্গল"
(৬) বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত"
(৭) লোচন দাসের "চৈতন্য-মঙ্গল"
(৮) কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত"
(৯) নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তি-রত্নাকর"
(১০) নরহরি চক্রবর্ত্তীর "নরোত্তম-বিলাস"
(১১) নিত্যানন্দ দাসের "প্রেম-বিলাস"
(১২) নরহরি চক্রবর্ত্তীর "গৌরচরিত চিন্তামণি"
(১৩) ঈশান-নাগরের "অদ্বৈত-প্রকাশ"
(১৪) হরিচরণ দাসের "অদ্বৈত-মঙ্গল"
(১৫) নরহরি দাসের "অদ্বৈত-বিলাস"
(১৬) গোপীবল্লভ দাসের "রসিক-মঙ্গল"
(১৭) জগজ্জীবন মিশ্রের "মনঃসন্তোষিণী" (মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।
(১৮) লোকনাথ দাসের "সীতা চরিত্র" (অদ্বৈত প্রভুর দুই স্ত্রী শ্রী ও সীতাদেবী; তন্মধ্যে সীতাদেবীর চরিত্র বর্ণনা।)
(১৯) শ্রীচৈতন্য-জীবনী (সদানন্দ রচিত প্রতাপ রুদ্রের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত, ৩২ পৃষ্ঠা। কুচবিহার-রাজের গ্রন্থাগারে আছে।)

(২০) আনন্দচন্দ্র দাসের চৈতন্য-পার্ষদ "জগদীশপণ্ডিত চরিত" (রচনা ১৮১৫ খৃঃ)।

(২১) চূড়ামণি দাসের "ভুবন-মঙ্গল" (খণ্ডিত) বা "চৈতন্য-চরিত" (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী—বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুঁথি কুচবিহার-দর্পণ, আষাঢ়, ১৩৫৪, সুকুমার সেন রচিত চূড়ামণি দাসের "ভুবন মঙ্গল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২২) পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের "বঙ্গ-জয়" (শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব-বঙ্গ ভ্রমণ বৃত্তান্ত)।

এই গ্রন্থগুলি ছাড়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও নানাগ্রন্থে বৈষ্ণব চরিতাখ্যান আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'মহাপ্রসাদ বৈভব', 'চৈতন্যগণোদ্দেশ', 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুরারী গুপ্তের "কড়চা" মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে খুব প্রামাণ্য গ্রন্থ, কিন্তু ইহা সংস্কৃতে লিখিত সুতরাং আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। স্বরূপ-দামোদরের "কড়চা"ও সংস্কৃতে রচিত সুতরাং এই গ্রন্থখানিও আমাদের বিবেচনার বাহিরে হওয়া সঙ্গত। তাহার উপর স্বরূপ-দামোদরের "কড়চার" সামান্য অংশ ভিন্ন পাওয়া যায় না। কবিকর্ণপুরের "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর জীবনচরিত হইলেও ইহা নাটক এবং তাহার উপর ইহাও সংস্কৃতে লিখিত সুতরাং আমাদের সমালোচ্য নহে। অপর গ্রন্থগুলি বিষয়-বস্তু হিসাবে প্রধানতঃ দুই ভাগ করা যায় এবং সময়ের দিক দিয়াও দুইভাগ করা চলে। সময়ের হিসাবে চৈতন্যযুগ ও শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগ এই দুইভাগ। চরিতাখ্যানগুলি আবার দুই শ্রেণীর, যথা মহাপ্রভু সম্বন্ধে এবং তাঁহার পার্ষদ সমসাময়িক ভক্তগণ সম্বন্ধে। চৈতন্য-পরবর্ত্তী বা চৈতন্যোত্তর যুগের গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ মহাপ্রভুর ও তৎসাময়িক ভক্তগণের কাহিনী।

শ্রীচৈতন্যের যুগ

মহাপ্রভুর জীবনী

(ক) গোবিন্দদাসের কড়চা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে গোবিন্দদাসের "কড়চা" তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। "কড়চা" অর্থ "নোট" বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা স্মারকলিপি। গোবিন্দদাস বা কর্ম্মকার মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তাঁহার ভক্ত অনুচর হিসাবে সঙ্গী ছিল এবং মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। এই লেখক ও তাঁহার রচনা নিয়া নানারূপ বাদানুবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের পরিচয় নিয়াই প্রথম গোলযোগ। দ্বিতীয় গোলযোগ তাঁহার রচিত পুথি বলিয়া যাহা কথিত হয় তাহা আংশিক বা সমগ্রভাবে সত্যই তাঁহার রচিত কিনা? তৃতীয় গোলযোগ মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণিত বিষয় নিয়া।

উল্লিখিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে প্রথমটি হইতেছে গোবিন্দের পরিচয় সম্বন্ধে। গোবিন্দ শূদ্র, কায়স্থ ও কর্ম্মকার এই তিন কুলের কোন কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন? পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের শ্রীগোবিন্দ[১] নামক এক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতেন বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে কথিত আছে। কড়চার গোবিন্দ কর্ম্মকার এবং পুরীর মন্দিরের এই ব্যক্তি দুইজন না একই ব্যক্তি? বৃন্দাবন দাস[২] তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন যে গোবিন্দ নামক জনৈক ভক্ত নদীয়াতে মহাপ্রভুর সেবক হিসাবে তাঁহার সহিত থাকিত। পদকর্ত্তা বলরাম দাস[৩] (খৃঃ ১৬শ শতাব্দী) দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী এক গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক জয়ানন্দ[৪] তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গী ছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতকার মহাপ্রভুর গোবিন্দ নামক ভৃত্যকে শ্রীগোবিন্দ ও শূদ্রজাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর বহু সেবক থাকিতে এই "শূদ্র" শ্রীচৈতন্যের সেবক হইবেন ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তৎসঙ্গে ইহাও আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে এই শূদ্র গোবিন্দদাস পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিল এবং সেই কারণেই মহাপ্রভু তাহাকে স্বায় অনুচররূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর এই মত একটু মহাপ্রভুর উদার মনোবৃত্তিবিরোধী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই "শূদ্র" কর্ম্মকার অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইদানীং কেহ কেহ গোবিন্দকে "শূদ্র" অর্থে কায়স্থ[৫] প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাদের মত সমর্থনে "কর্ম্মকার" বর্ণিত কড়চার প্রথম পত্রগুলি (৫০ পৃষ্ঠা) বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন গোবিন্দ কর্ম্মকারের (দাসের) রচিত "কড়চা" নামক পুথি সম্বন্ধে। গোবিন্দদাসের কড়চার দুইখানি পুথিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে

১। চৈতন্য-চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)। ২। চৈতন্য-ভাগবত (বৃন্দাবন দাস)।
৩। গৌর-পদ তরঙ্গিণী (জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত)। ৪। চৈতন্য-মঙ্গল (জয়ানন্দ)।

(৫) অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় গোবিন্দকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহাকে কর্ম্মকার বলিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং) এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও একই মত (পাদটীকা, ৩১৮ পৃষ্ঠা) দিয়াছেন।

এবং দুই পুথিরই আবিষ্কারক শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই পুথি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের দুইখানিরই কাল প্রায় ২৩০ বৎসরের কাছাকাছি এবং অল্প ব্যবধানে লিপিকার কর্ত্তৃক লিখিত। পুথি দুইখানির ভাষায় স্থানে স্থানে পরবর্ত্তীকালের সংশোধনের চিহ্ন সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। তদুপরি কড়চার প্রথম ৩০ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে। জয়ানন্দের পুথির যে দুই একখানি নকলে গোবিন্দকে কর্ম্মকার বলা হইয়াছে কেহ কেহ বলেন তাহার মূলে অসাধু প্রচেষ্টা আছে। প্রকৃত শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া নাকি অসদুদ্দেশ্যে বা অভিসন্ধিমূলক ভাবে তাহাতে পরবর্ত্তীকালে "কর্ম্মকার" শব্দ যোজিত হইয়াছে। বাবং জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলই গোবিন্দকে কর্ম্মকার প্রতিপন্ন করিবার প্রধান উপায়। কেহ কেহ মনে করেন পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের "কর্ম্মকার" জাতীয় শিষ্যগণকে সন্তুষ্ট করিবার হেতুতে পুথিদ্বয়ের আবিষ্কার ঘটিয়াছিল সুতরাং কর্ম্মকার জাতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক উহা রচিত বলিয়া প্রমাণের মধ্যে তাঁহারা উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা বলিয়া কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।

কড়চার বিরুদ্ধবাদীগণ সাধারণতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইহারা বৃন্দাবনের পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ এবং অপর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনগণ কর্ত্তৃক লিখিত অথবা রচিত মহাপ্রভুর জীবনালেখ্যের পার্শ্বে শূদ্রজাতীয় মহাপ্রভুর অনুচরের লেখার স্থান দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই গেল এক আপত্তি। ইহাদের অন্য আপত্তি হইতেছে রচনার স্থানে স্থানে বিবরণ নিয়া

বর্ণিত নানা বিষয় নিয়া মতভেদ এবং রচনাকারী গোবিন্দদাস ও তাঁহার রচিত কড়চা পুথির আবিষ্কার ভিন্ন আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন বা সমস্যা গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর কতিপয় কার্য্যের বর্ণনা। এই গ্রন্থের তিনটি স্থান নিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ঘোর আপত্তি আছে। (১) মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের নানাতীর্থ পরিভ্রমণকালে সুবাটের কালী মন্দিরে, অষ্টভুজার মন্দিরে, রামেশ্বরে শিব-মন্দিরে, দাক্ষিণাত্যের মৎস্য-তীর্থের নিকটবর্ত্তী কাচাড়ে দুর্গা-মন্দিরে এবং এইরূপ নানা শৈব ও শাক্ত দেব-দেবীর মন্দিরে নিজে বৈষ্ণব হইয়া ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ভাবাবেশে আকুল হইয়াছিলেন—এইরূপ কথা তাঁহাদের মতে অবিশ্বাস্য।

(২) মহাপ্রভু বৈষ্ণব হইয়া শৈবের ন্যায় জটাধারণ করিতেন এবং তাহাও অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালমধ্যে দীর্ঘজটা, ইহাও এই বৈষ্ণবদিগের চক্ষে অসহ্য।

(৩) মহাপ্রভু স্ত্রীজাতির সংস্পর্শবিহীন গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়া

আলুথালুবেশে দাক্ষিণাত্যের দুইজন গণিকাকে কোল দিয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, এই ঘটনাও তাঁহাদিগের মতে অসম্ভব।[১]

এই সমস্ত মতবিরোধের মধ্যে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ অতি কঠিন। তবে অন্ততঃ শূদ্র গোবিন্দকে কর্ম্মকার শ্রেণীর বলিয়া ধরিয়া লইতে আমাদের তেমন কোন আপত্তি নাই। গোবিন্দদাসের কড়চায় মহাপ্রভু সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য রহিয়াছে তাহার কিছুটা নিয়া যে সমস্ত আপত্তি উঠিয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত সুতরাং ততটা বিচারসহ নহে। শুধু দুইটি কথা চিন্তার বিষয়—প্রথম, বৈষ্ণব মহাপ্রভুর আদৌ জটাভার (বৃহৎ জটা) এমনকি জটা পর্য্যন্ত তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দুই বৎসরে কল্পনা করা যায় কি? দ্বিতীয় গোবিন্দ কর্ম্মকার কড়চাতে যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাহাকে "মূর্খ" বা "নির্গুণ" বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের যে অংশ এই কড়চায় নাই তাহা মহাপ্রভুর মাত্র দুই বৎসরের ভ্রমণবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত নোটে থাকা সম্ভবও নহে। ইহাতেই কবিকে অল্পশিক্ষিত মনে করা যায় না। তবে গোবিন্দ সম্বন্ধে এইটুকু সন্দেহ হয় যে বৈষ্ণব সমাজে তাহার বংশ ও পদমর্য্যাদার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাইলে তাহাকে এমন সুন্দর একটি কড়চার লেখক বলিয়া গ্রহণ করি কিরূপে? এমনও তো হইতে পারে যে শূদ্র ও অর্দ্ধশিক্ষিত গোবিন্দ যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ গদ্যে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে কোন

---

(১) কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে।
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন।
সত্যারে করিলা প্রভু মাতৃ-সম্বোধন।
থরথরি কাঁপে সত্যা প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে।
কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়ে সত্যবালা পড়ে চরণেতে।
কেন অপরাধী কর আমারে জননী।
এই মাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী।
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর।
সব এলোমেলো হ'ল প্রভুর আমার।
কোথা সত্যা কোথা লক্ষ্মী নাহি দেখি আর।
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি।
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস।
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হতে মালিকার গোছা।
না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার।
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হইতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়।
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল।
চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্য-জ্ঞান।
হরি বলি বাহু তুলে নাচে আগুয়ান।
সত্যের বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ-মুরারী।
কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ-মুরারী।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি।
হরিনামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ঘাড় ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ।" ইত্যাদি

—কড়চা, গোবিন্দ দাস।

অজ্ঞাতনামা ও মার্জ্জিত রুচির শিক্ষিত কবি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহা হইতে ছন্দে এই কড়চা রচনা করিয়া গিয়াছেন? ইহা ঠিক হইলে গদ্যে লেখা গোবিন্দের নোটটি কোথায় লুকাইয়া গেল এবং সেই অজ্ঞাতনামা কবিটিই বা কে এবং কর্ম্মকার-কুলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধই বা কি? যাহা হউক আমরা আপাততঃ গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচনা বলিয়াই পুঁথিখানিকে গ্রহণ করিলাম। শুধু তর্ক উত্থাপন করিয়া লাভ নাই।

গোবিন্দদাস[১] বা গোবিন্দ কর্ম্মকারের পিতার নাম শ্যামদাস ও মাতার নাম মাধবী। গোবিন্দের স্ত্রীর নাম ছিল শশিমুখী। গোবিন্দদাস জাতিতে কর্ম্মকার (এক মতে) এবং নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চন নগর গ্রাম। গোবিন্দের স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিলেও খুব মুখরা ছিল। ইহাতে একদিন উভয়ের বিবাদের ফলে গোবিন্দ গৃহত্যাগ করে (১৫০৮ খৃষ্টাব্দ)। গোবিন্দ প্রথমে কাটোয়া গমন করে এবং সেখা হইতে মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষে নবদ্বীপ যায়। গঙ্গার ঘাটে সে মহাপ্রভুকে প্রথম দেখিতে পায়। ইহার পর সে মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভৃত্যের কর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগ করিলে গোবিন্দ তাঁহার অনুগামী হয়। কাটোয়াতে মহাপ্রভুর শিরোমুণ্ডন হয় এবং কেশব ভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত করেন। স্বামিদর্শনাকাঙ্ক্ষায় শশিমুখী কাটোয়ার পথে কাঞ্চন-নগরে স্বামীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে বহু চেষ্টা করে, এমনকি মহাপ্রভুও গোবিন্দকে গৃহে ফিরিতে বলেন, কিন্তু গোবিন্দ তাহার সঙ্কল্পে অটল থাকে এবং কাঞ্চন নগর হইতে পলায়ন করিয়া পরে কাটোয়াতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হয়। কাটোয়া হইতে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর আগমন করেন এবং সেই স্থানে শচীদেবী পুত্রকে দেখিতে আগমন করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকারের মতে পুরী হইতে শান্তিপুর আসিয়া মহাপ্রভু মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

---

(১) "বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম।
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার।
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
একদিন অসন্তুষ্ট করি মোরে কটু কয়।
নির্গুণ মূর্খ বলি গালি দিল মোরে
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে।
চৌদ্দশ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে ঘর দ্বার ফিরে নাহি চাই।" ইত্যাদি।

—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

"গোবিন্দ দাসের কড়চা" দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত), বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য এবং Chaitanya and his Companions (D. C. Sen) পড়িয়া দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি পুরী গমন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসে পুরী আগমন করিয়া তথায় তিন মাস থাকেন। তাহার পরেই তিনি গোবিন্দ ও কালাকৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তিসহ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। কয়েকদিন পথ চলিবার পর তিনি কালাকৃষ্ণদাসকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন এবং শুধু গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে থাকে। দাক্ষিণাত্যে তিনি বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই স্থানগুলির উল্লেখ পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে করিয়াছি। পথে যে সব ঘটনা ঘটে তন্মধ্যে সিদ্ধবটেশ্বর নামক স্থানে তীর্থরাম নামক এক ধনী যুবক ও তৎপ্রেরিত সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বারবণিতাদ্বয়ের উদ্ধার উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া তাঁহার গিরীশ্বরে শিব দর্শন, চই-পল্লীতে সিদ্ধেশ্বরী নামক সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ ও শৃগাল-ভৈরবীদেবী দর্শন, পদ্মকোটায় অষ্টভুজাদেবী দর্শন, ত্রিপদীতে চণ্ডেশ্বর-শিব দর্শন, রামেশ্বরে শিব দর্শন, কন্যা-কুমারী দর্শন, কাছড়ে দুর্গাদেবী দর্শন গুর্জ্জর ও পুণা ভ্রমণ, জাজুরী নগরে খাণ্ডব দেবতার দেবদাসীগণকে ("মুরারী"গণকে) এবং চোরানন্দীবনে নারোজীদস্যুকে উদ্ধার, তৎপরে ক্রমে মূলানদীর তীরস্থ খাণ্ডলাগ্রাম, নাসিক, পঞ্চবটি, দমন ও অষ্টভুজাদেবীসহ সুরাট দর্শন, নর্ম্মদাতীরস্থ ভৃগুকচ্ছ, বরোদা ও দ্বারকা প্রভৃতি দর্শন উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে গোবিন্দ ও রামচরণ নামে কুলীন-গ্রামের (বাঙ্গালা) বসু পরিবারের দুই ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা চারিজনে মিলিয়া ঘোগা নামক স্থানে যান এবং তথায় তাঁহাদের বারমুখী নামক পতিতা নারীর সহিত দেখা হয়। এই ধনবতী ও সুন্দরী নারীকে মহাপ্রভু উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নাভাজীর ভক্তমালে বারমুখী বেশ্যার কাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি এই সম্পর্কে কোন সাধুর কথা বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের নাম করেন নাই। ইহার পর নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পর শ্রীচৈতন্য দুই বৎসর পরে পুরী প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর গোবিন্দের নিজ বিবরণে আর আমাদের তত প্রয়োজন নাই। গোবিন্দ দাসের কড়চা এক হিসাবে অতি মূল্যবান। লেখক শুধু চৈতন্যের সমসাময়িক নহে, একেবারে তাঁহার সঙ্গী। জয়ানন্দ মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গী ছিলেন না। তাঁহার অপর অনেক চরিত-লেখকের সেই সৌভাগ্যও হয় নাই। এমতাবস্থায় গোবিন্দ দাসের কড়চার মূল্য অনেকখানি। এই লেখকের সরল বর্ণনা, আন্তরিক ভক্তি, বিভিন্ন ঘটনার সুন্দর ও বাস্তব আলেখ্য, মহাপ্রভুতে দেবত্বের ও অলৌকিক ভাবের অনাবশ্যক আরোপের অভাব গ্রন্থখানিকে স্বাভাবিক ও মনোহারী করিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশগুলি মহাপ্রভুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে না চাপাইয়া লেখক হয়ত ভালই

করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ের অভাব সম্ভবতঃ গোবিন্দের সুরুচিরই পরিচায়ক, মূর্খতার নহে।

(খ) চৈতন্য-মঙ্গল (জয়ানন্দ)

প্রসিদ্ধ "চৈতন্য-মঙ্গল" রচয়িতা জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। অনুমান ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তিনি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কবি জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমাইপুরা (মতান্তরে অম্বিকা) গ্রাম। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও জয়ানন্দ একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের মাতার পুত্রসন্তান হইয়া বাঁচিত না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার এক নাম "রোদনী" এবং শিশুকালের অপর নাম "গুইঞা" হইয়াছিল। সুবুদ্ধি মিশ্র মহাপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। একবার শ্রীক্ষেত্র হইতে বর্দ্ধমান যাইবার পথে শ্রীচৈতন্য তৎশিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে (আমাইপুরে) আগমন করেন। এই সময় হইতে কবি "গুইঞা" নামের পরিবর্তে মহাপ্রভু দত্ত "জয়ানন্দ" নামে পরিচিত হন। জয়ানন্দের মন্ত্রগুরুর নাম অভিরাম গোস্বামী। কবি জয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিত ও বীরভদ্র প্রভুর আজ্ঞাক্রমে "চৈতন্য-মঙ্গল" নামে মহাপ্রভুর জীবনী রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থখানির আবিষ্কারক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়।[১]

জয়ানন্দের "চৈতন্য-মঙ্গলে" কবিত্ব অপেক্ষা ঐতিহাসিক গুণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি জয়ানন্দ মহাপ্রভু ও তৎসাময়িক বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্য কবিগণের উক্তির সহিত মিলে না। কবি শ্রীচৈতন্যের সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া সেই সময়ের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার অথবা অবগত হইবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন মহাপ্রভু সম্বন্ধে অপর অনেক চরিত-লেখকের সে সুবিধা ছিল না। সুতরাং জয়ানন্দের উক্তিকেই অধিক খাঁটি বলিতে হয়। ইহা ছাড়া প্রায় সকল জীবনী লেখকই মহাপ্রভুর জীবনী রচনা করিতে যাইয়া নানারূপ অলৌকিক কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু গোবিন্দ কর্ম্মকার ও জয়ানন্দ এই পথ আশ্রয় করেন নাই। এই দুই কারণ যেরূপ জয়ানন্দের গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা বৃদ্ধি করিয়াছে অলৌকিকত্বের

---

(১) জয়ানন্দের রচিত "চৈতন্য-মঙ্গল" নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রাপ্ত পুঁথির লেখার তারিখ এবং জয়ানন্দের খাঁটি রচনা ইহাতে কতটা আছে তাহা আমাদের জানা নাই।

অভাব সেইরূপ গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থখানির মূল্য কমাইয়াছে। যাহা হউক জয়ানন্দের মত (আবিষ্কৃত পুথিখানি খাঁটি হইলে) বৈষ্ণব-সমাজে গ্রাহ্য না হইলেও সমালোচকের কাছে ইহার মূল্য আছে।

জয়ানন্দ তাঁহার "চৈতন্য-মঙ্গলে" জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাস ঢাকা-দক্ষিণ (শ্রীহট্ট) না বলিয়া জয়পুর (শ্রীহট্ট) বলিয়াছেন। এই কবির মতে হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম নহে, ভাটকলাগাছি গ্রাম। মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্টে আগমনের পূর্ব্বে যে উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন তাহা এবং এতৎসংক্রান্ত উড়িষ্যারাজ কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারের কথা আমরা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেই প্রথম জানিতে পারি। কবি অপর এক ঘটনার উল্লেখও প্রথম করিয়াছেন, উহা মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপের হিন্দুগণের প্রতি সুলতান হুসেন সাহেব অত্যাচার কাহিনী। জয়ানন্দের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বর্ণনা মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে। একদিন পুরীর পথে কীর্ত্তনরত অবস্থায় শ্রীচৈতন্য পায়ে ইষ্টকাঘাতজনিত ব্যথা প্রাপ্ত হন। ইহা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তিনি শয্যা আশ্রয় করেন। মাত্র অল্প কয়েকদিন এই ব্যথাজনিত রোগভোগের পরই তাঁহার তিরোধান হয়। মহাপ্রভুর তিরোভাব বর্ণনায় অলৌকিকত্বের অভাবে জয়ানন্দের পুথিখানি শ্রীচৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবসমাজে ততটা সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

চৈতন্য-মঙ্গল ভিন্ন জয়ানন্দের অপর রচনা দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য; যথা—"ধ্রুব-চরিত্র" ও "প্রহ্লাদ চরিত্র"।

জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য-মঙ্গলের কিয়দংশ।

(ক) "চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার।
অনন্ত কবীন্দ্র গায় মহিমা যাহার॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচনা করিল প্রেমানন্দে॥

শ্রীপরমানন্দ পুরী গোসাঞি মহাশয়।
সংক্ষেপে করিল তিঁহ গোবিন্দ বিজয়॥
আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দগুপ্ত।
গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য-মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য-মঙ্গল গাএ শেষে॥"

চৈতন্য-মঙ্গল, জয়ানন্দ।

(খ) "বঙ্গে রামনবলা গ্রাম লভাবতী ঠাকুরাণী।
তার গর্ভে জন্মিলা অদ্বৈত শিরোমণি॥
কমলাক্ষ নাম সূতিকা-গৃহবাসে।
সুপ্রকাশ অদ্বৈত পদবী হব শেষে॥
শচী-গর্ভে অষ্টকন্যা জন্মকালে মৈল।
দৈব-নিবন্ধনে দিন কত কাল গেল॥
জগন্নাথ মিশ্র হৈল মিশ্র পুরন্দর।
সংকবি পণ্ডিত মহাতার্কিক সুন্দর॥

* * * *

আর এক পুত্র হৈলে বিশ্বরূপ নাম।
দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥
নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা।
নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা॥
তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতুকে।
বিশ্বরূপ দশকর্ম্ম করি একে একে॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাটঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা।
রত্ন-সিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥"

—চৈতন্য-মঙ্গল, জয়ানন্দ।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে আছে গোবিন্দ "কর্ম্মকার" নামক জনৈক মহাপ্রভুর অনুচর তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে সঙ্গী ছিল। সুতরাং জয়ানন্দের মতে কড়চার লেখক গোবিন্দ দাস "কর্ম্মকার" জাতীয় ছিলেন। গোবিন্দ দাসের কড়চা আলোচনাকালে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

(গ) চৈতন্য-ভাগবত (বৃন্দাবন দাস)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী লেখকগণ পুথির নামকরণ হিসাবে যে দুইটি শব্দের অধিক ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার একটি "মঙ্গল" ও অপরটি "ভাগবত"। "মঙ্গল" কথাটি আমরা "মঙ্গলকাব্য" নামক একশ্রেণীর বিশেষ কাব্যে পাইলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে "মঙ্গল" শব্দ ব্যাপক অর্থে "ভাল" বা "পারিবারিক কুশল" হিসাবে প্রযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ সংস্কৃত ভাগবতের অনুকরণে মহাপ্রভুর জীবনী রচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষীলীলা তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকাহিনী "ভাগবত" নামে অভিহিত হইয়াছে। "মঙ্গল" ও "ভাগবত" শব্দ দুইটির ব্যবহার লইয়া বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাসের মধ্যে মনোমালিন্য পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে বৃন্দাবন দাস প্রথমে তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু পরে লোচন দাসও তাঁহার চৈতন্য-জীবনীর নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিলে বৃন্দাবন দাস অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গ্রন্থের নাম মাতা নারায়ণী দেবীর উপদেশক্রমে "চৈতন্য-ভাগবত" রাখেন। অবশ্য বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ রচনার পূর্বেই জয়ানন্দের "চৈতন্য-মঙ্গল" রচিত হইয়াছিল এবং লোচন দাস তদীয় গ্রন্থে "বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে" এই উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে উভয়ের বিবাদের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে ভাগবতের অতিরিক্ত অনুকরণহেতুতে পুথিটির নাম পরবর্তীকালে "চৈতন্য-ভাগবত"রূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে অনুমান করা যায়।

বৃন্দাবন দাস প্রসিদ্ধ চৈতন্য পার্ষদ শ্রীবাস বা শ্রীনিবাসের ভাতুষ্পুত্রী ও মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্রী বিধবা নারায়ণী দেবীর পুত্র ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের প্রকৃত জন্মসময় নির্ধারণ এক সমস্যা। খুব সম্ভব বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর পুরী যাত্রার দুই বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বিধবা নারায়ণীর এই পুত্রের জন্ম নিয়া অনেক লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, এমনকি অদ্যাপি কেহ কেহ মহাপ্রভুর আশীর্বাদের ফলস্বরূপ এই পুত্রের জন্ম হয় বলিয়া নানারূপ অন্যায় কটাক্ষও করিয়া থাকেন। অবশ্য এইরূপ করা উচিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় তাহা কবির "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন" এই উক্তি (চৈতন্য-ভাগবত, আদি ও মধ্য) হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন। এই হিসাবে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় বলিয়া কেহ কেহ

স্থির করিয়াছেন।[১] কিন্তু ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে (মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ত্যাগের দুই বৎসর পূর্ব্বে) বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন ইহা অপর মত। সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক। কবির জন্ম নিয়া সেই সময়ে তাঁহাকে লোকে অযথা ও অন্যায় আক্রমণ করিত বলিয়া কবি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেন।[২] বৃন্দাবন দাস ক্রোধে কতদূর দিশাহারা হইতেন, তাহা তাঁহার অসংযত ভাষা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যথা,

"এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥"

—বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত।

চৈতন্য-ভাগবত মধ্যখণ্ডের একস্থানে আছে, "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী। যারে আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥" পারিবারিক কথা ভিন্ন কবি বৃন্দাবন দাসের দুই ছত্র, যথা—

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের একদিকের ইঙ্গিত করিতেছে।

কবি বৃন্দাবন দাস সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সম্ভবতঃ ১৪২৯ শকে বা ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে এবং লোকান্তর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে হয়। সুতরাং এই হিসাবে তিনি ৮২ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার মাত্র দুই বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহার মনে আক্ষেপ ছিল। বৃন্দাবন দাসের বয়স যখন ২৬ বৎসর তখন মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। তিনি এই বয়সের মধ্যে একবারও নীলাচল গমন করিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন নাই বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতার নামে

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৩২১)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তৎরচিত History of Bengali Language & Literature নামক গ্রন্থে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ত্যাগের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের পূতচরিত্রে কলঙ্কারোপণ করিতে যে সেই যুগে নানারূপ ব্যর্থ চেষ্টা করিত তাহার কতিপয় উদাহরণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসমাজভুক্ত নবদ্বীপ নিবাসিনী বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী ইহাদের একজন। নীলাচলের জগন্নাথ-মন্দিরের সেবিকা শিখি-মাহিতীর ভগিনী বিদুষী মহিলা মাধবী অপর জন। সহজিয়া মতে মাধবী শ্রীগৌরাঙ্গের "মঞ্জরী" ছিলেন। ছোট হরিদাসের উপর মহাপ্রভুর বিরাগ ও অবশেষে ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীর জলে (প্রয়াগ) আত্মহত্যার কাহিনী অতি করুণ ও মাধবীর নামের সহিত জড়িত।

অপবাদই ইহার কারণ কি না বলা কঠিন। অনুমান শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে[১] তিনি "চৈতন্য ভাগবত" রচনা করেন। "নিত্যানন্দ বংশ-মালা" বা "নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার" কবির অপর গ্রন্থ। ইহা ছাড়া তিনি কতিপয় বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন।

চৈতন্য-ভাগবতে তিনটি খণ্ড আছে, যথা—আদি, মধ্য ও শেষ। আদি-খণ্ডে ১৫ অধ্যায়, মধ্যখণ্ডে ২৬ অধ্যায় ও শেষখণ্ডে ৮ অধ্যায় আছে। আদি খণ্ডে মহাপ্রভুর গয়া-গমন পর্যান্ত এবং মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবি রচিত শেষখণ্ড যেমন ছোট তেমন আবার কতকটা অসম্পূর্ণ। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার কাহিনী বর্ণনায় বাধা বোধ করিয়াই কবি এইরূপ করিয়া থাকিবেন।

চৈতন্য-ভাগবতের ভাষা কিছু অমার্জ্জিত হইলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিত্র স্থানে স্থানে বিশেষ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীগণের প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং ইহার মধ্য দিয়া তদানীন্তন বাঙ্গালা দেশ ও সমাজের যে সুন্দর আলেখ্য কবি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য এইদিক দিয়া যথেষ্ট আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় সূক্ষ্মভাব বর্ণনায় কবি তত পটু নহেন। দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারেও কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় কবি ততটা কৃতিত্ব দেখান নাই। গ্রন্থখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাগবতের অনাবশ্যক অনুকরণ প্রচেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে শ্রীচৈতন্য-লীলাতে পরিণত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যোদ্রেক করে। ইহার ফলে মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুপম মানুষীলীলা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অলৌকিক দেবলীলার অন্তরালে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক ভক্তের চক্ষে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ভক্তিরসের প্রস্রবণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত হইতে অনেক পরিমাণে সাহায্য নিয়া তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাসকে "চৈতন্য-লীলার ব্যাস" বলিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভু সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর মূলে ভক্তের অন্ধবিশ্বাস ও সম্প্রদায়গত মনোভাবের ক্রিয়ার পরিচয় রহিয়াছে।

---

(১) এই গ্রন্থ রচনার তারিখ নিয়া মতভেদ আছে। উক্ত মত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে রচনার তারিখ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ (বঙ্গভাষা, দ্বিতীয় ভাগ)।

চৈতন্য-পার্ষদগণের আবির্ভাব ও শ্রীচৈতন্যের জন্ম সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা।

"কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ-গ্রামে;
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সভার প্রকাশ।
বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে করি পিতা-ব্যাজ॥
কৃপা-সিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম॥
সেইদিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
তিরোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্রে বিলাস॥

* * * *

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একোজাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকে-হো ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায়॥

* * * *

কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়ে।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥

* * *

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্ব-লোকে ধন্য॥

* * *

এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদিয়ায়।
ভক্তিযোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥

* * *

বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ-পূজা করে॥"[১] ইত্যাদি।

—চৈতন্য-ভাগবত, বৃন্দাবন দাস।

কবি বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। খেতুরির প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহোৎসবে বৃন্দাবন দাস উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান দেনুড় গ্রামের "দেনুড় শ্রীপাট" বৃন্দাবন দাসের প্রতিষ্ঠিত।

(১) চৈতন্য-ভাগবত (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত), আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(ঘ) চৈতন্য-মঙ্গল (লোচন দাস)

কবি লোচন দাসের পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস এবং বাড়ী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কোগ্রাম। কবির জন্মকাল ১৪৪৫ শক বা ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ। "চৈতন্য-মঙ্গল" ভিন্ন কবির অপর দুইখানি গ্রন্থের নাম "দুর্লভসার" (সহজিয়া মতের গ্রন্থ) ও "আনন্দলতিকা"। "দুর্লভসার" ও "চৈতন্য-মঙ্গলে"র ভূমিকায় কবির আত্মপরিচয় এইরূপ।—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।
মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্ব তীর্থ পূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথাই দুলিল করে মোরে।
দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥"

দুর্লভসার ও চৈতন্য-মঙ্গলের ভূমিকা, লোচন দাস।

কবি লোচন দাস ৫১ বৎসর বয়সে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশক্রমে "চৈতন্য-মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নামকরণ নিয়া বৃন্দাবন দাসের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের কথা বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত" আলোচনা কালেই উল্লিখিত হইয়াছে। লোচন দাসের রচনায় অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য ও কল্পনার আতিশয্য পাঠককে বিস্মিত করে। ইহাতে পুথিখানির প্রামাণিকতা কমিয়া যাওয়ায় বৈষ্ণব-সমাজে তত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে কল্পনা-বিলাস থাকিলেও তাহার মাত্রা সীমাবদ্ধ সুতরাং সত্য ঘটনাসমূহ

একেবারে কুহেলিকাচ্ছন্ন হয় নাই। কিন্তু লোচন দাসের গ্রন্থে এই গুণের পরিচয় নাই। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের দেবোপম চরিত্র অপরিমিত দৈব-ঘটনাসম্বলিত উপাখ্যানরাশিতে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। লোচন দাসের পুথির ঐতিহাসিক মূল্য খুব অল্প থাকিলেও রচনা-মাধুর্য্যের দিক দিয়া ইহা বৈষ্ণব-সমাজে আদরণীয় হইয়াছে।

লোচনদাসের স্বহস্তলিখিত পুথি কোগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কাঁকড়া গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। "চৈতন্য-মঙ্গল" বৃহৎ গ্রন্থ নহে। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। লোচন দাস ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে লোচন দাসের স্বহস্তলিখিত বলিয়া গৃহীত গ্রন্থে কতিপয় ছত্র পাওয়া গিয়াছে এবং মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কিয়দংশ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। "ভক্তিরত্নাকরের" বর্ণিত কাহিনীর সহিত ইহার মিল নাই। লোচন দাসের গ্রন্থের বটতলা ও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত সংস্করণদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত সংস্করণেও এই ছত্রগুলি পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এইরূপ—

"বৃন্দাবনকথা কহে বাথিত অন্তরে।
সম্ভ্রমে উঠয়ে প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেখনি চলিল।
সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিলা কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেলা অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুণ্ডাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
দেখিয়া সে কি কি বলি আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয় তখন।
গুণ্ডাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখচন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥"

—চৈতন্য-মঙ্গল, লোচন দাস।

লোচন দাসের কবিত্বের একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণে বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দন।

"বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে পৃথিবী বিদরে।
পশুপক্ষী লতাপাতাএ পাষাণ ঝরে॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় শ্রীচরণের ধেয়ানে।
সম্বরণ হয় হিয়া অনেক যতনে॥
প্রভু প্রভু বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে সর্ব্বলোক কাঁদে॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে কান্দিতে লাগিল॥
সব জন বলে হেন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কায।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া-মাঝ॥
কহএ লোচন ইহা কাতর-হৃদয়।
এথা পহুঁ গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়॥"

—চৈতন্য-মঙ্গল, লোচন দাস।

(৬) চৈতন্য-চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

চৈতন্য চরিতামৃতের রচনাকারী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মকাল আনুমানিক ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ। কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা। কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্যামাদাস। ইঁহারা বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন। উত্তরকালে শ্যামাদাস অদ্বৈত প্রভুর এক জীবনী (অদ্বৈত-মঙ্গল) রচনা করিয়াছিলেন।

বাল্যে উভয় ভ্রাতাই নানা কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পিসিমাতার গৃহে প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহারা যথাসম্ভব লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্য হইতেই কৃষ্ণদাস ভাবুক ও গম্ভীর প্রকৃতি এবং শ্যামাদাস কিয়ংপরিমাণে চপলচিত্ত ছিলেন। একদা নিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্য মীনকেতন রামদাস ঝামটপুর আসিলে তাহার সহিত বাক্যালাপে কৃষ্ণদাসের মন বৈরাগ্যের দিকে ধাবিত হয়, এমনকি তিনি একরাত্রে স্বপ্নই দেখিয়া ফেলিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিতেছেন। তৎকালে কৃষ্ণদাস যুবক এবং অবিবাহিত ছিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া অমনি তৎপরদিন কৃষ্ণদাস নিঃসম্বল অবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট মনোযোগ সহকারে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। রাধা-কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত শ্রীবৃন্দাবন ইতিমধ্যেই তাঁহার মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সরল-চিত্ত কৃষ্ণদাস এই স্থানের আবেষ্টনীর ভিতর মুগ্ধ ও একাগ্রচিত্তে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন এবং প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস ও তৎপ্রণীত "চৈতন্যচরিতামৃত" সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী দুইখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার একখানির নাম "আনন্দরত্নাবলী" (মুকুন্দদেব প্রণীত) ও অপরটির নাম "বিবর্ত্ত-বিলাস" (অকিঞ্চন দাস)। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে থাকিয়া অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সংস্কৃতে রচিত "গোবিন্দলীলামৃত" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" টিপ্পনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রন্থখানি কবিত্বে ও দ্বিতীয় গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্যে প্রধান। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির মধ্যে "অদ্বৈতসূত্রকড়চা", "স্বরূপবর্ণন", "রাগময়ীকণা", "রসভক্তিলহরী" প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণদাসের রচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত মহাপ্রভুর জীবনী "চৈতন্য-চরিতামৃত"। ইহার তিনটি খণ্ড, যথা—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদ, মধ্যখণ্ডে ২৫ পরিচ্ছেদ ও অন্ত্যখণ্ডে ২০ পরিচ্ছেদ। গ্রন্থখানির মোট শ্লোক সংখ্যা ১১০৫১, সুতরাং ইহা আকারে বৃহৎ। "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থের পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত" রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই গ্রন্থখানি ভক্ত বৈষ্ণবের চক্ষে অসম্পূর্ণ ছিল, কারণ মহাপ্রভুর শেষ-জীবন ইহাতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন চৈতন্য ভাগবতে অলৌকিক ঘটনা-বাহুল্য যে পরিমাণে আছে প্রেম ও ভক্তির ব্যাখ্যা সে পরিমাণে নাই। বিশেষতঃ প্রেমের অবতার মহাপ্রভুকে চৈতন্য-ভাগবতে সম্যকরূপে চিত্রিত করা হয় নাই। এই সব ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্ত বৈষ্ণব (বাঙ্গালী) সমাজ কবিরাজ গোস্বামীকে বিস্তারিত অন্ত্যলীলাসহ মহাপ্রভুর জীবনী রচনা করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধকারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভূগর্ভ গোস্বামী, কাশীশ্বর গোস্বামী, চৈতন্যদাস, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সময় প্রায় ৭৮ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টি-শক্তির অনেক পরিমাণে হানি হইয়াছিল। কিছু লিখিতে গেলেও তাঁহার হাত কাঁপিত। এমতাবস্থায় এই গুরুভার বহনে তিনি প্রথমে অস্বীকৃত হন। কিন্তু বৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণবগণের আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হয়। নয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ অবশেষে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়সে এবং ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে[১] অমূল্য গ্রন্থ "চৈতন্য-চরিতামৃত" সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থ রচনা করিতে কৃষ্ণদাস পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিনয়ের অবতার কৃষ্ণদাস কৃতজ্ঞতার সহিত বারম্বার তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রাপ্য সম্মানের অধিক সম্মান এই কবিকে দিয়াছেন। অপর যে সব গ্রন্থ হইতে তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মুরারী গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ-দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপুরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গোবিন্দদাসের "কড়চা"র নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে এই কড়চাখানির নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহার প্রামাণিকতা নিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস

---

(১) মতান্তরে ১৫৭৭ শকাব্দ বা ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। প্রাপ্ত চৈ চঃ পুথিসমূহের এক স্থানের শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এই মতভেদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহ ভিন্ন তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব প্রধানগণের নিকট মৌখিক অনেক বৃত্তান্তও অবগত হইয়াছিলেন। লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীদাস, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি ইঁহাদের মধ্যে প্রধান।

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাসের সাম্প্রদায়িকতাশূন্য নির্ম্মল দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখকেরই এই গুণের বিশেষ অভাব। গ্রন্থখানির অপর গুণসমূহের মধ্যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও গভীর দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের নানারূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও ইহাতে রহিয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনী উপলক্ষ করিয়া কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া তিনি মহাপ্রভুর প্রেমপূর্ণ আলেখ্যখানি অতি সুন্দর ভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে ভুলিয়া যান নাই। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কত ব্যাপকভাবে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বরচিত ও উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় (১৩০২ সাল, ৫ম সংখ্যা) এই উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সংখ্যা অন্ততঃ ৬০ খানা। ইহাদের মধ্যে অভিজ্ঞান-শকুন্তলা, অমরকোষ, আদিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র, পঞ্চদশী, পদ্ম-পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মনুসংহিতা, মলমাস তত্ত্ব, ভাগবত-পুরাণ, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের নাম দেখা যায়। কৃষ্ণদাস বাঙ্গালার ব্যাখ্যায় ও প্রমাণ প্রদর্শনে সংস্কৃত গ্রন্থাদির যেভাবে সাহায্যগ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব। চৈতন্য-চরিতামৃতের কতিপয় স্থান বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে দিগ্বিজয়ী এবং রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর বিচার বর্ণনার মধ্য দিয়া কৃষ্ণদাস তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। কাম ও প্রেমের প্রভেদ বর্ণনাও খুব সুন্দর। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবনদর্শনের বর্ণনাটিও অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। স্থানে স্থানে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃতের মূল্যবান সংস্কৃত টিপ্পনী রচনা করেন।

গ্রন্থখানির দোষ প্রধানতঃ ভাষাগত। বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া

অভ্যাসবশতঃ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের ভাষার মধ্যে ব্রজমণ্ডলের ভাষা অনেক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃতের মিশ্রণও উল্লেখযোগ্য। এতৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানির রচনা সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। গ্রন্থের আর একটি ত্রুটি এই যে কৃষ্ণদাসও বৃন্দাবন দাসের ন্যায় মহাপ্রভুর তিরোধান স্পষ্ট বর্ণনা করেন নাই। হয়ত ইহার কারণ বৈষ্ণব রুচিগত বাধা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যুকাহিনী বড়ই হৃদয়-বিদারক। চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা শেষ হইলে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ইহার বিশেষ প্রশংসা ও সমর্থন করেন। তাঁহাদের সমর্থন ভিন্ন তৎকালে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়গত গ্রন্থ তাঁহাদের সমাজে চলিত না। তাঁহারা এই গ্রন্থের রক্ষা বা প্রচারের উদ্দেশ্যে উহা অপরাপর মূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থসহ বাঙ্গালাদেশে প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে বনবিষ্ণুপুরের দুর্দ্দান্ত রাজা বীরহাম্বীর প্রেরিত দস্যুগণ ভ্রমক্রমে চৈতন্যচরিতামৃতসহ এই গ্রন্থগুলি লুণ্ঠন করে। অবশ্য চৈতন্যচরিতামৃতসহ সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থই পরে উদ্ধার হয় এবং বীরহাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা পরের কথা। গ্রন্থ-লুণ্ঠনের দুঃসংবাদ ক্রমে বৃন্দাবনে পৌছিলে তথায় বৈষ্ণব সমাজ একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এই দুঃসংবাদ কবিরাজ গোস্বামী সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনঃকষ্টে হয় তৎক্ষণাৎ (প্রেমবিলাস) নতুবা অল্প কয়েকদিন পরেই (কর্ণানন্দ ও ভক্তি-রত্নাকর) দেহত্যাগ করিলেন।[১]

কাম ও প্রেমের প্রভেদ প্রদর্শন।

"কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করিব যত তাড়ন ভৎর্সন॥

(১) নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩০০ সন দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

(চ) ১। **অদ্বৈত-প্রকাশ** (ঈশান নাগর)
২। **অদ্বৈত-মঙ্গল** (হরিচরণ দাস)
৩। **অদ্বৈত-বিলাস** (নরহরি দাস)
৪। **অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র** (লাউরিয়া কৃষ্ণদাস)
৫। **অদ্বৈত-মঙ্গল** (শ্যামাদাস)

"অদ্বৈত-প্রকাশ" নামক অদ্বৈত প্রভুর জীবন-চরিত লেখক ঈশান নাগরের জন্মকাল ১৪৯১ খৃষ্টাব্দ। ঈশান নাগর জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাল্যে তিনি বিধবা মাতাসহ অদ্বৈত প্রভুর গৃহে প্রতিপালিত হন। ঈশান বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। অবশেষে ৭০ বৎসর বয়সে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। পদ্মাতীরস্থ তেওথাগ্রাম ঈশানের শ্বশুরালয় বলিয়া কথিত হয়। ঈশানের বংশধরগণ এখন গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী ঝাঁকপাল নামক গ্রামের অধিবাসী। তিনি বৃদ্ধকালে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে একবার শ্রীহট্টস্থ লাউরে গিয়াছিলেন। ঈশান নাগর ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অদ্বৈত-প্রকাশ" রচনা করেন। "অদ্বৈত-প্রকাশ" ঈশান নাগরের নিরঙ্কুশ কল্পনার আকর এবং এই দিক দিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনী লেখকদিগের সহিত ঈশান প্রতিযোগীতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কবি অদ্বৈত প্রভুকে শিব ঠাকুরের অবতার প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। এই অংশ বাদ দিলে কবি রচিত তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের এবং বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর পরিবার সংক্রান্ত বিবরণগুলির মূল্য আছে। ঈশান নাগরের বর্ণনাশক্তি প্রশংসাযোগ্য। "অদ্বৈত-প্রকাশের" মতে[1] অদ্বৈত প্রভুর জন্মকাল ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ এবং তিরোভাব ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ। অদ্বৈত প্রভুর সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাতের কথা একমাত্র "অদ্বৈত-প্রকাশে"ই আছে।

১। অদ্বৈত প্রভুর নাম কমলাক্ষ আচার্য্য এবং উপাধি "বেদ পঞ্চানন" ছিল। মহাপ্রভু কিছুকাল তাঁহার কাছে পড়িয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন—এই সমস্ত কথাও অদ্বৈত-প্রকাশে আছে।

অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুত প্রভুর এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম হরিচরণ দাস। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিচরণ দাস অদ্বৈত প্রভুর এক জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির নাম "অদ্বৈত-মঙ্গল"। এই গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভুর ছয়জন জ্যেষ্ঠ সহোদরের কথা বর্ণিত আছে। ইহারা লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীহরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীর্ত্তিচন্দ্র। এই গ্রন্থে আছে মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে[১] অদ্বৈত প্রভু জন্মগ্রহণ করেন এবং এতদনুসারে তাঁহার জন্ম বৎসর ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ।

নরহরি দাসের "অদ্বৈত-বিলাস" (খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ) অদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে আর একখানি জীবনী গ্রন্থ। এই নরহরি দাস শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরি সরকার (দাস) নহেন, কারণ অদ্বৈত বিলাসের একস্থানে আছে,—

"জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী।
যার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌর গুণরাশি॥"

এইস্থানে কৃষ্ণদাস কবিরাজকেও বন্দনা করা হইয়াছে। ইহাতেও নরহরি সরকার ও কবিরাজ গোস্বামীর ইনি পরবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া বুঝা যায়। নরহরি দাসের রচনা সরল ও সাধারণ এবং তৎকালীন জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ প্রাপ্ত পুথিখানি খণ্ডিত এবং ইহার সামান্য অংশই পাওয়া গিয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যজীবনী সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থখানির নাম "বাল্যলীলাসূত্র" এবং ইহার রচয়িতা কৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তি। গ্রন্থ-প্রণেতার বাড়ী শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর নামক নগরে ছিল বলিয়া তাঁহার নাম "লাউরিয়া কৃষ্ণদাস"। ইনি অদ্বৈতাচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার বাল্যজীবন স্বীয় গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

অদ্বৈত প্রভু সংক্রান্ত অপর আর একখানি গ্রন্থের নাম "অদ্বৈত-মঙ্গল"। গ্রন্থখানির প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাদাস। ইনি অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধানের পরে অর্থাৎ খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। ইহার রচনা সাধারণ।

উল্লিখিত জীবনী গ্রন্থগুলি ভিন্ন শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির নাম ও বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ মাস, ১৩০৯ সাল, প্রবন্ধ—রসিকচন্দ্র বসু) দ্রষ্টব্য।

(ছ) গৌরচরিতচিন্তামণি

এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি রচনার সময় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর ভাগ। নরহরি রচিত "গৌরচরিতচিন্তামণি"র কবিত্ব প্রশংসার যোগ্য।

(জ) নিত্যানন্দ-বংশমালা

প্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও তদ্বংশীয়গণ সম্বন্ধে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে "প্রেমবিলাসের" কবি নিত্যানন্দ দাসও একখানি বৃহৎ ও নির্ভর-যোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। "প্রেমবিলাসে" বারম্বার গ্রন্থখানির উল্লেখ থাকিলেও উহা আর পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় নিত্যানন্দ প্রভুর নিবাস বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে ছিল। তাঁহার জন্মকাল ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতার নাম হড়াই ওঝা এবং তাঁহার মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী। শালিগ্রামনিবাসী (অম্বিকার নিকটবর্ত্তী গ্রাম) সূর্য্যদাস সরখেলের বসুধা ও জাহ্নবী[১] নামে দুইটি কন্যা ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীদেবীর গর্ভে নিত্যানন্দ প্রভুর গঙ্গা নামে একটি কন্যা ও বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইতিপূর্ব্বেও নিত্যানন্দের প্রসঙ্গ আলোচনায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(ঝ) বংশী-শিক্ষা

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ বংশীবদনের জীবন-চরিতের নাম "বংশী-শিক্ষা"। এই গ্রন্থখানি বিখ্যাত কবি ও পদকর্ত্তা প্রেমদাস (পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ) রচনা করেন। ইহার বাড়ী কুলিয়া (নবদ্বীপ) এবং পিতার নাম গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাস বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেবের মন্দিরে পৌরহিত্য করিতেন। "বংশী-শিক্ষার" রচনার তারিখ ১৬৩৮ শক বা ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ। এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় বংশীবদনের পিতার নাম ছকড়ি চট্টো এবং ইহাদের আদিনিবাস কালনার নিকটবর্ত্তী পাটুলি গ্রামে ছিল। পরবর্ত্তীকালে

১। জাহ্নবী দেবী ও বীরভদ্র সম্বন্ধে ইদানিং নানারূপ অদ্ভুত মত প্রচার হইতেছে। তন্মধ্যে একটি কথা এই যে জাহ্নবী বা জাহ্নবা দেবী স্ত্রী নহেন "নায়িকা" ভাবাপন্ন পুরুষ।

ইঁহারা নদীয়ার অধিবাসী হন। বংশীবদনের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বৃত্তান্ত এবং তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সার-তত্ত্ব বিষয়ে বংশীবদনের সহিত প্রায়শ: যে সমস্ত গভীর আলোচনা করিতেন তৎসম্বন্ধে "বংশী-শিক্ষা" গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সুতরাং এই দিক দিয়া গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বংশীবদন শ্রীচৈতন্য-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অভিভাবক নিযুক্ত হন। বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছাক্রমে মহাপ্রভুর যে বিগ্রহ স্থাপন করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার নিত্য সেবা করিতেন।

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগ

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তিনটি মহাপুরুষের আগমন হইয়াছিল। ইঁহারা নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ। শ্রীচৈতন্যযুগের ত্রিরত্ন অদ্বৈতপ্রভু, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবাগ্রগণ্য উল্লিখিত তিনজন। শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব চরিত-সাহিত্য প্রধানত: নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই যুগের জীবনী-সাহিত্য আলোচনার পূর্ব্বে ইঁহাদের জীবন-কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) নরোত্তম

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম দাস খেতুড়ির কায়স্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে নরোত্তম রাজপুত্রের ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন গমন করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার অল্পকাল পরেই এই ঘটনা ঘটে। বৃন্দাবনে নরোত্তমের সংসার-বৈরাগ্য ও পূতচরিত্র সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কায়স্থকুলোদ্ভব হইলেও অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমবৈষ্ণব গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। "নরোত্তম-বিলাসে" বর্ণিত আছে নরোত্তম ঠাকুর বাঙ্গালায় আসিলে একবার কতিপয় ব্রাহ্মণ ইহাতে আপত্তি করিয়া পক্কপল্লীর রাজার শরণাপন্ন হন। রাজা মহাশয় নরোত্তমের নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলে নরোত্তম অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং রাজ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে অভিলাষী হন। তদনুসারে পক্কপল্লীরাজ বহু পণ্ডিতসহ নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

অগ্রসর হন। এই সময় এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। নরোত্তমের প্রধান শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ পথে ছদ্মবেশে পণ্ডিতবর্গের সম্মুখীন হন। গঙ্গানারায়ণ কুম্ভকারের বেশে এবং রামচন্দ্র কবিরাজ তাম্বুলির বেশে পথে দোকান খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজপরিজন দ্রব্য ক্রয় উপলক্ষে এই স্থানে আসিলে ছলনা করিয়া তাঁহারা সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলিতে থাকেন। ইহাতে লোকজন বিস্মিত হইয়া বিষয়টি রাজগোচরে আনে এবং অবশেষে পণ্ডিতগণ ঘটনাস্থলে আগমন করেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে উভয়পক্ষে যে তুমুল তর্কবিতর্ক হয় তাহাতে রাজার পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হন। অবশেষে তাঁহারা ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণ ও রামচন্দ্রের পরিচয় জানিতে পারেন এবং পক্বপল্লীরাজ সদলবলে নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নরোত্তম দাস বা ঠাকুরের রচিত অনেক সুন্দর পদ পাওয়া গিয়াছে।

(২) শ্রীনিবাস

শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী এবং বাড়ী গঙ্গাতীরস্থ চাখণ্ডি গ্রামে। যাজীগ্রামের লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শ্রীনিবাসের মাতা ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাসের আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় শ্রীনিবাস বালক ছিলেন। শ্রীনিবাস দেখিতে সুন্দর পুরুষ ছিলেন। অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন এবং তথায় গোস্বামী প্রভুগণের অত্যন্ত সমাদর লাভ করেন। রূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী তাঁহাদের রচিত পুথিসমূহসহ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ বাঙ্গালাতে প্রেরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রচলিত মতানুসারে স্বদেশে পুথিসমূহের প্রচলনই নাকি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ, কারণ বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মধুর রসের ব্যাখ্যা অবাঙ্গালী সমাজ বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই মধুর রসের প্রচারই বৃন্দাবনের বর্ত্তমান সময়ের "ব্রজবাসী" (হিন্দুস্থানী) ও "কুঞ্জবাসী" (বাঙ্গালী বৈষ্ণব) সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের প্রধান কারণ। শ্রীনিবাস আচার্য্য উল্লিখিত পুথিসমূহের ভার গ্রহণ করেন এবং নরোত্তম ও শ্যামানন্দসহ বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত হন। গাড়ী বোঝাই পুথি বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তস্থ বনবিষ্ণুপুরের আরণ্যপথে পৌঁছিলে তথায় তাঁহারা স্থানীয় রাজা বীরহাম্বীরের প্রেরিত দস্যুদলের সাক্ষাৎ পান। এই দস্যুগণ পুথিগুলিপূর্ণ

বস্তাগুলিকে ধনরত্নপূর্ণ বস্তা মনে করিয়া উহা লুণ্ঠন করে এবং রাজ-সমীপে উহা উপস্থিত করে। এই দুঃসংবাদ বৃন্দাবনে প্রেরিত হয় এবং "রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥"—প্রেমবিলাস। যাহা হউক অবশেষে বীরহাম্বীর স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং সদলবলে শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব হইয়া বীরহাম্বীর "চৈতন্যদাস" নামে কিছু পদ রচনা করেন। শ্রীনিবাস বীরহাম্বীরের সভায় সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যকে ভাগবতপাঠে কিরূপ বিস্মিত করিয়াছিলেন এবং সভায় রাজা এবং সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত "ভক্তিরত্নাকরে" বর্ণিত আছে। বৃন্দাবনের গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসের গুরু ছিলেন এবং শ্রীনিবাস বীরহাম্বীরের গুরু হইয়াছিলেন। বীরহাম্বীর স্বীয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য গুরু-পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস প্রভু বনবিষ্ণুপুরেই থাকিয়া যান। তথায় তিনি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিতে থাকেন এবং দুই বিবাহ করেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী মনোহর দাস নামক জনৈক ব্যক্তি কিছুকাল পরে এই সংবাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দেন। সেই বৃত্তান্ত এইরূপ।

> "বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
> রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥
> আচার্য্যের সেবক রাজা বীরহাম্বীর।
> ব্যাসাচার্য্যাদি অমাত্য পরম সুধীর॥
> সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছে।
> গ্রাম ভূমি বৃত্তি আদি রাজা যা দিয়াছে॥
> এইত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা।
> অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলা॥
> মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিলা আর।
> স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ কহে বার বার॥"

— প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দ দাস।

(৩) শ্যামানন্দ

শ্যামানন্দের পৈতৃক নিবাস উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাদুর গ্রাম। ইনি জাতিতে সদেগাপ ছিলেন এবং জন্ম ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ। ইহার অপর নাম

"দুখিনী" এবং ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ইনি কতিপয় পদও রচনা করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "পদাবলী" সাহিত্যের অংশে ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

(ঞ) **ভক্তিরত্নাকর** (নরহরি চক্রবর্ত্তী)

বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্যে চৈতন্যচরিতামৃতের স্থান প্রথম এবং "ভক্তি-রত্নাকরের" স্থান দ্বিতীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত" শ্রীচৈতন্যের জীবনী এবং "ভক্তিরত্নাকর" (১৬১৪—১৬২৫ খৃষ্টাব্দ) শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনীসম্বলিত গ্রন্থ। "ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা" নরহরি চক্রবর্ত্তী নরোত্তম ঠাকুরেরও এক জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির নাম "নরোত্তম-বিলাস"। নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগবতের "টীকা" বিশেষ প্রামাণ্য। নরহরি চক্রবর্ত্তী (খৃঃ ১৬-১৭শ শতাব্দী) পদকর্ত্তা "ঘনশ্যাম" নামে কতিপয় প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার অন্যতম ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। "ভক্তিরত্নাকর" বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উভয়রূপ কাহিনীতেই পূর্ণ। তবে কাহিনীগুলির লক্ষ্য এক। উহা ভক্তিবাদের কথা। উহা অপরের নিকট তত প্রীতিকর না হইলেও ভক্তের কাছে ইহার মূল্য অনেক। ইহার বিষয়বস্তু একঘেয়ে হইলেও উদ্দেশ্য মহৎ। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবেতিহাস জানিতে হইলে এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিয়া উপায় নাই।

"ভক্তিরত্নাকর" পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলির নাম "তরঙ্গ"। এই "তরঙ্গ"গুলিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথম জীবন, তাঁহার পিতা চৈতন্যদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুরীতে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গমন, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিতের ব্রজগমন, রাগরাগিণী, নায়িকাভেদ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বৈষ্ণব গোস্বামীগণের গ্রন্থসমূহসহ বৃন্দাবন হইতে গৌড়যাত্রা, গ্রন্থচুরি ও বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের কাহিনী, রামচন্দ্রের শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ, কাঁচাগড়িয়া ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসব (১৫০৪ শক), জাহ্নবী দেবীর কথা, শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ আগমন, ঈশান কর্তৃক নবদ্বীপ-কথা বর্ণন, শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার পরিণয়, বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্ত্তন এবং শ্যামানন্দ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কাহিনী প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের তিনটি বিষয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার প্রথমটি হইতেছে রাগ-রাগিণী, নায়িকাভেদ ও প্রেমের

লক্ষণ আলোচনা উপলক্ষে নরহরি চক্রবর্ত্তীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয়। দ্বিতীয়টি হইতেছে গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত। এই বর্ণনার বিশেষ মূল্য আছে। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রমাণস্বরূপ অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোকের ও গ্রন্থের ব্যবহার। ইহা নরহরির পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক তো বটেই তাহা ছাড়া তিনি চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে বহু ছত্র উদ্ধার করিয়াও প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষাকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতের সহিত একাসনে বসিবার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। ব্যবহৃত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে আদি-পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, সৌর-পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, লঘুতোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, উজ্জ্বল-নীলমণি, নবপদ্য, গোপাল-চম্পু, লঘুভাগবত, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু, সঙ্গীতমাধব, হরিভক্তিবিলাস, মথুরা-খণ্ড ও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি আছে। নরহরির রচনা সরল ও কিছু অনুপ্রাসযুক্ত। তাঁহার অপর গ্রন্থ সমূহ গৌরচরিতচিন্তামণি, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস-চরিত ও নরোত্তমবিলাস। সুতরাং শ্রীনিবাস সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থ দুইখানি। নরহরি স্বয়ং একজন পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরের স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের পদসমূহ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থসমূহসহ শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুরের
বৃন্দাবন হইতে গৌড় যাত্রা।

"শ্রীনিবাস আচার্য্য লৈয়া গ্রন্থ-রত্নগণ।
চলে গৌড়-পথে করি গৌরাঙ্গ-স্মরণ॥
সঙ্গে নরোত্তম ঐছে দেহ ভিন্ন মাত্র।
শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহ-পাত্র॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস।
নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস॥
নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সবার সঙ্গে চলে বন-পথ দিয়া॥
বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন।
সেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥
স্থানে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া।
দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া॥

বনপথে চলিতে আনন্দ অতিশয়।
কোনদিন কোথায়ও না হয় কোন ভয়॥
যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে তাহা না লিখিল॥" ইত্যাদি।

—ভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্ত্তী।

(ট) **প্রেম-বিলাস** (নিত্যানন্দ দাস)

নিত্যানন্দ দাস "বলরাম দাস" নামেও পরিচিত। ইঁহার নিবাস শ্রীখণ্ড ও পিতার নাম আত্মারাম দাস। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নিত্যানন্দ দাসের মাতার নাম সৌদামিনী। নিত্যানন্দ তাঁহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। কবি নিত্যানন্দের কাল খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। খৃ. ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে "প্রেম-বিলাস" রচিত হয়। ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে। প্রেম-বিলাস ২৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলির নাম "বিলাস"। অনেকে মনে করেন এই গ্রন্থের ২০ অধ্যায় পর্য্যন্তই নিত্যানন্দ দাসের রচনা এবং অবশিষ্ট চারি বিলাস পরবর্ত্তী যোজনা, সুতরাং প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই চারি বিলাসে জাতিগত অনেক সত্য ও মূল্যবান তথ্য সংযোজিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ, রাজা কংশ-নারায়ণ, শ্রীচৈতন্য, কৃত্তিবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য এই শেষ চারি বিলাসে আছে। "প্রেম-বিলাসে" নিত্যানন্দ দাসের রচনা কিছু জটিল এবং সর্ব্বত্র তত সুখ পাঠ্য নহে। প্রাচীন বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের একাংশ জানিতে হইলে "ভক্তি রত্নাকরের" ন্যায় "প্রেম-বিলাস"ও অবশ্য পাঠ্য।

প্রভুদত্ত শেষ চিহ্ন আসন ও ডোর রূপ-সনাতনের
নিকট প্রেরিত।

(ক) "সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল।
গৌরাঙ্গ বিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥
চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন।
শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন॥
সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া।
ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া॥

দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্ন করি বুকে।
ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় সুখে॥
দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি।
পত্র পড়ি শুনাইলা পত্রের মাধুরী॥
পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা।
আসন বুকে করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥" ইত্যাদি।

—প্রেম-বিলাস, নিত্যানন্দ দাস।

(খ) "প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ব্বকাল॥
* * * * *
দৈবে শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা॥" ইত্যাদি।

—প্রেম-বিলাস (২৪ বিলাস) নিত্যানন্দ দাস।

(গ) "রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে।
আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥
বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥"

গ্রন্থচুরি সংবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যু।
প্রেম-বিলাস, নিত্যানন্দ দাস।

(৯) অপরাপর বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ

উল্লিখিত জীবনী গ্রন্থগুলি ভিন্ন আরও অনেক বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। যথা,- (১) যদুনন্দন দাসের "কর্ণানন্দ" (১৬০৭ খৃষ্টাব্দে রচিত) সশিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী। গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর আদেশে তাঁহার শিষ্য যদুনন্দন দাস রচিত। (২) "শ্যামানন্দ-প্রকাশ" ও (৩) "অভিরাম-লীলা গ্রন্থ"। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানিতে শ্যামানন্দের জীবন-কথা বর্ণিত হইয়াছে। (৪) "নরোত্তম-বিলাস" "ভক্তি-রত্নাকর" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত। এই গ্রন্থখানি নরোত্তম ঠাকুরের উৎকৃষ্ট জীবনী এবং ১২ অধ্যায় বা 'বিলাসে" বিভক্ত। গ্রন্থখানি "ভক্তিরত্নাকর" অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হইলেও রচনা-পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনে

"ভক্তি-রত্নাকর" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। "নরোত্তম-বিলাসে" অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অভাব ইহার গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন "ব্রজপরিক্রমা" নামে বৃন্দাবন বর্ণনা সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তীর অপর একখানি অমূল্য গ্রন্থ আছে। (৫) "মনঃ-সন্তোষিনী"—জগজীবন মিশ্র কৃত। মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ উপেন্দ্র মিশ্র জগজীবন মিশ্রেরও পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। এই গ্রন্থখানিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-বঙ্গ ও শ্রীহট্ট ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে। (৬) "চৈতন্য চরিত"—চূড়ামণি দাস কৃত। (৭) "চৈতন্য-চরিত"—হৃদানন্দ। কুচবিহারের অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ সেন এই রচনা ধারাবাহিকভাবে "কুচবিহার-দর্পণে" (সন ১৩৫৪) প্রকাশ করিয়াছেন। (৮) "নিমাই-সন্ন্যাস"—শঙ্কর ভট্ট। (৯) "সীতা-চরিত্র"—লোকনাথ দাস। (১০) "মহাপ্রসাদ-বৈভব"। (১১) "চৈতন্য গণোদ্দেশ"। (১২) "বৈষ্ণবাচার দর্পণ"। (১৩) "জগদীশ পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য পার্ষদ)-চরিত"—আনন্দচন্দ্র দাস (১৮১৫ খৃষ্টাব্দ)।

বৈষ্ণব অনুবাদ গ্রন্থ

উল্লিখিত জীবনী-সাহিত্য ভিন্ন নিম্নে কতিপয় বৈষ্ণব অনুবাদগ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গেল।

(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংস্কৃত "গোবিন্দ লীলামৃতের" বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ—যদুনন্দন দাস কৃত। এই গ্রন্থখানির সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় রচনাই অতি সুন্দর হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থখানি কবিরাজ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের অপর নিদর্শন।

(২) বিল্বমঙ্গল ঠাকুর "কৃষ্ণকর্ণামৃত" সংস্কৃতে রচনা করেন। ইহার "টিপ্পনী" করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সংস্কৃতে রচিত এই টিপ্পনীতে কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদুনন্দন দাস "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" বঙ্গানুবাদ রচনা করেন।

(৩) রূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃত "বিদগ্ধ-মাধব"—যদুনন্দন দাস কৃত বঙ্গানুবাদ।

(৪) কবিকর্ণপুরের "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নাটকের বঙ্গানুবাদ "চৈতন্য-চন্দ্রোদয় কৌমুদী", প্রেমদাস কৃত।

(৫) ভাগবতের অনুবাদ—সনাতন চক্রবর্ত্তী কৃত।

(৬) জয়দেবের "গীত-গোবিন্দের" বঙ্গানুবাদ (ক) রসময় কৃত (১৭শ শতাব্দী) ও (খ) গিরিধর কৃত (রচনাকাল ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ)।

(৭) "রাধাকৃষ্ণ-রসকল্পলতা"—গোপাল দাস (রচনা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ)।

(৮) "গীতা"—গোবিন্দ মিশ্র (কুচবিহারের মহারাজা প্রাণ-নারায়ণের সমসাময়িক দামোদর দেবের শিষ্য)।

(৯) "বৃহন্নারদীয় পুরাণ" দেবহি (রচনাকাল ১৬৬৯ খৃঃ)। ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে রচিত। এই ত্রিপুরারাজের নাম গোবিন্দ মাণিক্য।

(১০) "জগন্নাথবল্লভ নাটক"—(অকিঞ্চন কৃত) গ্রন্থখানি রায় রামানন্দের এই নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।

(১১) "হরিবংশ"—দ্বিজ ভবানন্দ (১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)।

(১২) "নারদ-পুরাণ"—কৃষ্ণদাস।

(১৩) "গরুড়-পুরাণ"—গোবিন্দদাস (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত)।

(১৪) "রামরসগীতা" (গীতার অনুবাদ), (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ সাল, পৃঃ ৩১৩-৩১৭)—ভবানীদাস কৃত।

এই সব গ্রন্থ ভিন্ন বৈষ্ণব সাধন-ভজন ও তত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক বিশেষ পুথি রহিয়াছে। তন্মধ্যে নরোত্তম দাস রচিত "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", "সাধন-ভক্তি-চন্দ্রিকা", "হাট-পত্তন" ও "প্রার্থনা" প্রধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচিত অকিঞ্চন দাস "বিবর্ত্ত-বিলাস" নামক বৈষ্ণব সহজিয়া মতের এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই মতের ইহা একখানি নির্ভরযোগ্য পুথি। শ্রীনিবাস শিষ্য কৃষ্ণদাসের "পাষণ্ড-দলন", রামচন্দ্র কবিরাজের "স্মরণ-দর্পণ", বৃন্দাবন দাসের "গোপিকা-মোহন" কাব্য বৈষ্ণব সাহিত্যের কতিপয় আদরণীয় গ্রন্থ।

আগর দাসের শিষ্য নাভাজী হিন্দী ভাষায় তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীনিবাস-শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী এই গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করেন। নাভাজীর "ভক্তমাল" গ্রন্থের টীকা তৎশিষ্য প্রিয়দাস রচনা করেন। এই "ভক্তমাল" গ্রন্থ বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবনী সংগ্রহ। বাঙ্গালা "ভক্তমাল" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস বাবাজী আরও অনেক বৈষ্ণব মহাজনের জীবনী যোগ দিয়া গ্রন্থখানিকে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে বিষ্ণুপুরী ঠাকুর "ভাগবত" অবলম্বনে "রত্নাবলী" নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। "লাউরিয়া" (অদ্বৈতপ্রভুর সমকালিক ও তৎজীবনী লেখক) কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ রচনা করেন।

ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদসমূহের কথা ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ প্রধানতঃ সংস্কৃতে লিখিত এবং এইগুলি মূল গ্রন্থ। খৃঃ ১৬-১৮শ শতাব্দী মধ্যে ও মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে বাঙ্গালায় এই জাতীয় যে সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। এই গ্রন্থগুলি আকারে ক্ষুদ্র।

গ্রন্থ — রচনাকারী

১। ভক্তিরসাত্মিকা— অকিঞ্চন দাস
২। গোপীভক্তিরসগীতা—অচ্যুত দাস (ইহার গ্রন্থখানি কিছু বৃহৎ।)
৩। রসসুধার্ণব—আনন্দ দাস
৪। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা
৫। পাষণ্ড-দলন— শ্রীনিবাস-শিষ্য কৃষ্ণদাস
৬। চমৎকার-চন্দ্রিকা—
৭। গুরু-তত্ত্ব—
৮। প্রেমভক্তিসার—গৌরদাস বসু
৯। গোলক-বর্ণন— গোপাল ভট্ট
১০। হরিনাম-কবচ—গোপীকৃষ্ণ
১১। সিদ্ধি-সার—গোপীনাথ দাস
১২। নিগম গ্রন্থ - গোবিন্দ দাস
১৩। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা – নরোত্তম দাস (বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।)
১৪। রাগময়ী কণা—নিত্যানন্দ দাস
১৫। উপাসনা-পটল—প্রেমদাস
১৬। মনঃশিক্ষা—প্রেমানন্দ
১৭। অষ্টোত্তর শতনাম—দ্বিজ হরিদাস
১৮। বৈষ্ণব-বিধান বলরাম দাস
১৯। হাট-বন্দনা —বলরাম দাস
২০। প্রেমবিলাস—যুগোলকিশোর দাস
২১। রসকল্প তত্ত্বসার —রাধামোহন দাস
২২। চৈতন্য-তত্ত্বসার – রামগোপাল দাস
২৩। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা—রামচন্দ্র দাস
২৪। স্মরণ-দর্পণ রামচন্দ্র দাস (কবিরাজ)
২৫। ক্রিয়াযোগসার—অনন্তরাম দত্ত (জন্ম—মেঘনা তীরবর্তী সাহাপুর গ্রাম এবং পিতার নাম রঘুনাথ দত্ত। বৃহৎ গ্রন্থ।)

	গ্রন্থ	রচনাকারী
২৬।	ক্রিয়াযোগসার	রামেশ্বর দাস
২৭।	চৈতন্য-প্রেমবিলাস	লোচন দাস (জন্ম ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ।)
২৮।	দুর্লভ-সার	
২৯।	দেহ-নিরূপণ	
৩০।	আনন্দ-লতিকা	
৩১।	ভক্তি-চিন্তামণি	বৃন্দাবন দাস
৩২।	ভক্তি-মাহাত্ম্য	
৩৩।	ভক্তি লক্ষণ	
৩৪।	ভক্তি-সাধনা	
৩৫।	বৃন্দাবনলীলামৃত	নন্দকিশোর দাস
৩৬।	রসপুষ্পকলিকা	
৩৭।	প্রেম দাবানল	নরসিংহ দাস
৩৮।	গোকুল-মঙ্গল	ভক্তিরাম দাস
৩৯।	রাধা বিলাস	ভবানী দাস
৪০।	একাদশী-মাহাত্ম্য	মহীধর দাস
৪১।	কৃষ্ণলীলামৃত	বলরাম দাস
৪২।	সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস
৪৩।	হাট-পত্তন	
৪৪।	প্রার্থনা	
৪৫।	বিবর্ত্ত-বিলাস	(কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য পরিচয়ে অকিঞ্চন দাস নামে জনৈক ব্যক্তি।)
৪৬।	গোপিকা-মোহন (কাব্য)	বৃন্দাবন দাস।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে জীবসমাজে লক্ষ্য করা যায় ইহাদের জন্ম, পরিবর্দ্ধন ও ধ্বংস আছে। ধর্ম্ম এবং সাহিত্যও এই লক্ষণাক্রান্ত। মাধবেন্দ্র পুরী (মাধ্বী সম্প্রদায়ের ১৪শ গুরু) সম্ভবতঃ নিজে বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যগণের মধ্যে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি (চট্টগ্রাম), অদ্বৈতাচার্য্য (শান্তিপুর), নিত্যানন্দ (একচক্রাগ্রাম), মাধব মিশ্র (বেলেটি গ্রাম—ঢাকা), (বৈদ্য ?) ঈশ্বরপুরী (কুমারহট্ট) এবং কেশব ভারতী (কালীনাথ আচার্য্য—কাটোয়া) প্রধান। দাক্ষিণাত্যে উদ্ভূত এবং সশিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী প্রচারিত এই বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য-

পূর্ব্ববর্ত্তী। মহাপ্রভু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব-চণ্ডীদাস প্রচারিত ধর্ম্ম ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া একদিকে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন, অপরদিকে ইহার প্রচারিত বৈরাগ্য ধর্ম্মের সহিত রসভাব ও রহস্যবাদের ভিতর দিয়া নারীর সহযোগিতা ঘটিল। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত নূতন ভক্তিশাস্ত্রে নারী মাতৃভাবে প্রবেশ না করিয়া পত্নীভাবে প্রবেশ করিল এবং ইহার কুফল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ণবসমাজেও দেখা দিল। আধ্যাত্মিক পটভূমিকা ছাড়িয়া নারীসঙ্গ সুখের পরিকল্পনা জড় জগতের সাধারণ মনকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে নানা বীভৎসতা সৃষ্টি করিল। স্বয়ং মহাপ্রভু ইহা স্বীয় জীবনেই দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করিয়াও ইহা রোধ করিতে পারেন নাই। রাগানুগা ভক্তি প্রচারে নারীভাবের অত্যধিক পরিকল্পনা জাতীয় চরিত্রেও বোধ হয় বাঙ্গালীকে তেজোবীর্য্যহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। রঘুনাথ দাসকে বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে বৈরাগ্য বুঝাইতে গিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদন আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোর করুন উপদেশ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করে স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিক্ষ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি॥"

—চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬ অঃ।

মহাপ্রভু জাতিভেদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। যথা—

"মুচি যদি ভক্তিভরে ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটি নমস্কার মোর তাঁহার চরণে॥"—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

তাঁহার মতানুসারে,

> "প্রভু কহে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
> হরিভক্তি হরি সেই পায় সর্ব্বথায় ॥"—গোবিন্দ দাসের কড়চা।

এই উচ্চ আদর্শবিশিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্মে ক্রমে শাক্ত-বৈষ্ণব কলহ[১], বংশ-মর্য্যাদা, নৈতিক দুর্নীতি প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া ইহার অবনতি ঘটাইয়াছিল। মহাপ্রভু ইহা স্বয়ংও প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালেই কতিপয় খল-চরিত্র ব্যক্তি কপট ধার্ম্মিক সাজিয়া মহাপ্রভুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহাদের একজনের নাম বাসুদেব। এই ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বাড়ী রাঢ় দেশে ছিল। ইহারও অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ এই ব্যক্তির "শিয়াল" (শৃগাল) নাম দিয়াছিল। "তেষান্তু কশ্চিদ্দ্বিজ বাসুদেবঃ। গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহং ॥ এবংহি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী। শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে ॥"—গৌরাঙ্গচন্দ্রিকা। দ্বিতীয় কপট ব্যক্তির নাম বিষ্ণু দাস। এই ব্যক্তির উপাধি ছিল "কবীন্দ্র"। বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন "কপীন্দ্র"। তৃতীয় ব্যক্তির নাম ছিল মাধব। এই ব্যক্তি কোন মন্দিরের পুরোহিত ছিল। এই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া বেড়াইত এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে মাথায় চূড়া বাঁধিত। এইজন্য বৈষ্ণবগণ তাহার নাম দিয়াছিলেন "চূড়াধারী"। গোপগৃহে শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া এই ব্যক্তি অনেক গোয়ালিনীকে শিষ্যা করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত অনেক গর্হিত কার্য্য করিত। একবার এই ব্যক্তি পুরীতে গেলে মহাপ্রভু শিষ্যগণ সাহায্যে তাহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই লোকটির সঙ্গী গোপগোপীগণ তাহার একান্ত অধীন ছিল।

> "গোপগোপী লঞা সদা নর্ত্তন কীর্ত্তন।
> চূড়াধারী কাচি গোয়ালিনী লৈঞা লীলা।
> চূড়াধারী নামে ইথে বিখ্যাত হইলা ॥" —প্রেমবিলাস।

বৈষ্ণব সমাজের এই দুরবস্থার সূচনা ও তদুপরি মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই শতাব্দী পরে ইংরেজাগমনে এই দেশে রাজ-বিপ্লব এবং তৎকালে দেশের বিভিন্ন সমাজে দুর্নীতির প্রচার—এই সব মিলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যেরও অবনতি ঘটাইল। ইহার ফলে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের পরিবর্ত্তে নবভাবে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্য নূতনরূপে দেখা দিল।

---

(১) পাষণ্ডিকা—শাক্ত-বৈষ্ণব ও নানা সম্প্রদায়ের দল সম্বন্ধে চিরঞ্জীব শর্ম্মার "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" এবং এই সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন, ৬ষ্ঠ সং) পৃঃ ৩৫১-৩৬২, দ্রষ্টব্য।

চত্বারিংশ অধ্যায়

(ক) বিবিধ সাহিত্য

(১) আলোয়ালের পদ্মাবৎ

কবি আলোয়াল একটি সাহিত্যিক নবযুগের পথপ্রদর্শক কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে চণ্ডীদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নারায়ণ দেব, মালাধর বসু, মাধবাচার্য্য (চণ্ডীকাব্য প্রণেতা), মুকুন্দরাম, আলোয়াল, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র—ইঁহারা সকলেই যুগপ্রবর্ত্তক কবি। ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত পথে চলিয়াই অন্য বিশিষ্ট কবিগণ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন এবং মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যকে নানাদিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

আলোয়াল জাতিতে মুসলমান ছিলেন। ইনি খৃ: ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি, সুতরাং কবি ভারতচন্দ্রের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আলোয়াল পূর্ব্ব-বঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ পরগণার অধীন জালালপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা এই স্থানের অধিপতি সমসের কুতুব নামক জনৈক ব্যক্তির একজন সচিব ছিলেন। আলোয়াল তরুণ বয়সে পিতার সহিত সমুদ্রপথে গমনকালে পর্ত্তুগিজ জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং ইহার ফলে তাঁহার পিতা নিহত হন। আলোয়াল বিপন্ন হইয়া আরাকান গমন করেন ও তথাকার রাজার প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয়প্রার্থী হন। "মাগন ঠাকুর" নামটি হিন্দু হইলেও ইনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কোন সময়ে মুসলমানের হিন্দুনাম গ্রহণ ও হিন্দু দেব-দেবী বিষয়ক গ্রন্থ লেখার উদাহরণের অভাব ছিল না। হিন্দুগণও মুসলমানগণ সম্বন্ধে অনুরূপ উদারতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। এই গ্রন্থের বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব উভয় অংশেই এতৎসংক্রান্ত কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। কবি আলোয়াল সম্বন্ধেও ইতিপূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের যুগ আলোচনা উপলক্ষে উল্লেখ করা গিয়াছে।

মাগন ঠাকুর খুব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে আলোয়াল "পদ্মাবৎ" গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ব্বে কবি মীরমহম্মদ জয়াসী বাং ৯২৭ সনে (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) হিন্দীভাষায় তাহার সুপ্রসিদ্ধ "পদ্মাবৎ" গ্রন্থ প্রণয়ন

করিয়াছিলেন।[১] আলোয়ালের "পদ্মাবৎ" ইহারই বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু চিতোর-রাজপরিবারের রাজ্ঞী পদ্মিনী ও দিল্লীর পাঠান সুলতান আলাউদ্দিনের ঐতিহাসিক কাহিনী। চিতোরাধিপতি ভীমসেন এই গ্রন্থে রত্নসেনে পরিণত হইয়াছেন এবং আরও কিছু প্রাসঙ্গিক গরমিল আছে। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান"ও বাঙ্গালা ভাষায় একই কাহিনীর অপর গ্রন্থ। গ্রীয়ারসন সাহেব আলোয়ালের গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

পদ্মাবতী বা পদ্মাবৎ কাব্য আলোয়ালের হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কবি আলোয়াল পিঙ্গলাচার্য্যের অষ্টমহাগণ ও রসশাস্ত্রের নায়িকা-ভেদ সম্বন্ধে এবং জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে হিন্দুসমাজের নানাবিধ সূক্ষ্ম আচার-নিয়মের উল্লেখ এবং অধ্যায়গুলির শিরোদেশে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক। কবি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে পদ্মাবতীর রচনা শেষ করিবার সময় তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থখানি তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা। এই বৃদ্ধ বয়সেই কবিকে "চয়ফুল মুল্লুক" এবং "বদিউজ্জমাল" নামক দুইখানি ফার্শী কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিতে মাগন ঠাকুর আদেশ করেন। এই সময় আরাকান বা "রোশঙ্গ" রাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। কবি উক্ত গ্রন্থ দুইখানি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেই মাগন ঠাকুর ইহলোক ত্যাগ করেন। ঠিক এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে দিল্লীর মসনদের অধিকার নিয়া কলহ উপস্থিত হয়। ইহাদের চারি ভ্রাতার অন্যতম সাহাজাদা সুজা (দ্বিতীয় ভ্রাতা) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগ্যহত সুজার সহিত আরাকানরাজের শীঘ্রই বিরোধের কারণ ঘটে এবং সাহাজাদা সুজা সদলবলে আরাকানরাজের সৈন্য-দলের হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে আরাকানরাজ মুসলমানগণের উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি সুজার সহিত ষড়যন্ত্রের সন্দেহে কবি আলোয়ালকে কারাগারে প্রেরণ করেন। এই গোলযোগের সময় উক্ত ফার্শী

১। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে হিন্দী "পদ্মাবৎ" রচনাকাল ৯২৭ বাং সন। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের মতে ৯৪৭ সন (১৫৪০ খৃষ্টাব্দ) এবং ইহার কারণ গ্রন্থ মধ্যে সের সাহের উল্লেখ। সের সাহের সম্রাট হওয়ার তারিখ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ। গ্রীয়ারসন সাহেব ৯২৭ সন মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়া মনে করেন কিন্তু ডাঃ সেন একখানি হস্তলিখিত পুথিতেও ৯২৭ সন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া স্বরচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৫১৩, পাদটীকা) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ৯২৭ বাং সন ও সের সাহের উল্লেখ এই দুই কথার সামঞ্জস্য করা কঠিন। হয় প্রথমটি ভুল, না হয় দ্বিতীয়টি (সের সাহের উল্লেখ) প্রক্ষিপ্ত।

গ্রন্থ দুইখানির অনুবাদ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কবি নয় বৎসর এইরূপে কারারুদ্ধ ছিলেন এবং তাহার পর মুক্তি পান। এই সময়ে সৈয়দ মুসা নামক এক ব্যক্তির অনুগ্রহ ও আশ্রয়লাভ করেন। এই আশ্রয়দাতার নিতান্ত অনুরোধে কবি অবশেষে "ছয়ফুল মুল্লুক" ও "বদিউজ্জমাল" গ্রন্থ দুইখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থ দুইখানি "পদ্মাবৎ" গ্রন্থ হইতে নিকৃষ্ট এবং ফার্শী অক্ষরে লিখিত। ইহার পর আরাকানরাজের অমাত্য সুলেমানের আদেশে দৌলত কাজির রচিত "লোরচন্দ্রানী" ও "সতী ময়না" নামক অসম্পূর্ণ গ্রন্থ দুইখানি সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি সৈয়দ মহম্মদ খান নামক এক ধনী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির আদেশে নেজাম গঞ্জনবী রচিত "হস্তপয়কর" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি ভিন্ন কবি আলোয়াল কতকগুলি "রাধা-কৃষ্ণ" বিষয়ক পদও রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের "পদাবলী" অংশে উল্লিখিত হইয়াছে। কবি ভারতচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং রুচিবিকৃতি ও শব্দাড়ম্বরবাহুল্য লক্ষিত হয় তাহার প্রথম উৎকৃষ্ট নিদর্শন আলোয়াল রচিত গ্রন্থসমূহ।

হিন্দীভাষার মূল "পদ্মাবৎ" গ্রন্থের প্রণেতা মালিক মহম্মদ একজন ফকির ছিলেন। এই সাধু ব্যক্তির শিষ্যগণের মধ্যে আমেথির রাজা একজন। মালিক মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধি আমেথির রাজদুর্গেই দেওয়া হয়। এই সাধু ব্যক্তির রচনাতে অনেক আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচয় আছে। আলোয়ালের অনুবাদ আক্ষরিক না হইলেও স্থানে স্থানে তিনি আক্ষরিক অনুবাদই করিয়াছেন এবং মূলের আধ্যাত্মিকতার সুরটিও বজায় রাখিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহার হিন্দুসমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোয়াল তৎরচিত পদ্মাবতীতে কল্পনাবাহুল্য ও মুসলমানীভাবের পরিচয়ও পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানারূপ গুণাবলীতে "পদ্মাবতী" গ্রন্থখানি ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গল" গ্রন্থের সহিত তুলনীয়। পরিণত বয়সে আলোয়াল পরলোক গমন করেন।

"মাগন" নামের ব্যাখ্যা।

(ক) "নামের বাখান এবে শুন মহাজন।
অক্ষরে অক্ষরে কহি ভাবি গুণগণ॥
মাঙ্গের মাকার আর ভাগ্যের গকার।
শুভযুগ্মে নক্ষত্রের আনিল নকার॥

এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে।
রাখিলেন্ত মহাজনে অতি মন-শুভে ॥
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্য-শাস্ত্র ছন্দোমূল পুস্তক-পিঙ্গল ॥
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মহাগণ-মূল।
তাহাতে মগণ আছে বুঝ কবিকুল ॥
নিধিস্থির কল্প-প্রাপ্তি মগণ-ভিতর।
মগণ মাগণ এক আকার-অন্তর ॥
আকার-সংযোগে নাম হইল মাগণ।
অনেক মঙ্গল ফল পাইতে কারণ ॥"

—পদ্মাবৎ, আলোয়াল।

সরোবরে রাণী পদ্মিনী।

(খ) "সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত ॥
সুগন্ধী শ্যামল-ভার ধরণী চুঁইল।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল ॥
কিম্বা মেঘারম্ভ-যোগে হইল অন্ধকার।
বিধুন্তুদ আসিল বা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥
দিবস স হতে সূর্য্য হইল গোপন।
চন্দ্রতারা লইয়া নিশি হইল প্রকাশন ॥
ভাবিয়া চকোর-আঁখি পড়ি গেল ধন্ধ।
জীমূত-সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥
হাস্য সৌদামিনী-তুল্য কোকিল-বচন।
ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত-গগন ॥
নয়ন-খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব্ব আদরে ॥" ইত্যাদি।

—পদ্মাবৎ, আলোয়াল।

২। বৌদ্ধ-রঞ্জিকা

ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় "থাড়ুথাঙ্" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী

বর্ণিত আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ধর্ম্মবক্স নামে জনৈক রাজার প্রধানা রাণী কালিন্দী এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে নীলকমল দাস নামক সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের জনৈক কবি "থাড়ুথাড়ু" গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিতে এই রাণী কর্তৃক আদিষ্ট হন। ইহারই ফল "বৌদ্ধ-রঞ্জিকা" গ্রন্থ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে গৌতম-বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত ইহাই একমাত্র গ্রন্থ। নীলকমল দাস বা রাজা ধর্ম্মবক্সের কাল জানিতে পারা যায় নাই। প্রাপ্ত পুথি একশত বৎসরের কিছু বেশী প্রাচীন। সুতরাং ইহার প্রণেতা খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন।

৩। নীলার বারমাস

এই গ্রন্থের কাহিনী নীলা বা লীলা (লীলাবতী) নামক কোন পতিব্রতা নারীর ব্রত উপলক্ষে রচিত। নীলার স্বামী নীলার মাত্র ১২ বৎসর বয়সের সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করে। ইহাতে নীলা অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া কঠোর ব্রত গ্রহণ করে এবং বনে বনে অতি বিপদসঙ্কুল স্থানে স্বামীকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। অবশেষে তাহার ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শন ঘটে এবং নীলা সকাতরে স্বামীকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করে। অশ্রুসজল নয়নে স্বামী-সেবা ও স্বামীকে গৃহে ফিরিতে কাকুতি-মিনতি এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির বর্ণনীয় বিষয়। অবশ্য নীলা অবশেষে তাহার কঠোর ব্রতে সাফল্য-লাভ করে। বাঙ্গালা দেশে চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে হিন্দুনারীগণ "নীলার উপবাস" করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ আমাদের আলোচ্য নীলা সেই নীলা। নীলার বারমাসী গান এখনও পল্লীগ্রামে গীত হয় এবং ইহা অতি করুণ সন্দেহ নাই। আমাদের "নীলার বারমাসে"র কবির নাম বা তাঁহার সময় জানা নাই। এই কাব্যে একটু সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা নীলার স্বামী সম্বন্ধে। এই ব্যক্তির পিতার নাম গঙ্গাধর ও মাতার নাম কলাবতী। তাহার গ্রামের নাম সুলুক প্রদেশের অন্তর্গত নন্দপাটন গ্রাম। অবশ্য ইহা কবিকল্পনাও হইতে পারে। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৫৬১)।

৪। বিক্রমাদিত্য-কালিদাস প্রসঙ্গ

এই গ্রন্থখানির প্রণেতা ও পুথিরচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। পুথিখানি খণ্ডিত। পুথির জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া ইহা খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষে রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার রচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী।

রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত কালিদাসের রাজ্যান্তরে গমন এবং তথায় এক রাক্ষসীর সহিত কালিদাসের প্রশ্নোত্তর।

রাক্ষসীর প্রশ্ন— "পৃথিবীর মধ্যে কহ গুরুতর কে।
গগন হইতে উচ্চতর বলি কাকে॥
কহ তৃণ হইতে কেবা লঘুতর হয়।
বাতাস হইতে কেবা শীঘ্রত চলয়॥"

কালিদাসের উত্তর—"মাএর বাড়া গুরুতরা পৃথিবীতে নাই।
গগন হইতে উচ্চ কহিব পিতায়॥
তৃণ হইতে লঘুতর হয় ভিক্ষুকজন।
বাতাস হইতে শীঘ্র চলয়ে যে মন॥"

রাক্ষসীর প্রশ্ন— "কহ দেখি কিসে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।
কিসে ধর্ম্ম প্রবর্ত্ত হয় কহ মহাশয়॥
ধর্ম্ম স্থাপিত শরীরে হয় কি বিষয়ে।
কহ দেখি কি বিষয়ে ধর্ম্ম বিনাশ হএ॥"

কালিদাসের উত্তর—"সত্য-ব্যবহারে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।
দয়াবান হইলে তাহে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়॥
ক্ষমাযুক্ত লোকের হয় ধর্ম্ম সংস্থাপন।
লোভ-মোহ-যুক্তে ধর্ম্ম-বিনাশ ততক্ষণ॥"

রাক্ষসীর প্রশ্ন— "কহ দেখি প্রবাসেতে মিত্র কেবা হয়।
গৃহের মধ্যেতে মিত্র কাহারে বলয়॥
অন্তর-মধ্যেতে বল মিত্র কোন জন।
মৃত্যু-কালে মিত্র কেবা কহ প্রকরণ॥"

কালিদাসের উত্তর—"প্রবাসেতে বিদ্যার বাড়া বন্ধু নাহি কেহ।
গৃহে ভার্য্যা বন্ধু ইহা নিশ্চয় জানিহ॥
অন্তরের মধ্যে ঔষধ মিত্র হয়।
জনার্দ্দন মিত্র জান মরণ-সময়॥"

রাক্ষসীর প্রশ্ন— "কহ দেখি কিসেতে রাজার বিনাশ হয়।
সকল হইতে বৈতরণী নদী কারে কয়॥
কহ কামদুঘা ধেনু কহিব কাহারে।
নন্দনের বন কিসে কহত সত্বরে॥"

কালিদাসের উত্তর—"রাজা হইয়া ক্রোধী হইলে শীঘ্র বিনাশ হয়।
সকল হইতে বৈতরণী নদী যে আশয়॥
বিদ্যা কামদুঘা ধেনু এহা যে নিশ্চয়।
সন্তোষ নন্দন-বন নাহিক সংশয়॥"
—বিক্রমাদিত্য-কালিদাস প্রসঙ্গ।

৫। সখীসেনা

ফকিররাম কবিভূষণ খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ব্যক্তি। কবির বৈদ্য বংশে জন্ম হয় এবং বাড়ী বর্দ্ধমান ছিল। সখীসেনা নামটি নানা আকারে পাওয়া যায়; যথা, সখীসোনা ও শশিসেনা। সখীসেনা নামের স্থানে শশিমুখী নামেরও ব্যবহার রহিয়াছে। সখীসেনা নামক রাজকুমারীর গল্পটি প্রাচীন। সখীসোনা নামে এই গল্পটি মহম্মদ কোরবান আলি নামক এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে ইহার প্রাচীন প্রকাশভঙ্গী গীতিকথার আকারে ছিল এবং শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় এই শ্রেণীর গল্পগুলির যথাযথ রূপ রক্ষা করিয়া অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত করিয়াছেন। ফকিররাম কবিভূষণের কবিত্ব প্রশংসনীয়। ইনি রামায়ণের "লঙ্কাকাণ্ড" অংশটিও রচনা করিয়াছিলেন। "সখীসেনা" গল্পের মূল ঘটনা "সখীসেনা" নামক এক রাজকন্যার প্রতি সেই রাজ্যের কোটালপুত্রের প্রেম নিবেদন ও বিবাহ। এক পাঠশালায় উভয়েই কিশোর বয়সে পড়াশুনা করিত। কোটালপুত্র নিম্নে আসন পাইত ও রাজকন্যা উচ্চাসনে বসিতেন। একদিন রাজকন্যার লিখিবার কলম নীচে পড়িয়া যায়। কোটালপুত্র তাহা তুলিয়া দেয় বটে কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় যে সে যাহা চাহিবে তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে। এই কলমঘটিত ব্যাপার তিনবার ঘটে এবং তিনবারই রাজকন্যা একই প্রতিজ্ঞা করেন। পরে যখন কোটালপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিল তখন তাঁহার বিস্ময় ও খেদের অবধি রহিল না। যাহা হউক, অবশেষে উভয়ের মনের মিলন হইল ও বিবাহ হইয়া গেল। ইহাই সখীসেনার গল্প।

রাজকন্যার নিকট কোটালপুত্রের বিবাহ প্রস্তাব।

"তুমি পড় উচ্চাসনে আমি হেটে পড়ি।
পরিহাস করিয়া ফেলিয়া দিলে খোড়ি॥

তিনবার খোড়ি তুল্যা দিলাঙ তোমার হাতে।
হাস্য-মুখে সত্য যে করিলে আমার সাথে॥
আশা পায়্যা ভাষা কথা কহিলাঙ তোরে।
যে হল্য সে হল্য গুণা মাপ কর মোরে॥
তোরে হেন বচন বলিব নাই আমি।
সত্যে বন্দী থাকিলে হইবে অধোগামী॥
ভণএ ফকীররাম ঐ কথা দৃঢ়।
ছাড়িলে ছাড়ান নাই যদি কাট মুড॥"

—সখীসেনা, ফকীররাম কবিভূষণ।

৬। দামোদরের বন্যা

ছাওয়াল গাএন নামক কোন অজ্ঞাত কবি কর্তৃক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে "দামোদরের বন্যা" নামক এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচিত হয়। দামোদরের ভীষণ বন্যার কথা এই দেশে সর্ব্বজনবিদিত। কবির রচনা ভাল। বর্ণিত বন্যার সময় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ।

দামোদরের বন্যা বর্ণনা।

"অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুন সভে করিএ বিবরণ॥
সন হাজার বায়াত্তর সালে প্রথম আশ্বিনে।
দামোদরে আইল বান শুন সর্ব্বজনে॥
আড়া চারি জল হইল পর্ব্বত-উপর।
মনুষ্য ডুবাতে মন কৈল দামোদর॥
পর্ব্বত হইতে জল পড়ে মহাতেজে।
লুড় লুড় ছড় ছড় জলের শব্দ বাজে॥
যোজন ঘুড়িয়া জল হইল পরিসর।
উপাড়িয়া ফেলিল কত গাছ পাথর॥
তৃণ আদি কাষ্ঠ খড় হইল একার্ণব।
পর্ব্বত-প্রমাণ হয়্যা পড়ে ঢেউ সব॥
ভাসিল মরাল কত পর্ব্বতীয়া ঘোড়া।
আনন্দে চাপিল বেঙ ঘোড়ার পৃষ্ঠে যুড়া॥

চাপিয়া ভুজঙ্গ-পৃষ্ঠে মনে মনে হাসে।
সমুদ্র ভেটিব আজি মনের হরিষে॥
অজগর বলে ভাই কর অবধান।
কোনকালে নাহি হয় এত অপমান॥
এককালে শ্রীকৃষ্ণে দংশিয়াছিল কালি।
সেই অপরাধেরে বেঙের ঘোড়া হলি॥" ইত্যাদি।

—দামোদরের বন্যা, ছাওয়াল গাএন।

(৭) গোসানী-মঙ্গল

গোসানী দেবীর অপর নাম কামতেশ্বরী দেবী। কুচবিহার রাজবংশের ইনি অধিষ্ঠাত্রীদেবী। কবি রাধাকৃষ্ণ দাস কুচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আদেশে এই দেবীর বিবরণ ("গোসানী-মঙ্গল") ১১০৬ বঙ্গাব্দে বা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। কবি রাধাকৃষ্ণ রঙ্গপুর জেলার বাগডুয়ার পরগণার অন্তর্গত ঝাড়বিশিলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবি-রচিত বিবরণ বেশ প্রাঞ্জল।

গোসানী দেবীর কামতেশ্বরী নাম গ্রহণ ও পূজা-ব্যবস্থা।

"রাজাগুরু করে পূজা গোসার চরণ।
মৈথিল ব্রাহ্মণ হয়া পূজে সাবধান॥
ছাগল মহিষ বলি কাটিল বিস্তর।
তুষ্ট হয়া গোসানী রাজাক দিল বর॥
কামতেশ্বর রাজা হইল তাহার ঈশ্বরী।
এই হেতু গোসানীর নাম কামতেশ্বরী॥
নানাবাদ্য কোলাহল করে হুরাহুরি।
গান নৃত্য করে কত বন্দুক গরগরি॥
আনন্দে বাদাই করি পূজা সমর্পিল।
মস্তক নামিয়া রাজা নির্ম্মাল্য লইল॥
এহি মতে গোসানী হইল স্থাপন।
নানাদেশী লোক আসি করে দরশন॥
কার্ত্তিক বৈশাখমাসে গোসানীর মেলা হয়।
মানসী পূজাএ তার বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥

পূজা-অবসানে গৃহে উপশন।
লোকজন সবে গেল আপনা-ভুবন॥
বনমালা ধরে রাজা আনন্দে বিহ্বলে।
ভূণে কবি রাধাকৃষ্ণ গোসানী-মঙ্গলে॥"

—গোসানী-মঙ্গল, রাধাকৃষ্ণ দাস

(৮) মদনমোহন-বন্দনা

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বনবিষ্ণুপুরের রাজা প্রসিদ্ধ বীর হাম্বীর স্বীয় গৃহে মদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই বিগ্রহ কলিকাতাস্থ অপার চিৎপুর রোডে স্থাপিত আছেন। কলিকাতাবাসীর নিকট "মদনমোহনতলা" বিশেষ পরিচিত। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জয়কৃষ্ণ দাস নামক কোন কবি "মদনমোহন-বন্দনা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মদনমোহন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য এই গ্রন্থে ভক্তিভাবে বিরচিত হইয়াছে। মদনমোহন সংক্রান্ত প্রাপ্ত পুথির কাল ১২৬৭ বঙ্গাব্দ অথবা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় স্বয়ং মদনমোহনের
বিষ্ণুপুর গড়-রক্ষা।

"একদিন যত বরগী একত্র হইল।
চারি ঘাট খুঁজি তখন যুজ-ঘাটে গেল॥
তালবরুক্ষের খানায় নামি যত বরগীগণ।
হাতীর উপরে চাপি করিলা গমন॥
এক গোলন্দাজ তখন ছুটিয়া চলিল।
দক্ষিণভদ্রে যেয়ে রাজায় আদ্দাস করিল॥
শুন শুন মহারাজ বৈসে কর কি।
বরগী তাড়াবার লেগে বলিতে এসেছি॥
এই কথা শুনি রাজা কাঁপিতে লাগিল।
ডাক দিয়া সহরের কীর্ত্তনীয়া আনিল॥
মহাপ্রভুর বেড়ে যায়্যা সঙ্কীর্ত্তন করে।
রাখ মদনমোহন রাজা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

এখানেতে মদনমোহন জানিলা অন্তরে।
রাজা প্রজায় বরগী তাড়াবার ভার দিলা মোরে ॥
মল্লবেশ ধরে প্রভু অতি বিনোদিয়া।
বরগী তাড়াতে যান প্রভু শাঁখারি-বাজার দিয়া।

*　　*　　*　　*

যুজ-ঘাটে যায়্যা প্রভুর ঘোড়া দাণ্ডাইল।
বরগীর কর্ত্তা ভাস্কর-পণ্ডিত দেখিতে পাইল ॥

*　　*　　*　　*

এ সব দেখিয়া বরগী পলাইয়া যায়।
মদনমোহন ভূমে নাম্বে এমন সময় ॥
আপন হাতে সলিতা লয়্যা কামানেতে দিল।
বর্গী পলাইল তাদের হাতী মরে গেল ॥" ইত্যাদি।

—মদনমোহন-বন্দনা, জয়কৃষ্ণ দাস।

৯। চন্দ্রকান্ত

"চন্দ্রকান্ত" কাব্যের প্রণেতা গৌরীকান্ত দাস। ইঁহার অপর নাম কালিকাপ্রসাদ দাস। ইনি বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবির নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত প্রাচীন সুতানুটী গ্রামে ছিল এবং তাঁহার পিতার নাম মাণিকরাম দাস। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি গৌরীকান্ত কবি ভারত-চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" আদর্শে "চন্দ্রকান্ত" গ্রন্থখানি রচনা করেন। দেবীচরণ নামক কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থরচনায় তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন। কবি গৌরীকান্ত গদ্যেও কিছু রচনা করিয়াছিলেন। "চন্দ্রকান্ত" গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের বিকৃত আদর্শের পরিচয় থাকিলেও রচনামাধুর্য্যে একসময় এই গ্রন্থ প্রায় "বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

গোয়ালিনীর রূপ-বর্ণনা।

"গোপীর সৌন্দর্য্য কত কহিব বিস্তারি।
কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি সাধ্য অনুসারী ॥
অৰ্দ্ধেক বএস মাগী যুবতীর প্রায়।
কপালে চন্দন-বিন্দু তিলক নাসায় ॥

সুগন্ধি-তৈলে করে চিকুর-বন্ধন।
খোপার চাঁপার ফুল অতি সুশোভন॥
কাণে পাশা মৃদুভাষা সহাস্য-বদন।
নয়নে কজ্জল-রেখা দশনে মঞ্জন॥
শুভ্র বস্ত্র পরিধান গলে পাকা মালা।
পরাণ কাড়িয়া লয় কথার কৌশলা॥
হাব-ভাব কটাক্ষেতে যুবতী নিন্দিয়া।
যৌবনে কেমন ছিলা না পাই ভাবিয়া॥"

—চন্দ্রকান্ত, গৌরীকান্ত দাস।

"চন্দ্রকান্ত" গ্রন্থের গল্পাংশ এইরূপ। চন্দ্রকান্ত নামক এক বণিক যুবক তাঁহার নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে গুজরাট গমন করে। তথায় রাজকন্যার রূপ দেখিয়া এই যুবক মুগ্ধ হয় এবং উভয়ের প্রেমের ফলে চন্দ্রকান্ত স্ত্রীবেশে রাজপুরীতে গোপনে বাস করিতে থাকে। অবশেষে চন্দ্রকান্তের স্ত্রী পুরুষের ছদ্মবেশে স্বামীর খোঁজ করিতে গুজরাটে যায় এবং স্বামীকে উদ্ধার করে। ভারতচন্দ্রের যুগের বিকৃত আদর্শের নমুনা শুধু "চন্দ্রকান্ত" নহে। এইরূপ অপর দুইখানি গ্রন্থ কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা"।

১০। সঙ্গীত-তরঙ্গ

"সঙ্গীত-তরঙ্গ" প্রণেতা রাধামোহন সেনের সময় ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। বঙ্গবাসী প্রেস কর্তৃক "সঙ্গীত-তরঙ্গ" মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত রাগ-রাগিণী এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা,—

রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণনা।

"দেখ বাঙ্গালী সুন্দর-কান্তি বালা।
যোগিনীর বেশ গলে পুষ্পমালা॥
কর দক্ষিণে পাণ্ডুর পদ্মফুল।
ধৃত শব্য-করে রুচির ত্রিশূল॥
রমণী-বদনে বিভূতি-প্রঘটা।
আর মস্তকে উষ্ণীষ-বদ্ধ জটা॥

পরিধান বাস কাষায় কেশরে।
ভুরু-রোমাঝে কস্তুরী বিন্দুপরে॥
ঘন চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ-রাগ।
জাতি রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ণভাগ॥
খরজ গৃহ-মধ্যে বিরাজে ধনী।
সুর-সুশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
দিবসের শেষ যামেতে বিধান।
কবি সেন-বিরচিত ছন্দোগান॥"

—সঙ্গীত-তরঙ্গ, রাধামোহন সেন।

১১। উষা-হরণ

বগুড়ার মনসা-মঙ্গলের কবি জীবন মৈত্রেয় (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) "উষা-হরণ" রচনা করিয়াছিলেন। মনসা-মঙ্গল কাব্য আলোচনা উপলক্ষে পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে এই কবির সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী মনসা-মঙ্গলেরও অন্তর্গত। জীবন মৈত্রেয় রচিত ও এই কাহিনী সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। বাণ-কন্যা উষা ও কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্ত-প্রেম কাহিনী এবং তদুপলক্ষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দৈত্যরাজা বাণ ও দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই "উষা-হরণ" রচিত।

অনিরুদ্ধ গোপনে উষা-সম্ভাষণে গেলে উষার উক্তি।

"অনিরুদ্ধ-বদন দেখিয়া বিনোদিনী।
কপট করিয়া উষা বলিয়াছে বাণী॥
কে তুমি কোথায় থাক কেন আইলে এথা।
পিতায় শুনিলে তোমার কাটিবেন মাথা॥
কাহার কুমার তুমি পরিচয় দেহ।
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি এথা হৈতে যাহ॥
ভালত চাঙ্গাতি বটে একি পরমাদ।
হরিতে পরের নারী করিয়াছ সাধ॥
দাসীগণ দিয়া আজি করিব দুর্গতি।
এথা হৈতে যাহ চোর বলিলাম সম্প্রতি॥

কে জানে তোমাকে তুমি কোন স্থানে বৈস।
এত বড় প্রাণ যে আমার ঘরে আইস॥
আপন কল্যাণ চাহ যাহ নিকেতন।
নহে আজি স্ত্রীর লোভে হারাবে জীবন॥"

—উষা-হরণ, জীবন মৈত্রেয়।

(১২) বৈদ্য-গ্রন্থ

এই "বৈদ্য-গ্রন্থ"খানি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা চিকিৎসক ও কবি কর্ত্তৃক রচিত হয়। ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা-প্রণালী পদ্যে লিখিবার প্রাচীন রীতির হেতু এই যে ইহাতে মুখস্থ করিতে সুবিধা হয়। এইরূপ গ্রন্থে কবিত্ব আশা করা যায় না।

অথ ফুলা-মহাকুষ্ঠের লক্ষণ ও চিকিৎসা।
"গাও ফুলএ যার অঙ্গুলিখানি পড়ে।
নাক ফুলিয়া চেভা হয় কথকালে॥
এ সব লক্ষণ যার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিও নিশ্চিৎ॥
চিকিৎসা করিব তাহা যে জন পণ্ডিত।
দৈব-যোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত॥
কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি যতনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেতে শুখাইব॥
বাবরির বীজ সমে গুণ্ডি করিব।
চারি মাষা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব॥" ইত্যাদি।

—বৈদ্য-গ্রন্থ।

(১৩) বৈষ্ণব-দিগ্দর্শন

এই গ্রন্থখানির প্রণেতা জয়কৃষ্ণ দাস। এই কবি ও তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, ৪র্থ সংখ্যা, ২২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উক্ত পত্রিকায় কবি রচিত "ভুবন-মঙ্গল" গ্রন্থের পরিচয় আছে। রচনাদৃষ্টে মনে হয় "বৈষ্ণব-দিগ্দর্শন" ও "ভুবন-মঙ্গল" একই গ্রন্থ। "বৈষ্ণব-দিগ্দর্শন" "ভুবন-মঙ্গলে"র অংশবিশেষ হইতে পারে। কবি জয়কৃষ্ণ দাস হুগলী জেলার অন্তর্গত গড়বাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির কাল খৃঃ ১৭শ

শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে পারে। "বৈষ্ণব-দিগ্দর্শন" গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচরগণের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যথা—

শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণের জন্মস্থান।

"নবদ্বীপে জন্ম প্রভুর নিশ্চয় জানিয়া।
স্থানে স্থানে পারিষদ জন্মেন আসিয়া॥
জনমিলা কমলাক্ষ ভট্ট শান্তিপুরে।
অদ্বৈত বলিয়া তার বিখ্যাত সংসারে॥
দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্ত্তিক মাসেতে।
অনুরাধা নক্ষত্রেতে মঙ্গল বারেতে॥
একচাকা খলতপুরেতে নিত্যানন্দ।
জনম লভিলা প্রভু আনন্দের কন্দ॥
পরমানন্দ ঘরে জন্মিলেক আসিয়া।
যার প্রসিদ্ধ নাম হাড়াই পণ্ডিত বলিয়া॥
জনম লভিলা পদ্মাবতীর উদরে।
মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিসুত বারে॥
কুবের বলিয়া নাম জনক রাখিল।
স্বভাব-প্রকাশ নাম নিত্যানন্দ হইল॥" ইত্যাদি।

—বৈষ্ণব-দিগ্দর্শন, জয়কৃষ্ণ দাস।

(১৪) সপিণ্ডাদি-বিচার-প্রবৃত্তি

রাধাবল্লভ শর্ম্মা বাঙ্গালাতে একখানি স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম সম্ভবতঃ "সপিণ্ডাদি-বিচার-প্রবৃত্তি"। এই গ্রন্থখানি খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে (বোধ হয় শেষভাগে) রচিত হয়। পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র (খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) তাঁহার "গৌরীমঙ্গল" কাব্যে (১৮০৬ খৃষ্টাব্দ) এই গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাপ্ত পুথিখানি খণ্ডিত এবং গ্রন্থকারের নাম ইহাতে নাই। অনুমান করা যাইতেছে আলোচ্য গ্রন্থখানিই রাধাবল্লভ শর্ম্মা রচিত স্মৃতি-গ্রন্থ।

সপিণ্ডাদি-বিচার।

"সপ্তম পুরুষাবধি সপিণ্ড-লক্ষণ।
পুরুষের হয় এই শাস্ত্রের লিখন॥

জীবদ্দশাতে পিতা পিতামহ থাকে।
তবে দশপুরুষ সপিণ্ড হয় লোকে ॥
বিবাহ-রহিত শুন দুহিতার কথা।
তৃতীয় পুরুষাবধি সপিণ্ড-গৃহীতা ॥
সপিণ্ডান্তর চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত।
সমান-উদক তার হয় দেহবন্ত ॥
তারপর সম্বন্ধ জানিহ নিজ জন।
স্মরণ অবধি হয় সাকল্য-লক্ষণ ॥
তারপর সকলে গোত্রজ করি কয়।
সপিণ্ড-বিচার এই শুন মহাশয় ॥"

—সপিণ্ডাদি-বিচার-প্রবৃত্তি, রাধাবল্লভ শর্ম্মা।

(১৫) উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা

এই গ্রন্থখানি রূপগোস্বামী রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ "উজ্জ্বল-নীলমণি"র বঙ্গভাষায় অনুবাদ। অনুবাদকের নাম শচীনন্দন বিদ্যানিধি। হরিদত্ত নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির আদেশে ইনি ১৭০৭ শকে বা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে "উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা" নামক অনুবাদ গ্রন্থখানি রচনা করেন। শচীনন্দন বিদ্যানিধি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ও গুস্করা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চানক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর পদকর্ত্তা শচীনন্দন দাস হইতে ইনি অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি। এই গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে।

পতি।

"শাস্ত্র মতে কান্তার যেই করে পাণিগ্রহে।
সেই ভর্ত্তা হয় তারে পতি শব্দে কহে ॥"

* * * *

উপপতি।

"ইহলোক পরলোক না করি গণন।
নিজরাগে করে যেই ধর্ম্মের লঙ্ঘন ॥
পরকীয়া নারী সঙ্গে করয়ে বিহার।
সদা প্রেমবশ উপপতি নাম তার ॥"

* * * *

শৃঙ্গার-রস।

শৃঙ্গারের মাধুর্য্য অধিক ইহাতে।
উপপতি রসশ্রেষ্ঠ ভরতের মতে॥
লোকশাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ।
প্রচ্ছন্ন কামুক সাথে দুর্লভ মিলন॥
তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়॥
ইহাতে লঘুতা সেই কবিগণ কয়।
প্রাকৃত নায়কে সেই কৃষ্ণ প্রতি নয়॥" ইত্যাদি।

—উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা, শচীনন্দন বিদ্যানিধি।

(১৬) বৃহৎ সারাবলী

এই গ্রন্থ রচনাকারীর নাম রাধামাধব ঘোষ। "বৃহৎ সারাবলী" বারা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, যথা,—কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা, জগন্নাথ-লীলা, চৈতন্য-লীলা ও বুদ্ধ-লীলা। শিবরতন মিত্র মহাশয়ের মতে "এই সমগ্র বৃহৎ সরাবলী গ্রন্থখানি ৯৫০০০ অর্থাৎ প্রায় লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্যে বেদব্যাস-কৃত মহাভারত ব্যতীত অপর কোন ভারতীয় গ্রন্থের এরূপ খ্যাতি আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।" (বীরভূমি, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)। বাঁকুড়া মুদ্রাযন্ত্র হইতে এই গ্রন্থের কৃষ্ণ-লীলা, রাম লীলা ও জগন্নাথ-লীলা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আর্থিক ক্ষতি হওয়াতে অবশিষ্ট দুই অংশ মুদ্রিত হয় নাই। রাধামাধব ঘোষ হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কবির পিতার নাম রামপ্রসাদ ঘোষ।

জটিলা ও কুটিলার চিরঘাটে রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শন।

"মদনমোহন শ্যামে মধ্যেতে থুইয়া।
চারিদিকে গোপীগণ মণ্ডলী করিয়া॥
পদ্মেতে কেশর যেন মধ্যেতে ভ্রমর।
চারিদিকে শোভে যেন পল্লব মনোহর॥
সেই মত শোভা হল কি কহিব তার।
মধ্যস্থলে বিরাজেন সংসারের সার॥

চারিদিকে সখীসব নাচিয়া বেড়ায়।
হেনকালে জটিলা কুটিলা তথা যায়॥
মায়ে ঝীয়ে দুইজনে কক্ষে কুম্ভ করি।
চিরঘাটে গেল তবে আনিবারে বারি॥
মত্ত হয়ে সখীগণ নাচিয়ে বেড়ায়।
জটিলা কুটিলা দেখি ভাবে অনুপায়॥
প্রকাশ করিয়া প্রভু না কহেন বাণী।
ঠাবিয়া রাধারে জ্ঞাত করে চক্রপাণি॥
চিহ্ন দেখি কমলিনী হন সাবধান।
সম্বরিয়া তথায় রহিল ভগবান॥" ইত্যাদি।

—বৃহৎ সারাবলী, কৃষ্ণলীলা, রাধামাধব ঘোষ।

(খ) কুলজী-সাহিত্য

এতদ্দেশীয় হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। জাতিভেদ কথাটি মূলে একটু ব্যাপক। হিন্দু ও অহিন্দু, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব সমাজে ও সব দেশেই কোন না কোন আকারে জাতিভেদ রহিয়াছে। "জাতি" কথাটি গোড়াতে Race অথবা Tribe (উপজাতি) অর্থে প্রযুক্ত হইলেও বর্ত্তমানে সংস্কৃতিগত People অথবা রাজনীতিগত Nation প্রাচীন (tribe অর্থে নহে) অর্থেই অধিক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হিসাবে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে ইহা অনেকটা স্বতন্ত্র সংজ্ঞা-জ্ঞাপক। পৃথিবীর সভ্য সমাজগুলির ভিতরে পাশ্চাত্য মহাদেশে ধন (wealth) ইহার মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। ধনী ও নির্ধন এই দুই জাতিতে পাশ্চাত্যসমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আবার এই ধন হিসাবে প্রাচীনকালে উক্ত মহাদেশেও ভূমির অধিকারই অধিক গৌরবজনক ছিল এবং ইহার ফলে তথায় "Feudal system" নামক একপ্রকার জমিদারি প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে তৎস্থানে বিনিময় মুদ্রার অধিকারী বণিক সম্প্রদায় অধিক সম্মান অথবা ক্ষমতালাভ করিয়াছে। অবশ্য সামাজিক মর্য্যাদার মানদণ্ড পাশ্চাত্য মহাদেশেও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। বংশ-মর্য্যাদার সম্মান আমেরিকা মহাদেশে তত মান্য না হইলেও ইউরোপ তাহা একেবারে ভুলিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের এবং মস্তিষ্ক-জীবী (Intellectuals), ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মব্যবসায়িগণের স্বাতন্ত্র্য অথবা সামাজিক

মর্য্যাদা অনেক দেশেই অল্প নহে। আমরা প্রত্যেক দেশের সভ্য মানব-সমাজ-গুলিকে উপলক্ষ করিয়াই প্রধানতঃ উপরোক্ত কথাগুলি বলিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে মানুষ সকলেই সমান নহে। ইহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ সর্ব্বত্রই আছে ও থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের এই সামাজিক উচ্চ-নীচ ভেদ একসময়ে ছিল না পরে হইয়াছে, যথা—বৈদিক যুগে ছিল না, পৌরাণিক যুগে হইয়াছে—ইহা স্বীকার করা যায় না। বৈদিক যুগে ঋষিগণ অপর ব্যক্তিগণ হইতে অধিক মান্য পাইতেন। সাধারণ পুরুষ, সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা বা অধিকার পাইত। পরে "গুণ ও কর্ম্ম" হিসাবে সমাজভাগ হইল। এই দেশের বৈশিষ্ট্য এই যে "কাঞ্চন-কৌলীন্য" এই দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। ছিন্ন-কন্থা পরিহিত সন্ন্যাসী এই দেশে রাজা বা বণিক অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। এই হিসাবে বাহ্যিক ও সামাজিক দারিদ্র্য আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির মর্য্যাদা কখনও ক্ষুন্ন করে নাই। যাহা হউক "গুণ ও কর্ম্ম" অবলম্বনে সমাজ-বিভাগে class তৈয়ারী হয় caste তৈয়ারী হয় না। Max Müller সাহেবের ও Rhys Davids সাহেবের মতে "Connubium ও Commensality" অর্থাৎ বিবাহদ্বারা এবং একত্র পান-ভোজনদ্বারা caste তৈয়ার হয় এবং কালক্রমে ভারতবর্ষ ও তথা বাঙ্গালাদেশে তাহাই হইয়াছিল।

নানা জাতি (Race) বাঙ্গালাদেশে আগমন করিয়া ক্রমে বিবাহাদি দ্বারা এক সমাজে পরিণত হয়। আর্য্যজাতির এতদ্দেশে আগমন ও এই মিলন প্রচেষ্টায় নানা জাতি বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের অঙ্গে মিলিয়া গেল। এইরূপ প্রত্যেক জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী সংস্কৃতে রচিত হইল এবং প্রত্যেক জাতির জীবিকা সংস্থানের কার্য্য স্থির হইল। বৈদিক যুগে শ্বেত, রক্ত পীত ও কৃষ্ণ এই চারি "বর্ণের" (গাত্রবর্ণের) লোকের দ্বারা হিন্দুসমাজ সংগঠন পরিকল্পিত হইয়া ক্রমে কার্য্য বিভাগদ্বারা (সম্ভবতঃ এই গাত্রবর্ণসমন্বিত চারিটি Race ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নাম গ্রহণ করিয়া) সমাজদেহে মিশিয়া গেল এবং পরে "মিশ্রবর্ণ"সমূহের উৎপত্তি হইল।

যাহা হউক এই নানা caste বা জাতি বাঙ্গালাদেশে বংশানুক্রমিক ভাবে নিজ নিজ জাতিগত কর্ম্ম এতদিন করিয়া আসিতেছিল। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতির পুরোভাগে বাঙ্গালাতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিত্রয় রহিয়াছে। ইহাদেরও নানা উপবিভাগ রহিয়াছে। জাতি বা সমাজের সেবা করিয়া অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে বা ইতিহাসে অনেকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া স্বীয় নাম তো বটেই

স্বীয় কুলকেও মর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। আবার নানারূপ কুকার্য্য করিয়া অনেক বংশের পতনও হইয়াছে। এই দেশে যাহা "গুণ ও কর্ম্মগত" গোড়াতে ছিল তাহা সুদীর্ঘকাল যাবৎ বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে অযোগ্য লোক বৃথা সম্মানের দাবী করিতে অভ্যস্ত ছিল। হিন্দুরাজাগণের উৎসাহে ও বিশেষ বিশেষ সমাজনীতিজ্ঞগণের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে মধ্যে মধ্যে সংস্কারও হইয়াছে। এই বিষয়ে সেনরাজগণ, বিশেষতঃ বল্লাল সেন, পণ্ডিত রঘুনন্দন ও দেবীবর ঘটকের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালী বণিককুলের সমুদ্রপথে বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইয়া সমাজবহির্ভূত রীতিনীতি পালন এবং মুসলমান, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের বাঙ্গালী নারী অপহরণ বা বলপূর্ব্বক মুসলমানগণের হিন্দুগণকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। ইহার ফলে সমাজসংস্কার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজে বিশেষ বিশেষ গুণী লোককে সম্মানিত করিবার ফলে তাঁহাদের অযোগ্য বংশধরগণও উহা দাবী করাতে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। "কৌলীন্য-প্রথা" নামক এই প্রথার আদর্শ প্রথমেই ছিল "আচার"। তাহার পর বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান গণ্য হইয়াছিল। এই কৌলীন্যপ্রথা অনুসারে বহুবিবাহ প্রথা এইরূপ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল যে বহুকাল সমাজদেহে উহা ব্যাধিরূপে বিরাজ করিয়াছিল। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য আদিশূর কৃত। কৌলীন্য-প্রথা (বিশেষ করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে) স্থাপনে বল্লাল সেনের নাম চিরস্মরণীয়। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-নিয়ম সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহা রাজকৃত নহে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কৃত এবং বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র মান্য। উদারদৃষ্টিদ্বারা বিভিন্ন কালের গুণ-দোষ বিচার করিয়া সমাজ মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের নিয়ম-কানুনের প্রবর্ত্তকরূপে দেবীবর ঘটক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "মেলবন্ধনের" নিয়ম-কানুনগুলি কালক্রমে অতি-সূক্ষ্মতার ফলে অচল হইয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এই দেশে ঘটকগণ বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির করিতেন এবং বিভিন্ন কুলের খবর তাহারা "নোট" করিয়া রাখিতেন। ইহার ফলে সংস্কৃতে অনেকগুলি কুলজী-গ্রন্থ রচিত হয়। এই দেশের ভাটব্রাহ্মণগণও স্কটল্যাণ্ডের Bard বা চারণদিগের ন্যায় অনেক কুলের সংবাদ রাখিয়া স্থানে স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। সংস্কৃত কুলজী-গ্রন্থগুলি বর্ত্তমানে আমাদের

প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালাতেও অনেক কুলজী-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল এবং ইহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে রচিত। এই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কুলজী-গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন তথ্য ও দেশের মূল্যবান প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহকার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে আমরা কতিপয় উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা কুলজী-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলাম।[১] ঘটকসমাজও অনেক সময়ে কুলের খবর জানা উপলক্ষে সামাজিক উৎসবে উৎপীড়ন ও অর্থোপার্জ্জন দুইই করিতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ইহার কিছু ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের কুলগ্রন্থ অন্য কুলগ্রন্থগুলির তুলনায় সংখ্যায় অধিক।

১। দেবীবর ঘটককৃত মেলবন্ধ
২। দেবীবর ঘটককৃত প্রকৃতিপটলনির্ণয়
৩। বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলার্ণব
৪। দনুজারি মিশ্রের মেলরহস্য
৫। পরিহর কবীন্দ্র রচিত দশতত্ত্বপ্রকাশ
৬। মেলপ্রকৃতিনির্ণয়
৭। মেলমালা
৮। মেলচন্দ্রিকা
৯। মেলপ্রকাশ
১০। দোষাবলী
১১। কুলতত্ত্ব প্রকাশিকা
১২। কুলসার
১৩। পিরালীকারিকা (নীলকণ্ঠ ভট্ট)
১৪। গোষ্ঠী কথা (নন্দু পঞ্চানন)
১৫। কারিকা (নন্দু পঞ্চানন)
১৬। রাঢ়ী ও সমাজ নির্ণয়
১৭। কুলপঞ্জী রামদেব আচার্য্য
১৮। রাঢ়ী ও গ্রহবিপ্রকারিকা (কুলানন্দ)
১৯। গ্রহবিপ্রবিচার (কুলানন্দ)

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৩৬—২০৭) দ্রষ্টব্য।

১০। ঢাকুর শুকদেব)
২১। কুলপঞ্জী (ঘটকবিশারদ কান্তিরাম)
২২। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা (মালাধর ঘটক)
২৩। কারিকা (ঘটককেশরী)
২৪। কারিকা (ঘটকচূড়ামণি)
২৫। কুলপঞ্জিকা (ঘটকবাচস্পতি)
২৬। ঢাকুরি (সার্ব্বভৌম)
২৭। ঢাকুরি (শম্ভু বিদ্যানিধি)
২৮। ঢাকুরি (কাশীনাথ বসু)
২৯। ঢাকুরি (মাধব ঘটক)
৩০। ঢাকুরি (নন্দরাম মিশ্র)
৩১। ঢাকুরি (রাধামোহন সরস্বতী)
৩২। মল্লিকবংশকারিকা (দ্বিজ রামানন্দ)
৩৩। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলসর্ব্বস্ব
৩৪। একজাই কারিকা
৩৫। বঙ্গকুলজী সারসংগ্রহ
৩৬। দ্বিজ বাচস্পতি কৃত বঙ্গজকুলজী
৩৭। বঙ্গজ ঢাকুরি (দ্বিজ রামানন্দ)
৩৮। মৌলিক ঢাকুরি (রামনারায়ণ বসু)
৩৯। বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুরি (কাশীরাম দাস)
৪০। বারেন্দ্র ঢাকুরি (যদুনন্দন)
৪১। গন্ধবণিক কুলজী (তিলকরাম)
৪২। গন্ধবণিক কুলজী (পরশুরাম)
৪৩। তাম্বুল বণিকের কুলজী (দ্বিজ পরশুরাম)
৪৪। তন্তুবায় কুলজী (মাধব)
৪৫। সদ্ধর্ম্মাচার কথা (কিঙ্কর দাস)
৪৬। সদগোপ-কুলাচার (মণিমাধব)
৪৭। তিলি পঞ্জিকা (রামেশ্বর দত্ত)
৪৮। সুবর্ণবণিক-কারিকা (মঙ্গলকৃত)
৪৯। ত্রিপুর রাজমালা (শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর)

এই কুলপঞ্জিকাগুলির মধ্যে নুলু পঞ্চাননের কারিকায় আদিশূরের

জাতি-নির্ণয় উল্লেখযোগ্য।[১] ত্রিপুর রাজমালায় জাতি ও এ দেশের ঐতিহাসিক অনেক মাল-মসলা আছে।

(গ) ঐতিহাসিক সাহিত্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ খুব অল্প। সেই সময়ের যে কিছু ইতিহাস তাহা প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব অথবা অবৈষ্ণব সাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। তবুও বৈষ্ণব অংশে জীবনী বর্ণনা উপলক্ষে তৎকালীন অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। অবৈষ্ণব অংশে, বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যে, অনেক ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান মিলে। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ যে কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার যথাসম্ভব বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) মহারাষ্ট্র-পুরাণ

এই গ্রন্থখানি গঙ্গারাম ভাট নামক জনৈক ময়মনসিংহ জেলাবাসী ও মুর্শিদাবাদ প্রবাসী ব্রাহ্মণ কর্তৃক রচিত। গ্রন্থের বিষয়-বস্তু নবাব আলিবর্দি খানের সময়ের বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ বা "বর্গীর হাঙ্গামা"। মহারাষ্ট্রীয় নেতা ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থকারও সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বর্ণনা দুই একস্থানে ইতিহাসের বর্ণনার সহিত না মিলিলেও অধিক প্রামাণিক। গঙ্গারাম সরল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় বাঙ্গালায় বর্গীর অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কবিত্ব অপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের খুঁটিনাটি বর্ণনা অতি নিপুণভাবে করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি খণ্ডিত। ইহার সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থখানির আবিষ্কারক ময়মনসিংহের কেদারনাথ মজুমদার

---

(১) "বৈদ্য রাজা আদিশূর করিয় আচার। বেদে ব্রহ্মণ্য কাণো দাও ধারচার। এই উপলক্ষে —কারিকা, নন্দ পঞ্চানন। সম্বন্ধনির্ণয় (২য় সং, লালমোহন বিদ্যানিধি) দ্রষ্টব্য।

(২) ইহংকর্তৃক "মহারাষ্ট্র-পুরাণ" সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Dept. of Letters, Vols XIX ও XX (১৯শ ও বিংশ) সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া "কবি গঙ্গারাম ভাট ও মহারাষ্ট্রপুরাণ" (ব্যোমকেশ মুস্তফী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৩ সাল), "The Mahratta invasions of Bengal" by Prof J N Samaddar (Bengal, Past & Present, Vol 27, P. 55) ও "বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ", চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সাঃ পঃ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৪ সাল দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল", পৃঃ ১৪৭, "Bengal Past & Present, Vol. 24, Jan-June, "Bargi Invasion of Bengal"—J. N Samaddar (Indian Historical Records Commission, Vol 6), "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (দীনেশচন্দ্র সেন), Story of Bengali Language & Literature (D. C. Sen) এবং Typical Selections from old Bengali Litt., Vol 2, (D C Sen) উল্লেখযোগ্য।

মহাশয়। যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম (অংশবিশেষ) "ভাস্কর-পরাভব" এবং পুথির হস্তলিপির তারিখ ১৬৭২শক অর্থাৎ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ। "বর্গীর হাঙ্গামার" মাত্র নয় বৎসর পরে এই পুথিখানি লিখিত হয়।

বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে বর্গীর অত্যাচার।

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোণার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাকনড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জালদড়ি॥
সঙ্খবণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভালমানুষের স্ত্রীলোক যত হাটে নাই পথে।
বরগির পলানে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত্র যত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ যমনি॥
গোসাঞি মোহান্ত জত চোপালায় চরিয়া।
বোচকাবুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটআরি যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥

দশবিস লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমরা পলাই॥
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া।
কেথা খোকড়ি কত মাথাএ করিয়া॥
বুড়া বুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞ্চি ধাম্মুক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিগে লোক পলাঞা ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা-রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
এক চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মত বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণুমণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মত জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥

কান্থকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥
ত্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা॥
পৃথিবীতে নাম তার হইলা ভাগীরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি॥" ইত্যাদি।

—মহারাষ্ট্র-পুরাণ, গঙ্গারাম ভাট।

(২) সমসের গাজীর গান

"সমসের গাজীর গান" বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে চারি হাজার পয়ার (আট হাজার ছত্র) আছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম জানা যায় নাই। গ্রন্থখানি সমসের গাজী নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত। এই গাজীর নিবাস ত্রিপুরা এবং ইনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। সমসের দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। যৌবনে ইনি একটি দস্যুদলের নেতা হন এবং ইঁহার প্রতাপ দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কালক্রমে ইনি এত প্রবল হন যে ত্রিপুরা-রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কিছুকাল ত্রিপুরাতে রাজত্ব করেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক গান এখনও ত্রিপুরা-অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। কথিত আছে দস্যুতা করিয়া ইনি লুন্ঠিত ধন গভীর অরণ্যে লুকাইয়া রাখিতেন। সমসের গাজী জঙ্গলে ধনসমেত প্রবেশ করিয়া শুধু কতিপয় সূত্রধর ভিন্ন অন্য লোকজন সরাইয়া দিতেন এবং বড় বড় শাল গাছে এই মিস্ত্রীদের দ্বারা গর্ত্ত করিয়া ধনসম্পদ তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেন। তাহার পরে তিনি এই লোকদের দ্বারা গর্ত্তের মুখ খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতেন এবং কার্য্য-শেষে বিষয়টি গোপন রাখিবার জন্য এই হতভাগা মিস্ত্রীদের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ

করিতেন। এখনও নাকি মধ্যে মধ্যে কাঠুরিয়াগণ জঙ্গলে এই ধন পায়। একবার হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবার সময় মীরেশ্বরী নামে এক গ্রামের পুষ্করিণীতে কতিপয় স্নানরত হিন্দুরমণীকে দেখিতে পাইয়া, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী একজনকে বলপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন। এই রমণী বিবাহিতা ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল। তাহাকে সমসের নিকা করিতে মনস্থ করিলে সমসেরের স্ত্রী প্রথমে বাধা দেয়। পরে একটি রফা হয়। সমসের এই হিন্দুরমণীর স্বামীর সহিত অপর একটি হিন্দুরমণীর বিবাহ দেয় এবং এই ব্যক্তি ও তাহার পিতাকে রাজদরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করে। পিতাপুত্র সমাজচ্যুত হওয়াতে এই কার্য্যে বাধা হয় না এবং সমসেরও এই সুন্দরী হিন্দুনারীকে বিবাহ করে। এই গ্রন্থের লেখক সম্ভবতঃ মুসলমান ছিলেন।[১]

হিন্দুর নন্দিনী বিবাহ।

"একদিন গাজী গেল করিতে শীকার।
জয়পুর মন্দিয়ার বনের মাঝার॥
জয়পুরে ছিল এক মজুসরকার।
কানুরাম লস্কর হয় ফরজন্দ তাহার॥
সেই মজুসরকারের সুন্দরী কুমারী।
কুলীন দামাদে বিভা দিছিল মিরেশ্বরী॥
পঞ্চসখী মিলি তারা পুকুরের ধারে।
গিয়েছিল সেই দিন স্নান করিবারে॥
নূতন বয়সী বামা জলে যেন উড়ে।
দেখিয়া গাজীর চিত্ত ধরাইতে নারে॥
ইসারা করিল গাজী লোক গেল দূরে।
গাজী উত্তরিল সেই পুষ্করিণী পাড়ে॥
গজ লোটাইয়া গাজী তুলি নিল ধনী।
রাজপথে ভেক ধরি যেন নিল ফণী॥
নিল নিল বলি ডাকে সেই দাসীগণ।
বাপে পুত্রে শুনি তারা হৈল অচেতন॥
জাতি গেল জাতি গেল কান্দে সর্ব্বজন।
কি করিব কোথা যাব করয়ে ভাবন॥

(১) মৎপ্রণীত "Aspects of Bengali Society" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আসিতে শীকার কৈরে পথে দৈবগতি।
পাইলাম রত্ন এক সুন্দরী যুবতী॥
যদি কৃপা কর মোরে হয় মম কাজ।
দেশাচার আছে নাহি এতে লাজ॥
এ বলিয়া প্রিয়া হস্তে সমর্পিল বামা।
মঞ্জুর করিল বিবি ছাড়ি নিজ তামা॥
যে ইচ্ছা তোমার প্রভু সে ইচ্ছা আমার।
মনে লয় যেই সেই কর আপনার॥
কিন্তু হিন্দুসুতা ধনী তুমি মুসলমান।
কলেমা পড়াই তারে আনাও ইমান॥
তাহার পিতারে আনি রাজি কর গাজী।
পূর্ব্ব স্বামী বশ কর আল্লা হবে রাজী॥
এ বলি রাখিল কন্যা করিয়া যতন।
হারামি করিতে গাজী না পারে যেমন॥
সমসের গাজী মনু সরকারে আনি।
প্রণামে নজর দিয়া শ্বশুর হেন জানি॥
মিরেশ্বরী হতে আনি পূর্ব্ব দামাদেরে।
বিবাহ করাই দিল ভুলুয়া নগরে॥"

—সমসের গাজীর গান, পৃষ্ঠা ৮২—৮৩।

(৩) রাজমালা

"রাজমালা" ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস। ইহা অতি মূল্যবান গ্রন্থ। কুলজী হিসাবে ইহার আদর তো আছেই, বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক মালমসলাও এই গ্রন্থে রহিয়াছে। আসামের অধিবাসী শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক দুইজন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীধর্ম্ম মাণিক্যের আদেশে এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই মহারাজার রাজত্বকাল ১৪০৭-১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ। দুর্লভ চণ্ডাই নামক জনৈক বৃদ্ধ রাজসভাসদ ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতেও এই ব্রাহ্মণদ্বয় সাহায্য পাইয়াছিলেন। যথা,—(১) রাজমালিকা, (২) লক্ষণমালিকা, (৩) যোগিনীমালিকা ও (৪)

বারুদ্ধ কালীর স্থায়। ত্রিপুরার রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া নিজেদিগকে মনে করেন। এই সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও আছে।

(৪) চৌধুরীর লড়াই

ইহাতে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত রাজগঞ্জের চৌধুরী উপাধিবিশিষ্ট জমিদার পরিবারের ঘটনা একজন মুসলমান কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। খুল্লতাত রাজনারায়ণ চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে বাবুপুর নামক স্থানে যে সংঘর্ষ হইয়াছিল এই গ্রন্থে পয়ার ছন্দে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এই ঘটনাটি রঙ্গমালা নামে এক নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী নারীর সহিত জমিদার-যুবক রাজচন্দ্রের প্রেমকাহিনী ঘটিত। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকায় (৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা) "চৌধুরীর লড়াই" গীতিকাটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৫) ইসা খাঁ মসনদালি

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ইসা খাঁ বাঙ্গালার তদানীন্তন "বার-ভুইঞার" অন্যতম "ভুইঞা" ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী খিজিরপুর নামক স্থানে ছিল। মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহের সময়ের এই ভৌমিকগণের অন্যতম দুই ভৌমিক বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও তাঁহার পুত্র (ভ্রাতা ? কেদার রায়। চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণির সহিত ইসা খাঁর প্রেম, সোণামণিকে ইসা খাঁর অপহরণ এবং চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের ইসা খাঁর ও মোগল সেনাপতি মানসিংহের সহিত বিবাদ, যুদ্ধ ও তাঁহাদের ভুইঞাদ্বয়ের পরাজয়ের ছড়াটি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকার ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক মালমসলা এই ছড়াটিতে আছে।

(৬) দারা সেখ

মোগল সম্রাট সাহজাহানের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সেখের (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) করুণ কাহিনী এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। "দারা সেখ" কাব্যের কবি দ্বিজ রামচন্দ্র। সাহাজাদা দারার ঐতিহাসিক কাহিনীর বর্ণনা বেশ মনোরম হইয়াছে।

(৭) প্রতাপচাঁদ

প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমানের রাজগদির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াও দুর্ভাগ্য-বশতঃ জাল ব্যক্তি প্রতিপন্ন হওয়াতে রাজগদি প্রাপ্ত হন নাই। এই ব্যক্তি সম্বন্ধে "প্রতাপচাঁদ" কবিতাটির রচক অনূপচন্দ্র দত্ত। কবিতাটি ১৮৪৪

খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কবির নিবাস ছিল শ্রীখণ্ড। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রও "জাল প্রতাপচাঁদ" নাম দিয়া গদ্যে বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

(৮) কুকি-বিদ্রোহ

একবার ত্রিপুরা-রাজ্যের পার্ব্বত্য কুকিগণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরার গ্রামসমূহ আক্রমণের কাহিনী এই ছড়ায় বর্ণিত হইয়াছে। এখনও এই ছড়াটি ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে। এই ছড়া কিঞ্চিদধিক ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা।

(৯) ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত অসংখ্য ছড়া এখনও বাঙ্গালার পল্লী-অঞ্চলের নিভৃত কোণে গীত বা কথিত হইয়া থাকে। ছাওয়াল গাএনএর দামোদরের বন্যার কাহিনী ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বহু কবি বিভিন্ন বৎসরের দামোদরের বন্যার কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রচিত নফরচন্দ্র দাসের দামোদরের বন্যা বর্ণনা তন্মধ্যে অন্যতম। বরিশাল—কীর্ত্তিপাশার জমিদার বাবু রাজকুমার সেনকে তাঁহার দেওয়ান কিশোর মহলানবিশ ষড়যন্ত্র করিয়া বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলেন। এই শোচনীয় কাহিনীটি অবলম্বনেও ছড়া রচিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের অনেক স্থানের বৃদ্ধগণ এখনও উহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসএর আমলে রাজপুত বংশীয় ইতিহাসবিখ্যাত দেবীসিংহ উত্তর-বঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনাও একটি ছড়াতে আছে। যথা,—

দেবীসিংহের উৎপীড়ন (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী)

"কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার ঢিং॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন॥
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল॥
কত যে খাজনা পাইবে তার লেখা নাই।
যত পাবে তত নেয় আরো বলে চাই॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইয়ের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল॥

—দেবীসিংহের উৎপীড়ন।

(ঘ) দার্শনিক সাহিত্য

(১) **মায়াতিমির-চন্দ্রিকা**— এই গ্রন্থের প্রণেতা রামগতি সেন (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী)। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অবৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে যোগশাস্ত্রের কথা রূপকের ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের অনুকরণে রচিত।

(২) **যোগ-সার**—গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় যোগশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। ইহার লেখক স্বীয় নামের স্থানে গুণরাজ খান লিখিয়াছেন। ইনি মালাধর বসু নহেন। গ্রন্থকার শচীপতি মজুমদার নামক এক ধনী ব্যক্তির আদেশে "যোগ-সার" গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের সময় জানা নাই।

(৩) **হাড়মালা**—ইহাও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম ও সময় জানিতে পারা যায় নাই।

(৪) **জ্ঞানপ্রদীপ**—জ্ঞানপ্রদীপে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে এবং শিবকে যোগশাস্ত্রের দেবতা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। অথচ এই গ্রন্থের প্রণেতা একজন মুসলমান। তাঁহার নাম সৈয়দ সুলতান। কবি সৈয়দ সুলতান মুসলমান ফকির সাহ হোসেনের শিষ্য ছিলেন।

(৫) **তনুসাধনা**—যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অপর গ্রন্থ। ইহারও রচনাকারী হিন্দুশাস্ত্রে গভীর বিশ্বাসী জনৈক অজ্ঞাতনামা মুসলমান। গ্রন্থখানিতে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) **জ্ঞানচৌতিশা**—যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যাপূর্ণ এই গ্রন্থখানির প্রণেতার নাম সৈয়দ সুলতান। মুসলমান কবি হইয়াও তিনি শিব ও শক্তির প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি রচনার তারিখ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ।

মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা মারফৎ যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথির তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুথির নাম আছে। পুথিগুলির সময় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত।

(ঙ) মুসলমান রচিত সাহিত্য[১]

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলমানগণও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দ্দু ও ফার্শী ভাষা মিশ্রিত

(১) মুন্সী আবদুল করিম সংগৃহীত এবং কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মুসলমান কবি ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য। মোহাম্মদ আসরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন কর্ত্তৃক রচিত "সিলেটের নাগরী সাহিত্য ও তাহার প্রভাব" নামক প্রবন্ধ (শ্রীহট্ট সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪০ বাং) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালায় মুসলমান লেখকগণ যে সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যাও অনেক। এই বাঙ্গালাকে "মুসলমানি বাঙ্গালা" বলে এবং বর্ত্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। খাঁটি বাঙ্গালায় তাঁহারা যে সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় নিম্নে দিতেছি। এই গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই সুরমা উপত্যকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিবাসী। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাবহেতু অনেক মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। অনেক মুসলমান কবি সংস্কৃত শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি আলোয়াল তাঁহার অন্যতম প্রধান উদাহরণ। সম্ভবতঃ অনেক মুসলমান কবির পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন বলিয়াও এইরূপ হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবপূর্ণ রচনা সম্ভব হইয়াছিল।

রূপকথা ও গীতিকথা[১]

	পুথি	লেখক
১।	চন্দ্রাবলীর পুথি	মুন্সী মহাম্মদ আবেদ
২।	মধুমালার কেচ্ছা	খোন্দকার জাবেদ আলি
৩।	মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা	মুন্সী আয়জদ্দিন
৪।	জরাসুরার পুথি	মুন্সী এনাতুল্লা সরকার
৫।	সতী বিবির কেচ্ছা	মুন্সী আয়জদ্দিন
৬।	মালতিকুসুমমালা	মহাম্মদ মুন্সী
৭।	কাঞ্চনমালার কেচ্ছা	মুন্সী মহাম্মদ
৮।	সখীসোণা	মহম্মদ কোরবান আলি
৯।	যামিনী ভান	মহাম্মদ খাতের মরহুম
১০।	ইন্দ্রসভা	মুন্সী আমানত মরহুম
১১।	শীত-বসন্তের পুথি	মুন্সী গোলাম কাদের
১২।	সাপের মন্তর	মীর খোররম আলী
১৩।	ভেলুয়াসুন্দরী	হামিদুল্লা
১৪।	জামিল দিলারাম	আপ্তাবুদ্দিন

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিসূচক নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশ চন্দ্র সেন), পৃ ৭০।

"বহু প্রাচীন ফার্শীতে বিরচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি, উহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উর্দ্দু ভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন। মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস-নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুস্থানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল। রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্ম্মের ছবক্ শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মিরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপ মোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্নী দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ মন্দিরে ভোগ দিতেন। উত্তরপশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন। অর্দ্ধশতাব্দী হইল, ত্রিপুরায় মুজা হুসেন আলি নামক জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়ীতে কালীপূজা করিতেন এবং ঢাকায় গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি। মুসলমানগণের "গোপী", "চাঁদ" প্রভৃতি হিন্দু নাম ও হিন্দুদিগের মুসলমানী নাম অনেকস্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার-ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার ভেলুয়া সুন্দরীর কাব্যে বর্ণিত আছে, লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্ব্বে "বেদপ্রায়" পিতৃবাক্য মান্য করিয়া "আল্লার নাম" লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবুদ্দিন তাঁহার "জামিল দিলারাম" কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্তঋষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে "লক্ষ্মণের চন্দ্রকলা", "রামচন্দ্রের সীতা", "বিদ্যাধরী চিত্ররেখা" ও বিক্রমাদিত্যের "ভানুমতীর" সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন; হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি। এই সময় নায়ক-নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উর্দ্দু ও ফার্শী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল; এই সব পুস্তকে প্রায়ই

দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্ত্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে।"

—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৯১ — ৪৯২ (৬ষ্ঠ সং)।

মুসলমান সাহিত্যিকগণ যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতিপয় গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মুসলমান লেখকগণ রচিত অপর কতিপয় গ্রন্থের নামও নিম্নে দেওয়া গেল।

১। যামিনী-বহাল—করিমুল্লা (নিবাস সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম জেলা, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে মুসলমান নায়িকার শিব ঠাকুরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন আছে।)

২। ইমাম যাত্রার পুথি (?)—মুসলমান গ্রন্থকার সরস্বতী বন্দনা করিয়াছেন।

৩। রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী —করমালী

৪। রাগমালা—(?) —(সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ। রাগরাগিণী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।)

৫। তালনামা—(?)—সঙ্গীত শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ বহু হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতবিদের নাম ও গান ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

৬। সৃষ্টি-পত্তন—(?)—ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের গ্রন্থ।

৭। ধ্যানমালা — অলিরাজ (সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে রচিত)

৮। রাগ-তালের পুথি—জীবন আলি ও রামতনু আচার্য্য (সংগ্রহ গ্রন্থ)।

৯। রাগ-তাল—চম্পা গাজী

১০। পদ-সংগ্রহ—সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। লালবেগ রচিত গানের সংখ্যা বেশী।

১১। জুবিয়া —(?)—সঙ্গীত-সংগ্রহ গ্রন্থ। মুসলমান সমাজে বিবাহের গানসমূহ।

গল্পগ্রন্থ

১২। লোর চন্দ্রানী— দৌলত কাজী (অসম্পূর্ণ গ্রন্থ—কবি আলোয়াল সম্পূর্ণ করেন।)

১৩। সপ্তপয়কর—কবি আলোয়াল

১৪। রজমালা—কবির মহম্মদ

১৫। রিজোয়া সাহা—সমসের আলী

১৬। ভাব-লাভ—সামসুদ্দিন সিদ্দিক

১৭। ইউসুফ-জেলেখা—ফার্শী গল্পের অনুবাদ। অনুবাদক—আব্দুল হাকিম।

১৮। লায়লী-মজনু—প্রসিদ্ধ ফার্শী গল্পের অনুবাদ। অনুবাদক—দৌলত উজির বাহরাম।

১৯। যামিন-জেলাল—প্রেম-কাহিনী। রচনা—মহম্মদ আকবর।

২০। চৈতন্য-সিলাল—প্রেম-কাহিনী। রচনা—মহম্মদ আকবর।

(চ) সহজিয়া-সাহিত্য

সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের বিশেষ মত প্রচার করিবার জন্য কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবগণের মতের মূলে রাগানুগা প্রেম রহিয়াছে। পরকীয়াতত্ত্ব এই রাগানুগা প্রেমের উপর নির্ভরশীল। চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, রূপ, সনাতন, স্বরূপদামোদর প্রমুখ বৈষ্ণবপ্রধানগণ এই বিশেষ মত প্রচার করিয়া সহজিয়া মত প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মতবাদ প্রচারে সহজিয়াগণ বিশেষ অর্থবোধক কতকগুলি শব্দ ও রহস্যময় ভাষা অবলম্বন করাতে ইঁহাদের ভাষা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। নাথপন্থী সাহিত্যে এই ভাষার তুলনা পাওয়া যায়। সহজিয়াদের "সহজ" মত বড়ই কঠিন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিল। যৌন-সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল এই মত উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনা এবং নিম্নস্তরের বীভৎস ক্রিয়াকাণ্ড এতদুভয়েরই জন্মদাতা। তান্ত্রিক মতের সহিত সহজিয়া মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় সমাজেই সহজিয়া সম্প্রদায় ছিল। অনুসন্ধান করিলে বৈদিক যুগেরও পূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে এই মতাবলম্বীগণের সন্ধান মিলিতে পারে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ হইতে বৈষ্ণব সহজিয়াগণের উদ্ভব কল্পনা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। উভয় সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। সহজিয়া সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনারই সন্ধান পাওয়া যায়, তবে পদ্যে রচনাই বেশী। প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে সহজিয়া গদ্যসাহিত্যের মূল্য আছে। উহা পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে গদ্যসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান যাইবে। এই গদ্যসাহিত্যে সহজিয়া মতও বেশ সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। তাহাতে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—উহা সহজিয়া মত বেদ-বিরোধী। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা সহজিয়ার

"জ্ঞানাদি সাধনা" নামে পদ্যে রচিত একটি পুথিতে সহজিয়া মত প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বেদ-বিরোধী মত এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা,—

"অতএব বুঝিলাম অত্যজাত বালকের ঐ চতুর্দ্দশ কর্ম্মের শ্রীগুরুস্থানে শিক্ষা নাই। পরে জম্বুদ্বীপাদির অনিত্যদেশের লোক সেই নিত্যদেশের নিত্যকর্ম্মাদি পাসরণ করাইয়া পরে অনিত্য জম্বুদ্বীপের অনিত্য আহার আদি করাইয়া পরে অনিত্য লোকের অনিত্য ব্যবহারাদি শিক্ষা করাইয়া পরে অনিত্য বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা করাএন।" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে "পরকীয়া" মতের প্রাধান্যজ্ঞাপক কতিপয় প্রাচীন দলিলও (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন এবং "পরকীয়া" মত-সংস্থাপক হিসাবে মূল্যবান।

১। নরেশ্বর দাসের চম্পক-কলিকা

নরেশ্বর দাস সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রাপ্ত পুথির তারিখ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরূপ কর্ত্তৃক শ্রীসনাতনকে সহজতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন।

"গোবর্দ্ধনে প্রণাম করি বসিলা দুই ভাই।
সেই স্থানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীরূপ গোসাঞি॥
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
কহত নিত্যের কথা করিএ শ্রবণ॥
কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপর।
কাঁহা হৈতে উদ্ভব হয় কহত সকল॥
কোন বর্ণ হএ সেই কিসের গঠন।
চন্দ্র-সূর্য্য-গতি তথা নাহি কি কারণ॥
পবনের গতি নাই মনের গোচর।
কোন রূপে পাই তাহা কহ নরেশ্বর॥
আর এক নিবেদন শুন সুবচন।
তবে বীজ কয় কোষ কিসের পতন॥
শ্রীমন্দির কিসে হইল নিরমাণ।
শুনিতে চাহিএ কিছু ইহার সন্ধান॥

কোন থাকিঞা হইল তাহার নির্ম্মাণ।
কতখানি দীর্ঘপ্রস্থ কহত প্রমাণ॥
কাঁহা হৈতে জীব আইসে কার গতাগতি।
সে জন কে হয় কোথা কহ তার স্থিতি॥
কিশোর কিশোরী আদি অষ্ট সপুজন।
কোথা হৈতে উদ্ভব হয় কহত কারণ॥
এ সকল উদ্ভব যাহা হৈতে হয়।
কিবা নাম তাহার কহত মহাশয়॥
কোন মূর্ত্তি ধরিঞা আছিল কোন স্থানে।
কৃপা করি কহ বল শুনিএ শ্রবণে॥"

—চম্পক-কলিকা, মহেশ্বর দাস।

২। অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্ত-বিলাস

কবি অকিঞ্চন দাসের "বিবর্ত্ত-বিলাস" সহজিয়া মতের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। এই কবির অপর রচনা "ভক্তিরসাত্মিকা" নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ। অকিঞ্চন দাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় অকিঞ্চন দাস নিজ পরিচয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহা মানিয়া লইলে, তাঁহাকে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর ব্যক্তি (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে) মনে না করিয়া খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অকিঞ্চন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোসাই।
মোর বাঞ্ছা পুরাইতে তোমা বিনে নাই॥
এই গ্রন্থে কর গোসাঞি কৃপাবলোকনে।
রূপাশ্রয় বিনে যেন কেহ নাহি জানে॥
বস্তুনিষ্ঠা বিনে যেন কেহ বুঝে নাই।
কৃপা এই গ্রন্থে করহ গোসাঞি॥" ইত্যাদি।

—বিবর্ত্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

অকিঞ্চন দাস শুধু কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রতিই ভক্তি ও আনুগত্য জানান নাই। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ (দাস?)

গোস্বামী এবং বংশীবদন ঠাকুরের প্রতিও যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছেন। যথা,—

(ক) "শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ।
অকিঞ্চন দাসে কহে বিবর্ত্ত-বিলাস॥"

—বিবর্ত্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

(খ) "ঠাকুর শ্রীরামের কনিষ্ঠ সহোদর।
প্রিয় শিষ্য মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরীর॥
ঠাকুর সে বংশীবদন তার নাম।
রূপাশ্রয় ধর্ম্ম যেহ করিল বর্ণন॥
বস্তুপদ কৈল তেঁহ অনির্ব্বচনীয়ে।
বলরাম চন্দ্র বৈসে যাহার হৃদয়ে॥
হেন বংশীর পাদপদ্মে মোর হউক আশ।
জন্মে জন্মে তার ধর্ম্মে করিয়া বিশ্বাস॥"

—বিবর্ত্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

অকিঞ্চন দাসের উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে অনুমান হয় যে কবি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয় জন গোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। অকিঞ্চন দাস পরকীয়া মতে বিশ্বাসী ও ঘোর সহজিয়া ছিলেন মনে হয়। ইহার ফলে তিনি গোপীভাবে ভজনার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার মতের সমর্থনে কবি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব প্রধানগণের প্রত্যেকের সহিত এক একটি নারীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নারী বা "মঞ্জরী" সহজিয়া সাধনার প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণবাগ্রগণ্যগণের বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শের ভয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ "কর্ত্তাভজা"দলের কোন ভণ্ড ও বিদ্রোহী ব্যক্তির ইহা কুকীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। সহজিয়া মতের গ্রন্থসমূহে অপকৃষ্ট তান্ত্রিক মতের অনুরূপ অনেক জঘন্য ও বীভৎস ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ আছে। "বিবর্ত্ত-বিলাস" এই শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কৃষ্ণদাস বিরচিত "পাষণ্ড-দলন", রামচন্দ্র কবিরাজ রচিত "স্মরণ-দর্পণ" এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় "চৈতন্য-ভাগবত"কার বৃন্দাবন দাসের "গোপীকা-মোহন" কাব্য এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যাহা হউক অকিঞ্চন দাসের নিম্নলিখিত রচনা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

নায়িকা (মঞ্জরী) বিবরণ।

"শ্রীরূপ করিলা সাধন মিরার-সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণবাই সাথে॥

লক্ষ্মীহীরা সনে করিলা গোঁসাই সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমে সেবা সদা আচরণ॥
গোসাঞি লোকনাথ চণ্ডালিনী-কন্যা সঙ্গে।
দোহজন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে রঙ্গদেবী সম।
গোসাঞি কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ॥
শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোসাই।
পরম সে ভাব কৈলা যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী পীরিতি উল্লাসে।
মিরাবাই সঙ্গে তেহ রাধাকুণ্ড বাসে॥
গৌরপ্রিয়া-সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন অন্য কিছু নাই॥
রায় রামানন্দ যজ্ঞে দেবকন্যা-সঙ্গে। (দেবকন্যা অর্থাৎ দেবদাসী)
আরোপেতে স্থিতি তেহ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥" ইত্যাদি।

—বিবর্ত্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

"বিবর্ত্ত-বিলাসে" সহজিয়া মতের নমুনা এইরূপ :—

(ক) বাহ্য পরকীয়া এবে শুন ওহে মন।
অগ্নি-কুণ্ড বিনে নহে দুগ্ধ-আবর্ত্তন॥
প্রকৃতির সঙ্গে সেই অগ্নি-কুণ্ড আছে।
অতএব গোস্বামীরা তাহা যজিয়াছে॥
এবে কহি শুন সেই নায়িকার মন।
সামর্থা রতির যেই হয় মহাজন॥
গোস্বামীরা পরকীয়া বিচার করিয়া।
গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া॥
সে সব নায়িকা-পদে মোর নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥"

—বিবর্ত্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

(খ) "দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥

তাহা দুই লয়ে রয় নিভৃত উত্থানে।
কোন্ জন জানে ক্ষুদ্র কাঁহা তার মনে॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।" ইত্যাদি।

(চৈঃ চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত)

* * *

"এসব নায়িকাগণ পরম সুন্দরী।
আকার স্বভাবে যেন ব্রজদেবী-নারী॥"

—বিবর্ত্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

(গ) "রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বহুজনে।
আমারে বুঝাও আশ্রয় হইলা কেমনে॥
অপ্রাকৃত রূপ সে প্রাকৃত কভু নয়।
প্রাকৃত শরীর-রূপ কেমনে মিলয়॥
ধ্যান মন্ত্রেতে নাই কেমনে মিলে তারে।
যদি অনুরাগ হয় গুরু অনুসারে॥
তবে যে কহিয়ে কিছু রূপের মহিমা।
আশ্রয়-তত্ত্ব-সিদ্ধ হয় করিলাম সীমা॥
আশ্রয়-তত্ত্ব-সিদ্ধি অতি দুর্লভ হয়।
স্থানে স্থানে মহাজনে এই কথা কয়॥
রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বংশীদাসে।
রসিকের কৃপা না হইলে রূপ পাবে কিসে॥
নতুবা হারাবে ভাই আপনার ধন।
মহৎ-কৃপা বিনে নহে ঐছে আচরণ॥
বেদ-শাস্ত্র পুরাণেতে স্ত্রী-সঙ্গ বারণ।
কেমনে বা বারণ ইহা বুঝি বিবরণ॥
বৈরাগ্যের ধর্ম্ম যায় স্ত্রী-সঙ্গ করিতে।
গোস্বামীরা বারণ করিয়াছে বহু গ্রন্থে॥"

—বিবর্ত্ত বিলাস, অকিঞ্চন দাস।

৩। রাধাবল্লভ দাসের সহজ-তত্ত্ব

সহজিয়া কবি রাধাবল্লভ দাস সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুথির তারিখ ১২৩০ বাং সাল (১৮২২ খৃষ্টাব্দ) সুতরাং কবি রাধাবল্লভ অন্ততঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন অনুমান

করা যাইতে পারে এবং তাঁহার রচিত "সহজ-তত্ত্ব" সম্ভবতঃ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ রহস্যপূর্ণ। এই রহস্য বা প্রহেলিকা ভেদ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অতি কঠিন। "সহজ-তত্ত্ব" গ্রন্থ গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রীতিতেই রচিত। প্রাচীন গদ্যের নমুনা এই গ্রন্থের অপর বৈশিষ্ট্য। গদ্য সরল হইলেও অর্থভেদ করা দুরূহ। যথা,—

শ্রীবৃন্দাবন-পরিচয়।

"শ্রীবৃন্দাবন কারে বলি। বৃন্দাবন তিন মত প্রকার হন। কি কি। নব-বৃন্দাবন এক ।১। মন-বৃন্দাবন ।২। নিত্য-বৃন্দাবন ।৩। কেমন স্থানে নব-বৃন্দাবন। লীলা-বৃন্দাবন কারে বলি। ইহার অধিকারী গোলকনাথে বলি। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান নিত্য-বৃন্দাবন কারে বলি। নিত্য-স্থান কোথা। ব্রহ্মা বিষ্ণু অগোচর। নিত্য রাধাকৃষ্ণ বিরাজমান। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড মধুর। ইহাকে নিত্য-বৃন্দাবন বলি। মন-বৃন্দাবন কারে বলি। সাধকের মন কৃষ্ণ-ভক্তি। দুএ একতা প্রীতি হইয়া সাধন করে। সেই মন-বৃন্দাবন বলি। ইহাঁর অধিকারী ভক্ত। সেখানে এখানে। একই রূপ হয়। প্রবর্ত্ত দেহেতে কায়িক বাচিক মানসিক কারে বলি। কায়াটি কায়মনোবাক্যে। বাচিক অমুক ঠাকুরে শিক্ষা। মানসিক নিত্যসিদ্ধা। মুকুন্দাবন্তের আশ্রয়। অমুক মঞ্জরী। সিদ্ধ দেহেতে কায়িক বাচিক মানসিক কারে বলি। কায়াটি শ্রীরূপ মঞ্জরীগত। বাচিক অমঞ্জরী। উচ্চারণ হাকাহাকি। মানসিক নীতি নবকিশোর। এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি আদি সম্ভোগ করে। এবং প্রবর্ত্ত দেহেতে গুরুসঙ্গে সম্বন্ধ কি। সেব্য সেবক আপনাকে দাস অভিমান। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণপতি। বৈষ্ণব-সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেমের গুরু সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণের ভাব। আপনি এমনি ভাব করিবে বৈষ্ণব সঙ্গে। এবং সাধক দেহেতে গুরুকে শিক্ষাগুরু মংরূপা। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। বন্ধুতা সম্বন্ধ। ভাব কি। পরকীয়া ভাব। সিদ্ধ দেহে গুরু কে হন। শ্রীরূপ মঞ্জরী। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেম-সখী। শ্রীমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণ-প্যারী। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণ-নাথ। ইতি প্রবর্ত্ত-লক্ষণ॥"

—সহজ-তত্ত্ব, রাধাবল্লভ দাস।

কবি রাধাবল্লভ দাস জীবদেহে পদ্মসমূহের কল্পনা করিয়া ইহার নিম্নরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—

"পাদপদ্ম উরুপদ্ম নাভিপদ্ম হৃদিপদ্ম দুই কহি শুন।
হস্তপদ্ম মুখপদ্ম কহি বিবরণ॥

ব্রহ্মপদ্ম ব্রহ্ম কোপনে তার অনুবাদ নেত্রপদ্ম।
শরীর মধ্যে সহস্র পদ্ম দেখহ বিচারি॥
ব্রহ্ম কোপনে পরম আত্মার স্থান রত্ন-পালঙ্কে শয়ন।
দুই শত পদ্ম পালঙ্কোপরি স্থান॥
চারি খোরায়ে একশত পদ্ম মস্তক শিয়রে এক শত।
হৃদিমাঝে পদ্মিনী বাস।
তার পালঙ্কে দুই পদ্ম শয়ন বিলাস॥
তাহার দুই পদ্ম পালঙ্কে বিশ্রাম।
দুই নেত্রে দুইশত পদ্মে রাধাকৃষ্ণের বিশ্রাম॥
বামে রাধা ডাহিনে কৃষ্ণ দেখহ রসিকজন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ভিতরে নাই নাহিক দুইজন॥
দুই নেত্রে বিরাজমান রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই নেত্রে হয়।
সজল নয়নদ্বারে ভাবে প্রেমে আস্বাদয়॥"

—সহজ-তত্ত্ব, রাধাবল্লভ দাস।

(৪) চৈতন্য দাসের রসভক্তি-চন্দ্রিকা
(বা আশ্রয়-নির্ণয়)

সহজিয়া কবি চৈতন্যদাস খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। ইহা ঠিক হইলে ইনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ বংশীবদনের (খৃঃ ১৫শ-১৬শ শতাব্দী) জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাস (পদকর্তা) নহেন। সহজিয়া চৈতন্যদাস কৃত গ্রন্থের নাম "রসভক্তি-চন্দ্রিকা" বা "আশ্রয়-নির্ণয়"। এই কবি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানা নাই।

আশ্রয় কথন।

"আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নাম আশ্রয় ১, শাস্ত্র আশ্রয় ২, ভাব আশ্রয় ৩, প্রেমাশ্রয় ৪, রসাশ্রয় ৫—এই পঞ্চপ্রকার।"

"তথাহি চন্দ্রিকায়াং।"—

"আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
এমন আশ্রয় হয় শুন সুভাজন॥
এইত আশ্রয় হয় পঞ্চপ্রকার।
ক্রমে ক্রমে কহি এবে করিয়া বিস্তার॥

এই পঞ্চ মত আশ্রয় নির্ণয়।
প্রবর্ত্ত সাধকসিদ্ধ তথি সঙ্গে হয়॥
প্রবর্ত্তের নামাশ্রয় শাস্ত্রাশ্রয় হয়।
সাধকের ভাবাশ্রয় জানিহ নিশ্চয়॥
সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর।
সাশ্রয় নির্ণয় এই ত পঞ্চপ্রকার॥
প্রবর্ত্তের আশ্রয় হয় শ্রীগুরু-চরণ।
আলম্বন সাধু-সঙ্গ জানিহ কারণ॥
উদ্দীপন হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
এইত কহিল কিছু প্রবর্ত্ত-লক্ষণ॥
সাধকের আশ্রয় হয় সখীর চরণ।
সেবা পরিচর্য্যা তার হয় আলম্বন॥
উদ্দীপন হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
সিদ্ধদেহ চিন্তা করে স্মরণ মনন॥" ইত্যাদি।

—রসভক্তি-চন্দ্রিকা, চৈতন্য দাস।

এই গ্রন্থে গদ্যেও কিছু সহজমত প্রচার করা হইয়াছে। যথা,—

দশ দশা।

"এই দশ দশা শ্রীমতীর কি করে হয়। পূর্ব্বরাগ হৈতে এই দশ দশা। মাথুরের দশ দশা। পূর্ব্বরাগ লালসা হইতে দশ দশা। সাধকের তিন দশা। অন্তর্দশা। অর্দ্ধব্যগ্রদশা। কেবল ব্যগ্রদশা। ক্রিয়া কি।"

"অন্তর্দশায় করে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
অর্দ্ধব্যগ্রদশায় করে প্রলাপ বর্ণন॥
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর ব্যগ্রজ্ঞান।
সেই দশা হৈতে উক্ত অর্দ্ধব্যগ্রনাম॥
ব্যগ্রদশায় করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
এই তিন দশা কৃষ্ণের পঞ্চগুণ॥"

"শব্দগুণ ১। গন্ধগুণ ২। রসগুণ ৩। রূপগুণ ৪। স্পর্শগুণ ৫। বর্ত্তে কোথা। শব্দগুণ কর্ণে। গন্ধগুণ নাসিকাতে। রূপগুণ নেত্রে। রসগুণ অধরে। স্পর্শগুণ অঙ্গে। বাণ পঞ্চপ্রকার। মদন মাদন শোষণ স্তম্ভন

মোহন। বর্ত্তে কোথা। মদন বর্ত্তে দক্ষিণ চক্ষুর দক্ষিণ কোণে। মাদন বর্ত্তে বাম চক্ষুর বাম কোণে। শোষণ কটাক্ষে।" ইত্যাদি।

—রসভক্তি-চন্দ্রিকা, চৈতন্যদাস।

(৫) যুগলকিশোর দাসের প্রেম-বিলাস

"প্রেম-বিলাস" নামে দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের প্রথমখানি প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস বিরচিত বৈষ্ণব চরিতাখ্যান, অপরটি কবি যুগলকিশোর দাস রচিত সহজিয়া সাহিত্য। যুগলকিশোর দাস সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর কোন সহজিয়া কবি। তাঁহার পরিচয় অজ্ঞাত। প্রাপ্ত পুথিখানি দেখিয়া মনে হয় তিনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের এক "মঞ্জরী"র নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম শ্রীস্নেহ।

সহজিয়া মত ও আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

"এই যে সহজ-বস্তু সহজ তার গতি।
সতত আছএ সেই তিন দ্বারে স্থিতি॥
বহিঃপ্রবেশ আর গতায়াত-দ্বারে।
নারী-পুরুষরূপে সতত বিহরে॥
এথে কাম কামিনীর যদি হয় সঙ্গ।
নিজ-সুখ-বাঞ্ছা দেহে হয় এই অঙ্গ॥
ইহাতে রময়ে যদি বীজাঙ্কুর কাম।
তাহাতে বাঢ়য়ে বৃক্ষ হয় বলবান॥
তৃতীয় শাখায় বৃক্ষ হয় প্রফুল্লিত।
পল্লব ষষ্ঠম তাথে হয় সুনিশ্চিত॥
দ্বিতীয় পল্লব-মধ্যে পুষ্প নিকশয়।
পঞ্চদশ অক্ষর নামে মধু তাথে হয়॥
দুঃখ আর সুখ দুই তাথে ফলাফল।
বুঝিবে রসিকভক্ত অঙ্গের বিরল॥
সেই ফল-ভক্ষণেতে দগ্ধ হয় দেহ।
তাথে বোধ নাহি হয় মত্ত রহে সেহ॥
ইশা বিমশা দুই ফলে হয় রস।
সেই রস পান করি জীব হয় বশ॥

এই রসের সেই ধাতু সেই পাক হয়।
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত ভ্রমণ করয়॥
গুরু-কৃপা হৈলে তবে হয় দিব্যজ্ঞান।
কৃষ্ণদাস হৈলে তার হয় পরিত্রাণ॥
মায়া পিশাচী তার পলাইবে দূরে।
শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তি তার হয় দিগোচরে॥
সেই বস্তু অভাবেতে গন্ধ হয় দেহ।
তাতে বোধ হৈলে বুঝি গুরু-অনুগ্রহ॥
কোন্ অবলম্বে জীব জন্মে আর মরে।
কোন্ অবলম্বে জীব নানা যোনি ফিরে॥
কোন্ অবলম্বে জীব দুঃখ শোক ভোগে।
কোন্ অবলম্বে দেহ মৃত্যু কোন্ রোগে॥
এই উপদেশ যদি গুরু-স্থানে পাই।
নিতান্ত জানিহ তবে সংসার এড়াই॥
যুগলকিশোর দাস ভাবএ অন্তরে।
কি বেচিব কি কিনিব অর্থ নাহি ঘরে॥
শ্রীস্নেহ-মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল আত্ম-তত্ত্বের বিধান॥"

—প্রেম-বিলাস, যুগলকিশোর দাস।

(৬) রাধারস কারিকা

"রাধারস-কারিকার" রচনাকারী কে তাহা জানা নাই। এই খণ্ডিত পুথির যে সামান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোন নাম পাওয়া না গেলেও মনে হয় এই গ্রন্থখানিরও প্রণেতা যুগলকিশোর দাস এবং রচনার কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দী।

সাধ্যভাব।

"তবে বন্দো বৈষ্ণব রসিক যার হিয়া।
বিকাইনু কিন মোরে পদরেণু দিয়া॥
শ্রীরূপ-সনাতন গোঁসাই-চরণ করি আশ।
রাধারস-কারিকা ইবে করিয়ে প্রকাশ॥

যাহা হইতে কৃষ্ণাশ্রয় ভগবান্ হয়।
সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিবে নিশ্চয়॥
রাধাভজে রাধা কৃষ্ণময় পায়্যা।
জ্ঞানকাণ্ড জপ তপ দূরে তেআগিয়া॥
কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠা হয় কৃষ্ণগুণে।
তবে কেন নাহি পায় ব্রজে সিদ্ধজনে॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে অনুগত বিনে।
মন্ত্রে যৈছে প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে॥
কিবা ভজে কিবা যজে সিদ্ধি কিবা হয়।
সাধক সাধিকা কিবা করিয়া নিশ্চয়॥
তবে সাধ্যভাব সাধন নিশ্চয়।
তার অনুগতে কার্য্য যেই জনা কয়॥
কৃষ্ণদাস হইয়া কিন্তু আশা যদি করে।
সাধ্য করি কৃষ্ণ পায় কোন অনুসারে॥"

রাধারস-কারিকা।

(৭) সহজউপাসনা-তত্ত্ব

এই গ্রন্থখানির প্রণেতার নাম অজ্ঞাত। সাধকের মনকে সাংসারিক বাসনা-কামনা হইতে ক্রমে উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া নির্ম্মল করিতে হইবে। এই কথাটি বুঝাইতে সহজিয়া কবি সাধারণ ইক্ষুরসকে নির্ম্মল করিয়া মিসৌতামিশ্রি তৈয়ার করার পন্থার সহিত প্রকৃত সহজিয়ার মনের ক্রমিক উন্নতির তুলনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সৌতামিশ্রি তৈয়ারির প্রণালীও ইহাতে জানা যায়। গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর রচনা।

সহজ-সাধনের ক্রমিক স্তর।
(সৌতামিশ্রি প্রস্তুতের সহিত তুলনা)

"দেখ যেন ইক্ষুরস দ্রব্যের সমান।
অনলের জোগে দেখ হয় বর্ণ আন॥
দেখ জেন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করি।
অগ্নী আবর্ত্তন করে অতি যত্ন করি॥
অনলের জোগেতে বিরাগ যে উঠয়।
বিরাগ নির্ম্মল হঁএ রজগুড় হয়॥

সেই গুড় মোদকেতে পুন লৈয়া জায়।
গাঞ্জ জোগ দিয়া পুন বিকার ঘুচায়॥
গাঞ্জ জোগ শাঙ্গ হৈলে ভুরা তার নাম।
ষুর্য্যাগ্নীতে পুনরোপী করএ ষুখান॥
অনলে চাপায় পুন দিএ দুগ্ধ জোগ।
নির্ম্মলতা হয় তার জায় গাদ রোগ॥
ষুক্রবর্ণ হয় রস নাম তার চিনী।
তত্তপর ভিআনেতে ওলালাও্খানি॥
পুন দুগ্ধ জোগ দিএ তাহার ভিয়ান।
অখণ্ড লড্ডুকা হয় মিশ্রী তার নাম॥
তারপর দুগ্ধ জোগে ভিয়ান করয়।
সীতামিশ্রী নাম তার নিব্বিঘ্নতা হয়।
অখণ্ড মধুর রস সীতামিশ্রী নাম।
হেমবর্ণ্য বরিষন হয় অবিরাম॥"

সহজ উপাসনা-তত্ত্ব।[১]

উল্লিখিত সহজিয়া গ্রন্থসমূহ ভিন্ন আরও বহু সহজিয়া পুথি রহিয়াছে। তন্মধ্যে বস্তু-তত্ত্ব, অমৃতরত্নাবলী (মুকুন্দদাস), অমৃতরসাবলী (অজ্ঞাত লেখক), কৃষ্ণদাস রচিত আশ্রয় নির্ণয় (পুথি ১০৯৮ বাং সন), ত্রিগুণাত্মিকা (পুথি ১১১২ বাং সন), দেহকড়চা (সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩০৪ বাং সন), দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ দ্বাদশ পাটনির্ণয় (নীলাচল দাস), প্রকাশু-নির্ণয় (পুথি ১১৫৮ বাং সন) ও সাধন-কথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য)।

---

(১) মৎপ্রণীত Aspects of Bengali Society : Culinary Art, দ্রষ্টব্য।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

জনসাহিত্য

(১) গান ও কথকতা (২) গীতিকা

(১) গান

(ক) নানাবিষয়ক গান (পারমার্থিক ও অন্যান্য গান)

(খ) কবি-গান (শাক্ত ও বৈষ্ণব)

(গ) যাত্রা গান

(ঘ) কীর্ত্তন-গান

(ঙ) কথকতা

(চ) উদ্ভট কবিতা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালী জনসাধারণের দান সামান্য নহে। এই জনসাধারণের অনেকেই বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি। মুসলমান সমাজের দানও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কতিপয় হিন্দু-নারীর সাহিত্যিক দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সাহিত্য প্রধানতঃ গান। এই গানগুলি বিষয়বস্তু হিসাবে প্রধানতঃ তিন ভাগ করা চলে। যথা, নানাবিষয়ক গান, শাক্তগান ও বৈষ্ণব গীতি। গান ভিন্ন আর এক শ্রেণীর সাহিত্যও ইহার অন্তর্গত। ইহা "গীতিকা" সাহিত্য। "গীতিকা" সাহিত্য গীত হইলেও সরল অর্থে "গীত" বা "গান" বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা হইতে বিভিন্ন ও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। এক হিসাবে মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন ও বৈষ্ণবপদাবলী প্রমুখ প্রায় সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যই গীত হইত। অথচ এই সকল সাহিত্য সাধারণ গান হইতে যেরূপ বিভিন্ন, "গীতিকা" সাহিত্যও তদ্রূপ বিভিন্ন। "গীতিকা" সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পরে আলোচনা করা যাইবে। নানাবিষয়ক গান সাধারণতঃ পারমার্থিক ও মানুষী প্রেম বা ভালবাসা বিষয়ে রচিত হইত। শাক্ত ও বৈষ্ণব গান গাহিবার জন্য কবিগান, যাত্রাগান ও কীর্ত্তনগানের দল গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার মধ্যযুগের প্রাচীন গানগুলির মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে রহিয়াছে। এই গানগুলি তান্ত্রিক দেহতত্ত্ব এবং বৈদান্তিক মায়াবাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এই দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা সংস্কৃত পুরাণাদি দ্বারা যথেষ্ট

প্রভাবিত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রের মূল কথাগুলি সাধারণতঃ "কথক" নামক একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ও প্রচার সাহায্যে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলকেই প্রভাবিত করিয়াছিলেন। এইরূপে উচ্চ শ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর স্ত্রী পুরুষও রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের সমস্ত কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইত। মঙ্গল-কাব্যসমূহের বিষয়বস্তু, ব্রতকথা এবং পাঁচালী গানের ভিতর দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকই ধর্ম্মবিষয়ক নানা কাহিনী জানিবার সুযোগ লাভ করিত। ইহার ফলে তাহাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক মানদণ্ড নির্দ্ধারিত হইত এবং জীবনের আদর্শ স্থিরীকৃত হইত। উল্লিখিত নানাভাবে হিন্দুশাস্ত্র প্রচারের ফলে ধর্ম্মজনিত শিক্ষা হইতে হিন্দুসমাজের কেহই বঞ্চিত হইত না। এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ফলে ব্রাহ্মণ হইতে মুচি পর্য্যন্ত সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যে যে জাগরণ দেখা গিয়াছিল তাহারই সুফল "গান" ও "গীতিকা" সাহিত্য। এই সাহিত্যের রচনাকারীর মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ব্যক্তিও যেমন আছে মুচির ন্যায় নিম্নশ্রেণীর কবিও তেমনই আছে। এই সাহিত্য সৃজনে পুরুষও আছে, স্ত্রীলোকও আছে। এই সাহিত্য সার্ব্বজনীন-গুণসম্পন্ন, অনাড়ম্বর ও সরল মনের অভিব্যক্তি। ইহাতে ভক্তের প্রাণের কথা ভাব-মধুর সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সাহিত্য আন্তরিকতাপূর্ণ ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আনন্দদায়ক।

এই গানগুলির একটি প্রধান ভাগ "কবি-গান"। সাধারণের আনন্দ-দায়ক "পাঁচালী" গানের পর কবি-গানের উদ্ভব হয়। "কবি-গান" প্রচলন হইলে "পাঁচালী" গানেরও রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া "যাত্রা-গান" প্রচলিত হয়। "ভাসান-যাত্রা", "কৃষ্ণ-যাত্রা" (সাধারণ কথায় "কালীয়-দমন" যাত্রা), "চণ্ডী-যাত্রা", "রাম-যাত্রা" প্রভৃতি "যাত্রা-গান"গুলি বিষয়বস্তু ভেদে বিভিন্ন নামে কথিত হইতে থাকে। "কবি-গানে" প্রধান গায়ক অর্থাৎ "কবি" মুখে মুখে গানের আসরেই ছড়া বাঁধিতে অভ্যস্ত ছিল। পৌরাণিক নানা কূট-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দুইদলের প্রধান ব্যক্তিদ্বয় বা "কবি"দ্বয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং "পূর্ব্ব-পক্ষ" ও "উত্তর-পক্ষ" হইয়া একে অপরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা বড়ই উপভোগ্য হইত। এই উপলক্ষে একে অপরকে ইতর-ভাষায় গালাগালি পর্য্যন্ত করিত। উভয়-দলেই সঙ্গীতকারী দল স্বীয় দলের কবিকে গান গাহিয়া সাহায্য করিত। এই কবি-গান, অন্যান্য গান ও গীতিকা-সাহিত্যের কাল সাধারণতঃ খৃঃ ১৭-১৯শ শতাব্দী। বহুসংখ্যক প্রাচীন গানের মধ্যে মাত্র সামান্য কয়েকটি গান নিম্নে উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

(ক) নানাবিষয়ক গান (পারমার্থিক ও অন্যান্য গান)[১]

(১) আনন্দময়ী

বিখ্যাত বিদুষী নারী আনন্দময়ীর কথা পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইনি বিক্রমপুরের জয়নারায়ণ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং উভয়ে মিলিয়া ১৭০২ খৃষ্টাব্দে "হরিলীলা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। আনন্দময়ী রচিত একটি গীতের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উমার বিবাহ।

* * *

"আলতার চিক পদে চাঁদের বাজার।
হেরে সুরনারীগণ কত বারে বার ॥
মালা গলে করি উমা খেলিয়াছে ফুলে।
সেউতী মল্লিকা যুথি চম্পক বকুলে ॥

* * *

পাণিগ্রহণের পর কর একাইল।
অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল ॥
দুর্গা বলি জয়কার দিয়া সবে নিল।
উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভদৃষ্টি করাইল ॥
লাজ হোম পরে ধূম নয়নে পশিল।
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হইল ॥
সিন্দূরের কৌটা দিল রজত থুইতে।
হাতে করি উমা নেয় বাসর-গৃহেতে ॥
শুভক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল।
আনন্দে আনন্দময়ী রচনা করিল ॥"

—উমার বিবাহ (গান), আনন্দময়ী।

(২) গঙ্গামণি দেবী

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ সেনের ভগ্নী। ইনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে "হরি-লীলা" গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন। এই মহিলা কবির সময় খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। সম্ভবতঃ এই পরিবারভুক্ত

১। পারমার্থিক ও অন্যান্য গানগুলির মধ্যে খেউর, ভাটিয়ালি, জারি, বাউল, বারমাসী (কৃষ্ণ ও শুক্ল), গাজন, গম্ভীরা, ঝুমুর ও সারি প্রভৃতি নানাজাতীয় গানগুলি (লোকসঙ্গীত) এখনও বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত রহিয়াছে।

যজ্ঞেশ্বরী নামে মহিলা-কবি অনেকগুলি "কবি-গান" (খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) রচনা করিয়াছিলেন।

সীতার বিবাহ।

"জনক-নন্দিনী সীতে হরিষে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সীঁথিপাত হীরা মণি চুনি ॥
নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্রভাতি জিনি রূপ হেরি ॥
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভমাঝে মজিয়া রহিল ॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা ॥
কেয়ূর কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা আর লাগে ধন্দ ॥
বিচিত্র ফণীত শঙ্খ কুল পরিচিত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৌছি বেষ্টিত ॥
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে ॥"

—সীতার বিবাহ (গান), গঙ্গামণি দেবী।

(৩) কর্ত্তাভজা লালশশী

লালশশীর কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দী। তাঁহার রচনা সাধকের প্রাণের কথা, কিন্তু নিগূঢ় অর্থবোধ কঠিন। লালশশীর গানগুলিতে সহজ-মতের ইঙ্গিত আছে।

(ক) "মাতঙ্গ কত রঙ্গ বিহঙ্গ তরঙ্গ দেখি।
রঙ্গে ভঙ্গে এই যে ভাঙ্গা ডিঙ্গে তরঙ্গে ডুবে আটকী ॥
এই যে সহজ ভরা গো যারা ওরা যদি চায়,
ছো দিয়ে ওষ্ঠেতে ধরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়,
দৈবি ঘটে যদি উঠে ঢেউ,
এই তরঙ্গে ভাঙ্গিবে ডিঙ্গে বাঁচব তবে কেউ,
লালশশী বলে তরীতে বসিলে কারু না বোলে
তারি ফলটা হলো ॥"

—গান, লালশশী।

(খ) "যারা সহজ দেশের মানুষকে দেখতে করে আশা।
সেই বাসনা ভিন্ন উপাসনা করে না চায় না রতি মাষা॥
পূর্ব্বজন্ম স্বকর্ম্ম-সংসর্গজা,
যা হয়েছে হচ্ছে ইচ্ছে যুগে যুগে ভোগে সেই মজা,
যারা মনের সাধে ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে করে তার সাধন।
সহজ লোককে দেখাচ্ছে কে কিম্বা নিদর্শন
সেটা কে জেনেছে কে শুনেছে এসে কার ভাগ্যে
সদয় এসে হবে॥"

গান, লালশশী।

(৪) গোপাল উড়ে

গোপাল উড়ের জন্মভূমি উড়িষ্যা দেশস্থ যাজপুর। ইনি "বিদ্যা-সুন্দর" যাত্রা পরিচালনায় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি শুধু যাত্রাওয়ালা ছিলেন না। ইঁহার রচিত "বিদ্যা-সুন্দর" যাত্রার গানগুলি অশ্লীলরুচিদুষ্ট হইলেও এক সময়ে সারা বাঙ্গালায় লোকের বিশেষ পরিচিত ছিল। এই কবির জন্মকাল ১৭৯৭ (?) খৃষ্টাব্দ। ইনি ভারতচন্দ্রীয় যুগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঝিঁঝিট আড়খেমটা

(ক) "কে করেছে এমন সর্ব্বনাশ,
হলো অরাজকে বাস।
আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায়,
জ্বলি বারো মাস॥
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে,
পাতা-ছিঁড়ে ডাটা-সার করেছে,
পাঁপড়িগুলো মুচড়ে দেছে,
যার যে অভিলাষ॥"

—বিদ্যা-সুন্দর, গোপাল উড়ে।

আড়খেমটা।

(খ) "এস যাদু আমার বাড়ী,
তোমায় দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ যাদু পূর্ণ হবে মন-আশা॥

আমার নাম হীরে মালিনী,
কড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
করি রাজ-মহলে যাওয়া-আসা॥"

—বিদ্যা-সুন্দর, গোপাল উড়ে।

(গ) "হায়রে দশা কি তামাসা বাসার জন্য ভাবছ কেনে।
হৃদকমলে দিতে বাসা আশা করে কতই জনে।
শুন নাগর তোমায় বলি, নিত্য নিত্য কুসুম তুলি।
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে অলি, এই সুখে থাকি বর্দ্ধমানে॥"

—বিদ্যা-সুন্দর, গোপাল উড়ে।

(৫) কাঙ্গাল হরিনাথ

"বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে,
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লাটবহরা, জাত বেহারার কাঁধে চড়ে।
ছেলে কাঁদে বাবা বলে,
তুমি কওনা কথা, নাইক বাথা, কিসের জন্য এমন হলে?
ঘুরে যে দিল্লী লাহোর, ঢাকার সহর, টাকা মোহর এনেছিলে,
খেলে না পয়সা সিকি, কওনা দেখি, তার কি কিছু সঙ্গে নিলে॥"

—গান, কাঙ্গাল হরিনাথ।

(৬) কৃষকরমণী কাবেল-কামিনী

"আসমানে উঠেছে শ্যামার গায়ের আলো ফুটে।
তাই দেখতে সড়ে সাঁঝের কালে লোক এল ছুটে,
বেটির বেগার বেড়াই খেটে॥
কত সকল কত বশিষ্ঠ শ্যামা-মায়ের পায়।
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী
কালের ঢেউ দেখায়॥

—স্ত্রীকবি কাবেল-কামিনী (১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩১২, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

(৭) পাগলা কানাই

এই কবির সময় ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ, সুতরাং আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে পড়ে না। তবুও এই কবির একটি গান নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই কবির বাড়ী যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন বেড়বাড়ী গ্রামে ছিল। (বং. সা. প.-পত্রিকা, সন ১৩১১, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

হিন্দু-মুসলমান।

"এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরই এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয় ॥
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥
কারো গায়ে শালের কোর্ত্তা কারো গায়ে ছিট,
দুই ভাইরে দেখতে ফিট,
কেবল জবানিতে ছোট বড়, কেবা বাচাল চেনা যায় ॥
কেউ বলে দুর্গা হরি,—কেউ বলে বিশমোল্লা আখেরি,—
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।
মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা সুন্নত করে,
তবে ভাই-ভাইতে মারামারি করে
যাচ্ছিস্ কেন সব গোল্লায় ॥"

—হিন্দু-মুসলমান, পাগলা কানাই।

(৮) অজ্ঞাত পল্লীকবি

(১) "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না।
জনম ভরে বাইলাম তরীরে, তরী ভাইটায় সোয়ায় উজায় না ॥
নায়ের গুড়া ভাঙ্গা, ছাপ্পর লড়ারে, আমি আর বাইতে পারি না ॥"

—পল্লীসঙ্গীত, পূর্ব্ববঙ্গ।

(২) বঁধু তোমায় করবো রাজা বসে তরুতলে।
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে।
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোমার গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে, দিব এই হৃদয় পেতে,
পীরিতি পরম মধু দিব তোমায় খেতে; * * *
বিচ্ছেদেরে বেঁধে এনে ফেলবো পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুট্‌বে কেওয়ার ডালে ॥"

—অজ্ঞাত।

(৩) এবার এলো মাঘ মাস তাতে বড়ো কুয়ো।
ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায় কুয়ো ॥
এবার এলো মাঘ মাস তাতে বড় শীত।
সূয্যি মামা পূবের চালে উঠ্‌লে গাবো গীত ॥
আঁজলা-ভরা রাঙ্গাজবা সাদা ভাঁটির ফুল।
শিশির-ভেজা দূর্ব্বোগুলো মুক্তোর সমতুল ॥
ভাঙ্গা কুলোয় বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি।
ঝোপের আড়ে ডাক্‌লে পাখী রোদ পুইয়ে বাঁচি ॥
আয়লো দিদি দেখবি যদি উষারাণীর বিয়ে।
ফুলের মালা গলায় পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে ॥
আমরা তো বস্ত করি পূব-দুয়োরে বসে আঁচল গায়।
দোহাই তোমার সূর্যিঠাকুর রাঙ্গা বর দিও আমায় ॥
শীতের দাপে পরাণ কাঁপে নড়্‌ছে মাথার চুল।
মা বাপের গোলা ভর্‌বে ধানের ফুটবে ফুল ॥

অজ্ঞাত।

(৪) তামাক খেয়ে গেলে নারে কবিরাজ কত দুঃখ মনে যে রৈল।
ঐ যে চাঁদের পাশে তারা হাসে তেঁতুল-পাত শুকাল ॥
মরা গাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় গুঁদির ফুল।
এই ভরা কালে হলাম রাঁড়ী কবিরাজ যৌবনে ফুটল ফুল ॥
দরদী নিগম কথা শুন্‌লি নে হেলায়,
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে,
তোরা বুঝ্‌লি নে দেখ্‌রে বেলা যায় ॥”

- অজ্ঞাত।

(৫) “যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা কেমন রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদ-বচনে,
মা মা বলে উমা কেন্দেছে ॥
ভাঙ্গেতে ভাঙ্গ পীরিতি বড়,
ত্রিভুবনের ভাঙ্গ্‌ করেছে জড়,
ভাঙ্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর,
উমারে কত কি কয়েছে ॥

উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ,
তাও বেচে ভাঙ্ খেয়েছে ॥"

—শিব-দুর্গার প্রাচীন গান।

(৬) "গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
সে যে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল ॥
দেখা দিয়ে কেন এত দয়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী হোল ॥"

—শিব-দুর্গার প্রাচীন গান।

ভক্তিভাব শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই সমান প্রিয়। প্রাচীন বাঙ্গালা গানগুলির মধ্যে শাক্তগান ভক্তি ও ভাবমাধুর্য্যের দিক দিয়া বাঙ্গালী জাতির অমূল্য সম্পদ। শতাধিক প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালী কবি ও ভক্ত শাক্তগান রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তের প্রাণের আকুলতা এই সমস্ত শাক্তগানগুলিতে প্রকাশিত। শক্তি-উপাসক ভক্ত এই গানগুলির ভিতর দিয়া ভগবানের মাতৃত্ব কল্পনা করিয়াছেন এবং নিজেকে মায়ের কোলের সন্তান হিসাবে কল্পনা করিয়া কতই না অভিমান ও আব্দার করিয়াছেন! ভক্ত-ভগবানের এই সম্বন্ধ যেমন স্বাভাবিক তেমন মধুর। মাধুর্য্যরসপ্রিয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদর্শ হইতে এই ভক্তি-আকুলচিত্ত শাক্তগণের আদর্শের কত প্রভেদ! একদিকে আদর্শগত বিভিন্নতা হেতু উভয় সম্প্রদায় যেরূপ আপোষে বিবাদ করিয়াছেন, আবার তেমনই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের মিলনের জন্যও হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইর ছড়ায় কথা কাটাকাটি প্রথমটির দৃষ্টান্তস্থল এবং শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ, বৃন্দাবনে কাত্যায়নী-পূজা, বৈষ্ণব-পদাবলীর ন্যায় শাক্তপদাবলী রচনা ও শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-যাত্রার ন্যায় দেবী-গোষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিতীয়টির উদাহরণ। বৈষ্ণব-পদাবলীর ন্যায় শাক্ত-পদাবলীও ভক্তের বিভিন্ন মনোভাবের পরিচায়ক। শাক্তগান রচকগণই এই শ্রেণীর পদকর্ত্তা বলা যায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরও বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় প্রকার অনেক পদরচনাকারীরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এই স্থানে কবি

আলোয়াল[১], ত্রিপুরা-বরদাখাতের জমিদার হুসেন আলী এবং সৈয়দ জাফর খাঁ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছি।

(১) আলোয়াল

"ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি। ধ্রু।
ঘরের ঘরণী, জগতমোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যূষে বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল॥
সিঁথের সিন্দুর, নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর, অঙ্গ জর জর, দারুণ পদ্মের নালে॥
কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলে নাই সীমা।
আরতি মাগনে, আলোয়াল ভণে, জগৎমোহিনী বামা॥"

—আলোয়াল (বৈষ্ণবপদ)।

(২) মুজা হুসেন আলী

(বাড়ী ত্রিপুরা—খৃঃ ১৯শ শতাব্দী)

গান।

"যারে শমন এবার ফিরি!
এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।
যদি কর জোর-জবরি, সামনে আছে জজ-কাছারি,
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাসতালুকে বসত করি।
বলে মুজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।"

—শাক্তপদ, মুজা হুসেন আলী।

এই স্থানে অসংখ্য শাক্তগান বা পদের মধ্যে সামান্য কয়েকটি পদের নমুনা দেওয়া গেল।[২] যথা,—

(১) এই প্রসঙ্গে অন্য সংগ্রহগ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংগৃহীত "বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি" দ্রষ্টব্য।

(২) এই গানগুলি উপলক্ষে "বাঙ্গালীর গান", "সঙ্গীত-মুক্তাবলী", "সঙ্গীত কোষ", "শাক্ত-পদাবলী" (অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
নাসরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনী॥
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননী॥"

—কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা)।

(২) দেওয়ান নন্দকুমার

"কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে॥
উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞান-তত্ত্ব ক্রিয়া-তত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পর-তত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে॥
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
সমান, উদান, ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তত্ত্ব,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে॥
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে॥
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি আরাধনে॥"

—দেওয়ান নন্দকুমার রায় (মতান্তরে মহারাজা নন্দকুমার)।

(৩) রামকৃষ্ণ রায়

"মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে,
আনরে ভোলা জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে,
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে ॥"

—নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় (রাণী ভবানীর পুত্র)।

(৪) ভারতচন্দ্র

"কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো।
ভীম ভ'জে নাম ভীমা গো ॥
আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে, শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম শিবের সেই সে অণিমা গো ॥
নিলে তারা-নাম,তবে পরিণাম, নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর, কহে নিরন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥"

—ভরতচন্দ্র রায়।

(৫) শিবচন্দ্র রায়

"নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী।
নীল নলিনী, জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নৃকর চারুকর সুশোভিনী,
লোলরসনী করালবদনী ॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূল-ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,
লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ॥

নিপতিত পতি শব-রূপে পায়,
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥"

—মহারাজা শিবচন্দ্র রায় (নদীয়া)।

(৬) মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায়

"ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে ভাল
করবাল যেন দামিনী ॥
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে,
নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গ রে।
মায়ের শিরে শিশু শশী ষোড়শী রূপসী
শশীমুখি কাশীবাসিনী ॥
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে,
নাশিছে দনুজ মাভৈ ভাষিছে রে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে
তব রূপে ভব-জননী ॥"

— মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুচবিহার)।

(৭) রামনিধি গুপ্ত

"গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে,
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।,
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি,
উমা 'ও মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥"

—রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।

(৮) দাশরথি রায়

"বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে ॥
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা,
বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥

রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্‌রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে।
দাশরথি কহিছে, রাণী, দুই তুল্য দরশন,
হের ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্মরূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে॥"

দাশরথি রায়।

(৯) শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

"মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলে বল।
কালো রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল।
ছিল বামা কার ঘরে, কেমন করে আনলি তারে,
কালো নয়, পূর্ণিমার শশী হৃদয় মাঝে করে আলো।
অরুণ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি মায়ের চরণ-তলে,
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে, ও পদে জবা দিলে সাজে ভাল॥"

—শম্ভুচন্দ্র রায় (নদীয়া)।

(১০) দেওয়ান রঘুনাথ রায়

দেওয়ান রঘুনাথ রায় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপি গ্রামে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতৃপিতামহও এই কার্য্য করিতেন। রঘুনাথ রায়ের পিতার নাম দেওয়ান ব্রজকিশোর। রঘুনাথ সংস্কৃতে ও ফারসীতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। দেওয়ান রঘুনাথ অনেকগুলি ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি গান নিম্নে দেওয়া গেল।

'তারা, কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-দুহিতে॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে॥"

—দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

(১১) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কবি কমলাকান্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের গুরু ছিলেন। কবির জন্মকাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ এবং বাড়ী কোটালহাট গ্রাম (বর্দ্ধমান)। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস অম্বিকানগর।

"যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
জনম, করম, দুঃখ, সুখ করি মানি।
যদি নিরখি, অন্তরে শ্যামা জলদ-বরণী॥
বিভূতিভূষণ, কি রতন মণিকাঞ্চন,
তরুতলে বাস, কি রাজসিংহাসন,
কমলাকান্ত উভয় সম সাধন জননী,
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে গো মা॥"

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

(১২) রামদুলাল নন্দী

রামদুলাল নন্দী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ফারসী তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি প্রথমে নোয়াখালির কালেক্টরের সেরেস্তাদার হইলেও উত্তরকালে ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান ও মন্ত্রী হইয়াছিলেন। দেওয়ান রামদুলালের মৃত্যুকাল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ।

"ওগো জেনেছি, জেনেছি, তারা,
তুমি জান মা ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেমনি ভাবে,
তাতে তুমি মা হও রাজী॥
মগে বলে ফরা, তারা, গর্ড বলে ফিরিঙ্গী যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়,
মোগল, পাঠান, সৈয়দ, কাজী।
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি,
শিব তুমি শৈবের উক্তি,
সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ।

শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ॥
শ্রীরামদুলালে বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে,
মন আমার হয়েছে পাজি ॥"

—দেওয়ান রামদুলাল নন্দী।

(১৩) মহারাজা নন্দকুমার

"ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বিনাবাদ্যবিনোদিনী ॥
শরীর শারীরযন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে।
গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম – সঞ্চারিণী ॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর।
মণিপুরেতে মহ্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী ॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞা সুরে,
তান লয় মান সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী ॥
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে।
তত্ত্বলয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী ॥
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী ॥"

—নন্দকুমার রায় (মহারাজা, মতান্তরে দেওয়ান)

(১৪) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

"কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা।
যা'রা তারা চায়, আমার মত হয় কি তা'রা ?
বিধাতারে আরাধিব মা, তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা ॥

—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

(১৫) রামপ্রসাদ সেন*

শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে। শাক্ত ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনাকারীগণের মধ্যে

* 'সিস্টার' নিবেদিতা তৎরচিত 'Kali the Mother' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫৮) সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ সেনের স্থান সর্ব্বোচ্চে। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতচন্দ্রের যুগে এবং তাঁহারও পূর্ব্বে "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে কুরুচির পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন তাহার সহিত সাধক ও কালীভক্ত রামপ্রসাদের কোনই মিল নাই। একই ব্যক্তির এইরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্নভাব ও রুচির পরিচয় পাঠককে বিস্মিত করে। সম্ভবতঃ "বিদ্যাসুন্দর" তাঁহার প্রথম জীবনের লেখা। পরিণত বয়সে মা কালীর পরমভক্ত ও প্রিয় সন্তান যে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় আমরা তাঁহার রচিত কালী-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেখিতে পাই। কবি ও সাধক রামপ্রসাদ ভাবে বিভোর হইয়া মাতার কাছে শিশু যেমন অভিমান ও আব্দার করে মা কালীর কাছে তেমনই আব্দার করিয়াছেন। আরাধ্যা দেবী ও আরাধনাকারী ভক্ত তখন যেন বড়ই নিকটবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন। ভাবে বিভোর ভক্ত শেষে বাহ্যিক মূর্ত্তির পূজা পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আরাধ্যা দেবীকে স্বীয় মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ সাধক কবি রামপ্রসাদ রচিত কতিপয় সঙ্গীত নিম্নে দেওয়া গেল। রামপ্রসাদের গানগুলি একবিশেষ সুরে গীত হইয়া থাকে। এই নূতন সুরের নাম "রামপ্রসাদী সুর"। উমা-বিষয়ক আগমনী গানের প্রথম প্রবর্ত্তকই বোধ হয় রামপ্রসাদ।

(ক) "মন তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে কল্লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে।
তুই লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা, জান্‌বে নারে জগজ্জনে ॥
ধাতু, পাষাণ, মাটীর মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
ঝাড়, লণ্ঠন, বাতি দিয়ে কাজ কিরে তোর আলোদানে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দাও না জ্বলুক নিশিদিনে ॥
মেষ, ছাগল, মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি 'জয় কালী', 'জয় কালী' বলে বলি দেও ষড়রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে, ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি 'জয় কালী' বলি দেও করতালি, মন রাখি তাঁর শ্রীচরণে ॥"

—গান, রামপ্রসাদ সেন।

(খ) "মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।
মা দিয়েছ, দিতেছ কতই যাতনা॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী, বানালি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী॥
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ম'লে কি তার ছেলে বাঁচে না॥
রামপ্রসাদ ছিল গো মায়েরই পুত্র।
মা হ'য়ে হলি গো ছেলেরই শত্রু॥
মা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা থেকে তাব কি ফল বল না॥"

—গান, রামপ্রসাদ সেন।

(গ) "মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥"

— গান, রামপ্রসাদ সেন।

(ঘ) "আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অৰ্দ্ধ অঙ্গ জায়গির—মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥

প্রসাদ বলে, অমন বাপের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥"

—গান, রামপ্রসাদ সেন।

(১৬) আজু গোঁসাই

ইনি রামপ্রসাদের সমসাময়িক এবং ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা রচনায় রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বৈষ্ণব আজু (অযোধ্যানাথ) গোঁসাই শাক্ত রামপ্রসাদকে বলিতেছেন;—

"এই সংসার রসের কুঠি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি ॥
যার যেমন মন তার তেমনি মন করবে পরিপাটী।
ওহে সেন অল্পজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি ॥
ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পীড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী ॥
জনক রাজা ঋষি ছিল কিছুতে ছিল না ত্রুটী।
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে
খেতে পেত দুধের বাটী ॥
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ায় বেড়ি কাটি।
তবে অভেদ যেন শ্যামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ দুটি ॥"

—আজু গোঁসাই।

জন-সাহিত্য মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগের খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত লোকরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় এই শ্রেণীর কবিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কবি রামপ্রসাদ খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর ব্যক্তি। এই যুগের আর একজন কবি একই যুগে ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় কৃতিত্ব দেখাইলেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর অনুরূপ কবিতা রচনায়। তিনি ধর্ম্মসঙ্গীত অপেক্ষা পার্থিব প্রেম বর্ণনায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। এতকাল শুধু রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রেম-গীতি রচনারই রীতি ছিল। অবশ্য কোন কোন কবি সাধারণ প্রেম-গীতিও কিছু পরিমাণে রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই জাতীয় গীতি রচনায় রামনিধি গুপ্ত সকলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মধ্য-যুগ বাঙ্গালা-সাহিত্যে ধর্ম্ম-কথা অবলম্বনে রচনার যুগ। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে এই রীতির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামনিধি গুপ্ত তাহার প্রথম সূচনা

করিয়াছিলেন। অবশ্য "গীতিকা" সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নহে। রামনিধি গুপ্ত যে পথে চলিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়া আরও দুইজন কবি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন দাশরথি রায় এবং অপরজন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। জন-সাহিত্যের দাবী খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যান্ত থাকিলেও এই শেষোক্ত দুইজন কবি খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় ইঁহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে বিরত রহিলাম।

(১) রামনিধি গুপ্ত

কবি রামনিধি গুপ্ত (১৭৩৮-১৮২৫ খৃঃ) সাধারণতঃ নিধুবাবু নামে পরিচিত। তিনি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ চাঁপাতলা (চাঞ্চপাতলা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবুর পিতা কবিরাজ ছিলেন এবং কবির জন্মের পর কলিকাতা কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কবি রামনিধি ফারসী ও বাঙ্গালা ভালভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষাও কিছুটা শিখিয়াছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের সাহচর্য্যে তাঁহার ইংরেজী ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। কবি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কবি রামনিধির সঙ্গীত বিদ্যায় অসীম অনুরাগ ছিল। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে রামনিধি ছাপরা (বিহার) জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বদলী হন। তথায় তিনি বিখ্যাত মুসলমান গায়কগণের সংশ্রবে আসেন এবং তাঁহাদের সঙ্গীত-রীতি অভ্যাস করেন। এই মুসলমান গায়কগণের মধ্যে সারি মিঞা নামক জনৈক গায়ক নিধুবাবুর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সারি মিঞা "টপ্পা" জাতীয় গীত গাহিতেন। নিধুবাবু তাঁহার অনুকরণে বাঙ্গালা গানে সর্ব্বপ্রথম এই "টপ্পা" আমদানী করেন। ইহা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় বাঙ্গলাতে বিশেষ লোকরঞ্জন করিয়াছিল। কবি রামনিধি গুপ্ত পরিণত বয়সে (৮৭ বৎসর বয়সে) লোকান্তর গমন করেন।

নিধুবাবুর গানগুলি[১] সঙ্গীতজ্ঞগণের অত্যন্ত প্রীতিকর বলিয়া আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। "টপ্পা" নামক নূতন শ্রেণীর গানের আবির্ভাবই ইহার কারণ। এই আলোচনা অবশ্য সাধারণের বোধগম্য হওয়ার কথা

(১) দুর্গাদাস লাহিড়ী সংগৃহীত নিধুবাবুর গান দ্রষ্টব্য। এই সংগ্রহ পূর্ণাঙ্গ নহে। এই সংগ্রহের বাহিরেও নিধুবাবুর অনেক গান রহিয়াছে।

নহে। গানগুলি ধর্ম্মসঙ্গীত না হওয়াতে সাধারণের পক্ষে ইহাদের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণও প্রথমে হইতে পারে নাই। জনসাধারণের রুচিতে পরবর্ত্তী কবি দাশরথির ধর্ম্মকথাপূর্ণ পাঁচালী যত উপভোগ্য হইয়াছে, নিধুবাবুর টপ্পা তত উপভোগ্য নাও হইতে পারে। কিন্তু, তবুও বলা যায় ক্রমে তাহারা নিধুবাবুর টপ্পারও রস গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল। একদিকে দেশে ধর্ম্মসঙ্গীতের বাহুল্য, অপরদিকে ভারতচন্দ্রের আদর্শে রচিত সাহিত্যের দুর্নীতি। নিধুবাবু এই দুইএর মধ্যে এক মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন টপ্পা গানে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, তেমনই তিনি বিদ্যা-সুন্দর কাহিনীর ন্যায় ভারতচন্দ্রীয় যুগের কামকলুষতা পূর্ণ রচনা হইতেও দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পার্থিব প্রেম বুঝাইতে গিয়া অনেক উচ্চাঙ্গের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনায় অতি সহজ ভাষায় অত্যন্ত নির্ম্মল মনোভাবের প্রকাশ রহিয়াছে। মানুষের হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ও কামগন্ধহীন প্রেমের স্থান কত উচ্চে এবং ইহার অনুভূতি কত সূক্ষ্ম তাহা নিধুবাবুর গানগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

নিধুবাবুর গান।

(ক) "তবে প্রেমে কি সুখ হত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক-হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেম-সাগরের জল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত॥"

—গান, রামনিধি গুপ্ত।

(খ) "যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে।
দৈব-যোগে একদিন হয়েছিল দরশন
না হতে প্রেম-মিলন লোকে কলঙ্ক রটালে॥"

—গান, রামনিধি গুপ্ত।

(গ) "তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥
আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম-তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে॥

সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সেদিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে ॥"

—গান, রামনিধি গুপ্ত।

(ঘ) "সে কি আমার অযতনের ধন।
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন।
তবে যে অপ্রিয় বলি যখন জ্বালাতে জ্বলি
নতুবা তার সকলি প্রেমের কারণ ॥"

—গান, রামনিধি গুপ্ত।

(ঙ) "কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব ॥"

—গান, রামনিধি গুপ্ত।

(চ) "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই দেখে যেতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥"

—গান, রামনিধি গুপ্ত।

(১) দাশরথি রায়

কবি দাশরথি রায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁদমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দাশরথি রায়ের পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। পিতার অবস্থা স্বচ্ছল না থাকাতে দাশরথি বাল্যে পিলা গ্রামে মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই গ্রামেই বসতি করেন। যৌবনে দাশরথি বা "দাশু" রায় একটি নীলকুঠিতে সামান্য বেতনে কৰ্ম্মগ্রহণ করেন এবং এই সময়ে "অক্ষয় পাটুনি" বা "আকা বাই" নামক একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রেমে পতিত হন। দাশরথি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্ত্রীলোকটির প্রেমে পড়াতে যথেষ্ট নিন্দার ভাজন হন। আকা বাইএর একটি কবির দল ছিল। কবি দাশু তাহাতে গান বাধিয়া দিতেন। অবশেষে মাতা ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে তিনি এই রমণী ও তাহার কবির দল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত পাঁচালী রচনায় মনোনিবেশ করেন।

কবি দাশু নানা বিষয়ে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কৃষ্ণ-লীলা" বিষয়ক পাঁচালী প্রধান। দাশু রায়ের পাঁচালী এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গীত হইত। তাঁহার "কৃষ্ণ-লীলা" বিষয়ক পাঁচালী মনোরম হইলেও অন্য বিষয়ক কতকগুলি পাঁচালীতে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। উহা ভারতচন্দ্রীয় যুগের প্রতিধ্বনি মাত্র। দাশু রায় খুব অনুপ্রাস ও তুলনার ভক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া যখন তিনি বক্তব্য বিষয়ের তুলনা আরম্ভ করিতেন তখন তাহা অল্প কথায় শেষ করিতে পারিতেন না; অথচ শ্রোতৃবর্গ ইহা অপছন্দ করা দূরে থাকুক বরং দাশুকবিকে ইহা বলিবার সময় উৎসাহিতই করিতেন। দাশুকবির ভাষা স্থানে স্থানে অশ্লীল হইলেও যেমন স্বচ্ছ তেমনই সুন্দর অর্থপূর্ণ ছিল। এই অশ্লীলতা তৎকালীন রুচিসম্মত ছিল। এই স্থানে তাহার রচনার সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণ-লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

(ক) "হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পূরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয়ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি॥"

—কৃষ্ণ-লীলা, দাশরথি রায়।

নলিনী-ভ্রমর-কথা।

(খ) "মনস্থ করি মধুকর করে তীর্থ-যাত্রা।
কুমুদী-আমোদ করি নলিনীকে কয় বার্ত্তা॥
বলে প্রেম করি তোর সুখের দশা দেখ্‌তে পাইনে এজন্ম।
নিত্যি অপকীর্ত্তি তোদের বৃত্তি বাহিরে কর্ম্ম॥

আমরা ত প্রেম করে থাকি এমন নয় যে সতী।
এমনি ধারা করেছি বশ তার তফাৎ নাই একরতি ॥
আমি মান করিলে আমার বঁধুর কাছে সে আঁধার দেখে সৃষ্টি।
আমি নয়ন ফিরালে তার নয়নে বহে বৃষ্টি ॥

* * *

কমলিনী বলে সখি যে দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
অধম-সঙ্গেতে থাকিতে হৈলে অধর্ম্মের ফল ফলে ॥
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চণ্ডী-পূজায় ভক্তি।
রামছাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল-চালের পথ্যি ॥
মুচীকে করে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর ব্রত।
ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে কুকুরকে দিয়েছি ঘৃত ॥
গজ-মুক্ত গেঁথে দিলাম বানর-পশুর গলে।
বোবাকে বল্‌লাম হরিবল, সে কেমন করেই বা বলে ॥
জানি বেটা জন্ম-ভেড়া, দিলে কিছু শিক্ষা পড়া, লাগে যদি কাযে।
তাও কখন লাগে কাযে ॥
দগুড়ের হাতে কি তবলা বাজে।
রামশিঙ্গে যে বাজায় তার হাতে কি বাঁশী সাজে ॥
যেমন শুকশারী আর শালিকে, চাকবে আর মালিকে।
ডোঙ্গা আর শুলুকে, একখানি গাঁ আর মুলুকে ॥
পাতালে আর গোলোকে, টমটমী আর ঢোলোকে।
সালিম আর সালুখে, শাঁখে আর শামুকে ॥
আফিঙ্গ আর তামুকে ॥
মালজমি আর খামারে, কলু আর কামারে।
শেয়াকুল আর জামিরে, দরিদ্র আর আমীরে ॥
বেঙ্গে আর কুমীরে, গণ্ডারে আর শূকরে।
চণ্ডালে আর ঠাকুরে, আগড়ে আর পুকুরে ॥
সিংহ আর কুকুরে, কমল-লোচন আর দর্দ্দুরে।
বলবান্ আর আতুরে, বোকা আর চতুরে ॥
দেওয়ান আর মেথরে, রাজবৈদ্য আর হাতুড়ে।
ধন্বন্তরি আর তুতুড়ে, সক্ষম আর ভাতুড়ে ॥

ময়ূর আর বাদুড়ে, ভ্রমর আর পাদুড়ে।
আমন আর ভাদুরে ॥”

—নলিনী-ভ্রমর-কথা, দাশরথি রায়।

(গ) কবি দাশরথি কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রচিত বলিয়া কথিত গানটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। কবি তাঁহার সহোদর ভ্রাতা তিনু বা তিনকড়িকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

“তোরা ফিরে যা ভাই তিনুরে,
আমি যাব না, যেতে পারব না,
ভবে এসেছি একা, আমার একা যেতে হবে রে।
আমার যত কিছু টাকা-কড়ি,
ঘর দরজা, বাগান বাড়ী,
সকল ধনের অধিকারী, তিনকড়ি ভাই তুমি রে।
হয়ে বিচক্ষণ, ক'রো রে রক্ষণ,
ঘরে র'ল বিধবা রমণী, তারে অন্ন দিওরে।
তোমরা সবে ভাব একা,
আমি কিন্তু নইরে একা,
বসে আছি আমি মায়ের কোলেরে ॥”

--শেষ গান, দাশরথি রায়।

দাশরথি রায় পৌরাণিক নানাবিষয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশখানা গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।[১] তিনি অনূ্যন ৫০ হাজার ছত্র রচনা করিয়াছিলেন। দাশু রায় শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার গানই রচনা করিয়াছিলেন। তবে, তাঁহার শাক্ত মতের দিকে ঝোঁক তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে রচিত গান এবং নিম্নোদ্ধৃত তীব্র বৈষ্ণব-নিন্দাসূচক গানটিতে বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

“গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া, যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া,
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমন্ত্রে উপাসনা,
নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলায় গড়াগড়ি ॥
গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে,
বাগ্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।

(১) বঙ্গবাসী আফিস কর্তৃক প্রকাশিত দাশরথি রায়ের গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখ্‌তে নারেন চক্ষের শূল,
কালী নাম শুন্‌লে কাণে হস্ত।

* * * *

কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা সেবদাসী,
ভজন কুঠরি আইরি কাঠের বেড়া।
গোসাঞিকে পাঁচসিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে,
জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া॥
ভক্ত হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস,
শাস্ত্র ইহাদের অগোচর নাই কিছু।
এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কি সিদ্ধান্ত,
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥"

—পাঁচালী, দাশরথি রায়।

তবে এই কথাও বলিতে পারা যায় যে দাশু রায়ের শ্লেষ অনেক সময়ে লোকের প্রাণে আঘাত দিত। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই গানটির ভিতর দিয়া তিনি বৈষ্ণব সমাজের দুর্নীতির প্রতিই কষাঘাত করিয়াছিলেন ; প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন বিবাদ ছিল না। "যদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলা-পতি" শীর্ষক তৎরচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানটির ভাব কত গভীর!

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবি ঈশ্বরগুপ্ত ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিমোহন গুপ্ত। হরিমোহন গুপ্তের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কবির দশ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিমাতাকে নাকি ইষ্টকখণ্ড ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার পনর বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা বিবাহ দেন। এই মেয়েটি বংশে উচ্চ হইলেও দেখিতে সুন্দরী ছিল না। কবি তাঁহার মাতৃবিয়োগে, বিমাতার আগমনে এবং সর্ব্বোপরি কুরূপা স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া সংসারের উপর একেবারে চটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক রচনা ইহারই ফল। কবির স্কুলে লেখাপড়াও ভাল হয় নাই। এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কবিত্বগুণে ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যযুগের অবসানে ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভবের সময় উভয় যুগের

সংযোগসাধন করিয়াছিলেন। তিনি আধুনিক যুগের প্রথম দিকে আবির্ভূত হইলেও মধ্যযুগের সাহিত্যিক সমস্ত নিদর্শন তাঁহার সাহিত্যে পাওয়া যায়। কবির প্রতিভা ইংরেজী প্রভাববর্জ্জিত ও অনন্যসাধারণ ছিল। পরবর্ত্তী কালে তদীয় বন্ধু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় কবি উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করেন এবং এই ধনী বন্ধুর অর্থসাহায্যে "সংবাদ প্রভাকর" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দ)। এই কাগজের অসামান্য খ্যাতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র প্রথম জীবনে এই কাগজেই প্রবন্ধ দিতেন এবং "গুপ্ত কবি" উহা প্রকাশিত ও পুরস্কৃত করিয়া এই যুবকগণকে উৎসাহিত করিতেন। "সংবাদ প্রভাকর" ভিন্ন ঈশ্বর গুপ্ত বা "গুপ্ত কবি" "সংবাদ রত্নাবলী" সম্পাদনা করিতেন। তিনি "বোধেন্দু বিকাশ" নাম দিয়া সংস্কৃত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত "ভাগবতের"ও বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৫০,০০০ হাজার পয়ার রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়। বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি অনেক সময় অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কবির প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা "গুড়গুড়ে" ভট্টাচার্য্যের সহিত কবির এই জাতীয় কবিতার লড়াই তৎসম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" এবং গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "রসরাজ" কাগজে মুদ্রিত হইত। এই জাতীয় রচনা উভয় কবিকেই নিন্দার্হ করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু এই জাতীয় রচনাই করেন নাই। তাঁহার ধর্মভাবপূর্ণ কবিতাগুলিও সংখ্যায় অল্প ছিল না। কবি অতি সাধারণ বিষয়বস্তুর উপরও সুন্দর কবিত্ব আরোপ করিতে পারিতেন। তিনি স্বীয় সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই নানা অনাচারের সুন্দর আলেখ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা স্বভাবিকত্বের গুণমণ্ডিত এবং অমার্জ্জিত হইলেও ইংরেজী প্রভাব বর্জ্জিত খাঁটী দেশী রচনা। যথা,—

(ক) "সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত থাকে তার কাঁচা, কত তার পুড়ে।
সাধে রাধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত কথা বেঁকে বেঁকে॥

হ্যালো বউ কি করিলি দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস মায়ের নিকটে॥
বধূর মধুর ধ্বনি মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল॥
আহা তাঁর হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥"

—নববধূ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

(খ) বিধবা-বিবাহ

"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলে, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা॥"

—বিধবা-বিবাহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের যুগের শেষ কবি। গুপ্ত কবি কবিতা রচনায় ভারতচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কবিবর হেমচন্দ্রও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় গুপ্ত কবির চিহ্নিত পথেই চলিয়াছিলেন। কবিতা রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি থাকিলেও তাঁহার গদ্যরচনা তত প্রশংসনীয় ছিল না। তাঁহার রচিত গদ্যের গুরুভার ভাষা পাঠকের পীড়াদায়ক ছিল বলিলে অন্যায় হয় না।

(গ) কবিগান*

(১) শাক্ত কবিওয়ালাগণ

শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের তুলনা নাই। তাঁহার পরে যাঁহারা এই শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক কবিওয়ালাও রহিয়াছেন। নানা শ্রেণীর গানের মধ্যে "কবিগান" এক সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। এখনও পল্লী অঞ্চলে ইহা গীত হইয়া থাকে। সময়ের দিক দিয়া "পাঁচালী" বা "মঙ্গল" গানের পরই কবিগান ও কীর্ত্তনগানের নাম করা যাইতে পারে। কীর্ত্তনগানের প্রায় সমকালে আগত কবিগানের

---

* জনসাহিত্য (লোকসাহিত্য) এবং ইহার বিশেষ অংশ কবিগান সম্বন্ধে History of Bengali Literature in the 19th century (1800—1825 A.D.—S. K. De), বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), History of Bengali Language & Literature (D. C. Sen) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিষয়-বস্তু পৌরাণিক এবং এই জাতীয় গায়কগণের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়-প্রকার কাহিনীই তুল্য আদরণীয় ছিল। কিন্তু কীর্ত্তনগানের উদ্ভব প্রধানত: বৈষ্ণব সমাজে হইয়াছিল বলিয়া "রাধাকৃষ্ণ-লীলা" ও "চৈতন্য-লীলা" বর্ণনাই এই জাতীয় গানের উপাদান জোগাইয়াছিল। শাক্তগণের মধ্যে যে কীর্ত্তন-গান ছিল তাহা বৈষ্ণবগণের অনুকরণে এবং এই জাতীয় গান তেমন খ্যাতি অর্জ্জনও করিতে পারে নাই। শাক্ত কবিওয়ালার সংখ্যা অল্প ছিল না। তন্মধ্যে মাত্র কতিপয় প্রসিদ্ধ কবিওয়ালার নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

কবিওয়ালা রাম বসু

কবিওয়ালা রামবসুর জন্মভূমি কলিকাতার নিকটস্থ ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত সালিখা গ্রামে ছিল। কবির কাল ১৭৮৬-১৮১৮ খৃষ্টাব্দ। কথিত আছে ইনি বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা অভ্যাস করিয়াছিলেন। রাম বসুর সময়ে যে সমস্ত কবিওয়ালা বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর ও মোহন সরকার প্রধান। রাম বসু ভবানী বেণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ পাইয়াছিলেন। মাত্র বার বৎসর বয়সে কবি রাম বসু ভবানী বণিকের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। ক্রমে নীলুঠাকুর ও মোহন সরকারের দলেও কবি-রচিত গান গীত হইত। রাম বসু শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার গানই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত উমা-সঙ্গীতগুলি ও বৈষ্ণব সঙ্গীতগুলি উভয়ই প্রশংসার যোগ্য।

রাম বসু রচিত উমা-সঙ্গীতগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ঘরের দারিদ্র্যের অকৃত্রিম ও স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এই গানগুলিতে কন্যাস্নেহের সুন্দর অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কতদিন কত কথা।
সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক,
ধূলায় পোড়ে লুটাতো।" —গান, রাম বসু।

এণ্টুনি ফিরিঙ্গি

কবিওয়ালা এণ্টুনি ফিরিঙ্গি জাতিতে পর্ত্তুগিজ ছিলেন। ইঁহার সময় খৃঃ ১৮শ-১৯শ শতাব্দী। কোন একটি ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া

এন্টনি হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দু সামাজিক আচার-ব্যবহার অভ্যাস করেন। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে এন্টনি ফিরিঙ্গি সাগ্রহে যোগদান করিতেন। এমন কি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি একটি কবির দল পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছিলেন। হুগলী-গরিটীর নিকটে এন্টনি ফিরিঙ্গির ভগ্ন বাগান-বাটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বহুবাজারে স্ত্রীর অনুরোধে এন্টনি ফিরিঙ্গি যে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন উহা অদ্যাপি রহিয়াছে। ঠাকুর সিংহ ও রাম বসুর সহিত কবিগানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এই "কবি"গণের প্রশ্নোত্তর ছলে গালাগালির নমুনা এইরূপ—

ঠাকুর সিংহ—"বলহে এন্টনি আমি একটি কথা জানতে চাই।
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥"

ইহার উত্তর এন্টনি ঠাকুর সিংহকে "শ্যালক" সম্বোধন করিয়া নিম্নরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। যথা—

এন্টনি—"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুর সিংহের বাপের জামাই, কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি॥"

রাম বসু আণ্টনিকে নিম্নরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যথা,—

"সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে, গালে দেবে চুণকালী॥"

এন্টনির উত্তর—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ ছ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

নিম্নোদ্ধৃত দুই ছত্রে এন্টনি ফিরিঙ্গির ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়:

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজে ত ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥"—এন্টনি ফিরিঙ্গি।

ঠাকুর সিংহ

ঠাকুর সিংহ খৃঃ ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শাক্ত কবিওয়ালা। এই কবি এন্টনি ফিরিঙ্গির পূর্ব্বপক্ষ হিসাবে প্রায়ই কবিওয়ালার আসরে তাঁহাকে

জব্দ করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই কবিওয়ালার কথা এণ্টুনি ফিরিঙ্গির প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর ও মোহন সরকারের নামও পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

(২) বৈষ্ণব কবিওয়ালাগণ

রঘুনাথ দাস (রঘু মুচি)

কবিওয়ালা রঘুনাথ জাতিতে মুচি এবং কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে সালকিয়া নামক স্থানে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার সময় খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কাহারও কাহারও মতে রঘুনাথ দাস মুচি ছিলেন না, জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

মহড়া।

"কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এতদিন আমি যমুনা-জলে
আমি এমন মোহন মূরতি কখন
দেখিনি এসে হেথায়॥

চিতেন।

অঙ্গ অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে বাঁধিয়াছে চূড়া
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥

অন্তরা।

সই সজল নব জলদ-বরণ ধরি নটবর-বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ এই কি রসিক-শেষ॥

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ—
নখরের ছটায় আমার হেন লয় মন।
জীবন যৌবন সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥ —গান, রঘু মুচি।

রাসু ও নৃসিংহ

এই কবিওয়ালা সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় রঘুনাথ দাসের (রঘু মুচির) সমসাময়িক ছিলেন (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) এবং ইঁহাদের নিবাস ছিল চন্দনগরের নিকটস্থ গোন্দলপাড়া গ্রামে। ইঁহাদের রচিত "সখীসংবাদ" গানের প্রসিদ্ধি আছে।

"কই সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্য জ্ঞান,
হেন প্রেম ধন উপজে কোথা॥
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
পীরিতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা॥
আমি রসিকের স্থান, পেয়েছি সন্ধান,
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা॥
কাপটা তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা॥
হায় কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে॥
কি প্রেম-কারণে, ভগীরথ-জনে,
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে॥
কোন্ প্রেমে হরি, বাঁধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী করে অনাথা॥
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণ-পদ পেলে মাধবী লতা॥"

—গান, রাম্ব-নৃসিংহ

গোঁজলা গুঁই

গোঁজলা গুঁইও রঘুনাথ দাসের সমসাময়িক কবিওয়ালা ছিলেন। এই কবি রচিত অনেকগুলি গানের মধ্যে একটি গান এইরূপ :

"এস এস চাঁদবদনি।
এ রসে নীরস করো না ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ॥
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি॥"

—গান, গোঁজলা গুঁই।

কেষ্টা মুচি

কবিওয়ালা কেষ্টা মুচি রঘু মুচির (রঘুনাথ দাসের) সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

"হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে॥
হইয়ে ভূপতি কুবুজা যুবতী পাইয়ে শ্রীপতি
শ্রীমতি রাধারে রহিলে ভুলে॥
চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এত দিনের পর।
অন্তর জুড়াও গো কিশোরি
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর॥
যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর।
সেই চিকণ কাল হৃদে উদয় হল
এখন সুশীতল করগো অন্তর॥
যদি অন্তরে অকস্মাৎ উদয় হল রাধানাথ
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
বুঝি নিবলো রাধে তোমার অন্তরের কৃষ্ণ-বিরহ-অনল॥"

—গান, কেষ্টা মুচি।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী

এই কবিওয়ালার মিষ্টি গান রচনায় প্রসিদ্ধি ছিল। কবিওয়ালা নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর কাল ১৭৫১-১৮২১ খৃষ্টাব্দ।

"বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে।
বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন কারণে॥
যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে।
একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে॥" ইত্যাদি।

—গান, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী।

হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি)

এই কবিওয়ালার ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ায় জন্ম হয়। ইহার মৃত্যু সময় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ। হরু ঠাকুরের রচনা মধুর এবং বিরহ-বর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। যথা—

মহড়া।

"ইহাই কি তোমারি মনে ছিল হরি
ব্রজ-কুল-নারী বধিলে।
বল না কি বাদ সাধিলে।
নবীন পীরিত না হইতে নাথ
অঙ্কুরে আঘাত করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে আনিল রথ গোকুলে।
অক্রুর-সহিতে তুমি কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব শুনহে মাধব
তোমারি প্রেমের পিয়াসী॥"

—গান, হরু ঠাকুর।

ভোলা ময়রা

ভোলা ময়রা হরু ঠাকুরের চেলা ছিল। তাহার বাড়ী কলিকাতা শ্যামবাজার ছিল। প্রতিপক্ষ কবি একবার "ভোলা" শিবের নাম বলিয়া তাহাকে রহস্য করাতে ভোলা নিম্নরূপ উত্তর দিয়াছিল :

"আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই॥
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে আমায় পূজলি কই॥" ইত্যাদি।

—গান, ভোলা ময়রা।

রাম বসু

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সালকিয়ার কবিওয়ালা রাম বসুর কথা (১৭৮৬ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ) ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রাম বসুর শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার গানই সর্ব্বজনবিদিত। এই কবির রচিত শাক্ত গানের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত বৈষ্ণবগানগুলিও বড়ই মধুর। তিনি "বিরহ" ও "মানের" গানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কবি রচিত দুইটি বৈষ্ণবগান এইরূপ—

(ক) "দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে চাই,
কিছুকাল থাক থাক বোলে—ধরে রাখব না॥
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না—
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল—
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবি নে পর,
তুমি চক্ষু মুঁদে আমায় দুঃখ দিও না॥
দৈব-যোগে যদি প্রাণনাথ হলো এপথে আগমন,
কও কথা একবার কও কথা তোল ও বিধুবদন,—
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি,—
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলাম না॥"

—গান, রাম বসু।

(খ) "কেন আজ কেন্দে গেল বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী॥
রাধা-কুঞ্জে দ্বারী হয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই সুধাই গো তোমায়॥
মণিহারা ফণীপ্রায় মাধব তোমার।
প্রিয়া দাসী বলে বদন তুলে চাইলে না একবার॥
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম গলে পীতবাস,
দেখে মুখ ফাটে বুক আ মরি মরি॥" —গান, রাম বসু।

রামরূপ ঠাকুর

পূর্ব্ব-বঙ্গের কবিওয়ালাগণের মধ্যে রামরূপ ঠাকুরের নাম (খৃঃ ১৮শ-১৯শ শতাব্দী ?) বিশেষ স্মরণযোগ্য। এই কবি রচিত "সখী-সংবাদ" গানের প্রসিদ্ধি আছে। যথা —

চিতান

"শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিত জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেমি কমলিনী॥
তুলে জাতি যূথি কুট্‌রাজ বেলী, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলি
অর্দ্ধবিকশিত, যাতে বনমালী হরষিত।
সাজাল যুঁই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর, আসাতে হয়
যামিনী ভোর, চিতে হল বিপরীত॥
ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা বাঁশী বাজায়।
বৃন্দেদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে।

ধুয়া

ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে।
ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে।

পর চিতেন

ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে, বঁধু তারে কেন নিরাশ করে,
নিশি-শেষে এলে রসময়।
বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম্ম নয়।
তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষে,
এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়।
প্যারী ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মরতে চায়
যমুনায় প্রবেশিয়ে॥"

— গান, রামরূপ ঠাকুর।

যজ্ঞেশ্বরী (স্ত্রী-কবি)

ঊনবিংশ শতাব্দীর হইলেও স্ত্রী-কবি বলিয়া যজ্ঞেশ্বরীর নাম এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। এই স্ত্রী-কবির পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। সম্ভবতঃ

ইনি বিক্রমপুরের কবি জয়নারায়ণ সেনের পরিবারভুক্ত মহিলা ছিলেন। পূর্ব্বেও যজ্ঞেশ্বরীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

"অনেক দিনের পরে সখা তোমারে
দেখতে পেলাম চোখেতে।
ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভাল তো আছেন প্রাণেতে॥
ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে॥
বলো বলো প্রাণনাথেরে—
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আসবো তার,
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।
আমার হলো উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে॥
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।
দেখি পাপ-দেশের পাপ-বিচার,
দোহাই আর দিব কার,
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহু-স্বরেতে॥"

—গান, যজ্ঞেশ্বরী।

কোন সময়ে বাঙ্গালা দেশে কবিওয়ালার সংখ্যা অগণিত ছিল। ইহাদের নাম সংগ্রহ ও রচনা উদ্ধার করিতে পারিলে মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইত। বহু সংখ্যক কবিওয়ালার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ অতি অল্প কয়েকজনের নাম ও রচনার নমুনা এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ইহাদের ছাড়া বিশিষ্ট কবিওয়ালাগণের মধ্যে লালু নন্দলাল, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নসাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, মধুসূদন কিন্নর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই কবিগণের মধ্যে গদাধর মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য বিংশ শতাব্দীর কবি।

শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে এই স্থানে আরও কতিপয় কবিওয়ালার নাম দেওয়া গেল। যথা, রামপ্রসাদ, উদয় দাস, পরাণ দাস, কাশীনাথ পাটুনি, চিন্তা ময়রা, বলরাম কাপালী, গোবিন্দ আরজবেগী, উদ্ধব দাস, পরাণ সিংহ, গৌর কবিরাজ ও কাশীচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

(গ) যাত্রাগান

বিষয়বস্তুভেদে যাত্রাগান নানারূপ ছিল। যথা, কৃষ্ণ-যাত্রা, রাম-যাত্রা, চণ্ডী-যাত্রা, (মনসার) ভাসান-যাত্রা ও বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রাকে "কালিয়-দমন" যাত্রাও বলিত। অবশ্য "কালীয়-দমন" ভিন্ন কৃষ্ণ-লীলার নানা বিষয়ই ইহার অন্তর্গত ছিল। যাত্রাগান গাহিবার প্রথমে গৌর-চন্দ্রিকা পাঠের নিয়ম থাকাতে মনে হয় যাত্রাগান মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী। অক্রুর-সংবাদ সখাসংবাদ ও নিমাই-সন্ন্যাস কালিয়-দমনের ন্যায় কৃষ্ণ-যাত্রার প্রিয় বিষয় ছিল।

যাত্রাওয়ালাদিগের মধ্যে কৃষ্ণ যাত্রার নিম্নলিখিত অধিকারীগণ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যথা,—

(১) পরমানন্দ অধিকারী
(১) শ্রীদাম-সুবল অধিকারী
(৩) লোচন অধিকারী
(৪ গোবিন্দ অধিকারী
(৫) পীতাম্বর অধিকারী
(৬) কালাচাঁদ (পাল) অধিকারী
(৭) কৃষ্ণকমল গোস্বামী

এই ব্যক্তিগণের মধ্যে লোচন অধিকারীর অক্রুর-সংবাদ ও নিমাই-সন্ন্যাস গানের করুণরসে দর্শকগণ বিমুগ্ধ হইত। পরমানন্দ অধিকারীর বাড়ী বীরভূম, গোবিন্দ অধিকারীর বাড়ী কৃষ্ণনগর (জাহাঙ্গীর পাড়া), পীতাম্বর অধিকারীর বাড়ী কাটোয়া এবং কালাচাঁদ পালের বাড়ী বিক্রমপুর (ঢাকা) ছিল। গোবিন্দ অধিকারী এক সময়ে কৃষ্ণযাত্রা গাহিয়া প্রচুর যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-যাত্রা রচনাকারীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ যিনি করিয়াছিলেন তাঁহার নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। এইস্থানে গোবিন্দ অধিকারীর ও কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

গোবিন্দ অধিকারী

গোবিন্দ অধিকারী (জন্ম ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) কৃষ্ণযাত্রার পদ রচনা করিতেন এবং শুনা যায় স্বয়ং স্বপরিচালিত যাত্রার দলে দূতিও সাজিতেন। তাঁহার রচিত একটি পদ এইরূপ—

মনোহর সাহী।

"যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,
অন্তর কি কাল তার।
কাল ভালবেসে ভাল
বল কোন কালে হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল, দুঃখে মজে গেল কাল,
কাল ভালবেসে হল আসন্ন কাল গোপিকার॥
এক কালে কথা বলি, ছিল বামন মহাছলী,
তারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার॥
ভুলিয়া বলির বলি, ত্রিপাদ-ভূমি ছলে ছলি,
হরিয়ে বলির বলি পাতালে দিলে আগার॥
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পনখা বেসে ভাল,
সঙ্গি-আশে পাশে গেল তারে কল্লে কদাকার॥
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে কল্লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্লে পরিহার॥"

—গান, গোবিন্দ অধিকারী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

কৃষ্ণ-যাত্রার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ বৈদ্য কুলোদ্ভব সদাশিব কবিরাজ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পিতামহের নাম রামচন্দ্র ও পিতার নাম মুরলীধর গোস্বামী। তাঁহাদের আদিনিবাস সুখসাগর ও পরে বোধখানা (যশোহর)। এই বংশের এক শাখা ভাজনঘাট (নদীয়া) নামক গ্রামে বাস করিতে থাকে। কৃষ্ণকমল ভাজনঘাটের অধিবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধবাচার্য্য সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং পুরুষোত্তমের সন্তান-সন্ততিবর্গ নিত্যানন্দ প্রভুর দৌহিত্রবংশের গুরুবংশ। কৃষ্ণকমলের মাতার নাম যমুনা দেবী। কবির বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর মুরলীধর সেই সময় শুধু পুত্রসহ বৃন্দাবন গমন করিয়া

ছয় বৎসর থাকেন। বৃন্দাবনে থাকিতেই বালক কৃষ্ণকমলের হরিভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্থানে তিনি ব্যাকরণ পাঠেও মনোনিবেশ করেন। কৃষ্ণকমল পরে নবদ্বীপের এক টোলে পাঠসমাপন করেন। পাঠসমাপন করিয়া তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "নিমাই সন্ন্যাস" যাত্রার পালা রচনা করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমল হুগলীর অন্তর্গত সোমড়া বাঁকিপুরে স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পর তাঁহার ধনী শিষ্য রামকিশোরসহ ঢাকায় আগমন উল্লেখযোগ্য। ঢাকাতে তখন অনেক প্রসিদ্ধ যাত্রার দল পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এই স্থানে কৃষ্ণকমল তাঁহার 'স্বপ্ন-বিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। তৎপরে ক্রমে কবির "রাই-উন্মাদিনী", "বিচিত্রবিলাস", "ভরত-মিলন", "নন্দ-হরণ", "সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি নানা পালা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে "স্বপ্ন-বিলাস", "বিচিত্র-বিলাস" ও "রাই-উন্মাদিনী"র খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও কৃষ্ণকমলের গান একেবারে অপরিচিত নহে। ইউরোপ মহাদেশেও কবির উক্ত গ্রন্থত্রয় পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণকমলকে ঢাকার অধিবাসিগণ "বড় গোঁসাই" বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে "পণ্ডিত গোঁসাই"ও বলিতেন। শেষজীবন কবি ঢাকাতে অতিবাহিত করিলেও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার নিকটে গঙ্গাতীরে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সত্যগোপাল ও কনিষ্ঠ নিত্যগোপাল। বৃদ্ধ কবির জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়।[১]

কবি কৃষ্ণকমল তাঁহার গ্রন্থগুলিতে "রাধা-কৃষ্ণ" লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যের কথাই পরোক্ষে কহিয়াছেন। "রাই-উন্মাদিনী" গ্রন্থে ইহা অতি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত চৈতন্য-লীলার ব্যাখ্যার আদর্শই কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদর্শে কবি কৃষ্ণকমল তাঁহার রাধা-চরিত্র অঙ্কিত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিরহিনী রাধাকে অঙ্কিত করিতে যাইয়া তিনি যেন প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য প্রভুকেই চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি যাত্রার পালা রচনা করিতে গিয়া পদাবলীর রচনাকারী

---

(১) কবি কৃষ্ণকমলের পৌত্র (নিত্যগোপাল গোস্বামীর পুত্র) কামিনীকুমার গোস্বামী "কৃষ্ণকমল-গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া কবির রচনাসমূহের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। National Magazine (March, 1894) ও সাহিত্য (পৌষ, ১৩০১ সন) পত্রিকায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী সম্বন্ধে প্রবন্ধদ্বয় এবং তৎরচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

কবিগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। ইহা কৃষ্ণকমলের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কবি শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে রচিত "প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পথ মাঝে—সখি, আমায় যেতে যে হবে গো—রাই বলে বাঁজিলে বাঁশী।"—ইত্যাদি কতিপয় ছত্র ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দদাসের পদের চমৎকার বঙ্গানুবাদ।

কৃষ্ণকমলের ভাষা নানারূপ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। তাহাতে ভাবের গভীরতাও যেমন অধিক আবার একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগও তেমনই লক্ষণীয়। এই শব্দগুলির অধিকাংশই চলতি ভাষায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, যশোদা বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "নাই অবসর, কোথা পাব সর, সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে।"—স্বপ্ন-বিলাস। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন, "খাঁটী দেশী শব্দের এই বিভিন্ন অর্থ-বৈভবের সন্ধান পাইয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা মাতিয়া যান। নূতন কোন সম্পদ পাইলে তাহাতে একটু বাড়াবাড়ি অস্বাভাবিক নহে। যাত্রা ও কবির নেতাগণ এই ক্ষেত্রে অনেকটা বাড়াবাড়ি করিয়া গিয়াছেন। দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কবিদের রচনায় যমক অলঙ্কারের এই ভাবের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কৃষ্ণকমলের খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার সম্পদের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেশী ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছেন, কোন কোন স্থলে যে একটু বাড়াবাড়ি না হইয়াছে তাহা নহে; তিনি শুধু নাম শব্দগুলির দ্বারা যমক অলঙ্কারের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার পদে বিভক্তি ও শব্দাংশ দ্বারা শত শত স্থানে যমক অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টিতে বাঙ্গালা ভাষার মজ্জাগত শক্তি বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক স্থলে উচ্চারণ একই—অথচ শব্দগুলি ভিন্ন, যথা—"যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে"—পদে 'কিশোরীরে' ও 'কি শরীরে' উচ্চারণ একই—উভয়ে ভিন্নার্থবাচক।"—ইত্যাদি (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৫৬০)। ডাঃ সেন আরও বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণকমল অগাধ সংস্কৃত শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য লইয়া খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার মূলগত প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য। ভাবরাজ্যের খুটিনাটি বিভক্তি ও প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল।" (বঃ ভাঃ ও সাঃ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৫৬০)। বাঙ্গালা খাঁটী শব্দগুলির নানারূপ অর্থে ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা যায় কৃষ্ণকমল ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক নহেন। ইহার প্রথম আবিষ্কার কবিগুণাকর

ভারতচন্দ্র করিয়াছিলেন। যথা,—"আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥" (ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাগণের দ্বারা যমক অলঙ্কারের অত্যধিক ব্যবহার বা অপব্যবহার পছন্দ করেন নাই।

যুগল-মিলনে গৌররূপের পূর্ব্বাভাস।

(ক) "আজ কেন অঙ্গ গৌর হলয়ে, ভাবি তাই।
এখন ত আমার গৌর হবার সময় হয় নাই॥
সদাশিব ত অদ্বৈত হয় নাই—(এখনো যে)—
দাদা বলাই যে এখনও হয় নাই নিতাই।
পিতা নন্দ হয় নাই মিশ্র পুরন্দর,
মা যশোদা হয় নাই শচী-কলেবর,
নবদ্বীপ নাম, নিরুপম ধাম,
সুরধুনী তীরে হল না গোচর,
ব্রহ্মা ত হল না, ব্রহ্ম-হরিদাস,
নারদ এখনো হয় নাই শ্রীবাস,
ব্রজলীলার অবকাশ হয় নাই,—(এখনো যে)—
তবে, কি ভাবে এভাব দেখিবারে পাই॥
তা হলে ললিতা হইত স্বরূপ,
বিশাখা হইত রামানন্দ-রূপ,
সখাসখী সবে, আনন্দিতভাবে,
হ'ত কিনা তবে মহান্ত-স্বরূপ;
আর এক মনে হল যে সন্দেহ,
রাধার আমার কেন র'ল ভিন্ন দেহ।
দুই দেহ এক দেহ হয় নাই, (এখনো যে)—
আমি তা বিনে গৌর কভু হব নাই॥"

—কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

(খ) দিব্যোন্মাদ

রাগিণী-টোরি, তাল মধ্যমান।

"তাই বলি ভাইরে সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি।
না বুঝে তার চতুরালী, হারাধন পেয়ে হারালি॥

যখন শ্যাম-সুধাকরে, নয়ন ধরেছিল করে,
তখনি তার কর ধরে মোদের কেন না ডাকিলি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে ক'রে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে ;
কেও ধ'রব তার কমল করে,
কেও থাক্‌ব তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে না'র্‌বে বনমালী ॥"
—দিব্যোন্মাদ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

"কৃষ্ণ-যাত্রা" ভিন্ন অন্যান্য যাত্রাগানগুলিরও বহু প্রসিদ্ধ অধিকারীর সংবাদ পাওয়া যায়। এই অধিকারীগণের মধ্যে "রামযাত্রা"য় প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী এবং জয়চাঁদ অধিকারী যশস্বী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীও "ভরত-মিলন" রচনা করিয়াছিলেন। "চণ্ডীযাত্রা"য় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ। মনসার "ভাসান-যাত্রা" পালায় বিশেষ প্রসিদ্ধ নাম হইতেছে বর্দ্ধমান নিবাসী লাউসেন বড়াল।[১] বিদ্যাসুন্দর "যাত্রার" সুবিখ্যাত গোপাল উড়ের কথা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। কুরুচিপূর্ণ হাল্কা গান রচনায় "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রাগানের অধিকারী গোপাল উড়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্রের আদর্শে রচনা করিতে যাইয়া স্থানে স্থানে ইনি কুরুচিতে ভারতচন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তবে নৃত্যগীতবহুল যাত্রার আসরে তাঁহার চুট্‌কি গান ভাল জমিত। ভারতচন্দ্রের মত কবিত্ব শক্তি না থাকিলেও ক্ষিপ্র গতিসংযুক্ত হইয়া চটুল রসিকতা প্রকাশ করিতে এবং তদ্দ্বারা সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে গোপাল উড়ের তুলনা নাই। গোপাল উড়ের দুই শিষ্য গুরুর নাম অনেক পরিমাণে বজায় রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজনের নাম কৈলাস বারুই এবং অপরজন শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়। গোপাল উড়ে রচিত বিদ্যাসুন্দরের গানের নমুনা এই অধ্যায়ের অন্যত্র দেওয়া গিয়াছে। তবু একটি গান এইস্থানে দেওয়া গেল। যথা,—

জলদ তেতালা।

"মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মিছে কান্না আর কাঁদিস্‌নে,
জ্বালাস্‌-নে আমায় ॥

(১) ভারতী (মাঘ, ১৮৮৮) এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন) দ্রষ্টব্য। সাধারণ যাত্রাদলের যাত্রাওয়ালা হিসাবে কোন সময়ে চন্দননগরের বদন মাষ্টার, ব্রজ অধিকারী ও মহেশ চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মালিনী লো তোর জন্যে,
পূজা হয় না ফুল বিনে,
উপবাসী রাজকন্যে, মরে পিপাসায়।"

—বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, গোপাল উড়ে।

(ঘ) কীর্ত্তন গান

কীর্ত্তন গান বাঙ্গালায় বহু পুরাতন। দেবতা বা মানুষের গুণাবলী গানের ভিতর দিয়া বর্ণনা করাকে ব্যাপক অর্থে কীর্ত্তন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কি শৈব কি শাক্ত দেব-দেবীর গুণকীর্ত্তন শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্যের মধ্য দিয়া প্রচুর করা হইয়াছে। মানুষের গুণ-কীর্ত্তন উপলক্ষে মহীপালের গান (অধুনা লুপ্ত), গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাট-ব্রাহ্মণগণের গানগুলিও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গুণ-কীর্ত্তন মাত্র। মধ্য-যুগ অতিক্রম করিয়া আরও পুরাতন সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে চর্য্যাপদগুলিও একরূপ সাধু-সন্ন্যাসীর রচিত কীর্ত্তন গান। এই সাধু-সন্ন্যাসীগণের মধ্যে শৈব ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই ছিলেন অথবা উভয় মতের প্রকাশক হিসাবে এইগুলি বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে। কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদ-এর দোহাগুলি এই সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতেছে। কৃষ্ণাচার্য্য, লুইপাদ, কুক্কুরিপাদ, ভুসুকু, বির্না, গুণ্ডরী, ডোম্বি, মোহিন্দা, সরহ, ধেণ্ডনা, শান্তি, ভাদে, তন্তক, রাহু, কঙ্কণ, জয়ানন্দ, চৈটেন, ধর্ম্ম এবং শবর নামক সিদ্ধাচার্য্যগণ বৌদ্ধ সহজিয়া সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিয়াছেন এবং ইঁহাদের রচিত দোহা বা চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা দেশে প্রাচীনতম কীর্ত্তন গান বলিয়া তাঁহারা ধার্য্য করিয়াছেন।[১] অবশ্য, এই সব সন্ন্যাসীগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। ইঁহাদের অনেককে আমরা শৈব সন্ন্যাসী বলিতেই অভিলাষী। ইহা ছাড়া বৌদ্ধসহজিয়াগণের রচিত প্রাচীন কীর্ত্তন গানের কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

এত ব্যাপক অর্থে কীর্ত্তন গান না ধরিয়া আমরা সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থে বৈষ্ণব-সমাজে গৃহীত "কীর্ত্তন" নামক এক প্রকার গানের কথাই এই স্থানে উল্লেখ করিব। চৈতন্য-দেবের সময়ের অনেক পূর্ব্বে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ-সভায় জয়দেবের রচিত বৈষ্ণবপদ গীত হইত। ইহা খৃঃ ১২শ শতাব্দীর কথা। খৃঃ ১৪।১৫শ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বৈষ্ণবপদ রচনা ও গান করিয়া

(১) সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রাম-চরিতম্, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

গিয়াছেন। এই সমস্ত গান বৈষ্ণব কীর্ত্তন গানের অন্তর্গত। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনই এই সব পদরচনার উদ্দেশ্য। এই সমস্তই মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্ব সময়ের রচনা। অতঃপর খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব-সমাজ ও তৎসঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র বাঙ্গালা দেশে নব জীবন লাভ করিল এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবন-কথা ও ভাবাবেশ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের রচনার বিষয় হইল। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যের গুণ-কীর্ত্তন পদকর্ত্তাগণের সেই যুগের রীতি হইয়া পড়িল। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বৃন্দাবন ও মাথুর-লীলার মধ্য দিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রকাশ করিতে গোষ্ঠ, মান, মাথুর প্রভৃতি নানা খণ্ডে এই লীলাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণব-পদগুলি ভাগে ভাগে একত্রীভূত করিয়া যে গান গাহিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাই কীর্ত্তন গান বা সংকীর্ত্তন গান। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেন এবং তাঁহার সময়ে শ্রীবাসের অঙ্গন সংকীর্ত্তন গানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একজন প্রধান গায়ক একটি দলের নেতা হিসাবে কীর্ত্তন গান করিতেন এবং তাঁহাকে "কীর্ত্তনীয়া" বলিত। খোলবাদ্য ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। সুর সম্বন্ধে বলা যায়, ইহাতে সংস্কৃত রীতির সঙ্গীতের সহিত দেশী (বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি) সঙ্গীতের সংযোগেও নূতন এক প্রকার সুরে এই কীর্ত্তন গান করিবার নিয়ম ছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে প্রেমদাস রচিত "চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর দলের কীর্ত্তন গান শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভুর দলস্থ গোপীনাথ আচার্য্যকে এই গানের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গোপীনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কীর্ত্তন গানের স্রষ্টা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। আমাদের এই স্থানে যে আলোচনা করা গেল তাহাতে গোপীনাথের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় না। যাহা হউক ইহা ভক্তের উক্তি এবং সম্ভবতঃ মহাপ্রভু এই গানের উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিলেন ইহাই গোপীনাথের কথার মূল তাৎপর্য্য ছিল।

চারি প্রকার রীতিতে কীর্ত্তন গান হইত। যথা, (১) গড়ানহাটী, (২) রেনেটী, (৩) মান্দারণী ও (৪) মনোহরসাহী। প্রথম তিন প্রকার রীতির কিয়ৎপরিমাণ সংমিশ্রণে মনোহরসাহী কীর্ত্তনের উদ্ভব হইয়াছিল। এই চারি শ্রেণীর কীর্ত্তনের নাম চারিটি স্থানকে লক্ষ্য করিতেছে। গড়ান-হাট মালদহ জেলায়, রেণেটী মেদিনীপুরে, মান্দারণ (গড় মান্দারণ) হুগলী জেলায় এবং মনোহর-সাহী (পরগণা) চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। এই চারি স্থানের বৈষ্ণব

কীর্ত্তনীয়াগণ স্ব স্ব স্থানের নামে পদ্ধতিগুলির সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়াছেন। মনোহরসাহী সময়ের দিকে সর্ব্বশেষে উদ্ভাবিত হইলেও এই রীতির কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল। মনোহরসাহী গানের চারিটি সুবিখ্যাত কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। যথা,—কান্দ্রা গ্রাম (বর্দ্ধমান), তিওরা গ্রাম (বর্দ্ধমান), ময়নাডালা গ্রাম (বীরভূম) এবং টেঞা গ্রাম (মুর্শিদাবাদ)। শুনা যায় তিওরা গ্রামের বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী (মহাপ্রভুর সমসাময়িক) নানাপ্রকার সুরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মনোহরসাহী গানের সৃষ্টি করেন। পরবর্ত্তীকালে মঙ্গল ঠাকুর নামে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গদাধরের জনৈক শিষ্য ইহার উন্নতিবিধান বা সংস্কার করেন।

মনোহরসাহী কীর্ত্তন-গায়কগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।* এই কীর্ত্তন-গায়কগণের কাল খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত।

১। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—তিওরা (বর্দ্ধমান)
২। মঙ্গল ঠাকুর— ?
৩। চন্দ্রশেখর ঠাকুর
৪। শ্যামানন্দ ঠাকুর
৫। বদনচাঁদ ঠাকুর
৬। পুলিনচাঁদ ঠাকুর
৭। হরিলাল ঠাকুর
৮। বংশীদাস ঠাকুর
(৩–৮) — কান্দ্রা (বর্দ্ধমান)
৯। নিমাই চক্রবর্ত্তী—পয়ার (বীরভূম)
১০। হারাধন দাস
১১। দীনদয়াল দাস
(১০–১১) — মেরেটা (বর্দ্ধমান)
১২। রামানন্দ মিত্র
১৩। রসিকলাল মিত্র
(১২–১৩) — ময়নাডালা (বীরভূম)
১৪। বনমালি ঠাকুর—কান্দ্রা (বর্দ্ধমান)
১৫। কৃষ্ণকান্ত দাস—পাঁচথুপি (মুর্শিদাবাদ)
১৬। দামোদর কুণ্ডু—কান্দি (মুর্শিদাবাদ)
১৭। কৃষ্ণহরি হাজরা
১৮। কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র
(১৭–১৮) — পাটুলি (মুর্শিদাবাদ)

* History of Bengali Language and Literature (D. C. Sen) 583—584.

১৯। রাম বন্দ্যোপাধ্যায়
২০। মহানন্দ মজুমদার } —সিংহরি (মুর্শিদাবাদ)

২১। স্বরূপলাল ঠাকুর—সতি (মুর্শিদাবাদ)

২২। বিশ্বরূপ গোস্বামী—সোনাইপুর (মুর্শিদাবাদ)

২৩। গোপাল দাস—বাটিপুর (মুর্শিদাবাদ। ইনি ব্রজবুলি মিশ্রিত কীর্তনের পদগুলির ছন্দে বাঙ্গালা ব্যাখ্যার "আখরের" প্রবর্তক। সুতরাং ইনি "আখরিয়া" গোপাল নামে প্রসিদ্ধ হন।)

২৪। গোপাল চক্রবর্ত্তী—পরজ (মুর্শিদাবাদ)

২৫। গোপী বাবাজী—কোটা (মুর্শিদাবাদ)

২৬। নিতাই দাস—তাঁতিপাড়া (বীরভূম)

২৭। নন্দদাস—মারো (বীরভূম)

২৮। অনুরাগী দাস—দখিনখণ্ড (মুর্শিদাবাদ)

২৯। সুজন মল্লিক —বীরনপুর (মুর্শিদাবাদ)

৩০। কৃষ্ণকিশোর সরকার—কাঁচোতলি (নদীয়া)

৩১। রসিক দাস (অনুরাগী দাসের পুত্র)—দখিনখণ্ড (মুর্শিদাবাদ)

৩২। পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী—কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ)

৩৩। শিব কীর্ত্তনীয়া কুষ্টিয়া (নদীয়া)

(৬) কথকতা

পৌরাণিক কাহিনী বা "কথা" বলিয়া শাস্ত্রবাক্য প্রচার করা এক শ্রেণীর লোকের কার্য্য বলিয়া এই দেশে গণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা এই জাতীয় "কথা" বা গল্প বলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে "কথক" বলে। পৌরাণিক গল্পগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী ও ভাগবতের গল্পই প্রধান। কথকঠাকুর গল্প বলিবার সময় শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে কথকতা খুবই জনপ্রিয় ছিল। কথকতা কত পুরাতন তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা যে বহু পূর্ব্বের কোন বিস্মৃত যুগের ইঙ্গিত করে তাহা বাল্মীকির রামায়ণ (অযোধ্যা-কাণ্ড) পাঠে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, বাঙ্গালার কথকগণের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত, সুকণ্ঠ ও সুবক্তা হিসাবে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। গল্প বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে গান করিয়া কথকঠাকুর বক্তব্য বিষয় ভক্তিভাবপূর্ণ ও সুস্পষ্ট করিয়া তোলেন। কথকতার গল্প

ভাষা প্রচুর সংস্কৃত শব্দপূর্ণ হইলেও ইহা এমনভাবে গ্রথিত থাকে যে শুনিতে বেশ মিষ্ট হয় এবং অভ্যাস বশতঃ নিরক্ষর শ্রোতাও মোটামুটি ভাবটি বুঝিতে কষ্ট বোধ করে না। কথকগণ নগর, গ্রাম, দিবা, রাত্রি, নারদ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতি নানা বিষয়ের ও নানা দেব-দেবীর বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়া থাকেন এবং এইজন্য পূর্ব্বরচিত বর্ণনাত্মক বিষয়গুলি অভ্যাস করেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কথকতাও শিক্ষা করিতে হয় এবং পৌরাণিক কাহিনী বলিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী বা রীতি আয়ত্ত করিতে হয়।

কথকতাতে অন্ধকার রাত্রির বর্ণনার একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।—

(ক) "ঘোরা যামিনী, নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী, শান্তা নলিনী কুমুদগন্ধামোদিনী, পৃথ্বীঝিল্লিরবোন্মাদিনী, বিহগরবক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকর-জালমালব্যাপ্তা যামিনী, সভয়চকিতনয়না কামিনী মনোনায়ক নিকটাভিসারিকা নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগ্‌ভ্রান্ত্যাদি জন্য স্থগিত চকিত গতি কষ্টেসৃষ্টে গমন করিতেছেন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ভয়ানক জন্তুসমূহ ভোজনার্থে গমন করিতেছে। প্রতি যামে যামে জাগ্রতভট ঘোর কঠোর চীৎকারধ্বনি প্রবোধিত কান্তাকান্ত প্রবেশিত হৃদয় সঙ্কোচিত ভঙ্গবিভঙ্গদ্বারা গাঢ়ালিঙ্গনে মনোহরণপূর্ব্বক পুনর্নিদ্রাবিষ্ট হইতেছেন।"

—কথকতাতে অন্ধকার রাত্রির বর্ণনা। (History of Bengali Lang. & Lit.—D. C. Sen, পৃঃ ৬৮৬)

মেঘাচ্ছন্ন দিনের বর্ণনা।

(খ) "পূর্ব্বদিগন্তর দেদীপ্যমান, শক্রধনুশোভিত নভোমণ্ডল,
কাদম্বিনী সৌদামিনী চঞ্চল, তদ্দর্শনোদ্বেজিতান্তঃকরণ
মস্তকরিবরারোহণকৃতদেবেন্দ্র নিজায়ুধবজ্রনিক্ষেপশঙ্কিত
ইরম্মদস্খলিত পতিতকণা সমুদ্র গর্জ্জিত বজ্রপতন
ভয়ানক ধ্বনিপ্রতিধ্বনিশ্রবণ সভয়চকিত নয়নোদ্বেজিত
পান্থজন পক্ষিগণগণিতপ্রমাদ সঙ্কটত্রাসিত এককালীন
কুহু কুহু কলরব করিতেছে।"

—কথকতাতে মেঘাচ্ছন্ন দিনের বর্ণনা। (History of Bengali Lang. & Lit.—D. C. Sen, পৃঃ ৬৮৭)

কথকঠাকুরদের মধ্যে কোন সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি ও রামধন শিরোমণির খুব প্রসিদ্ধি ছিল। রামধন শিরোমণি খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে

জীবিত ছিলেন। তিনি কথকতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ করিতেন। আবালবৃদ্ধবনিতাকে তাঁহার কথকতা দ্বারা তুল্যরূপে হাসাইতে কাঁদাইতে পারিতেন। এমনই তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী কথক ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। কৃষ্ণমোহন ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই সময়ের আর একজন কথকের নাম শ্রীধর পাঠক। ইনি কথকতা প্রসঙ্গে অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন।

(চ) উদ্ভট্ কবিতা

কতকটা হেয়ালীর মত একজাতীয় কবিতা জনসাধারণের এক সময়ে খুব প্রিয় ছিল। এই কবিতাগুলিকে "উদ্ভট" কবিতা বলিত। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাঁড়ামোতে বিখ্যাত; গোপাল ভাঁড় হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও কবিবর ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেক রসিক ও কবি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। এই গুণবান ব্যক্তিগণের অন্যতম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল "রস-সাগর"। ইনি "উদ্ভট" কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। এইরূপ এক জাতীয় কবিতার নিয়ম ছিল যে, কেহ কবিতার শেষচরণ বলিয়া পূর্ব্ব-পক্ষ হইতেন এবং প্রতিপক্ষকে অবশিষ্ট চরণগুলি তখনই মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া পূরণ করিতে হইত। কবিতার যে চরণ উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করা হইত তাহার সরল অর্থ থাকিত না, কতকটা হেয়ালী বা প্রহেলিকার মত শুনাইত। এই জাতীয় কবিতা রচনা করিতে পাদপূরণকারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়শঃই রস-সাগরকে এই প্রকার প্রশ্ন করিতেন এবং রস-সাগর সমস্যা সমাধান করিয়া উত্তর দিতেন। এই স্থানে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে রস-সাগর রচিত কতিপয় উদ্ভট কবিতার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। "বড় দুঃখে সুখ।"

"চক্রবাক চক্রবাকী এক(ই) পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চখা কহে চখী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ।"

—রস-সাগর।

২। "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

"কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বাহির।
বারো ইয়ারী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

—রস-সাগর।

৩। "কাঠ পাথরে প্রভেদ কি?"

"তোমার চা'ল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষ্মী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
আমার কাঠের না, দিলে পা,
না' হবে মোর সুনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাঠ পাথরে প্রভেদ কি?"

—রস-সাগর।

(২) গীতিকা-সাহিত্য

গীতিকা-সাহিত্য বঙ্গ-সাহিত্যে এক বিশেষ ভাবের ইঙ্গিত করিতেছে। এতকাল আমরা যে প্রেম-গীতি শুনিয়াছি তাহা আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদপূর্ণ। বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর ন্যায় কোন কাহিনী কদাচিৎ সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। গীতিকা-সাহিত্যে আমরা যে প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা পাই উহা রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা নহে। ইহা নিছক পার্থিব প্রেমের কাহিনী। সাধারণ নর-নারীর উচ্চস্তরের প্রেম-বর্ণনাই গীতিকা সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এই প্রেমের পরিণতি যে নিদারুণ দুঃখে পর্য্যবসিত হয় তাহাও গল্পগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। ছড়া বা গানের ভিতর দিয়া একটি সম্পূর্ণাঙ্গ প্রেম কাহিনীর যে চিত্র এই গীতিকাগুলির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইংরেজি সাহিত্যের "ব্যালাড"এর সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে। তবে এই প্রেম সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী পরিবারসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া দুঃসাহসিক কার্য্যপূর্ণ (adventure) যুদ্ধ-বিগ্রহ বা দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার সংশ্রব পাশ্চাত্য ব্যালাড্ সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু। এই দেশের গীতিকা-সাহিত্যে এই আদর্শের অত্যন্ত অভাব।

এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে ময়মনসিংহ জেলার আইথর গ্রামনিবাসী (পোঃ কেন্দুয়া) ৺চন্দ্রকুমার দে মহাশয় প্রথম সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই জাতীয় সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হন। তিনি চন্দ্রকুমার বাবুর সাহায্যে কতকগুলি পল্লীগাথা উদ্ধার করেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ও সহানুভূতি এইদিকে আকৃষ্ট করিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় স্বদেশে ও বিদেশে এই শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্যের গুণব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেকগুলি পালাগান প্রথমে ময়মনসিংহ ও পরে বাঙ্গালার অন্যান্য জেলা হইতে সংগ্রাহকগণ সাহায্যে উদ্ধার করেন। ইহার ফলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি পালাগান "ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা" নামে ইংরেজী অনুবাদসহ কতিপয় খণ্ডে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এই দুষ্কর কার্য্য অনেকাংশে সমাধা করিয়া তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইলেও সাহিত্য হিসাবে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ যুক্তি-তর্ক কালক্রমে মস্তকোত্তলন করে। তাঁহার অত্যধিক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা একদিকে এবং বিরুদ্ধ সমালোচকের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে তীব্র সমালোচনা অন্যদিকে বিবেচনা করিয়া আমাদের অভিমত এই স্থানে সতর্কভাবে উদ্ধৃত করিতে প্রয়াস পাইব। পালাগানগুলি সঙ্গীতকারক দলবিশেষ পল্লীতে পল্লীতে গাহিয়া বেড়াইত। অবশ্য প্রধান গায়ক একজন থাকিত। লোক-মুখে রচিত চলতি, বিস্মৃত ও অর্দ্ধবিস্মৃত গানগুলি শ্রুত হইয়া পরে সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে এবং ডাঃ সেন উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

এই জাতীয় গানের গুণ প্রচুর রহিয়াছে, তন্মধ্যে কতক ভাষাগত এবং কতক ভাবগত।

এই পালাগান বা গীতিকাগুলির মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, আঁধাবধূ, রাণী কমলা, চন্দ্রাবতী, ঈশা খাঁ, শ্যামরায়, সুরন্নেহা, মাণিকতারা প্রভৃতি গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে ঘটনাগুলি সম্পর্কে এই গানগুলি রচিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ পারিবারিক বা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। পরিচিত ঘটনা অবলম্বনে ইহা রচিত বলিয়া এইগুলিকে কাল্পনিক বলিবার অবকাশ নাই। রাণী কমলা, কঙ্ক ও লীলা, চন্দ্রাবতী, ঈশা খাঁ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহুয়া ও মলুয়ার ন্যায় গল্পগুলিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক কি না বলা যায় না। এইগুলিও হয়ত স্থানীয় কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে পল্লীকবি

কর্তৃক রচিত হইয়াছে। এই জাতীয় পালাগানগুলিকেও নিছক কাল্পনিক বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

এই অমার্জ্জিত পল্লী-গাথাগুলির ভাষায় স্থানীয় শব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্ণনাভঙ্গীও অনাড়ম্বর এবং পল্লীর প্রভাবযুক্ত। সুতরাং বিশেষ করিয়া ভাষার দিকে সংস্কৃতের প্রভাব ইহাতে অল্প এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিগড় হইতে ইহা অনেকাংশে মুক্ত। এই গানাগুলি কবিত্বে ভরপুর এবং ইহাতে বর্ণনাগুলি জীবন্ত। সহজ দুই একটি কথায় ইহাতে নায়ক-নায়িকার মনোভাব বা অন্যজাতীয় বর্ণনা যতটা পরিস্ফুট হইয়াছে এবং পাঠকের বা শ্রোতার চিত্ত হরণ করিয়াছে রাশি রাশি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে উপমা ও তুলনা সাহায্যে ততটা ফল পাওয়া যাইত না। এইরূপ বহু স্থানের মধ্যে নিম্নে দুই একটি স্থান হইতে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) "সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাদ্যার নন্দিনী॥" —মহুয়া।

(২) "ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥" —মহুয়া।

(৩) "আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জোনি যেমন জ্বলে॥
সোণার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ন ভইরা দেখ॥" —মহুয়া।

(৪) "কাল না ডাঙ্গর আঁখি লম্বা মাথার চুল।
বিধি আইজ মিলাইল মধু ভরা ফুল॥" —মহুয়া।

(৫) "কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমিনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে॥
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে ভিজি ঠাডা পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে॥" —মলুয়া।

(৬) "শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন পুরুষেরে॥
এত বলি কলসী কন্যা জলেতে ভরিল।
জল ভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল॥" —মলুয়া।

(৭) "মেঘ আরা আষাঢ়ের রইদ গায়ে বড় জ্বালা।
স্নান করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা॥" —মলুয়া।

(৮) "পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জ্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর।
ডুইবা৷ দেখি কত দূরে আছে পাতালপুর॥
পূবেতে গজ্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কই বা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥" —মহুয়া।

(৯) "দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপরে ভাসে পুন্নু মাসীর চান॥
আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী॥" —চন্দ্রাবতী।

(১০) "শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দে পথে পথে॥" —কঙ্ক ও লীলা।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রশংসা[১] কিছু অত্যধিক হওয়াতেই যত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম কথা সময় সম্বন্ধে। ডাঃ সেন মনে করেন কোন কোন পল্লী-গীতি খুব প্রাচীন। উহা এত প্রাচীন যে চণ্ডীদাসের সময়ের বলা যাইতে পারে। কোন কোন পল্লী-গাথাকে তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক মনে করেন। চণ্ডীদাসের পদে আছে "জিহ্বার সহিত দন্তের পীরিতি, সময় পাইলে কাটে" এবং "ধোপার পাটে" আছে "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি আর ছলাতে কাটে।" লোচন দাসের পদে আছে "ফুল নও যে কেশের করি বেশ" আর মহুয়াতে আছে "ফুল যদি হৈতারে বন্ধু ফুল হৈতা তুমি। কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইরা বানতাম বেণী॥" এইরূপ নানাস্থানে বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পল্লী-গাথাসমূহের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা ছাড়া "কঙ্ক ও লীলা" গল্পের কঙ্ক মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আদি বিদ্যা-সুন্দর কাহিনীর অন্যতম রচনাকারী। দ্বিতীয় কথা, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ইহাও মনে করেন যে এই পল্লী-গীতিকাগুলি বৈষ্ণব সাহিত্য দ্বারা আদৌ প্রভাবিত নহে। সুতরাং তাঁহার মতে উক্ত সাদৃশ্য হইতে কি মনে করা যাইতে পারে? বৈষ্ণব সাহিত্যই হয় পালাগানগুলির কাছে উল্লিখিত উক্তিগুলির কাছে ঋণী, নতুবা উভয় সাহিত্যের মূল উৎস অন্য কোন স্থানে রহিয়াছে। আমাদের কিন্তু ধারণা হইয়াছে দুই একটি পালা গান ১৬শ।১৭শ

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা দ্রষ্টব্য। মৎরচিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা", "পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা", পাঞ্চজন্য (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০) দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীর হইলেও অধিকাংশ পালাগানই ১৮শ।১৯শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে পালাগানের প্রভাব না পড়িয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী হিসাবে পালাগানের উপরই বৈষ্ণব প্রভাব কিছুটা পড়িয়াছে এবং সেইজন্য উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে উক্তির সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া সাধারণ প্রবাদ বাক্যও উভয় সাহিত্যে গৃহীত হইয়া থাকিবে। ডাঃ সেনের আমলে তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে সংগৃহীত পালাগানে অনেক পরিমাণে ভেজাল চলিয়াছিল বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচক পালাগানগুলি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া থাকেন। এবং এই সন্দেহ সবটাই অমূলক না হইতেও পারে। ডাঃ সেনের প্রশংসা কিছুটা মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়াতে এক শ্রেণীর সমালোচকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। ইহা ছাড়া, ইহা ভুলিলে চলিবে না যে মফঃস্বল হইতে বেতনভোগী সংগ্রাহকগণ গানগুলি সংগ্রহ করিয়া হাতে লিখিয়া ডাঃ সেনকে পাঠাইতেন। অবশ্য তাঁহাদের পরিশ্রমও অস্বীকার করা যায় না। তবু, আমরা বলিব খাঁটি পালাগানগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্ব কবিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সুন্দর ভাষায় ডাঃ সেন অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন তাহা ন্যায্যই হইয়াছে। এই জাতীয় সাহিত্য খুব পুরাতন হইলেই গুণ অধিক হইবে এই বিশ্বাসও আমাদের নাই। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সময়ের প্রাচীনত্ব বা নবীনত্বের অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় কথা, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গীতিকাগুলির সাহিত্যিক সমালোচনা খুবই ভাল, অপর জাতীয় সমালোচনা তত ভাল নহে এবং পল্লীগীতিকার নারী-চরিত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য তিনি করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমরা মোটেই একমত নহি। বাঙ্গালার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে কটাক্ষ করিয়া এই নারীগণের চরিত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। বরাবর সর্ব্বদেশে এবং এই দেশে প্রেমের যে ধারা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সাহিত্যে এবং বৈদেশিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রেম-লীলা তাহা হইতে পৃথক নহে। সব সমাজেই এইরূপ ঘটনা ঘটে এবং সব সমাজেরই নিয়ম যুবক-যুবতীর প্রেম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। ইহাতে তবে নূতনত্ব কোথায়? এক স্থানে অবশ্য নূতনত্ব আছে। ইহা একদেশদর্শী প্রেম। নারী সবই ত্যাগ করিতেছে আর পুরুষ চরিত্রগত দৌর্ব্বল্য দেখাইতেছে। বাঙ্গালী নারীর সহিষ্ণুতার ইহা চরম পরীক্ষা হইলেও পুরুষচরিত্রের পক্ষে ইহা শোভন নহে। সুতরাং পল্লীগীতিকার নারীচরিত্র খুব প্রশংসাযোগ্য হইলেও এই জাতীয় নারীর জন্য গৌরব বোধ অপেক্ষা দুঃখই অধিক হয়। যাহা হউক নানাদিক

বিচার করিয়া আমরা সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানা সংবাদ বহন করিবার জন্য, বর্ণনার উৎকর্ষতার জন্য, অনেক ক্ষেত্রে এক তরফা হইলেও প্রেমের নিকট নারীর আত্মবলিদানের জন্য, ভাষা ও কবিত্বের সৌন্দর্য্যের জন্য এবং ধর্মকাহিনীর পথে না গিয়া নর-নারীর পার্থিব প্রেম বর্ণনার জন্য আমরা এই পল্লীগীতিকাগুলির প্রশংসাই করিব। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই বলা গেল।

কথাসাহিত্য (ব্রতকথা, রূপকথা, বাঙ্গকথা ও গীতিকথা) এই জনসাহিত্যের মধ্যে পড়িলেও প্রাচীনত্বের দিক দিয়া ইহা আদি যুগের অন্তর্গত করা গিয়াছে। ইহা ছাড়া মঙ্গলকাব্যের ন্যায়, সাহিত্যের মূল হিসাবে এই জনসাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে হইয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

প্রাচীন গদ্য সাহিত্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় সবটাই পদ্যে রচিত। তবে ইহাতে গদ্যের ভাগ যে একেবারেই নাই তাহাও বলা যায় না। আদি যুগের শূন্য-পুরাণেও কিছু কিছু গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন যুগের গদ্য লিখিবার হেতু ও প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রধানতঃ বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট ও সহজ করিবার জন্য প্রথমে পদ্যের সহিত কিছু গদ্যও মিশ্রিত থাকিত। এই গদ্যকেও ছন্দের অন্তর্গত কল্পনা করিয়া "গদ্য ছন্দ" কথার ব্যবহার ছিল। কথকতার ন্যায় নানারূপ প্রাচীন কথাসাহিত্যেও বক্তব্য বিষয় মনোরম ও সহজবোধ্য করিবার জন্য পদ্যের সহিত গদ্যের প্রচলন ছিল। কথকতা ছাড়া এই শ্রেণীর গদ্যে ভাষা যথাসম্ভব সরল করা হইত। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মবিষয়ক সাহিত্যে, যথা শূন্য-পুরাণে ও সহজিয়া সাহিত্যে, ভাষা সরল হইলেও ইহাদের ভিতরকার বিশেষার্থ-ব্যঞ্জক গূঢ় ও রহস্যময় ভাব বুঝা শক্ত ছিল। প্রাচীন কালে প্রথম যুগের গদ্যে সংস্কৃত শব্দের অভাব এবং প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মানুষ সাধারণ কথাবার্তা বলিতে অথবা চিঠিপত্র লিখিতে অবশ্য পদ্য ব্যবহার করে না। এই দিক দিয়াও পদ্য সাহিত্য গদ্য সাহিত্যে রূপান্তরিত হইবার পথ পাইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম যুগে কথিত ও লিখিত ভাষার প্রভেদও বেশী ছিল না। দ্বিতীয় যুগে, মুসলমানি আমলে একদিকে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে সংস্কৃত এবং অপরদিকে আরবী ও ফারসী (তৎকালীন রাজভাষা) প্রবেশ লাভ করিল। রাজকার্যে দলিলাদি সম্পাদনে সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত প্রচুর পরিমাণে উর্দ্দু ভাষার অপূর্ব্ব সংমিশ্রন ঘটিল। ভারতচন্দ্র তো আরবী ও ফারসী ভাষার সংমিশ্রনে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জাতীয় ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা নামে পরিচিত হইয়া মুসলমান সাহিত্যিকগণ দ্বারা পদ্যে ও গদ্যে বহুল পরিমাণে রচিত হইয়াছিল। অপরদিকে বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ পদ্যে ব্রজবুলির আমদানি করিয়াছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতির দিক দিয়া বলা যায় হিন্দু রাজসভায় রাজকার্যে বহুল পরিমাণে সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। গদ্যে শাস্ত্র বুঝাইতে যাইয়া "কথক"গণও প্রচুর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিতেন। ক্রমে সাধারণ চিঠি লেখার আদর্শ পর্য্যন্ত সমাসবদ্ধ সংস্কৃত

শব্দবহুল হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম যুগের সরল বাঙ্গালা গদ্য দ্বিতীয় যুগে বিশেষভাবে রূপ পরিবর্ত্তন করিল। গদ্য সাহিত্যে নানারূপ বিবরণ ও ইতিহাস যাহা রচিত হইয়াছিল তাহাতে ভাষায় সংমিশ্রণ থাকিলেও সরল করিবার দিকে লক্ষ্য ছিল। গদ্য সাহিত্যের তৃতীয় যুগে,[১] (আধুনিক যুগে) খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শ্রীরামপুর মিশনারীগণের এবং তন্মধ্যে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের কর্ত্তা রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরির প্রচেষ্টায় এবং উৎসাহে দেশীয় পণ্ডিত ও ইউরোপীয়ানগণ দ্বারা কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা রীতিমত ভাবে আরম্ভ হয়। এই কলেজের বাহিরেও কতিপয় লেখক গদ্যে কথিতভাষা ব্যবহার করিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ইউরোপীয় নানা ভাষার শব্দ মধ্যে বিশেষ করিয়া পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার অনেক শব্দ এবং কিয়ৎ পরিমাণে রচনারীতি বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে সহজ বাঙ্গালার মধ্যে সংস্কৃতের আদর্শ রাজা রামমোহন রায় প্রচলন করিতে চেষ্টা পান। ইহার কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গালা ভাষার ভিতরে সংস্কৃতের আদর্শ বিশেষরূপে গৃহীত হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষার আদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ লাভ করে। ইহার পরে পুনরায় দেশী (তদ্ভব) ও সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ যোগে বাঙ্গালা সাহিত্য রচিত হইতে থাকে এবং বঙ্কিমচন্দ্র (খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক হ'ন। ইতিপূর্ব্বে ইহা "গুরু-চণ্ডাল" নামক সাহিত্যিক দোষরূপে গণ্য হইত। আধুনিক গদ্য সাহিত্যের চতুর্থ যুগে স্বল্প সংস্কৃতজ শব্দের সহিত বেশীর ভাগ কথ্যভাষা মিশ্রিত হইয়া "চলতি" ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ইহা সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। তবে বাঙ্গালা সাহিত্যে লঘু ও গুরু বিষয়ের ভেদে এবং বিষয়বস্তুর তারতম্যানুসারে দেশী ও সংস্কৃত রীতির ব্যবহার এখনও চলিতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালার গদ্যে ছেদ চিহ্ন বা যতি চিহ্নের বড় অভাব ছিল। পদ্যের ন্যায় শুধু এক দাড়ি ও দুই দাড়ি দ্বারা পূর্ণ ছেদ বুঝান হইত। কোন কোন রচনায় বিরাম-চিহ্ন

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় ও অক্ষরে এই দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলীতে মুদ্রিত হয়। ইহারও অনেক পূর্ব্বে ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে লিসবনে (পর্ত্তুগাল) পাদ্রী এসাম্পসাঁও একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত ও কথোপকথন সম্বলিত গ্রন্থ (বঙ্গানুবাদ) বাঙ্গালা শব্দগুলি রোমান অক্ষরে পরিবর্ত্তিত করিয়া মুদ্রিত হয়। গ্রন্থগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন। Manoel da Assumpcam's Bengali Grammar (Ed. & Trans. by S K. Chatterji & P. R. Sen) এবং Brâhman Roman Catholic Sambad (ed. by S. N. Sen) দ্রষ্টব্য।

ঘন ঘন থাকিলেও অধিকাংশ রচনায় উহা বহু দূরবর্ত্তী থাকিত। পাঠ করিবার সময় অর্থ বুঝিয়া বিরাম চিহ্নগুলির অভাব অনুমান করিয়া লইতে হইত এবং তদনুযায়ী পাঠ করিতে হইত। এখনকার ন্যায় নানারূপ বিরাম-চিহ্নের পূর্ব্বে ব্যবহার ছিল না। প্রাচীন কালের বিভিন্ন গদ্য-রচনার আদর্শগুলি নিয়ে দেওয়া গেল। সময়ের দিক দিয়া খৃঃ ১১শ শতাব্দী হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্যান্ত এবং উনবিংশ শতাব্দীর কিয়ৎকাল পর্যান্ত ইহা প্রদর্শিত হইল।

১। শূন্য-পুরাণ (১)

(খৃঃ ১১শ শতাব্দী ?)

(ক) "হে মধুসূদন বার ভাই বার আদিত্ত হাত পাতি লেহ, সেবকের অর্ঘপুষ্পপানি সেবক হব সুখি ধর্ম্মাং কল্পি গুরুপণ্ডিত দেউলা দানপতি মাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি ভাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডার-পাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকুতি এহি, দেউলে পড়িল জঅ-জঅকার।"

শূন্য-পুরাণ, রামাই পণ্ডিত।

(খ) "পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত সেতাই জে চারিসএ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্র কোটাল জে জে বসুয়া ঘটদাসী দুত নাহি ডরায় ভুঙ্কাক দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাজি পরিমাণ করে।"

—শূন্য-পুরাণ, রামাই পণ্ডিত।

২। চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি

(খৃঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দী)

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস রচিত বলিয়া কথিত। ইহাতে তান্ত্রিক উপাসনার নানারূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিবৃত হইয়াছে। যথা,—

"চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ নাড়ি। রা অক্ষরে রাগ নাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা নাড়ি। রএতে চ মিশিল। রাএতে বসিল। ইহা এক অজানাড়ি॥"

—চৈত্যরূপ প্রাপ্তি, চণ্ডীদাস।

(৩) কারিকা[২]

(খৃঃ ১৬শ শতাব্দী)

রূপগোস্বামী রচিত একখানি ক্ষুদ্র গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল।

(১) রামাই পণ্ডিতের সময় নিয়া মতভেদ আছে। ইনি খৃঃ ১১শ শতাব্দীর ব্যক্তি হইলে ইঁহার রচনায় কিছু পরিমাণে পরবর্ত্তী হস্তক্ষেপের চিহ্ন আছে বলিতে হইবে।

(২) বান্ধব, ১২৮১ সন, অষ্টম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"শ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই। হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।" ইত্যাদি।

—কারিকা, শ্রীরূপ গোস্বামী।

(৪) রাগময়ীকণা

(খৃঃ ১৬শ শতাব্দী)

এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত। ইহা পদ্যগ্রন্থ হইলেও তিনি স্থানে স্থানে সূত্রের অর্থ পরিষ্কার করিতে গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন।

"রূপ তিন তিন। কি কি রূপ—শ্যাম১ শ্বেত২ গৌর৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ জীউর পঞ্চ নাম। গুণ তিন মত হয় কি কি গুণ। ব্রজলীলা১ দ্বারকালীলা২ গৌরলীলা৩। দশা তিন কি কি দশা।" ইত্যাদি।

—রাগময়ীকণা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

(৫) দেহকড়চা

এই সহজিয়া গ্রন্থের প্রণেতার নাম জানা নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৪ সাল, ২য় সংখ্যা) পুথিখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ভাষা খুব সরল ও সহজে বোধগম্য।

"তুমি কে॥ আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ববস্তু হইতে। তত্ত্ববস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্রিয়। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল যেকযোগে ভাণ্ড হইল। পঞ্চ আত্মা কে কে। পৃথিবী। আপ। তেজঃ। বাউ। আকাশ। একাদশেন্দ্রিয় কে কে। কর্ম্ম ইন্দ্রিয় পাঁচ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ। আবরণ এক॥"

—দেহকড়চা।

(৬) ভাষা-পরিচ্ছেদ

এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত "ভাষা-পরিচ্ছেদ" গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদ। গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছু জানা নাই।

"গোতম মুনিকে শিষ্যসকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কত্তো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার।

দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।" ইত্যাদি। —ভাষা-পরিচ্ছেদ।

(৭) বৃন্দাবনলীলা

দেড়শত বৎসরের একখানি খণ্ডিত পুথি। ইহার লেখকের কোন পরিচয় জানা যায় নাই। এই পুথিখানিতে ভাষার নমুনা নিম্নরূপ—

"তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চরণ পাহাড়ি পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনু বৎসের এবং উটের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন, যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কামাবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারিস্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম নাঞী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড়বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোটবেস শাহি তাহাতে লক্ষ্মী-নারায়ণের এক সেবা আছেন, তাহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে সেরগড। গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্ব্ব পশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর জাইতে বামদিগে এক অটালিকা অতি গোপনীয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের সৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক।" ইত্যাদি। বৃন্দাবনলীলা।

বিস্ময়ের বিষয় লেখক বৃন্দাবনের প্রতি সম্মান ও ভক্তি দেখাইতে গিয়া অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে অচেতন পদার্থেও সম্মানার্থক ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে রচনা খুব প্রাঞ্জল সন্দেহ নাই।

(৮) বৃন্দাবন-পরিক্রমা

(খৃঃ ১৮শ শতাব্দী)

প্রাপ্ত পুথিখানির তারিখ ১১১৮ সাল। ইহার ভাষা অনেকটা "বৃন্দাবন-লীলার" ভাষার ন্যায় সহজবোধ্য অথচ ইহাতে "বৃন্দাবন-লীলার" ন্যায় সম্মানার্থক ক্রিয়ার বাহুল্য নাই। পুথিখানির একটি বিশেষত্ব এই যে সুদীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে বিরাম চিহ্নের একান্ত অভাব। লেখক অজ্ঞাত।

"দক্ষিণে হরিদুআর বৈরাগ-গঙ্গা তাহার দক্ষিণ গোরুওকুণ্ড তাহার পশ্চিম ব্রহ্মকুণ্ড তাহার দক্ষিণ সূর্য্যকুণ্ড তাহার দক্ষিণ গ্রাম-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রত্নসিংহাসন হিন্দোলা অক্ষয় বট ৮৪ খাম্বা এক ঘেরার মধ্যে আর ব্যাসদেবের

সহ স্থির লিখন আছে পাষাণে তাহার নিকট শ্রীগোপীনাথ জীএর সেবা তাহার মধ্যে দক্ষিণ গ্রাম-মধ্যে গোবিন্দ জীএর সেবা শ্রীমন্দিরে একদিকে শ্রীবৃন্দাদেবী আর একদিকে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রাস-মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর বিরাজমান তাহার সৌভাগ্য বাক্য—অগোচর শ্রীবৃষভানুপুরের বায়ব্য কোণে পাহাড়ের উপর······পেছলা খেলা তাহাতে যাবকের চিহ্ন আছে তাহার পূর্ব্ব এক ক্রোশ বৃষভানুপুরের ঈশান কোণে প্রেম-সরোবর তাহার চৌদিগে কেলিকদম্বের বন তাহার উত্তর এক ক্রোশ সঙ্কেতের স্থান শ্রীমন্দির আছে তাহার উত্তর এক ক্রোশ নন্দগ্রাম নন্দগ্রামের দক্ষিণ যশোদাকুণ্ড নিকট দধিমন্থনের হাড়ী আছে তাহার পর পর্ব্বতের উপর শ্রীনন্দ·····বাসী সেবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম শ্রীমন্দির দক্ষিণ দুয়ারি শ্রীনন্দজী ডাহিনে বলরাম তার ডাহিনে শ্রীকৃষ্ণজীএর ডাহিনে তাহার মাতা শ্রীযশোদা এই মন্দিরের পশ্চিমে পাবন-সরোবর তাহার অগ্নিকোণে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুঠরী নন্দগ্রামের পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ কদম্বখণ্ডি তাহাতে কেলিকদম্বের গাছ অনেক আছে তাহার পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ ভুড়িবন তাহাতে ঠাকুর টুস্কি দিয়া সঙ্কেত করিয়াছিলেন (ইত্যাদি)।"[১]

—বৃন্দাবন পরিক্রমা

(৯) সহজিয়া গ্রন্থসমূহ

বৈষ্ণব সহজিয়া মতের গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু গদ্য রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা জ্ঞানাদি-সাধনা, দেহকড়চা, রসভক্তি-চন্দ্রিকা বা আশ্রয় নির্ণয় (চৈতন্যদাসকৃত) ও সহজ-তত্ত্ব (রাধাবল্লভ দাস কৃত) হইতে কতিপয় ছত্র উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। ইহা ছাড়া ত্রিগুণাত্মিকা, দেহভেদতত্ত্ব নিরূপণ, দ্বাদশপাট নির্ণয়, প্রকাশ্য নির্ণয়, সাধন-কথা প্রভৃতি সহজিয়া গ্রন্থেও প্রচুর গদ্য সাহিত্যের পরিচয় আছে। এই পুথিগুলির অধিকাংশই খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে রচিত। সহজ-তত্ত্ব হইতে এই স্থানে কতিপয় ছত্র দেওয়া গেল।

সহজ-তত্ত্ব (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী)—"ঈশ্বরের শক্তি। সত্ত্বরজস্তমঃ। তিনে এক হয়্যা থাকে। মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর-ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয়। ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে। মানুষ ঈশ্বর-তনু জানে সর্ব্বজনে। মানুষ ঈশ্বর-ছাড়া হয় কিরূপে কহি যে শুন। তাহার প্রমাণ গোপীজন যান তৈল হরিদ্রা মাখিয়া যমুনাতে স্নান করে যেন। গোপী আর সখী যেন তাতে অঙ্গের মলা যায়

(১) বিন্দুচিহ্নিত স্থানগুলির অক্ষর বুঝা যায় না।

জন্ম। তেমতি সে গতাগতি হইয়া থাকে। সদাই প্রকট সে। কেহ নাই দেখে।”
—সহজ-তত্ত্ব, রাধাবল্লভ দাস।

(১০) দেবডামর তন্ত্র

তন্ত্রসাহিত্যেও কিছু গদ্যের নিদর্শন আছে। দেবডামর তন্ত্র নামে একখানি প্রাচীন তন্ত্রে নিম্নলিখিতরূপ গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাকারী অজ্ঞাত।

“গোঁসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াল পাই মুই অকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া।”
— বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথি।

(১১) কুলজী-পটী-ব্যাখ্যা

(খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে পুনর্লিখিত)

এই কুলজী গ্রন্থে সহজ গদ্যের নমুনা রহিয়াছে। ইহার ছত্রগুলি দীর্ঘ নহে এবং পূর্ণ ছেদচিহ্ন দাঁড়িরও অভাব নাই। তবে কুলজী শাস্ত্রের বিশেষার্থবোধক শব্দগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কুলজ্ঞগণ কোন সময়ে সমাজে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও যথেচ্ছাচার চালাইতেন।

“কিছুকাল অন্তে অবসাদে পটী। মুকুন্দ ভাহুড়ীতে জন্মিল দর্পনারায়ণী। সে দর্পনারায়ণী কিমং। মুকুন্দ ভাহুড়ীর পুত্র গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী বিবাহ করেন রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্যা। কুলজ্ঞরা গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে। শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী কুলজ্ঞদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল উষ্মা। কুলজ্ঞরা কহিলেন যে হায় কুলীন হয়ে কুলজ্ঞের উপর এত অহঙ্কার। দেখ দেখি শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ীর কি দোষ আছে। কুলজ্ঞরা বিবেচনা ক'রে দেখিলেন যে রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুর সেই হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ ঠাকুর। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোত্তাখানায় সাতকৈড়ি নামে ব্রহ্মহত্যা হয়। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কন্যা দেন দুর্লভ মৈত্রে। সেই দুর্লভ মৈত্রের বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী ভায়রা সম্বন্ধে যাতায়াত করেন। অতএব ভোজন করিয়া থাকিবেন। কুলজ্ঞরা শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন। আস্তাড়ে গেলেন মুকুন্দ ভাহুড়ীর নিকট। কহিলেন যে হে মুকুন্দ ভাহুড়ী তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ীতে

জন্মিয়াছে দর্পনারায়ণী। তুমি যদি পুত্র সম্বরণ কর তোমাকেও দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িব। আর পুত্র যদি উপেক্ষা কর তবে তুমি যে আউটুষ গাঞির প্রধান সেই আউটুষ গাঞির প্রধান থাকিবে। মুকুন্দ ভাদুড়ী পুত্র উপেক্ষা না ক'রে পুত্র সম্বরণ ক'রে করণ কারণ করিলেন। মুকুন্দে অনন্তে করণ, মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, অনন্ত লাহিড়ী আর মুকুন্দ সান্ন্যালে করণ। মুকুন্দ মুকুন্দ অনন্ত ধ্রুব এই চারি মুখ্য ধারায় দুর্লভ মৈত্র। কুলজ্ঞরা পাঁচ কর্ত্তাকেই দর্পনারায়ণী দিয়ে আস্তাড়িলেন।" ইত্যাদি। —পটী-ব্যাখ্যা।

(১২) স্মৃতিগ্রন্থ[১]

কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যে ও পদ্যে রচিত হইয়াছিল। রাধাবল্লভ শর্ম্মা বিরচিত "সপিণ্ডাদি-বিচার" নামক পদ্যগ্রন্থের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। গদ্যে রচিত দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একখানির নাম "স্মৃতিকল্পদ্রুম"। এই গ্রন্থখানি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থখানির সংবাদ ময়মনসিংহ সেরপুরের মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় দিয়া গিয়াছেন। খোঁজ করিলে এইরূপ আরও গদ্য স্মৃতিগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। "ব্যবস্থাতত্ত্ব" নামক (কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত) প্রাপ্ত প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থখানিও গদ্যে রচিত।

(১৩) প্রাচীন পত্রাবলী

(ক) কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। রাজকীয় পত্রের নিয়মানুযায়ী ইহার প্রথমাংশ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দপূর্ণ।

"স্বস্তি সকল-দিগ্‌দন্তি-কর্ণতালাস্ফাল-সমীরণ প্রচলিত-হিমকর-হার-হাস-কাশ-কৈলাস-পাণ্ডুর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশতরঙ্গিণী সলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ-প্রচণ্ড-ধীর-ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবার সকল-দিক্-কামিনী-গীয়মান-গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ-প্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সং, দীনেশচন্দ্র সেন), পৃঃ ৫০৮ দ্রষ্টব্য।

উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বৃদ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয়, না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কৰ্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উভয় চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিত্তাপ বিদায় দিবা।

অপর উকিল সঙ্গে ঘুড়ি ১ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর নালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ২ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ১০ শুক্ল-চামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"[১]

(খ) মহারাজ নন্দকুমার খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ রায় এবং দীননাথ সামন্তজীউর নিকট দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার একখানি নিম্নরূপ ছিল। বলা বাহুল্য ভাষা উর্দ্দু মিশ্রিত হইলেও সহজে বোধগম্য।

"অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকররর, মকররর জানিবা। নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মসুব্বা কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।"[২]

—মহারাজ নন্দকুমারের পত্র।

(গ) ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের একটি তাম্রশাসনে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হয়। যথা,—

"৭ স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্যদেব বিষম সমরবিজই মহামহোদধি রাজনামদেশোঽয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল মৌজে যোলনল অক্ত হামিলা ১৷৵ আঠার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম, এহার পাঁঠা পক্ষক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭—১৯ কার্ত্তিক।"

—মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত তাম্রশাসন।

---

(১) "আশাবর্ত্তি" (২৭শে জুন, ১৯০১ সন) দ্রষ্টব্য।

(২) National Magazine (September, 1892)—an article by Beveridge

(ঘ) খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলা নিম্নলিখিত পত্রখানি ড্রেক সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। নিম্নপ্রদত্ত ছত্রগুলি রাজীবলোচনকৃত অনুবাদ।

"ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি অনেক অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন, এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তাঁর রাজ্যের বাহুল্য হয় না, এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন, মহাজন, কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন? অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্রই এখানে পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয়বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক, কিন্তু আর আর সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক, সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।"

— নবাব সিরাজুদ্দৌলার পত্র।

(ঙ) পত্র লেখা, বিশেষতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পত্রবিনিময়ের আদর্শ, মধ্যযুগের শেষভাগে প্রচলিত শিশুপাঠ্য পুস্তক শিশুবোধকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এইরূপ পত্রের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর লিপিরচনার সমাসযুক্ত সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ও অনুপ্রাসবহুল গদ্য আদর্শ এইরূপ ছিল। যথা,—

স্ত্রীর পত্র

শিরোনামা—"ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক

শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু।"

"শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরং লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছে, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়

কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুইকালের সুখকর বিবেচনা করিবেন।...অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।" —শিশুবোধক।

স্বামীর উত্তর

"শিরোনামা—প্রাণাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণ: ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনাঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুভমিবিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস ব্যতিরিক্ত উদ্‌ভ্রান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতাপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুশোভিত মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রবেত্তা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীঘ্রান্তে নিতান্ত সংযোগপূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিদ্যোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনামিতি।" - শিশুবোধক।

(১৮) আদালতের আরজির দৃষ্টান্ত

(ক) (১৬৮৮-১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ)

"৬ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

সন ১০৯৬।

মহামহিম দেওয়ানি আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু

আরজি শ্রীরামকান্ত চন্দ্র সাং বিষ্ণুপুর—

আসামী শ্রীসদারাম মহান্ত চকলা তথা সাং ইন্দাষ মকদ্দমা ইহার স্থানে আমার এক কিত্তা তমসুক দিয়া ট° ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা আর চটা বাবুদ ৫০৲ পঞ্চাশ তঙ্কা একুনে ৫৫০৲ পাঁচশত পঞ্চাশ তঙ্কা সররতি করি দেয় না একারণে নালিশ সাহেব ধর্ম্ম-অবতার হক আদালত করিয়া আসামী আদালতকে হুকুম করিয়া আমার টাকা দেলাইয়া দিয়াতে হুকুম হইবেক আমি গরীব সাহেব ধর্ম্ম-অবতার আমার পানে নেকনজর করিয়া দেলাইয়া দিআইবেন এই আরজ নিবেদন করিলাম—সন ১০৯৬ সালে তা: ১১শে আষাঢ়।"—আদালতের আরজি।

(খ) "৺শ্রীশ্রীহরি

সন ১০৯৭

মহামহিম ফৌজদার আদালতের শ্রীযুত সাহেব বরাবরেষু

চাকালাই বিষ্ণুপুর সাং বাণপুর শ্রীরামকান্ত ঠাকুর—

আরজ নিবেদন আমার এই সাকিমের শ্রীমাণিক রায় স্থানে আমার মূল ১০৲ দশ তঙ্কা পানা ছিল তাহাতে আমি আসামী মজ্কুরে স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না আমাকে দুই চারি বদ জবান গালি দিলাক এবং আমাকে মারিতে উদ্যত হইল এ কারণ নালিশ আসামী মজ্কুরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হএ আমি গবির প্রজা সাহেব ধর্ম্ম-অবতার আমা বারে যেমত হুকুম হএ এতদর্থে আরজ নিবেদন লিখিয়া দিলাম ইতি ৭ সেবন।"—আদালতের আরজি।

আদালতের আরজি ও দলিলাদি সম্পাদনে আরবী, ফারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত গদ্য-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। টাকা ঋণ-গ্রহণের দলিলে সংস্কৃত এই কয়টি কথার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে। যথা, —"কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে লিখিতং শ্রী" ইহা দ্বারা মুখবন্ধ করিতে হয়।

(গ) দুইখানি প্রাচীন দলিলে (জয়পত্রে) "পরকীয়া" মত প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। ইহাতেও আদালতের মিশ্রিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের একখানি (তারিখ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ বা ১১০৫ সাল) এইরূপ। যথা,—

"শ্রীশ্রীহরি

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ

শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ	শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ	শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ
শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ দেবশর্ম্মণ	শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ

প্রভুসন্তানবর্গেষু—শ্রীবল্লভীকান্ত দেবশর্ম্মণ

স্বধর্ম্মাশ্রিত শ্রীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং সুপুর তস্য পর শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং লোতা তস্য পর শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ সাং সুদপুর তস্য পর

শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ সাং শ্রীপাট খড়দহ তস্য পর শ্রীবল্লভীকান্ত দেবশর্ম্মণ সাং বীরচন্দ্রপুর তস্য পর শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং গএষপুর তস্য পর শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং কানাইডাঙ্গা। --

প্রভুসন্ততিবর্গেষু —

ইস্তাফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রীং স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুৎ সওয়াই জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাৎশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সঙ্গে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপের সভাপণ্ডিত এবং কাশীর সভাপণ্ডিত এবং সোণারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডিত এবং ঢাকালের সভাপণ্ডিত এবং ধর্ম্ম-অধিকারী ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব মোলাকাত একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ ষধাম গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টীকা ও তোষণী লইয়া শ্রীযুৎ ভট্টাচার্য্য মজ্কুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরকীয় সংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমরাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্তপুস্তক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন, অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম-অধিকারী তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন হইতে শিরোপা তোমাকে আইল আমরা পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা উড়িষ্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাস্তা শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তাফা দিলাম পুনরায় কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধিকার করি তবে শ্রীশ্রী৺তে বহির্ভূত এবং শ্রীশ্রী৺সরকারে গুনাগার এতদর্থে তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাস্তা ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ।

শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণ
সাং জয়নগর" (ইত্যাদি)

দ্বিতীয় দলিলখানির তারিখ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দ (১২২৫ বাং)
ইহার প্রারম্ভ ছত্রগুলি এইরূপ।

"লিখিতং শ্রীরামানন্দ দেবস্য তথা শ্রীরাঘবেন্দ্র দেবস্য তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য তথা শ্রীআত্মারাম দেবস্য শ্রীবল্লভীকান্ত দেবস্য তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্য শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্য ও গয়রহ ইস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সন ১১২৫ সাল আমরা শ্রীশ্রী৺ গিয়া সম্রাট জয়সিংহ মহারাজা মহাশয় শ্রীশ্রী৺ তিনলক্ষ বত্রিশ হাজার ভাগবত শাস্ত্রগ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ একলক্ষ গ্রন্থ শ্রী৺ যমুনায় সমর্পণ করিয়াছিলেন বাকী একলক্ষ গ্রন্থ শ্রীশ্রী৺ পদ্মাসনে গচগিরি গাড়া ছিল বাকী একলক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান একমৎ শ্রী৺ আছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছ শ্রীমন্দিরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছেরা শ্রীমন্দির দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺জয়নগর গেলেন পদ্মাসন খুদিয়া সেই একলক্ষ গ্রন্থ আনিয়া শ্রীমহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আসিয়া সেই সকল গ্রন্থ বিচার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্ম প্রধান করিয়াছিল।" ইত্যাদি।

(১৫) জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান

কুচবিহার রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলনকারী জয়নাথ ঘোষ কুচবিহারের রাজমুন্সী এবং বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এই গ্রন্থে সংস্কৃত সমাসবহুল পদের প্রাচুর্য্য এবং সহজ বাঙ্গালা উভয়েরই নিদর্শন রহিয়াছে। যথা,—

"শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব মকরন্দ অজ্ঞানতিমিরান্ধ জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জন ন্যায় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তস্য চরণ-প্রান্তে কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক ধরণিধরেন্দ্র-তনয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-কারিণী ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীশ্রীআশুতোষ দীন দয়াময় সদাশিব চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্বে প্রণামান্তর শ্রীমন্নারায়ণপরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ভূদেব ব্রাহ্মণ সকলের চরণ-প্রান্তে প্রণতিপূর্ব্বক বহুতর প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীসদাশিব-বংশ-সম্ভব বিহারস্থ দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ কুলশীল বলবীর্য্য শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শান্ত দান্ত বিদ্যা বিনয় বিচার রাজলক্ষণ রাজ-ব্যবহার শরণাগতজন-প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রূপ-

লাবণ্যাদিতে যিনি তুলনারহিত রিপুকুল-বনপক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ।

• • • •

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোরকাল হই নাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া বাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমত খোষনবিস লিখক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও গজ-চালানে অদ্বিতীয় তীরন্দাজ ও গোলেন্দাজিতে উপমা-রহিত অন্য অন্য শিল্পকর্ম্ম যাহা দৃষ্টি হয় তাহা তৎকালীন শিক্ষা করেন গান বাদ্য সকলি অভ্যাস করিলেন এবং তাল মান ও রাগরাগিণী এমত বুঝিতে লাগিলেন যে উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশঙ্কিত হইয়া হজুরে গান করেন গুণবোদ্ধা গুণগ্রাহী গুণ-সমুদ্র হইলেন দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি অতিশয় হইল দয়াল মিষ্ট-ভাষক সকল লোকে দেখিয়া চক্ষু সফল জ্ঞান করে।" ইত্যাদি।

—রাজোপাখ্যান, জয়নাথ ঘোষ।

(১৬) কামিনীকুমার

"কামিনীকুমার" নামক গল্পের রচনাকারী কালীকৃষ্ণ দাস। এই গ্রন্থ রচনার কাল খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ। সাহিত্যে সহজ কথাভাষার প্রয়োগ কালীকৃষ্ণদাসই প্রথম করেন, তবে তাঁহার রুচির প্রশংসা করা যায় না। উহা ভারতচন্দ্রীয় যুগের কুরুচির নিদর্শন। সহজ অথচ প্রাণবন্ত কথাভাষায় রচনার ইনি প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহার পরে ইহার আদর্শে ক্রমশ: প্রমথ শর্ম্মার "নব-বাবু-বিলাস (১৮২৩ খৃষ্টাব্দ), "নব-বিবি-বিলাস", "আলালের ঘরের দুলাল" (টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র) এবং "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" (কালীপ্রসন্ন সিংহ) রচিত হয়। এই জাতীয় হাল্কা ও ব্যঙ্গপূর্ণ রচনা সাধারণত: "হুতোমী ভাষা" নামে বিখ্যাত। অথচ ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক কালীপ্রসন্ন সিংহ নহেন কালীকৃষ্ণ দাস। কিন্তু এই জাতীয় ব্যঙ্গ রচনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রমথ শর্ম্মার "নব-বাবু-বিলাস"। কালীকৃষ্ণ দাস "কামিনীকুমার" রচনার রীতিকে "গদ্যছন্দ" নাম দিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

রামবল্লভের তামাক সাজা।

"গদ্যছন্দ॥ সদাগর অতি কাতরে এইরূপ পুন: পুন: শপথ করাতে সুন্দরী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কটু দিব্য বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত

হইয়া আশ্রয় যাচিঞা করিতেছে অতএব শরণাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে, বরঞ্চ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিসম্মত বটে। আর বিশেষতঃ আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্য কর্ম্ম উহা হৈতে যত হউক আর না হউক কিন্তু এক আধ ছিলিম তামাক চাহিলেও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হাঁ ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্ম্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত নূনাতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে সর্ব্বদা আমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হইবেক। ···· সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেক যে রাম বাঁচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক কামিনীর সম্মুখে কহিতেছে····· আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভৃত্য কৃতসাধ্য প্রাণপণে পালন করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কর্ম্ম করিবে কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি। রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আলবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক। এই প্রকার রামবল্লভ তামাকসাজা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলে হে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি।"

—কামিনীকুমার, কালীকৃষ্ণ দাস।

(১৭) নব-বাবু-বিলাস

প্রমথ শর্ম্মার এই গ্রন্থখানি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সুতরাং খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা হইলেও ভাব ও ভাষায় "কামিনীকুমার" শ্রেণীর গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া এইস্থানে ইহার কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"অথ মুনসী বৃত্তান্ত॥"

(খরের পো) "বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহর নিবাসী এক মুনসী সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। কর্ত্তা কহেন শুন মুনসী আমার

সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা যে দিবস বাবুরা কোনস্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা। ইহা শুনিয়া যশোহর নিবাসী মুনসী প্রস্থান করিলেন। তৎপরে নাটুর ফরীদপুর ঢাকা ছিলহট্ট কমিল্লা বডন বরিশাল ইত্যাদি দেশী মুনসী প্রায় মাসেক দুইমাস গমনাগমন করিলেন কর্ত্তা তাহার দিগর জবাব দিলেন কহিলেন তোমাদিগের জবান দোরুস্ত নহে অর্থাৎ বাক পরিষ্কার নহে। কর্ত্তাটীর কাছে কি কেহ পারসী কথা বা হিন্দী কথা কহিয়া খোসনাম পাইতে পারেন তিনি অনর্গল পারসী ও হিন্দী কহিতে পারেন। অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী রাখা হইল। তিনি বোট আপিসের মাজি ছিলেন এক সার্টিফিকেট দেখাইলেন। কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকেট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কতকাল এসাহেবের নিকট চাকর ছিলে। মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন। কর্ত্তা কহিলেন হাঁ হাঁ আছে বটে কোন সাহেবের কর্ম্ম করিতে। আজ্ঞা করতা বালবর কোম্পানি। কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন। পরে মাজি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রযুক্ত দুই বৎসরের মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্ত করিলেন। গোলেস্তা বোস্তা আরম্ভ করিয়া ইংরেজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন। বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিংক্রস ডিকক্রস কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না। ইহা শুনিয়া কর্ত্তা কহিলেন তবে একজন সাহেব লোক বাটীতে চাকর রাখিতে হইল। পরে ধরের পো অন্বেষণে চলিলেন।"

—গৌড়দেশ-চলিত সাধু ভাষায় নব-বাবু-বিলাস, প্রমথ শর্ম্মা।

(১৮) ম্যানুয়েলের বাঙ্গালা ব্যাকরণ

খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগর হইতে পর্ত্তুগিজ ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানিতে বাঙ্গালা হইতে পর্ত্তুগিজ ও পর্ত্তুগিজ

হইতে বাঙ্গালা শব্দসমূহের প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। বাঙ্গালা শব্দগুলি রোমক অক্ষরে লিখিত আছে। এই গ্রন্থের রচনাকারীর নাম ম্যানুয়েল-ডা-আসাম্পর্সা (Manœl da Assumpcam)। ইনি সিন্ অগাষ্টিন (Saint Augustin) নামক পর্ত্তুগিজ রোমান ক্যাথোলিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন এবং পূর্ব্ব-ভারত এই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ম্ম-কেন্দ্র ছিল। যে বৎসর এই ব্যাকরণখানি প্রকাশিত হয় সেই বৎসরই পাদরী আসাম্পর্সা কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথোলিক সংবাদ" নামক রোমান ক্যাথোলিক মতবাদমূলক কথোপকথনের কৌতূহলপ্রদ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থকারের রচনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক স্বতন্ত্রভাবে এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। হালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ এই দেশে বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক হইলেও এখন দেখা যাইতেছে হালহেডের গ্রন্থ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হওয়াতে উক্ত পর্ত্তুগিজ পাদরীর ব্যাকরণখানি (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) হালহেডের গ্রন্থের পূর্ব্বে রোমান অক্ষরে বিদেশে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্যরচনা আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের অন্তর্গত খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ অপরিহার্য্য। এই যুগের প্রথম কতিপয় বৎসরও গদ্য সাহিত্য রচনা উপলক্ষে প্রাচীন যুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত। কারণ তখনও প্রাচীন ধারাই অনুসৃত হইতেছিল এবং প্রাচীন গদ্যের ধারা প্রাচীন যুগে যে সহজ পথে চলিয়াছিল এই গ্রন্থসমূহে সেই ধারা বজায় রাখিয়াও ক্রমশঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা ও ভাবসম্পদের আদর্শে কতিপয় সাহিত্যিক ইহা সংগঠনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নাম এই সম্পর্কে প্রথম স্মরণীয়। শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায়ের নেতা রেভারেণ্ড কেরি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষহিসাবে সহজ বাঙ্গালা ও কথাভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ তাঁহার অধীনস্থ কলেজের পণ্ডিতবর্গের অনুরাগ সংস্কৃতের প্রতিই অধিক ছিল এবং কেরির রচনার আদর্শে ও উৎসাহে তাঁহারাও অবশেষে সহজ বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। যাহা হউক ১৯শ শতাব্দীর গদ্যালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের রচনা-রীতির পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ পরে দেওয়া গেল।

(১৯) পৌত্তলিক মত নিরসন[১]

(বেদান্ত-সার)

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩ খৃ:) বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার গদ্য রচনার রীতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ-নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগো জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কিনা আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কিনা এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কিনা শূদ্রেরাও সেই সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরম্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কিনা আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কিনা।"

—বেদান্ত-সার, পৌত্তলিক মত নিরসন,
রাজা রামমোহন রায়।

(২০) কথোপকথন

রেভঃ উইলিয়ম কেরীর রচনা বেশ সরল ছিল। তাঁহার রচিত "কথোপকথন" হইতে একটি বিষয় নিম্নে দেওয়া গেল। কেরীর "কথোপকথন" ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

"ঘটকালি"

"ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রটির বিবাহ দিব আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আসুন নিস্তর দিবস গৌণ না হয় বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাই। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব এখন না হইলে যে খরচ-পত্র আনিয়াছি সে ফুরিয়ে যাবে।

---

(১) রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী (রাজনারায়ণ বসু সম্পাদিত), রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা রচনা (পাণিনি কার্য্যালয় এলাহাবাদ, প্রকাশিত) এবং রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী রচনা ([illegible] রায় প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য। ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের রচনার তালিকা দ্রষ্টব্য (প্রাচ্যবাণী মন্দির)।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক্ কি! আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনাকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগার কন্যা উপস্থিত আছে যেখানে বলেন সেইখানে স্থির করিয়া আসি। কুলীন-গ্রামে হর-হরি বসুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন দুধে আলতায় গোলা আর কর্ম্মেও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।" ইত্যাদি।

—কথোপকথন, কেরী।

(২১) প্রতাপাদিত্য-চরিত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যতম পণ্ডিত রামরাম বসু রচিত। রচনা-কাল ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

"দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত্ব করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেইস্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা। স্বীকার করিলে রাজা বসন্ত রায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্ত রায় কুমার বাহাদুরের মুখচুম্বন করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখ্যা করিয়া মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুণ ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন এই ২ মতে প্রশংসা করিতেছিলেন।" ইত্যাদি।

—প্রতাপাদিত্য-চরিত, রামরাম বসু।

(২২) হিতোপদেশ

গোলক শর্ম্মা অনূদিত ও ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত।

"হিতোপদেশ।
সংগ্রহ ভাষাতে।
গোলকনাথ শর্ম্মা ক্রিয়তে।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ।"

"সর্ব্বত্রে বিচিত্র কথা এবং নীতি বিদ্যাদায়িক যে কিমত তাহার বিশেষ কহি। পণ্ডিত যে ব্যক্তি সে বিদ্যার্থ কি মত চিন্তা করে তাহা শুন। অজরামরবৎ আর ধর্ম্মাচরণ কেমন যেমত যমেতে কেশাকর্ষণ করিয়া থাকে তাদৃশ। অপর বিদ্যাবস্তু সকল দ্রব্যের মধ্যে অত্যুত্তম কহিয়াছেন তাহার কারণ এই অহরণীয় অমূল্য অপূর্ব্ব অংশীর অধিকার নাহি ও চোরের অধিকার নাহি এবং দানেতেও ক্ষয় নাহি এতএব বিদ্যারত্ন মহাধন সংজ্ঞা তাহার শক্তি কি কি বিদ্যা বিনয়দাতা বিনয়পাত্রদাতা পাত্র ধনদাতা ধন ধর্ম্ম ও সুখদাতা এ বিষয় কহিলে পুস্তক বাহুল্য হয় অতএব সংক্ষেপে কিছু কিছু কহিব। সম্প্রতি মিত্রলাভ সুহৃদভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এই চারি ভাগ।"

—হিতোপদেশ, গোলকনাথ শর্ম্মা।

(২৩) হিতোপদেশ

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণুশর্ম্মা রচিত সংস্কৃত হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ। রচনার কাল ১৮০১ খৃষ্টাব্দ। প্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও "প্রবোধ-চন্দ্রিকার" প্রসিদ্ধ রচনাকারী ছিলেন।

"মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি।
এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।
বিষ্ণুশর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত।
বাঙ্গালা ভাষাতে।
মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা ক্রিয়তে। (১৮০১ খৃষ্টাব্দ)"
"হিতোপদেশ। সংগ্রহ ভাষাতে।

পুস্তকারম্ভে বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্তে প্রথমতঃ প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

জাহ্নবীর ফেণ রেখার ন্যায় চন্দ্রকলা যাঁহার মস্তকে আছেন সে শিবের অনুগ্রহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্যকর্ম্ম সিদ্ধ হউক।

জ্ঞাত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কৃত বাক্যেতে পটুতা ও সর্ব্বত্র বাক্যের বৈচিত্র্য ও নীতিবিদ্যা দেন। প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা ও অর্থচিন্তা করিবেক। ইত্যাদি।"

"ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণ-যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ।" ইত্যাদি।

—হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা।

(২৪) কৃষ্ণচন্দ্র-রচিত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যতম পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তৎরচিত "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" মুদ্রিত করেন। ঐতিহাসিক উপাদান গ্রন্থখানিতে প্রচুর আছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সময়ে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কথা বর্ণনা গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। নিম্নে প্রসঙ্গক্রমে পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজুদ্দৌলার করুণ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির ভাষা উর্দ্দু প্রভাব শূন্য।

"পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান। তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুদিত নদীর তটের নিকটে এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন ফকীর স্থানে তুমি ফকীরকে বল কিঞ্চিত খাদ্য-সামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিত আহার করিবেক। ফকীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব স্রাজেরদৌলা বিষণ্ণ বদন। ফকীর সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব। ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকীরের প্রিয়বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকীরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকীর খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালি খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের লোক এ সম্বাদ পাবা মাত্র অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক।"

—কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।

(২৫) বগুড়া-বৃত্তান্ত

খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা গদ্য-রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হস্তেও কি রূপ পরিগ্রহ করিল তাহা প্রদর্শন করিয়া ও আনুসঙ্গিক দুই একটি মন্তব্য করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। আলোচ্য গ্রন্থটি কালীকমল সার্ব্বভৌম রচিত "বগুড়া-বৃত্তান্ত"। গ্রন্থখানির রচনা সরল ও একান্ত অনাড়ম্বর।"

"পীর খাঁ নাজিরের বৃত্তান্ত।"

"পীর খাঁ নাজীর প্রথমতঃ জিলা নাটোরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আরদালির বরকন্দাজ ছিলেন। তৎপর ঐ জেলার বালাগড়ির জমাদার, তৎপর বগুড়ায় আসিয়া সদর থানার জমাদার হন। অনন্তর কোন কার্য্যগতিকে থানার দারোগা বিদায় লইলে ঐ দারোগাগিরি কর্ম্ম একটীন করেন। তৎপর এ জেলার ফৌজদারী আদালতের বহালি নাজির হন। নাজির হইয়া জিলার তাবত লোকের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করায় সমুদায়ের কোপভাজন হন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় হঠাৎ কেহ কিছু করিতে পারে নাই। তৎপর আসজন্মা চৌধুরীর সহিত এই কুঠীতে কতকগুলিন কোওয়া খরিদের কারণ ভোক্ত খাতা ছিল, ঐ খাতায় যে সকল লোক দাদনের টাকা পাইত তাহাদিগের নাম থাকিত। তদ্ভিন্ন উহাতে মিছামিছি কতকগুলিন লোকের নাম লেখা থাকিত। বৎসর বৎসর নিকাশের সময় দুইলক্ষ আড়াই-লক্ষ টাকা বিলাত বাকী দেখান হইত। ঐ বাকীর টাকাটী দেওয়ান প্রভৃতি কুঠীর যাবতীয় কর্ম্মকারক অংশাংশী করিয়া লইত। বাস্তবিক বিলাত পড়িত না। এাবল সাহেব গোয়েন্দা দ্বারা এই বিষয়ের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া কুঠির কর্ম্মকারকদিগের নিকট ১০০০০০৲ লক্ষ টাকা আদায় করেন। অন্য সাহেবেরা প্রোক্ত বিশ্বাসঘাতকতার বিন্দুবিসর্গও টের পান নাই। শিবশঙ্কর দাস এমন কুহকজালে সাহেবদিগকে আবদ্ধ করিত যে, তাহা হইতে সাহেবেরা কখন মুক্ত হইতে পারিতেন না। শিবশঙ্কর দাস একদিন পীর খাঁ নাজিরের সহিত টক্রাটক্রি দেওয়ার জন্য রেশমের কুঠির ১০০০ হাজার তলবদারকে একবারে দেখিতে পারিত না। রেশম কুঠীর কারবার যৎকালে বগুড়ায় ছিল, তখন বগুড়া জেলা হইয়া এখন যেমন জাঁকজমক হইয়াছে, এই প্রকার জাঁকজমক ছিল। তৎকালে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আসজন্মা চৌধুরী আর বগুড়াবাসী কতকগুলি নিষ্পীড়িতা বারবণিতা

পীর খাঁর নামে কলিকাতায় গিয়া অভিযোগ করিলে পর, ঐ দুর্বৃত্ত নাজিরের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ার পর নাজির কর্ম্মচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন। এই সূত্রে বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ বেগুেল সাহেবও একবারে ডিস্‌মিস্ হন।"

—বগুড়া-বৃত্তান্ত, কালীকমল সার্ব্বভৌম।

খৃঃ উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। তবে, আমরা এই যুগের গদ্য-সাহিত্যের কিছুভাগ এইস্থানে উদ্ধৃত করিলেও এই যুগের সাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। এই যুগের প্রথম দিকে "তোতা ইতিহাস," "বত্রিশ সিংহাসন," "পুরুষ-পরীক্ষার" অনুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" এবং অপরাপর রচনা, "রাজ-বিবরণ" (১৮২০ খৃঃ —লেখক অজ্ঞাত) "রাসসুন্দরীর জীবনী" (১৯শ শতাব্দী) "ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের" সাধু ভাষায় ব্যাকরণ সংগ্রহ (১৮৪০ খৃঃ) "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী," ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিদ্যাসুন্দরের ভূমিকা ও অন্যান্য গদ্য রচনা, অক্ষয়কুমার দত্তের বিবিধ গদ্য রচনা (যথা "স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন" ও "চারুপাঠ") প্রভৃতি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যুগের কথা বলা এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপীয়গণ এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুর-মিশনারী সম্প্রদায় বাঙ্গালা গদ্য রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রেভঃ লং সাহেবের বাঙ্গালা সাহিত্যের তালিকা দেখিলেই তাঁহাদের অপরিসীম দানের কথা উপলব্ধি হইবে। তবে তাঁহাদের অনেকের লেখা যেমন ভাল আবার অনেকের রচনায় ইংরাজী ভাষার অন্বয় ও বাঙ্গালা শব্দগুলির অশোভন ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামপুর-মিশনারীদের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত "সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস" (১৮১৯ খৃঃ). সি, বি, লুইস কৃত "জন টমাসের জীবন-চরিত" (১৮৭৩ খৃঃ), ফিলিক্স কেরীর "ইংলণ্ডের ইতিহাস" (১৮১৯ খৃঃ), শ্রীরামপুরে মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৫০ খৃঃ). মার্শম্যানের "ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের রাজ-বিবরণ" (১৮৩১ খৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।[১]

---

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগ ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" (দীনেশচন্দ্র সেন), "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (দীনেশচন্দ্র সেন), "History of Bengali Language and Literature. (D. C Sen) "Bengali Prose Style" (D. C. Sen), "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" (সুকুমার সেন) "বাংলা গদ্যের চারযুগ" (মনোমোহন ঘোষ) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি, ছন্দ ও অলঙ্কার, বাঙ্গালার হিন্দুরাজা ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের তালিকা, সংস্কৃত তন্ত্র ও পুরাণ এবং প্রাচীন গ্রন্থ-পঞ্জী।

(ক) বাঙ্গালা ভাষা

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রাকৃত ভাষার আবার নানা শাখা ছিল, যথা, লাটী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধ-মাগধী প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি মাগধী প্রাকৃত হইতে হইয়াছে। মাগধী প্রাকৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার ভাষা ছিল, তাহা মাগধী অপভ্রংশ (অবহট্ঠ) সুতরাং প্রাকৃত (মাগধী) হইতে গৌণভাবে এবং অপভ্রংশ (মাগধী) হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা জন্ম লাভ করে। বলা বাহুল্য, সব রকম প্রাকৃতেরই "অপভ্রংশ"রূপ ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার স্থান নিম্নের তালিকা তিনটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।●

(১) ইন্দো-ইরাণীয়

বা

আর্য্যভাষা

দরদজাতীয় (Dardic group) আর্য্য ভাষা	ইরাণীজাতীয় (Iranian group) আর্য্য ভাষা	ইন্দো-আর্য্যজাতীয় বা ভারতীয় আর্য্য ভাষা (Indic or Indo-Iranian group)
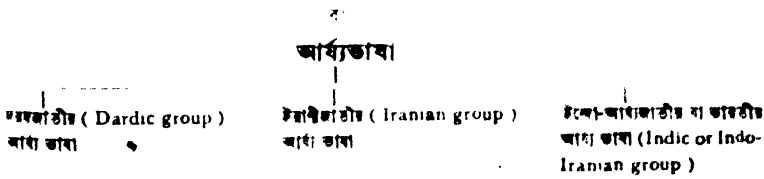
● Origin and Development of the Bengali Language—Introduction—(by S. K. Chatterji) দ্রষ্টব্য।

(২) ইন্দো-আর্য্যজাতীয় ভাষা

প্রাচীনতম ভারতীয় আর্য্য (ইন্দো-আর্য্য) ভাষা
(বৈদিক কথাভাষা খৃঃ পূঃ ১৫০০—১২০০ শতাব্দী ?)
ভাষা ব্যবহারের স্থান—পূর্ব্ব-আফগানিস্থান(?), কাশ্মির, পাঞ্জাব(?) ও
উত্তর-পশ্চিম গাঙ্গেয় দোয়াব।

- কথাভাষা (খৃঃ পূঃ ১২০০-৭০০ শতাব্দী) ভাষা ব্যবহারের স্থান—গান্ধার, পাঞ্জাব ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা (Upper Ganges Valley)
- লিখিত বা সাহিত্যের ভাষা ("ব্রাহ্মণ" সাহিত্য)—উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য-পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত কথ্য-ভাষা হইতে জাত।
  - সংস্কৃত
    উদীচ্য হইতে আগত ব্যাকরণকার পাণিনীর কাল—খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী, আনুমানিক। গাথা (সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের সংমিশ্রণ)।
    - উদীচ্য
      (গান্ধার বা কান্দাহার, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের হিমালয় পর্ব্বতের অধিবাসী খস ও দরদ জাতিদ্বয়ের ভাষা। আর্য্যজাতীয় ভারতে উপনিবেশের মধ্যযুগে রাজপুতানা অঞ্চলের ভাষাও এই শ্রেণীর ভাষার মধ্যে গণ্য।
    - প্রতীচ্য
      (গুজরাটি ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ভাষা)
    - মধ্যদেশীয়
      (কুরু-পাঞ্চাল, মধ্যদেশীয় ও অপর কতিপয় উত্তর-ভারতীয়—যথা, পশ্চিম দোয়াব অঞ্চলের ভাষা।)
    - প্রাচ্য
    - দাক্ষিণাত্য
      (মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রির অপভ্রংশ।)
      - মারাঠি
      - কঙ্কণ প্রদেশীয় (Konkon)

(৩) প্রাচ্য

(খ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কতকগুলি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় উহা প্রাকৃতের কত নিকটবর্ত্তী।* প্রাকৃত ক্রিয়া ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের প্রভেদ বড় অল্প। প্রাকৃত "হোই", "করই", "বোলই", "পুছে" প্রভৃতি শব্দের সহিত বাঙ্গালা "হয়", "করে", "বলে", "পোছে" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের সাদৃশ্য তুলনীয়। "ভনসি", "করসি", "খায়সি", "করোম্মি", "যাম্মি" প্রভৃতি প্রাকৃতের অনুরূপ শব্দের প্রাচুর্য্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষভাবে রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপিগুলিতে দেখা যায় শুধু 'স', 'জ' ও 'ন' ব্যবহারের ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। ইহাও প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের ফল। পৈশাচী প্রাকৃতে 'ন'র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে বঙ্গভাষাকেও "প্রাকৃত-ভাষাই" বলিত।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে বলা যায় যে, ইহা প্রথমদিকে খুব অধিক নহে। "করোমি" শব্দটি ইহার অন্যতম উদাহরণ। পূর্ব্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত "করুম" শব্দ এই সংস্কৃত তৎসম ক্রিয়াপদ "করোমি"রই প্রকারভেদ। পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত "করিব" ক্রিয়াপদ সংস্কৃত "কুর্ব্বঃ" কথাটিরই রূপান্তর মাত্র। তবুও বলা যায় বিশেষভাবে ক্রিয়া ও বিভক্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতেরই অধিক অনুসরণ করিয়াছে। প্রাকৃত ক্রিয়াপদের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় একটি অতিরিক্ত "ক" যোগ দেখা যায়। ইহা পরবর্ত্তী যোজনা। প্রাকৃত "হউ" "দেউ" প্রভৃতি ক্রিয়া ইহার উদাহরণ। "হউ" (সং ভবতু), "দেউ" (সং দদাতু) প্রভৃতি শব্দ প্রথমে এই ভাবেই ব্যবহৃত হইত। যথা "জয় জয় জগন্নাথপুত্র দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর যত ভকত সমাজ" (চৈ,ভা-আদি) পরবর্ত্তীকালে "হউ" স্থলে "হউক" এবং "দেউ" স্থলে 'দেউক" ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রীয়ারসন সাহেবের মতানুসারে এই অতিরিক্ত "ক"এর প্রয়োগ সংস্কৃত প্রভাবের ফল। ক্রিয়াপদ ছাড়া "কে" অর্থে "ক" বিভক্তি প্রয়োগও অনেক আছে। যথা "ভীমক মারিতে যায় দেব জগন্নাথ"—কবীন্দ্র। এখনও উত্তর-বঙ্গে, পাবনা জেলায় "তোমাক" (তোমাকে), 'আমাক" (আমাকে) প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রচলন আছে। (সং) কিন্তু এই "ক"এর ন্যায় সংস্কৃতের "হি",

---

* বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন), Origin & Development of Bengali Language (S. K. Chatterji), দেশী নামমালা (হেমচন্দ্র, ১২শ শতাব্দী), বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা (অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ), History of Bengali Language (B C Mazumder) এবং প্রবন্ধসমূহ (রামদাস সেন) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালাতে "হ" রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা জানীহি (সং) জানিহ (বাং)। পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্কৃত "ভনসি", "খায়সি", "করোস্তি", "কহসি", "বলন্তি" "যান্তি" (যায়ন্তি) শব্দগুলিরও অবাধ প্রয়োগ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে (যথা—খনা ও ডাকের বচন, শূন্যপুরাণ, কবীন্দ্রের মহাভারত, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে) প্রচুর রহিয়াছে। প্রাকৃতের "আহ্মি" ও "তুহ্মি" প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও অপরাপর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃতের অনুরূপভাবে লিখিতে গিয়া পুথিগুলিতে শব্দের মধ্যস্থানে "অ"র ব্যবহার রহিয়াছে, যথা—"শিআল" (প্রাকৃত) শৃগাল (সংস্কৃত) এবং শিয়াল (বাঙ্গালা)। প্রাচীন বাঙ্গালার বানান "শিআল"ই রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার সম্মানার্থক 'আপনি" শব্দ যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইত। যথা, "কেনে কেনে নেঙ্গা আইলেন কি কারণ" (ময়নামতীর গানে রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক তদীয় অনুচর নেঙ্গা সম্বন্ধে উক্তি)। এইরূপ মাণিকচন্দ্র রাজার গানে "যাইস না ধর্ম্মী রাজা পরদেশক লাগিয়া" উদাহরণে তুচ্ছার্থক 'যাইস" শব্দের সম্মানার্থক ব্যবহার হইয়াছে। "তুহ্মিসব" "আহ্মিসব" বহুবচনে ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালার আর এক বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনযুগে ব্যবহৃত অনেক বাঙ্গালা শব্দের অর্থবোধ কঠিন, কারণ ইহাদের কতকগুলি শব্দ লোপ পাইয়াছে নতুবা ইহাদের অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই প্রকার শব্দের অধিকাংশই হিন্দু-বৌদ্ধযুগের। নিম্নে এই জাতীয় অসংখ্য শব্দের মধ্যে মাত্র কতিপয় দুরূহ শব্দ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল। এই উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বঙ্গভাষা সাহিত্য" এবং History of Bengali Language and Literature গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

	প্রাচীনশব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(১)	অকইবের	পণ্ডিতের	শূন্যপুরাণ
(২)	আপাবন	বিশেষরূপ পবিত্র	ঐ
(৩)	আফুলা	অপরিপক্ক	ঐ
(৪)	আমলো	রসহীন	ঐ
(৫)	কামিল্যা	কর্ম্মকার	ঐ
(৬)	তাউল	তণ্ডুল	ঐ
(৭)	তেঠঙ্গা	ত্রিভঙ্গ	ঐ
(৮)	ত্রিরূচ	ত্রিমুখ	ঐ

	প্রাচীনশব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(৯)	ধুন্ধকার	শূন্যকার	শূন্যপুরাণ
(১০)	পাকানা	জড়িত	ঐ
(১১)	পাড়ন	পাটাতন	ঐ
(১২)	পাটসালে	রাজসভায়	ঐ
(১৩)	বেলাল	বিব	ঐ
(১৪)	দেউল্ল্যা	পূজাকারক	ঐ
(১৫)	নিছনি	ঝাড়িয়া ফেলা, বালাই, মন্দ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত	ঐ
(১৬)	ভেক	বেশ	ঐ
(১৭)	সইতর	সঙ্গের	ঐ
(১৮)	অক	উহাকে	মাণিকচন্দ্র রাজার গান (ময়নামতীর গান)
(১৯)	অচুম্বিতের	আশ্চর্য্যের	ঐ
(২০)	অফিল্লা	আফুলা	ঐ
(২১)	আউড়ে	বক্রভাবে	ঐ
(২২)	আইল পাতার	এলোমেলো	ঐ
(২৩)	আরিব্বল	আয়ু	ঐ
(২৪)	একতন যেকতন	যে কোন প্রকারে	ঐ
(২৫)	কাউশিবার	তাগাদা করিতে	ঐ
(২৬)	গাবুরালী	যৌবন	ঐ
(২৭)	আধার	খাদ্য (মনুষ্য ও পশুপক্ষীর)	ডাকের বচন
(২৮)	উকা	উল্কা, মশাল	ঐ
(২৯)	গাভুর	যুবক (বলশালী)	ঐ
(৩০)	গোঁধল	গোময়	ঐ
(৩১)	চরিচর	উপায়	ঐ
(৩২)	বেআলি	অনৈক্য	ঐ
(৩৩)	উলী	কুশল	খনার বচন
(৩৪)	কা	কাক	ঐ
(৩৫)	সেঁওয়ালী	সন্ধ্যাকালীন	মাণিকচন্দ্র রাজার গান

প্রাচীন শব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(৩৬) সতী-অসতী	ভাল-মন্দ (স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ব্যবহার)	মাণিকচন্দ্র রাজার গান
(৩৭) বিমরিষ	ক্রুদ্ধ	কবিকঙ্কণ-চণ্ডী
(৩৮) সম্ভাবনা	সম্পত্তি	ঐ
(৩৯) সম্ভ্রম	ভয় (সত্বর অর্থেও ব্যবহৃত)	ঐ
(৪০) অথান্তর	দুঃখ-কষ্ট	মনসা-মঙ্গল বিজয় গুপ্ত)
(৪১) আগল	দক্ষ (অগ্রসর হওয়া অর্থেও হয়)	ঐ
(৪২) উদাসিনী	বন্ধু-বান্ধব হীন	ঐ
(৪৩) খিটে	উত্তোলন করা	ঐ
(৪৪) গোহারি	বিনীত প্রার্থনা	ঐ
(৪৫) টনক	বলশালী, শক্ত	ঐ
(৪৬) পাচে	চিন্তা করে	ঐ
(৪৭) সুশ্রীত	ভাগ্যবান	ঐ
(৪৮) খাখার	নিন্দা, অখ্যাতি	পদ্মাপুরাণ (নারায়ণ দেব)
(৪৯) তিতা	সিক্ত (তুলনীয় তিতিল)	ঐ
(৫০) গারুয়াল	আবরণ	ঐ
(৫১) গোরবিৎ (গর্ব্বিত)	সম্মানিত	ঐ
(৫২) চক্মট	ঠাট্টা	ঐ
(৫৩) ভগন্ধরা	প্রত্যাখ্যান	ঐ
(৫৪) মাণ্ডস	'মান্দাস' বা মঞ্চ	ঐ
(৫৫) মচকা	চিরুণি	ঐ
(৫৬) বোআচুক	ভাল	ঐ
(৫৭) ডাইর	ডাড়্কা (শৃঙ্খল)	ঐ
(৫৮) লোহ	অশ্রু	রামায়ণ (কৃত্তিবাস)
(৫৯) সন্তোক	অনুগ্রহ-চিহ্ন	ঐ
(৬০) যুয়ায়	উপযুক্তরূপ ধারণা করে	মহাভারত (সঞ্জয়)
(৬১) সুসারিত	সর্ব্বোত্তম	ঐ
(৬২) পাড়িমু	ফেলিব	মহাভারত (কবীন্দ্র ও শ্রীকরণ নন্দী)
(৬৩) উপালেন্ত	উপরে	ঐ

	প্রাচীন শব্দ	অর্থ	গ্রন্থ
(৬৪)	আকুতে	সাগ্রহে	পদাবলী (চণ্ডীদাস)
(৬৫)	উতরোল	ভীত	ঐ
(৬৬)	চেটোনেটো	যুবতী স্ত্রীগণ	ঐ
(৬৭)	লেহ	স্নেহ	ঐ
(৬৮)	আউদর	এলোমেলো, খোলা (চুল)	শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু)
(৬৯)	আবর	অপর	ঐ
(৭০)	আবে	এখন	ঐ
(৭১)	নাহা	প্রভু	ঐ
(৭২)	তয়্	তোমার	ঐ
(৭৩)	পোকান	পুত্র (?) অথবা পুত্র কাহ্ন (?)	ঐ
(৭৪)	ভসহিল	সংবাদ দিল	ঐ
(৭৫)	রাকড়ে	শব্দ	ঐ
(৭৬)	বিহদাইল	নিবৃত্ত করিল	ঐ
(৭৭)	বুড়া	পুরাতন	ঐ
(৭৮)	সোমাইল	প্রবেশ করিল	ঐ
(৭৯)	ছকর	শূকর	ঐ
(৮০)	মক্‌মকে	উচ্চৈঃস্বরে	ঐ

উল্লিখিত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দগুলি যে সব পুথিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বলা বাহুল্য, তাহা বিভিন্ন শতাব্দীর রচনা। এই হিসাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচনাকাল বুঝাইবার সুবিধার জন্য মোটামুটিভাবে এইস্থানে একটি তালিকা দেওয়া গেল। বিভিন্ন শ্রেণী ও শতাব্দীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালিকাটি প্রদত্ত হইল।[১] বিভিন্ন শতাব্দীতে নানা শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি ইহাতে কতকটা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

আদিযুগের সাহিত্য। খৃঃ ৮ম-১০ম শতাব্দী।

চর্য্যাপদ ও দোহা, ডাকের বচন, খনার বচন, ব্রতকথা ইত্যাদি।

খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী।

গোপীচাঁদের গান, গোরক্ষ-বিজয়, শূন্য পুরাণ (?)।

(১) মৎপ্রণীত Mediaeval Bengali Literature, June, 1934, Calcutta Review দ্রষ্টব্য।

মধ্যযুগের সাহিত্য।

খৃঃ ১৩শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (কাণাহরি দত্ত), ১২শ-১৩শ শতাব্দী, পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল (নারায়ণ দেব), চণ্ডী-মঙ্গল (মাণিক দত্ত), চণ্ডী-মঙ্গল (দ্বিজ জনার্দ্দন), ধর্ম্মমঙ্গল (ময়ূর ভট্ট) ?।

খৃঃ ১৪শ শতাব্দী।

অনুবাদ সাহিত্য—মহাভারত (সঞ্জয়)

খৃঃ ১৫শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (বিজয় গুপ্ত), ধর্ম্ম-মঙ্গল (রূপরাম), ধর্ম্ম-মঙ্গল (গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অনুবাদ সাহিত্য—মহাভারত (কবীন্দ্র পরমেশ্বর), মহাভারত (শ্রীকরণ নন্দী), মহাভারত (দ্বিজ অভিরাম)। ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়—মালাধর বসু)। বৈষ্ণব সাহিত্য—পদাবলী (চণ্ডীদাস) ?।

খৃঃ ১৬শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (বংশীদাস)। চণ্ডীমঙ্গল (মাধবাচার্য্য), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম), চণ্ডীমঙ্গল (দ্বিজ হরিরাম)। ধর্ম্ম-মঙ্গল (মাণিক গাঙ্গুলী)।

অনুবাদ সাহিত্য—রামায়ণ (কৃত্তিবাস, ১৫শ-১৬শ শতাব্দী ?), রামায়ণ (শঙ্কর কবিচন্দ্র), রামায়ণ (দ্বিজ মধুকণ্ঠ), রামায়ণ (ঘনশ্যাম দাস)। মহাভারত (ঘনশ্যাম দাস), মহাভারত (নিত্যানন্দ ঘোষ), মহাভারত (কাশীরাম দাস), মহাভারত (রাজেন্দ্র দাস), মহাভারত (গঙ্গাদাস সেন), মহাভারত (চন্দন দাস মণ্ডল)। ভাগবত (মাধবাচার্য্য), ভাগবত (কবিচন্দ্র), ভাগবত (শ্যামাদাস), ভাগবত (রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য), ভাগবত (রামকান্ত), ভাগবত (গৌরাঙ্গ দাস), ভাগবত (নরহরি দাস)।

বৈষ্ণব সাহিত্য—চৈতন্য-ভাগবত (বৃন্দাবন দাস), চৈতন্য-চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ), চৈতন্য-মঙ্গল (লোচন দাস), চৈতন্য-মঙ্গল (জয়ানন্দ), নিত্যানন্দ-বংশমালা (বৃন্দাবন দাস)। বৈষ্ণব পদাবলী (গোবিন্দ দাস)।

খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—মনসা-মঙ্গল (কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ), মনসা-মঙ্গল (জগজ্জীবন ঘোষাল), মনসা-মঙ্গল (রামবিনোদ)। শিবায়ন (রামকৃষ্ণ)।

চণ্ডীমঙ্গল (কৃষ্ণকিশোর রায়)। ধর্ম্ম-মঙ্গল (রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ধর্ম্ম-মঙ্গল (বামনারায়ণ)।

অনুবাদ সাহিত্য—রামায়ণ (দ্বিজ দয়ারাম), রামায়ণ (কৃষ্ণদাস পণ্ডিত)। মহাভারত (বিশারদ), মহাভারত (দ্বিজ শ্রীনাথ), মহাভারত (বাসুদেব আচার্য্য), মহাভারত (নন্দরাম দাস), মহাভারত (সারল), মহাভারত (কৃষ্ণানন্দ বসু), মহাভারত (দ্বৈপায়ন দাস), মহাভারত (অনন্ত মিশ্র), মহাভারত (রামচন্দ্র খান), মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব—দ্বিজ কৃষ্ণরাম), মহাভারত (ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী), মহাভারত (রামেশ্বর নন্দী)। ভাগবত (কবিশেখর), ভাগবত (দৈবকীনন্দন), ভাগবত (হরিদাস), ভাগবত (অভিরাম দাস), ভাগবত (নরসিংহ দাস), ভাগবত (অচ্যুত দাস), ভাগবত (রাজারাম দত্ত), ভাগবত (দ্বিজ পরশুরাম)।

বৈষ্ণব সাহিত্য—কর্ণানন্দ (যদুনন্দন দাস), প্রেমবিলাস (নিত্যানন্দ দাস), পদাবলী (জ্ঞানদাস)[1], পদাবলী (গোবিন্দ দাস)[2], পদাবলী (বলরাম দাস)।

খৃঃ ১৮শ শতাব্দী।

লৌকিক সাহিত্য—শিবায়ন (জীবন মৈত্রেয়), শিবায়ন ([illegible]র ভট্টাচার্য্য)। মনসা-মঙ্গল (দ্বিজ রসিক), মনসা-মঙ্গল (জীবন মৈত্রেয়)। চণ্ডী-মঙ্গল (ভবানী-শঙ্কর দাস), চণ্ডী-মঙ্গল (জয়নারায়ণ সেন), কালিকা-মঙ্গল (দ্বিজ কালিদাস)। ধর্ম্ম-মঙ্গল (ঘনরাম চক্রবর্ত্তী), ধর্ম্ম-মঙ্গল (সহদেব চক্রবর্ত্তী)।

অনুবাদ সাহিত্য—ভাগবত (শঙ্কর দাস), ভাগবত (জীবন চক্রবর্ত্তী), ভাগবত (ভবানন্দ সেন), ভাগবত (উদ্ধবানন্দ)। রামায়ণ (অদ্ভুতাচার্য্য বা নিত্যানন্দ), রামায়ণ (দ্বিজ লক্ষ্মণ), রামায়ণ (জগৎরাম)। মহাভারত (লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বৈষ্ণব সাহিত্য—ভক্তি-রত্নাকর (নরহরি চক্রবর্ত্তী), বাংশী-শিক্ষা (পুরুষোত্তম)

মধ্যযুগের শেষভাগে ও কিয়ৎ পরিমাণে আধুনিক যুগের (খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর) প্রথম অংশে নানা বিষয়ে অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ "সারদা-মঙ্গল" (দ্বিজ দয়ারাম—খৃঃ ১৭শ শতাব্দী), "মহারাষ্ট্র-পুরাণ" (গঙ্গারাম ভাট—খৃঃ ১৮শ শতাব্দী) ও "রামায়ণ" বা "রামরসায়ন"

(১) জ্ঞানদাস—পুরাতন মতে মধ্য খৃঃ ১৬শ এবং আধুনিক মতে খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

(২) গোবিন্দ দাস—পুরাতন মতে খৃঃ ১৬শ শতাব্দী এবং আধুনিক মতে কাল খৃঃ ১৭শ শতাব্দী।

(রঘুনন্দন গোস্বামী—খৃ: ১৯শ শতকীর প্রথম পাদ) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে শুধু লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের গ্রন্থসমূহের ধর্ম্মবিষয়ক বা সম্প্রদায়গত আদর্শ অতিক্রম করিয়া বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত কাব্য, স্মৃতি ও দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের ভাবানুবাদ। এতদ্ভিন্ন সাধারণ লোকশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থরচনার যে ভূমি খৃ: ১৮শ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইতেছিল, খৃ: ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তাহা ফলপ্রসূ হয় এবং তাহাতে ইংরেজ মিশনারি সম্প্রদায়ের দানও অল্প নহে। "জনসাহিত্য" নামক এক শ্রেণীর সাহিত্যও খৃ: ১৮শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ই পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থাদির সাহায্যে নানাবিধ পাঁচালী, ছড়া, গান, গীতিকা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই জাতীয় সাহিত্যের প্রচার করে। তবে, জনসাহিত্য প্রাণবস্তু শাস্ত্রাতিরিক্ত এক প্রকার সাম্য ও বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের উদার মতবাদ সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল এবং পল্লীগীতিও ছড়ার মধ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যদিও নানা শ্রেণীর গ্রন্থানুবাদ ও নানা জাতীয় গানের ও গীতিকার নাম উপরের তালিকায় দেওয়া হইল না তবুও এই শ্রেণীর জাতীয় সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। শুধু আভাসে প্রাচীন সাহিত্যের ধারা বুঝাইতে মাত্র তিন শ্রেণীর কতিপয় গ্রন্থের নামোল্লেখ এই স্থলে করা গেল, সুতরাং উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির তালিকার মধ্যে এই তিন শ্রেণীর অনেক মূল্যবান গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা গেল না।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য যে বাঙ্গালী-সমাজে রচিত হইয়াছিল সেই প্রাচীন সমাজ ও বর্ত্তমান সমাজ এক নহে। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও অনেক। সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারাকেই প্রতিফলিত করে। কোন এক যুগের বিশেষ সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, চিন্তাধারা ও জীবন-যাত্রা প্রণালী অর্থাৎ এক কথায় সংস্কৃতি, সেই যুগের সাহিত্যে অনেকটা নিদর্শন রাখিয়া যায়। আধুনিক রুচি ও অভিজ্ঞতার মাপ-কাঠিদ্বারা প্রাচীনকে বিচার করা চলে না। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা কালে প্রাচীন সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতি বুঝা একান্ত আবশ্যক। এই স্থানে এতদুপলক্ষে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ সুবৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর কতিপয় শাখার সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেক শাখার বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ অল্প-বিস্তর বহন করিয়াছে। আবার ধর্ম্ম প্রত্যেক জাতির আদর্শ ও রুচিকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। ইহার ফলও সুদূরপ্রসারী হইয়া থাকে। প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। জাতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সাহিত্যকে যুগে যুগে নবরূপ দান করে এবং ধর্ম্ম সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়া সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য স্থূলভাবে দেখিতে গেলে খৃঃ ৮ম হইতে ১৮শ শতাব্দীর অর্থাৎ এক হাজার বৎসরের সাহিত্য। অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ খৃঃ ১৫শ হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ মুসলমান অধিকার কালে রচিত হইলেও এই গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে তৎপূর্ব্বের "হিন্দু" অথবা সঙ্কীর্ণার্থে "হিন্দু-বৌদ্ধ" যুগকে নির্দ্দেশ করে। আমরা বহু বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া এই বিস্মৃত হিন্দুদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা পাইব। এই স্থানে উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ আলোচনাকালে আমাদিগকে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বলিতে অষ্ট্রিক, আল্পাইন (পামিরীয়ান), মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতিসমূহ বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ তান্ত্রিক ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ইসলাম ধর্ম্ম ইহাদের অনেক পরবর্ত্তী। কালক্রমে তান্ত্রিক মতের আদর্শ ও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে মাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ই রহিয়া গেল। ক্রমে পৌরাণিক আদর্শ হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৌরাণিক হিন্দু ও তান্ত্রিক হিন্দু এই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পৌরাণিক মতের পঞ্চ শাখা (যথা, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য) বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালায় তাহার প্রথম তিনটি গৃহীত হওয়ায় নানা পৃথক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তান্ত্রিক মতাবলম্বী শাক্ত এবং পৌরাণিক মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবাদ স্মরণীয়। অথচ এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও আংশিকভাবে তান্ত্রিক মত পরবর্ত্তী কালে গ্রহণ করিয়াছিল। সহজিয়া মত ইহারই অন্যতম ফল। শাক্তগণ জ্ঞান ও বৈষ্ণবগণ ভক্তিপথের প্রাধান্য দিয়াছিল। মোটামুটি ইহা স্মরণ রাখিয়া বর্ত্তমানে আলোচনা করা যাইবে।

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্য্যাপদগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে শৈব-বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং গৃহী সমাজের উপর তাঁহাদের অসামান্য প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

কিছু পরের যুগে নাথ-পন্থী সাহিত্য একই কথা প্রমাণ করে। এই সন্ন্যাসীগণও শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সন্ন্যাসীগণের মধ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা পামিরীয় ও মঙ্গোলীয় হইতে পারে, কারণ ইহাদের ঐতিহ্য প্রধানতঃ হিমালয় প্রদেশকে নির্দ্দেশ করে।

ধর্ম্মের দিকে মায়াবাদ যে যুগে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল এবং তান্ত্রিকতার গুহ্যতত্ত্ব ক্রমে তাহাতে সংমিশ্রিত হইয়াছিল সেই খৃঃ ৮ম শতাব্দী বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ স্মরণীয়। এই যুগে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরসনে ব্যস্ত ছিলেন। অপর পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম লোকচক্ষে সম্ভ্রম পাইতেছিল। একদিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম ও অপরদিকে বাঙ্গালার পালরাজগণ সমর্থিত মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই খৃঃ ৮।৯ম শতাব্দীতে এই সন্ন্যাসাশ্রম সমর্থন করিয়া তান্ত্রিক মতের সহিত ইহার সংমিশ্রণে সাহায্য করিয়াছিল। অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বনকারী জনসমাজ সব সময়ে ভারতবর্ষে খুব মিলনের ভাবও দেখায় নাই। বাঙ্গালায় অবশ্য বৌদ্ধজনগণের অস্তিত্ব খুব বেশী দেখা যায় না। অন্ততঃ সাহিত্যে ইহার প্রমাণ অল্প। ধর্ম্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ নাও হইতে পারেন এবং পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধদেব সোজাসুজি বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপেও কল্পিত হইয়াছেন। তিব্বতের মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর যে তান্ত্রিকতা মিশ্রিত হইয়াছিল তাহার সহিত বাঙ্গালার তান্ত্রিকতা মিশ্রিত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম তুলনীয়।[১] বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর ক্রমে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিভাব কিরূপে মিশ্রিত হইল তাহাও আলোচনার যোগ্য।[২] "শঙ্কর-বিজয়" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বৌদ্ধ-দমন সম্বন্ধে লিখিত আছে যে রাজা সুধন্বা—"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকাবিদ্যাপ্রসঙ্গভেদৈর্নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছিত্বা বহুধু উদূখলেষু নিক্ষিপ্য কঠভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমতধ্বংসামচরণ নির্ভয়েবর্ত্ততে।" অপরপক্ষে সাহসরামের প্রস্তর-লিপিতে সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা আছে। "শূন্যপুরাণ" অন্তর্গত "নিরঞ্জনের-রুষ্মা" একই কথার আভাষ দেয়। অথচ অধিকাংশ সময় উভয় সমাজ পরস্পর সদ্ভাবেই বসবাস করিত (যথা নেপালের "গুভাজু" ও "দেভাজু"গণ) তাহাও মানিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বহু লৌকিক দেব-দেবী কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়া-

---

(১) Lamaism in Tibet by Col. Wadell.

(২) (ক) The Manual of Buddhism by Dr. Kern, (খ) Modern Buddhism (N. Vasu) ও (গ) বৃহৎ-বঙ্গ (দীনেশচন্দ্র সেন)। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যসমূহে তান্ত্রিকতার বহু উদাহরণ আছে। বেহুলা ও রঞ্জাবতীর কথা উদাহরণস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে।

ছিল। তবে এই দেব-দেবীগণ আর্য্যেতর পামিরীয়, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিগণ কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রথম আনিত হইয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক কোন সুদূর অতীতকালে সম্ভবতঃ ব্যাপকভাবে পূজিত হইতেন। এই রূপান্তর প্রধানতঃ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের দিকেই অত্যধিক। বৈদিক যুগের বহু ধারণাও নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও লৌকিক দেব-দেবী পূজকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। "সৃষ্টি-তত্ত্ব" ইহার অন্যতম উদাহরণ। শূন্য-পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব মাণিক দত্তের চণ্ডীর সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুকুন্দরাম বর্ণিত পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু ঋক্‌বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের অতি নিকটবর্ত্তী। পৌরাণিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট কৌতুক সৃষ্টি করে। চিরঞ্জীব শর্ম্মার (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী ?) "বিদ্বোন্মদ-তরঙ্গিণী"তে বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের বাদানুবাদের একটি সুন্দর আলেখ্য রহিয়াছে। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের দ্বন্দ্বের বর্ণনা উপলক্ষে রামপ্রসাদ তাঁহার রচিত "বিদ্যাসুন্দরে" বৈষ্ণবগণের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা এইরূপ। যথা—

"খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধুড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
পৃষ্ঠ দেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট।
ভেকালোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক একজনার মধ্যে ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥" ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে পরবর্ত্তী এক কবি লিখিয়াছেন। যথা,

"দিন দুপুরে সন্ন্যাসীদল এসে জুটিল।
"হর হর" এই রবেতে সে ঘর পুরিল॥
গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি নাম "অহংকার।"
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাভার॥
পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি আরক্ত নেশায়।
ঢালে, সাজে সাজে ঢালে,—সদাই গাঁজা খায়॥' ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের "কালীকীর্ত্তনে" কালী ঠাকুরাণী নৃত্য তো করিয়াছেনই, ইহা ছাড়া "রাস-লীলা" এবং "গোষ্ঠ" উৎসবেও যোগদান করিয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণব আজু গোসাঞি শাক্ত রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন ;—

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।

তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ॥"

শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের অনেক পূর্ব্বে খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে (?) রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্ম-পূজা-পদ্ধতিতে গ্রহাচার্য্য ও ধর্ম্ম-পূজকগণের বিবাদেরও অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিকতা সম্ভবতঃ এই বিবাদ-পরায়ণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি-স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিল। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, ময়নামতীর ও মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি শৈব ও শাক্ত গ্রন্থ সমূহে তান্ত্রিকতার ফলে অদ্ভুত শক্তিলাভ,[১] স্বীয়দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উপাস্য দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধনের অনেক উদাহরণ রহিয়াছে। অপরপক্ষে নারীঘটিত সাধনায় তান্ত্রিকমত গ্রহণ করিয়া, নিম্নস্তরের শৈব ও শাক্তগণের ন্যায়, বৈষ্ণবগণও অনেক বিভৎস ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া যৌন-চর্চ্চার সাহায্য করিয়াছে এবং "সহজিয়া" নামক এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইহার অত্যধিক চর্চ্চার ফলে যথেষ্ট নিন্দা অর্জ্জন করিয়াছে। এই বিষয়ে দুই মত নাই। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের নামও এতৎ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

গৃহের মেরুদণ্ড গৃহিণী। ইহা সর্ব্বদা স্বীকার্য্য। এমতাবস্থায় প্রাচীন বাঙ্গালীর গৃহাভ্যন্তরে নারীগণের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারিলে তৎকালীন বাঙ্গালী গৃহস্থের সমাজের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় অন্ততঃ খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারা যেরূপ স্বাধীনতা, শিক্ষা ও মর্য্যাদালাভ করিয়াছিল ক্রমে তাহার অবনতি ঘটে। অবশ্য গৃহাভ্যন্তরে নারীর মর্য্যাদা বরাবরই অনেকাংশে অব্যাহত আছে, শুধু স্বাধীন গতিবিধি ও মতবাদ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের গীত বা মাণিকচন্দ্র রাজার গীতের ন্যায় নাথ-পন্থী সাহিত্যে দেখা যায় রাজবধূরাও দোলায় চড়িয়া স্বর্ণকারের বাড়ী যাইতেছেন। ধর্ম্ম-মঙ্গল সাহিত্যের লক্ষ্মী ডুমুনি ও রাজকন্যা কানেড়া অপর উদাহরণ। এই জাতীয় সাহিত্যে "আদ্যের আমিনী" নামক এক শ্রেণীর নারী-পুরোহিত বা সন্ন্যাসিনীর বৃত্তান্তও অবগত

(১) "ডুড়ু ডুড়ু করিয়া মনা হুকার ছাড়িল।
যত মুনিগণকে হুকারে নাবাইল।
পুষ্পরথে গোরখ বিদ্যাধর।
ঢেকি বাহনে নাবিল নারদ মুনিবর।
বাসোরার পিঠিত নাবিল ভোলা মহেশ্বর।
ধনুক বাণে নাবিলেন শ্রীরাম-লক্ষণ।" ইত্যাদি।
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হওয়া যায়। বেহুলার ন্যায় নারীর যে চিত্র আমরা পাই তাহাতে পৌরাণিক প্রভাব সুস্পষ্ট থাকিলেও তৎপূর্ব্বযুগের স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার অনেক আভাস এই চরিত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকাতে নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও শিক্ষা-দীক্ষার অনেক পরিচয় আছে। নারীগণ অনেকটা অবাধে চলা-ফেরা করিতে তো পারিতই, তাহারা পুরুষদের ন্যায় রীতিমত শিক্ষাও লাভ করিত। শুধু লিখিতে পড়িতে জানাই এই শিক্ষার সব ছিল না। নারীজনোচিত নানা শিক্ষাও ইহারা লাভ করিত, আবার পুরুষদিগের ন্যায় শরীরচর্চ্চা, যুদ্ধ-বিদ্যাতেও ইহারা আবশ্যকানুযায়ী শিক্ষা লাভ করিত। ছেলেদের সহিত মেয়েরাও একই পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেছে এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। নারীজাতির প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যায় রাণী ময়নামতী (ময়নামতীর গান) বিশেষ তান্ত্রিক জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় স্বামী মাণিকচন্দ্রের গুরুর পদ পাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে "ডাকিনী" বলিতে বিশেষ অতিমানুষী জ্ঞান-সম্পন্ন এক শ্রেণীর নারীকে বুঝাইত। 'মহাজ্ঞান" বলিতে এই জাতীয় গুহ্যজ্ঞান বুঝাইত এবং এই জ্ঞান লাভ করিলে পার্থিব জগৎসহ মৃত্যুকেও জয় করা যাইত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। ডাকিনীগণ নানারূপ হীনকার্য্য করিয়া পরবর্ত্তীকালে সমাজে হেয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যের সুরিক্ষা নটীর অপূর্ব্ববিদ্যাবত্তা ও কলা-বিদ্যায় দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ব্যাধ-পত্নী ফুল্লরা চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে শাস্ত্র-জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। বিষয়ার উপাখ্যানে (বা চন্দ্রহাস গল্পে) মন্ত্রী-কন্যা বিষয়া লেখাপড়া ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের লীলাবতীর পত্র-লিখন এবং ধনপতি সদাগরের হস্তাক্ষর জাল-প্রচেষ্টা এবং খুল্লনার তাহা আবিষ্কার এই সমস্তই তৎকালীন সমাজের নারীগণের বিদ্যাচর্চ্চার পরিচায়ক। "সারদা-মঙ্গলে" দেখা যায় তাহারা পাঠশালায় যাইত। একই পাঠশালায় ছেলে ও মেয়ে পড়াশুনা করিতেছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়—যথা, কথাসাহিত্যের "পুষ্পমালা"র উপাখ্যান। কথাসাহিত্যের রাজকুমারী মল্লিকার কাহিনীতে নারীর শারীরিক বল-চর্চ্চারও আভাস পাওয়া যায়। রাজকুমারী বিদ্যা "বিদ্যাসুন্দর" উপাখ্যানে যেরূপ বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং তর্ক-যুদ্ধে হারিলে বিবাহ করিবেন বলিয়া যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

অথচ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইহার কারণ কি? যে যুগে নারীগণ উল্লিখিত সুখ-সুবিধা ভোগ করিত তাহা খৃঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইলেও পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। নারীগণের মর্য্যাদা ও অধিকার মূলতঃ জাতিগত-ভাবে বিচার করা সঙ্গত। আর্য্যেতর অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিগুলির ভিতর স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তুলনায় আর্য্যজাতি বৈদিক যুগ হইতে যে মর্য্যাদা তাহাদিগকে দিয়াছে তাহা নানা দিকে সীমাবদ্ধ। মনুসংহিতার নির্দ্দেশ এই সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলেও দেখা যাইবে আর্য্যপূর্ব্ব বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য সমধিক ছিল। পূর্ব্ব-ভারতে নানা জাতির আদর্শগত স্ত্রীপ্রাধান্য বা স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য আর্য্যপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং নিঃসন্দেহক্রমে পুরুষপ্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। পৌরাণিক ধর্ম্ম ও স্মৃতির আদর্শের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার আর্য্যগণ এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করে। তাহাদের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ ইহা সাধন করিতে তত অগ্রসর তো হয়ই নাই বরং নানা জাতি লইয়া গঠিত বৌদ্ধ-সমাজে নারী একটি বিশিষ্ট স্থানই অধিকার করিয়াছিল।

উপরে বর্ণিত জাতিগত আদর্শ ধর্ম্মগত আদর্শকে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিল এবং পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্ব-ভারতীয় আর্য্যগণই এই সম্বন্ধে দায়ী। নূতন আদর্শ অনুসারে নারী পুরুষের ভূ-সম্পত্তির ন্যায় এক প্রকার সম্পত্তিতে পরিণত হইল এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতা অপেক্ষা ইহার কোমলতা ও স্বাধীন মতানুবর্ত্তিতা অপেক্ষা স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অধিক আদরণীয় হইল। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে সেনরাজগণের রাজশক্তি এই নূতন মত প্রচারে প্রথম সাহায্য করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে মুসলমান যুগেও ব্রাহ্মণ সমাজকর্ত্তাগণ কৌলিন্য প্রথা, সহমরণ প্রথা প্রভৃতি সাহায্যে এই মতবাদ দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করেন। আর্য্যেতর জাতিসমূহ হইতে আগত দেবদেবীগণ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে নারীর এই পরাধীনতা সগর্ব্বে ঘোষিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম যে কার্য্য সাধনে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইয়াছিল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সেনরাজগণ ও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাহা সংসাধিত করিল। তবুও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশেষ করিয়া নারীচরিত্রের দৃঢ়তা নানা স্থানে বিঘোষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্কার যুগের আদর্শগত পরিবর্ত্তনে এবং হিন্দুস্বাধীনতার অবসানেও তাহা একান্তভাবে লোপ পায় নাই। যেখানেই নারীচরিত্রে দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যাইবে সেখানেই

দেখা যাইবে এই কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও তেজস্বীতার মূলে ধর্ম্মের আদর্শ তত প্রবল নহে ; ইহার মূলে প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির স্বাভাবিক রুচি, প্রবৃত্তি ও সহিষ্ণুতা এবং আর্য্যেতর জাতির জাতিগত স্বভাব অধিক ক্রিয়া করিয়াছে। নারী হিন্দু বা বৌদ্ধ বলিয়া নম্র-স্বভাব অথবা তেজস্বিনী হয় নাই এবং এই দুইগুণ পরস্পর বিরোধীও নহে। নারীকে প্রথমে নারী হিসাবেই গ্রহণ করিয়া পরে তাহার উপর জাতিগত ও সমাজগত প্রভাব এবং সর্ব্বশেষ ধর্ম্মগত প্রভাব বিচার করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বেহুলার কথা বলা যাইতে পারে। নৃত্যগীতপটু যে বেহুলা কত কষ্ট সহ্য করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিল এবং মৃত স্বামী জিয়াইয়া ঘরে আনিল তাহার চরিত্র সমালোচনা করিতে নারীর সহজ স্বভাব হিসাবে তাহাকে প্রথম বিচার করিয়া তৎপর নৃত্যগীত প্রভৃতি নারীর শিক্ষণীয় বিষয়সম্পন্ন হিন্দু সমাজে আর্য্যেতর আদর্শ কতখানি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দেখিতে হইবে। সর্ব্বশেষে মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত করিবার কাহিনীতে কতটা তান্ত্রিক আদর্শ এবং কতটা পৌরাণিক স্বামীভক্তির আদর্শ রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে হইবে। নতুবা হয় পৌরাণিক হিন্দু আদর্শ নতুবা বৌদ্ধ আদর্শ বলিলে ঠিক হইবে না। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-সমাজ পৌরাণিক ভিত্তিতে গঠিত রক্ষণশীল সমাজের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর কিয়ৎপরিমাণে শিথিলতা আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে নারী কতখানি অসহায় ছিল তাহা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের এক ছত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফুল্লরার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন,—"দোষ দেখি নাক কাটে, উৎসাহে বসায় খাটে, দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।" এই কাব্যে নানা স্থানে এই শ্রেণীর উক্তি ও বর্ণনা আছে। তবে একটা কথা না বলিয়া পারা যায় না। হিন্দুস্বাধীনতার অবসানে রক্ষণশীল হিন্দু (প্রধানতঃ শাক্ত কিম্বা স্মার্ত্ত) সমাজ মুসলমান ভীতিতে পড়িয়াই হউক, কৌলীন্য প্রথার জন্যই হউক অথবা অন্যবিধ যে কারণেই হউক নারীগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলেও মাতৃত্ব-বোধের দিক দিয়া এই সমাজ নারীকে যথেষ্ট সম্মানও দিয়াছিল। বৈষ্ণব নারী-ভাব ও বিশেষ প্রেমের আদর্শ নারীকে সমাজবন্ধন হইতে কিয়ৎপরিমাণে মুক্ত করিলেও ইহাদের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাও বোধ হয় কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালার পুরুষসমাজ নানাদিকে বৈশিষ্ট্য ও উন্নতি অর্জ্জন করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের "ব্রাত্য" নামক

সামরিক জাতির রথ ও সৈন্যবলের কথা বৈদিক সাহিত্যে অবগত হওয়া যায়। মহাভারতে এই দেশের রাজশক্তির নৌবলের উল্লেখ আছে। মানব জাতির নানা শাখার বসবাসহেতু নানা রুচিসম্পন্ন জাতিনিচয় বিভিন্ন দিকে এই দেশের উন্নতি করিয়াছিল এবং ইহাদের সংমিশ্রণের ফলেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীন বাঙ্গালার অধিবাসিগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। খৃঃ ৮ম। ৯ম শতাব্দীর চর্য্যাপদগুলি পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই ধারণা হয় যে তৎকালীন বাঙ্গালী মনে একসঙ্গে বৈরাগ্য ও তান্ত্রিকতা ক্রিয়া করিতেছিল। বৈরাগ্য বলিতে সংসারবিমুখতা ও সন্ন্যাস শৈবমতাবলম্বী ও মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্যকে আশ্রয় করিলেও ইহার পটভূমিকাতে বৌদ্ধশূন্যবাদের প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে। আবার তান্ত্রিকতার দিকে শৈবমতবাদের শিব ঠাকুর এবং প্রধানতঃ তিব্বত প্রচলিত মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালায় চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু রাজা শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়া মহাযানী বৌদ্ধ পাল রাজত্ব উত্তর বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার বহু পূর্ব্বে মগধে বৌদ্ধ মৌর্য্য ও হিন্দু গুপ্ত সাম্রাজ্যের লোপ হইলেও এই দুই সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি বাঙ্গালা দেশ আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয়ই অত্যধিক। ইহার এক কারণ বোধ হয় একদিকে বৌদ্ধ পাল রাজগণের পূর্ব্বে হিন্দু রাজা শশাঙ্কের রাজত্ব এবং পরে হিন্দু শূর ও সেনরাজগণের অভ্যুদয়।

প্রাচীন বাঙ্গালায় ধর্ম্মমতের যে আন্দোলন দেখা যায় তাহার একধারা উত্তরের হিমালয় পর্ব্বতের ক্রোড়দেশ হইতে সম্ভবতঃ পামিরীয়-মঙ্গোলীয় জাতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। চর্য্যাপদ জাতীয় গ্রন্থে তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য নানা ধর্ম্মমত প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। চর্য্যাপদের ধর্ম্ম মতেও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রচারেও দাক্ষিণাত্যের দান অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মান্দোলনসমূহের ফলে বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতির দেব-দেবী যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া আসিতেছিল তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব মতবাদের মধ্যে তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু মতের বিভিন্ন ধারা এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী পূজার

মধ্যেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মঙ্গল কাব্য, শিবায়ন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার অনেক নিদর্শন আছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন যুগ কৃষি-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ডাকের বচন এবং বিশেষ করিয়া খনার বচন ইহার সাক্ষ্যদান করে। শিবোপাসক পাহাড়ী পামিরীয় জাতি বাঙ্গালার সমতল ভূমিতে আসিয়া কৃষির প্রতি যে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখায় তাহাই শিবায়ন কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে কি না কে জানে! "বাপ-বেটায় চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই"—(খনা) প্রভৃতি বাক্যে কৃষির প্রতি প্রাচীন বাঙ্গালীর মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালা দেশে প্রাধনতঃ কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই সমাজ দাঁড়াইয়াছিল। পারিবারিক জীবন এবং দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতিতে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ইহার ফলে নগর অপেক্ষা গ্রামের প্রতিই সমাজের অধিক লক্ষ্য ছিল। ঐক্যবদ্ধ পরিবার ও সামাজিক সংগঠন কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। ধান্য বাঙ্গালার প্রধান কৃষিসম্পদ হিসাবে এখনকার ন্যায় তখনও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের শূন্যপুরাণে এবং মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের শিবায়নে বহু রকম ধান্যের নাম ও বিবরণ আছে। সুগন্ধ-বিশিষ্ট অত্যন্ত সরু যে সব শ্রেণীর চাউলের সংবাদ ইহাতে রহিয়াছে তাহা এখন স্বপ্নলোকের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সব চাউল ও ধান্যের অনেক শ্রেণীর নামের অর্থ দুর্ব্বোধ্য, আবার অনেক শ্রেণীর নাম যথেষ্ট কবিত্ব-পূর্ণ ছিল। ছিছিরা, ককচি, আলাচিত্রা, কয়া, ভুটিয়া, ভোজনা বুধি প্রভৃতি ধান্য-নাম যেমন দুর্ব্বোধ্য, আবার কটকতারা, মাধবলতা, মহিপাল, গোপাল, তিলক-ফুল, নাগর-যুয়ান, মুক্তাহার, লক্ষ্মী-প্রিয়, রণ-জয়, কণক-চূড, ভুবন-উজ্জ্বল প্রভৃতি নাম কেমন কবিত্ব-পূর্ণ এবং আংশিক ঐতিহাসিক (যথা মহিপাল ও গোপাল) তথ্যের সন্ধান দেয়। সংস্কৃত কৃষি-পরাশর কৃষি-বিষয়ক গ্রন্থ এবং বাঙ্গালী কৃষকগণ কৃষি-কার্য্য ও গোপালনে এই গ্রন্থের মত মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিল। কৃষি-জ্ঞানের অপরিহার্য্য অঙ্গ আবহাওয়া জ্ঞান। বাঙ্গালী কৃষক যে ইহা ভালরূপেই লক্ষ্য করিয়া চাষবাস করিত, খনার বচন পাঠে তাহা জানা যায়। প্রাচীনকালে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বাঙ্গালী সমাজের অগাধ বিশ্বাস কতকটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং কৃষিকার্য্যেও ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইত। সুদূর অতীতে সাধারণ বাঙ্গালী কৃষকের গ্রহ-নক্ষত্র জ্ঞান এবং আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা এই যুগে আমাদিগকে বিস্মিত করে। "খনার-বচন" এই হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রাচীনকালের অনেক রীতি-নীতি এই যুগে অচল। উদাহরণস্বরূপ "অষ্ট-পরীক্ষা"র কথা বলা যাইতে পারে। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে সমাজ এইরূপ পরীক্ষা লইতে স্বামীকে বাধ্য করিত নতুবা তাহার অর্থদণ্ড হইত। এই "অষ্ট-পরীক্ষা" বা আট রকম পরীক্ষার মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা এক এক পুথিতে এক একরূপ লিখিত আছে। এই পরীক্ষাগুলির নিম্নরূপ নাম দেওয়া যাইতেছে। যথা, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষা, অগ্নি-পরীক্ষা (জতুগৃহ পরীক্ষা, উষ্ণ-তৈলপূর্ণ কটাহ পরীক্ষা, অগ্নিকুণ্ড পরীক্ষা ইত্যাদি), জল-পরীক্ষা, আসন-পরীক্ষা, অঙ্গুরী-পরীক্ষা, সর্প-পরীক্ষা, লৌহ-পরীক্ষা ও তুলা-পরীক্ষা। সেকালে মঙ্গলকাব্যের খুল্লনা ও বেহুলাকে এই পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই পরীক্ষাগুলি এবং অনেক রীতি-নীতির মধ্যে মঙ্গোলীয় ও তান্ত্রিক প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। সেই যুগে বাণিজ্য-যাত্রা কালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে একরূপ স্বীকারোক্তি লিখিয়া বণিক জল-পথে বাণিজ্য-যাত্রা করিত। তাহার নাম ছিল "জয়-পত্র"। বিদেশে যাত্রার ছাড়পত্রের নাম ছিল "বেরাজপত্র"। বিবাহ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত নিয়ম ছিল। এক কন্যা বিবাহ করিয়া তাহার ভগ্নীকে দানস্বরূপ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। যথা, "অদুনাকে বিবাহ দিয়া পদুনাকে দিল দানে" (মাণিকচন্দ্র রাজার গান)। পৌরাণিক হিন্দু সংস্কার-যুগে কুকুর অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তৎপূর্ব্বযুগে মাণিকচন্দ্র রাজার গানে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র কুকুর পুষিতেন এবং তাহা অস্পৃশ্য ছিল না। স্বামীবশীকরণের বহু তুক্‌তাক্ (অভিচার) মন্ত্র-তন্ত্র ও ঔষধাদির কথা (টোনা) অথর্ব্ব বেদের যুগে উল্লিখিত আছে জানা যায়। বহু বিবাহ এই দেশের অনেক পুরাতন প্রথা। ইহার ফলে স্ত্রীগণ স্বামীকে বশীভূত করিবার উপায় চিন্তা করিত। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে (যথা—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং মনসামঙ্গল কাব্যে) ইহার উদাহরণ আছে। এই উপলক্ষে "কচ্ছপের নখ আন, কুম্ভীরের দাঁত। কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥" ইত্যাদি (মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল) এবং "কাকড়ার বাম পাও উন্দুরের পিত। পেঁচার বাঁও চক্ষের কর কাজল রচিত॥" ইত্যাদি (বংশীদাসের মনসামঙ্গল) ছত্রগুলি বেশ উপভোগ্য। সেক্সপিয়র বর্ণিত ম্যাকবেথের "Witches broth" বা ডাইনীদের প্রস্তুত অদ্ভুত ব্যঞ্জনের সহিত একই যুগের বাঙ্গালার এই প্রাচীন তালিকাগুলির আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য আছে। অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়া তখন সমাজে চলিত। ধর্ম্মমঙ্গলের রাণী রঞ্জাবতীর "শালে-ভর" দেওয়া ও মনসামঙ্গলের বেহুলার

স্বীয় গাত্রমাংস কাটিয়া মনসা-দেবীকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস ইহার অন্যতম উদাহরণ। নাথ-পন্থী সাহিত্যের হারিপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের অলৌকিক কার্য্যসম্পাদন তান্ত্রিকতারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খৃঃ ১৪শ।১৫শ শতাব্দী হইতে পৌরাণিক আদর্শ ও আর্য্য ব্রাহ্মণগণ প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি ক্রমশঃ সমাজে প্রবেশ করিয়া এইরূপ প্রথা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে শ্রীচৈতন্যের আদর্শে গঠিত বৈষ্ণব বাঙ্গালী-সমাজ এই সমস্ত রীতি-নীতি, রক্তপাত ও বলী-প্রথা প্রভৃতির রীতিমত বিরোধী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে কালক্রমে অনেক তান্ত্রিক কুপ্রথার বিলোপ ঘটে। মধ্যযুগের প্রথম দিকে বেশভূষা অনেক পরিমাণে পশ্চিমদেশীয়গণের ন্যায় ছিল। তখনকার বাঙ্গালী কাপড় "কাছিয়া" (মালকোঁচা দিয়া) পরিধান করিত। মাথার পাগড়ি অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র মাতৃশোকে মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুরুষগণ কোমরে "বেল্টের" পরিবর্ত্তে যাহা পরিত তাহার নাম ছিল "পটুকা" এবং স্ত্রীলোকগণের কোমরবন্ধের নাম ছিল "নীবিবন্ধ।" জুতা সম্ভবতঃ কদাচিত ব্যবহৃত হইত। সাধারণ ব্যবহারে খড়ম চলিত। নারীগণের মধ্যে কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরি ও চন্দনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। সেই সময় সাবানের পরিবর্ত্তে আমলকি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সৌখিন সমাজে গাত্রে "পত্র-রচনা" এবং সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে "অলকা-তিলকা" নামে চন্দন ও কস্তুরির সংমিশ্রিত পদার্থের মুখে ও বক্ষে অঙ্কণের প্রথা ছিল। সমাজে সমাগত ব্যক্তিগণের বৈঠকে "মালা-চন্দন" দিয়া অভ্যর্থনা করিবার প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কে উহা আগে পাইবে তাহা নিয়া বিবাদবিসম্বাদও হইত। ধনপতির উপাখ্যানে তাহার পরিচয় আছে। সম্ভ্রান্ত নারীগণ মেঘডম্বুর, মেঘনাল প্রভৃতি বহুমূল্য রেশমী সাড়ী পরিধান করিত। নিম্নস্তরের নারীগণ মোটা রেশমের সাড়ী (খুঞা) পরিত। নীবিবন্ধ ও সাড়ী ভিন্ন নারীগণের আর একটি সৌখীন সামগ্রীর নাম কাঁচুলি নামক জামা। ইহা খুব বহুমূল্য হইত এবং শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার প্রভৃতি খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে তৎপরবর্ত্তীকালের কাঁচুলিগুলিতে যথেষ্ট অঙ্কিত থাকিত। তাড়, বালা, কঙ্কণ, কেউর প্রভৃতি তখনকার দিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্কার ছিল এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহার কতকগুলি অলঙ্কার পরিধান করিত।

পুরুষেরা একরূপ বাবড়ি চুল রাখিত এবং নারীগণ তাহাদের সুদীর্ঘ কেশ নানারূপ খোঁপায় এবং মালা ও কুসুমদামে সজ্জিত করিত। এতদ্ভিন্ন

উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর ভিতরেই নারীগণের নানাপ্রকার রন্ধন জানা অন্যতম বিশেষগুণ হিসাবে গণ্য হইত।

জাতিবিভাগ সম্বন্ধে বলা যায় প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ নানা জাতি বা বর্ণের (castes) বাসভূমি হইলেও ইহাদের সকলের অবস্থা সব সময় সমান ছিল না। উদাহরণস্বরূপ অন্ততঃ গ্রহবিপ্র, হাড়ি, ডোম ও বণিক সমাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সময়ের দিক দিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-যুগের (খৃঃ ১২শ-১৫শ শতাব্দী) পূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী সময় ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই পৌরাণিক সংস্কার যুগের পূর্ব্বে বর্ণগুলির অবস্থা একরূপ ছিল পরে অন্যরূপ হইয়াছে। খৃঃ ১২শ হইতে খৃঃ ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সামাজিক সংস্কার খুব প্রবলভাবে চলিয়া খৃঃ ১৬শ হইতে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা ফলপ্রসূ হয়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে খৃঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ইহার যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহার ফলে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব এই দুই ভাগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিক আদর্শে সমাজসংস্কার সেনরাজা বল্লাল সেনের সময় (খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী) বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে শূররাজগণও এই বিষয়ে কতক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাদের সহায় হন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ। এই ব্রাহ্মণগণের আগমনের পূর্ব্বে হাড়ি ও ডোম শ্রেণী কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট (যথা, ধর্ম্ম-পূজক ও নাথ-পন্থী) বিশেষ মর্য্যাদা পাইত। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন ইহা বৌদ্ধ-প্রভাব। এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তি নাই। লৌকিক ধর্ম্মের প্রসার হেতু এবং তান্ত্রিক মতের প্রাবল্যে এই জাতি দুইটি উক্তরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি। ধর্ম্ম-ঠাকুর শিব ঠাকুরেরই অন্যতম সংস্করণ হওয়া সম্ভব। এই জাতি দুইটিও আর্য্য না হইয়া অষ্ট্রিক অথবা মঙ্গোলীয় (তিব্বত-ব্রহ্মী) গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারে। ইহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে বর্ণ বাঙ্গালা দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহারা সূর্য্য-উপাসক ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র। জ্যোতিষভক্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সমাজে এই ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। ইহারা মগ ব্রাহ্মণ বা মধ্য এসিয়া হইতে আগত শাকদ্বীপি (তুরাণীয় ?) ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। ইহাদের সহিত ক্ষমতা নিয়া ধর্ম্ম-পূজক হাড়ি-ডোমগণের সহিত যে বিবাদ হয় তাহার পরিচয় রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি"তে আছে। সেনরাজগণের সময়ের প্রথমদিক পর্য্যন্ত বণিক সম্প্রদায়ের নানা শাখার মধ্যে সুবর্ণ বণিক ও গন্ধ-বণিকশাখা দুইটির খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইহা কি

হিন্দু ও কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের রাজার আমলেই থাকা সম্ভব। কিন্তু কোন কোন কারণ পরম্পরা এই দুই বণিক শ্রেণী সেনরাজা বল্লালসেনের কোপে পতিত হইয়া সামাজিক মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলে। এই সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যাহা হউক, কোন এক বিস্মৃত যুগে গন্ধবণিকগণ যে সমুদ্র-পথে নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিত এবং রাজাগণও তাহাদিগকে প্রায় সমশ্রেণীভাবে ব্যবহার করিতেন তাহার অনেক পরিচয় পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যসমূহে রহিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালে ইহাদের দ্বারা নানারূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার উদাহরণেরও অভাব নাই।

কোন এক অতীত যুগে বাঙ্গালী বণিকগণ যে সমুদ্র-পথে নানা দূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত অনেক পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহার কিছু কিছু সন্ধান আমাদিগকে দিয়াছে। বাঙ্গালীর এই সমুদ্র-যাত্রা এবং ভারত-মহাসাগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নানা স্থানে যাতায়াতের ফলেই সম্ভবতঃ ইন্দোচীন ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন বাঙ্গালীর কীর্ত্তি চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় কৃষি-সম্পদ যেরূপ পামিরীয় জাতির বিশেষ প্রচেষ্টার ফল সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গালীর অকুতোভয়ে পালতোলা জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় অষ্ট্রিক উপনিবেশের অপূর্ব্ব দান। অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। বাঙ্গালার গন্ধবণিক শ্রেণীতে অষ্ট্রিক রক্ত আবিষ্কার হইবে কি না তাহা না জানিলেও সমুদ্রপ্রিয় অষ্ট্রিক জাতির প্রাচীন বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন ভুলিলে চলিবে না। সমুদ্রপথে যে যে দেশে বাঙ্গালী বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইত এবং যে যে দ্রব্য বিনিময় হইত তাহার কতক বিবরণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। অনেক পরবর্ত্তী সাহিত্যে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কাহিনীর এইরূপ অপূর্ব্ব সংরক্ষণ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। যে যে দেশে এই বণিকগণ যাইত তাহাদের মধ্যে সিংহল ও পাটন (দক্ষিণ-পাটন) বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। বণিকগণ কোন সময়ে বাণিজ্য ব্যাপারে অসাধুতার আশ্রয় লইত তাহার অনেক প্রমাণ মঙ্গলকাব্যসমূহে ও কথা-সাহিত্যে আছে। বিনিময় মুদ্রার সাহায্যে ব্যবসা না করিয়া দ্রব্যের বদলে দ্রব্য লেন-দেন হইত। ইহার নাম "বদল-বাণিজ্য"। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত তালিকা দেখিয়া মনে হয় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এক বস্ত্র ভিন্ন বাঙ্গালী বণিকগণ প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ নিয়া বাণিজ্যে বাহির হইত। ইহাতে প্রাচীন সেই বিস্মৃত যুগের শিল্পোন্নতির কোন পরিচয় নাই। ইহাদের বদলে

প্রাচীন বাঙ্গালী বণিকগণ নানাবিধ মসলা, পশুপক্ষী, শিল্পজাতদ্রব্য, মূল্যবান শঙ্খ, মুক্তা ও রত্নাদি নিয়া স্বদেশে ফিরিত। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে "বদল-বাণিজ্যের" বর্ণনা এইরূপ। যথা,—

"লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
পাটশণ বদলে, ধবল চামর পাব,
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
জোয়ানী বদলে জিরা॥" ইত্যাদি।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

সমুদ্রগামী পোত বা জলযানগুলি যে খুব বৃহদাকার হইত তাহা বুঝাইতে কবিসুলভ অতিশয়োক্তি আছে। নৌকাগুলির নামও বেশ সুন্দর ছিল। প্রধান নৌকা বা জলযানের নাম "মধুকর" ছিল। এই স্থানে ইহাদের বর্ণনার একটু নমুনা দিতেছি। যথা,—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বান্ধা যার বৈঠকির ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আথণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশীগজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥" ইত্যাদি।

—মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য।

বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) বর্ণনা এইরূপ। যথা,—

"তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি॥
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা ভাড়ার-পাটুয়া।
সেই নায় উঠাইয়া লইল তামিলের নাটুয়া॥

* * * *

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
অনেক নায় ঝড়বৃষ্টি অনেক নায় খরা॥" ইত্যাদি।

—মনসা-মঙ্গল, বিজয়গুপ্ত।

পুরোহিতের প্রশ্নের উত্তরে বণিকগণ যাত্রার প্রাক্কালে নানারূপ পূজা, বিশেষতঃ বরুণ দেবতার পূজা ও নৌকা-পূজা, করিয়া প্রথানুযায়ী পারিবারিক ভরণপোষণ স্বীকার করিয়া তবে নৌকায় পদক্ষেপ করিত। নৌকাগুলি সুদৃঢ় করিবার জন্য ইহার অগ্রভাগ ময়ূর, শুকপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় গঠিত হইত। বণিকগণ যাত্রার প্রাক্কালে কখনও কখনও দেব-দ্বিজের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন বা অপমান করিলেও তাহা বৌদ্ধ-ভাবের জন্য নহে। ইহা বণিকের দাম্ভিক প্রকৃতি এবং অজানিত দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। অথবা ইহা স্বীয় উপাস্য-দেবতার প্রতি অন্ধভক্তির উদাহরণ এবং নারীগণের মধ্য দিয়া নূতন কোন দেবতার পূজা প্রচারে অবিশ্বাসীকে ভক্তিমান করিবার কৌশল মাত্র। নারীগণ কর্তৃক নূতন দেবতার পূজা সমাজে প্রচারের মধ্য দিয়া বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন বাঙ্গালায় নানা জাতির সংমিশ্রণ সূচিত করে।

প্রাচীন বাঙ্গালার জনগণের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে বলা যায় মধ্য যুগের সাহিত্যে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা প্রায় অনেক পরিমাণে তৎসাময়িক। ইহাতে জানা যায় ধনী ও নির্ধন দুই শ্রেণীই দেশে ছিল এবং উভয় শ্রেণীর বেশ জীবন্ত বর্ণনা এই সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় একদিকে যেমন ধনীর বিলাসদ্রব্যের প্রাচুর্য্য অপরদিকে দরিদ্রের মর্ম্মান্তিক অভাব ও দুঃখের জীবন। শিবায়ন কাব্যে শিবঠাকুরের ভিতর দিয়া যেন দারিদ্র্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মঙ্গলকাব্যে ফুল্লরার দারিদ্র্যের চিত্রও খুব মর্ম্মস্পর্শী। তবে, সম্ভবতঃ অভাবগ্রস্ত লোক সংখ্যায় তখন অল্প ছিল এবং দেশে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্য্য ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভর করিত। শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক, স্বর্ণবণিক ও গন্ধবণিক প্রভৃতি বণিকগণ ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট ধন অর্জ্জন করিত। ব্রাহ্মণগণ কেহ অধ্যাপক, কেহ পুরোহিত, কেহ গুরু এবং কেহ কুশারি (কুশের জল নিক্ষেপ দ্বারা আশীর্ব্বাদকারী) প্রভৃতির কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ইহাদের মধ্যে ভাট ব্রাহ্মণগণ কোন কোন কুলের প্রশংসাসূচক গান গাহিয়া ও রাজ-দূতের কাজ করিয়া, ঘটকগণ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া এবং গ্রহবিপ্রগণ নবজাত শিশুর কুষ্ঠী-ঠিকুজী প্রস্তুত করিয়া ও বর্ষফল শুনাইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

তখনকার দিনে নগর-নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। ইহার চারিদিকে প্রাচীর ও ভিতরে বিভিন্ন অংশে মন্দিরাদি থাকিত ও নানা জাতি বসবাস করিত। এক একজাতি এক এক অঞ্চলে এক চাপে বসবাস করিত। জাতিগুলির মধ্যে বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিত এবং কায়স্থগণ হিসাব-রাখা ও আবশ্যকানুযায়ী লেখাপড়ার কাজ করিত। পরবর্ত্তীকালে মুসলমানগণ নগরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে এক চাপে বাস করিত। মন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল এবং গৃহনির্ম্মাণের পূর্ব্বে গৃহস্থ "বাস্তু-পূজা" করিত। সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী ঘর-বাড়ী ও নগর নির্ম্মিত হইত। গৃহনির্ম্মাণে বাঁশ ও বেতের প্রচুর ব্যবহার তো ছিলই ইষ্টক, পাথর ও লোহার পাতের ব্যবহারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নানারূপ ঘর নির্ম্মিত হইত। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার ঘরকে "জলটুঙ্গী" বলিত। ইহা জল মধ্যে (ঠাণ্ডা বোধ করিবার জন্য) নির্ম্মিত হইত। ইহা ছাড়া "বাঙ্গালা ঘর" নামক এক প্রকার ঘর এবং 'বার-দুয়ারী' ঘর নামক ঘরের প্রচলন ছিল। ফার্গুসন সাহেবের মতে দুই চালযুক্ত 'বাঙ্গালা-ঘর' বাঙ্গালীই প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছে। মঙ্গলকাব্য, নাথপন্থী সাহিত্য প্রভৃতিতে এই সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নানা জাতি যাইত। আমরা মাধবাচার্য্যের চণ্ডী-মঙ্গল-কাব্যাদিতে ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চর্ম্মকার পাইক, নট পাইক প্রভৃতি নানাজাতির পাইকের বিবরণ প্রাপ্ত হই। প্রতাপশালী রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে তাঁহার অধীনস্থ বারজন "ভূঁইয়া" রাজা (বারভূঁইয়া) সঙ্গে করিয়া নিতেন। রাজশক্তি নামতঃ নিরঙ্কুশ হইলেও তাঁহার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন তাঁহাকে মানিতে হইত এবং সামাজিক প্রশ্নে রাজার বিশেষ কোন হাত ছিল না। প্রধানতঃ গ্রামে গঠিত হিন্দু সমাজ সামাজিক ব্যাপার নিয়া যত ব্যস্ত থাকিত রাজনীতি নিয়া তত মাথা ঘামাইত না। রাজাও স্বীয় কর্ত্তব্যভার সমাজের পাঁচজনের উপর ন্যস্ত থাকাতে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণও হিন্দু সামাজিক ব্যাপারে অল্পই হস্তক্ষেপ করিতেন, সুতরাং হিন্দুগণের অনেক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ছিল।[১] আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হইতে (খৃঃ ১৯শ শতাব্দী) জনসাধারণের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে।

---

(১) প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মৎপ্রণীত Aspects of Bengali Society এবং "বৃহৎ বঙ্গ" (দীনেশচন্দ্র সেন) দ্রষ্টব্য।

(ঘ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ছন্দ[১] ও অলঙ্কার

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য গান ও কবিতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অনেক কাব্যে কবিতার শীর্ষে রাগ-রাগিণী দেওয়া থাকিত। গায়কগণ উহা গাহিয়া যাইত। প্রধান গায়কের স্থানে স্থানে বিরতির প্রয়োজন হইত। তখন সঙ্গী গায়কগণ একত্রে কতিপয় ছত্র গাহিত। তাহাকে "ধুয়া" বলিত। প্রাচীন ছন্দ দুই প্রকার ছিল, যথা "পয়ার" ও "লাচাড়ী"। "লাচাড়ী" সবক্ষেত্রে না হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "ত্রিপদীর" স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রধান চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিতে অথবা বিশেষ ঘটনার মূল্য বুঝাইতে দীর্ঘ ছন্দের "ত্রিপদী" বা "লাচাড়ী" ব্যবহৃত হইত। গানে মাত্রার দিকেই লক্ষ্য অধিক হয়। ইহাতে অক্ষরের সংখ্যা নিয়া বাধাধরা নিয়ম চলে না। সুতরাং প্রাচীন "পয়ার" ও "লাচাড়ী"তে অক্ষর নিয়মানুগত না হইয়া কম-বেশী হইত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতে অক্ষর-সংখ্যা অপেক্ষা উচ্চারণের দিকে প্রাচীন কবিগণের অধিক দৃষ্টি এবং বাঙ্গালা অক্ষর "পূরা" এবং "ভাঙ্গটা"— এই দুই কারণেও প্রাচীন পয়ারের অক্ষর-সংখ্যা কম-বেশী হওয়ার কারণ ছিল। ফল কথা হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ এবং গানের রীতি প্রাচীন পদ্য-রচনা নিয়মিত করিত অথচ এখন এই হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বাঙ্গালায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ডাক ও খনার বচনে, শূন্যপুরাণে এবং ময়নামতীর গান প্রভৃতিতে সেইজন্য বাহ্যিক শৃঙ্খলার অভাব মনে হয়। ধারণা হয় যেন প্রাচীন যুগে অক্ষর, যতি বা মিলের কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য কথাটা আংশিক সত্যও বটে। বাঙ্গালা পয়ারের আদর্শ প্রথমে হয়ত প্রাকৃত ছিল। পয়ারের মোট ১৮শ অক্ষরের মধ্যে প্রতি ছত্রে ১৪ অক্ষর সংখ্যার স্থানে প্রয়োজনানুরূপ কম কি বেশী অক্ষর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আবার কমের দিকে ১১ অক্ষরেও উহা নামিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। ছত্রের শেষ অক্ষর বা শব্দের মিলের দিকেও সব সময় প্রাচীন কবিগণ দৃষ্টি দিতেন না, যথা—"তোমার বুদ্ধি নয় বধূ সকলের চক্র। যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল॥"—ময়নামতীর গান। এই অবস্থা সম্ভবতঃ খৃঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার পর অর্থাৎ খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যগুলিতে কবিতা-রচনায় যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে পয়ার ও লাচাড়ীর স্থানে ত্রিপদী ক্রমে সংস্কৃত আদর্শে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয় এবং অক্ষর ও মাত্রা সুশৃঙ্খলভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে।

---

(১) ছন্দ-সরস্বতী (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), বাঙ্গালা ছন্দ (মোহিতলাল মজুমদার), কাব্য-জিজ্ঞাসা (অতুলচন্দ্র গুপ্ত), কাব্যবিচার (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত), কাব্যনির্ণয় (আনন্দমোহন বিদ্যানিধি) প্রভৃতি গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ বাঙ্গালী কবি পদের অন্তে মিল রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত দেখা যায়। ইহাও কি সংস্কৃত "যমক" অলঙ্কারের অনুকরণের ন্যায় কি না বলা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি পদান্ত মিল ও অনুপ্রাস-যমক প্রভৃতির খুব ভক্ত ছিল। পয়ারাদি বাঙ্গালা ছন্দের প্রথম আদর্শ বোধ হয় প্রাকৃত জোগাইয়াছিল। ক্রমে সংস্কৃতের ছন্দের ঐশ্বর্য্য ইহাতে কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, আলাওল ও লোচনদাস প্রভৃতি মধ্যযুগের কবিগণ তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে কবি রামপ্রসাদ ও বিশেষভাবে কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তনের প্রশংসনীয় উদ্যম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিবিধ ছন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে। ইহাদের মধ্যে বৃত্তগন্ধী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী, মাত্রাত্রিপদী, লঘু চৌপদী, মাত্রাচতুষ্পদী, একাবলী (দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি), একাবলী (একাদশাক্ষরাবৃত্তি), তূণকছন্দ, দিগাক্ষরাবৃত্তি, তোটক, কুসুমমালিকা, ললিত, মালঝাঁপ, গৌরবিনী, মাত্রাবৃত্তি, বর্ণবৃত্তি, মালিনী ও ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দ উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র এককপ নির্দ্দোষরূপেই ছন্দরচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙ্গালায় তূণকছন্দ, একাবলী (একাদশাক্ষরাবৃত্তি), তরল পয়ার ও মালঝাঁপের ব্যবহার এইরূপ ছিল। যথা,—

তূণক— (ক) "রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
ছলস্থূল, কুলকুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥"—অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র।

একাবলী— (খ) "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥"— বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র।

তরলপয়ার—(গ) "বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতিচমৎকার॥" ঐ রামপ্রসাদ।

মালঝাঁপ— (ঘ) "কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি প'ড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥"— ঐ ঐ

এইরূপ সংস্কৃতের অনুকরণে সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় প্রয়োগের বহু উদাহরণ আছে।

অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা যায়, বাঙ্গালায় সংস্কৃতের আদর্শে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি, যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, কাকু প্রভৃতির ব্যবহার পরবর্ত্তীকালে হইয়াছিল। অলঙ্কার দুই প্রকার— শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শ্লেষ ও যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং রূপক ও উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার। খৃঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত

উপমা-তুলনার আড়ম্বরের অভাব ছিল। অতি সাধারণ গ্রাম্য কথায় সহজভাবে যে কোন বিষয় বুঝান হইত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে (খৃঃ ১১শ শতাব্দী) গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর দন্তের সহিত মুক্তার তুলনা না দিয়া সোনার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। যথা—"কার দন্ত দন্ত করিলে সোনা।" খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিতেছেন :

চণ্ডীর মূর্ত্তি

"তপ্ত কলধৌত জিনি তৈল অঙ্গশোভা।
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা॥
শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদচন্দ্র জিনিয়া বদন।" চণ্ডীকাব্য, মুকুন্দরাম।

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দীর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন :

"এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ জনসমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতাদির অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। অনেক রমণীর বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও চক্ষু নীলোৎপলের ন্যায় নহে, কাহারও ওষ্ঠ পক্ব বিম্বকে কিম্বা কাহারও দন্ত দাড়িম্ব বীজকে লজ্জা প্রদান করে না। ইহাদের সুদীর্ঘ কেশ-পাশ কালভুজঙ্গ হইয়া নায়ককে দংশন করে না। অনেক বীরের বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও ভুজ আজানুলম্বিত অথবা শালসম নহে।" ইত্যাদি (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৬৫)। এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত থাকা সম্ভব নহে।

* (৬) বাঙ্গালার হিন্দু রাজবংশ ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ

হিন্দু রাজবংশ

১। **খড়্গবংশ**—(আনুমানিক ৬৫০—৭০০ খৃষ্টাব্দ)—সমতটরাজ্য।
(হুগলী নদী ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালার বদ্বীপ অঞ্চল।)

খড়্গোদ্যম
|
জাতখড়্গ
|
দেবখড়্গ (আনুমানিক ৬৭৯—৬৮৫ খৃষ্টাব্দ)
|
রাজরাজ—রাজভট (৬৮৭ খৃষ্টাব্দ)

---

* বংশতালিকা, হিন্দু—The Dynastic History of Northern India by H. C. Roy এবং বংশতালিকা, মুসলমান—An Advanced History of India by R. C. Mazumder, H. C. Roy Chaudhuri and K. K. Datta হইতে প্রধানতঃ গৃহীত।

২। **পালবংশ**— (আনুমানিক ৭৬৫—১১৬২ খৃষ্টাব্দ)—উত্তর-বঙ্গ।

দৈত্যবিষ্ণু
|
ব্যপাট
|
প্রথম গোপাল (আনুমানিক ৭৬৫—৭৬৯ খৃঃ) = দেদ্দাদেবী
|
ধর্মপাল (আঃ ৭৬৯—৮১৫ খৃঃ) = রন্নাদেবী — বাক্‌পাল

ধর্মপাল-এর পুত্র:
ত্রিভুবনপাল — দেবপাল (আঃ ৮১৫—৮৫৪ খৃঃ)
দেবপাল
|
রাজ্যপাল

বাক্‌পাল
|
জয়পাল
|
প্রথম বিগ্রহপাল (আঃ ৮৫৪—৮৫৭)
অথবা প্রথম শূরপাল = লজ্জাদেবী
|
নারায়ণপাল (আঃ ৮৫৭—৯১১ খৃঃ)
|
রাজ্যপাল (আঃ ৯১১—৯৩৫ খৃঃ) = ভাগ্যদেবী
|
দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৩৫—৯৯২ খৃঃ)
|
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ৯৯২ খৃঃ)
|
প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৯২—১০৪০ খৃঃ)
|
ন্যায়পাল (আঃ ১০৪০—১০৫৫ খৃঃ)
|
তৃতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ১০৫৫—১০৮১ খৃঃ) = যৌবনশ্রী
|
দ্বিতীয় মহীপাল (আঃ ১০৮২ খৃঃ) — দ্বিতীয় শূরপাল (আঃ ১০৮৩ খৃঃ) — রামপাল (আঃ ১০৮৪—১১২৬ খৃঃ)

রামপাল-এর পুত্র:
রাজ্যপাল — কুমারপাল (আঃ ১১২৬—১১৩০ খৃঃ) — মদনপাল = চিত্রমতিকা (আঃ ১১৩০—১১৫০ খৃঃ)

কুমারপাল
|
তৃতীয় গোপাল (আঃ ১১৩০ খৃঃ)

মদনপাল
|
গোবিন্দপাল (আঃ ১১৫০—১১৬২ খৃঃ)
|
পলপাল

৩। **চন্দ্রবংশ** (আ: ৯৫০—১০৫০ খৃ:)—"বঙ্গাল" দেশ (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ)।
(রোহিতগিরি হইতে আগত। রোহিতগিরি—বিহারের অন্তর্গত রোটাসগড় অথবা ত্রিপুরার অন্তর্গত লালমাই পাহাড়।)

পূর্ণচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র
|
শ্রীচন্দ্র (মাণিকচন্দ্র)
|
গোবিন্দচন্দ্র (আ: ১০২১—১০৫৫)

লয়হচন্দ্র (হরিচন্দ্র ?)

মন্তব্য—এই বংশলতা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে।

৪। **শূরবংশ** (আ: ৯৫০—১১০০ খৃ:)—দক্ষিণ বঙ্গ বা রাঢ়দেশ (দক্ষিণ রাঢ়)

?
⋮
রণশূর (আ: ১০২১—১০২৫ খৃ:)

লক্ষ্মীশূর (আ: ১০৮৪—১১০০ খৃ:)
(দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত অপর-মন্দারের রাজা এবং পালবংশীয় রামপালের অধীনস্থ সামন্ত রাজা। সেনবংশীয় বল্লাল সেন লক্ষ্মীশূরের কন্যা রমাদেবীকে বিবাহ করেন।)

কুলজীমতে
আদিশূর (আ: ৭০০—১১০০ খৃ: মধ্যে কোন সময়ে)
|
ভূশূর
|
ক্ষিতিশূর
|
অবনিশূর
|
ধরণীশূর
|
রণশূর

৫। **বর্মন বংশ** (আ: ১০৫০—১১৫০ খৃ:)—পূর্ব বঙ্গ (বিক্রমপুর)।

বজ্র বর্মন
|
জাত বর্মন = বীরশ্রী (কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা)
|
শ্যামল বর্মন
|
ভোজ বর্মন

(জ্যোতি বর্মন)
|
হরি বর্মন

* ৬। **সেনবংশ** (আঃ ১০৫০—১২৮০ খৃঃ)—রাঢ়দেশ (পশ্চিম-বঙ্গ বা উত্তর-রাঢ়)

বীর সেন
⋮
সামন্ত সেন (আঃ ১০৫০—১০৭৫ খৃঃ)
|
হেমন্ত সেন (আঃ ১০৭৫—১০৯৭ খৃঃ)
| = যশোদেবী
বিজয় সেন (আঃ ১০৯৭—১১৫৯ খৃঃ)
| = বিলাসদেবী (শূরবংশীয়া)
বল্লাল সেন (আঃ ১১৫৯ – ১১৮৫ খৃঃ)
| = রমাদেবী
লক্ষ্মণ সেন (আঃ ১১৮৫—১২০৬ খৃঃ)
| = তারাদেবী (?), তন্দ্রাদেবী (?), তঠ্ঠনদেবী অথবা চন্দ্রাদেবী (?)।

- (?) মাধব সেন
- বিশ্বরূপ সেন (আঃ ১২০৬—১২২৫ খৃঃ)
  ⋮
  সদা সেন
  ⋮
  দনুজরাজা (?) — রাজা নাউজা (আঃ ১২৮০ খৃঃ)
- কেশব সেন (আঃ ১২২৫—১২৩০ খৃঃ)

৭। **কৈবর্ত্ত বংশ**

(আঃ ১২৮০ —১১০০ খৃঃ)—উত্তর-বঙ্গ (বরেন্দ্র)।

×
|
- দিব্বক
- রুদক
  |
  ভীম

মুসলমান রাজত্ব

পাঠান শাসনকাল

সুলতান ও শাসনকর্ত্তাগণ। ইঁহাদের অনেকে সাময়িক স্বাধীনও হইয়াছিলেন।

ক। **প্রথমদিকের কতিপয় পাঠান শাসনকর্ত্তাগণ**

(১) ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন (বিন বখ্‌তিয়ার) খিলিজি (মৃত্যু ১২০৬ খৃঃ)

(২) সুলতান আলাউদ্দিন (আলি মর্দ্দান)

(৩) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (সম্রাট আলতামসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যু ১২২৯ খৃঃ)

(৪) আলাউদ্দিন জানি (সুবেদার—১২৩১ খৃঃ)

---

* দ্রষ্টব্য—বিন্দুচিহ্ন দুই নামের মধ্যে থাকিলে সম্পর্ক অজ্ঞাত বুঝিতে হইবে।

(৫) তুঘরিল খান (সম্রাট বল্বনের প্রতিনিধি)

(৬) বাগ্রা খান (সম্রাট বল্বনের দ্বিতীয় পুত্র)

(৭) সামসুদ্দিন ফিরোজ সাহ (মৃত্যু—১৩১৮ খৃঃ) ইনি দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সমসাময়িক।)

দ্রষ্টব্য—সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর, সিহাবুদ্দিন বাগ্রা সাহ এবং নাসিরুদ্দিনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। গিয়াসুদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গে (রাজধানী সোনার গাঁও) স্বাধীন হন এবং সিহাবুদ্দিন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (গৌড়—উত্তরবঙ্গ) নগরে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। কিছুকাল পরে নাসিরুদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে (রাজধানী সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম) স্বাধীন হন। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বাঙ্গালাকে (সামসুদ্দিন ফিরোজ সাহের মৃত্যুর পর) উপরে বর্ণিত তিনভাগে ভাগ করেন। কয়েক বৎসর এইরূপ বিভক্ত থাকিয়া ত্রিধাবিভক্ত বাঙ্গালা পুনরায় একত্র হইয়া যায়।

(৮) নাসিরুদ্দিন (পশ্চিম-বঙ্গ)

(৯) বহরাম খান। এই সময়ে পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রথমে ফকরুদ্দিন মবারক সাহ (১৩৩৬ খৃঃ) এবং তৎপরবর্ত্তীকালে ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন গাজি সাহ সুলতান হন।

ধারাবাহিকভাবে পাঠান শাসকগণ

(১০) আলাউদ্দিন আলি সাহ (১৩৩৯ খৃ.—পশ্চিম-বঙ্গ)

(১১) হাজি সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ ভাঙ্গরা (১৩৪৫ পশ্চিম-বঙ্গ)

(১২) সিকান্দার সাহ (১৩৫৭ খৃঃ—সম্পূর্ণ বঙ্গ)

(১৩) গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ (১৩৯৩ খৃঃ)

(১৪) সইফুদ্দিন হামজা সাহ (১৪১০ খৃঃ)

(১৫) সিহাবুদ্দিন বায়াজিত (১৪১২ খৃঃ)

(১৬) গণেশ (ভাতুড়িয়া পরগণার রাজা, কানস্ নারায়ণ, ১৪১৪ খৃঃ)

(১৭) যদু (জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহ, খৃঃ ১৪১৪)

(১৮) দনুজমর্দ্দন (১৪১৭ খৃঃ ?—মতদ্বৈধ আছে)

(১৯) মহেন্দ্র (১৪১৮ খৃঃ ?—মতদ্বৈধ আছে)

(২০) সামসুদ্দিন আহাম্মদ সাহ (১৪৩১ খৃঃ)

(২১) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৪৪২ খৃঃ)

(২২) রুকনুদ্দিন বরবক সাহ (১৪৬০ খৃঃ)
(২৩) সামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ (১৪৭৪ খৃঃ)
(২৪) সিকান্দার সাহ (দ্বিতীয়) (১৪৮১ খৃঃ)
(২৫) জালালুদ্দিন ফাৎ সাহ (১৪৮১ খৃঃ)
(২৬) বরবক (খোজা) সুলতান সাহজাদা (১৪৮৬ খৃঃ)
(২৭) মালিকউদ্দিন (ফিরোজ সাহ) (১৪৮৬ খৃঃ)
(২৮) নাসিরুদ্দিন (মামুদ সাহ দ্বিতীয়) (১৪৮৯ খৃঃ)
(২৯) সিদি বদর (সামসুদ্দিন মুজাফর সাহ) (১৪৯০ খৃঃ)
(৩০) সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন সাহ (১৪৯৩ খৃঃ)
(৩১) নাসিরুদ্দিন নসরত সাহ (১৫১৮ খৃঃ)

মোগল শাসনকাল - বাবর, রাজত্ব ১৫২৬ খৃঃ আরম্ভ

(৩২) আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৫৩৩ খৃঃ)
(৩৩) গিয়াসুদ্দিন মামুদ সাহ (১৫৩৩ খৃঃ)
(৩৪) হুমায়ুন (দিল্লীর মোগল বাদসাহ—১৫৩৮ খৃঃ)
(৩৫) সেরসাহ শূর (১৫৩৯ খৃঃ)
(৩৬) খিজির খান (১৫৪০ খৃঃ)
(৩৭) মহম্মদ খান শূর (১৫৪৫ খৃঃ)

আকবর বাদসাহের সময় হইতে (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ)

(৩৮) খিজির খান (বাহাদুর সাহ) (১৫৫৫ খৃঃ)
(৩৯) গিয়াসুদ্দিন জালাল সাহ (১৫৬১ খৃঃ)
(৪০) গিয়াসুদ্দিনের পুত্র (১৫৬৪ খৃঃ)
(৪১) তাজখান কররাণী (১৫৬৪ খৃঃ)
(৪২) সুলেমান কররাণী (১৫৭২ খৃঃ)
(৪৩) বায়াজিদ খান কররাণী (১৫৭২ খৃঃ)
(৪৪) দায়ুদ খান কররাণী (১৫৭২—১৫৭৬ খৃঃ)
(৪৫) মুজাফরখান তুরবটী
(৪৬) তোডড়মল্ল (রাজপুতরাজা—মোগল বাদসাহের রাজপ্রতিনিধি)
(৪৭) মানসিংহ (রাজপুতরাজা—মোগল বাদসাহের রাজপ্রতিনিধি)
(৪৮) সুজা (বাদসাহ সাজাহানের পুত্র)
(৪৯) মির জুমলা

(৫০) সায়েস্তা খান

(৫১) মুর্শিদকুলি জাফর খান (১৭০৫ খৃঃ)

(৫২) সুজাউদ্দিন খান (ঐ জামাতা)

(৫৩) সরফরাজ খান (সুজাউদ্দিনের পুত্র)

(৫৪) আলিবর্দ্দি খান (সরফরাজ খানকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন, ১৭৪০ খৃঃ)

(৫৫) সিরাজুদ্দৌলা (১৭৫৬—১৭৫৭ খৃঃ)

খ। বাঙ্গালার ইলিয়াস সাহি বংশ
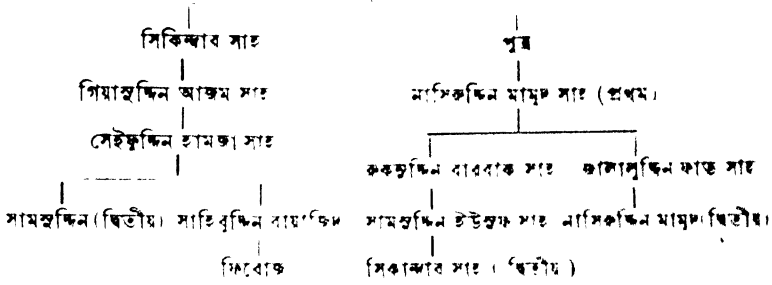
গ। বাঙ্গালার সৈয়দ স্থলতান বংশ

ঘ। বাঙ্গালার কররাণী বংশ

৬। বাঙ্গালার নবাবগণ

মুর্শিদকুলি জাফর খান (১৭০৩—১৭২৭ খৃঃ)

কন্যা = সুজাউদ্দিন (১৭২৭—১৭৩৯ খৃঃ)

সরফরাজ খান (১৭৩৯—১৭৪০ খৃঃ)

চ। **মির্জা মহম্মদ** (তুর্কীস্থান হইতে আগত ভাগ্যান্বেষী)
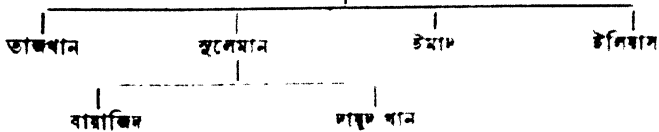
ছ। **মিরজাফর** (প্রথমবার নবাব, ১৭৫৭—১৭৬০ খৃঃ,
দ্বিতীয়বার নবাব, ১৭৬৩—১৭৬৫ খৃঃ)

ফতেমা বেগম (কন্যা) = মিরকাশিম (১৭৬০—১৭৬৩ খৃঃ)

নাজিমুদ্দৌলা (১৭৬৫—১৭৬৬ খৃঃ)

সৈফুদ্দৌলা (১৭৬৬—১৭৭০ খৃঃ)

(চ) প্রাচীন গ্রন্থ-পঞ্জী*

এই গ্রন্থে আলোচিত পুথিগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পুথি প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পুথির বিবরণও নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে তৎকালীন রচনার ধারা বুঝা যাইবে।

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(১)	অদ্বৈত-তত্ত্ব	শ্যামানন্দ পুরী। ইহাতে অদ্বৈত প্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্র পুরীর উপদেশ আছে।
(২)	অমৃতপ্রকাশখণ্ড	শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ।
(৩)	অভিরাম বন্দনা	রাইচরণ দাস। অভিরাম গোস্বামী এবং জাহ্নবী দেবীর বিবরণ আছে।

* প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে বর্তমানকালে নানাবিধ গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, যথা— বাংলার ব্রত (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), চৈতন্য চরিতের উপাদান (শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার), মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য), বাংলা সাহিত্যের কথা (শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন মৌলভী শহীদুল্লাহ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণও এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন।

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(৪)	আটরস	গোবিন্দদাস
(৫)	আনন্দভৈরব	প্রেমদাস
(৬)	উদ্ধব দূত	মাধব গুণাকর রচিত। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা গজসিংহের সভাসদ ছিলেন।
(৭)	উদ্ধব সংবাদ	দ্বিজ নরসিংহ
(৮)	উপাসনাসার সংগ্রহ	শ্যামানন্দ দাস
(৯)	একাদশী ব্রতকথা	শ্যামাদাস
(১০)	কণ্বমুনির পারণ	কৃষ্ণদাস
(১১)	কপিলামঙ্গল	ক্ষুদিরাম দাস ও কেতকা দাস
(১২)	কালনেমির রায়বার	কাশীনাথ
(১৩)	কালিকা বিলাস	কালিদাস
(১৪)	কাশীখণ্ড	কেবলকৃষ্ণ বসু (ময়মনসিংহ, কেদারপুরবাসী অনুবাদগ্রন্থ)
(১৫)	কিরণ দীপিকা	দীনহীন দাস (কবি কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার অনুবাদ)
(১৬)	ক্ষণদাগীতচিন্তামণি	পদসংগ্রহের পুথি
(১৭)	ক্রিয়াযোগসর	রামেশ্বর নন্দী
(১৮)	গঙ্গা-মঙ্গল	জয়রাম
(১৯)	গজেন্দ্রমোক্ষণ	ভবানী দাস
(২০)	গীতগোবিন্দ	গীতগোবিন্দের অনুবাদগ্রন্থ—লেখক অজ্ঞাত
(২১)	গীতগোবিন্দসার	গীতগোবিন্দের অনুবাদগ্রন্থ—লেখক অজ্ঞাত
(২২)	গুরুদক্ষিণা	পরশুরাম
(২৩)	গুরুদক্ষিণা	স্বরূপরাম
(২৪)	গুরুদক্ষিণা	শঙ্কর
(২৫)	গৌরগণাখ্যান	দেবনাথ
(২৬)	গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা	দ্বিজ রূপচরণ দাস
(২৭)	গৌরী বিলাস	দ্বিজ রামচন্দ্র

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(২৮)	ঘুঘু-চরিত্র	ভবানন্দ
(২৯)	চন্দ্রচিন্তামণি	প্রেমানন্দ দাস
(৩০)	চমৎকারচন্দ্রিকা	মুকুন্দ দাস
(৩১)	চমৎকারচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস
(৩২)	চাটুপুষ্পাঞ্জলী	রূপগোস্বামী
(৩৩)	চৈতন্যচন্দ্রামৃত	প্রবোধানন্দ সরস্বতী (সংস্কৃতের অনুবাদ)
(৩৪)	চৈতন্যতত্ত্বসার	রামগোপাল দাস
(৩৫)	চৈতন্যপ্রেমবিলাস	লোচনদাস
(৩৬)	চৈতন্য মহাপ্রভু	হরিদাস
(৩৭)	জগন্নাথ-মঙ্গল	দ্বিজ মুকুন্দ
(৩৮)	জয়গুণের বারমাস্যা	মহম্মদ হারি (চট্টগ্রাম)
(৩৯)	জ্ঞানরত্নাবলী	কৃষ্ণদাস
(৪০)	তত্ত্বকথা	যদুনাথ দাস
(৪১)	তত্ত্ববিলাস	বৃন্দাবন দাস
(৪২)	তীর্থ-মঙ্গল	বিজয়রাম সেন
(৪৩)	দধিখণ্ড	বৃন্দাবন
(৪৪)	দণ্ডীপর্ব্ব	কবি মহীন্দ্র
(৪৫)	দর্পণচন্দ্রিকা	নরসিংহ দাস
(৪৬)	দময়ন্তীর চৌতিশা	বিষ্ণু সেন
(৪৭)	দানখণ্ড	জীবন চক্রবর্ত্তী
(৪৮)	দাসগোস্বামীর সূচক	রাধাবল্লভ দাস
(৪৯)	দ্বারকাবিলাস	দ্বিজ জয়নারায়ণ
(৫০)	দিনমণিচন্দ্রোদয়	মনোহর দাস
(৫১)	দীপকোজ্জ্বল	বংশীদাস
(৫২)	দেহনিরূপণ	লোচনদাস
(৫৩)	দুর্গাপঞ্চরাত্রি	জগৎরাম
(৫৪)	ধ্রুবচরিত্র	ভারত পণ্ডিত
(৫৫)	ধ্রুবচরিত্র	লক্ষ্মীকান্ত দাস
(৫৬)	নারদপুরাণ	কৃষ্ণদাস

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(৫৭)	নিকুঞ্জরহস্য স্তবগীতাবলী	মূল রূপ-সনাতন কৃত এবং অনুবাদ বংশীদাস কৃত।
(৫৮)	নিগম	গ্রন্থকার অজ্ঞাত
(৫৯)	নিগমগ্রন্থ	গোবিন্দদাস
(৬০)	নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী	গৌরীদাস
(৬১)	নাম-সংকীর্ত্তন	লেখক অজ্ঞাত
(৬২)	নিত্যবর্ত্তমান	শ্রীজীব গোস্বামী
(৬৩)	নিমাইচাঁদের বারমাস্যা	লেখক অজ্ঞাত
(৬৪)	নিষ্কামী আশ্রয় নির্ণয়	লেখক অজ্ঞাত। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর কথায় ভক্তির ব্যাখ্যা আছে।
(৬৫)	নৌকাখণ্ড	জীবন চক্রবর্ত্তী
(৬৬)	পাষণ্ড দলন	কৃষ্ণদাস
(৬৭)	প্রেমদাবানল	গুরুদাস বসু
(৬৮)	প্রেমবিষয়ক বিলাপ	যুগলকিশোর দাস
(৬৯)	প্রেমভক্তিসার	গুরুদাস বসু
(৭০)	প্রেমামৃত	গুরুচরণ দাস (শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী)
(৭১)	বাণ-যুদ্ধ	গৌরীচরণ গুহ
(৭২)	বিদ্যাসুন্দর	নিধিরাম কবিরত্ন
(৭৩)	বিলাপকুসুমাঞ্জলি	রঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস
(৭৪)	বীররত্নাবলী	গীতিগোবিন্দ
(৭৫)	ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত	অজ্ঞাত
(৭৬)	বৃন্দাবন-পরিক্রমা	কৃষ্ণদাস
(৭৭)	বৃন্দাবন-পরিক্রমা	জ্ঞানানন্দপুরী
(৭৮)	বৈষ্ণবামৃত	অজ্ঞাত
(৭৯)	ভক্তিচিন্তামণি	বৃন্দাবন দাস
(৮০)	ভজনমালিকা	কৃষ্ণরাম দাস
(৮১)	ভক্তি উদ্দীপন	নরোত্তম দাস
(৮২)	ভগবদ্গীতা	বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী (অনুবাদ)

	গ্রন্থ	রচনাকারী
(৮৩)	ভ্রমর গীতা	দেবনাথ দাস
(৮৪)	ভাগুতত্ত্বসার	রসময় দাস
(৮৫)	মঙ্গল-চণ্ডী	রঘুনাথ দাস
(৮৬)	মনঃশিক্ষা	গিরিবর দাস
(৮৭)	মাধবমালতী	দ্বিজরাম চক্রবর্ত্তী
(৮৮)	মুক্তাচরিত্র	নারায়ণ দাস (শ্লোক সংখ্যা ১০০০ হাজার)
(৮৯)	মোহমুদ্গর	পুরুষোত্তম দাস
(৯০)	যোগাগম	যুগলদাস
(৯১)	রতিবিলাস	রসিক দাস
(৯২)	রতিমঞ্জরী	অজ্ঞাত
(৯৩)	রতিশাস্ত্র	গোপাল দাস
(৯৪)	রত্নমালা	(পদ্য সংগ্রহ) অজ্ঞাত
(৯৫)	রসকদম্ব	কবিবল্লভ
(৯৬)	রসকল্পসার	নিত্যানন্দ দাস
(৯৭)	রসভক্তিচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস

অতিরিক্ত—

(৯৮)	অম্বরিশ উপাখ্যান	ভরতপণ্ডিত (কঃ বিঃ ৪০৬৫)
(৯৯)	আধ্যাত্ম রামায়ণ	ভবানীনাথ (কঃ বিঃ ২১১)
(১০০)	কালকেতুর চৌতিশা	শ্রীচাঁদ দাস
(১০১)	কালিকাষ্টক	শম্ভু
(১০২)	কৃষ্ণবর্ণন	নরোত্তম দাস
(১০৩)	কৃষ্ণের একপদ চৌতিশা	ভবানন্দ
(১০৪)	ক্রিয়াযোগসার	প্রাণনারায়ণ (কঃ বিঃ ৬১২৪)
(১০৫)	জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্ব	রামচন্দ্র খান (কঃ বিঃ ৬১২৩)
(১০৬)	জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্ব	কৃষ্ণদাস (কঃ বিঃ ৬১৩৪)
(১০৭)	দ্রৌপদীর যুদ্ধ	সঞ্জয় (কঃ বিঃ ৬১৬৭)
(১০৮)	নারদ সংবাদ	কৃষ্ণদাস (কঃ বিঃ ৬১৯২)
(১০৯)	রাধিকা-মঙ্গল	কৃষ্ণরাম দাস (কঃ বিঃ ৬০৮২)

(ছ) হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থসমূহ।

হিন্দুমতে তন্ত্রশাস্ত্র শিবোক্ত বলিয়া কথিত হয়। ইহার আবার তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে, যথা, আগম, যামল ও তন্ত্র। তন্ত্রসমূহ সংস্কৃতে রচিত এবং সংখ্যায় অনেকগুলি। হিন্দুমতের তন্ত্রগ্রন্থগুলি ভিন্ন বৌদ্ধমতেও (মহাযানী) অনেক তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ভাষায়ও অনেক বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় তন্ত্রের নাম "ঋগ্যুদ"। নিম্নে হিন্দু ও বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলির মধ্যে কতিপয় গ্রন্থের দুইটি তালিকা প্রদত্ত হইল। বৌদ্ধগণের মতে বৌদ্ধতন্ত্রগুলি বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)।

হিন্দুতন্ত্র।

(ক) আগমতত্ত্ববিলাস মতে :—

(১) স্বতন্ত্রতন্ত্র
(২) ফেৎকারীতন্ত্র
(৩) উত্তরতন্ত্র
(৪) নীলতন্ত্র
(৫) বীরতন্ত্র
(৬) কুমারীতন্ত্র
(৭) কালীতন্ত্র
(৮) নারায়ণীতন্ত্র
(৯) তারিণীতন্ত্র
(১০) বালাতন্ত্র
(১১) সময়াচারতন্ত্র
(১২) ভৈরবতন্ত্র
(১৩) ভৈরবীতন্ত্র
(১৪) ত্রিপুরাতন্ত্র
(১৫) বামকেশ্বরতন্ত্র
(১৬) কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র
(১৭) মাতৃকাতন্ত্র
(১৮) সনৎকুমারতন্ত্র
(১৯) বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র
(২০) সম্মোহনতন্ত্র
(২১) গৌতমীয়তন্ত্র
(২২) বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র
(২৩) ভূতভৈরবতন্ত্র
(২৪) চামুণ্ডাতন্ত্র
(২৫) পিঙ্গলাতন্ত্র
(২৬) বারাহীতন্ত্র
(২৭) মুণ্ডমালাতন্ত্র
(২৮) যোগিনীতন্ত্র
(২৯) মালিনীবিজয়তন্ত্র
(৩০) স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্র
(৩১) মহাতন্ত্র
(৩২) শক্তিতন্ত্র
(৩৩) চিন্তামণিতন্ত্র
(৩৪) উন্মত্ত ভৈরবতন্ত্র
(৩৫) ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র
(৩৬) বিশ্বসারতন্ত্র
(৩৭) তন্ত্রামৃত
(৩৮) মহাফেৎকারীতন্ত্র

(৩৯) বারুণীয়তন্ত্র
(৪০) তোড়লতন্ত্র
(৪১) মালিনীতন্ত্র
(৪২) ললিতাতন্ত্র
(৪৩) ত্রিশক্তিতন্ত্র
(৪৪) রাজরাজেশ্বরীতন্ত্র
(৪৫) মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র
(৪৬) গবাক্ষতন্ত্র
(৪৭) গান্ধর্ব্বতন্ত্র
(৪৮) ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র
(৪৯) হংস পারমেশ্বরতন্ত্র
(৫০) হংস মাহেশ্বরতন্ত্র
(৫১) বর্ণবিলাসতন্ত্র
(৫২) মায়াতন্ত্র
(৫৩) কামধেনুতন্ত্র
(৫৪) মন্ত্ররাজতন্ত্র
(৫৫) কুব্জিকাতন্ত্র
(৫৬) বিজ্ঞানলতিকাতন্ত্র
(৫৭) লিঙ্গাগমতন্ত্র
(৫৮) কালোত্তরতন্ত্র
(৫৯) ব্রহ্মযামলতন্ত্র
(৬০) আদিযামলতন্ত্র
(৬১) রুদ্রযামলতন্ত্র
(৬২) বৃহদ্যামলতন্ত্র
(৬৩) সিদ্ধযামলতন্ত্র
(৬৪) কল্পসূত্রতন্ত্র
(৬৫) আগমতত্ত্ববিলাস

(খ) মহাসিদ্ধি সারস্বততন্ত্র মতে :—

(১) সিদ্ধিশ্বরতন্ত্র
(২) নিত্যতন্ত্র
(৩) দেব্যাগমতন্ত্র
(৪) নিবন্ধতন্ত্র
(৫) রাধাতন্ত্র
(৬) কামাখ্যাতন্ত্র
(৭) মহাকালতন্ত্র
(৮) যন্ত্রচিন্তামণিতন্ত্র
(৯) কালীবিলাসতন্ত্র
(১০) মহাচীনতন্ত্র
(১১) মহাসিদ্ধি সারস্বততন্ত্র

(গ) বিবিধ হিন্দুতন্ত্র :—

(১) কুলার্ণবতন্ত্র
(২) কুলামৃততন্ত্র
(৩) কুলসারতন্ত্র
(৪) কুলাবলীতন্ত্র
(৫) কালীকুলার্ণবতন্ত্র
(৬) কুলপ্রকাশতন্ত্র
(৭) বাশিষ্টতন্ত্র
(৮) যোগিনীহৃদয়তন্ত্র
(৯) তারার্ণবতন্ত্র
(১০) মেরুতন্ত্র
(১১) বৈষ্ণবামৃততন্ত্র
(১২) ক্রিয়াসারতন্ত্র
(১৩) আগমদীপিকা
(১৪) তারারহস্য
(১৫) শ্যামারহস্য
(১৬) তন্ত্ররত্ন

(১৭) তন্ত্রপ্রদীপ
(১৮) তন্ত্রসার
(১৯) তারাবিলাস
(২০) সারদাতিলক
(২১) তন্ত্রচূড়ামণি
(২২) ত্রিপুরার্ণবতন্ত্র
(২৩) বিষ্ণুধর্মোত্তরতন্ত্র
(২৪) চতুঃসতীতন্ত্র
(২৫) মাতৃকার্ণব
(২৬) যোগিনীজালকুরকতন্ত্র
(২৭) লক্ষ্মীকুলার্ণবতন্ত্র
(২৮) তত্ত্ববোধতন্ত্র
(২৯) তারাপ্রদীপতন্ত্র
(৩০) মহোগ্রতন্ত্র
(৩১) উড্ডীশতন্ত্র
(৩২) কুলোড্ডীশতন্ত্র
(৩৩) বীর ভদ্রোড্ডীশতন্ত্র
(৩৪) কুক্তডামরতন্ত্র
(৩৫) ডামরতন্ত্র
(৩৬) যক্ষ-ডামরতন্ত্র
(৩৭) আগমচন্দ্রিকাতন্ত্র
(৩৮) আগমসারতন্ত্র
(৩৯) চিন্তামণিতন্ত্র
(৪০) কৈবল্যতন্ত্র
(৪১) পিচ্ছিলাতন্ত্র
(৪২) পীঠ-নির্ণয়তন্ত্র
(৪৩) শক্তিসঙ্গমতন্ত্র
(৪৪) যোগিনীহৃদয়দীপিকা
(৪৫) স্বরোদয়
(৪৬) শ্যামাকল্পলতা
(৪৭) সরস্বতীতন্ত্র
(৪৮) মহানির্বাণতন্ত্র ইত্যাদি।

(ঘ) বারাহীতন্ত্র মতে :—

(১) মুক্তক
(২) সারদা
(৩) প্রপঞ্চ
(৪) যোগডামর
(৫) শিবডামর
(৬) ব্রহ্ম যামল
(৭) রুদ্র যামল
(৮) বিষ্ণু যামল
(৯) আদি যামল
(১০) দুর্গাডামর
(১১) ব্রহ্মডামর
(১২) গণেশ যামল
(১৩) আদিত্য যামল
(১৪) নীলপতাকা
(১৫) যোগার্ণব
(১৬) মায়াতন্ত্র
(১৭) দক্ষিণামূর্তি
(১৮) তন্ত্ররাজ
(১৯) কামেশ্বরীতন্ত্র
(২০) প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র
(২১) যোগিনীতন্ত্র
(২২) বারাহীতন্ত্র
(২৩) আজ্ঞাতন্ত্র
(২৪) তন্ত্রনির্ণয়

(২৫) মৃড়ানীতন্ত্র

বৌদ্ধতন্ত্র

(১) প্রমোদ মহাযুগ
(২) পরমার্থ সেবা
(৩) বারাহীতন্ত্র
(৪) বজ্রধাতু
(৫) যোগিনীজাল
(৬) ক্রিয়ার্ণব
(৭) নাগার্জুন
(৮) যোগপীঠ
(৯) কালচক্র
(১০) বসন্ততিলক
(১১) হয়গ্রীব
(১২) মহাকালতন্ত্র
(১৩) যোগাম্বরা পীঠ
(১৪) ভূতডামর
(১৫) ত্রৈলোক্যবিজয়
(১৬) নৈরাত্মতন্ত্র
(১৭) মর্ম্মকালিকা
(১৮) মঞ্জুশ্রী
(১৯) তন্ত্রসমুচ্চয়
(২০) ডাকার্ণব ইত্যাদি।

পুরাণ

নাম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী মূল "পুরাণ" অষ্টাদশ ও সবগুলিই সংস্কৃতে রচিত। যথা,—

(১) ব্রহ্ম
(২) পদ্ম
(৩) বিষ্ণু
(৪) শিব + বায়ু
(৫) ভাগবত
(৬) নারদীয়
(৭) মার্কণ্ডেয়
(৮) অগ্নি
(৯) ভবিষ্য
(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
(১১) লিঙ্গ
(১২) বরাহ
(১৩) স্কন্দ
(১৪) বামন
(১৫) কূর্ম্ম
(১৬) মৎস্য
(১৭) গরুড়
(১৮) ব্রহ্মাণ্ড

দ্রষ্টব্য – এই পুরাণগুলি ভিন্ন আরও বহু পুরাণ ও উপপুরাণ রহিয়াছে।

সমাপ্ত

শব্দ-সূচী

(শব্দ ও পৃষ্ঠা)

ই

ঈ

উ

খ

ঘ

ছ

জ

ঝ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

প

ভ

ম

ল

ব

শ

হ

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হইবে
২১৭	১৯	সাস্ত্রী	শাস্ত্রী
২২৭	১৮	মাহমদ	মহামদ
২২৯	১৪	কর্ণগড়ের	ময়নাগড়ের
২৪৮	১৩	তৎপুর্ব্বে	তৎপূর্ব্বে
২৫৮	১১,১২	করিতেন	করিত
২৫৮	১২	বলিতেন	বলিত
২৬১	পাদটীকা	তরুণীসেন	তরণীসেন
২৬৩	৩	কংশনারায়ণ	কংসনারায়ণ
২৭৩	১৬	একদশী	একাদশী
২৮৫	১৫	মেদিনপুর	মেদিনীপুর
২৮৮	১৮	মহেশ্বরাদি	মহেশ্বরদি
৩০৮	১২	চতুর্বার্গ	চতুর্বর্গ
৩০৮	১৮	সস্কৃত	সংস্কৃত
৩০৮	২১	দার্শনিত	দার্শনিক
৩০৯	২৮	(খৃ: ৮ম শতাব্দী।	(খৃ: ৮ম শতাব্দী)
৩১৩	১১	বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টর	বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের
৩২৮	১২	কর্ণমুনির পারণ	কণ্বমুনির পারণ
৩৪৪	১৪	“দ্রৌপদীর সয়ম্বর”	“দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর”
৪২৯	২৪	ভুবনবিজয়ী	ভুবনবিজয়ী
৪৩২	৩	বড়ু চণ্ডীদাস	বড়ু চণ্ডীদাস
৪৩৪	৩১	বড়	বড়ু
৪৩৮	১৭	নররূপ	নবরূপ
৪৩৯	পাদটীকা	প্রিয়ারসন	গ্রীয়ারসন
৪৪১	৪	মিনে হয়	মনে হয়
৪৪৫	২৪	বাহির হইয়াছিল	বাহির হইয়াছিলেন
৪৭৭	১১	নিলাচলে	নীলাচলে
৫০৫	১০	পিতার নাম	পূর্বনাম
৫২৯	পাদটীকা	সূচনা	রচনা
৫৪৭	২	১৭শ শতাব্দীর ভাগ	১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগ
৫৬০	পাদটীকা	চিরজীব শর্ম্মা	চিরঞ্জীব শর্ম্মা
৫৬২	পাদটীকা	য়চনাকাল	রচনাকাল
৬২৩	পাদটীকা	উচ্ছসিত	উচ্ছ্বসিত
৬৩৮	২৮	চন্দনগরের	চন্দননগরের

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হইবে
৬৬৪	পাদটীকা	Brâhman Roman Catholic Sambad	Dom Antonio's Brâhman Roman Catholic Sambâd
৬৮০	৭	"ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথোলিক সংবাদ"	"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"
৬৮০	৮	বঙ্গানুবাদ	বঙ্গানুবাদ (পর্তু গিজ Mysteries of the Faith হইতে)